স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন

ভূ মি কা

সুদক্ষিণা ঘোষ

সং ক ল ক

অভিজিৎ সেন
অনিন্দিতা ভাদুড়ী

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : ২৯ এপ্রিল ১৯৬০

প্রচ্ছদশিল্পী : ধ্রুব দাস
সহঃ সম্পাদনা : নিলয় মুখার্জ্জী

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

বর্ণ সংস্থাপন:
আই. ই. আর. ই.
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর:
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৩৭/১/২ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কোলকাতা-৪

ভূমিকা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্ম নিয়েছেন এক সাহিত্যিক, কুড়ি বছর বয়সে রচনা করেছেন এক ঐতিহাসিক উপন্যাস, মনন মেধা ও কল্পনারসের মিশ্রণে একে একে লিখে চলেছেন আরো অনেক উপন্যাস—সামাজিক, ঐতিহাসিক; লিখছেন ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গান ; স্বাধীন মনস্বিতায় সম্পাদনা করছেন নামী কোনো সাহিত্যপত্র, গড়ে তুলছেন অনেক মানুষের অর্থময় একটি সম্মিলন ক্ষেত্র—একটি সমিতি।

ছিয়াত্তর বছরের জীবন পরিধির মধ্যে এতগুলি ভূমিকার দায়িত্ব যিনি সফলভাবে পালন করেছেন, স্বভাবতই তাঁর পক্ষে বড়ো সহজ হয় নি সে কাজ,—আরো কঠিন বলে মনে হবে, যদি মনে রাখি বিচিত্রপথগামী এ মানুষটি বেড়ে উঠেছেন অন্তঃপুরের অন্তরালে।

বিচিত্রকর্মা এই মানবীরই নাম স্বর্ণকুমারী দেবী—রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা, ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ দুহিতাদের অন্যতমা তিনি। এ কথা ঠিক যে, ঠাকুরবাড়ির মতো সমৃদ্ধ শিক্ষিত অভিজাত সংস্কৃতিমনস্ক পবিবারে জন্ম হয়েছিল তাঁর, দেশজোড়া সাধারণ মেয়ের মতো অশিক্ষা-অজ্ঞানতা-সংস্কারবদ্ধতা-প্রথাসর্বস্বতার অদ্ভুত আঁধারের মাঝে বাস করতে হয় নি তাঁকে, ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব অন্তঃপুরশিক্ষার আয়োজনেব পাশাপাশি পেয়েছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো পিতা আর দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো অগ্রজদের সঙ্গ ও সান্নিধ্য, মাত্র এগারো বছর বয়সে ব্রাহ্মবিধিমতে পরিণীতা হলেও জীবনসঙ্গী রূপে পেয়েছেন জানকীনাথ ঘোষালেব মতো উদারমনা পুরুষকে—কিন্তু জীবন থেকে পাওয়া এ সমস্ত সুযোগকেই দিনে দিনে জীবনের অর্জনে পরিণত করে নিয়েছেন স্বর্ণকুমারী।

১৮৫৬ থেকে ১৯৩২—দীর্ঘ এই কালসীমায় তিলে তিলে গড়ে উঠেছে স্বর্ণকুমারী দেবীর ব্যক্তিত্বের প্রতিমা। ১৮৭৬ সালে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসের অনামিকা লেখিকা হিসেবে স্বর্ণকুমারীর আত্মপ্রকাশ আর শেষ ত্রয়ী উপন্যাস 'বিচিত্রা-স্বপ্নবাণী-মিলনরাত্রি'-র শেষ খণ্ড 'মিলনরাত্রি'-র প্রকাশকাল ১৯২৫ সাল, যখন তাঁর বয়স ঊনসত্তর। উনবিংশ শতকের শেষ অর্ধাধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধার্ধ—এই দুই যুগ জুড়েই অব্যাহত ছিল তাঁর সৃজনশীলতা। আর তাই, লেখক হিসেবে তিনি যেমন দেখেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতার গর্ভ থেকে নতুন চেতনার জাগরণ, বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ-বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে মেয়েদের দিন যাপনের অসহায়তা, আর সেই যাপিত জীবনের অধিকারহীনতাকে অনুভব করে নতুন সংবেদনার উন্মেষ ;অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর সূচনা-মুহূর্ত থেকে দেখেছেন রাজনৈতিক উন্মাদনা—বঙ্গভঙ্গের অন্যায় আক্রমণ, সে-অন্যায় রোধের সংগ্রাম, বয়কট আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদলের হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি কিংবা জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতায় নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মতাদর্শগত বিরোধ। আর এই সব বিষয় নানা ভঙ্গিতে—কখনো গল্পে-উপন্যাসে, কখনো-বা প্রবন্ধে—রূপ নিয়েছে তাঁর রচনায়, চিরকালীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীনতাকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে তাঁর লেখালেখি।

তবু, আজকের পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কী এমন লেখালেখি করেছেন তিনি, যে জন্য আজ আমরা তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাগুলিকে বাঁধতে চাইছি এক মলাটের পরিসরে, তুলে দিতে চাইছি দূর যুগের পাঠকের হাতে?

ইতিহাসের তথ্য তো অনেকদিনই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত অসূর্যম্পশ্যা সেই বঙ্গভূমিতেও স্বর্ণকুমারী দেবী নন বাংলার প্রথম নারী-ঔপন্যাসিক ; প্রথম কবিতা, প্রথম গান, প্রথম নাটক—সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখাতেই স্বর্ণকুমারী দেবীর আগেই কলম ধরেছেন কোনো-না-কোনো মহিলা-লেখক, এমনকী পুরুষ-প্রভাবিত পত্রিকা-সম্পাদনার জগতেও স্বর্ণকুমারী দেবীর আগে লেখা আছে থাকমণি দেবী বা মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের নাম।

আসলে একথাও আমরা ভুলি নি যে, ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে প্রথম হওয়ার গৌরবে নয়, স্বর্ণকুমারী স্বতন্ত্র তাঁর ধারাবাহিকতার সামর্থ্যে। সাহিত্যের প্রতিটি শাখাপ্রশাখাকেই শুধু অনায়াসে ছুঁয়ে যায় নি তাঁর কলম, দীর্ঘকাল একই সাবলীলতায় প্রাণবানও রয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে নারী-সাহিত্যিকদের রচনাধারার উৎসমুখটি লুকিয়ে আছে তাঁরই কলমের আঁচড়ে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলীর যে ক'টি খণ্ড বহুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল, উত্তরযুগের কাছে আজ আর তা খুব সহজপ্রাপ্য নয়, তাই ছোটগল্প-প্রবন্ধ-নাট্যে সাজানো এমন একটি সংকলন বড়ো জরুরি ছিল এখন, এই লেখাগুলির স্বাদ গন্ধ ও সৌন্দর্যই আজকের পাঠককে চিনিয়ে দেবে স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিত্ব আর সাহিত্যের স্বরূপ।

২

"যাহারা হারিবে জানিয়াও সমস্ত পণ করে, তাহারা পাগল, কিন্তু এরূপ পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নহে, অন্তত অর্ধেক—নারীজাতি।"—'ভারতী' পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লিখতে বসে এই কথাগুলি একদিন লিখেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। আর স্বর্ণকুমারীর গল্পের জগতের অনেকখানি জুড়ে আছে এই 'পাগল' মেয়ের দল ; ভালোবাসায় সর্বস্ব সমর্পণ করেই যারা জীবন পণের খেলায় নেমেছে—এই সংকলনের নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যেই 'লজ্জাবতী' 'পেনে প্রীতি' 'কেন' 'গহনা' 'যমুনা' 'অমরগুচ্ছ' 'পূজার তত্ত্ব' কিংবা বড়োগল্প 'মালতী'—সবখানেই ছড়িয়ে আছে এইরকম সাধারণ কিন্তু 'পাগল' মেয়ের দল, এ সংসারের সব সুখের খেলাতেই অনধিকারের ললাট লিখন নিয়ে যারা পৃথিবীতে এসেছে ; আর সব দিয়ে, কিছুই না পেয়ে নিরভিমান প্রেমে মুছে গেছে সংসারের পট থেকে, ঝরে গেছে একরাশ 'মৃদুহাস্যময়ী কুসুমকলিকা'। ফুলের মতোই স্বল্প পরমায়ু নিয়ে আর সুন্দর মন নিয়ে এসেছে এই সুহাসিনী সুভাষিণী মেয়েরা, ক্ষীণ আয়ুশেষে ফুলেরই মতো সৌন্দর্যের সৌরভ জাগিয়ে রেখে হারিয়ে গেছে।

স্বর্ণকুমারীর মনের গভীরে হয়তো কোথাও ছিল এমন শ্রীময়ী একটি মেয়ের মুখের আদল—তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল'-এর নায়িকা কনক বা 'স্নেহলতা' উপন্যাসের নায়িকা স্নেহলতার চরিত্রের ছাঁচও এমনই এক সর্বংসহা নারীর। ছোটগল্পের জগতের এই মেয়েদের—এমন অসহায় অসম্পূর্ণ অসমর্থ ভালোবাসায় এমন আবিষ্ট মেয়েদের ছবিও অনেকখানি মমতা আর সমবেদনা মিশিয়ে এঁকেছেন স্বর্ণকুমারী।

শুধু বাঙালী মেয়েরাই কি জানে এমন আত্মহারা হয়ে ভালোবাসতে? আত্মহারা ভালোবাসার সর্বোত্তম নিদর্শন স্বর্ণকুমারীর 'পেনে প্রীতি' গল্প, যেখানে মহারাষ্ট্রের সুদূর 'পেন' গ্রামের এক অখ্যাত আঙিনায় অপেক্ষা করে আছে এক অপরূপসুন্দরী মারাঠী মেয়ে—যার জন্য তার এই শবরীর প্রতীক্ষা, সেই সাহেব সম্পর্কে তার ভগ্নীপতি, দশ বছর আগে

পরিহাসছলে সে শ্যালিকাকে বলেছিল বড়ো হলে সে তাকেও বিয়ে করবে। বালিকা সেই পরিহাসকেই অঙ্গীকার জেনে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় কাটিয়ে দিয়েছে দীর্ঘ দশ বছর, সপ্তদশী তরুণীটি আজও অপেক্ষা করে চলেছে—নিরভিযোগ প্রেমে, নিশ্চিত প্রত্যয়ে। প্রতিদানহীন এমন প্রেমও সম্ভব!

প্রতিদানহীন প্রেমেরই জগৎ স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্পে, এমনই সৌন্দর্যময় সে প্রেমের জগৎ, যে দুশ্চরিত্র খলনায়িকাকেও যথোচিত খলচরিত্র বলে মনে হয় না, বেদনাময় অনুকম্পা জেগে ওঠে তার জন্যও—স্বর্ণকুমারীর 'কেন' গল্পে যেমন। অন্যাসক্ত স্বামীকে নিয়েই যন্ত্রণা এ গল্পের গৃহবধূটির, তবু স্বামীর প্রতি ভালোবাসার অন্ত নেই তার, অকাতরে স্বামীর হাতে তুলে দেয় নিজের গয়না, স্বামীর সমস্ত স্খলন-পতন-ত্রুটি মেনে নিয়ে তারই অপেক্ষায় প্রহর গোণে, অবশেষে অপেক্ষা সার্থক করে একদিন ফিরেও পায় স্বামীকে—নিজের কোনো তপস্যাব গুণে নয়, 'অন্য' সেই চরিত্রহীন মেয়েটির উদারতায়, পতিব্রতা বধূটির যন্ত্রণার আঁচ পেয়েই যে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সবিয়ে নিয়েছে প্রেমের প্রতিযোগিতা থেকে। আসলে এ গল্প দুই নারীর ভালোবাসার প্রবলতারই গল্প, একই পুরুষকে ভালোবেসেও যারা পরস্পবের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়ে ওঠে নি, একে অপরকে না চিনেও অদৃশ্য এক সখিত্বের বাঁধনে জড়িয়েছে নিজেদেব। প্রেমিক পুরুষটির ভালোবাসার কোনো নির্ধারক ভূমিকাই নেই এ গল্পে —ভালোবেসেও সবল প্রত্যাখ্যানে কারো ফিরিয়ে-দেওয়া আর সব জেনেও উদার ক্ষমায় কাবো ফিরিয়ে-নেওয়া—প্রেমিক পুরুষটি কেবল এই দেওয়া-নেওয়ার ক্রীড়নক মাত্র। পুরুষ-প্রতাপী সমাজের দুই নারী-এক পুরুষ ছকের বেশ বিপরীত ছবি এই গল্পটি, যেখানে পুরুষটি সর্বপ্রকাবে প্রতাপবিহীন।

লাজুক মেয়ে লজ্জাবতীর অকালমৃত্যুব কারণ খানিকটা যদি হয় তার অভিযোগহীন অভিমানী স্বভাব, খানিকটা তো নিশ্চয়ই তার শ্বশুববাড়িব—শাশুড়ি, জা-এর অবহেলা ; কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো বধূনির্যাতনেব চেনা ছকেব গল্প হয়ে ওঠে না লজ্জাবতী—তার অকালমৃত্যুর বেদনা ছাপিয়েও বড়ো হয়ে ওঠে তার অভিমানী স্বভাব, বিনা দোষে দোষী করলেও যে আত্মপক্ষ সমর্থন করে না, প্রতিবাদ করে না, নীরবে চোখেব জল ফেলে শুধু ; আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—রায়বাঘিনী বলে বাঙালী সমাজ যাকে নিন্দিত করেছে সেই ননদিনীর সঙ্গে লাজুক ছোট বৌ লজ্জাবতীর নীরব স্নেহসম্পর্কটুকু। দুই অসমবয়সী নারীর এই সখিত্বে, স্বার্থহীন ভালোবাসায় আর লজ্জাবতীর প্রতিবাদহীন স্বভাবের মাধুর্যেই করুণ কোমল তারে বাঁধা হয়ে যায় গল্পটির সুর।

অগ্রজদের ভালোবাসা ছিল স্বর্ণকুমারীর নিজের জীবনের একটি পরম সম্পদ। তাঁর 'মালতী' নামের বড়োগল্পটিতে কিশোরী মালতীর রক্ত-সম্পর্কে আপন দাদা নয় রমেশ, তবু আশৈশব দাদা বলেই জেনেছে তাকে—সেই দাদার জীবন থেকে অ-সুখের একটি কাঁটা তুলে দেবার জন্য, রমেশ-শোভনার যুগল জীবনকে নিশ্চিন্ত নির্ভার করার জন্য অকাতরে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে ছোট্ট মালতী। এ গল্প যতখানি ত্রিভুজ ভালোবাসার ভুল-বোঝাবুঝির গল্প, তার চেয়েও অনেক বেশি মাত্রায় বড়ো ভাই ও ছোট বোনের অকৃত্রিম স্নেহবন্ধনের গল্প।

সামাজিক সংস্কারের চেনা ছকে বন্দী স্বর্ণকুমারীর গল্পের অনেক নায়িকাই ; 'অমরগুচ্ছ' গল্পে যেমন দেখি বিধবা ষোড়শী মেয়েটি অমরপুষ্পের উপহার তুলে দিয়েছে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের নবপরিণীতা বধূর হাতে, তারপরে সান্ত্বনা খুঁজেছে বিস্মৃত স্বামীর ছবিতে-আঁকা মুখশ্রীতে। কিংবা, 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে শুনতে পাই মাতৃত্বের সংস্কারের উচ্চারণ। পতিগৃহে

পিতৃনিন্দা শুনে আর পিতৃগৃহে পতিনিন্দা শুনে সমান কাতর বাঙালী বধূর বেদনার ছবি আছে এ গল্পে, সন্তাপ-তাড়িতা সে-মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে মা বলেছেন—"সহ্য করে কর্তব্যপালনেই মনুষ্যত্ব। স্ত্রীলোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ করে—প্রকৃত মানুষ করে তুলবে—তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।" স্বর্ণকুমারীর এ গল্পের রচনাকাল আশ্বিন, ১৩২১—তবু 'স্ত্রীলোকের জীবনের উদ্দেশ্য' খুঁজতে মাতৃত্বেই মেয়েদের জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা—সমাজের এই দীর্ঘদিনের সংস্কারের পিছুটানকেই স্বীকার করে নিলেন তিনি।

মেনে-নেওয়া মানিয়ে-নেওয়া আর সহ্য করে চলাতেই মেয়েদের লক্ষ্মীশ্রী দেখেছেন স্বর্ণকুমারী, কিন্তু প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গও অনেক সময়ই জ্বলে উঠেছে তাঁর গল্পেও। 'সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত' 'যমুনা' গল্পে যেমন, নবপরিণীতা যমুনাকে তার স্বামী নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল নতুন দাসী পরিচয়ে, 'গর্বিত তীব্র স্বরে' যমুনা স্বামীকে বলে এসেছিল—'তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি তোমার পত্নী নহি—আমাকে স্পর্শ করিও না'; ছেড়ে এসেছিল সংসারের মায়া। জীবনের খেলায় অবশ্য জেতে নি যমুনা, অকালেই ফুরিয়ে গিয়েছিল তার জীবন। এ গল্পটিতেও পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার ছবি আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে যমুনা ও গল্পের কথক—আশ্রিতা ও আশ্রয়দাত্রীর স্নেহমধুর সম্পর্কের ছবিটি।

স্বামীর অনাচারের প্রতিবাদ করেছে 'তিনটি দৃশ্য' গল্পের ধনিষ্ঠাও, তার প্রতিবাদের দৃপ্ত তেজ দেখেই ভুল বুঝতে পেরেছে, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে তার বিপথগামী স্বামী।

'তিনটি দৃশ্য' গল্পেরই একটি চরিত্র মন্তব্য করেছিল—তার বিচারে পৃথিবীতে সবচেয়ে 'তাজ্জব ব্যাপার' বাঙালীর গৃহবধূ। এত বিচিত্র প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এত অপরিমিত ক্ষমতার তুলনা আর নেই পৃথিবীতে। এই রকম সহায়হীন অথচ শক্তিময়ী মেয়েদের চরিত্রকেই নানাদিক থেকে দেখেছেন আর বাঙালী পাঠককে দেখিয়েছেন স্বর্ণকুমারী—তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে। আর সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন—মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু—এই চলতি কথাটার বিপরীতে মেয়েদের পারস্পরিক ভালোবাসার শক্তি। সংসারের স্বার্থবহুল সম্পর্কগুলির মধ্যে থেকেও তারা কীভাবে নিষ্কাশন করে নেয় ভালোবাসার অমৃতরস—অচেনা এক গৃহবধূর মায়ায় চরিত্রহীন এক মেয়ে নিঃশব্দে আর নিঃশেষে ছেড়ে দেয় তার ভালোবাসার অধিকার, ননদ-ভ্রাতৃবধূ হয়ে ওঠে পরমসখী, আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা হয়ে ওঠে অত্যাগসহন বান্ধবী। মেয়েদের পারস্পরিক ভালোবাসায় এমন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল বলেই তো এ গল্পগুলির স্রষ্টা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন 'সখিসমিতি'-র মতো একটি নারী সম্মিলনী।

স্বর্ণকুমারীর গল্পরচনার জগতের বৈচিত্র্যকে চিনে নিতে আরো অনেকগুলি গল্প আছে এ সংকলনে, সামাজিক গল্পের পাশাপাশি আছে টডের রাজস্থান থেকে আহৃত ঐতিহাসিক আখ্যানগুলি। কোনো কোনো গল্প, যেমন 'ক্ষত্রিয়রমণী', কাহিনী উৎস এক বলেই হয়তো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বেশি পরিচিত 'হাম্বির' গল্পটিকে মনে না করিয়ে পারে না।

এই সংকলনভুক্ত আর-একটি গল্পের উল্লেখও না করলেই নয়—গল্পটির নাম 'নব ডাকাতের ডায়েরি'। 'মাসিক বসুমতী'-তে গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল ১৩২৯ বঙ্গাব্দে। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বদেশবোধ, তাঁর রাজনীতিভাবনার প্রত্যক্ষ পরিচয় ধরা আছে এই গল্পটিতে। স্বদেশী ডাকাতি বিষয়ে বীরপূজক, বাঙালীর মোহমুগ্ধতা ভেঙে দিতে চেয়েছেন স্বর্ণকুমারী নায়ক নবকুমারের কার্যকলাপ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে (মনে পড়ে যেতে পারে

বেশ কিছু বছর পরে লেখা 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অন্তর আক্ষেপ—দলের নির্দেশে অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুণ্ঠন করার পর তার আত্মগ্লানি), কেমিক্যাল-সাহেবের হিতৈষণার মধ্যে দিয়ে হয়তো ফুটে উঠেছে বড়ো-ইংরেজের স্বরূপ। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবপন্থী রাজনীতি কোনোদিন স্বর্ণকুমারীর সমর্থন পায় নি, এ গল্পে যেমন তার পরিচয় আছে, শেষ ত্রয়ী উপন্যাস বিচিত্রা-স্বপ্নবাণী-মিলনরাত্রি-তেও আছে সেই অসমর্থনের অভিজ্ঞান, এই রচনাবলীতে সংকলিত 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ', 'কর্তব্য কোন্ পথে', 'আমাদের কর্তব্য'—প্রভৃতি নিবন্ধেও আছে তার স্পষ্ট পরিচয়।

৩

সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারীর সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশ বোধহয় তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তায়; অথচ প্রাবন্ধিক স্বর্ণকুমারীই দীর্ঘদিন ছিলেন পাঠকের কাছে সবচেয়ে বিস্মৃত এবং দুষ্প্রাপ্য। দুষ্প্রাপ্য, কারণ দূর অতীতে স্বর্ণকুমারী দেবীর যে ক'টি রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে, তার একটিতেও তাঁর গদ্যপ্রবন্ধগুলির বিশেষ স্থান হয় নি। সাম্প্রতিক কালে 'বিকল্প' প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পেয়েছে 'স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ'— এই বইটিই বোধহয় এখন তাঁর একমাত্র সহজপ্রাপ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

আর তাই, স্বর্ণকুমাবী দেবীর ঐ প্রবন্ধ-সংকলনটি এখনকার পাঠকের কাছে অনায়াসলভ্য বলেই হয়তো ঐ বইয়ের প্রবন্ধগুলি সযত্নে পরিহার করা হয়েছে বর্তমান সংকলনে। তার ফলে, এই সংকলনে স্থান পায় নি 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' বা 'গিল্‌টির বাজার'-এর মতো তীব্র শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ, 'বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা'-র মতো প্রখর সমাজ-সচেতন নিবন্ধ, বা রমাবাই-কেন্দ্রিক বিতর্কিত প্রবন্ধ অথবা 'নীলগিরির টোডা জাতি' শীর্ষক নৃতত্ত্বভিত্তিক ভ্রমণরচনাটি।

কিন্তু এক মলাটের পরিসরে স্বর্ণকুমারীর আরো বহু বিচিত্র প্রবন্ধের সমাহারে আকীর্ণ বর্তমান সংকলনটি—বিজ্ঞান, সমাজ, ভ্রমণ, ব্যক্তিত্ব —এ বিষয়ে তাঁর বোধ এবং উপলব্ধির প্রকাশ তো ধরা আছেই, 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর ভাবনা-কণিকার বেশ কয়েকটি টুকরোও সংকলিত হয়েছে এখানে।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর অনন্যতা অনস্বীকার্য। যে-যুগে লেখালেখি শুরু করেছিলেন স্বর্ণকুমারী, সে সময়ে যে স্বল্প-সংখ্যক মহিলা লেখালেখি করতেন, তাঁরা গল্প-উপন্যাস-কবিতা লিখতেন কিন্তু অভ্যস্ত ছিলেন না বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনা বা পাঠে। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রধানত স্বদেশীয় মহিলাদের কথাই ভেবেছিলেন স্বর্ণকুমারী—পত্রিকায় বিজ্ঞান প্রবন্ধের মাত্রা বাড়াবার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর, সেই মহিলাদের কথা ভেবেই—যাঁরা বিদেশি ভাষা জানেন না আর জানেন না বলেই আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা তাঁদের আয়ত্তের অতীত।

প্রথাগত বিজ্ঞানশিক্ষা ছিল না স্বর্ণকুমারী দেবীরও, তবু পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি, লিখিয়েছেন আরো বহুজনকে দিয়ে। স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞান প্রবন্ধের বিশেষত্ব এইখানেই যে, সেগুলি তথ্যভারাক্রান্ত নয়, সে তথ্যগুলি আজকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে হয়তো আর ততো প্রয়োজনীয়ও নয়, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলির গ্রহণযোগ্যতা আজও অম্লান তার সরসতায়, তার সাধারণের পাঠোপযোগী পরিবেশনের দক্ষতায়। এই সংকলনভুক্ত 'প্রলয়' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়লেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-র 'প্রকৃতি' নামের বিজ্ঞানগ্রন্থটির সমালোচনা আছে এ সংকলনে। সমালোচনা করতে বসে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন—"বিদেশীয় ভাষায় এ সকল জ্ঞান আয়ত্ত করিতে যে শ্রম যে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল ইহাতে সে ক্লেশ নাই সে শ্রম নাই; আছে শুধু জ্ঞানলাভের আনন্দ আর কাব্যপাঠের মুগ্ধতা।" আরো লিখেছিলেন স্বর্ণকুমারী —"...পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিগূঢ় কঠোর তত্ত্বসকল বাংলা ভাষায় যে এমন সংক্ষেপে অথচ এত জলের মত পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করা যায় এ বইখানি না পড়িলে তাহা ধারণা করা যায় না।" স্বর্ণকুমারীর লেখা এই কথাগুলিই বলা চলে স্বর্ণকুমারীর নিজের বৈজ্ঞানিক রচনা সম্পর্কেও।

সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে স্বর্ণকুমারীর আর এক রূপ। 'অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের সহিত শিক্ষিত মহিলাদের সম্মিলন'-এর প্রস্তাব নিয়ে ১২৯২ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর 'একটি প্রস্তাব' প্রবন্ধ; যে প্রবন্ধে নারীশিক্ষার অনুকূলে প্রশ্ন করেছিলেন স্বর্ণকুমারী—বাইরের শিক্ষাই কি পুরুষের জীবনেরও একমাত্র শিক্ষা? জানতে চেয়েছিলেন—ঘরের শিক্ষা কি পুরুষের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না? জানাতে চেয়েছিলেন—স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সমাজ শুধু 'আধাআধি রকমে ক্ষতিগ্রস্ত' হয় না, বাধাপ্রাপ্ত হয় জাতির 'সম্যক উন্নতি'-ই।

পরের বছর, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে স্বর্ণকুমারীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল 'সখিসমিতি' আর ঐ বছর 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হল তাঁর প্রবন্ধ—'আর একটি প্রস্তাব'। স্বর্ণকুমারীর জন্মের বছরে আইনস্বীকৃত হয়েছিল বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার। তবুও, পুনর্বিবাহে অনিচ্ছুক যে-সব বিধবারা তখনও আশ্রিতার জীবন যাপন করে চলেছেন, এ প্রস্তাবে তাঁদের ডাক দিলেন স্বর্ণকুমারী; তাঁর প্রস্তাব ছিল– অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবারা রীতিমতো শিক্ষালাভ করে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদের শিক্ষাদান করে অর্থবান করে তুলতে পারেন নিজেদের জীবন।

'একটি প্রস্তাব' এবং 'আর একটি প্রস্তাব'-কে বলা যায় সখিসমিতির-র ঘোষণাপত্র। আর সেই ঘোষণাপত্রের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে যায় স্বর্ণকুমারীর সমাজবোধ। এই দু'টি প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান সংকলনে।

রাজনৈতিক, ভ্রমণকেন্দ্রিক, সাহিত্যিক এবং স্মরণীয় কয়েকজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর শ্রদ্ধার উচ্চারণ সংকলিত হয়েছে সংকলনের অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতে।

৪

'কৌতুকনাট্য' রচনায় পথিকৃৎ নন স্বর্ণকুমারী দেবী, তাঁর আগে রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় নাট্যরচনা করেছেন পত্রিকার পাতায়। স্বর্ণকুমারী রচিত কৌতুক-নাট্যগুলিও প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' এবং 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার নানা সংখ্যায়।

কৌতুকনাট্য বা হেঁয়ালিনাট্য বা রহস্যনাট্য রচনার উৎস ছিল বিদেশি শারাড় (Charades)। শারাড় অনেকটা ধাঁধার মতো একটি নাট্যখেলা। অভিনয় বা সংলাপের মধ্যে থেকে দর্শক বা পাঠককে নাট্যে পরিবেশিত হেঁয়ালিটির উত্তর খুঁজে বার করতে হয়—এটাই এ খেলার নিয়ম।

এইরকম একটি লঘু উদ্দেশ্যকে মনে রেখেই কৌতুকনাট্যগুলি রচনা করেছিলেন

স্বর্ণকুমারী। কিন্তু খেলার উপাদানেব পাশাপাশি মানবচরিত্র ও সমকালীন সমাজজীবনের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যকে আশ্রয় করেছিলেন বলে তাঁর অধিকাংশ নাটিকাই কেবল ধাঁধার উত্তরের সন্ধান না দিয়ে হয়ে উঠেছে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ।

স্বল্পপরিসর এই নাটিকাগুলিতে সমকালীন বহু প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে কৌতুকের আয়োজন করেছিলেন স্বর্ণকুমারী। যেমন, সমকালীন বাঙালী মহিলার সাজপোশাক। এ বিষয়ে রুচির অভাব নিয়ে ক্ষোভ ছিলই স্বর্ণকুমারীব। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই নির্মল কৌতুকের আয়োজন দেখি 'লজ্জাশীলা' নাটিকায়, আবার 'সৌন্দর্যানুরাগ' নাটকেও দেখি সেই একই প্রসঙ্গের উত্থাপন, কিন্তু এবারে অভিযোগের তীর ঘুবে গেছে পুরুষের অভিমুখে। এ নাটিকায় স্ত্রী জানতে চাইছেন, মেয়েদের এই রুচিহীন সাজ পোশাকেব দায়িত্ব কাব? সত্যিই মেয়েদেরই রুচিহীনতার, নাকি, তা আসলে পুরুষেবই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন? লঘু ব্যঙ্গের সুরে বলা হলেও স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথনের আড়ালে কোথাও যেন সামাজিক সত্যের গভীর সুরও শোনা যায়।

আবাব, নাবী-পুরুষেব অসমবিবাহকে কেন্দ্র কবে কৌতুক বিচ্ছুবিত হয়েছে 'বিবহবেদনা' নাটিকায়। ববীন্দ্রনাথের 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতার মতোই এ নাটিকাব বালিকা বধূটি বিবাহের অর্থই বোঝে না. সেই বালিকাবধূব বিরহে সকাতব যুবক বব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে—ক্ষুদ্র বৌটি বিরহকাতব না হযে ছোটাছুটি হাসিখেলা করে বেড়াচ্ছে শুনে সিদ্ধান্ত কবেছে—'রমণী, তুমি সত্যই ভুজঙ্গিনী।'

এইভাবেই বিষযবস্তুতে, বচনাকৌশলে তাৎক্ষণিক শব্দকৌতুকীকে অতিক্রম কবে যেতে পেবেছিলেন স্বর্ণকুমাবী, আব তাই এ লেখাগুলি আজও পাঠককে দিতে পাবে অনাবিল সাহিত্যরসেব স্বাদ।

এই সময়ে এমন একটি সংকলন প্রকাশের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র। স্বর্ণকুমাবীর উপন্যাস-নাটক-কবিতা বা গান স্থান না পেলেও এই সুঠাম সংকলনটি থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীর ব্যক্তিত্বের একটি বেখাচিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের চোখে, উদ্ভাসিত হযে ওঠে তাঁর চারিত্রের নানা দিক, আজকের পাঠকেব চোখেও উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয় তাঁব প্রাসঙ্গিকতা। এ সংকলনের অমূল্য সংযোজন এর পরিশিষ্ট দুটি আর গ্রন্থপঞ্জী অংশটি। গবেষকেব অসীম নিষ্ঠা ও অশেষ শ্রমে সংকলকদ্বয় এ অংশটি সংকলন করেছেন।

যে বাঙালী মনীষা, সাহিত্যিক আর সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির উত্তরাধিকার আমরা আজও বহন করে চলেছি, তার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা সেদিনের মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে অনবহিত থেকে যাই। স্বর্ণকুমারীর রচনার এই সুচয়িত সংকলনের মধ্যে দিয়ে আমরা ছুঁতে পারি শতাব্দী প্রাচীন সেই ব্যতিক্রমী নারীমনীষাকে, চিনে নিতে পারি তাঁর সমকালকে, আর সেই সমকালকে ঘিরে তাঁর প্রত্যাশা, তাঁর অন্বেষণ আর তাকে অতিক্রমণের আগ্রহকে।

সূচি

ছোটগল্প

মালতী

১

দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরমধ্য দিয়া বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া সুখময়ী নদী বক্র ভাবে বহিয়া যাইতেছে। তীরে লতাচ্ছাদিত একখানি কুটীর, কুটীরের দুই পার্শ্বে মালতী-লতাবেষ্টিত দুইটি ঝাউ গাছ, তাহার তলায় দুইজনে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে ; চতুর্থীর চাঁদ, নিরাশ হৃদয়ে ক্ষীণ আশার মত গগন প্রাঙ্গণে একটি ধারে মলিন জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়াও যেন করিতে পারিতেছে না ; চঞ্চল নদীবক্ষ ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া, ফুটন্ত মালতী ফুলগুলি আরো ফুটাইয়া মালতীর মুখে সেই চাঁদ পড়িয়াছে। মালতী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা, মালতী জ্যোৎস্নাময়ী প্রতিমা—মালতী মৃদুহাস্যময়ী কুসুমকলিকা। মালতী কথা কহিতে কহিতে একবার চাঁদের পানে চাহিয়া দেখিল, একবার জ্যোৎস্না-ধৌত সুখময়ীর তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দেখিল, একবার সন্ধ্যাসমীর আন্দোলিত মালতীলতা হইতে কতকগুলি ফুল লইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিয়া বলিল, "দাদা আর দশ দিন আছে মাত্র, তবুও আমার মনে হচ্ছে দিন বুঝি আর ফুরাবে না।"

যুবকের হর্ষোৎফুল্ল মুখ এই কথায় আরো প্রফুল্ল হইল, ঈষৎ রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইল, যুবক একটু হাসিতেই তাহার কথায় উত্তর করিলেন। মালতী গোলাপকলির মত রাঙা মুখ খানি নাড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া আবার বলিল, "দাদা, আমরা দু'জনে চিরকাল এই কুটীরটিতে আছি, শোভনা এলে আমাদের একটি লোক বাড়বে, তুমি যখন দিনের বেলা কাজে যাবে, আমাকে আর একলা থাকতে হবে না।" যুবক হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই মালতী তোর বুঝি এত আহ্লাদ?"

মালতী ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল, "না, দাদা, আমি শোভনাকে কত ভালবাসিয়াছি তুমি তা জান না।"

যু। "তাকে না দেখেই এত ভালবাসা কি করে হোলো? তোদের বুঝি স্বপ্নে স্বপ্নে এত ভাব হোয়ে গেল?"

মা। "আমি নাই বা দেখলুম, তোমার কাছে তার কথা শুনে শুনেই আমার ভালবাসা হয়েছে, তাকে দেখতে যে কি ব্যগ্র হয়েছি তা আর কি বলব। বিয়ের আগে, দাদা, একদিন তাকে দেখাবে না?"

যু। "সে তো এ গ্রামে নয়, যে দূরে যেতে হয়, তুই ছেলেমানুষ, কষ্ট হবে যে —নইলে কি আর আমি তোকে তার কাছে নিয়ে যেতেম না? শোভনাও যে তোকে কতবার দেখতে চেয়েছে তার ঠিক নেই।"

মা। "তবে কি, দাদা, সেও আমাকে ভালবাসে?"

যুবকের উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই পূর্ণ উচ্ছ্বাস ভরে বালিকা তখনি আবার বলিল, "আহা, দাদা, তোমার বিয়ে হবে, আমার যে কি আহ্লাদ হচ্ছে কি বলব। তুমি যখন না থাকবে, তাতে আমাতে আমার ঐ বাগানটিতে বেড়াব, তাকে কত সাজাব, তুমি এলে দেখে কতই খুসী হবে, দু'জনে কতই গল্প করব।"

যু। "তুই দেখছি এখন থেকেই মনে মনে সব কল্পনা করে রেখেছিস।"

সহসা গল্পের মধ্যে বালিকা মৌন হইয়া পড়িল, তাহার প্রফুল্ল মুখখানি বিষাদে আচ্ছন্ন হইল, যুবার কথায় কাণ না দিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "দাদা, আহা, আজ যদি মা থাকিতেন, তাঁর এ বিয়েতে কত আহ্লাদই হোত।"

যুবাও যেন এই কথায় বিমর্ষ হইলেন, কি যেন ভাবিতে ভাবিতে আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "তাই কি? তিনি থাকিলে কি এ বিবাহ হইত?"

বালিকা আশ্চর্য্য হইল, বালিকা কুতূহল হইয়া বলিল, "তিনি থাকিলে এ বিবাহ হইত না? কেন?"

যুবক নিস্তব্ধ, যুবক গম্ভীর, এ কথায় কোন উত্তর করিলেন না।

বালিকা আবার বলিল, "দাদা, মা থাকিলে এ বিবাহ হইত না কেন?"

যুবা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে স্থির-গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মালতি, তুই এখন বড় হ'য়েছিস, তোর এখন সকল কথা বুঝিবার ক্ষমতা হয়েছে, এতদিন ধরে তোর নিকট যে একটি কথা লুকিয়েছি, আজ তা' বলিব, মালতি, তুই আমার সোদরা ভগিনী ন'স।"

মালতী সোদরা ভগিনী নহে! মালতীর তবে সংসারে কেহই নাই? যুবাকে সে একমাত্র সংসার বন্ধন—একমাত্র ভাই—বলিয়া জানিত। যুবাও তাহার ভাই ন—হেন! মালতীর বুকে বজ্রের মতন কথাটি পড়িল। যুবা আবার বলিলেন, "মালতি, তুই মায়ের একজন সখীর মেয়ে। এক বৎসর বয়সে তোর বিধবা মা মরিলে আমার মা তোকে আপনার মেয়ের মত করিয়া রাখেন—তখন আমার বয়স সাত বৎসর, সেই জন্য সে সব কথা আমার বেশ মনে আছে। মায়ের ইচ্ছা ছিল তোর সঙ্গে আমার বিবাহ দেন, তাতেই মনে হয় মা থাকিলে এ বিবাহ হইত কি না সন্দেহ।"

সব কথাগুলি মালতীর কানে গেল না, সে চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিল, কি একটি অসহ্য বেদনায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—অথচ তাহার কারণ সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

যাহাকে অন্ধকার মধ্যে আলো বলিয়া জানিত—অন্য আপন কেহ না থাকা সত্ত্বেও যে ভাইটিকে পাইয়া তাহার আর অভাব মনে হইত না—যাহাকে সে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে, সে তাহার ভাই নয়। সে তাহার কেহই নয়। তাহার সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সে ভালবাসাতেও তাহার অধিকার নাই। এ সংসারে মালতী অনাথা বালিকা, রমেশের ন্যায্য স্নেহের সামগ্রী নহে, তাহাতে তাহার জোর নাই, তাহার কৃপা-ভাজন আশ্রিত মাত্র। হয়তো এই সকল কারণেই তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল, কিন্তু এত কথা তাহার মনে আসে নাই; কেন যে তাহার কষ্ট, কষ্টের কথা রমেশ কি বলিলেন, সে তাহা বুঝিল না, অথচ অকারণে কি একটি মর্ম্মভেদী তীব্র-যাতনায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে চতুর্থীর ক্ষীণচন্দ্র মেঘের কোলে লুকাইল, উদ্যান নদী পৃথিবী অন্ধকার করিয়া চন্দ্র নিভিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চিরহাস্যময়ী মালতীর হৃদয় অন্ধকার করিয়া চন্দ্র আজ অস্তমিত হইল। শোক বিহ্বল চিত্তে অজ্ঞানের মত বালিকা কাঁদিতে লাগিল।

রমেশ যেন তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "মালতি, কাঁদিস কেন? আমার সোদরা না হইলেও তুই আমার ভগিনী। আমি সোদর না হইয়াও তোর ভাই। কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আমাদের এ আশৈশব স্নেহ কখনই ঘুচিবে না, ইহা হৃদয়ে বদ্ধমূল। তুই জানিস, মালতি, আমার আপন ভগিনী হইলেও তোকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারিতাম না। আমাদের এ ভালবাসা অকাট্য, বিশুদ্ধ স্বর্গীয়। ইহা দেবতারও লোভনীয়!"

মালতীর অশ্রুজল শুকাইল, মালতীর বিষাদময়ী মূর্ত্তি এই কথায় আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যদি তাহাদের সেই ভালবাসাই রহিল, যদি মালতী তেমনি করিয়া হৃদয় পূরিয়া ভালবাসিতেই অধিকারী হইল, তবে আর মালতী কি চায়? তাহার আর তবে কিসের দুঃখ।

২

দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে,—ঘটনারূপ পদচিহ্ন প্রত্যেক মানুষের জীবনে অঙ্কিত রাখিয়া, এই দুই তিন বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ রমেশের শয়ন কুটীরে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া শোভনা পান সাজিতেছিল, রমেশ শয্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বসিয়া সংস্কৃত রত্নাবলী নাটক হইতে শোভনাকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। রমেশ গঙ্গারাম বিদ্যারত্নের পুত্র, সেই জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। শোভনার পান সাজা হইল, হাত ধুইয়া শোভনা হাতে মুখটী রাখিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রত্নাবলী শুনিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে রমেশ বলিলেন, "শোভনা, আজ মালতী কোথায়? সে যে এখনো রত্নাবলী শুনিতে এলো না?"

শোভনা ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কি ডেকে আনব?"

রমেশ। "সে কোথায় ফুল তুলছে, কোথায় পাখীকে পড়াতে শেখাচ্ছে, কোথায় নদীর ধারে নুড়ী কুড়াচ্চে, তুমি তাকে কি করে খুঁজে পাবে? সে আপনি আসবে এখন।"

যুবা আবার পড়িতে লাগিলেন,

"দুল্লহজণঅণুরাও
লজ্জা গুরুই পরব্বসো অপ্পা।
পিঅসহি বিসমং পেম্মং
মরণং সরণং ণবরিঅমেক্কং।।"

পড়িয়া তাহার মানে বলিতে বলিতে শোভনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন শোভনার পদ্মকোরকসদৃশ নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু শোভিতেছে। যুবা হাসিয়া বলিলেন, "শোভনে, এই কবিতাটি কি তোমার এতই মনে লাগিল, যে চোকে জল আসিল?"

শোভনা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি, কবিতা?"

যুবক দেখিলেন শোভনা অন্যমনা, শোভনা চিন্তামগ্ন, শোভনা কবিতা শুনিয়া কাঁদে নাই। যুবার আর পড়া হইল না। বইখানি রাখিয়া শোভনাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "শোভনা, তোমার সে আগেকার হাসি এখন কোথায়? বিবাহের আগে যখন তোমাদের

বাড়ী যাইতাম, তখন তোমার মুখে যে হাসি দেখিতাম, যে একটি প্রফুল্লভাবে মুখখানি উৎফুল্ল দেখিতাম—আজ কাল তোমার সে ভাব নাই কেন? তোমাকে সর্ব্বদাই প্রায় বিষণ্ণ দেখি—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাই না; শোভনে, আমাকে বিবাহ্ করিয়া কি অনুতাপ হইয়াছে?"

শোভনার নয়ন হইতে অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল—গদগদ কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বস্ব ধন! তোমাকে বিবাহ্ করিয়া অনুতাপ! তোমার সহিত চিরজীবন নরকে থাকিলেও আমার অনুতাপ হইবে না—তোমার সহিত নরকবাসও আমার স্বর্গ—তোমাকে বিবাহ্ করিয়া অনুতাপ! কিন্তু—"

যু। "কিন্তু কি শোভনে, বল? তোমার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমার কি ভয়ানক যাতনা হয়, তাহা যদি বুঝিতে—", শোভনার হৃদয়ে কথাটি প্রবেশ করিল, শোভনা ব্যথিত হইয়া বলিল, "ভাই—আমার কি হইয়াছে জানি না, আমার মনে হয় আমাকে বিবাহ্ করিয়া তোমার অনুতাপ হইয়াছে।"

যু। "সে কি কথা শোভনা? আমার কি কার্য্যে, কি কথায়, কি ভাবে, আমি তোমাকে ও রকম মনে করিতে দিয়াছি, শোভনে?"

শোভনা দুই হস্তে আঁচলের একটি কোণ নখাগ্রে খুঁটিতে খুঁটিতে আনত মস্তকে বাধ' বাধ' স্বরে বলিল, "নাথ, আমার কি গুণ আছে যে আমাকে বিবাহ্ করিয়া সুখী হইবে? আমার এমন রূপ নাই যে দেখিলেই ভালবাসা জন্মাইতে পারে, আমার এমন গুণ নাই যাহাতে রূপের অভাব সত্ত্বেও তোমার হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে, আমার বিদ্যা নাই —যে আমার সহিত কথা কহিয়া তুমি সুখী হইবে; আমি মূর্খ, লেখাপড়ার কথায় তোমার সহিত যোগ দিতে পারি না, এমন বুদ্ধিও নাই যে শীঘ্র লেখাপড়া শিখিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করি, এক কথায়, আমা হইতে তোমার সকল রূপ অভাব পূরণ হইতে পারে না—এমন কি তুমি যে গান শুনিতে এত ভালবাস, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও আমার আসে না, তবে কিসের জন্য তুমি আমাকে ভালবাসিবে? রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাক, কিছুতেই আমি তোমার পায়ের নিকটও পৌঁছিতে পারি না, আপন অযোগ্যতা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমি বুঝিতে পারিতেছি। আগে মনে করিতাম, রূপ গুণ নাই থাক, আমার এ অসীম ভালবাসার তো প্রতিদান আছে, কিন্তু এখন আর তাও মনে করিতে পারি না—"

রমেশ নিস্তব্ধে সকল শুনিলেন, শোভনার কথা শেষ হইলে একটু হাসিয়া বলিলেন, "শোভনে, কে বলে যে বিদ্যা বুদ্ধিতে তুমি আমার অসমযোগ্য। কজন পুরুষ আজ এ বিষয়ে তোমার মত বক্তৃতা করিতে পারিত! আর তোমার রূপের বিচারক? সে তুমি নও, সেও আমি। ইহাই যদি তোমার কষ্টের কারণ হয় তো আশ্বাস দিতেছি, তোমার কষ্ট অমূলক। না শোভনে, ঠাট্টা নয়, কোন্ দেবী তোমা হইতে গুণবতী, তা তো আমি জানি না, আর তা হইলেও আমি কোন স্বর্গীয় দেবীর সহিতও তোমাকে বিনিময় করিতে প্রস্তুত নই—তুমি আমার হৃদয়, আমার রত্ন, আমার দেবতা—তুমি আমার কে নও আমি বলিতে পারি না—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমাকে পাইয়া আমি সুখী নই, শোভনে? তুমি আমার সুখের প্রতিমা।"

শোভনার আহ্লাদে কথা ফুটিল না। শোভনার তবে কি সকলি কল্পনামাত্র, সকলি ভ্রম? শোভনা স্বামীর চরণে মাথা লুকাইয়া বলিল, "আমি পাপী, নরকেও আমার স্থান হইবে না—তাই তোমার মত স্নেহময় স্বামীর প্রতি সন্দেহ করিয়াছি—আমার কিসে প্রায়শ্চিত্ত হইবে জানি না—কিন্তু আজ যখন মন খুলিতে বসিয়াছি, আজ মুক্তকণ্ঠে আমার হৃদয় খুলিব—আমি কি নরক যাতনা মৌনে সহ্য করিয়া আসিতেছি, আজ তাহা তোমাকেই খুলিয়া বলিব, যদি আমার অপরাধের মার্জ্জনা না থাকে তো তুমিই তাহার শাস্তি দাও, তোমার হাতেই আমার জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। নাথ, আমার হৃদয়ে দাবানল জ্বলিতেছে, তোমার মত, দেবতার মত স্বামী পাইয়াও আমার নিজের মনের গুণে আমি সুখী হইতে পারিলাম না—হৃদয়ধন, আমার মনে হয় তুমি আর আমাকে ভালবাস না, তুমি মালতীকে—", শোভনার আর কথা ফুটিল না, লজ্জায় অনুতাপে কষ্টে সে থামিল।

যুবা তাহার কথায় বিস্মিত হইলেন, তাহার সম্পূর্ণ মনের ভাব বুঝিলেন না, ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "শোভনে, কি বলিলে! মালতীকে কি?"

শোভনা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভালবাস।"

যুবা বিস্মিত নেত্রে বলিলেন "মালতীকে ভালবাসি! ইহার মর্ম্ম? মালতী আমার ভগিনী না হইয়াও আমার ভগিনী—তাহাকে তো আমি ছেলেবেলা হইতে ভালবাসি।"

এই কথায় শোভনার আবার কথা কহিবার শক্তি হইল, দৃঢ়তার স্বরে বলিল, "এ আমি সে ভালবাসার কথা বলিতেছি না—আমা হইতেও ভালবাস, এ প্রেমের ভালবাসা।"

"প্রেমের ভালবাসা!" যুবা অবাক হইলেন, যুবা এতক্ষণে শোভনার মন বুঝিলেন, তাঁহার কষ্টের ভিতর একটু হাসিও আসিল, বলিলেন, "শোভনে, তাহা হইলে কি মালতীকে বিবাহ করিতাম না? তবে তোমাকে বিবাহ করিলাম কেন?"

শো। "যখন বিবাহ করিয়াছিলে তখন আপনার মন বোঝ নাই।"

যুবা। "তা যদি না বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে এখনো বুঝি নাই—আমি তাহাকে বরাবর যেমন ভালবাসি, এখনো তাহা অপেক্ষা বেশী ভালবাসি বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হই নাই; এ ভালবাসা বিশুদ্ধ ভগিনী-স্নেহ, ইহা প্রণয়ের ভালবাসা নহে।"

শো। "প্রেম যখন অল্পে অল্পে হৃদয়কে অধিকার করে, তখন নিজেই তাহা বোঝা যায় না—তোমার হৃদয় তুমি যাহা না বোঝ—আমি তাহা বুঝিতে পারি।" এই স্থির সন্দেহে যুবার মনে বড় আঘাত লাগিল, কি করিয়া তাহা দূর করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন, "আমার কি ব্যবহারে তোমার ঐরূপ ধারণা হইল।"

শো। "তোমার সকল কথায়, সকল ভাবে, সকল ব্যবহারেই তোমার মনে ভাব প্রকাশ পায়। প্রেমে বাধা না পড়িলে অনেক সময় তাহা পূর্ণতা লাভ করে না; হয়তো ছেলেবেলা হইতে তোমার যে অঙ্কুর হইয়াছে, তাহা তুমি তখন প্রেম বলিয়া বোঝ নাই, তাই আমাকে ভালবাসিয়া প্রেম মনে করিয়াছ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, মালতীকেই তুমি ভালবাস।"

যুবা ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "শোভনে, প্রেমে বাধা না পাইলে তাহা পাকে

না—ইহা অনেকে বলে বটে, তুমিও বলিতেছ, কিন্তু যদি মালতীকে ভালইবাসি, কি বাধা পাইয়া আজ তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে?"

শো। "আমাকে বিবাহ্ করিয়া। আমিই তোমাদের বাধা।" বলিতে বলিতে শোভনার আবার কষ্টে কথা বন্ধ হইল ; যে যাতনা এতদিন হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন উচ্ছলিত হইয়া নয়নে উথলিয়া উঠিল, কষ্টে অশ্রুজল সামালিয়া শোভনা আবার বলিল, "নাথ, আমিই তোমাদের বাধা। যখন বিবাহ হয় নাই, তখন মালতী ছাড়া তোমার আর কেহই ছিল না ; মালতীকে লইয়া সারাদিন গল্প করিলে সোহাগ করিলে কেহই কাঁদিবার ছিল না। তখন অবাধে মন পূরিয়া তুমি তাহাকে স্নেহ করিতে পারিতে, মন পূরিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতে, তাহাতে তোমার সঙ্কুচিত হইবারও কোন কারণ ছিল না—সেই জন্য তখন সে ভালবাসা পাকে নাই, অন্ততঃ তাহা প্রেম বলিয়া বোঝ নাই। কিন্তু এখন সকল সময় ইচ্ছা হইলেও মালতীর সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পার না, এখন অনিচ্ছা হইলেও আমার সহিত থাকিতে হয়, আমিই তোমার বাল্যসুখ ভাঙ্গিয়াছি, আমিই তোমাদের ভালবাসায় বাধা হইয়া তাহা প্রেম রূপে পরিণত করিয়াছি।"

শোভনার যুক্তি শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও তাঁহার হাসি আসিল, হাসিয়া বলিলেন, "তুমি শোভনা যে একদিন কোন ন্যায়পঞ্চাননের সহিত তর্কে জয়ী হইবে, তাহাতে বড় সন্দেহ হইতেছে না, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়, তারপর? তোমার সকল যুক্তিই কি ফুরাইল? না আরো কিছু বাকি আছে?"

শোভনার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহা মিলাইল, বিষাদ-গম্ভীর ভাবে শোভনা বলিল, "ভাই হাসিও না, যদি তুমি আমাকে বোঝাইতে পার যে ইহা প্রেম নয়, যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারি তুমি আমারি, তাহা হইলে আর আমি কি চাই, তাহা হইলে আর আমার মত সুখী কে? আমার হৃদয়ে যে আগুণ জ্বলিতেছে, তাহা তুমি কি বুঝিবে? ঐ আমার তপ, জপ, ঐ আমার ধ্যান হইয়াছে, সমস্ত দিন রাত আমি ঐ ভাবিতেছি, ঐ লইয়া মনে মনে কখনো সন্দেহে কখনো বিশ্বাসে বিচলিত হইতেছি ; আমার নিকট ইহার যুক্তির আর অভাব নাই। এক কথায় ঐ ভাবিয়া ভাবিয়া এখনো আমি পাগল হই নাই—এই আশ্চর্য্য।"

যু। "শোভনে, আমি আর শুনিতে পারি না, যাহাকে দেখিয়া আজও আমার আশ মেটে নাই, যাহাকে ভালবাসিয়া আমার এখনো তৃপ্তি হয় নাই, যাহাতে আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ, তাহার মুখ হইতে আর এরূপ অবিশ্বাস সহ্য হয় না, ইহা অপেক্ষা বজ্রেও আমার অধিক লাগিত না।"

তড়িতের মত কথাগুলি শোভনার বুকে বিঁধিল, স্বামীর চরণে ধরিয়া শোভনা বলিল, "নাথ, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিব? আমি থাকিতে তোমার সুখ নাই। এ জঘন্য-ঘৃণিত মন থাকিতে কাহারো সুখ হইতে পারে না, আমাকে মরিতে দেও, আমি এ প্রাণ দিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

যুবা শোভনাকে এখনো হৃদয়ের কোথায় রাখিবেন খুঁজিয়া পাইতেন না, এখনো তাঁহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র শমিত হয় নাই, শোভনার কথায় তাঁহার মন গলিয়া গেল, তিনি অশ্রুজল মুছিয়া বলিলেন, "না, শোভনা, যাহা বলিলাম উহাতে কিছু মনে

করিও না, তীব্র কষ্টে উহা বাহির হইয়া গিয়াছে। তুমি হৃদয় খুলিয়া বলিয়াছ ভালই হইয়াছে, তাহাতে কষ্টের মধ্যেও আমি সুখ অনুভব করিতেছি। তোমার আরো যাহা মনে হইয়াছে সকল খুলিয়া বল, কিছু লুকাইও না।" শোভনা বলিল, "আজ যেকালে মন খুলিয়াছি, সেকালে কিছুই লুকাইব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই হউক তাহা অবাধে সহ্য করিব সঙ্কল্প করিয়াই আমি বলিতে বসিয়াছি, সকল শুনিয়া এ পাপীকে পরে চরণে স্থান দেও দিও, নহিলে মরিতে আমার ভয় নাই, কত শতবার দিনে নিশীথে আমি মৃত্যুকামনা করি, তাহা দেবতাই জানেন," বলিয়া শোভনা অশ্রুজল মুছিল, যুবা ব্যথিত-চিত্তে তাহার কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

আপনাকে শামলাইয়া লইয়া শোভনা আবার বলিল, "নতুন বিবাহের পর তুমি সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়া আমাকে দেখিতে যেরূপ ব্যগ্র হইতে এখন আর সেরূপ দেখিতে পাই না কেন? এখন তাহার পরিবর্ত্তে কাহাকে সন্ধ্যাকালে না দেখিলে ব্যাকুল হইয়া পড়? আবার কাহাকে দেখিলে সেই বিষণ্ন-মুখে স্বর্গীয় প্রফুল্লতার ভাব আসিয়া পড়ে? কত সময় তোমার সেই ছবি আঁকিবার জন্য আমার চিত্রকর হইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কেন না তাহা হইলে তোমাকে তাহা আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু আঁকিতে পারি না পারি, তোমার সেই ছবি আমার মনে অঙ্কিত আছে। মালতীর সহিত গল্প করিতে করিতে কিরূপ ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়, তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। তোমার প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে, প্রত্যেক ভাবে, মালতীর প্রতি তোমার ভালবাসা আমাকে দেখাইয়া দেয়, আমাকে জীবন্তে পোড়াইতে থাকে। প্রতি পদে আমি বুঝিতে পারি, মালতী ও আমি তোমার নিকট কত ভিন্ন। আমার নিকট তোমার সেই মন-খোলা হর্ষের হাসি বিকাশ পায় না, আমার নিকট তুমি আপনহারা হও না, মালতী না থাকিলেই তুমি যেন মুমূর্ষু হইয়া পড়।"

যু। "মালতীকে দেখিলে যে আমার ভাল লাগে, মালতীকে যে আমি ভালবাসি তাহা তোমার নিকট কখনই অস্বীকার করি নাই, এখনো করিব না, কিন্তু তুমি আপন কল্পনা দ্বারা স্নেহ হইতে তাহা যেরূপ উচ্চে উঠাইয়াছ, তাহার কিছুই তাহাতে নাই! তোমাকে কি বলিয়া বোঝাইব আমি কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না, যদি বিশ্বাস কর—"

স্বামীকে কথা শেষ করিতে না দিয়া শোভনা বলিল, "একটি কথা তোমাকে বলা হয় নাই, তাহাও লুকাইব না, মালতীর বিবাহের সম্বন্ধ হইল, তুমি তাহাতে গড়িমসি করিয়া এখনো তাহার বিবাহ দিলে না, ইহাও আমার সন্দেহ বৃদ্ধির একটা কারণ হইয়াছিল।"

যুবা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সেকি! মালতী যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সম্বন্ধের পরেই সে বিদেশে কার্য্যে গিয়াছে দুই তিন বৎসর হইল, এখনো আসিল না, আসিলেই তাহাদের বিবাহ হইবে, মালতীর অমতে অন্যের সহিত আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইল না বলিয়া কি ইহাতেও তুমি প্রেম দেখিলে! ঈর্ষাতে মানুষকে কি অন্ধই করে!"

শোভনা লজ্জিত হইল, আপনার ভ্রম যেন বুঝিল। যুবা আবার বলিলেন, "শোভনা, তুমি ওরূপ ভাবিয়া আর নিজের অনর্থক অসুখের কারণ হইও না, আমাকেও আর এরূপ আহত করিও না, বল আমি কি করিলে তোমার অবিশ্বাস দূর হইবে? যাহা করিতে বল এখনি করিব। পবিত্র ভালবাসার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাকে বই আমি আর

কাহাকেও জানি না। শোভনা, আমি মালতীকে ছাড়িয়া চিরকাল থাকিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমার কষ্ট হয়। যতক্ষণ বাহিরে কাজের জন্য থাকিতে হয়, তখন কাহার কথা সমস্ত ক্ষণ মনে জাগিতে থাকে? কাহার জন্য ব্যাকুল ভাবে সমস্ত কাজ ভুলিয়া যাই? কাহার ছবি মনের নিভৃত কক্ষে ধ্যানে দেখিয়া আবার মনে বল পাই? শোভনা! শোভনা! তুমি আর আমাকে অবিশ্বাস করিয়া আঘাত দিও না—শোভনা, আমার হৃদয় এরূপ নির্দ্দয় ভাবে আর ভাঙ্গিও না," মনের ব্যাকুলতায় যুবা তাহার চরণে হাত দিলেন। চমকিয়া শোভনা তাঁহার হাত উঠাইয়া বক্ষে রাখিল, পৃথিবী তাহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল, তাহার যেন সমস্ত স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইল। শোভনা তাহার নিজের মত জগতে আর কাহাকেও সুখী দেখিল না, শোভনা বুঝিল তাহার ঘৃণিত কল্পনা-গুণেই বৃথা দোষে স্বামীকে দোষী করিয়াছে। শোভনার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া শোভনা কাঁদিতে লাগিল, মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু ফুটিতে সাহসী হইল না। যুবা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, বুঝিলেন তাহার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, আর ওরূপ ভাব মনে আসিবে না। সুখে অভিভূত হইয়া উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

এই সময় মালতী সহসা তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিল, হাসিয়া একটি গোলাপ ফুল যুবার হাতে দিয়া বলিল, "দেখ দেখ, আজ তোমার জন্য কেমন একটি নতুন জিনিস এনেছি—আমার সেই শুকনো গাছটিতে আজ নতুন এই ফুলটি ফুটেছে।"

সেই শোকাকুল গৃহ যেন মালতীর হর্ষোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইল। মালতীর অজ্ঞান-সরল-হর্ষের ভাবে যুবার চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল। মালতী বালিকা জানে না, তাহাকে লইয়াই তাহার ভ্রাতার যত বিপদ, তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়াই আজ রমেশ অসুখী, রমেশের শোভনা অসুখী, তাহার জন্যই তাহাদের এত যাতনা। যুবা সেই সরলা বালিকার পানে চাহিয়া চাহিয়া হর্ষ-বিষাদ ভাবে একটু হাসিলেন, হাসিতে হাসিতে গোলাপটি লইয়া আঘ্রাণ করিলেন।

আবার আগুন জ্বলিল, শোভনা সেই হাসি দেখিল, সে আর আপন সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিল না। মানুষ আত্ম-বিরোধী অস্থিরচেতা। এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে শোভনা ভাবিয়াছিল তাহার মনে আর ওরূপ সন্দেহ কখনো স্থান পাইবে না, কিন্তু কেন যে আবার তাহা আসিল সে নিজেই বুঝিল না। রমেশের অত কথায় যে ফল হইয়াছিল, রমেশের ঐ হাসিটুকুতে তাহা উবিয়া গেল। অমন প্রেমময়, অমন স্বপ্নময় হাসি রমেশের মুখে শোভনা আর কখনো দেখে নাই। রমেশ নিশ্চয়ই আপন মন বোঝেন না—নহিলে এ হাসি কি করিয়া হাসিলেন? কই, ইহা তো শোভনার কপালে আর ঘটে না ; অমন মধুর সোহাগময় হাসি,—অমন প্রেমে বিজড়িত, আদরে সুমার্জ্জিত, অনুরাগে সুরঞ্জিত হাসি ত শোভার কপালে কখনো ঘটে না। রমেশ শোভনাকে তবে কি এতক্ষণ ছলনা করিয়া ভুল বুঝাইলেন? না, তাহা নহে, রমেশ আপন মনের ভাব আপনিই বোঝেন না। রমেশ, সত্যই কি তুমি আর শোভনার নও? সত্যই কি তুমি তবে মালতীর? রমেশের সেই হাসি শোভনার মনে জাগিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে আবার বজ্রাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

৩

সেই দিন হইতে শোভনা আর সহস্র কষ্টেও মুখ ফুটিত না, কখনো সন্দেহে কখনো অনুতাপে তাহার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু মনে মনেই সে তাহা সহ্য করিতে সঙ্কল্প করিল। মালতী এ সকল কিছুই জানিল না, তাহাকে লইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটির মধ্যে যে কি রূপ বিপ্লব চলিতেছে তাহা সে কিছুই জানিল না, সেই জন্য তাহার হাসিমাখা মুখখানির হাসি আর নিভিল না।—কখনো কখনো মাত্র কুটীরের অন্ধকার সেই জ্যোৎস্নাময়ী বালিকাকেও স্পর্শ করিত। শোভনা আর তাহার সহিত হাসিয়া হাসিয়া বাগানময় ঘুরিয়া বেড়ায় না, আর লুকাচুরি খেলিবার ছলে মালতীকে ফাঁকি দিয়া রমেশের নিকট পালাইয়া মালতীকে জব্দ করে না, মালতীর ফুলগুলি ছিঁড়িয়া আর মালতীকে কাঁদায় না—মালতীর সঙ্গে আড়ি করিয়া তাহাকে আর সাধায় না—রমেশের রাত্রের গল্প করিয়া আর তাহাকে হাসায় না—আজ কাল শোভনা বড় গম্ভীর, বড় বিষণ্ন। শোভনা বলে তাহার আর ছেলেমানষি করিবার সময় নাই। চিরকাল কি ছেলেমানুষ থাকিবে? চিরকাল কি আর খেলিয়া বেড়াইবে? মালতী তাহার কথার অর্থ যেন বুঝিতে পারে না—মালতী অবাক হইয়া ভাবে, সে আবার কি? চিরকাল আমরা খেলিব না? ছেলেমানুষ ছাড়া কি আর কাহাকেও খেলিতে নাই? তবে মালতীর বিবাহ হইলে তাহারও কি খেলা বন্ধ হইবে? মালতী যেন কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার সহিত রঙ্গ করিতেছে ভাবিয়া সে হাসিয়া হাসিয়া শোভনাকেও হাসাইতে চেষ্টা করে—শোভনার সাধের ফুলগুলি তুলিয়া তাহাকে মারিতে থাকে, তাহাতেও শোভনার গম্ভীর বিষণ্ন মুখটি প্রফুল্ল না হইলে তখন মালতীর চমক ভাঙ্গে, সেই অন্ধকার তখন তাহাকেও স্পর্শ করে। সত্যই তবে শোভনা বড় হইয়াছে, আর সে খেলিবে না, সে আর হাসিবে না, অমনি মালতীও বিষণ্ন হইয়া পড়ে—তাহার কান্না পায়, লুকাইয়া কাঁদিতে সে সেখান হইতে নিঃশব্দে চলিয়া যায়। বনে বনে বেড়াইয়া আবার হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসে। আসিয়া যদি রমেশকে দেখিতে পায়, যদি রমেশকে প্রফুল্ল দেখিতে পায় তো বড়ই আমোদ, নহিলে বিষণ্ন দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে থাকে। সে জানে স্ত্রীলোকেই বড় হইলে সংসারী হইয়া গম্ভীর হয়, বিষণ্ন হয় ; শোভনার কাছে সে তাহা শুনিয়াছে, শোভনাতে সে তাহা দেখিয়াছে, কিন্তু রমেশের আবার কেন ও-ভাব আসিবে? সে দেখিয়া শুনিয়া বিষণ্ন ভাবে না খাইয়া ঘুমাইতে যায়। রমেশকে প্রফুল্ল দেখিলে সে কত কি বকে, কত গল্প করে—কিন্তু বিষণ্ন দেখিলে কথা কহিতে সাহস করে না। এক দিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সঙ্কল্প করিল এবার বিষণ্ন দেখিলে সে রমেশকে কারণ জিজ্ঞাসা করিবেই করিবে। ইহাতে তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক। কিন্তু প্রত্যাশিত দিন আসিল, রমেশকে বিষণ্ন দেখিল, কিন্তু কই? তাহার প্রতিজ্ঞা রহিল কোথায়? সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—কতবার জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া গেল, শেষে না পারিয়া ভগ্ন হৃদয়ে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নদী তীরে আসিয়া কাঁদিতে বসিল। কিছু পরে হঠাৎ রমেশ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন, মালতীকে একাকী বিজনে কাঁদিতে দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হইলেন, যেন ব্যথিত হইলেন, ধীরে ধীরে সাদরে তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, "একি মালতি, —এখানে কাঁদছিস?" মালতী সে কণ্ঠস্বর চিনিল, মালতী মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল। মালতী আর পারিল না, মালতীর অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। কেন যে মালতী

কাঁদিতেছে মালতী তাহা বুঝিতেই পারিল না, সুতরাং সে আর রমেশকে বুঝাইবে কি? রমেশ ধীরে ধীরে অশ্রুধারা মুছাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালতি, কাঁদিস কেন? শোভনা তোর সঙ্গে কি আড়ি করেছে, মালতি?" রমেশ জানেন শোভনা আড়ি করিলেই মালতী কাঁদে। মালতী অনেক কষ্টে অশ্রুজল সামলাইয়া বলিল, "না, শোভনা আর আড়ি করে না"—এমন বিষাদার্দ্র স্বরে মালতী ঐ কথাটি কহিল যে রমেশ চমকিয়া বলিলেন —"তবে তোর কিসের দুঃখ, মালতি?" মালতী ধীরে ধীরে বলিল, "আড়ি করে না বোলেই আমার কষ্ট।" রমেশ হাসিয়া বলিলেন, "তাই তোর এত দুঃখ, তবে আমি আড়ি করিতে বলিব এখন; চল্ তবে, তার কাছে নিয়ে যাই।"

মালতী উঠিল না, মালতী হাসিল না, মালতী বিষণ্ন মনে বসিয়া রহিল, মালতী ভাবিতে লাগিল, "কি করিয়া রমেশের বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করি।" রমেশ দেখিয়া শুনিয়া আবার বলিলেন, "শোভনা আড়ি করে না বলেই তোর এত দুঃখ?" মালতী এবার তাহার ইচ্ছা পূরাইতে সহসা সুযোগ পাইল, সে কত বার থামিয়া থামিয়া অতি ধীরে ধীরে অতি মৃদু স্বরে বলিল, "আরো একটি কারণ আছে,—দাদা, তোমার কি হয়েছে, কেন আর সারাদিন তেমন কোরে গল্প কর না—আমি কি—কোন দোষ করেছি।"

মালতীর সরল প্রশ্নে, তাহার সেই সশঙ্কিত অর্দ্ধস্ফুট জড়িমা-জড়িত প্রশ্নে রমেশের চক্ষে জল আসিল, এক বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে মালতীর হস্তে পড়িল, মালতীর হৃদয় স্তম্ভিত হইল, মুখ শুকাইয়া গেল, মালতী নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করিয়াছে, নহিলে তাহার কথায় রমেশের চক্ষু দিয়া জল পড়িল কেন? মালতীর সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইল, আর কথা বাঁধিল না—ব্যগ্রতার ব্যাকুল ভাবে আবার মালতী বলিল—"দাদা, আমি কি দোষ করেছি বল?"

অশ্রু মুছিয়া যুবা বলিলেন, "তুই কি দোষ করিবি মালতি?"

মালতী। "দাদা রাগ করিলে? না, রাগ করিও না—বল ভাই, কি দোষ করেছি"—যুবা তাহার কাতরতায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না মালতি, তুই তো কিছুই দোষ করিসনি।"

মা। "তবে কেন তুমি আর তেমন করে আমার সহিত কথা কও না? কেন আজ আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে কাঁদিলে?"

সুখেই যে মানুষে হাসে তাহা নহে, নিভিবার আগেও প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে—অন্ধকারেও বিদ্যুৎ চমকে। আজ যুবা বালিকার কথায় অতি দুঃখেও হাসিয়া বলিলেন, "মালতি, তোর জন্য কি আমি কাঁদিলাম? না। কি দুখে আমার যে আগেকার সে ভাব নাই, কি দুখে যে এ কঠোর চোকেও জল পড়িল তাহা তুই কি বুঝিবি, মালতি? আজ তোর মত ছেলেমানুষ অজ্ঞান বালিকা তা কি ক'রে বুঝিবে, মালতি?"

মালতী ছেলেমানুষ হইলেও মালতী স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকে দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী না হইয়া থাকিতেই পারে না—আর কিছু বুঝুক না বুঝুক, পরের ব্যথা বুঝিবার সময় স্ত্রীলোকে আর ছেলেমানুষ থাকে না, অন্য সকল বিষয়ে বালিকা থাকিলেও সে সময় শতবর্ষের বৃদ্ধও তাহার মত হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের কষ্ট বুঝিতে সক্ষম হইবে না। বালিকা মালতী আজ গম্ভীর প্রৌঢ়ার মত বলিল, "দাদা, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিব না? ছেলেমানুষ! আজ তিন বৎসর আগে একদিন আমাকে কি অন্য রূপ ভেবে তোমার মনের কথা বলনি? আমি কি এখনো দাদা তার চেয়েও বড় হইনি?"

পৃথিবীতে যথার্থ ব্যথার ব্যথী অতি দুর্লভ। একটি সুন্দর গোলাপ দেখিয়া যত্নে কে না গ্রহণ করে? তাহাকে কে না ভালবাসে? কেন না তাহাতে চক্ষের তৃপ্তি হয়, তাহাতে নিজের সুখ হয়—কিন্তু সেই গোলাপটি শুকাইলে কে তাহাকে মায়াদৃষ্টিতেও একবার চাহিয়া দেখে? কজনের চক্ষু হইতে তাহাতে অকৃত্রিম শোকাশ্রু পড়ে? তাহা পড়ে না বলিয়াই অকৃত্রিম অশ্রুর এত আদর, নিঃস্বার্থ ভালবাসার এত আদর। স্বর্গ তুচ্ছ করিয়াও লোকে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে—তাহাতে লোকে এত মুগ্ধ হয়। রমেশও মানুষ, তিনিও সে দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারিলেন না—তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া গেল, একজন ব্যথার ব্যথী পাইবার জন্য তাঁহারও হৃদয় ব্যগ্র হইল, তিনি বলিলেন, "আমার কষ্টের কথা শুনিবে, মালতি? যাহা হইতে আমার সুখ, তাহা হইতেই মালতি আমার দুঃখ, শোভনা আজ কাল কল্পনার প্রাচুর্য্যে নিজেও অসুখী, আমাকেও অসুখী করিয়াছে". বলিয়া যুবা সংক্ষেপে শোভনার সন্দেহ বৃত্তান্ত বলিলেন।

মালতী নীরবে অনিমেষ নেত্রে সকল শুনিল। মালতীতে আর মালতী নাই। শুষ্ক অধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। দীন যাতনাময় দৃষ্টি শূন্যে সংলগ্ন হইল, মালতী থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যুবাও কাঁদিতে লাগিলেন। নীরবে সেই সন্ধ্যাকালে সুখময়ীর চঞ্চল বক্ষে সে জল মিশাইল। আকাশে চাঁদ নাই, শত শত তারা উঠিয়াছে। তাহারা সে দুঃখ বুঝিল না, তাহা দেখিয়া হাসিল মাত্র। হাসিবে নাই বা কেন?—তাহাদের নিকট মমতা কে প্রত্যাশা করে? তাহারা ত অনন্ত কাল পর্য্যন্ত হাসিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—সুতরাং সেই নির্ম্মমতায় কাহারো হৃদয়কে আহত করিতে পারে না, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সেই প্রশান্ত সুখময়ী-তীরে জনমানবের আর নামগন্ধও ছিল না। মালতীদের অশ্রুজল দেখিয়া হাসিবার, তাহাদের দীর্ঘশ্বাসে উপহাস করিবার, তাহাদের কাতরতায় আমোদ উপভোগ করিবার একজনও গুপ্ত বা প্রকাশ্য আত্মীয় পর কেহই ছিল না। যাহাদের মমতাশূন্য মূর্ত্তি দেখিলে অশ্রুজল প্রবাহিত না হইতে হইতেই নীহারবৎ জমাট হইয়া পড়ে, দীর্ঘশ্বাস আপনা আপনি মরমের নিভৃত কন্দরে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, এমন জনপ্রাণীও সেখানে ছিল না। সুতরাং মালতী আজ অবাধে কাঁদিয়া ফেলিল। থাকিয়া থাকিয়া বালিকা বলিয়া উঠিল, "দাদা, কি বলিলে? শোভনা কি মনে করে তুমি আমাকে শোভনা হইতে ভালবাস? আমিই তোমাদের তবে অসুখের কারণ? আমার জন্যই তোমার প্রফুল্ল মুখ, ও শোভনার হাসিমুখ আজ মলিন! আমিই তোমাদের অশান্তির মূল! আমিই তোমাদের কষ্টের কারণ! দাদা, কি করিলে তোমাদের পূর্ব্ব সুখ আবার ফেরে? কি করিলে তোমাদের শান্তি বজায় থাকে?"

মালতীর নিঃস্বার্থ স্নেহ-উথলিত বাক্যে যুবার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন, "মালতি, মালতি, তুই আমাদের অসুখের কারণ কি করে হবি মালতি? আমাদের অকারণ—"

মালতীর আজ কথা ফুটিয়াছে, মালতী আর রমেশকে কথা কহিতে না দিয়া বলিল, "না দাদা, আমাকে আর ভুলাইও না—আমি তোমার কথায় আর ভুলিব না। দাদা বল, কি করিলে তোমাদের সুখ ফিরিয়া আসে? আমি দাদা মরিলেও কি তোমাদের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শেষ হয় না?"

সকলরূপ ভালবাসার কি মর্ম্মান্তিক ভাব একই প্রকার? মরিতে ইচ্ছাই কি ভালবাসার

স্বাভাবিক? তাহার কথায় রমেশ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না—মালতীও কোন কথা কহিল না, মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করিল, মনেই রাখিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধেই কাটিল, দুজনের মনে কত কথা বহিয়া গেল, দুজনে বলিতে ইচ্ছাও করিলেন না। ক্রমে দুজনে এত গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন, দুজনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন ভুলিয়া গেলেন, একাকী আছেন জ্ঞানে যুবা আপন মনেই যেন বলিলেন, "যাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসি, তাহার নিকট অবিশ্বাসই কি প্রতিদান! তাহার নিকট এই দারুণ আঘাতই কি আমার পুরস্কার!" এই কথায় মালতীর চিন্তা ভঙ্গ হইল—আবার বলিল, "কি বলিলে দাদা? শোভনার চেয়ে তুমি আমাকে ভালবাস? এই কি শোভনার বিশ্বাস?"

যুবা কোন উত্তর করিলেন না।

মালতী আবার বলিল, "সত্যিই কি শোভনার মনে এই বিশ্বাস, তুমি শোভনা হইতে আমাকে ভালবাস?

যু। "হাঁ।"

সহসা এই সময় শোভনা পশ্চাৎ দিকে আসিয়া দাঁড়াইল—মালতীর শেষ প্রশ্ন ও যুবার শেষ উত্তর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। আর কোন ভুল নাই, এই বার শোভনার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল,—এ তো আর কল্পনা নহে। মালতী ও রমেশের প্রেমালাপ সে স্বকর্ণে শুনিতে পাইল। উন্মত্ত বেদনায় শোভনা অজ্ঞানের মত সেখান হইতে ছুটিয়া কিছু দূরে নদী তীরে আসিয়া দাঁড়াইল—আপন সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আগে একবার আকাশ পৃথিবী নদী কুটীরপানে চাহিয়া দেখিল, নিমেষ মধ্যে একবার কত কথা তাহার হৃদয় মধ্যে বহিয়া গেল। "আমি কে? আমি কার? আমি যখন আমার স্বামীরই নই, তখন আমি কার? আমার স্বামীই যখন আমায় চান না, তখন আমাকে আর কে চায়? সংসার আমাকে চায় না, সমাজ আমাকে চায় না, আমার আত্মীয়েরাও হয় তো আমাকে চায় না, অন্য সব দূরে থাক—আমি নিজেই আমাকে চাইনে, তবে বাঁচিয়া আর নরক ভোগ কেন? আমি আজ মরিলে সেই পূর্ব্বের মত পৃথিবী মেরুদণ্ডে ঘুরিবে, সংসার সেই পুরাতন ভাবে সমান চলিবে, আবার হেমন্তের পর বসন্ত আসিবে, অমাবস্যার পর চাঁদের উদয় হইবে, আত্মীয়েরা সেই আগেকার মত খাইবে শুইবে, বন্ধুরা একবার মাত্র অশ্রুজল ফেলিয়া আবার নূতন আমোদে মত্ত থাকিবে, আর আমার সর্ব্বস্বধন—যারপর নাই সেই স্বামী?—তিনি?—তিনি কি করিবেন? এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলা দূরে থাক, হয়ত নিষ্কণ্টক হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি সুখীই হইবেন, তবে—তবে?" আর একবার শোভনা চারিদিক চাহিয়া দেখিল, মাথা ঘুরিতেছিল, চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না—অন্ধকার পৃথিবী, অন্ধকার আকাশ, অন্ধকার নদীর অন্ধকার জল, তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। শোভনা সেই ঘূর্ণ-নদীর আবর্ত্ত মধ্যে বিঘূর্ণিত হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শোভনাকে নিকট দিয়া ছুটিতে দেখিয়া কিছু কারণ না বুঝিয়াও সঙ্গে সঙ্গে রমেশ ও মালতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পড়িতে না পড়িতে রমেশও লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে তীরে তুলিলেন, মালতী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

শোভনাকে লইয়া যুবা তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তাহাকে শয্যায় বসাইয়া আপনিও পার্শ্বে বসিলেন। শোভনা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, যাহা আর জনমে দেখিতে পাইবে না ভাবিয়াছিল—আবার সেই সকল পরিচিত সামগ্রী তাহার চক্ষে পড়িল। সেই কুটীর, যে কুটীরে বিবাহ অবধি দুজনে কাটাইয়াছে, যাহাতে তাহাদের জীবনের কত সুখদুঃখময় ঘটনা যেন অঙ্কিত আছে, সেই কুটীর—সেই সাধের কুটীর আবার দেখিল। কুটীরে, তাহাদের শয্যা তেমনই সজ্জিত রহিয়াছে, শয্যার শিয়র দেশে সেই রত্নাবলী উত্তররামচরিত শকুন্তলা সজ্জিত, আবার যে কখনো স্বামীর সুধা কণ্ঠে তাহা শুনিতে পাইবে, সে আশা তাহার ছিল না। দীপটি জ্বলিতেছে, কিন্তু তেলের অভাবে তেমন উজ্জ্বল রূপে জ্বলিতেছে না—মুমূর্ষুর জীবনের মত মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, নিভ নিভ হইয়াছে, অথচ নিভিতেছে না। শোভনার জীবনও নিভ নিভ হইয়াছিল কিন্তু নিভিল না। শোভনা লজ্জায় এতক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই, এইবার চাহিল ; যাহাকে —যে হৃদয়রত্নকে আর জনমে দেখিবার আশা করে নাই তাহাকে কি আর দেখিতে সত্যই পাইবে? ব্যগ্র ভাবে সে স্বামীর পানে চাহিল। রমেশের সেই বিষাদ-গম্ভীর ছবি দেখিয়া শোভনা বজ্রাহত হইল, তখনি চক্ষু নত হইয়া পড়িল, শোভনা নীরবে কাঁদিতে লাগিল, রমেশও নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় মানুষের জীবনকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করে, এমন একটি বহু-কাল ব্যাপি মহা কাণ্ডতেও পারে না। এই জন্যই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী ডিজরেইলি বলিয়াছেন যে, মনুষ্য জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমষ্টিমাত্র। শত শত বৎসরের বিপ্লবে যাহা না করিতে পারে, একটি মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র ঘটনাতেও তাহা সম্পন্ন হয়। পশুচুরি অপরাধে দণ্ডিত না হইলে মহাকবি সেক্সপিয়রের নামও হয়ত কেহ শুনিতে পাইতেন না। বৃহৎ ঘটনায় মানুষকে দলিত করিতে পারে, কিন্তু পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। সম্রাট পথের ভিখারী হইয়াও জীবন ধারণ করেন, প্রিয়তম পুত্র কন্যা বিয়োগও সহ্য করিতে পারা যায়, প্রণয়ে আহত হইয়া কত ভগ্ন হৃদয়ও জীবিত থাকে, কিন্তু আবার কখনো কাহারো এক মুহূর্ত্তের একটু অনাদর বাক্যেই হয়ত হৃদয়ের অন্তরতার সহসা এমন ছিন্ন হইয়া যায়, যে তাহা আর কিছুতেই জোড়ে না, তাহা হইতেই হয়ত জীবনের কাঁটা একেবারে এমন বিপথে গিয়া পড়ে, যে তাহা আর কিছুতেই সোজা হয় না। আবার তেমনি যে গর্ব্বিত-হৃদয় ভাগ্যের সকল প্রকার উৎপীড়ন, জীবনের সকল প্রকার অত্যাচারকে ভ্রূকুটী করিয়া উড়াইয়া দেয়, যে পাষাণ হৃদয়ে শত শত মনুষ্য শোণিত কিছুমাত্র বিকার জন্মাইতে পারে না, যাহা কিছুতেই নরম হয় না, সেই গর্ব্বিত পাঁষাণ হৃদয়ও কাহারো একটী স্নেহ বাক্যেতেই একেবারে দ্রব হইয়া যায়। যে আণ্টনি অসীম কষ্টে পড়িয়াও অপার বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই কেশিয়াস ও ব্রটাসকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই ভীম পরাক্রমশালী মহাবীর আণ্টনিই কি ক্লিয়োপেট্রার একবিন্দু অশ্রু দর্শনে বিজয়ী হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তই কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করেন নাই? কিসে যে হৃদয়ের কি হয়—কি প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা যে চলিতেছে তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নয়। নিউটন গেলিলিও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন এখনো জন্মায় নাই। কবে জন্মাইবে কে জানে?

আজকের সন্ধ্যাকালের এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে শোভনার জীবন-স্রোত যেন উলটাইয়া ফেলিল, শোভনা সকলি নূতন দেখিল, জলমগ্নের পরক্ষণ হইতে শোভনার যেন জীবন আবার নূতন হইয়া আরম্ভ হইল। রমেশকে সে পূর্ব্বকার সেই স্নেহময় স্বামীই দেখিল, তাঁহাতে প্রণয় ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কি করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যরূপ মনে করিতে পারিয়াছিল শোভনা নিজেই যেন বুঝিতে অক্ষম হইল।

আস্তে আস্তে তাহাদের কথা আরম্ভ হইল, আস্তে আস্তে নূতন প্রেম-সম্ভাষণের মত শোভনা স্বামীর ক্ষমা প্রার্থনা করিল, রমেশের নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল শুনিয়া তাহার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। এ অনুতাপ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে উথলিত, ইহা মিশ্রিত নহে, ইহাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস কিছুই ছিল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, এখনো তাঁহারা সেই জলসিক্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই, তাহা গাত্রেই শুকাইয়া গিয়াছে। সহসা শোভনার তাহা মনে পড়িল, রমেশের কাপড়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "কেন আমার মরণ হইল না, যাহাকে বুকে রাখিয়া তৃপ্তি হয় না, আমার জন্যই তাহার এত কষ্ট, উঠ উঠ—এত রাতে কি না আমার জন্যই এখনো ভিজা কাপড়ে কষ্ট পাইতেছ?" শোভনার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। রমেশ বলিলেন, "শোভনে, এ কি আর কষ্ট! এখন আমার মত সুখী এ সংসারে কে? তোমার পূর্ব্ব মন ফিরিয়া পাইয়াছি, তোমার অবিশ্বাস ঘুচিয়াছে, এখন কি শত শত অন্য বিপদ আসিলেও আমি তাহা কটাক্ষে উড়াইয়া দিতে পারি না?" সহসা নিশাকালের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাদের সেই সুখ-বিহ্বল মোহ ভঙ্গ করিয়া, দূরে নিশীথ গগন গীতধ্বনিতে পূর্ণ হইল। রমেশ মালতীর গলা চিনিতে পারিলেন। এত রাত্রেও মালতী ঘরে আসে নাই, একাকী বেড়াইতেছে, তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, "শোভনা, মালতী এখনো কুটীরে আসে নাই, একাকী বেড়াইতেছে!" বলিয়াই যেন রমেশের কি মনে হইল; একটু হাসিয়া বলিলেন, "শোভনা, ইহা হইতে না জানি আবার আমার কত ব্যাকুলতাই কত প্রেমই দেখিবে?" শোভনা লজ্জিত হইয়া বলিল, "সত্যি, মালতী এখনো একেলা বেড়াচ্ছে, হয়তো সব দেখে শুনে কষ্টে সে আজ ঘরে আসে নাই। আমি মালতীর নিকট ঘোর অপরাধে অপরাধী, আমি যাই—তাহাকে ডেকে আনি, আমি যাই, তাহার কাছে কেঁদে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি, আমি হাজার দোষ করিলেও মালতী কখনো রাগ করে নাই, আজ কি আমি পায়ে ধরিলেও আমাকে মাপ করিবে না?" রমেশ বলিলেন, "না শোভনে, বাহিরে বড় অন্ধকার, মালতী কোথায় তার ঠিক নেই, তোমার গিয়ে কাজ নেই, আমিই খুঁজে আনি।"

সহসা আবার গীতধ্বনি উথলিয়া উঠিল, স্পষ্ট রূপে কথাগুলি তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তাঁহারা শুনিলেন—

দূর বিজন বনে একাকী যাইব চ'লে
মানুষ-নিশ্বাস-বায়—যেখানে নাহি উথলে,
অনাথিনী উদাসিনী, যাব চলি একাকিনী,
আর তো দোসর আশা রাখি না মরম তলে।
ভালবাসায় প্রতিদান, সে আশাও অবসান
অবসান সুখআশা ভালবাসা এ কপালে—

সুখেরি জনম যার, এই এ দুখিনী আর
দিবে না সে সুখে বাধা—কাঁদাবে না পলে পলে,
সাক্ষী থেকো রবি শশী, জ্বলন্ত তারকারাশি,
সাক্ষী থেকো গিরি নদী তোমরা সকলে
যতই যাতনা স'ই, যেখানেই মোরে বই,
সুখে রব সুখী ভেবে দেখিও হৃদয় খুলে।

গানটি তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল, সেই বিষাদময় অথচ সুধাবর্ষী গগনস্পর্শী সুরে রমেশ চমকিয়া উঠিলেন, অজ্ঞাত কারণে তাঁহার হৃদয় বড়ই চঞ্চল হইল, হৃদয়ে কি একটি যেন বেদনা বোধ হইতে লাগিল, উঠিয়া কুটীরদ্বার খুলিলেন, অমনি বাতাস আসিয়া দীপটি নিভিয়া গেল, কুটীর অন্ধকারময় হইল। শোভনার অন্ধকারে ভয় ছিল না, সহসা আজ নূতন অজ্ঞাত ভয়ে সে কাঁদিয়া উঠিল। রমেশ একবার ফিরিয়া চাহিলেন, শোভনার ঝাঁপ দিবার কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা গান বন্ধ হইল, সেই আঁধার নিশীথের নিস্তব্ধতা আবার মুহূর্ত্তকাল জন্য সম্পূর্ণ রূপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিল, রমেশের হৃদয়েও কেমন একটি স্থির বিষাদ ভাব আসিয়া আধিপত্য করিল। রমেশ দৌড়িয়া ব্যাকুল ভাবে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেন যে তাঁহার মন দারুণ ভারাক্রান্ত হইল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

চারিদিক কি অন্ধকার, চারিদিক কি প্রশান্ত—কি গম্ভীর কি নিস্তব্ধ। আকাশে শত শত তারা জ্বলিতেছে তবু আকাশ অন্ধকার, গাছে গাছে পাতায় পাতায় অসংখ্য অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছে, তবু পৃথিবী অন্ধকার। সেই আঁধার নিঃস্তব্ধ প্রান্তর দিয়া চলিতে চলিতে একটি অসাধারণ ভয়ে রমেশ শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইল, শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ যেন বন্ধ হইল, চলৎশক্তি তাঁহার যেন রহিত হইল। কিন্তু সহসা একি এ! এই প্রান্তরের ভীষণ নিঃস্তব্ধতা মুহূর্ত্তের জন্য কিসের শব্দে ভীষণ ভাবে ভঙ্গ হইল? কই, আর শুনা যায় না; নদীগর্ভে কিছু কঠিন দ্রব্য পড়িবার শব্দ কি এ?

আবার সেই সন্ধ্যাকালের ভয়ানক ঘটনার কথা রমেশের মনে পড়িল, রমেশ যেন মনশ্চক্ষে তাহা দেখিলেন। রমেশ কণ্টকিতকায় হইলেন।

রমেশের নির্জীব প্রাণে প্রাণ আসিল, শোণিত বেগে বহমান হইল, দেহে আবার বল আসিল, রমেশ কাতর চিত্তে মালতী মালতী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে নদীতীরে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন নদীবক্ষে তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব-প্রকাশক অসাধারণ কোন ভাবই নাই, মৃদু মৃদু নিয়মিত ভাবে নিঃস্তব্ধে সুখময়ী বহিয়া যাইতেছে।

রমেশ এদিকে ওদিকে চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। মালতীর কোন চিহ্ন পাইলেন না।

রমেশ উন্মত্তের মত আবার মালতী মালতী বলিয়া ডাকিলেন, নদী, প্রান্তর, আকাশ, পৃথিবী তাঁহার আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু হায়—কোন মালতীই আর উত্তর করিল না।

ভারতী, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৬

কুমার ভীমসিংহ

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মিবারের রাণা রাজসিংহ একাকী বিশ্রামকক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে, মহারাজের আদেশ মতে ভৃত্যেরা একটি দীপ মাত্র প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া গৃহের অন্য দীপাবলী নিভাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে মৃদু আলোক প্রশস্ত ঘরে এমন একটি স্নিগ্ধতা আনিয়া ফেলিয়াছে যে তাহাতে স্নাত হইয়া মহারাজের এতক্ষণকার চিন্তাগুলিও ক্রমে স্নিগ্ধ বেশ ধারণ করিয়াছে। কুমার জয়সিংহের রাজ্যাভিষেকের দিন নিকটে,—প্রজারা এ-ঘটনাটি কিরূপ চিত্তে গ্রহণ করিবে, একথা আর তাঁহার মনে নাই, উৎসবের দিন সকলের কিরূপ আনন্দ হইবে, সকলের অর্থাৎ জয়সিংহের মাতার সেদিন কিরূপ হর্ষের উচ্ছ্বাস হইবে, জয়সিংহ কিরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে—অন্য কথা ভুলিয়া মহারাজ এখন কেবল এই রকম কথাই ভাবিতেছেন। হঠাৎ গৃহদ্বারটি অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া গেল, মহিষী কমলকুমারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া রাজা যেন বিস্মিত হইলেন, তটস্থ ভাবে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তাঁহাকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহিষী পার্শ্বে আসিয়া বসিলে বলিলেন—"একি, এ সময়ে যে?"

মহিষী বলিলেন—"না আসিয়া কি করি? ডাকিলে ত আর দেখা পাই না।" রাজা একটু অপ্রস্তুত হইলেন, আজ দিনের মধ্যে দুই তিন বার মহিষী তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন—তাহা মনে পড়িয়া গেল ; আস্তে আস্তে বলিলেন—"মহিষি, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" মহিষী মনে মনে বলিলেন—"আমার কপাল ক্রমে অনেক দিন ভুলিয়াছ —সে কি আর আজ নূতন"—কিন্তু মুখে আর সে কথার কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। যা গুজব উঠিয়াছে তাহা কি সত্য?" একেবারে উত্তরটা দিতে কেমন মহারাজের বাধিয়া গেল, বলিলেন—"কি গুজব?"

মহিষী। "শুনিতেছি তুমি থাকিতে তোমার সিংহাসন জয়সিংহ অধিকার করিবে, কথাটা কি সত্য? তাহা হইলে এ যে দেখিতেছি মুসলমানের রাজ্য হইয়া পড়িল।"

জয়সিংহের প্রতি এ কটাক্ষটা রাজার ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন—"কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। জয়সিং সিংহাসন অধিকার করিতেছে না, আমার সিংহাসন আমি তাহাকে দান করিতেছি।" মহিষী একটু তীব্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি দিতেছ? ইহারি মধ্যে? কেন, এত শীঘ্র বনে যাইবার সময় হইয়াছে কি?" রাজা উৎসারিত ক্রোধ সবলে দমন করিয়া বলিলেন, "মহিষি, ইহাতে হাসির কিছুই নাই, রাজা হইলে অনেক বিবেচনা করিয়া, অনেক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হয়, ভাবিয়া দেখ রাজার উপর কত শত পরিবারের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমি থাকিতে থাকিতে রাজ্যের একটা বন্দবস্ত করিয়া না গেলে শেষে এই অধিকার লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বাধাইয়া রাজ্য ছারখার করিয়া তুলিবে।"

মহিষী। "কিন্তু আমি ত বুঝিতেছি, তুমি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ মিটাইতে গিয়া,

বিবাদের সূত্রপাত করিয়া দিতেছ। রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া রাজ্য ছারখার করিবারই বন্দবস্ত করিতেছ। তুমি থাকিতে যদি পুত্রকে রাজা করাই বিধেয় মনে কর তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা না কর কেন? তাহার ন্যায্য অধিকার অন্যায় রূপে হরণ করিয়া সে সিংহাসনে কনিষ্ঠকে বসাও কি বলিয়া?"

কথাগুলি বড় সত্য, কিন্তু রাজার শুনিতে ভাল লাগিল না, অনেক সময় সত্য কথা শুনিতে বড় কষ্টকর। রাজা বিরক্তির ভাবে বলিলেন—"ভীমসিংহ ও জয়সিংহ এত অল্প সময়ের ছোট বড় যে সেজন্য জ্যেষ্ঠ বলিয়া ভীমসিং রাজ্য দাওয়া করিতে পারে না। দুইজনে একই দিনে জন্মিয়াছে, একই সময়ে জন্মিয়াছে বলিলেও বেশী বলা হয় না, এরূপ স্থলে তাহাদের মধ্যে যে যোগ্য অধিক, তাহারি রাজ্যে অধিকার। আমি জয়সিংহকেই অধিক উপযুক্ত মনে করি।"

রাণী হাসিয়া বলিলেন—"তুমি দেখিতেছি কালের নিয়ম উলটাইয়া ফেলিতে চাও, নহিলে ছোটকে ছোট না বলিয়া সমান বলিবে কেন? সুখের মধ্যে তোমার কথায় কালের নিয়ম ভাঙ্গিবে না। এক দণ্ড দূরে থাক, এক মুহূর্ত্ত আগেও যে জন্মিবে সেও বড়র অধিকার লইয়া জন্মিবে। নব কুশ ত যমজ ভ্রাতা, তবে নবই কেন পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইলেন? আর জিজ্ঞাসা করি—মহারাজ, জয়সিংহ ভীমসিংহ হইতে উপযুক্তই বা কিসে? শৌর্য্যে বীর্য্যে বুদ্ধি সততায় কিসে ভীমসিংহ জয়সিংহের উপরে? কাহার সাহসে সৈন্যগণ বশীভূত? সভাসদেরা কাহার সততায় মুগ্ধ? প্রজারা কাহাকে তাহাদের রাজা রূপে বরণ করিতে চায়? সকলকে জিজ্ঞাসা কর কে উপযুক্ত, শুনিতে পাইবে। তবে যদি তোমার প্রিয়মহিষীর পুত্র ও প্রিয় পুত্র বলিয়া জয়সিংহ উপযুক্ত হয় ত বলিতে পারি না।" এই বিদ্রূপ রাজার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইল—তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তবে তাই।" রাণীও ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"ওকথা তবে স্পষ্ট না বলিয়া পাঁচ রকম কথার ভাণ কর কেন? রাজা হইয়া সত্য কথা বলিতে ভয় হয় নাকি?" রাজা বলিলেন —"কে আমাকে আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আমি তাহার কাছে সত্য লুকাইয়াছি।" মহিষী বলিলেন—"কুমারদের জন্মদিনের কথা মনে পড়ে কি?" বলিতে বলিতে মহিষীর কথা বাধিয়া গেল, আর বলিতে পারিলেন না, মুহূর্ত্তে বিশ বৎসর যেন পিছাইয়া পড়িল, সেই দিনকার ঘটনা নূতন হইয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেদিনকার সরলা বিশ্বস্তহৃদয়া অভিমানিনী বালিকা-বধূতে আর আজিকার এই প্রৌঢ়া, স্বামী প্রেম-বঞ্চিতা, দলিত-প্রাণা রাজরাণীতে কত তফাৎ। আজিকার এ মর্ম্মাহত গর্ব্বিত কমলকুমারী নয়—সেদিন যেন আর এক কমলকুমারী—নব প্রসূত সন্তান কাছে করিয়া—প্রেমপূর্ণ উৎসুক হৃদয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, প্রসবের যন্ত্রণা আর তাঁহার মনে ছিল না, পুত্র মুখ দেখিয়া স্বামী কত না আহ্লাদিত হইবেন—কিরূপ উৎফুল্ল হৃদয়ে না জানি তিনি নবশিশুকে ক্রোড়ে লইবেন—এই ভাবিয়া হৃদয়ে সুখের উৎস বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখন পল গেল, দণ্ড গেল, স্বামী আসিলেন না, তখন সে সুখ কষ্টে পরিণত হইল, মহিষী ম্রিয়মান, কাতর হইয়া পড়িলেন। দুই দণ্ড পরে একজন দাসী আসিয়া বলিল—"রাণী চঞ্চলকুমারীর এই মুহূর্ত্তে এক পুত্র হইল, মহারাজ তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দিতেছেন। সেইখান হইতে এখানে আসিবেন।"

জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দেওয়া মিবার-রাজকুল পদ্ধতি। ইহা দ্বারা পিতার, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার ভবিষ্য-উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কমলকুমারী যখন শুনিলেন—জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্ত্তে অন্যায়রূপে কনিষ্ঠের পায়ে তিনি সেই কবচ বাঁধিয়াছেন—তখন একটি তীব্র কষ্টে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, মাতার অশ্রুজলে সেদিন নবশিশুর প্রথম অভিষেক হইল। মহিষী সেই প্রথম বুঝিলেন স্বামীর হৃদয়ে আর তাঁহার স্থান নাই, স্বামী তাঁহাকে ভালবাসেন না। আগে কখন কখন মনে এরূপ সন্দেহ যে আসে নাই তাহা নহে, কিন্তু নিমেষে তাহা চলিয়া গিয়াছে, এই সন্দেহের জন্য আপনাকে দোষী ভাবিয়া শেষে আপনাকেই তিরস্কার করিয়াছেন—কিন্তু আজ সে সন্দেহ সত্যরূপে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, মর্ম্মাহত হইয়া মহিষী মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন। স্বামী যখন পুত্রকে দেখিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কমলকুমারী একটি কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া উঠিল। ইহার কিছু দিন পরে একটা গুজব শুনিলেন যে মহারাজ জানিয়া শুনিয়া কনিষ্ঠকে কবচ পরান নাই, ভৃত্যদের কথার গোলমালে চঞ্চলকুমারীর পুত্রই অগ্রে জন্মিয়াছে বুঝিয়া ভুলক্রমে তাহাকে কবচ পরাইয়াছেন! একথা সত্য কি না তাহা কিন্তু কমলকুমারী এ পর্য্যন্ত কখনো রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। যাহার ভালবাসায় বিশ্বাস নাই, যাহার কাছে গেলে নূতন কষ্টের কারণ পাইয়া হৃদয় ব্যথিত হইয়া পড়ে, তাহাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে মনের বল থাকে কি? যতবার তিনি একথা তুলিতে গিয়াছেন, তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছে যে ততবারই তিনি সে কথা অন্যদিনের জন্য রাখিয়া অন্য কথা বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এতদিন পরে যখন কবচ বন্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না, যখন জানিলেন সত্যই জয়সিংহকে মহারাজ সিংহাসন দিতেছেন, তখন আর তাঁহার স্ত্রীর অভিমান মনে রহিল না, তখন তাঁহার কেবল মনে রহিল তিনি ভীমসিংহের মাতা, তাঁহার মত অভাগীর গর্ভে জন্মিয়া সে অভাগা সন্তান তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল! সেই দিন মহিষীর কষ্ট ক্রোধে পরিণত হইল, সেই দিন তিনি আর সকল ভুলিয়া সন্তানের পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইয়া স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু কথায় কথায় যখন আবার পুত্রের জন্ম ঘটনাটি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তখন হঠাৎ তিনি এমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার নয়নের ক্রোধ-জ্যোতি আবার অভিমানের অশ্রুজলে মলিন হইয়া গেল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহার সে-ভাব রহিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম সম্বরণ করিয়া মহিষী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"তুমি যদি সত্য বলিতে না ডরাও তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য কবচ কনিষ্ঠকে পরাইবার প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া লোককে অন্যরূপ বুঝিতে দিলে কেন?"

রাজা রাগিয়া বলিলেন—"আমি কখন কি ভাবিয়া কি কাজ করি—তাহা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ান আমার একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তবে লোকে যদি আমার মনের কথা আঁচিতে গিয়া এক বুঝিতে আর বুঝিয়া লয়—সে জন্য আমি দায়ী হইতে পারি না। লোকভয়ে সেদিন যদি সত্য কথা লুকাইতাম তাহা হইলে আজও লোকভয়ে জয়সিংহকে রাজত্ব দিতে কুণ্ঠিত হইতাম। তখন যদি কোন রকমে লোকে ভুল বুঝিয়া থাকে, এখন সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার রাজ্য আমি যাহাকে ইচ্ছা দিব— সেজন্য

আমি লোকের ভয় করি না, লোকের তাহাতে কথা কহিবার অধিকারও নাই।"

মহিষীর আর সহ্য হইল না, শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"না মহারাজ, তাহা মনে করিও না, রাজ্য তোমার বলিয়া যাহাকে ইচ্ছা দিবার তোমার ক্ষমতা নাই, তুমি বিচারক বলিয়া অবিচার করিতে তোমার ক্ষমতা নাই, রাজা বলিয়া তুমি নিয়ম ভঙ্গ করিতে পার না, রাজা হইয়া যে নিয়ম ভঙ্গ করে যে অবিচার করে—সে রাজা নহে, সে স্বেচ্ছাচারী, সে অধর্ম্মচারী। তাহার দান আর যে গ্রহণ করে করুক, আমার পুত্র তাহা গ্রহণ করিবে না। নিজ বলে যখন সে তাহার প্রাপ্যরাজ্য অধিকার করিবে তখনই এ রাজ্য তাহার। নহিলে তুমি দিতে চাহিলেও এখন তোমার হাত হইতে এ রাজ্য সে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু মহারাজ, তোমার এই অন্যায়াচরণ হইতে যখন শত সহস্র নির্দ্দোষী প্রজাদের রক্তে প্লাবিত হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইবে, ভ্রাতৃরক্তের কলঙ্কে মিবারের ভবিষ্যদ্বংশ চিরদিনের জন্য কালিমাখা হইয়া পড়িবে, তখন অন্যকে দোষী করিও না, তখন মনে থাকে যেন—তাহা তোমারি কার্য্যের ফল, তোমারি পাপের ফল। মহারাজ, যে সূর্য্য বংশের রাজা দশরথ সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য প্রাণসম পুত্র রামকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই সূর্য্য বংশে না তোমার জন্ম? আজ তুমি সে বংশের নাম ডুবাইলে—কিন্তু যত দিন আকাশে চন্দ্র সূর্য্য আছে, ততদিন অন্যায় দিয়া ন্যায়কে ডুবাইতে পারিবে না, সত্যের জয়ে বাধা দিতে তোমার ক্ষমতা নাই।"

সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে কথাগুলি বলিয়া ধীর পদক্ষেপে গর্ব্বিতা রমণী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে আর তিনি ভীমসিংহের সহিত দেখা করিলেন না, ভাবিলেন পরদিন তাঁহাকে সকল বলিবেন।

২

মহিষী চলিয়া গেলেন, তাঁহার তিরস্কার বজ্রের সুরে রাণার মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত বাজিতে লাগিল—অবিশ্রান্ত তিনি শুনিতে লাগিলেন, "যে বংশে দশরথ সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য প্রাণসম পুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই বংশে নাকি তোমার জন্ম?" রাণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মহারাজাধিরাজ রাণা রাজসিংহ আজ ক্ষুদ্র শিশুর মত অধীর হইয়া বলিলেন, "ছি, ছি কি করিয়াছি! সত্যের বংশে জন্মিয়া স্নেহের পদতলে ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়াছি? ভগবান! এই অকলঙ্ক সূর্য্যবংশে কালি দিবার জন্যই কি এই কুলাঙ্গারকে এ বংশে প্রেরণ করিয়াছিলে!"

মহারাজের অন্ধ নয়ন আজ হঠাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এতদ্দিন তিনি একথা এরূপ করিয়া কখনো ভাবেন নাই, তিনি ভাবিতেন যখন ভীমসিংহ জয়সিংহ এক দিনেই জন্মিয়াছে তখন বড় ছোট হিসাবে কাহারো রাজ্যে অধিকার জন্মে নাই, তাঁহার রাজ্য তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারেন। স্নেহে অন্ধ হইয়া তিনি যে ইহার আর এক দিক একেবারেই দেখিতেছেন না, এ কথা তাঁহার মনেই আসে নাই, আজ অতি ভীষণরূপে সে ভ্রম সে মোহ তাঁহার ঘুচিয়া গেল। সমস্ত রাত রাজসিংহের নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত ছটফট করিয়া তাঁহার কাটিয়া গেল। প্রভাত হইবামাত্র প্রহরীকে বলিলেন—"যুবরাজ ভীমসিংহকে এখানে আসিতে বল।" "যুবরাজ ভীমসিং!" প্রহরী আশ্চর্য্য হইয়া গেল,

তাহারা জয়সিংহকেই যুবরাজ বলিয়া জানে। সে যো হুকুম মহারাজ বলিয়া বাহিরে আসিয়া একবার আশ্চর্য্যব্যঞ্জক 'হুম' করিয়া লইল, তারপর গুম্ফ জোড়ায় সজোরে তা দিতে দিতে ভীমসিংহের নিকট গমন করিল। পিতা ডাকিতেছেন শুনিয়া ভীমসিংহেরও আশ্চর্য্য লাগিল। তাঁহার কাছে ইহা বড় নূতন। পিতা তাঁহাকে আর কোনদিন ডাকিয়াছেন বলিয়া কই মনে পড়ে না। ভীমসিংহ ভাবিলেন, "এ আবার কি? জয়সিংহকে রাজা করিয়া আমাকে তাহার ভৃত্য করিবার প্রস্তাব হইবে নাকি? কিন্তু এ হস্তে অসি ধরিবার ক্ষমতা যতদিন থাকিবে ততদিন যে জয়সিংহ সিংহাসনে বসিবে না, তাহা বুঝি এখনো তিনি জানেন না।" পিতার পক্ষপাতিতা স্মরণ করিয়া ভীমসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, একবার ভাবিলেন—'যাইব না', আবার ভাবিলেন, 'না, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না—তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আজ মুক্তকণ্ঠে মনের কথা প্রকাশ করিব'—ভীমসিংহ একরাশি ক্রোধ লইয়া পিতার নিকট আগমন করিলেন—কিন্তু যখন রাণার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, রাজমুখে অস্বাভাবিক বিবণ্ণতা দেখিতে পাইলেন, পিতার চিন্তাকুল নয়নের স্নেহ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি স্থাপিত দেখিলেন,—তখন ভীমসিংহ সে ক্রোধ কোথায় ফেলিয়া দিবেন যেন ভাবিয়া পাইলেন না। ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা তখন তাঁহার নিমেষে লয় পাইয়া গেল, সমস্ত হৃদয়ে কেবল একটি কষ্টের ভাব দুঃখের ভাব বই তখন আর কিছুই রহিল না। ভীমসিংহের সেই ক্রোধহীন, প্রশান্ত, সম্মান-পূর্ণ ভাব দেখিয়া রাজা অবাক হইয়া গেলেন। তিনি এতক্ষণ যে ভীমসিংহকে দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন, সে ভীমসিংহকে না দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার অন্যায়ের বিচারক, বদ্ধ ভ্রুকুটি, ক্রুদ্ধ মুখ ভীমসিংহের পরিবর্তে তাঁহার আপনার স্নেহময় বালক সন্তানকে পূর্ণ সম্মান ভরে অভিবাদন করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। পুত্রের সে সম্মান সে প্রশান্ততা সে ভক্তির ভাব রাণার হৃদয়ে যেরূপ অনুতাপের অনল জ্বালিয়া দিল—ভীমসিংহের সহস্র ভ্রুকুটি সহস্র ক্রোধও তাহা পারিত না। লজ্জায় অনুতাপে রাজা আর তাহার দিকে চাহিতে পারিলেন না, মুখ নত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"বৎস ভীমসিংহ?" সেই স্নেহের স্বরে ভীমসিংহ চমকিয়া উঠিলেন। মহারাজ ত কখনো তাঁহাকে এরূপ আদর করিয়া ডাকেন নাই! এ পর্য্যন্ত তিনি পিতার কাছে অনাদরই পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মনে আছে, বালক কালে একদিন দুই ভাইয়ে উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন, রাণা সেই উদ্যান দিয়া যাইবার সময় জয়সিংহকে আদর করিয়া গেলেন—কিন্তু তাঁহার সহিত একটি কথাও কহিলেন না, অভিমানী বালক সেখান হইতে চলিয়া গিয়া মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কত না কাঁদিয়াছিল—কিন্তু কাঁদিবার কারণ মাকেও সে বলে নাই। তাহার পর বড় হইয়া পদে পদে পিতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া আসিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাও রাণা জয়সিংহকে সিংহাসন দিবেন বলিয়া পুরাইয়া দিয়াছেন। ভীমসিংহের জন্য তাঁহার পিতার হৃদয়ে যে একবিন্দু স্নেহের স্থান আছে তাহা ভীমসিংহ এ পর্য্যন্ত মনেই করেন নাই —হঠাৎ এতদিনের পর আজ যখন পিতা স্নেহভরে ডাকিলেন—"বৎস ভীমসিংহ!" তখন তাঁহার হৃদয় তোলপাড় হইয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে ভীমসিংহ বলিলেন—"পিতঃ।" এতদিন তিনি মহারাজ বলিয়াই সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বৎস, আমি তোমার উপর অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর"

—ভীমসিংহের বীর নেত্র দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িল, এ অশ্রু সন্তানের অভিমানাশ্রু। পিতা তাঁহার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছেন এত দিন পরে যে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন, এত দিন পরে যে তিনি তাঁহাকে পুত্রের স্নেহ দিলেন—সেই আহ্লাদে তাঁহার অভিমান আর রহিল না। এরূপ ভাব আগে কখনো তিনি অনুভব করেন নাই। উথলিত-চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন—"পিতঃ, তোমার স্নেহে সন্দেহ করিয়া এতদিন দূরে দূরে যদি না থাকিতাম তাহা হইলে কি সে স্নেহ হারাই পিতা? সে জন্য আমিই তোমার কাছে দোষী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" ভীমসিংহকে নীরব দেখিয়া রাজা বলিলেন—"বৎস, তুমি ক্ষমা করিতে না পার—আমি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমার অন্তর-দেবতার নিকট, আমার ঈশ্বরের নিকট দোষমুক্ত হইব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার ন্যায্য অধিকার আমি তোমাকেই দান করিব, রাজ মুকুট তোমারি মস্তকে বৎস শোভিত হইবে। কিন্তু আমি দিলেও সম্মুখে একটি প্রতিবন্ধক, যাহা জয়সিংহের ন্যায্য প্রাপ্য নহে, আমারি দোষে সে তাহা পাইবার আশা করিতেছে, এখন হঠাৎ নিরাশ হইয়া সে অল্পে ছাড়িবে না—রাজ্য লোভে দেশ অরাজক করিয়া তুলিবে—ইহার প্রতিকার এক ভিন্ন অন্য নাই।"—বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি কোষমুক্ত করিয়া উঠাইয়া ধরিলেন। প্রভাত রশ্মি তাহার উপর চক চক করিয়া উঠিল, তিনি তাহা ভীমসিংহের হাতের কাছে ধরিয়া বলিলেন—"লহ বৎস—এই অসি তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া এস। একজনের রক্তে শত শত প্রাণীর রক্তপাত নিবৃত্তি হউক, অন্যায়ের পতনে নির্ব্বিবাদে ন্যায়ের জয় হউক। বৎস শিহরিয়া উঠিও না, কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট পিতা মাতা ভাই ভগিনী পত্নী পুত্র স্নেহ মমতা কাহারো স্থান নাই"—রাজসিংহের স্বর কাঁপিয়া আসিল, এ সত্যের ভীষণতা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে আজ অনুভব করিতেছিলেন। ভীমসিংহ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজের মনের দারুণ অবস্থা ছবির মতন তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল, কর্ত্তব্যের জন্য তিনি যে আপনার অধিক স্নেহের ধনকে বিসর্জ্জন দিতেছেন—তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, পিতার সে উদারতা, সে মহত্ত্ব পুত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল—তাঁহার পিতৃভক্তি সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠিল, ভীমসিংহ বুঝিলেন, রাণা যে অসি জয়সিংহের বুকে বিঁধাইতে দিতেছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নিজের বুকেই বিঁধাইতে দিতেছেন। মুখে আর ভীমসিংহের কোন কথা ফুটিল না, মনে মনে বলিলেন—"পিতা, তুমি দেবতা।"

রাজসিংহ পুত্রকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন—"বৎস, শিহরিয়া উঠিও না, এ হত্যায় পাপ নাই, ন্যায়সিদ্ধির জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য তুমি একাজ করিতেছ—যদি ইহাতেও পাপ হয়, সে পাপ তোমার নহে, সে পাপ আমার। আমার আদেশে তাহা তুমি সম্পন্ন কর।" ভীমসিংহের কথা ফুটিল—ভীমসিংহ পিতার হস্ত হইতে অসি লইয়া তাঁহার চরণতলে রাখিয়া বলিলেন—"পিতঃ, অসি ফিরাইয়া লউন—ইহাতে আমার আবশ্যক নাই। আপনি আমার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, আপনার কর্ত্তব্য আপনি পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়াছেন—এখন আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিব, আমা হইতে যাহাতে রাজ্যের একবিন্দু শোণিতপাত না হয়, যাহাতে কণা মাত্র পাপ চিন্তাও জয়সিংহকে স্পর্শ না করে তাহাই আমার কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিব। আপনি

আজ আমাকে যে অধিকার দান করিলেন—আমার সেই অধিকার আমি আজ জয়সিংহকে দান করিলাম। আজ হইতে রাজ্য ন্যায্যরূপে তাহার হইল। এখানে থাকিলে কি জানি যদি মোহবশত কখনো রাজ্যে লোভ আসিয়া পড়ে—আমি মিবার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আজ আপনি যে স্নেহ দিয়াছেন, যে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই দুর্লভ সম্পত্তি হৃদয়ে লইয়া আমি আজই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব—ইহার যদি অন্যথা হয় ত আমি আপনার সন্তান নহি।"

রাণাকে কথা কহিবার—বাধা দিবার সময় না দিয়া ভীমসিংহ পিতৃচরণ স্পর্শ করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন—মহারাজ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই দিনই ভীমসিংহ স্বহস্তে জয়সিংহকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহার প্রিয় সৈন্য সামন্ত দলবল লইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—আর কখনো ফিরিয়া আসিলেন না। অনেকদিন পরে তাঁহার সঙ্গীরা অনেকে মিবারে ফিরিয়া আসিল কিন্তু তাঁহাকে লইয়া নহে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ লইয়া।

ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৩

ক্ষত্রিয়-রমণী

ঐতিহাসিক উপন্যাস

"ঐ বরাহ" "ছুটাও ছুটাও" "আরো ছুটাও" "ঐ দিকে চল" এই দিকে এস"—মৃগয়াকারীদের শত কণ্ঠের চীৎকারধ্বনি আরাবলী প্রান্তস্থ অন্ধয়া-নামক বনের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল, অশ্বারোহীগণের দ্রুত পদ নিক্ষেপে অন্ধয়ার পার্ব্বত্য-ভূমি বিদারিত হইয়া উঠিল, বরাহ প্রাণভয়ে, উৰ্দ্ধশ্বাসে, পর্ব্বতের এ ধার হইতে ওধারে—বনের এদিক হইতে ওদিকে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে বন ছাড়াইয়া প্রান্তর পথ দিয়া এক সুবিস্তীর্ণ ভুট্টাক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মিবারের যুবরাজ অর্শি সদলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই ক্ষেত্র সম্মুখে উপনীত হইয়া রুদ্ধগতি হইয়া দাঁড়াইলেন,—অশ্ব চালাইবার আর স্থান দেখিলেন না। রণোন্মত্ত হস্তী হঠাৎ আহত হইলে মুহূর্ত্তের জন্য যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, শীকারোত্তেজিত যুবরাজ শীকারের অনুসরণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগ্রীব, সফেন মুখ অশ্বের রাশ শিথিল করিতে ভুলিয়া মুহূর্ত্তকাল সেইরূপ স্তম্ভিত চিত্রার্পিতের মত অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। এই সময় একজন গ্রাম্য কন্যা আসিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইল। যুবতী সেই ক্ষেত্রেরি অধিপতির কন্যা, ক্ষেত্রের নিকটস্থ উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া ক্ষেত্র পাহারা দিতে দিতে সে শূকরকে ক্ষেত্র মধ্যে লুকাইতে দেখিয়া এবং মৃগয়াকারীগণের দুর্দ্দশা অনুভব করিয়া তাঁহাদের সাহায্যের মানসে দ্রুতপদে যুবরাজের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ তখন আস্তে আস্তে অশ্বের রাশ শিথিল করিতে করিতে যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কি সুন্দর, বলিষ্ঠ সুগঠন উন্নত দেহ! কি সরল সুন্দর মুখশ্রী! তাহার আঁট সাট সাদাসিদে গ্রাম্যবেশে সেই সুগঠন দেহের সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর ফুটিয়াছে, তাহার অযত্ন রক্ষিত এলোথেলোচুলে সাজসজ্জাহীন-মুখখানি যেন আরো সুন্দর দেখাইতেছে, সেই বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যপূর্ণ, অসজ্জিত-স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কাছে মণিমাণিক্য বিভূষিত, যত্ন-সজ্জিত, যত্ন-রক্ষিত সৌন্দর্য্যও যেন মলিন হইয়া পড়ে। যুবরাজ দেখিলেন তাহার মাথায় সিন্দূর নাই, হাতে কঙ্গন আছে অথচ লৌহ নাই, যুবতী অবিবাহিত। তিনি বলিলেন, "সুন্দরি—এই ভুট্টাবনের মধ্যে অশ্ব যাইবার কোন পথ আছে কি!" যুবতী বলিল—"না, একটু অপেক্ষা করুন, আমি শূকর তাড়াইয়া আনিতেছি।" বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, একটি দীর্ঘ ভুট্টাগাছ বিনা আয়াসে—সমূলে উৎপাটিত করিয়া হস্তে তুলিয়া লইয়া দ্রুত গতিতে ভুট্টাবনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। মৃগয়াকারীগণ উৎসুক নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবতী শূকর তাড়াইয়া পার্শ্বের উচ্চ ভূমিতে আনিয়া ফেলিল—মৃগয়াকারীগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অমনি সেইদিকে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। বরাহ প্রাণভয়ে কাতর হইয়া আবার ভুট্টাবনের মধ্যে পলায়ন চেষ্টা করিল,—অন্য যে দিকে চাহে সেইদিকেই দ্রুতধাবিত অস্ত্রধারী মনুষ্য, কেবল ভুট্টাবনের দিকে এক সেই যুবতী মাত্র ; শূকর দেখিল যদি ইহার হাত ছাড়াইয়া পলাইতে

পারে—তবেই তাহার প্রাণ বাঁচে। সে মৃত্যুবলে বলী হইয়া রমণীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল —তাহার পর ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দূর হইতে সকলেই রমণীর এই বিপদ দেখিতে পাইলেন—সকলেই ত্রস্ত ভীত হইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন, কিন্তু বরাহ তীর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এই যুবতীর গাত্রের উপর আসিয়া পড়ে পড়ে, এই রমণী গেল গেল—বুঝি আর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না! যুবরাজের অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল,—কিন্তু তিনি আসিয়া পৌঁছিবার আগেই শূকর রমণীকে তাড়া করিয়া ঠিক তাহার হাতের কাছে আসিয়া পড়িল—যুবতী নির্ভয় চিত্তে অমনি আক্রমণোদ্যত শূকরের মস্তকে সেই ভুট্টাদণ্ড দ্বারা সবলে আঘাত করিলেন, সে আঘাতে শূকর যেন বজ্রাহত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—সেই সময় যুবরাজের অশ্বও নিকটে আসিয়া পড়িল, কিন্তু তখন আর কোন ভয় নাই। তখন রমণী হাসিতে হাসিতে শূকরের কান ধরিয়া তাঁহার নিকট টানিয়া আনিল, যুবরাজ তাহাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিলেন ; আর সকলে অবাক হইয়া রমণীর পানে চাহিয়া রহিল। রাজপুতানায় রমণীগণের সাহসের অভাব নাই—তথাপি এই গ্রাম্য নারীর সাহস দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল।

২

প্রথম কুমার। "ছিছি এ বড়ই লজ্জার কথা!"

দ্বিতীয়। "তাই ত আমরা থাকিতে একজন স্ত্রীলোক—"

যুবরাজ। "কেন লজ্জার কথা কি? আমাদের দেশে অমন স্ত্রীলোক আছে সে ত গৌরবেরই কথা।"

প্রথম কুমার। "দেশের গৌরব হইতে পারে, কিন্তু আমাদের গৌরব আর রহিল কই? স্ত্রীলোকের কাছে শেষে হারিলাম।" যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "যদি হারিতেই হয় —ত রমণীর নিকট—বিশেষতঃ অমন রমণীর নিকট হারিতে ত আমার দুঃখ নাই—"

তৃতীয় কুমার হাসিয়া বলিলেন—"যুবরাজ, শীকার করিতে আসিয়া আপনি নিজেই শেষে শীকার বনিয়া গেছেন দেখিতেছি!" অদূরে একটা বাঘের ছালের উপর বিশ্বম্ভর ভুঁড়িদারজি (শেষের নামটি কুমারদের দেওয়া) শুইয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সম্পর্কে রাজবাড়ীর সকলেরি সাধারণ শ্যালক। কুমার অজয়সিংহের গুরুপুত্র-পত্নীর মামাত ভাইএর পিসতত বোনের ননদের ইনি কেমনতর খুড়তত ভাই, সুতরাং গুরুপুত্রের ইহার সহিত যে ঘনিষ্ঠ ও গুরুতর সম্বন্ধ সেটি রাজবাড়ীর সকলেই নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারও তাহাতে বড় একটা আপত্তি নাই, কেননা এই সম্পর্কের দোহাই দিয়া সারাসময়টা ইনি দিব্য পায়ের উপর পা রাখিয়া, গদির উপর অঙ্গ ঢালিয়া, আলসেমি করিয়া, ঘুমাইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিন যাপন করেন,—আর মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলেই রাজকুমারদিগের উপরেও বিলক্ষণ করিয়া এক এক হাত ঝাড়িয়া লইতে ত্রুটি করেন না। তৃতীয় কুমারের কথা বিশ্বম্ভরের কান এড়াইল না, তিনি ঠিক সময়টিতে উঠিয়া বসিলেন—তিনি বোধ করি ঘুমটাকে অনেকটা নেপোলিয়ানি ধরণে তৈয়ার করিয়া লইয়াছিলেন, দরকারের সময়টিতে ঠিক তাঁহার ঘুমটি ভাঙ্গিয়া যাইত, নহিলে অন্য সময় সহস্র ডাকাডাকিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গায় কার সাধ্য।

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়াই বলিলেন—"সেকি কথা কুমারজি? আমি ত জানি যেটা শীকার বনিয়াছে —সেটা নিঃঝক শূয়ার—", সকলেই হাহা করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, তিনি আবার হাই তুলিতে তুলিতে শুইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন,—এমন সময়ে হঠাৎ হাসির সে উচ্ছ্বাসটা থামিয়া গেল। নিকটের একটি বৃক্ষে যুবরাজের অশ্ব বাঁধা ছিল, হঠাৎ পশ্চিম হইতে একটি ঢিল সবলে তাহার দিকে পড়িতে দেখা গেল,—আর অমনি অশ্ব লাফাইয়া উঠিয়া করুণ স্বরে ডাকিয়া উঠিল, কুমারগণ বুঝিলেন অশ্ব আঘাত পাইয়াছে। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি অশ্বের নিকটে আসিয়া দেখিলেন —যে একটা সামান্য ঢিলের আঘাতে অশ্বের উরুদেশের হাড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এত জোরে কে ঢিল ছুড়িল! এ ত সামান্য জোরের কাজ নহে! তাহাদের ক্রোধ কৌতূহলে পরিণত হইল। এই সময় ইঁহারা সেই যুবতীকে তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিলেন, সে নিকটে আসিয়া বলিল, "আমাকে মার্জ্জনা করুন—আমি পাখীর দৌরাত্ম্য হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ঢিল ছুঁড়িতেছিলাম—দৈবক্রমে অশ্বের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, সে জন্য আমি বড়ই দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছি," ভুঁড়িদারজি বাঘের ছালের উপর হইতেই তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"সুন্দরি, দুঃখ করিবেন না, ঢিলটা ঘোড়ার উপর দিয়া গেছে সেটা আহ্লাদেরই কথা।" যুবতী একটু সরল হাসি হাসিয়া, সঙ্গের আনীত ঔষধ বাহির করিয়া অশ্বের উরুদেশে লেপন করিতে লাগিল, লেপন শেষ হইলে বস্ত্র দিয়া সেই স্থান বন্ধন করিল, বন্ধনান্তে কুমারদের হস্তে ঔষধ-কৌটা প্রদান করিয়া—তাহা লেপন করিবার নিয়মাদি বলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজপুত্রদিগের ক্রোধের ভাব প্রশংসার ভাবে পূর্ণ হইল। রমণী অশ্বকে আহত করিয়া অশ্বপ্রভুদের ধন্যবাদ লইয়া চলিয়া গেল। যুবতী চলিয়া গেলে—কুমারদিগের যেন মুগ্ধভাব দূর হইল, তাঁহাদের কথা ফুটিল, একজন বলিলেন, "সর্ব্বনাশ? ঐ কোমল বাহুতে যে শতঘ্নির বল!" শ্যালকজি বলিলেন—"শতঘ্নি হইলে ত রক্ষা ছিল, একেবারেই কাজ নিকাশ হইয়া যাইত, ও হাতের গোলাগুলি যাহার উপর আসিয়া পড়ে সে যে একেবারে মরে না—আধমরা হইয়া থাকে।" কথাটা সকলের লাগিল ভাল, যুবরাজের দিকে চাহিয়া সকলেই হাসিতে আরম্ভ করিল, যুবরাজও হাসিয়া বলিলেন—"মরিতে বাকী ছিল বটে, কিন্তু তোমাদের কথার অস্ত্রে আর বুঝি কিছু বাকী থাকে না। যদি বাঁচাইতে চাও কথাটা একটু বন্ধ করিতে হয়।" একজন পারিষদ বলিলেন—"যুবরাজ কোন কাজই হইল না, শীকার করিতে আসিয়া কষ্টমাত্র সার, এখন যদি কথাটাও বন্ধ করিতে হয় ত বাঁচি কি করিয়া?"

কথাটা নিতান্ত সত্য, যেখানে কর্ম্মের যত অভাব সেইখানেই কথার তত ছড়াছড়ি! যুবরাজ বলিলেন—"কর্ম্মের জন্য এত কাতর হইয়া থাক, আমি কর্ম্মের বন্দবস্ত করিতেছি। চল, সকলে মিলিয়া একবার গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসি, যুবতীর পরিচয়টাও অমনি জানিয়া আসা যাইবে, একটা অসাধারণ রমণী!—বাড়ী গিয়া ত তার সম্বন্ধে গল্প করিতে চাই।" প্রস্তাবটা সকলেরই মনের মত হইল, প্রথম কুমার বলিলেন—"এই মাত্র আমি আপনার নিকট ঠিক এই প্রস্তাব করিতে যাইতেছিলাম," দ্বিতীয় কুমার বলিলেন—"তুমি ত এইমাত্র বলিতে যাইতেছিলে—আমি যে সকাল হইতে এইরূপ প্রস্তাব করিব ভাবিতেছি"—তৃতীয় বলিল—"তুমি ত ভাবিয়াছ—আমি ত মহারাজকে এই কথাই তখন

বলিতেছিলাম", চতুর্থ বলিল—"ইঃ! তুমি বলিয়াছিলে! যুবরাজকে জিজ্ঞাসা কর দেখি আমি আগে বলিয়াছিলাম কি না।" পারিষদগণ টেপাটেপি করিয়া বলিল—"উঁহারা বড় লোক, কিন্তু ছোটর ধন লইয়া বড় লোক,—অথচ সেই কথাটা প্রকাশ করিলেই মহাকাণ্ড! তা মুখেই যেন নাই বলিলাম, মনে মনে ত চুপ করিতে পারি না।" শ্যালকজি দেখিল বড় গোলযোগ, বলিল—"আমি মীমাংসা করিয়া দিতেছি,—যুবরাজ ছাড়া আর সকলেই এ প্রস্তাব আগে করিয়াছেন।" মুখে সকলেই হাসিল, কিন্তু সকলেই মনে মনে কথাটা নিজের পক্ষে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিল, আর কে জানে ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিয়াছিল কি না—যে দিন মৃগয়াকারীদের সকলেই এই প্রস্তাবকারী বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নাম পাইয়াছিল—কেবল যুবরাজের নাম ইহার সম্পর্ক হইতে একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। এ স্থলে এরূপ না হউক—অন্ততঃ জগতের এইরূপ ধারা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়।

৩

রাজপুত্রগণ অশ্বারোহণে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য পথ, পথের একপার্শ্বে পাহাড়ের গায় বড় বড় গাছ জঙ্গল বাঁধিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, আর এক পার্শ্বে দূরে অতি দূরে আকাশের গায় পাহাড় শ্রেণী সুনীল মেঘের মত মাথা তুলিয়া আছে। বিকাল বেলা, সূর্য্য অশ্বারোহীগণের পশ্চাৎদিকের একটা পাহাড়শৃঙ্গের আড়ালে লুকাইয়া আলোক দিতেছে আর তাহাদের সম্মুখে অনন্ত নীল আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, সূর্য্যের আলোকে চাঁদের আলো মিশিয়া চারিদিক ঈষৎ-স্বর্ণময় স্নিগ্ধ রজতাভায় রঙাইয়া নিকটের রজতকণায় উচ্ছ্বসিত ঝরনার বুকে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। আকাশের পূর্ব্বকোণে দুই একটি তারকা মৃদু মৃদু জ্বলিয়া সেই ঝরনার উজ্জ্বল বারিকণার প্রতি ঈর্ষা দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! ধিরে ধীরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়া পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া, গাছে গাছে বাঁশির তান তুলিয়া জোরে জোরে ফিরিয়া যাইতেছে। অশ্বারোহীগণ—প্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ শোভা উপভোগ করিতে করিতে পথের একটি বাঁক ছাড়াইয়া গ্রামের রাস্তায় পদার্পণ করিলেন, অমনি সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল—যে শৃঙ্গের আড়ালে সূর্য্য লুকাইয়া পড়িয়াছিল—সে শৃঙ্গ অমনি তফাতে পড়িয়া গেল—মুক্ত সূর্য্যের রশ্মিতে চারিদিক হঠাৎ লালে লাল হইল। চন্দ্র তারা দৃশ্যের অপরপার্শ্বে লুকাইয়া পড়িল।

একই সময়ে ঘূর্ণ্যমান পথের একপার্শ্বে সূর্য্যালোক, একপার্শ্বে চন্দ্রালোক, একপার্শ্বে দিবা, একপার্শ্বে দিবাময়-সন্ধ্যা—চন্দ্র সূর্য্যবিকাশের এই রহস্যময় বৈকালিক শোভা কেবল পার্ব্বত্য প্রদেশেরই কোন কোন স্থানে দেখা যায়। অশ্বারোহীগণের নিকট যদিও এ দৃশ্য নূতন নহে, তথাপি এই সুবর্ণখচিত লাল দৃশ্যের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এই লাল সমুদ্রে অবগাহিত হইয়া তাঁহাদের মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে একটি উন্নতবপু যুবতী মূর্ত্তি আসিয়া পড়িল। যুবতীর মস্তকে দুগ্ধ কলস, দুই পার্শ্বে দুইটি মহিষ, সেই মহিষ দুইটির পৃষ্ঠে দুই হাত রাখিয়া যুবতী তাহাদের চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। কুমারগণ যুবতীকে চিনিতে পারিলেন, তাঁহারা আপনাদের মধ্যে আস্তে আস্তে কি বলাবলি করিলেন, কি একটা পরামর্শ হইল, সকলেই হাসিয়া কুটি কুটি হইতে লাগিলেন, যুবরাজ হাসিটা

চাপিয়া যুবতীর দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন—সকলে দাঁড়াইয়া কি একটা যেন রহস্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যুবরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া হঠাৎ যেন অসতর্ক অবস্থায় একেবারে যুবতীর উপর আসিয়া পড় পড় হইলেন, আর যেন তাঁহার অশ্ব সম্বরণের ক্ষমতা নাই, —তিনি ভয়ার্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সুন্দরী সর সর—পথ দাও—", অভিপ্রায় —যুবতী ভয় বিহ্বল হইয়া পলায়নোদ্যত হইবে অমনি তাহার দুগ্ধকলস মাথা হইতে পড়িয়া যাইবে, আর তাঁহারা সকলে হাসিয়া উঠিবেন, যুবতী অপ্রতিভ হইবে।

"সর সর" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে যুবরাজ—যুবতী-পার্শ্বস্থ মহিষ ও যুবতীর মধ্যে আসিয়া পড়িবার মানসে অশ্ব একটু বাঁকাইয়া লইলেন, অদূরে অশ্বারোহীগণের হাসি মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হইল, তাহাদের মনে হইতে লাগিল—রহস্য বুঝি সত্যই প্রাণঘাতক হইয়া পড়ে! নিস্তব্ধে তাহারা শেষ দেখিবার অপেক্ষা করিয়া রহিল। যুবতী যুবরাজের অভিপ্রায় বুঝিল—বুঝিল তিনি তাহার গাত্রের ঠিক পাশ দিয়া তাহাকে নড়াইয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু সে তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া—একটু সরিতে চেষ্টা না করিয়া, পার্শ্বের মহিষের শৃঙ্গটা হাতে ধরিয়া যুবরাজের দ্রুতশীল অশ্বের গাত্রে লাগাইয়া দিল —অশ্ব হঠাৎ চমকিয়া লাফাইয়া হঠিয়া গেল, যুবরাজ অসতর্ক অবস্থায় হঠাৎ অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। তিনি যে রহস্য জমাইতে চাহিয়াছিলেন—তাহা জমিল বটে—তবে সম্পূর্ণ উল্টা রকমে জমিল। যুবরাজ পড়িবামাত্র যুবতী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল, অশ্বারোহিগণও নিকটে আসিয়া পড়িল। কিন্তু কাহারো সাহায্য আবশ্যক হইল না, তিনি অপ্রস্তুত হইয়া আপনিই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবতী বলিল, "মাপ করুন, আমার ইচ্ছায় হয় নাই।" যুবরাজ লজ্জায় উত্তর দিতে পারিলেন না ; সে তখন আস্তে আস্তে এমন প্রশান্ত ভাবে চলিয়া গেল—যেন কিছুই হয় নাই। রমণী চলিয়া গেলে যুবরাজ প্রথমে দেখিলেন তাঁহার কোনস্থলে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে কি না, দেখিলেন সৌভাগ্যক্রমে কোথায় লাগে নাই। তখন আপনারা সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া আর একবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন, হাসিটা ফুরাইলে একজন বলিল "যুবরাজ, এ কি হইতেছে কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একটা সুসার হইল না।"

যুবরাজ বলিলেন—"একেই আর কি বলে গ্রহ।" আর একজন বলিল—"গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া এখন গ্রহের শেষটা কি একবার দেখা যাউক।" যুবরাজ বলিলেন—"কোন লজ্জায় আর গ্রামে যাই, একটা ঘোড়াকে সামলাইতে পারিলাম না,—মুখ দেখাই কি করিয়া?" আর একজন বলিল—"ঘোড়াটা ত সামলাইতে পারিলেন না, এখন প্রাণটা সামলাইয়া ঘরে ফিরিতে পারিলেই হয়।"

সত্য সত্যই আর তখন গ্রামে যাওয়া হইল না। তাঁহারা একটা নির্ঝরিণী-ধারে গাছের তলায় বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে লাগিলেন। কিছু পরে একজন গ্রামবাসীকে নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "দাঁড়াও, সন্ধানটা জানিয়া আসি", বলিয়া গমনশীল গ্রামবাসীর কাছে আসিয়া পশ্চাৎদিক হইতেই বলিল—"বাপুহে, তোমার নাম কি?" গ্রামবাসী সেই দিকে মুখ ফিরাইবামাত্র নিতান্ত অপরিচিত মূর্ত্তি তাহার চোখে পড়িল—সে একটু উদ্ধতভাবে বলিল—"সে খবরে তোমার কাজ কিহে বাপু?" ব্রাহ্মণের মহা রাগ হইল—বলিল—"নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি কত সৌভাগ্য—তা না বেটার রকম

দেখ।" গ্রামবাসী হস্তস্থিত লাঠির উপর দুই হাত সবলে রাখিয়া ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—শ্যালকজি বলিল—"ইঃ, তবে ত মরিয়া গেলাম—আমি কি আর রাগ করিতে জানি না নাকি?" গ্রামবাসী বলিল—"কে তুই উম্মাদ, চলিয়া যা, ফের যদি কথা কহিবি, মুখ ভাঙ্গিয়া দিব?" বিশ্বম্ভর কুমারদের প্রিয়পাত্র, তাহার বুকের পাটা একজন সামান্য গ্রাম্যের কথায় দমিবার নহে, সে বলিল—"চলিয়া যাইব! ওঁর কথায় চলিয়া যাইব! জানিস বেটা আমি ব্রাহ্মণ? মুখ সামলাইয়া কথা কহিস"—গ্রামবাসী ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিল—"তুমি যার সঙ্গে কথা কহিতেছ সে কে জান—একজন ক্ষত্রিয়।"

বিশ্বম্ভর। "ক্ষত্রিয়! তোর মত কত ক্ষত্রিয় দেখেছি, কি বলিব—কলিকাল, নইলে আজ ব্রহ্মণ্যতেজে তোকে এইখানে ছাই করিয়া রাখিয়া যাইতাম।" ক্ষত্রিয় আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ দাঁত দেখাইয়া বলিল—"আবার হাসি হচ্ছে? চল বেটা যুবরাজের—", এই সময় দুইজন পারিষদ এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বৃক্ষতল হইতে উভয়ের উচ্চ স্বর শুনিয়া বুঝিল ঠাকুর গোলযোগ বাধাইয়াছেন, নিকটে আসিয়া বলিল—"মহাশয়, ও ব্রাহ্মণের কথা ধরিবেন না, উহাকে পাগল বলিয়া জানিবেন—", ক্ষত্রিয় বলিল—"হ্যাঁ, পাগলই দেখিতেছি—", বিশ্বম্ভর রাগ করিয়া চলিয়া গেল, পারিষদ বলিলেন— "মহাশয়, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি—অনুগ্রহ করিয়া বলিলে বড়ই বাধিত করেন, আজ সকালে একটি কন্যা অন্ধয়া বনের নিকটের একটি ভুট্টাক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন—তাঁর নিবাস কোথা? তিনি কে বলিতে পারেন?"

ক্ষত্রিয়। "তিনি আমার কন্যা। এই গ্রামেই আমরা থাকি।" বিশ্বম্ভর যাইবার সময় এই কথা শুনিয়া উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া যুবরাজকে এই সংবাদ প্রদান করিল, যুবরাজ তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত্রিয়ের সাক্ষ্যৎ প্রার্থনা করিয়া একজন কুমারকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কুমার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"মহাশয়, মিবারের যুবরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন—যদি অনুগ্রহ করিয়া—", কথা শেষ না হইতেই ক্ষত্রিয় গর্ব্বিত স্বরে বলিল, "মহাশয়, মাপ করিবেন। তিনি মিবারের যুবরাজ, আমি এই গ্রামের অধিপতি। এখানে কেহ আসিলে প্রথমে তিনিই আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন—নহিলে আমরা গ্রামবাসীরা আগন্তুকের ব্যবহারকে অভদ্রতা জ্ঞান করি,—মিবারের যুবরাজ তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। কিন্তু মিবারের যুবরাজ বলিয়া তাঁহার অনুরোধে আমি আমার কর্ত্তব্য ভঙ্গ করিতে পারি না,—আমি অন্যস্থলে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি—তিনি যুবরাজ বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে বিপরীতাচরণ করিয়া আপনাকে অবনত করিতে পারি না,—নিয়মের কাছে ছোট বড় নাই—।" কুমারগণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, একজন সামান্য ক্ষত্রিয়ের এত বড় কথা! কিন্তু এ আশ্চর্য্য ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে আরো একটা মহা আশ্চর্য্যের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়া গেলেন, ক্ষত্রিয়ের কথার উত্তরে যুবরাজ স্বয়ং পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া এই কথাগুলি বলিলেন—"মিবারের যুবরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আপনার সম্মান প্রদর্শনে যে ত্রুটি দেখাইয়াছেন, আপনার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিয়া এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত"—

সকলে যেন কি শুনিল বিশ্বাস করিতে পারিল না। সত্যই যুবরাজ একজন সামান্য

ক্ষেত্র-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন! কিন্তু এখনো তাহারা বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে নাই। যুবরাজের কথা ক্ষত্রিয়ের ভাল লাগিল না, বলিল, "যুবরাজ, এ প্রস্তাব করিয়া আপনি আমাকে যতদূর সম্মানিত করিলেন—দুঃখের বিষয়, আমি ইহাতে ততদূর সম্মানিত হইলাম না।"

ক্ষত্রিয় উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই স্পর্দ্ধিত পদক্ষেপে চলিয়া গেল। সকলে বিস্ময়ে ক্রোধে অপমানে অভিভূত হইয়া পড়িল।

যেমন দর্পভরে ক্ষত্রিয় কুমারদিগের সহিত কথা কহিয়া আসিলেন, গৃহে আসিয়া তেমনি তাঁহার দর্পচূর্ণ হইল। মিবারের যুবরাজকে কন্যাদানে অস্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া গৃহিণী তাঁহাকে এমন ধুড়্‌ধুড়ি নাড়িয়া দিলেন—যে সেই তিরস্কার খাইয়া নিজের অন্যায়টা স্পষ্টরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু ইহাতেও গৃহিণী ক্ষান্ত না হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীর দোষের ক্ষমা চাহিয়া ও কন্যার বিবাহে সম্মতি জানাইয়া যুবরাজের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। পরদিনই যুবতীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ শীকার করিতে আসিয়া বধূ সঙ্গে গৃহে গমন করিলেন। এই মহিষীর গর্ভেই পরে বীরশ্রেষ্ঠ হাম্মীর—যিনি ১২ বৎসর বয়সে শত্রু জয় করিয়া মিবার রাজপুতকুল উজ্জ্বল করেন—তাঁহার জন্ম হয়।

ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩

ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি

সম্রাট সেকন্দর লোদির অমাত্য আসফ খাঁ কোন কার্য্য উপলক্ষে বুন্দিনগরে অবস্থিতিকালে মহারাজ দেবসিংহের পাথার নামক মনোহর অশ্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া দিল্লি ফিরিয়া কুক্ষণে সম্রাটকে বলিয়াছিলেন, "তেমন অশ্ব সম্রাটের অশ্বশালেও নাই।" সম্রাট অশ্ববাতুল ব্যক্তি, বহুমূল্য দিয়া বহুদূর দেশ হইতে তিনি অশ্ব আনাইয়া থাকেন—সুতরাং তাঁহার ভাণ্ডারে সেরূপ অশ্ব নাই, এই কথাটা তাঁহার এতই অসঙ্গত, অসম্ভব বোধ হইল যে তিনি ইহাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীর কথার প্রমাণ দেখিতে চাহিলেন। মহম্মদ খাঁ দেবসিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে প্রেরিত হইল।

অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত সম্রাট সেকেন্দর লোদি স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। দাসেরা চামর ব্যজন করিতেছে, স্তাবকেরা স্তুতিবাদ গাহিতেছে, পারিষদবর্গ প্রিয়বাক্যে মনোরঞ্জন করিতেছে, রাজকর্ম্মচারী মহম্মদ খাঁ এই সময় আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া সিংহাসন-সমীপে দাঁড়াইলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহম্মদ, বুন্দিরাজের খবর কি?"

মহম্মদ উত্তর করিলেন, "বাদশার প্রেরিত উপঢৌকনে জাঁহাপনার অনুগ্রহলাভে রাজা আপনাকে সম্মানিত জ্ঞানে আনন্দিত হইয়াছেন এবং আপনার আদেশানুসারে শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইবেন।"

সম্রাট অমাত্য আসফ খাঁর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি আসফ খাঁ, বুন্দিরাজের অশ্ব ত এইবার দেখা যাইবে, এখনও কি তোমার সেই কথা?"

আসফ খাঁ মাথা নোয়াইয়া বলিলেন, "হুজুর, দাসের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, আমার এখনও সেই কথা। বুন্দিরাজের অশ্বের ন্যায় অশ্ব আপনার একটিও নাই।"

সম্রাট বলিলেন, "আমার ঘোড়া 'নবাব'ও তাহার মত নহে?"

আসফ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিলেন, 'না'।

সম্রাট আবার বলিলেন, "পারস্য-রাজ গত বৎসর যে ঘোড়া আমাকে উপহার দিয়াছেন তাহা দেখিয়াছ?"

আসফ খাঁ বলিলেন, "দেখিয়াছি, আপনার সব অশ্বই আমি দেখিয়াছি, বুঁন্দিরাজের অশ্বের কেহই সমকক্ষ নহে।"

সম্রাট বলিলেন, "আচ্ছা শীঘ্রই দেখা যাইবে। মনে থাকে, তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণ হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

আসফ খাঁ বলিলেন, "হুজুরের যেরূপ ইচ্ছা।"

২

আজ দুই দিন বুন্দিরাজ দেবসিংহ দিল্লী নগরে আসিয়াছেন, সম্রাট তাঁহাকে যথোচিত সমাদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। প্রতিদিন কোন না কোন পারিষদ তাঁহার তত্ত্বাবধারণ

করিতে আসেন। আজ রাজভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, "অমাত্য আসফ খাঁ আপনার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক।"

রাজা বলিলেন, "আসিতে বল।" আসফ খাঁ আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা বলিলেন, "কি সংবাদ?"

আসফ খাঁ বলিলেন, "সম্রাট আপনাকে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তাহা দেখিতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "সম্রাটের যথেষ্ট অনুগ্রহ—আমার কোন কষ্টই নাই, তাঁহার অনুগ্রহ লাভে আমি বিশেষ বাধিত।"

আসফ খাঁ তখন বলিলেন, "আপনার অশ্ব পাথারকে দেখিয়া সম্রাট মোহিত হইয়াছেন।"

পাথার বুঁদিরাজের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তাহার প্রশংসা শুনিয়া বুঁদিরাজ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সেও বাদশার অনুগ্রহ।"

আসফ খাঁ আবার বলিলেন, "ঘোড়াটি বাদশার অত্যন্ত পসন্দ হইয়াছে।" ভাবিলেন দেবসিংহ এই ইঙ্গিত বুঝিয়া নিজেই সম্রাটকে অশ্ব উপহার দিতে চাহিবেন। কিন্তু আসফ খাঁ ভুল বুঝিয়াছিলেন। দেবসিংহ বলিলেন, "জহরীর প্রশংসাতেই জহরের মূল্য।"

আসফ খাঁ তখন মাথা চুলকাইয়া নত মুখে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "সম্রাট অশ্বটি কিনিতে চাহেন—কত মূল্য লইবেন?"

বুঁদিরাজ ক্রুদ্ধ হইলেন—বলিলেন, "বাদশাহকে বলিবেন আমি পাথারকে বিক্রয় করিব না।"

আসফ খাঁ বলিলেন, "মহারাজ, সম্রাটকে এ উত্তর দেওয়া কি বিবেচনা-সঙ্গত? ইচ্ছায় না দিলে সম্রাট বলে লইবেন।"

এই অপমান-বাক্যে ক্ষত্রিয় শোণিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বুঁদিরাজ উত্তর করিলেন, "এ দেহে প্রাণ থাকিতে সম্রাট পাথারকে পাইবেন না। সম্রাটকে বলিবেন ক্ষত্রিয় মৃত্যু-ভয় করে না।"

আসফ খাঁ একটু হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ দেহে প্রাণ থাকিতে যেন পাথারকে দিবেন না, কিন্তু দেহে প্রাণ রাখিবেন কতক্ষণ? সিংহের বিবরে বসিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ কি সম্ভব? কেন অনর্থক প্রাণ হারাইবেন, একটু বিবেচনা করিয়া উত্তর দিন।"

বুঁদিরাজ এ কথার সত্যতা অনুভব করিলেন। কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে আসফ খাঁ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, সম্রাটকে কি বলিব?"

বুঁদিরাজ বলিলেন, "আচ্ছা, ১৫ দিনের মধ্যে আমি অশ্ব লইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইব।"

৩

মন্ত্রী চলিয়া গেলেন,—বুঁদিরাজ বিষণ্ন মনে আপনার উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রাণাধিক পাথারকে দিতে পারিবেন না, কিন্তু না দিলেই বা উপায় কি? আসফ

খাঁ ঠিক বলিয়াছেন, ইচ্ছায় না দিলে সম্রাট বলে লইবেন। তিনি সিংহের কবলে আসিয়া পড়িয়াছেন। পলাইবার উপায় নাই। নিজে একাকী পাথারকে লইয়া গুপ্তভাবে পলাইতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে কুমার সমর্ষির দশা, তাঁহার সৈন্যবর্গের দশা কি হইবে? সম্রাটের ক্রোধে কি তাহারা রক্ষা পাইবে? তাহাদের উদ্ধারের উপায় স্থির করিবার জন্যই রাজা ১৫ দিন সময় চাহিয়াছেন, কিন্তু ১৫ দিনে মুক্তির কি উপায় পাইবেন? দেবসিংহ নিরুপায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, এই সময় কুমার সমর্ষি আসিয়া বলিলেন—, "সম্রাট পুত্র বিবাহ করিতে যাইবেন, আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন।"

রাজার মুখ এই কথায় সহসা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সৌৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যাইতে হইবে, বিবাহ কবে?"

কুমার বলিলেন, "বিবাহের আর এক মাস আছে মাত্র। ১৫ দিনের মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে।"

রাজার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, বিষণ্নমুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি উদ্ধারের এক উপায় দেখিলেন। পুত্রকে আসফ খাঁ কথিত সম্রাটের ঘৃণ্য প্রস্তাব আনুপূর্ব্বিক বলিয়া বলিলেন—"বৎস, সম্রাট পুত্র যে তোমাকে তাঁহার সঙ্গে লইতে চাহিয়াছেন ইহাতে বিধাতার হস্ত দেখিতেছি। নহিলে আমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় ছিল না। তুমি যুবরাজের সঙ্গে অধিকাংশ সৈন্য লইয়া নগর পরিত্যাগ কর এবং যুবরাজের সঙ্গে যাইবার জন্য নূতন যে সেনাসংগ্রহ হইতেছে, আমাদের অবশিষ্ট সেনাবর্গ মুসলমান বেশে সেই সৈন্য দলে ভুক্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ করুক। তাহার পর আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তোমাদের অনুসরণ করিব।"

৪

বুঁদিরাজের সৈন্য সামন্ত পুত্র সকলে সম্রাট পুত্রের সহিত চলিয়া গিয়াছে! বুঁদিরাজ ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন কিন্তু সম্রাটকে কথা দিয়াছেন ১৫ দিনের দিন অশ্ব লইয়া উপস্থিত হইবেন, তাই এখনও প্রাণাধিক পাথারকে লইয়া আপনি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। আজ বুঁদিরাজ নিজের কথামত পাথারকে লইয়া সম্রাট ভবনে চলিলেন। রাজা দ্বারে আসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "সম্রাটকে সংবাদ দাও, অশ্ব লইয়া বুঁদিরাজ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" সম্রাটও উৎসুকচিত্তে বুঁদিরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পাথারকে দেখিয়া অবধি সম্রাট তাহাকে অধিকার করিতে লোলুপ। আসফ খাঁর কথা ঠিক। সম্রাটের বাস্তবিক অমন ঘোড়া নাই। আসফ খাঁর প্রাণদণ্ড রহিত হইল, তাহার পরিবর্ত্তে দেবসিংহের নিকট হইতে ঘোড়া লইয়া আসিবার অনুমতি হইল। আসফ খাঁ দেবসিংহের নিকট হইতে আসিয়া তাঁহার প্রদত্ত উত্তর প্রদান করিলেন। ১৫ দিন সম্রাটের বড় দীর্ঘ মনে হইল। আসফ র অনুরোধে এই কয়েকদিন কোনরকমে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিলেন, আজ শেষ দিন আর ধৈর্য্য ধরিতেছে না—কখন বুঁদিরাজ আসিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। ভৃত্য এমন সময় আসিয়া বুঁদিরাজের আগমন সংবাদ দিবা মাত্র মহাহর্ষে সম্রাট স্বয়ং বুঁদিরাজকে অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। বুঁদিরাজ অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আমি আমার কথামত অশ্ব লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

সম্রাট অশ্ব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনার উপহারে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। আমি আপনাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিব। রাজপুতানার আপনিই অধীশ্বর হইবেন।"

সম্রাটের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেবসিংহ বলিলেন, "বাদশাহা, আমার একটা কথা শুনুন, মনে রাখিবেন—রাজপুতের নিকট তিনটি জিনিস কখন চাহিবেন না, স্ত্রী অশ্ব ও তরবারি।"

এই কথা বলিয়া দেবসিংহ অশ্ব ধাবিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

সন্ন্যাসিনী

১

নদীতীরে সুবিস্তৃত শ্মশান-প্রান্তে ভস্মাবশেষ চিতার সম্মুখে কে ঐ দীনবেশা, আলুলায়িতকুন্তলা মলিনমুখী রমণী বসিয়া? ও বুঝি সন্ন্যাসিনী? ঐ নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ চিতাভস্মের মত তাহার হৃদয়ও বুঝি আজ সুখদুঃখহীন? আপনার মর্ম্মশোণিতে ঐ চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া জীবন্তে বুঝি আজও জীবনহীনা? হায়! সবে মাত্র যে কচি হৃদয় নবীন প্রেমে, নবীন আশায়, নবীন বাসনায় মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কে জানিত সূর্য্য না অস্ত যাইতেই শুষ্কপত্রের মত এইরূপ ঝরিয়া পড়াই তাহার পরিণাম?

যখন নলিনী ফুলের মতন মুখটি লইয়া, বাল্যসখা কুমারের হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে এই নদীতীরে বসিয়া গল্প করিত, নদীর জলে ফুল ভাসাইয়া, ছোট ছোট পা দুখানি দিয়া ঢেউগুলির সঙ্গে সঙ্গে ফুলগুলি নাড়াইয়া দিত, নদীর জলে নামিয়া দুজনে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইত, তখন কে জানিত তাহার এই পরিণাম।

সেদিনও যখন এই নদীতীরে বসিয়া কুমার তাহাকে তাহাদের ভবিষ্যৎ কাহিনী শুনাইতেছিলেন, কল্পনাপটে সুখের ছবি আঁকিয়া দেখাইতেছিলেন, তখন নলিনী কি একবার স্বপ্নেও মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কল্পনা কেবল কল্পনাতেই অবসান হইবে!

সেদিন বসন্তের প্রভাত, নদীর চঞ্চল বুকে রবিকিরণ তরঙ্গভঙ্গে খেলা করিতেছে, নদীর ধারে মুকুলিত আমের গাছে একটি পাপিয়া সুর ভাঁজিতেছে, তলায় কুমার ও নলিনী বসিয়া আছেন। নলিনীর মুখখানিতে আজ হাসি নাই—তাহার চোখে জল। মিবার-সেনাপতি অজয়সিংহ এই উপত্যকা পথ দিয়া যবন সেনাপতি মহবুব খাঁর গতিরোধ করিতে যাত্রা করিবেন—এই সংবাদে নলিনী কাতর হইয়া পড়িয়াছে। একবৃন্তে দুইটি ফুলের মত তাহারা পাশাপাশি বাড়িয়াছে, কুমার গেলে নলিনী একাকী কি করিয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া নলিনীর নয়নে অশ্রুজল।

কুমার নলিনীর চোখ মুছাইয়া বলিলেন, "নলিনী কাঁদিতেছ কেন? আমি আবার শীঘ্রই আসিব।" নলিনী উত্তর করিল না—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নীরবে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুমার আবার বলিতে লাগিলেন—"যখন শত্রু নিপাত করিয়া মহারাজের নিকট হইতে জয়মাল্য পুরস্কার আনিয়া তোর চুলে পরাইয়া দিব—তখন—", বলিতে বলিতে কুমারের মুখ উদ্দীপ্ত, চক্ষু সজল অথচ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, তাঁহার আজন্মের আশা কল্পনার সফলতা যেন তাঁহার নয়নে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর একবার কেবল আস্তে আস্তে বলিলেন—"তখন নলিনী, তখন—?" নলিনী সজল-নেত্রে একটু হাসিল, কুমারের আর কোন কথা বলা হইল না, তাহার হাতখানি দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া আনন্দ-বিহ্বল নেত্রে মুগ্ধের মত তিনি কেবল তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কত সময় বহিয়া গেল—তাঁহারা বুঝিতেও পারিলেন না ; সহসা উপত্যকা পথে সৈন্য কোলাহল, অশ্বপদশব্দ, বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল, কুমার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিয়া

উঠিলেন—"ঐ বুঝি রাজধানী হইতে সৈন্য আসিতেছে, নলিনি, নলিনি, দেখ্‌বি আয়—"

দুইজনে উঠিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

২

আজ এই ক্ষুদ্র উপত্যকা-গ্রামের প্রাণে উত্তেজনা-আনন্দের সীমা নাই। রাজধানী হইতে সৈন্য আসিয়াছে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যগণ শ্রেণী বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহাদের বর্শাফলকে রৌদ্রকিরণ পড়িয়া ঝকমক করিতেছে। ঔৎসুক্যব্যাকুল গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা পথপ্রান্তর জনতাময় করিয়া তুলিয়াছে। গৃহের ছাদ, এমন কি গাছের ডালও জনশূন্য নহে। মাতৃবক্ষস্থিত নিদ্রিত শিশু কোলাহলে জাগরিত হইয়া এই বিস্ময়দৃশ্য দর্শনে কাঁদিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। নলিনীও এই সৈন্যসমারোহ দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে যে জনস্রোত তাড়নে কুমার কখন যে তাহার পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন—তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সহসা বালিকার মুগ্ধ নেত্রে ভয় বিহ্বল চকিত কটাক্ষ প্রকটিত হইল, তাহার ক্ষীণদেহ লতিকার মত কম্পিত হইয়া উঠিল, সে দেখিল একটি আরোহীহীন অশ্ব জনতা ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে দ্রুতগতিতে এইদিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ আর দু-একটি উন্মত্ত লম্ফ, আর দু-একটি মুহূর্ত্ত—তাহার পর এখনি সে অশ্বপদে দলিত হইয়া যাইবে। বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পড়িতে না পড়িতে একজন অশ্বারোহী পুরুষ নিমেষের মধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন।

বালিকা মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিল, সে তাহার পিতৃগৃহে শয়ান, নিকটে এক অপরিচিত সুন্দর যুবাপুরুষ ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া।

৩

কুমার একাকী বসিয়া আছেন, নদীর ধারে বকুলের তলাটি ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে, নলিনী এখনো মালা গাঁথিতে আসে নাই,—কুমার একাকী বসিয়া আছেন। এখন আর নলিনী আগেকার মত প্রত্যহ এখানে খেলিতে আসে না, যদি কোন দিন আসে, তেমন করিয়া আর কুমারের সঙ্গে গল্প করে না, ফুল কুড়াইয়া, মালা গাঁথিয়া, আর কুমারকে আগের মত পরাইয়া দেয় না, কুমার তাহাকে ফুল পরাইয়া দিলে সে আর হাসিয়া উৎফুল্ল নয়নে তাহার দিকে তেমন করিয়া চাহে না, কুমারের সহস্র চেষ্টায় তাহার মুখে আর পূর্ব্বের সেই সরল অনুরাগের হাসি ফুটিয়া উঠে না—কিন্তু অজয়সিংহকে দূর হইতে দেখিলে তাহার এ ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার নয়নের স্বাভাবিক জ্যোতি, অধরের অনুরাগ হাসি, আপনা হইতে আবাব বিকাশিত হইয়া উঠে।

কুমার ও নলিনী ছেলেবেলা হইতে দুজনে একত্র বাড়িয়াছেন—একত্র খেলিয়াছেন, দুজনের জীবন অচ্ছেদ্য ডোরে গ্রথিত ভাবিয়াছেন। তাঁহাদের দুজনের হৃদয় দুজনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল না, কাহারও প্রেমে কাহারও অবিশ্বাস ছিল না, তবে যে এতদিন বিবাহ হয় নাই, সে কেবল কুমার ভাবিয়াছিলেন নলিনীর যোগ্য হইয়া তবে নলিনীর

পিতার নিকট তাহাকে ভিক্ষা চাহিবেন ; এইবার যখন তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার দিন উপস্থিত, যুদ্ধ শেষে বীরত্ব গৌরব আনিয়া নলিনীর চরণে উপহার দিয়া তাহার হাত হইতে বরমাল্য গ্রহণ করিবেন এইরূপ যখন আশা করিতেছেন, তখন তাঁহার সে আশা, সে স্বপ্ন বজ্রাঘাতে সহসা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগরিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, নলিনী আর তাঁহার নাই—নলিনী অজয়সিংহের!

কুমার একাকী বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, আর নলিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,—যুদ্ধে যাইবার আগে একবার তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা। তাহার পর—ভুলিতে পারেন, দেশে ফিরিবেন, নহিলে এই শেষ দেখা। কেনই বা ভুলিতে পারিবেন না, তাঁহার জীবনের একটি আশা-আলো নিভিয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহাই কি তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব? সমরক্ষেত্রে যশস্বিতা লাভ করা তাঁহার আর একটি আশৈশব প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, বাল্যকালে মাতৃ ক্রোড়ে বসিয়া দুষ্ট যবনদিগের অত্যাচার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, শত্রু শোণিতে রঞ্জিত হইয়া পিতার ন্যায় "বীর" নাম লাভ করিতে মর্ম্মান্তিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। নলিনীর প্রেমও তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, বরঞ্চ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, কেননা যশ-গৌরবই তিনি নলিনীলাভের উপায়-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং এতদিন যশের আকাঙ্ক্ষা প্রেমাকাঙ্ক্ষায় মিলিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব রাসায়নিক উপাদান গঠিত করিয়াছিল, সহসা অজয়সিংহ মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের সে একত্ব নাশ করিয়া দিলেন, একমাত্র যশাকাঙ্ক্ষাই এখন কুমারের হৃদয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে, কেননা প্রেমাকাঙ্ক্ষা আর তাঁহার পূর্ণ হইবার নহে। নলিনী এখন অজয়কে ভালবাসে! নলিনী এখন অজয়ের বাকদত্তা,—যুদ্ধ শেষে অজয়সিংহ এখানে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবেন।

কুমার একাকী বসিয়া আছেন, নদী পূর্ব্বের মতই কুলুকুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে, আকাশ অপরাহ্লের সুবর্ণ আলোকে পূর্ব্বের মতই রঞ্জিত হইয়া নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, আর বটবৃক্ষের একটি আনত প্রকাণ্ড শাখা প্রতিদিনের মত আজও সেই সুবর্ণ স্রোতের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে, কুমার সেই তরঙ্গিত ছায়ালোকের দিকে চাহিয়া একাকী বসিয়া আছেন। অপরাহ্লের লোহিত আভা যখন মিলায় মিলায় তখন সেই কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার উপর আর একটি ছায়া প্রতিবিম্বিত হইল, কুমারের হৃদয় সশব্দে উঠিতে পড়িতে লাগিল, তিনি কিছুক্ষণ সেই ছায়ার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই বটবৃক্ষ তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—পশ্চিমাকাশের প্রশান্ত লোহিতাভা নলিনীর অশ্রুসিক্ত বিষণ্ন মুখ মধুরভাবে উজ্জ্বল করিয়াছে, নলিনী আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে। নলিনীর অশ্রুজল কুমারের প্রাণে পূর্ব্বে কখনও সহে নাই, আজও সহিল না, তিনি নিজের দুঃখ ভুলিয়া কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নলিনী, কাঁদিতেছ কেন?"

কুমার যে নলিনীকে ভালবাসেন, এক দিন যে নলিনীও তাঁহাকে ভালবাসিত, তাহার অনুরাগ এখন ভিন্ন পাত্রে অর্পিত দেখিয়া কুমার যে ব্যথিত হইতে পারেন, এ সকল তাহার কিছুই মনে আসিল না, সে কেবল আকুল-হৃদয়ে পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বাসভরে তাহার

বাল্যসখার নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিয়া কহিল, "কুমার, অজয় যুদ্ধে আর বুঝি আমাদের দেখা হইবে না।"

কুমারের মর্ম্মতল হইতে ধীরে ধীরে একটি রুদ্ধ নিশ্বাস নির্গত হইল, কুমার প্রাণপণে সংযত হইয়া সবলকণ্ঠে বলিলেন—"হইবে বই কি?"

৪

আর আশা নাই, অজয়সিংহ আর শত্রুর গতিরোধে অসমর্থ, পঙ্গপালের মত শত্রুসৈন্য মিবার-সৈন্যকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। হতবুদ্ধি, বিশৃঙ্খল সৈন্যগণ, কেহ দাঁড়াইয়া বর্শার আঘাত সহ্য করিতেছে, কেহ শূন্যে তরবারি চালনা করিতেছে, কেহ সেনাপতির অনুজ্ঞা অবহেলা করিয়া পলায়নপর হইতেছে, হিন্দুসৈন্যেব চারিদিকে এমনি একটা আতঙ্ক, নৈরাশ্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। অজয়সিংহ নিরুপায় হইয়া অগত্যা সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। যবন সৈন্যের মধ্যে সগর্ব্ব জয়ধ্বনি উঠিল। কুমারসিংহ এতক্ষণ তাঁহার সহস্র সৈন্য লইয়া অন্য দিকে শত্রুদমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাহাদের পরাভব করিয়া তিনি এই সময় অজয়সিংহের সাহায্যে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার বিজয়ী সৈন্যের হুহুঙ্কারে অজয়সিংহের পলাতক ভীত সৈন্যগণ পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল, কুমার জয়োন্মাদে সৈন্যদল হইতে সৈন্যদলের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের অনুজ্ঞা করিতে লাগিলেন, উৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া প্রবল প্রতাপে তাহারা অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। ভাগ্যস্রোত ফিরিল। যবন সেনাপতি মহবুব খাঁ পলাতক হইলেন। এবার তাঁহার সেনাদিগের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইল, তাহারাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। কুমারসিংহ পলাতক শত্রুসেনাপতির অনুবর্ত্তী হইয়া অশ্বচালনা করিলেন। মহাবুব খাঁর আহত অশ্ব কিছুদূর গিয়া ভূপতিত হইল, কুমারসিংহ নামিয়া যবন সেনাপতির নিকটে দাড়াইলেন, দেখিলেন সেনাপতি সংজ্ঞাহীন। অনুবর্ত্তী সৈন্য কয়েকজনের প্রতি তাঁহাকে উঠাইয়া লইবার ভার দিয়া তিনি তখন শিবিরাভিমুখী হইলেন। অৰ্দ্ধপথে এক বৃক্ষতলে অজয়সিংহকে দেখিয়া তিনি সেই দিকে অশ্ব চালিত করিলেন, বুঝিলেন, তিনি আহত হইয়া এইখানে অসহায় পড়িয়া আছেন। কুমার অশ্ব হইতে সবে মাত্র নামিয়াছেন, অজয়সিংহ ও তাঁহার মধ্যে দুই তিন হাত ভূমি মাত্র ব্যবধান, এই সময়ে দেখিলেন —দূর হইতে একজন যবনসেনা অজয়ের প্রতি বর্শা লক্ষ্য করিতেছে—তিনি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া অজয়কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন—মুহূর্ত্তমধ্যে বর্শা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল, —তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। নলিনীর বিদায় দিনের সেই অশ্রুমুখ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

৫

যুদ্ধ জয়ের পর অজয়সিংহ সসৈন্যে রাজধানীতে আসিয়াছেন। আহত কুমারও এখানে আনীত হইয়াছেন, বর্শাঘাতে তাঁহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় নাই, তবে বাঁচিবার আশা অতি অল্প।

সংসার ভোজবাজি, অদৃষ্ট বাজিকর কি কৌশলে যে এই বাজি খেলিতেছেন তাহা বুঝা দেবতার অসাধ্য, মানুষের কি কথা। কুমারের জন্যই যুদ্ধ জয় হইয়াছে, কিন্তু

সেনাপতি অজয়সিংহেরই যশঃগৌরবে রাজধানী ধ্বনিত! ক্ষমতার প্রভাব সর্ব্বত্র, তাহার বিপক্ষে ন্যায়ও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে অক্ষম, সুতরাং কুমারের সৈন্যগণও এই প্রশংসার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে না, কি জানি তাহা শুনিলে অজয়সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাহাদের শাস্তি প্রদান করেন। প্রথম প্রথম তাহারা সত্য কথাটা বলিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু রাজধানীর লোক তাহা শুনিলে হাসে, সে কথা বিশ্বাস করে না, আর অজয়সিংহের সৈন্যগণ তাহা শুনিয়া শাসাইতে থাকে, সুতরাং তাহার পর হইতে তাহারা আপনাদের মধ্যে কানাকানি করে, কিন্তু প্রকাশ্যে অজয়সিংহের প্রশংসাবাদে জয়ধ্বনি তুলে। কুমার শয্যাগত, ক্ষমতার রাজ্য হইতে তিনি দূরে পড়িয়া, তাঁহার পক্ষ হইয়া কে এখন সম্ভাবিত দুঃখ স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত!

আজ রাজধানীতে মহোৎসব, মহারাজ আজ সেনাপতিকে পুরস্কৃত করিবেন। দুর্গপ্রাঙ্গণে সভা বসিয়াছে, শত শত সৈন্য, নাগরিক, সভা বেষ্টন করিয়া উৎসুক চিত্তে দণ্ডায়মান! রাজা যখন সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হীরকশীর্ষ-তরবারি কোষমুক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সেনাপতি অজয়সিংহ, তোমার জন্যই আজ মিবার শত্রু-মুক্ত, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহার যোগ্য পুরস্কার ইহা নহে, ইহা কেবল—"

রাজার কথা শেষ না হইতে দর্শকমণ্ডলীর জয়ধ্বনিতে দিকবিদিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সেই জয়ধ্বনি শূন্যে বিলীন হইতে না হইতে একজন বৃদ্ধ সৈনিক দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"মহারাণা, রাজাধিরাজ, আপনি যে কার্য্যের জন্য যাহাকে পুরস্কার দিতেছেন, তিনি তাহার যথার্থ অধিকারী নহেন। অজয়সিংহ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যখন সন্ধিস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু কুমারসিংহ নিজ বাহুবলে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন।"

চারিদিক বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, অজয়সিংহের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল, মহারাজ অজ্ঞাতভাবেই যেন অসি কোষবদ্ধ করিয়া অজয়সিংহকে বলিলেন—"সেনাপতি, ইহার মধ্যে কিছু কি সত্য আছে?"

অজয়সিংহের রক্তবর্ণ মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া পড়িল, ক্ষত্রিয় হইয়া মিথ্যা বাক্য তাঁহার মুখ হইতে কিরূপে নির্গত হইবে? কিন্তু যে যশ যে গৌরব নিজের বলিয়া ভোগ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এতক্ষণ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যের ধন বলিয়া মনে হয় নাই, হঠাৎ কি করিয়া তাহা চোরের ন্যায় ত্যাগ করিবেন? অজয়সিংহ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বলিলেন—"মহারাজ, যিনি আমাকে অপরাধী করিতেছেন—তিনি আমার দোষের প্রমাণ দান করুন, নিজের পক্ষে নিজে বলিলে তাহা প্রামাণ্য হইবে না,"—

অজয়সিংহের এই মহত্ত্বের পরিচয়ে সভাসদ সকলেই সাধুবাদ করিল, মহারাজ বক্তা-সৈনিককে বলিলেন—"সৈনিক, তোমার প্রভু যে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ কি?"

রণজিৎ সত্যের বল কণ্ঠে ধারণ করিয়া বলিল—"প্রমাণ আমার কথা, আমি ক্ষত্রিয়।"

মহারাজ। "সত্য, কিন্তু অজয়সিংহও ক্ষত্রিয়, তোমার কথা সত্য হইলে তিনি চোর হইয়া পড়েন।"

রণজিৎ ক্রোধ দমন করিতে পারিল না, বলিল—"অজয়সিংহ চোর হইতেও অধম, কুমারসিংহ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

মহারাজ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"সৈনিক, চুপ কর ; ইহা রাজসভা, গালি দিবার স্থল নহে, প্রমাণ যদি কিছু দিবার থাকে বল, নহিলে চলিয়া যাও—"

রণজিৎ বলিল—"প্রমাণ কুমারসিংহের দুই সহস্র সৈনিক।"

মহারাজ। "দুই সহস্রের আবশ্যক নাই, দুইজনকে ডাক।"

রণজিৎ সেনা দুইজনকে ডাকিতে যাইতেছে, রাজা বলিলেন, "তোমায় ডাকিতে হইবে না, প্রহরি, তুমি যাও, ডাক।"

প্রহরী জনমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"কুমারসিংহের সৈন্যগণ কোথায়? তাহাদের মধ্যে দুইজন এদিকে এস, সাক্ষী দিতে হইবে।"

কুমারসিংহের সৈন্যগণের ত্রাস উপস্থিত হইল, বুঝিবা অজয়সিংহের বিরুদ্ধে তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বিচার হইবে,—প্রথমে সাক্ষ্য, তাহার পর প্রাণদণ্ড। প্রহরীর ডাকে কেহ কোন উত্তর করিল না, আবার প্রহরী ডাকিল, "কুমারসিংহের সৈন্য দুইজনকে মহারাজা ডাকিতেছেন, অগ্রসর হও।" চৌদিক নিস্তব্ধ, কেহ এক পদ অগ্রসর হইল না। প্রহরী ফিরিয়া গিয়া কহিল, "কুমারসিংহের কোন সেনা সম্ভবতঃ এখানে নাই, ডাকিয়া কোনই উত্তর পাওয়া গেল না।" রণজিৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। মহারাজ বলিলেন, "সৈনিক, তোমার অন্য কোন প্রমাণ আছে?"

সৈনিক বলিল—"প্রভু, কুমারসিংহ স্বয়ং ইহার প্রমাণ, তাঁহার সাক্ষী লওয়া হউক।"

অজয়সিংহ বলিলেন—"কিন্তু তিনি এখন শয্যাগত, এখানে তাঁহাকে আনিলে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে।"

সৈনিক বলিল—"ক্ষত্রিয়ের জীবন অপেক্ষা তাহার নাম, বীরত্ব, যশ অধিক মূল্যবান, তাঁহার নামরক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আনা হউক—।"

মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁহাকে শিবিকা করিয়া এখানে আনয়ন কর—।"

রণজিৎসিংহ দুই জন প্রহরী সঙ্গে লইয়া কুমারকে আনিতে গমন করিল। প্রহরী দুইজনকে একখানি মুক্ত শিবিকা আনয়নের ভার দিয়া রণসিং যখন কুমারসিংহের কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল—তখন কুমার বলিলেন—"রণজিৎ সিং, তুমি কোথায় গিয়াছিলে, আমি সেই অবধি তোমায় ডাকিতেছি কাহারো সাড়া নাই।" রণজিৎ সিং বিষণ্নমুখে বলিল —"প্রভু, শুনিলাম আজ অজয়সিংহ রাজহস্ত হইতে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার পাইতেছেন। যিনি যথার্থ বিজয়ী তিনি শয্যাগত, তাঁহার নাম কাহারও মুখে নাই, আর অজয়সিংহ ভীরু পাষণ্ড আজ মিথ্যাগৌরব লাভ করিতেছে। তাহা শুনিয়া সহ্য হইল না, আপনাকে একাকী রাখিয়াও তাই রাজসভায় সত্য প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম।"

কুমার বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, কুমারের যশ অজয়সিংহ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতেছেন!

রণসিং বলিল—"প্রভু, আমার কথা মহারাজ বিশ্বাস করিলেন না, আপনাকে সাক্ষী দিতে যাইতে হইবে।"

ক্রোধে কুমারসিংহের তখন সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান। তাঁহার নলিনীকে লইয়া অজয়সিংহ ক্ষান্ত নহেন, নিজের ক্ষমতায় নিজের পরিশ্রমে তিনি যে যশ, যে নাম লাভ করিয়াছেন, চোরের মত তাহা হইতেও তিনি তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত। মনের অতিরিক্ত আবেগে তিনি সবলে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, বক্ষের আহত স্থান রক্তপ্লাবিত হইয়া উঠিল, আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "রণসিং, শিবিকা এখনি আন, আমি সভায় যাইব।"

রণসিংহের চক্ষে জল আসিল, সে বলিল—"শিবিকা আনিতে পাঠাইয়াছি।"

কিছু পরে কুমারকে বহন করিয়া একখানি মুক্ত শিবিকা রাজসভায় আসিয়া পৌঁছিল। কুমারের সেই ক্ষীণ অথচ উদার বীরমূর্ত্তির প্রতি সকলের চক্ষু পড়িল, কুমার কেবল অজয়সিংহের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

কুমারের শিবিকা মহারাজের অতি নিকটে আনীত হইলে মহারাজ বলিলেন,—"কুমারসিংহ, তুমি মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তুমি যেখানে যাইতেছ সেখানে পৃথিবীর মান, যশ, তোমার সঙ্গে যাইবে না, সত্য মাত্র এখন তোমার সাথের সাথী, এই বুঝিয়া তুমি বল অজয়সিংহ বিজয়ী, না—তুমি!"

কুমারসিংহ উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একবার অজয়ের শুষ্ক মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল, "একবার ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন, এইবার ইহাকে প্রতিশোধ দিবেন? কিন্তু প্রতিশোধ! ইহা কাহার প্রতি প্রতিশোধ হইবে? অজয়ের প্রতি না নলিনীর? অজয়ের এই অপমানের কথা শুনিলে কাহার জীবনের সুখ নষ্ট হইবে? নলিনীর পিতা একথা শুনিবার পর যদি অজয়কে জামাতা না করেন ত কাহার হৃদয় চিরনৈরাশ্যে দগ্ধ হইবে? কিম্বা বিবাহের পর নলিনী কখনও যদি অজয়ের এই অপমানের কথা শুনিতে পায়, যদি জানিতে পারে সে প্রতারক চোর, তাহা হইলে তাহার কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! বিদায় দিনের নলিনীর সেই অশ্রুপূর্ণ বিষণ্ন মুখ কুমারের মনে আবার জাগিয়া উঠিল, কুমারের আর সত্য বলা হইল না, তিনি বলিলেন,—"মহারাজ, আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, প্রলোভন সম্বরণ করা মানুষের দুঃসাধ্য।"

মহারাজ বলিলেন—"এই মৃত্যুশয্যাতে শুইয়াও!"

কুমার। "হাঁ।"

মহারাজ। "তবে আর তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অজয়সিংহকে পুরস্কার প্রদান করা হউক।"

কুমার। "হউক।"

মহারাজ তখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন—"অজয়সিংহ বিজয়ী,—আর কোন সন্দেহ নাই।"

অজয়সিংহের নামে চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল, কুমারসিংহ হৃদয়ের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া মৌন হইয়া তাহা শুনিলেন, তাঁহার বীরত্ব-গৌরব অন্যের নামে ধ্বনিত হইল, তাঁহার প্রাণের বিফল আকাঙ্ক্ষা প্রাণকে আলোড়িত করিয়া তুলিল! তিনি রণজিৎকে কহিলেন, "শীঘ্র আমাকে এখান হইতে লইয়া চল।"

বাহক শিবিকা তুলিল, রণসিংহ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার অনুগামী হইল, তিনি অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় মনে মনে নলিনীর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অজয়সিংহের কটিদেশে উপহার তরবারি বাঁধিয়া কহিলেন—"অজয়সিংহ, তুমি যে মহাকার্য্য সাধিত করিয়াছ—সামান্য ধনরত্ন তাহার যোগ্য পুরস্কার নহে, আমার গৃহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসামান্য রত্ন, যাহার জ্যোতিতে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোকিত, তাহা তোমাকে অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিব।"

সেই দিনই রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

৬

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, অজয়সিংহ মহাবিজয় লাভ করিয়াছেন, একথা নগরে গ্রামে রাষ্ট্র। তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া নলিনীর হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, গর্ব্ববিস্ফারিত উৎসুক হৃদয়ে সে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে চলিল, তাঁহার আসিবার কোন লক্ষণ নাই, তাঁহার পত্রাদিও অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে! নলিনীর ফুল্লমুখ দিন দিন শুকাইয়া আসিতে লাগিল, তাহার বিস্মিত হৃদয়ের আশা দিন দিন ম্লান হইয়া পড়িতে লাগিল। যে উপত্যকা ভূমিতে প্রথমে সে অজয়কে দেখিয়াছিল, প্রতিদিন সে সেইখানে একটি নিভৃত তরুতলে গিয়া বসে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দূরোত্থিত অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠে, অবশেষে সন্ধ্যাকালে হতাশ ক্লান্তহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসে। একদিন তাহার অনুমান সত্য হইল, তাহার কল্পিত অশ্বপদধ্বনি শূন্যে বিলীন না হইয়া ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, নলিনীর আনন্দপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অবশেষে একটি ক্ষুদ্র সমারোহ প্রতিভাত হইল। দেখিল বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈনিক একখানি সুসজ্জিত শিবিকার অগ্রপশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। শিবিকা যে বরবেশী অজয়সিংহকেই বহন করিয়া আনিতেছে তাহাতে বালিকার আর সন্দেহ রহিল না।

শিবিকা একটি বৃক্ষতলে নামিল, বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, বর শিবিকা হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত তাহার আর বিলম্ব সহিল না, সে দ্রুত পদে কম্পবান হৃদয়ে শিবিকার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল শিবিকার অর্দ্ধরুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া রণসিংহ ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেছে। রণসিংহ কুমারের ভৃত্য, তাহাকে বালিকা চিনিত। কুমারের ভৃত্য অজয়সিংহের ভৃত্য হইয়া কেন আসিয়াছে ইহা তাহার তখন মনেই হইল না। মনের আগ্রহে সে শিবিকার অন্য পার্শ্বে গিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর সমস্ত মস্তক তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শিবিকাশায়ীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, অজয় নহেন, শিবিকার মধ্যে কুমার শুইয়া আছেন, তাঁহার মুখে মৃত্যুর প্রশান্তি বিরাজমান্।

নলিনী সব শুনিয়াছে, রণসিংহ তাহাকে কুমারের আমৃত্যু বিবরণ, অজয়সিংহের শঠতা, সমস্ত খুলিয়া বলিয়াছে, নলিনী এখন সন্ন্যাসিনী। শ্মশান তাহার বাসস্থান, কুমারের চিতাভস্ম তাহার একমাত্র উপভোগ্য দর্শনীয় বস্তু।

ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৮

কেন?

সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ? কোলে সোনার পুতলী বৎস, কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ির কন্যার অধিক স্নেহ যত্ন ;—তবুও মনের আগুন নেভে না। মা ত ছেলের দেখা পাইলেই বৌয়ের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে নানারূপে বুঝান, ইনাইয়া বিনাইয়া আমার প্রতি তাঁহার করুণার উদ্রেকে সচেষ্ট হন, আবার সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিতেও ছাড়েন না। কিন্তু ইহাতে যে বড় সুফল দর্শে তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক সময় বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এমনিতে তবু দিনান্তে একবার করিয়া প্রায় বাড়ী আসেন, কিন্তু শ্বাশুড়ি বকাবকি করিলে দুচার দিন একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। স্বামী যে ভালবাসেন না পোড়া প্রাণে তাহাও সয়, কিন্তু তাঁহার এই অদর্শন সহে না। নিয়মিত সময়ে তাঁহার যে দিন দেখা না পাই, সেদিন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মনে হয় স্বামী আসিয়া আমাকে যদি এখন পাদুকাঘাত করেন ত ইহার তুলনায় তাহাও সুখ। নেশা গো নেশা! সময়ে অহিফেন বা সুরা না পাইলে নেশাখোরের যে দুর্দ্দশা, ইহাও সেইরূপ এক প্রকার নেশা। সমস্ত বুঝি, তবু এ নেশা তাড়াইতে পারি না। কাজেই শ্বাশুড়ির শুভ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া মনে মনে তাঁহার অদূরদর্শিতার নিন্দাবাদ করি।

দিন ১৫র প্রায় হইল এবার উনি ঘরে আসেন নাই। 'সেখানে' লোকের উপর লোক যায়, ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'বাড়ী বন্ধ গো, বাবু বাগানে গেছেন'। শ্বাশুড়ি ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির, আর আমার আহার নিদ্রা ত একরূপ বন্ধ বলিলেই হয়। খোকার মুখের দিকে চাহিয়া আর ভগবানকে প্রাণমনে ডাকিয়া কোনরূপে দিনটা কাটিয়া যায় মাত্র। একদিন সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ রাতে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, স্বপ্নে দেখিলাম, আকাশ ফাটিয়া চারিদিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, সেই জ্যোতির মধ্যে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা এক দেবীরূপা রমণী আমাকে একটি জবাফুল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নে, মাথায় পর, স্বামী ভালবাসিবে।" আমি ফুলটি ধরিলাম। অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

তখনো ভাল করিয়া রাত পোহায় নাই, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া শ্বাশুড়িকে জাগাইয়া আমার স্বপ্নটি তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "জবাটি পাইয়াছ?" আমি বলিলাম, "না।" তিনি বলিলেন—"বাছা কালীঘাট যাও, কালী তোমাকে ঐ অপরূপ বেশে দেখা দিয়াছেন, সেখানে গিয়া তাঁহার ফুল পরিয়া এস।"

২

আমাদের বাড়ী ভবানীপুর, কালীঘাট নিকটেই। আগেও অনেকবার কালীঘাটে আসিয়াছি, দেবীদর্শন করিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইয়াছি, কিন্তু আজ প্রাতঃকালে তাঁহার দ্বারে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম, বলি রক্ত-স্রোতের পার্শ্ব দিয়া লোলজিহ্বা, কৃপাণ হস্তা, নৃমুণ্ডধারিণী. ভীমরূপা কালীর সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম, তখন কেমন মাথা ঘুরিয়া উঠিল। স্বপ্নের সেই করুণারূপিণী, প্রসন্না, হাস্যময়ী অনুপমা, অপরূপা প্রাণ-মোহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত ইঁহাকে এক ভাবিতে পারিলাম না। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ আশাযুক্ত সুশীতল হইয়া

উঠিয়াছিল, ইঁহাকে দেখিয়া ভয়-শিহরিত, নিরাশকম্পিত হইয়া উঠিয়া দ্বারদেশেই বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গে উমি দাসী ছিল, সে ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, বৌমার আমাদের কি হোল গা!" সেখানকার একজন পূজারি তিনি আমাদের চিনিতেন, তিনি তাড়াতাড়ি কালীর কোষাকুষি হইতে খানিকটা জল আমার মাথায় দিয়া উমিকে বলিলেন, "এখানে লোকজন আসছে, বৌমাকে ধরে ঐ গাছতলায় নিয়ে বসাও।" আমি উমিকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে একটি নির্জ্জন গাছতলায় আসিয়া বসিলাম। গাছতলায় আর একজন রমণী বসিয়াছিল,—উমি তাহার সহিত গল্প ফাঁদিয়া বসিল। বলিল—"বৌঠাকরুণকে নিয়ে আথান্তরে পড়েছিলুম, ভিরমি গো ভিরমি, হ্যাঁগা তুমি কোথায় থাক গা?"

রমণী বলিল—"আমি অনেক দূরে থাকি গো, আমায় চিনবে না, তোমরা কোথা থেকে আসছ?"

দাসী। "আমরা এই ভবানীপুরেরি লোক, প্রাণনাথ বাবুর নাম শুনে থাকবে কি? এককালে ছিল ভাল, এখন ভেঙ্গে পড়েছে—"

রমণী। উনি তাঁর কে হন?

দাসী। স্ত্রী গো স্ত্রী। তা বলব কি দুঃখের কথা, ত্যজা হলেন কমলিনী, কুব্জা এখন পাটরাণী। একবার মুখপানে চেয়ে দেখে না গো, মনোদুঃখে শরীরটা পাত করছে—একবার বেটিকে পাই ত দেখিয়ে দিই, ডাইনি বেটি, একটু মায়া দয়া নেই! এমন লক্ষ্মীর এই দশা করলি? তবে শুনতে পাই নাকি ভদ্রঘরের মেয়ে ছিল, পোড়াকপাল অমন—"

আমি তখন ভাল হইয়া উঠিয়াছি, আমি বলিলাম—"উমি, তাকে গাল দিস কেন? আমার অদৃষ্টে ভগবান সুখ লেখেননি, তার কি দোষ?"

ইহার পর অপরিচিতা নিকটে আসিয়া বলিল—"সত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন স্ত্রীকে স্বামী নেয় না!"

দাসী বলিল—"শুধু নেয় না। দেখ না গায়ে একখানা গহনা পর্য্যন্ত রাখেনি। এদিকে ত বাবু বাড়ী থাকেন না, কেবল যখন গহনার দরকার হয় তখন রাতবাস করতে আসেন! আমরা এত করে বলি বৌমা দিও না গো, স্বামী গেছে যাক, গহনাগুলো দিও না। তা যখন দুটো মিষ্টি কথা বলে বাবু বিপদ জানায়—তখন ওর কি আর বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে? মা সে দিন গহনার জন্য বাবুকে এমন ত গঞ্জনা দেয়নি, বলে ছাড়িয়ে আনতেই হবে, সেই অবধি আর বাবুর দেখা নাই। আর দেখ না, বৌমা ভেবে খুন হচ্ছে!" আমি বলিলাম—"কি বকিস উমি, চুপ কর!" রমণী বলিল—"তা ত সত্যি কথা! আমরা হলে অমন স্বামীর মুখ দেখিনে। দিদি তোমার ভাল হবে, এমন লোকের দুঃখ চিরকাল থাকে না।" রমণীর নয়নে করুণা-জ্যোতি বিভাসিত হইল, সে আমার নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া বিকম্পিত স্বরে বলিল, "এ পুণ্যবতীকে যে আদর করিতে জানে না, তাহার নিতান্তই দুর্ভাগ্য। দিদি তোর দুঃখ আমাকে দে, মা কালী যেন তোকে সুখী করেন।"

তাহার সমস্ত মূর্ত্তিতে এক অমানুষী সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত হইল, আমার স্বপ্নের দেবীকে মনে পড়িল।

৩

সেইদিন দুপুরবেলা একজন অপরিচিতা বৃদ্ধা আসিয়া হাঁকিল—"ওগো মাঠাকরুণরা, এই গহ্না নেও গো, বাবু আমার ঠাঁই বাঁধা রেখেছিল, টাকা দিয়ে বল্লে বাড়ী দিয়ে এস, বুঝে সুঝে সব নেও।"

মা (শ্বাশুড়ি) ত আহ্লাদে নির্ব্বাক! উমি বলিল, "মা-কালী বাবুর এই সুমতি দিয়েছেন! বৌমা, এদিকে এসগো—"

মা গহ্না দেখিয়া লইতে লাগিলেন, আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে টাকা দিয়েছেন?" জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য কবে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে, আর একজন তাহাকে দেখিয়াছে শুনিলেও মনটা ঠাণ্ডা হয়।

বৃদ্ধা বলিল, "এই আজকেরি—মরুগকে, এই কদিন হোল দিয়েছে, তা কাজে কর্ম্মে আসতে পারিনি।"

মা বলিলেন—"ছেলে কবে বাড়ী আসবে তা কি কিছু জান?"

বৃদ্ধা রাগিয়া বলিল—"তা বাছা আমি কি করে জানব? এখন ত গহ্না পেলে, আমি চন্নু।" আমার ইচ্ছা করিতেছিল বৃদ্ধাকে বসাইয়া ভাল করিয়া দু এক কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা হইল না, বৃদ্ধা এমন হঠাৎ চলিয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীও বাড়ী আসিলেন, বাড়ীর সকলেরি মহানন্দ। মা তাঁহাকে খাওয়াইতে বসিয়া বলিলেন "বাছা, গহ্না সব পেয়েছি, কিন্তু বিধাতা যে তোর সুমতি দিয়েছেন তাহাতেই আমার বেশী আহ্লাদ!"

স্বামী আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি গহ্না?"

"কেন বৌয়ের গহ্না যাকে বাঁধা দিয়েছিলি সেই বুড়ি মাগী আজ দিয়ে গেল, বল্লে তুই টাকা দিয়েছিস।"

স্বামী একটুখানি দম লইয়া বলিলেন—"ওঃ।"

আহারান্তে তিনি ঘরে আসিয়া আমাকে বলিলেন—"গহ্না দিয়ে গেছে? কই দেখি?" আমি তাঁহাকে আনিয়া দিলাম, তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ আজ পূর্ব্ব হইতেই বিষণ্ণ; গহনাগুলি দেখিবার পর আরো ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার মন বড় খারাপ হইয়া গেল, আমি বলিলাম, "তোমার কি গহ্নার আর দরকার আছে? থাকে ত নেও না।"

স্বামী কষ্টের স্বরে বলিলেন—"না।" কিছু পরে তিনি অন্যদিনের মত চলিয়া গেলেন, আমি তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে খোকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া গেলাম। অনেক রাত্রি এমন গভীর নিদ্রা হয় নাই। সকালবেলা খোকা উঠিয়া বা-বা করিয়া হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছে, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, জাগিয়া মনে করিলাম, একি এখনো স্বপ্ন দেখিতেছি! বিস্ময়ে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া আবার চাহিলাম, দেখিলাম স্বপ্ন নহে, সত্যই স্বামী পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছেন, তাঁহার মুখ বিষাদ-গম্ভীর, হৃদয়ে যেন মহা বিপ্লব। আমি চমকিয়া বলিলাম—"তুমি! কি হইয়াছে?" স্বামী কথা না কহিয়া শয্যায় বসিলেন, খোকা—বা—বা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তিনি তাহাকে তুলিয়া বুকে ধরিলেন, তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি

কাতর হইয়া বলিলাম, "স্বামী, প্রভু, সর্ব্বস্ব, তোমার কি হইয়াছে? আমাকে খুলিয়া বল, আমি প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।"

স্বামী খোকাকে বিছানায় রাখিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে? আমার আর কিছু চাহিবার নাই?"

অশ্রুতে আমার নয়ন ভাসিয়া গেল, আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তেমন সুখ আমার জীবনে কখনো হয় নাই, পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে, আত্মা যে শরীরের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেই দিন আমি জানিয়াছিলাম।

সেই দিন হইতে স্বামী একেবারে পরিবর্ত্তিত, স্ত্রী পুত্র লইয়া তিনি এখন গৃহবাসী। কিন্তু সহসা এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এ কৌতূহল আমার কখনো মিটিল না। স্বামী এ কথার উত্তর দিতে চাহেন না। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়—তিনি কষ্টের স্বরে বলিয়াছিলেন, "ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, আমার এই অনুরোধটি রাখিও।" সেই অবধি তাঁহার কাছে আর একথা তুলি না, আপন মনেই সদা সর্ব্বদা এই প্রশ্ন করি—'কেন?' কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন একটা স্থির মীমাংসাতে আসিতে পারি নাই, তাই আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—বলিতে পার—কেন?

ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৮

লজ্জাবতী

১

শুনিতে পাই তাহার আসল নাম লজ্জাবতী নহে। সে ছোট বেলায় নাকি বড় অভিমানী ছিল ; কোন দোষ করিলে পিতা মাতা যদি তাহাকে তিরস্কার করিতেন ত অমনি সে লজ্জাবতী-লতাটির মত সঙ্কুচিত জড় সড় হইয়া পড়িত, তাহার ছোট্ট, গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত, তাহার ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখ জলে ভরিয়া যাইত, হৃদয়ের ভাব লুকাইবার ইচ্ছায় হাসিতে চেষ্টা করিয়া অশ্রুজলে ও ম্লান হাসিতে সে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। তাই তাহার বাপ মা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—লজ্জাবতী।

লজ্জাবতীর পিতা মাতা এই মধুর কোমল অভিমানের মধ্যে হৃদয় মাধুর্য্য প্রকাশিত দেখিতেন, তাই তাঁহারা সাদরে ইহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু শ্বশুর-গৃহে লজ্জাবতীর এই অকৃত্রিম বিনয় নম্রতা প্রসূত শিশুসুলভ সরল লজ্জা-মাধুরী কখনও আদৃত হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারে নীরবতার গীতি-মাহাত্ম্য সকলের প্রাণে পৌঁছে কি?

সে ত প্রশংসার কাজ করিয়া ঢ্যাডরা পিটাইতে জানে না, দোষের কাজ করিলেও পাঁচ রকম কথার ছলে ঢাকিয়া লইতে পারে না, বিনা দোষে তাহাকে দোষী করিলেও তাহাতে কোন কথা না কহিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে, সে জানে ইহাতেই তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবে। কিন্তু কঠোর সংসারে কোমল অশ্রুর সাক্ষ্য কয়জন সত্য বলিয়া গ্রহণ করে? ইহাতে বরং তাহার দোষই সপ্রমাণিত হয় ; সুতরাং যে স্বভাবের গুণে লজ্জাবতী পিতামাতার·আদরের ছিল, সেই স্বভাবের গুণেই শ্বশুর-গৃহে প্রতিপদে তাহাকে তাড়না সহ্য করিতে হয়।

শীতের প্রভাত, কিন্তু আজ কুয়াসা নাই, নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের অগ্নি-গোলক জ্বলন্ত মহিমায় বিরাজিত হইয়া দিকবিদিক বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। লজ্জাবতী ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, তাহার ঘরের দেয়ালে সূর্য্যকিরণ ঝিক ঝিক করিতেছে ; ভাবিল কত না জানি বেলা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, একবার মাত্র আকাশের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে সূর্য্য প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিল ; তাহার পর তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া দ্রুতপদে রন্ধন-গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার যা তখনো আসেন নাই ; দাসী উনুন ধরাইয়া বাঁটনা বাটিতেছে ; সে তখন নিশ্বাস ফেলিয়া সুস্থির ভাবে কুটনার আয়োজন করিয়া লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল। সে দিন তাহার রাঁধিবার পালা নহে, বড়বৌ রাঁধিবেন ; সে যোগাড় দিবে মাত্র। তাহার কুটনা কুটা প্রায় শেষ হইয়াছে, এই সময় শাশুড়ি আসিয়া সহাস্য মুখে কোমল স্বরে বলিলেন—"বৌমা, শুনেছ— ?" দ্বাদশ বৎসর লজ্জাবতী শ্বশুর-গৃহে আসিয়াছে—এমন সাদরে শাশুড়ি আর তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে নাই, সে শাশুড়ির পানে চাহিতে গিয়া থতমত খাইয়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল—শাশুড়ি বলিলেন—"শুনেছ, ফুলকুমারী আসছে— ?" লজ্জাবতী

তাড়াতাড়ি কাটা হাত কাপড়ে লুকাইয়া ফেলিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশক স্বরে বলিল—"ঠাকুরঝি!" আশ্চর্য্য হইবারই কথা, লজ্জাবতী শ্বশুর-গৃহে আসিয়া অবধি কখনো এ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর হইল ফুলকুমারীর বিবাহ হইয়াছে—বিবাহের পর একবারো সে বাপের বাড়ী আসে নাই, শ্বশুর ধনীলোক, পুত্রবধূকে এই গৃহস্থ ঘরে পাঠাইতে তিনি অপমান জ্ঞান করিতেন। শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে ; তাই এত দিন পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিতেছে। শাশুড়ি আবার বলিলেন, "আজ কার রাঁধার পালা? বড় বৌয়ের বুঝি? তা দেখো বাছা, বড় মানুষের বৌ—এতদিন পরে আসছে, যত্নের যেন কিছু কমি না হয়।" শাশুড়ি চলিয়া গেলেন, কাটা আঙ্গুল জলে চুবাইয়া ধরিয়া লজ্জাবতী ভাবিতে লাগিল—আজ এই সুপ্রভাত যে আনিয়াছে সে না জানি কিরূপ কল্যাণরূপী উষাময়ী প্রতিমা? এই কঠোর অন্ধকার প্রান্তর এতদিনের পরে প্রেমের আলোকে আলোকিত দেখিব। এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

২

একে কন্যা, তাহে ধনীর ঘরণী, গৃহে আসিয়াছে আবার অনেক দিনের পর ;—চৌধুরী বাড়ীর অন্তঃপুরে আজ পর্ব্বোৎসবের ধূম, কাহারো মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবার অবকাশ নাই। বধূগণ রাঁধিতে ব্যস্ত, দাসীগণ যোগাড় দিতে ব্যস্ত, গৃহিণী আনাগোনা ও ফরমাস করিতে ব্যস্ত, ছোটছোট ছেলে মেয়েরা "পিসিমা আসিতেছেন" বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল, "দিদিমণি আসছেন গো।"

চাকর দাসী ছেলে মেয়ে গৃহিণী সকলেই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—লজ্জাবতীও তাড়াতাড়ি হাতাবেড়ি ফেলিয়া যাতৃদেবীর তিরস্কার না মানিয়া দ্বারদেশে আসিয়া উঁকি মারিল। রন্ধন গৃহের সম্মুখেই অন্তঃপুরের উঠান। একখানি বস্ত্রাবৃত পালকি,—অগ্রপশ্চাতে দুইজন সুসজ্জিত দ্বারবান এবং উভয় পার্শ্বে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণহার বিভূষিতা দুই দাসী, এই উঠানে আসিয়া দেখা দিল। এই রাজসজ্জা দেখিয়া লজ্জাবতীর স্ফীত হৃদয় সহসা দমিয়া গেল,—ধনীর নিকট দরিদ্র অনুগ্রহের পাত্র, তাহাদের মধ্যে কি সখ্যতা-সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মিতে পারে?

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাহার এ ভাবনা দূর হইল ; এই আড়ম্বরের মধ্যে যখন সামান্য সাজে, সামান্য বেশে এক হাস্যময়ী প্রফুল্লমুখী অসামান্যা রমণী আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহার হৃদয় আবার উত্তাল আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মা ফুলকুমারীর হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন, লজ্জাবতী তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া আবার রান্না ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই খানিকটা হলুদ লইয়া বড় বৌয়ের পৃষ্ঠ-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিল, বড়বৌ রাগিয়া বলিলেন, "ও আবার কি সোহাগীপণা!" সে হাসিয়া অস্থির হইল। বড় বৌয়ের রাগ তাহাতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল ; তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কাজের সময় ওসব ন্যাকরামি ভাল লাগে না—কি হাসিই পেয়েছ!" ছোট বৌ বুঝিল, কাজটা ভাল করিতেছে না। তবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, বড়বৌ আবার বলিলেন, "ভ্যালা আদুরেপণা শিখেছিলি। আদুরেগিরি ফলাতে হয় বাপের

বাড়ী গিয়ে ফলাস ; আমাদের ওসব ভাল লাগে না"—এই কড়া কথায় তাহার অন্তর বিদ্ধ হইল, নয়ন সজল হইয়া উঠিল, কিন্তু তবুও সে হাসিতে লাগিল। অনেক দিনের পর তাহার স্বাভাবিক শিশু-সুলভ চপলতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

আর লুকাইয়া এক তরফা দেখা নহে—এবার চোখে চোখে মিলন। বধূরা অন্ন ব্যঞ্জন, ক্ষীর নবনী, দধি দুগ্ধ ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা কন্যাকে ভোজন-স্থানে লইয়া আসিলেন। আহারের সরঞ্জাম দেখিয়া ফুলকুমারী বড়বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একি করেছিস লো, এত কেন! আমি কি গুরুঠাকরুণ হয়ে এসেছি নাকি?" বড় বৌ অর্দ্ধ ঘোম্‌টার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল, "তা নইলে এতদিন পরে বাপের বাড়ী আসিস? এখন বস, রান্নার যেন নিন্দে না হয়, পাতে পড়ে থাকিলেই বুঝ্‌ব রুচলো না।"

· "মরে যাই, আমি কি রাক্ষস নাকি? ও কে, বড়বৌ?"

মা তাহার উত্তর-স্বরূপ বলিলেন—"তা জানিসনে ফুলি, ও যে ছোট বৌ, কি করেই বা জান্‌বি, শ্বশুর পোড়ারমুখো হেমের বিয়েতেও ত একবার পাঠালে না, এত করে বল্লুম—তা একবেলাও না। এমন জানলে কি ওমন ঘরে বিয়ে দিই!"

ফুলকুমারী বলিল, "ঐ ছোট বৌ!"

ফুলকুমারী ইত্যবসরে ছোট বৌয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "এই ছোট বৌ! দেখি লো দেখি, মুখ খোল", বলিতে বলিতে সে তাহার ঘোমটা উঠাইল, ছোট বৌ একটু হাসিয়া আবার ঘোমটা টানিয়া দিল। ফুল বলিল, "ওমা বেশ বৌ হয়েছে, দাদা দেখছি ছবির মত বৌ করেছে!" ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল এই কথা বলিল, ছোটবৌ হাসিয়া মুখ হেঁট করিয়া ঘিয়ের বাটি ভাতের থালার কাছে আর একটু সরাইয়া রাখিল।

৩

কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিকালে লজ্জাবতী উপরে উঠিতেছে, ফুলকুমারীকে আর একবার দেখিবার জন্য সে তৃষিত, ফুলের সেই প্রফুল্ল ভাব, সহাস্য দৃষ্টি, সাদর মধুর কথা, সমস্তক্ষণ তাহার মনে তরঙ্গ তুলিয়াছে,—লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় সলজ্জ আগ্রহে অধরের মৃদু হাসি চাপিয়া অধীর চরণ ধীরে ধীরে বিক্ষেপ করিয়া দোতালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় পুটুরাণী আসিয়া বলিল—"মা, আমার ফুল কাঁটা ফিতে দে, পিশিমা চুল বেঁধে দেবে।" লজ্জাবতী সহসা স্বপ্নরাজ্য হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"সে কি, তোর ফুল কাঁটা ত আমি রাখিনি।" মেয়ে বল্লিল—"রাখিসনি কি! সেই যখন তুই কুটনো কুটছিলি, আমি তোর কাছে রেখে এলুম।" মা বলিলেন—"কই আমি ত তা জানিনে ; আমাকে ত বলে আসিসনি।" সে বলিয়া আসে নাই সেটা ঠিক। কিন্তু মা যে তুলিয়া রাখেন নাই সেটা ত আর তাহার দোষ নহে। মেয়ে মুখ ঝামটা দিয়া বলিল—"কাছে রেখে এলুম—তা আর বলে আসব কি। শীঘ্র আমার দড়ি কাঁটা দে।" লজ্জাবতী নিজের দোষটাই বুঝিয়া তাহাকে আর কিছু না বলিয়া গহনা খুঁজিতে

আবার নীচে নামিলেন,—আর ফুলকুমারীকে দেখিতে যাওয়া হইল না।

এদিকে দাসী আসিয়া গৃহিণীকে বলিল, "দিদিমণির বিছানা ত করে এনু—তা গায়ের নেপ কি দেব?—একটা দাও।" ফুলকুমারী তখন বড় বৌয়ের ঘরে তাহার সহিত গল্প করিতেছিল, গৃহিণী একাকী ছিলেন, দাসীর কথায় তিনি তাঁহার তলপী তলপা খুঁজিয়া একটিও ভাল লেপ পাইলেন না,—সবই ছেঁড়া ছেঁড়া, পাতা চলে, কিন্তু বড়মানুষের বৌকে গায়ে দিতে দেওয়া যায় না। গৃহিণী ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—তবে বিপদে পড়িলে যাঁহার বুদ্ধি না যোগায় তিনি স্ত্রীলোকই নহেন; মুহূর্ত্তের মধ্যেই উপায় আবিষ্কৃত হইল, দাসীকে বলিলেন, "দ্যাখ, আজ ত হেম পশ্চিম যাবে, ছোট বৌয়ের গায়ের লেপটা ফুলির বিছানায় দিগে, আর এর একটা আমি বেছে রাখি; এসে তখন ছোট বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাস।" দাসী তখন চলিয়া গেল, তাহার খানিক পরে আসিয়া বলিল—"এমন অগোছাল বৌও দেখিনি! পুটুরাণী গহনা রাখতে দিয়েছিল—হারিয়ে, খুঁজতে নেগেছে, তাই তাকে আর বলতে পেনু না, আপনিই নেপটা নিয়ে দিদিমণির বিছানা করে এনু।"

"গহনা হারিয়েছে! কি গহনা?"

"মাথার ফুল গো, ফুল! দেখ মা, আমাদের দায়ে মজিও না? তোমরা সব হারাবে; আর আমরা গরীব মানুষ মারা যাব,—"

গৃহিণী এই খবরে রাগিয়া আগুন হইলেন, আজ আনন্দের দিন, মেয়ে ঘরে আসিয়াছে—আর কি না পোড়ারমুখী বৌ গহনা হারাইয়া অলক্ষণ করিয়া বসিল। তিনি প্রথমে বড় বৌয়ের ঘরে আসিয়া খবর দিলেন—"শুনেছিস? ছোট বৌ গহনা হারিয়েছে! এই সেদিন চেলির কাপড়খানা হারালে, আবার আজ এই কীর্ত্তি! এমন উড়নচণ্ডী বৌ—"

ফুল বলিল—"মা, তা দৈবাৎ হারিয়েছে, ও ত আর ইচ্ছে করে হারায়নি"—ফুলকে তাহার পক্ষ লইতে দেখিয়া মায়ের রাগ আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তুমি ত বাছা বৌয়ের গুণ জান না, তাই ওকথা বলছ, দিন কতক থাক, তখন বুঝবে, দেখতে মুখখানি অমন—পেটে পেটে দুষ্টুমি, ইচ্ছে করেই হারিয়েছে! আর গহনা ত ওর যাবে না, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! তুই আজ বাড়ী এসেছিস, তাই ইচ্ছে করেই অলক্ষণ করছে।" বড় বৌ কোন কথা কহিল না; তিন জনে মিলিয়া ছোট বৌয়ের সন্ধানে চলিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল না, ছোট বৌ নীচের সব ঘর খুঁজিয়া উপরে উঠিতেছিল, বারান্দায় দাঁড়াইয়াই শাশুড়ির তীব্রস্বর তাহার কানে পৌছিল—"কি গহনা আবার হারিয়েছিস! (যেন চিরকাল ধরিয়া সে গহনাই হারাইয়া আসিতেছে) বাড়ীতে আর লক্ষ্মী রইলো না! পরের বাড়ী মেয়ে পাঠানই বা যাবে কি করে? শ্বশুররা যখন বলবে আমাদের গহনা কি হোল, তখন লজ্জায় না মুখ কালি হয়ে যাবে!"

লজ্জাবতী আস্তে আস্তে বলিল, "শ্বশুর বাড়ীর গহনা নয়; আমার বাবা আমাকে যে ফুল দিয়েছিলেন তাই পরিয়ে দিয়েছিলুম—"

"বটে, তোমার বাবা তোমায় যা দিয়েছেল তাই হারিয়েছ! তা আমরা কথা কয়েছি ঘাট হয়েছে। দোষ করলেই কথা কইতে হয়—তা কথা কইলেই অমনি বাপের বাড়ীর তুলনা। দেখলি বাছা ফুলি, দেখ—একবার মায়ের অপমানটা দেখ—"

বড় বৌ বলিল, "হলই বা বাপের বাড়ীর গহনা, জিনিষটা ত হারাল।"

শাশুড়ি বলিলেন—"হারাক—হারাক—সব যাক, আমাদের কথা কয়ে কাজ কি? বলব কি হরিমোহন ঘোষের মেয়ে, নইলে এমন বৌ নিয়ে ঘর করতে পারত না, আর বাছা। তোরা কেউ কথা কসনে,—"

শাশুড়ি চলিয়া গেলেন, ঘরে গিয়া সেই কথা লইয়াই গুলজার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবু সেদিন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন ; সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া মায়ের নিকট বিদায় লইতে গিয়া সেই সকল কথা তাঁহার কানে উঠিল, মা নানা কথার পর বলিলেন —"বাছা, তোদের ত এখন ঘর সংসার হয়েছে, আমাকে ত আর দরকার নেই—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এখানে থেকে এসব অপমান আমার আর সয় না!" ছোট বাবু ছোট বৌয়ের ব্যবহার শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, গোলযোগের আর ছাই কি দিন ছিল না, আজ বিদেশ যাইবার দিনে যত হেঙ্গাম? তিনি ত গৃহে গিয়াই ছোট বৌকে বকিতে লাগিলেন, কেবল বকিলেও রক্ষা ছিল,—বলিলেন, "আমি আর এরূপ গোলযোগ সহিতে পারি না, এই চলিলাম, আর ফিরিব না!"

স্বামীকে যদি লজ্জাবতী সব খুলিয়া বলে ত এতটা কিছুই হয় না ; কিন্তু স্বামীর কঠোর বাক্যে তাহার হৃদয় এত কাতর হইয়া উঠিল যে তাহার মুখ দিয়া একটি কথা ফুটিল না! বিদায়ের দিনে এইরূপ স্নেহ সম্ভাষণ জানাইয়া যখন চলিয়া গেলেন, সে বিছানায় পড়িয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কেবল কাঁদিতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহার উপায় কি! যেরূপ স্বভাব লইয়া সে জন্মিয়াছে!

৪

চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়াছে, এ বাড়ী তাহার আপনার বাড়ী হইলেও তাই তাহার চোখে ইহার সমস্তই নূতন লাগিতেছে। মায়ের সে শ্রী নাই, তিনি এখন বৃদ্ধা, বালিকা বড় বৌ এখন গৃহিণী, দাদারা সব বড় বড়, ঘরে ঘরে বালক বালিকা সকলি তাহার কাছে নূতন,—সর্ব্বাপেক্ষা নূতন, লজ্জাবতী, এবং তাহার প্রতি বাড়ীর ব্যবহার! সে যেন ছাই ফেলিতে ভাঙ্গাকুলা, তাহাকে যা বকেন, মা বকেন, স্বামী বকেন, মেয়ে পর্য্যন্ত—এমন কি মাসীরা পর্য্যন্ত বকে, তাহার কি দোষ, কোন দোষ আছে কি না ইহা বিচার করিয়া দেখিবারও কেহ আবশ্যক বিবেচনা করে না,—লজ্জবতীও কখনো নিজের দোষের প্রতিবাদ করে না।

ফুলকুমারী অবাক হইয়া গেল—তাহার হৃদয় মমতার্দ্র হইয়া পড়িল। সে ছোট বৌয়ের পক্ষ লইয়া মাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু দেখিল বৃথা চেষ্টা, [মা] তাহাতে আরো বেশী রাগিয়া যান। এদিকে নিষ্ফল হইয়া সে সন্ধ্যার পর লজ্জাবতীর কক্ষে গমন করিল, যদি কোনরূপে তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে। গৃহ দ্বারে আসিবা মাত্র দাদার রুষ্টস্বর তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; ফুলকুমারী ভিতরে না গিয়া সেইখানেই দাঁড়াইল। তখনি প্রায় দাদাকে গৃহের বাহিরে দেখিয়া বলিল, "দাদা, বৌকে বকছ, আমি ত বৌয়ের কোন দোষ দেখছিনে"—দাদা সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তবে দোষ কার?"

"দোষ যদি ধরিতে হয় ত পুটুরাণীর, নহিলে কাহারো দোষ নেই। সে যদি বৌকে গহনার কথা বলিয়া আসিত তাহা হইলে ত আর চুরী যায় না।"

"কিন্তু মায়ের মুখের উপর অমন চোপা করার কি আবশ্যক ছিল?"

ফুলকুমারী একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দাদা, সেটা ঠিক চোপা নয়, মা যদি বুঝে দেখতেন, তাহলে তাতে রাগ করতে পারতেন না, তবে এখন বুড় হয়েছেন, এক বুঝতে আর বুঝে বসেন—কিন্তু তাই বলে তুমিও দাদা ভুল বুঝো না। কি হয়েছে বলি শোন।" কি কথার পর লজ্জাবতী মাকে কি বলিয়াছিল, ফুলকুমারী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি ওর দোষ পেলে?" দাদা বলিলেন, "না।"

ফুল। তবে ভেবে দেখ দেখি, বিনা দোষে তুমি পর্য্যন্ত ওরূপ করে বকলে ওর কি কষ্ট হয়! বিশেষ আজ বিদেশে যাবার দিন ওকে এরূপ করে বকে যাচ্ছ, তোমার একটু মায়া করে না!

দাদা আর কিছু না বলিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন ; শয্যায় আসিয়া দেখিলেন লজ্জাবতী কাঁদিতেছে, নিকটে বসিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "লজ্জাবতী, তুই কি চিরকাল লজ্জাবতী থাকবি? এতক্ষণ সব খুলে বল্লেই ত আমি বুঝতুম তোর দোষ নেই, যা হয়েছে হয়েছে আর কখনও তোকে বক্‌ব না ; আমায় মাপ কর।" লজ্জাবতী গভীর সুখে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিল।

৫

স্বামী চলিয়া গিয়াছেন—রাত্রি গভীর, চারিদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু লজ্জাবতীর নিদ্রা আসিতেছে না। গভীর কষ্টের পর স্বামীর প্রেমাদর পাইয়া কৃপণের ন্যায় সে তাহা এখনো আস্তে আস্তে উপভোগ করিতেছে। এক এক বার তাহার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, স্বামী সব কথা কি করিয়া জানিলেন,—কে বলিল? সহসা সে চমকিয়া উঠিল, ফুলকুমারী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিল, "বৌ, এখনো বিছানায় যাসনি?" স্বামীকে বহির্বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া আসিয়া সেই যে সে নীচে শতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়াছে—আর ওঠে নাই। ফুলকুমারীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"ঠাকুরঝি, তুমি এখনো শোওনি?" ঠাকুরঝি বলিলেন—"আমি শুয়েছিলুম, বিছানা থেকে উঠে তোকে দেখতে এলুম, দাঁড়া, প্রদীপটা কাছে আনি, ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছে না।" ফুলকুমারী দীপটা নিকটে আনিয়া ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া নিকটে বসিল, বসিয়া বৌয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "তোর না ভাই বার বছর বিয়ে হয়েছে? আচ্ছা, তখন কি তুই এর চেয়েও ছোট ছিলি। তোকে এখনো এমন ছোট দেখতে, মনে হয় যেন তুই কনে বৌটি!"—বৌ একটু হাসিল —ননদ তাহার হাতটি হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল, "তুই ভাই অমন কেন?"

"কেমন?"

"যেখানে তোর দোষ নেই, সেখানেও কথা কোসনে?"

"কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টো হয়, কে জানে আমি কি রকম করে বলি, সবাই ভুল বোঝে?"

"দাদাও? কেন আমি ত দাদাকে বুঝিয়ে বলতে তিনি সব বুঝিলেন।"

ফুলকুমারীই তাহার পক্ষ হইয়া স্বামীকে সব বলিয়াছে, তাহার জন্যই সে স্বামীর আদর পাইয়াছে, কৃতজ্ঞতায় লজ্জাবতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তিনি কিছু বল্লে আমার বড় কান্না পায়।"

"তাইতে কোন কথা ফুটে বলা যায় না? বুঝেছি!"

"না, তা ঠিক না, তিনি বিরক্ত হ'য়ে তারপর আর জিজ্ঞাসা করেন না"—

"হায়রে আমার অভিমানিনি! কে জানে ভাই, তোকে সবাই বকে কি করে! কি করে তোর উপর রাগ করে!"

"দিন কতক পরে তুমিও বক্‌বে! দেখবে আমার উপর রাগ না করে লোকে থাকতে পারে না।"

"কক্ষনো না।"

"যদি দোষ করি?"

"তাহলেও না। তোকে যে সকলেই বকে, আমি কোন্ প্রাণে বক্‌ব?" লজ্জাবতী এই কথায় তাহার হাত দুটি টিপিয়া বলিল—"তাও নাকি কখন হয়।" খানিক পরে ফুলকুমারী চলিয়া গেলেন, বৌ বিছানায় গেল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা, স্বামীর আদর, ফুলকুমারীর সস্নেহ বাক্য, তাহার অকৃত্রিম সখিত্বভাব তাহার মস্তিষ্কে আলোড়িত করিতে লাগিল ; সুখের চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া সমস্ত রাত সে জাগিয়া কাটাইল।

ভোর বেলা উঠিতে গিয়া দেখিল মাথা বড় ঘুরিতেছে—আবার সে শুইয়া পড়িল। ফুলকুমারী সকালে গৃহে আসিয়া বৌকে তখনও শয্যায় দেখিয়া মশারীর দরজাটা একটু খুলিয়া যখন উঁকি মারিল, লজ্জাবতী তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, লজ্জাবতীকে নিতান্ত বিবর্ণ, ক্লান্ত দেখিয়া ফুলকুমারী বলিল, "বৌ, তোর কি অসুখ করেছে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি বলিল, "না।"

ফুলকুমারী বলিল—"কিন্তু তুই যে কাঁপছিস্, শীত করছে, গায়ে কাপড় দে না!"

লজ্জাবতী বিছানার এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "আমার নেপটা কই দেখছিনে ত"—গোলেমালে শাশুড়ির দত্ত লেপটি দাসী তাহার জন্য আনিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

"ওমা! সারারাত লেপ না গায়ে দিয়ে অমনি কাটিয়েছিস্! কেন, তোর লেপ কোথায় গেল?"

"জানিনে, ঝি বুঝি শুকতে দিয়েছিল, তুলে দিতে ভুলে গেছে"—বলিতে বলিতে লজ্জাবতী বিছানার বাহির হইল। ফুলকুমারী তাহার মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "সত্যি বৌ, তুই এখন উঠিসনে, শুয়ে থাক, তোর কপালটা যেন গরম গরম মনে হচ্ছে।" বৌ হাসিয়া বলিল, "এখন শুয়ে থাকলে কি চলে? ও কিছু না, একটু মাথা ধরেছে, স্নান করলেই সেরে যাবে এখন।"

"কেন, চলবে না কেন? আজ বুঝি তোর রাঁধার পালা—তা অসুখ করলেও পালা রাখতে হবে নাকি? আমি রাঁধব এখন।"

লজ্জাবতী জিভ কাটিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি—ক্ষেপেছ নাকি? সত্যি আমার কিছু

হয়নি।" এমন আজগুবি অসম্ভব প্রস্তাব সে যেন জীবনে কখনো শুনে নাই। বলিতে বলিতে সে খাটে বসিয়া পড়িল। ফুল বলিল, "আমার মাথা খাস, তুই শো,—", এমন সময়ে দাসী একটা লেপ আনিয়া বিছানায় ফেলিয়া বলিল, "এই তোমার নেপ রইলো গো,—কাল আনতে ভুলে গেছনু—তা উনুন যে বয়ে যাচ্ছে, আজ কি আর রান্নাবান্না করতে হবে না?"

লজ্জাবতী বলিল, "চল, যাচ্ছি"।

দাসী গেল, ফুল বলিল—"আমার কথা রাখবিনে, তবু রাঁধতে যাবি।"

বৌ কাতর হইয়া বলিল—"ঠাকুরঝি, তুমি রাঁধবে, সে কি করে হবে?"

"কেন তাতে কি হয়! তবে আমি তোর এত পর,—বেশ।"—এই কথা বলিয়া ফুল রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, লজ্জা বলিল, "শোন ঠাকুরঝি—না, তা নয়! কিন্তু মা তাহলে রাগ করবেন, তিনি ভাববেন—"

"তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া সে আমার!"

লজ্জাবতী একটু ভাবিল—ভাবিয়া সেই প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতাটা মনে মনে কল্পনা করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "ছি ছি, তাও কি হয়! না ঠাকুরঝি, সে কোন মতে হবে না!"

"কোন মতে হবে না! বেশ তুই রাঁধগে, আমি কিন্তু সে রান্না খাব না।" ফুল রুষ্ট স্বরে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল,—লজ্জাবতী ডাকিল—"ঠাকুরঝি!" কিন্তু ফুল আর ফিরিল না। লজ্জাবতী আর পারিল না—সে তাহার ঘূর্ণ্যমান উত্তেজিত উষ্ণ মস্তক লইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল! এখনো একদিন যায় নাই, ইহার মধ্যে ঠাকুরঝিও তাহার উপর রাগ করিল! সে বুঝিল এ রাগ ঠাকুরঝির স্নেহ হইতেই প্রসূত—সেই জন্যই তাহাতে তাহার হৃদয় অধিক বিদ্ধ হইল, তাই অভিমানের দুঃখে তাহার ক্রন্দন উথলিয়া উঠিল, সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে কহিল, ঠাকুরঝিও আমার উপর রাগ করিল—আমার মরণই ভাল!

৬

লজ্জাবতী খানিক পরে নীচে রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিল ফুল উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বড়বৌকে রান্না সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছে—বড় বৌ কুটনা কুটিতে কুটিতে হাসিয়া উত্তর করিতেছেন। ফুলের বাঁহাতি উনুনে ডালের হাঁড়ি—ডানদিকে কড়ায় তেল ফুটিতেছে—সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বৌ লো! তেল ত চড়বড় করে এলো, এখন তরকারীগুলো দিই?" বউ হাসিয়া বলিতেছে, "বলি তোমার অমন কাজ না করলেই কি নয়! চড়বড়ানি আগে থামুক, তখন দেবে—", ফুল বলিল, "ঐ লো বড় বৌ, ডাল উথলে উঠলো। কি করি আয় আয়—"

লজ্জাবতী বলিল, "এই যে আমি আসছি ঠাকুরঝি।" সে আসিতে আসিতে ডাল উথলিয়া খানিকটা ফুলের পায়ে পড়িয়া গেল। পা পুড়িল ফুলের, তাহার জ্বালা ভোগ করিল যেন লজ্জাবতী। এই ঘটনায় এমনি সে ব্যথিত হইয়া পড়িল! সে শুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি তাহার শুশ্রূষা করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শাশুড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা তাই ত। সত্যিই ফুলকুমারী রান্‌ছে

—আমার বিশ্বাস হয়নি! আবার পা পুড়িয়ে ফেলেছে! বলি সব রাজার ঝিরা! ননদ দুদিন মাত্র থাকতে এসেছে, তাকে না পুড়িয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি হল না—", বড় বৌ বলিল, "আমি ত সেই অবধি বারণ করছি, তা ঠাকুরঝি ত শোনে না, কি করব? ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে, না পারে—আমি রাঁধছি, তোর কেন বাবু আসা।"

শাশুড়ি। ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে তাই উনি রাঁধতে এয়েছেন। দেখ্ ফুলি, আমি আজ মাথামুড় খুঁড়ে মরব! এদিকে আয় বলছি, মাইরি—এমন বৌও তো আমি কখনও দেখিনি!

ফুল বড় বৌয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "না মা, আমি সখ্ করে রান্‌তে এসেছি, আমি এই ডাল আর তরকারীটা রেঁধে যাচ্ছি—তুমি যাও।" মা বলিলেন, "তুমি রাঁধবে, আর বৌরা বসে থাকবে? আয় বলছি, নইলে আমি রক্ষে রাখব না" —বলিয়া হেঁসেলে উঠিয়া ফুলের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া উপরে টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং সমস্ত বেলা ধরিয়া এমন চোখে চোখে রাখিয়া দিলেন যে ফুলের আর লুকাইয়াও এমুখো হইবার যো রহিল না।

৭

লজ্জাবতী তাহার অসুখ শরীর লইয়া নিস্তব্ধে রাঁধিল, কিন্তু রান্নার পর গৃহে আসিয়া সেই যে শুইয়া পড়িল, তাহার আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

বড়বৌ ফুলের ভাত বাড়িয়া উপরে লইয়া আসিল। পুটুরাণী পিসিমাকে ডাকিল, "পিসিমা ভাত এসেছে, খাওগে গো।" মা মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আহার স্থানে আসিয়া ছোটবৌকে না দেখিয়া বলিলেন, "রাজার ঝির বুঝি আর এদিকে আসতে নেই!" পুটুরাণী বলিল, "মায়ের বড় অসুখ করেছে, সে শুয়ে পড়েছে।"

শাশুড়ি বলিলেন, "সব ভাণ, কাজের নামে অমনি অসুখ!"

তাহার অসুখের কথা শুনিয়া ফুলের বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল—বুঝিল বিশেষ অসুখ না হইলে সে এখানে আসিত। সে বলিল, "না, মা! সকাল থেকে তার অসুখ করেছে, রেঁধে ভাল করেনি, একটা বাড়াবাড়ি না হয়।" মা বলিলেন—"অমনি বাড়াবাড়ি হোল! একটু বুঝি মাথা ধরেছে, আর পড়ে আছে, গেরস্থের বাড়ী অত বড়মানষী করলে চলে না।"

ফুল আর কিছু না বলিয়া আহারের পর তাহার গৃহে গমন করিল, মাও তাহার সঙ্গ লইলেন। লজ্জাবতীকে দেখিয়া শাশুড়ির জ্ঞান জন্মিল, সে সত্যই পীড়িত। ফুল তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "উঃ! আগুন যে! বৌ শীতে কাঁপছে, আবার লেপটা গেল কোথা? কাল ত বৌয়ের বিছানায় মোটেই লেপ ছিল না—সারা রাত শীতে সারা হয়ে আসলে এ অসুখটা হয়েছে!"

শাশুড়ি বলিলেন, "বড় মানষের ঝি! একটা লেপ দিয়েছিলুম, তা ফেরত দেওয়া হয়েছে! গেরস্তঘর, একদিন কি নিজের ভাল লেপটি নইলে চলে না! না হয় ননদকেই গায়ে দিতে দিয়েছিলুম—তার জন্যে একেবারে অসুখ বাধান!"

লজ্জাবতী জানিতই না যে শাশুড়ি তাহার লেপ ফুলকে দিয়া তাহার পরিবর্তে অন্য

লেপ দিয়াছেন। সকালে রন্ধন-গৃহে যাইবার সময় সে বিছানা তুলিতে গিয়া দেখিল, লেপটা তাহার নাই, ভাবিল দাসী শাশুড়ির লেপ তাহাকে বদল করিয়া দিয়াছে—তাই পুটুরাণীকে দিয়া লেপটা ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফুল বলিল, "সে যা হোক, এখন একটা লেপ পাঠিয়ে দেও দেখি!" শাশুড়ি চলিয়া গেলেন। ফুল লজ্জার সেই করুণ কাতর মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন আমি জোর করে রাঁধলুম না, তাহলে ত তোর এই অসুখ হোত না!"

লজ্জাবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সে বলিল, "না, আমার রেঁধে অসুখ করেনি। বল দিদি, তোমার আর রাগ নেই—তুমিও ভাই আমার উপর রাগ করলে!" ফুলকুমারী কাঁদিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "আর আমি কখনো রাগ করব না—বল ভাই, তুই কিছু মনে করবি নে!" লজ্জবতী কোন কথা কহিল না, তাহার মাথা ফুলের বুকে রাখিয়া গভীর প্রশান্ত সুখে সে কাঁদিতে লাগিল। প্রাণে প্রাণে এক হইয়া, বুকে বুকে রাখিয়া দুজনে অশ্রুজলে অশ্রুজল মিলাইল। বুঝি বা লজ্জাবতীর কাঁদিবার সাধ মিটিল!

ইহার পর আর সে কাঁদিল না—স্বামী যে কথা দিয়াছিলেন, ফুল যে কথা দিয়াছিল, তাহা ঠিক রহিল—আর কখনো লজ্জাবতীকে তাহাদের বকিতে হইল না!—কয়েক দিনের মধ্যেই লজ্জাবতী রুগ্ন-শয্যা হইতে একবারে চিতা-শয্যায় শয়ন করিল। শাশুড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আহা গেল গো—নিজের দোষে প্রাণটা খোয়ালে! রাগ করে লেপটা গায়ে দিলে না গা! রাগ করে বল্লে না যে অসুখ করেছিল—।" দাসী চাকর, যা, সকলেই এই এক ধুয়া ধরিয়া কাঁদিলেন,—কেবল একটি গভীর শোকক্লিষ্ট, অনুতপ্ত হৃদয় তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া নির্জ্জনে মর্ম্মান্তিক দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া মনে মনে কহিল, —হায় হায়, কি করিলাম! কেন রাগ করিয়া কথা কহিলাম! বুঝি সে ঐ অভিমানেই গেল—বুঝি আমিই তাকে মারিলাম! একবার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া এস দিদি—একবার প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া লই—আদরের ভিখারিণি, তোমাকে কেহ আদর করে নাই, আমিও করিলাম না; জীবনে এ দুঃখ শেলের মত আমার মর্ম্মে বিঁধিয়া থাকিবে!

ভারতী ও বালক, আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯৮

গহনা

বিহারীলাল সেন বংশে সম্ভ্রান্ত, স্বভাবে গর্ব্বিত, কিন্তু অবস্থার দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ব্যবসায় ধরিতে হইয়াছে কেরাণীগিরি অর্থাৎ খোসামুদি। এজন্য হাড়ে হাড়ে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে তাঁহার একমাত্র পুত্রের যাহাতে এরূপ দুর্দ্দশা না ভোগ করিতে হয়, যাহাতে সে মানুষের মত মানুষ হইতে পারে, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দিতে তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। টাকা কড়ি যাহা কিছু জমাইয়াছিলেন, এই দায়ে সকলি নিঃশেষ হইয়াছে, অথচ এখনো পুত্রকে আরো হাজার টাকা না পাঠাইলে নয়; তাহার পর সে পাশ হয় ত সকল কষ্টের সার্থক, নহিলে ভগবান যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন! বিহারীবাবু কর্জ্জের আশায় কদিন ধরিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের বাড়ী হাঁটিতেছেন, ৫০০শ টাকা কোন রকমে জুটিয়াছে, আর ৫০০শ কোথায় পান? পৈত্রিক সম্পত্তি বসতবাড়ী তাহা পূর্ব্বেই বাঁধা পড়িয়াছে, গহনাপত্র যাহা ছিল তাহাও সব গিয়াছে, এ অবস্থায় ৫০০শ পাইয়াছেন এই ঢের, আর ৫০০শ এখন মেলে কি করিয়া? বিহারীবাবু নিরাশ হইয়া রাত্রি নয়টার সময় বাড়ি ফিরিয়াছেন, গৃহিণী বলিলেন—"ওগো, হেমার জ্বর ত কই সারছে না; একবার ডাক্তার ডাকাও।"

কর্ত্তা বলিলেন—"একোনাইট দিয়েছিলে, সামান্য জ্বরে আর ডাক্তার ডেকে কি হবে? আরো দু চার দিন দেখা যাক।"

আসল কথা ডাক্তারের পয়সার অনাটন; কিন্তু স্ত্রীর সাক্ষাতেও সে দুঃখের কথা ফুটিয়া বলিতে জিহ্বা সরে না! স্ত্রী মনে মনে ইহা বুঝিলেন—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটু পরে বলিলেন—"মাণিকের চিঠি পেয়েছি, ৫০০শ টাকা পাঠিয়েছে।" এই বলিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠিখানি খুলিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। বিহারীবাবু পড়িলেন।—

"বহব প্রণামা নিবেদনঞ্চ—

দিদি—বুড় বয়সে দেখিতেছি তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। যদি টাকারি সঙ্গতি নাই, পরের ভিক্ষার উপর নির্ভর, তাহা হইলে ছেলেকে যে বিলাত পাঠান কেন তাহা ত বুঝিতে পারি না! আমার নিজের স্ত্রী পুত্র আছে, নানারকম খরচপত্র আছে, তার উপর তোমাদের খরচও চালান আমার সাধ্য নহে, আমি বলিয়া খালাস। তবে সেন মহাশয় আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন—তাঁহার ঋণ আমার পরিশোধ করিতে হয়। এই সঙ্গে সেই জন্য ৫০০শ টাকা পাঠাইয়া দিতেছি। ইহার বেশী পাঠাইতে আমি বাধ্যও নহি, আমার ক্ষমতাও নাই, পারিবও না। অতএব আমাকে আর রোজ রোজ টাকার জন্য লিখিয়া বিরক্ত করিও না। সেবক শ্রীমাণিকলাল দাস।"

মাণিক গৃহিণীর ছোট ভাই, বিহারীবাবু তাহাকে সন্তানের ন্যায় নিজগৃহে লালনপালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, বিবাহ দিয়াছেন, এখন বৎসর কয়েক মাত্র সে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া কর্ম্মস্থলে গিয়াছে। বিহারীবাবুর এই কষ্টের অবস্থায় আপনা হইতে সে সাহায্যের নামও করে নাই, তাঁহারাও ইহার আগে আর তাহাকে কিছু

বলেন নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এবার গৃহিণী ভ্রাতার নিকট ১০০০ টাকা কর্জ্জ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

চিঠি পড়িয়া বিহারীবাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মর্ম্মে মর্ম্মে অপমানিত জ্ঞান করিলেন। এ কেবল তাঁহার অপমান নহে—তাঁহার স্ত্রীর অপমান, তাঁহাদের আজীবন স্নেহের অপমান। বিহারীবাবুর গর্ব্বের অনেক খর্ব্ব হইয়াছে, তিনি ঢের সহিয়াছেন, এখনো সহিতে প্রস্তুত, কিন্তু আত্মীয়তার স্থলে, ভালবাসার স্থলে এরূপ অবজ্ঞা, এরূপ অপমান এখনো তিনি অবাধে গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "টাকা ফিরাইয়া দাও, আমি চাহি না।" গৃহিণী বলিলেন,—"সেও কি হয়? ছেলেকে এতদিন টাকা পাঠিয়ে আর একটুর জন্য সব মাটি করবে; না হয় দুট কথা বলেছে, অসময় হলে সব সইতে হয়। এ মেলে ত টাকা পাঠাতেই হবে।"

বিহারীবাবু বুঝিলেন, কথাটা ঠিক, এ অপমানও তাঁহার সহিয়া চলিতে হইবে, তিনি নিরুপায়। তিনি নীরবে এই বিষবড়ির উপাদেয়তা অনুভব করিতে লাগিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "যদি ভগবানের ইচ্ছায় পাশ হয় ত সকল দুঃখ ঘুচবে; দুদিন সয়ে যাও।"

বিহারীবাবুর নৈরাশ্যাভিভূত হৃদয় এই সুখের দিনের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিল, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া চারিদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তথাপি মাতার আশীর্ব্বাদই ফলিল, অল্পদিনের মধ্যেই খবর আসিল, নলিন সিভিল সার্ভিসে পাশ হইয়াছে। সে দিন এ বাড়ীতে কি মহানন্দ! খবর পাইয়া বিহারীবাবু স্ফীত হৃদয়ে ধরাখানাকে সরার মত জ্ঞান করিতে করিতে আফিসে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী সে পরমানন্দ নিজের মধ্যে রাখিবার স্থান না পাইয়া হাতা বেড়ি ছুড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া তাঁহার পীড়িতা কন্যার নিকট আগমন করিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা হেমপ্রভা জ্বরের ঘোরে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় শয্যালগ্ন হইয়াছিল, মা আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়িয়া বলিলেন,—"হেমা, হেমা, তোর দাদা পাশ হয়েছে।" হেমা চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময় দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিল; মা আবার বলিলেন,—"তোমার দাদা পাশ হয়েছে।" হেমপ্রভার মলিন বিবর্ণ মুখও এই কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ক্ষীণ ক্লান্ত স্বরে বলিল,—"দাদা কবে আসবে?" মা বলিলেন,—"শিগগির।" হেমপ্রভা বলিল,—"আমি ত দেখতে পাব?" আনন্দ-আগ্রহে গৃহিণী এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে হেমার অসুখ, এই কথায় আত্মস্থ হইয়া সোৎকণ্ঠস্বরে বলিলেন, "বালাই, ও কি কথা; দেখতে পাবি বইকি।"

কিন্তু এবার মাতার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইল; হেমার সহিত তাহার দাদার দেখা হইল না। এ বাড়ীর নূতন সুসংবাদ পুরাতন না হইতে হইতে হেমার ক্ষুদ্র প্রাণ অবসিত হইল। পিতা মাতা আনন্দে নিরানন্দ হইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী শোকে মুহ্যমান। বিধাতা তাঁহাকে দুইটি সন্তান দিয়াছিলেন, একটিকে আবার নিজের কাছে ডাকিয়া লইলেন, একটি মাত্র অবশিষ্ট। কন্যার শোকে বিহ্বল হইয়া পুত্রের পথের দিকে চাহিয়াই তিনি প্রাণ ধরিয়া আছেন; পুত্রই এখন তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। নলিন কবে আসিবে, তাহার বিবাহ দিবেন, বৌ হইবে, নাতিপুতি হইবে, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দের মধ্যে তিনি মরিতে পারিবেন, কন্যার শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সকল কথাই কহেন, ইহাই তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য। একদিন ভাবিনীর মা ভাবিনীকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে

আসিল, ভাবিনী হেমপ্রভার সমবয়সী, প্রায়ই তাহার সহিত খেলিতে আসিত। তাহাকে দেখিয়া গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন ; মাতা কন্যা সজলনেত্রে যখন তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, তিনি ভাবিনীকে কাছে টানিয়া বলিলেন,—"মাগো, কাকে দেখতে এলি বাছা, সে যে আমাদের ফেলে পালিয়েছে।" ভাবিনী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী সজলনেত্রে, সতৃষ্ণ আগ্রহে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিলেন,—"মা আমার, তুই আমার বুকে আয়, তোকে বুকে করে আমার প্রাণ জুড়োক। তুই আমার মেয়ে, আমার নলিনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।"

গৃহিণী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

যদিও অনেক দিন হইতে ভাবিনী ও নলিনীর মাতা পরস্পরকে বেয়ান বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এতদিন তাহা কেবল রঙ্গের সম্বোধন বা পাতান সম্পর্ক বলিয়াই গণ্য হইত। পুত্র কন্যার বিবাহের কথা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার পূর্ব্বে কেহই পাড়েন নাই। ভাবিনীর পিতা মাতা নানাস্থানে পাত্র দেখিতেছিলেন, তবে এ পর্য্যন্ত একটিও মনের মত পান নাই, তাই ভাবিনী এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছে। তাঁহারা কিছু ধনী নহেন, ইহার উপর এক বিলাত-ফেরত আত্মীয়কে দলে লইয়াছেন—এই জন্য তাঁহাদের পক্ষে সুপাত্র মেলা একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; সুতরাং বিহারীবাবুর স্ত্রী যখন নিজে হইতে ভাবিনীকে পুত্রবধূ করিতে চাহিলেন তখন তাহার পিতামাতা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ;—অমন সিবিলিয়ান জামাতা লাভ করা ত সৌভাগ্যের কথা।

বিবাহের পাকাপাকি সম্বন্ধ স্থির হইবার আগে বিহারীবাবু কেবল কুণ্ঠিতচিত্ত হইয়া একবার গৃহিণীকে বলিলেন, "ছেলে আসিয়া যদি বলে বিবাহ করিবে না? আমি বলি সে আসা পর্য্যন্ত সবুর করা যাক্!" গৃহিণী একথা একবারেই অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন, তাঁহার অমন সোনার ছেলে, সে নাকি কথার অবশ হয়! আর সবুর করিতে গেলে ওরা মেয়ে রাখিবে কেন? অমন সুন্দর মেয়ের ত আর বরের ভাবনা নাই, লাভে হতে শেষে অমন মেয়ে তাঁহাদেরি হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

যেমন হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে কর্ত্তাদেরই শেষে হার মানিতে হয়। বিশেষ এই শোকের সময় গৃহিণীর কথা অমান্য করিয়া তাঁহার ব্যথিত চিত্তে ব্যথা দিবার পরিবর্ত্তে নিজের আপত্তিটি অযুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া ত্যাগ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। ভাবিনী বাক্‌দত্তা হইয়া রহিল, কেবল তাহাই নহে, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই সে তাঁহাদের নিতান্ত আপনার হইয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী ভাবিনী ও তাহার মাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহারা আসিলে ভাবিনীকে আর দুই চারি দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিতে দেন না। যে কয়দিন সে কাছে থাকে তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া পুত্রের বিরহ, কন্যার শোক ভুলিয়া থাকেন। আর সে কাছে না থাকিলে তাহার জন্য জিনিসপত্র কিনিয়া তাহাকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবার আয়োজন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। চুড়িওয়ালা, খেলানাওয়ালা, তাঁতিনী ইহারা তাঁহার বাড়ী আসিয়া কেহ আর শূন্য-হস্তে ফেরে না। কোন একটি ভাল জিনিস দেখিলেই বউয়ের জন্য তিনি কিনিতে চান, কিনিতে না পারিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। কাহারও কোনরূপ নূতন সাজ বা নূতন গহনা কি নূতন রকম শাড়ী জামা দেখিলে তখনি গৃহিণীর মনে হয় বৌমা এইরূপ সাজিলে তাহাকে কেমন মানাইত! নিত্য নতুন ফরমাস যোগাইয়া কর্ত্তা ত আর পারিয়া উঠেন না। কাজেই অন্য পাঁচ জনকেও গৃহিণীর ফরমাসের ভার বহিতে হয়।

একদিন নবীনের মা মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোকে ভাই মেয়ে নিয়ে পরশু একবার আসতেই হবে! পরশু ভাবিনী আসবে, তোর মেয়ে যেমন জাল দিয়ে চুল বেঁধেছে, অমনি করে তার চুল বেঁধে দিবি। বুঝলিনে, ছেলে বিলেত থেকে আসবে—আমাদের পুরোনো সাজ গোজ তো চলবে না, নূতন রকম শিখে রাখি, এলে তো বেঁধে দিতে হবে।"

ছেলের জন্যে তো পরে হইবে, আমরা বুঝি আপাততঃ গৃহিণীর নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই ভাবিনীর এইরূপ নিত্য নূতন সাজের আবশ্যক।

নবীনের মা বলিলেন, "তা আসব এখন, তার আর কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা ঐ রকম জাল নিয়ে আসিস, বুঝলি, ভুলিসনে! যাবার সময় অমনি দামটা দিয়ে দেব।"

ভাবিনী বাড়ী না থাকিলে পানে ছোট এলাচ বাদাম পড়ে না, বাড়ীতে রুই মাছের মুড়ো কি টাট্‌কা ইলিস মাছ আসে না। যদিবা দাসী তাঁহার কথা অমান্য করিয়া বাড়ীতে ভাল মাছ আনিয়া ফেলে তো অমনি তাড়াতাড়ি তাহাকে তখনি ভাবিনীদের বাড়ী দৌড়িতে হয়। "ওগো মা ঠাকরুণ, একবার আজ বৌমাকে না পাঠালে চলবে না। মা রেঁদে বেড়ে বসে আছে, তাকে খাইয়ে তবে খাবে গো।" এ কথায় ভাবিনীর মা'ই বা কোন প্রাণে মেয়েকে না পাঠাইয়া থাকেন।

যত্নের বশ সকলেই—ভাবিনীও এখানে থাকিতে ভালবাসে—কেবল তাহাই নহে, সে জানে ইহাই তাহার আপনার ঘর। বউ না হইতেই গৃহিণী তাহাকে যেমন বউ ভাবেন, সেও তেমনি তাঁহাকে শাশুড়ি ভাবে। সে কিছু নিতান্ত অল্প-বয়স্কা নহে, তাহার বয়স এখন ১৩ বৎসর, তাহার সমবয়সী সখিদের সকলেরি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহার নিকট যখন স্বামীর গল্প করে, আপনাপন ভালবাসার কথা জানায়, ভাবিনী তখন নলিনকে স্মরণ করে। উপন্যাসে যখন সে নায়ক নায়িকার কথা পড়ে, তখন তাহার মনে হয় সে যেন নিজের জীবনের কথাই পড়িতেছে। বইখানি শেষ হইলে সে পুরাতন কথা ভাবিতে থাকে। ছেলেবেলায় তাহার যখন নলিনের সহিত দেখা হইত, তখন নলিন তাহার সহিত কিরূপ সস্নেহ বাক্যালাপ করিত, কিরূপ যত্নে তাহাকে ছবি দেখাইত, একদিন একটি গোলাপ ফুল আনিয়া কেমন যত্নে তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিয়াছিল, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসিতে রাস্তায় যে সমারোহ হয়, তাহা দেখিতে যেদিন ভাবিনী নলিনদের বাড়ী আসিয়াছিল, সেদিন কিরূপ আগ্রহে নলিন তাহাকে সেই সমারোহ দেখাইয়াছিল, এই সব কথা মনে করে, আর একটি অপরূপ আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আধো বাধো করিয়া অতি সসঙ্কোচে আর একটি কথা তাহার এই মনে আসে যে সেই নলিনদা তাহার স্বামী। একথা মনে করিতে নিজে নিজেই সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। সে ভাবে তিনি যখন আসিবেন আমি কি করিয়া তাঁহার কাছে যাইব। আর যদি তিনি আগেকার মত আমাকে আদর করেন? ছিঃ, সে আমার বড় লজ্জা করিবে!

আপনার লজ্জায় সে আপনি মুখ ঢাকে অথচ অতি আগ্রহে নলিনের আসিবার দিন গণনা করে।

গণনা শেষ হইল, নলিনের পরীক্ষা শেষে দুই বৎসর কাটিল। নলিন আজ গৃহে ফিরিবে, বিহারীবাবু তাঁহাকে জাহাজ হইতে আনিতে গিয়াছেন। গৃহিণী ভাবিনীর সাজ-

সজ্জা করিয়া দিয়া রান্নাঘরে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন, আর ভাবিনী একখানি আয়নার সম্মুখে ঘাড়টি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া চুল বাঁধা কেমন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে কি ভাবিয়া কে জানে মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছে, আর মাঝে মাঝে যেন পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠিতেছে। সে সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। একবার সে চমকিয়া উঠিয়া ত্রাস্তে আয়নার পশ্চাতে জানালার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া দেখিল তাহার ভয় বৃথা, কেহ কোথাও নাই। তখন নিশ্চিন্ত ভাবে জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল, জানালার সম্মুখেই মিত্রদের মাঠ, মাঠের গাছগুলি বৈকালিক সূর্য্য-কিরণে ঝক ঝক করিতেছিল, অল্প অল্প বাতাস বহিয়া ঘাস দুলিতেছিল, গাছে পাতা দুলিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল এমন সুন্দর মধুর দৃশ্য যেন আর কখনো সে দেখে নাই। রবি কিরণের মধ্যে আজ যেন কেবল পুলক কম্পনই চলিতেছে। বায়ু যেন কেবল আনন্দেরি হিল্লোল। সহসা তাহার দাদা রমাপ্রসাদ ডাকিল, "ভাবিনি, এখানে কি করছিস? তোকে সবাই ডাকছেন, নলিন এসেছে, আয়।" বালিকার ওষ্ঠাধরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভিত হইল, সে নড়িল না। রমাপ্রসাদ নিকটে আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, ভাবিনী লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সাজগোজ দেখিয়া যে দাদা হাসিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। রমাপ্রসাদ হাসিয়া সলজ্জা ভগিনীর হাত ধরিয়া মজলিসগৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই গৃহিণী বলিলেন, "চিনতে পারিস, নলিন? ছোট্টটি দেখে গিয়েছিলি, এখন দেখ কত বড় হয়ে উঠেছে।" নলিন তাহার দিকে চাহিয়া সসঙ্কোচে বলিল, "কে?"

রমাপ্রসাদ বলিল, "চিনতে পার না? ভাবিনী!"

তখন নলিন অসঙ্কোচে নিকটে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "Hello! এত বড় হয়েছে! How do you do, my pretty lass?"

ভাবিনীর যে ইংরাজী বিদ্যা বেশী ছিল তাহা নহে। নলিনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়া অবধি তাহার যদিও ইংরাজী শিখিতে চাড়ের অভাব ছিল না, কিন্তু শেখায় কে? দাদাকে অনেক ধরা পাকড়া করিয়াও তাহাকে দিয়া ফার্ষ্টবুকের অর্দ্ধেকও এখনো ভাবিনী শেষ করিয়া লইতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও সে নলিনের কথার অর্থ একরূপ বুঝিয়া লইল। How do you do চলিত কথা—pretty কথার অর্থও সে জানে, কিন্তু lass কথাটা সে ঠিক ধরিতে না পারিয়া ভাবিল নলিন pretty ass বলিয়াছেন। ভাবিনী ইংরাজী জানে না বলিয়াই যে এই উপহাস, তাহা সে বুঝিল ; বুঝিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল এবং ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া দাদার উপরই তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। তিনি যদি ইংরাজী শিখাইতেন তবে ত সে এতদিনে ইংরাজীতে পণ্ডিত হইতে পারিত। লজ্জায় সঙ্কোচে ভাবিনীর মুখে একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "বাছা, এমন সুন্দর মেয়ে বিলেতে দেখেছিস? বিয়ে করে তবে কাজের জায়গায় যাবি।"

ছেলে একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে দুই একবার কাশিল। গৃহিণী বলিলেন, "বিয়ের সবি ঠিক, কেবল দিন স্থির করে নেমন্তন্ন করে পাঠালেই হয়, আমি বলি এই রবিবারেই গায়ে হলুদ হোক।" গৃহিণী যে প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথা বলিতেছেন প্রথমবার নলিন তাহা

বুঝে নাই। এবার বুঝিয়া সহসা কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল। বিহারীবাবু ছেলের সঙ্কোচ বুঝিয়া বলিলেন, "তা এত তাড়াতাড়ি নাই হোল।" গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "তা বৈকি, সে হবে না। দেখ, বাবা, বিয়ে করেই কিন্তু নিয়ে যেতে পাবিনে। ছেলে পিলে হোক, তারা আমার কাছে থাকবে, তুই তখন বৌ নিয়ে যাস। তবে বাছা, রবিবারেই গায়ে হলুদ হোক—কি বলিস?"

নলিন কোন কথা কহিল না, কি যেন বলিতে গিয়া শুষ্ক কণ্ঠে দুই একবার কাশিল মাত্র। গৃহিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে এই রবিবারেই গায়ে হলুদের সব আয়োজন করে ফেল।"

নলিন সহসা অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে কহিল, "না, মা কিন্তু—কিন্তু—এখন থাক!" নলিনের এই সঙ্কোচ দেখিয়া রমাপ্রসাদ উপহাসচ্ছলে বলিল, "এত না, এত কিন্তু, এত সঙ্কোচ কিসের, একটা বিয়ে করে এসেছ না কি নলিনদা!" নলিনের বিবর্ণ মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "ও কি ঠাট্টা, বাছা, অমন কথা বলতে নেই! দেখ বাবা, এবার তুই এলি, এবার আমার গহনা পত্র তো সব খালাস হবে, পুরোন সাটের গহনা তাহোলে আর বৌমার জন্যে কিছুই গড়াতে হবে না। তবে আজকাল নতুন ফেসানের অনেক রকম গহনা হয়েছে, বাপেরা শুনচি তা সব দেবে। তবু আমারও তো দু একখানা তা না দিলে ভাল দেখায় না, আমি তাই কাদির মার কাছে দুশো টাকা ধার করে পালন পাতার দু গাছা বালা গড়িয়ে রেখেছি। দিব্যি হয়েছে ; আনচি, তুই একবার দেখ!" গৃহিণী হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গহনা আনিতে গেলেন, কিন্তু পুত্রের ভাব গতিক দেখিয়া বিহারীবাবু কিছু দমিয়া বলিলেন, "এখন তোমার কি বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই?"

নলিন দুই একবার কাশিয়া, দুই একবার এদিক ওদিক চাহিয়া আধো বাধো করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "না।"

রমাপ্রসাদ তখন হাসিয়া আবার আস্তে আস্তে বলিল, "নলিনদা, সত্যই বিয়ে করে এসেছ নাকি?"

নলিন তাহার গা টিপিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "For Heaven's sake, এখন থাম!" বিহারীবাবু একটু তফাতে কৌচে বসিয়াছিলেন, সে কথা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু রমাপ্রসাদ যখন এই কথার উত্তরে না থামিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তবে সত্য বিয়ে করেছ? কোথায়? কার সঙ্গে? ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে নাকি?"—তখন সহসা বিহারীবাবুর হৃৎপিণ্ডে রক্ত উছলিয়া উঠিল। তিনি নির্ব্বাক কম্পিত হৃদয়ে উত্তর অপেক্ষায় পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্তম্ভিত নীরব নলিনীমোহন কি করিতেছে না বুঝিয়া কলের পুত্তলির মত সহসা ঘাড় নাড়িল। বিহারীবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে দুই হস্তের উপর ঘূর্ণ্যমান মস্তক রক্ষা করিলেন। আনন্দ-গৃহ মুহূর্ত্তের মধ্যে শোক নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইল। গৃহিণী এই সময়ে গৃহ প্রবেশ করিয়া সহাস্য মুখে আনন্দ-উথলিতচিত্তে বালা দুই গাছি ছেলের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি বাছা, পছন্দ হয়? তুই আমার বৌয়ের হাতে পরিয়ে দে", বলিয়া ভাবিনীর উদ্দেশে চারিদিকে চাহিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ভারতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৮

যমুনা

(সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত)

১

শীতের প্রভাত, অন্ধকার কুয়াসার মাঝে মাঝে উষার আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছে, উত্তরের হিম বাতাস বহিতেছে, কিন্তু আমাদের আজ ব্রাহ্মণভোজন—সকালেই ঘরের বাহির না হইলে নয়—আমি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রত্যুষে উঠিয়া কলসীকক্ষে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, নদীর ধারে আসিয়া দেখিলাম একটি গাছের তলায় একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া বসিল, আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে আমরা মেয়েরা পরস্পরকে চিনি, দেখিলাম মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়—একটু অবাক হইলাম, এমন রূপবতী যুবতী কন্যা একাকী এখানে কেন? তাহার শীতে বিবর্ণ, শ্রান্ত-ভাবাপন্ন মুখখানি দেখিয়া প্রাণ কেমন কাঁদিয়া উঠিল, কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁ গা, তুমি কে গা, কোথা হইতে আসিয়াছ?" মেয়েটি বিষণ্ন নেত্র তুলিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"আমি একজন যাত্রী গো, আর চলিতে পারিলাম না, এইখানেই তাই পড়িয়া আছি"—

"তুমি যুবতী একা যাত্রী! বাড়ীর লোকেরা তোমাকে এরূপে একা ছাড়িয়া দিয়াছে?"

যুবতী চক্ষু নত করিয়া বলিল—"বাড়ীর লোক আমার কেহ নাই।" তাহার বিষণ্ন স্বর আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল—বলিলাম—"কেহ নাই! তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

যুবতী বলিল—"যদি স্থান পাই, এইখানেই থাকিব, আমাকে কেহ এখানে দাসী রাখিবেন?"

আমার চোখে জল আসিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও মুখ ফুটিল না—বুঝিলাম অভাগিনী বিধবা, সংসারের মোহাবর্ত্তে পড়িয়া আশ্রয় হারাইয়াছে, বলিলাম—"আজ হইতে আমি তোর দিদি হইলাম—আমার সঙ্গে আয়।"

গঙ্গাস্নান করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম।

২

অল্প দিনের মধ্যেই যমুনা আমাদের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িল, এমন কোন কথা নাই যাহা তাহাকে না বলিয়া আমাদের দুই যায়ের তৃপ্তি হয়, এমন কোন আমোদ প্রমোদ কাজ কর্ম্ম নাই যাহা তাহাকে ছাড়িয়া ভোগ করিতে আমাদের মন উঠে। ক্রিয়া কর্ম্মে, অসুখে বিসুখে, হর্ষে উল্লাসে যমুনা আমাদের সঙ্গিনী, সুখে দুঃখে আমাদের আপনার। কিন্তু আমরা তাহাকে যতদূর আপনার ভাবি সে কি আমাদের ততদূর ভাবে?

আমাদের স্নেহে তাহার ত সে স্থির বিষণ্নভাব ঘুচে না, আমাদের কাছে সে ত কখনও তাহার হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলে না। এতদিন আসিয়াছে, আমরা তাহার জীবন ইতিহাস কিছুই জানিলাম না, এই মাত্র জানি—জাতিতে সে আমাদের এক জাতি, সে

কায়স্থকন্যা। বাপের বাড়ী তাহার মেদিনীপুর জেলায়। বাপ মা এখন কেহই নাই, তাহার দাঁড়াইবারও স্থান নাই।

"কেন শ্বশুরালয়?"

এ কথার সে উত্তর করিতে চাহে না, এ সম্বন্ধে বেশী পীড়াপীড়ি করিলেই তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসে—সে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

আমাদের সহিত যমুনার এরূপ লুকাচুরী ভাব কেন? ইহা কি আমাদের প্রতি তাহার ভালবাসার অভাব? বুঝি তাহা নহে, আমাদের সুখে দুঃখে তাহার সে আন্তরিক মমতা মৌখিক হতে পারে না। বুঝি বা তাহার জীবনে এরূপ লজ্জার কথা আছে—যাহা প্রকাশ করিতে তাহার বুক ফাটিয়া যায়—যাহা প্রকাশ করিয়া কহিয়া কাহারও মমতা প্রত্যাশা করিতেও সে সাহসী নহে; এই ভাবিয়া আমরাও আর তাহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি না; তবুও মনের মধ্যে একটা কৌতূহল আন্দোলিত হইতে থাকে। তাহার এখনকার নিঃস্বার্থ পবিত্র জীবন কখনও মলিনভাবে ঢাকিয়া গিয়াছিল—ইহা সকল সময় মনে করিতেও পারি না, সময় সময় একেবারে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়—তাই মাঝে মাঝে যমুনার এই লুকাচুরীতে, এই অবিশ্বাসের ভাবে বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়ি।

এখনও বৎসর পূর্ণ হয় নাই, যমুনা শীতকালে আসিয়াছিল, এখন বর্ষা আসিয়াছে। আজ সকাল হইতে মেঘ করিয়া আছে; চারিদিক একটা অন্ধকার বিষণ্নভাবে আচ্ছন্ন, —আমরা দুই জনে বিকালে গঙ্গায় গা ধুইতে আসিয়াছি। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে —আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া গঙ্গার জল যেন আরো কালো করিয়া তুলিল—আমরা জলে নামিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"যমুনা শীঘ্র ওঠ—আর না"—যমুনা আমার দিকে মুখ ফিরাইল,—চমকিয়া উঠিলাম—কি ঘোর বিষণ্নতা! বাহিরের অন্ধকার যেন তাহার হৃদয়ের অর্দ্ধ বিকাশমাত্র। আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দিদি, তুমি ঘরে যাও—আমি আর একটু থাকি।" আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, "যমুনা, আমরা কি তোর এতই পর?"

সে আমার কথা বুঝিল, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিল, "দিদি, আর ত আমার আপনার কেহ নাই!"

"তবে যমুনা, তোর এই বিশ্বাসের অভাব কেন? আমাদের কাছে মনের কথা লুকাস কেন?"

যমুনা উর্দ্ধ-দৃষ্টি হইয়া কহিল, "ভগবান জানেন কেন লুকাই? কিন্তু আজ আর লুকাইব না, যদি এই অভাগিনীর জীবন শুনিতে এতই সাধ, তবে শোন দিদি।"

আমরা সিঁড়িতে উঠিয়া বসিলাম, চৌদিকে অন্ধকার, পদতলে নদী, মাথার উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, দুইজনে চারিদিক ভুলিয়া দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, যমুনা গল্প করিতে লাগিল, আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

৩

সেদিন ঠিক এই রকম একটি দিন, সকাল হইতে মেঘ করিয়া সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি আরম্ভ

হইয়াছে। আমি আমাদের কুটীরে আমার রুগ্ন মাতার কাছে বসিয়া আছি। আমার বয়স ১৪ বৎসর, কিন্তু তখনও বিবাহ হয় নাই। আমার বয়স যখন ৫ বৎসর তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। পিতা ধনবান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দু-একজন দুষ্ট লোকে তাঁহার ঋণের দাবী দিয়া আমাদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লয়। সংসারে আমাদের এমন আপনার লোক কেহ নাই যে উদ্যোগ করিয়া, যত্ন করিয়া আমার বিবাহ দিয়া দেয় ; মা একা স্ত্রীলোক—দরিদ্র কায়স্থ কন্যার বিবাহ সহজে হয় না। তাই এতদিন আমার বিবাহ হয় নাই। মা সেজন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, মনের অসুখে শরীর অসুখ দিন দিন তাঁহার বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি যাহাকে নিকটে পান কেবল ঐ কথাই বলেন, একটি সুপাত্র স্থির করিতে অনুরোধ করেন, ঐ এক কথাই তাঁহার মনে জাগিতেছে, তাহা ছাড়া যেন তাঁহার মনে আর কোন চিন্তাই নাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলাও ঐ কথা হইতেছিল, মা গেলে আমার কি দশা হইবে আমাকে বুকে ধরিয়া মা তাহাই বলিতেছিলেন, বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঘরের মধ্যে আমাদের দু জনের অশ্রুধারা বহিতেছিল। এমন সময় আমাদের কুটীরের দ্বারে ঘা পড়িল। মা বলিলেন, "হারার মা এল বুঝি, দরজাটা খুলে দে।" হারার মা আমাদের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী, আমাদের ঘর সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়। আমি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। হারার মা নহে, একজন আর্দ্র-কলেবর অপরিচিত পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি বলিলেন, "আমাকে আজিকার মত এখানে একটু আশ্রয় দিবেন কি? এই বৃষ্টিতে আর চলিতে পারিতেছি না।" মা তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "আহা তা ভিজবে কেন বাছা, রাতটা এইখানেই থাকো।"

পথিক সে রাত্রির জন্য আমাদের অতিথি হইলেন।

আমাদের চারখানি ঘর। একটি রান্নাঘর একটি গোয়াল, আর দুইখানি ভাল ঘর, তাহারি একখানি পথিকের শয়নের জন্য প্রস্তুত হইল, আমাদের যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম পথিক পীড়িত। সে দিনও তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। ক্রমে এক রাত্রির পরিবর্ত্তে এক সপ্তাহ, এক সপ্তাহের পর একমাস কাটিয়া গেল, পীড়িত পথিক আমাদের গৃহে অতিথি হইয়া রহিলেন।

বলিতে বলিতে সহসা যমুনার বিষণ্ন মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রকাশ পাইল, বুঝি বা তাহা অন্ধকার জীবনে সুখস্মৃতির দীপ্তি। যমুনা একটুখানি থামিয়া সজল নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, সেদিনের পর বাঁচিয়া রহিলাম কেন? প্রতিদিন অন্য কাজকর্ম্মের মধ্যে ছুটিয়া যখন পথিককে দেখিতে আসিতাম, প্রতিদিন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহার মুখে আরোগ্যলাভের লাবণ্য সঞ্চার দেখিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ উথলিয়া উঠিত, সেই আনন্দ না হারাইতে হারাইতে মরিয়া গেলাম না কেন? প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার সতৃষ্ণ নয়নে যে নীরব ঔৎসুক্য দেখিতে পাইতাম, যে ঔৎসুক্যে কিছু না বুঝিয়াও মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহার ভালবাসা অনুভব করিতাম, যে ভালবাসা তাঁহার দেবত্ব বিভাসিত করিত, সেই প্রেমে সেই দেবত্বে বিশ্বাস থাকিতে থাকিতে কেন মরিয়া গেলাম না?"

যমুনা থামিল, একটা অসহ্য কষ্টে যেন তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। বৃষ্টি পড়িতে

লাগিল, বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল, নদী উথলিতে লাগিল, আমরা দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

যমুনা আবার আরম্ভ করিল, "পথিক আরোগ্য লাভ করিলেন, তাঁহার যাওয়ার আর কোন বাধা নাই, প্রতিদিন শুনিতেছি দুই চারি দিনের মধ্যেই যাইবেন, কিন্তু সে দুই চার দিন আর ফুরাইতেছে না। একদিন আমি অন্য ঘরে কাজ করিতেছি, পাশের ঘরে মা পথিকের সহিত গল্প করিতেছিলেন—হঠাৎ এই কথাগুলি কানে গেল,—'আমার কথাটা একটু বিবেচনা করিবেন, আপনাদের ন্যায় আমিও সদ্বংশজাত কায়স্থ, আমার অর্থ আছে, আপনার কন্যাকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—'

এই সময় আমার সই কুসুম আসিয়া আমাকে ডাকিল, আর কিছু শোনা হইল না, কি জানি কুসুম যদি ঘরের মধ্যে আসিয়া সব শুনিয়া ফেলে—তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া কুসুমের কাছে আসিলাম।

সেই দিন কুসুমদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, পথিকের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত বাত সেদিন ঘুম হইল না, বিবাহ কি তখন ঠিক বুঝিতাম না, এইটুকু বুঝিলাম, পথিক আমাদের ফেলিয়া আর চলিয়া যাইবেন না, পথিক আমাদের আপনার হইবেন। এই মিলনের আনন্দের মধ্যে কেমন একটা বিচ্ছেদের ভাব তাড়াইতে পারিলাম না, কে জানে কেন সুখে দুঃখে আকুল হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। কিছু দিনের মধ্যে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। মা যেন আমাকে বিবাহিত দেখিবার জন্যই জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল, স্বামীর প্রেম পাইয়া স্নেহময়ী মাতার অসীম স্নেহ হারাইলাম।"

৪

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব। স্বামী প্রথমে একাকী একবার বাড়ী যাইতে চাহেন, কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করাতে আমাকে একেবারেই সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

নববধূর স্বামীর গৃহে যাইতে কত না আহ্লাদ, শাশুড়ি বধূ দেখিয়া কত না আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহার স্নেহে মাতার স্নেহ লাভ করিব, ছোট ছোট দেবর ও ননদেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইবে ; আমার ভাইবোন নাই, তাহাদের ভাইবোন পাইব ; গুরুজনের আশীর্ব্বাদের মধ্যে, পরিজনবর্গের আনন্দের মধ্যে, প্রেমময় স্বামীর সহিত নূতন সংসারে প্রবেশ করিব, প্রাণে কত আহ্লাদ, মনে কত সুখের ছবি। সারাপথ পাল্কীর মধ্যে এই কথাই মনে জাগিতেছে, পাল্কী থামিলে স্বামীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন পাল্কী নামিতেছে তখন হঠাৎ কেমন একটা ক্ষণস্থায়ী নিরাশার মধ্যে এতক্ষণকার আশা নিবিয়া পড়িতেছে ; স্বামীর মুখে যেন আমার হৃদয়ের আনন্দ প্রতিফলিত দেখিতেছি না—তাঁহাকে যেন এক একবার অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ আশায় নিরাশায় সুখে দুঃখে আট দিন পথে পথে কাটিল, পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম বিকালের মধ্যে বাড়ী পৌছিব, ঔৎসুক্যে মন পূর্ণ হইয়া রহিল। বিকালে গ্রামের নিকট পাল্কী থামিল। স্বামী সেইখান হইতে তাঁহার ও আমার দুইখানা

পাল্কীই বিদায় করিয়া দিলেন, বলিলেন বাড়ী অতি নিকটে, সন্ধ্যা হইলে দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গিয়া পৌঁছিব। নববধূ বেড়াইতে বেড়াইতে গৃহে যাইবে কেমন নূতন রকম বোধ হইল, বড় লজ্জা হইতে লাগিল, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, দু একটা আপত্তির কথা কি বলিতে গেলাম, স্বামী হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

শীতকালের বিকাল, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের আলো সন্ধ্যার আঁধার এক হইয়া আসে, অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিক একটা মলিন আলোকে ডুবিয়া পড়িতে লাগিল। একটি নির্জ্জনপথে স্বামীর অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যার কিছু আগে একটা তরুলতাময় ক্ষুদ্র জঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলাম, সহসা একটা অন্ধকার যেন বাহিরের আলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, স্বামী বলিলেন, "ঐ দেখ আমাদের বাড়ী।"

কম্পিত হৃদয়ে মুখ তুলিয়া চাহিলাম ; একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী নজরে পড়িল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র স্বামী বলিলেন —"তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।"

তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, অপরিচিত অন্ধকার স্থানে, একটা অজানিত অন্ধকার হৃদয়ে ধরিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরে প্রদীপ হস্তে একটী রমণী আমার দিকে আগুয়ান হইলেন, ভাবিলাম এইবার শাশুড়ি ঠাকরুণ আমাকে লইতে আসিয়াছেন, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিলাম। রমণী নিকটে আসিয়া বলিলেন—"এই বুঝি নূতন দাসী, তা দাসীর আবার এত ঘোমটা কেন?"

কি শুনিলাম কিছু বুঝিলাম না—কেবল একটা বজ্রের ধ্বনি মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিয়া মর্ম্মভেদ করিয়া চলিয়া গেল—বাড়ী ঘর চৌদিকে প্রবল বেগে ঘুরিয়া উঠিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

মানুষ যাহা চায় তাহা বুঝি পায় না, যাহা পায় তাহা বুঝি চায় না! আমি জ্ঞান চাহি নাই, তবু জ্ঞান জন্মিল, দেখিলাম একটি অপরিচিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মলিন শয্যার উপর একাকী পড়িয়া আছি। প্রাণ ছটফট করিয়া উঠিল, আকুল হইয়া চৌদিকে চাহিয়া দেখিলাম, যাহাকে দেখিতে কাতর তাহার দেখা পাইলাম না, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, মাথা ঘুরিতে লাগিল, কাঁদিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। কিছু পরে একজন স্ত্রীলোক আমার কাছে আসিয়া বসিল, আমাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল,—জানিতে যাহা বাকী ছিল সব জানিলাম। সেইদিন হইতে তিন চার দিন আমি পীড়িত। জানিলাম তাহার ন্যায় আমিও দাসী, তাহা ছাড়া অন্য অধিকার আমার নাই। স্বামী জাতিতে বৈদ্য, আমি কায়স্থ, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ বিবাহই নহে। প্রথম রাত্রিতে যে রমণী আমাকে দাসী বলিয়াছিলেন—তিনি স্বামীর পরিণীতা পত্নী! সব শুনিলাম, সব বুঝিলাম, মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, তবু মৃত্যু হইল না, তবু আরোগ্য লাভ করিলাম, ক্রমে উঠিবার হাঁটিবার সামর্থ্য জন্মিল, আমি চলিয়া যাইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম।

একদিন দুপুরবেলায় বাড়ীর সকলে যখন বিশ্রাম লাভ করিতেছে—আমি একাকী গৃহের বাহির হইয়া গেলাম, জঙ্গল পার হইয়া মুক্ত মাঠে আসিয়া পড়িয়া একটি আমগাছের

তলায় বসিলাম, তখনও অধিক পথ চলিবার বল নাই ; চারিদিক নিঃঝুম, নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে দূর তরু মধ্য হইতে ঘুঘু ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিয়া বহিয়া আবার থামিয়া পড়িতেছে, আমি যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি তাহাতেই হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—আমার চারিদিক কি শূন্য! কি অন্ধকার! আমার আর কেহ নাই, কিছু নাই, এই অসীম সংসারে আমি একাকী! ওগো পৃথিবীতে আর কেহ কাহাকে কি বিশ্বাস করিবে না—ভাল বাসিবে না! পৃথিবীতে কি সকলেই এইরূপ প্রতারক! সকল পুরুষেই কি এইরূপ বিশ্বস্তহৃদয়া বালিকাকে প্রতারণা করিয়া, তাহার জীবন কলঙ্কিত করিয়াই সুখ অনুভব করে? সংসারের কি এই নিয়ম!

অদূরে কাহাকে দেখিতে পাইলাম! সেই রাতের পর এই প্রথম দেখা, সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। এই কি সেই? করুণাময় স্বামী ভাবিয়া যাহার পদতলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছি—এই কি সেই? দেবতা ভাবিয়া যাহাকে দিবানিশি পূজা করিয়াছি—সেই দেবতা আমার আজ প্রতারক! সেই করুণাময় স্বামী আজ আমার প্রাণহন্তারক।

স্বামী আমার নিকটে অগ্রসর হইলেন, বলিলেন, "যমুনা, আমাকে মাপ কর, আমি তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব। তোমাকে এখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছি, সেইদিন হইতে তোমার সহিত দেখা করিবারও একবার সুবিধা হয় নাই।"

সর্ব্বাঙ্গে হুহু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, এইখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছেন—আর কিছু অন্যায় নহে। স্বামী আমার স্কন্ধে হাত দিতে যাইতেছিলেন, বিদ্যুতের মত সরিয়া দাঁড়াইয়া গর্ব্বিত তীব্র স্বরে বলিলাম, "আমাকে স্পর্শ করিও না, তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি তোমার পত্নী নহি—আমাকে স্পর্শ করিও না।" স্বামী থমকিয়া দাঁড়াইলেন—আমি রুদ্ধ শ্বাসে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম, কিন্তু স্বামী আমার অনুসরণ করেন নাই।

তাহার পর এইখানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

৫

যমুনার কথা শেষ হইয়াছে, বৃষ্টিও প্রায় থামিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মত আকাশ এখনো মেঘান্ধ, মেঘান্ধ হৃদয়ে সেই মেঘান্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া আমরা দুজনে নিস্তব্ধে বসিয়া আছি, এই সময় ওপাড়ার কালিন্দি কলসীকক্ষে ঘাটে আসিল—আমাদের দেখিয়া বলিল—"কি লো, তোরা দুজনে চুপ চাপ করে ভাবছিস্ কি?" আমি তখন উঠিলাম, যমুনাকে বলিলাম, "ঘরে আয়।"

দুজনে নদীতীর হইতে দুই এক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় আমাদের ঝি আসিয়া বলিল—"মা ঠাকরুণ, যমুনা দিদির দেশের একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"যমুনার দেশের লোক!" যমুনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমরা গৃহাভিমুখী হইলাম, বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দাসী অদূরের একটি বৃক্ষতলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল—যমুনার মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, সে বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল।—বৃক্ষতল হইতে একজন পুরুষ আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমি সরিয়া গেলাম—পুরুষ যমুনার নিকটে

আসিয়া দাঁড়াইল—ছিন্নশাখার ন্যায় সহসা যমুনা তাহার পদতলে পড়িয়া গেল।

সে পুরুষ আর কেহ নহে, যমুনার স্বামী। যমুনার সন্ধান পাইয়া তিনি তাহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। যমুনার রূপের ঘোর এখনো বুঝি তাঁহার হৃদয়ে কিছু লাগিয়া ছিল। যমুনা প্রথমে তাঁহার সহিত যাইতে কোন মতে সম্মত হইল না,—কিন্তু তাহার স্বামী মহা জেদ ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন যে, যমুনা তাঁহার সঙ্গে না গেলে তিনিও ফিরিবেন না ; দুই চার দিন চলিয়া গেল—সত্যই তিনি এইখানে রহিয়া গেলেন—তখন সে যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু যাইবার আগে স্বামীকে অঙ্গীকার করাইয়া লইল যে, তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিবেন—এবং তাহাকে পরস্ত্রীভাবে দেখিবেন।

৬

যমুনা অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না,—যেখানে সেখানে তাহার স্মৃতি ছড়ান, সুখে দুঃখে আমাদের সে সঙ্গিনী ছিল, সুখে দুঃখে তাহাকে মনে পড়িয়া যায়। আমার ছোট ছেলেটীর কয়দিন হইতে অসুখ করিয়াছে, নিকটে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে করিতে ক্রমাগত যমুনার কথাই মনে পড়িতেছে, সে গোপালকে বড় ভালবাসিত, তাহার কোলে-কোলেই গোপাল মানুষ হইয়াছে—যমুনা এখন এখানে থাকিলে কত যত্নই ইহাকে করিত! হঠাৎ এ চিন্তায় বাধা পড়িল—খোকার দাসী বলিল—"মা, খোকার অসুখ ত এখনো সারছে না,—তা শুনছি শ্মশানে একজন সন্ন্যাসিনী এসেছে ; অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানে—তার কাছে একবার গেলে হয় না?"—

কথাটা মনে লাগিল, সেই বিকালেই তাহার সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর নিকট গমন করিলাম।

নদীতীরে শ্মশানে শবকুটীর, সে কুটীরে শ্মশান হইতে বিষণ্ণগম্ভীর এলোকেশী মূর্ত্তি! হৃদয় স্তম্ভিত হইল—ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণত হইতে গেলাম—কিন্তু ভূমিষ্ঠ না হইতে হইতে সন্ন্যাসিনী হাত ধরিয়া উঠাইলেন—অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিলাম—সেই রুক্ষজটাযুক্ত, কেশপাশপ্রচ্ছন্ন, মলিন গম্ভীর অপরিচিত মুখ কাহাকে মনে করাইয়া দিতেছে? অথচ তাহাকে ত এখানে দেখিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। আমার সে আকুলতা দেখিয়া সন্ন্যাসিনীর অধর প্রান্তে হাসির রেখা পড়িল—আমি বলিয়া উঠিলাম, "যমুনা!" যমুনার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, আমি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, আবার তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল—বলিলাম, "যমুনা তোর এ কি বেশ!" যমুনার নেত্র অশ্রুহীন, সে কোন উত্তর করিল না—একটু কেবল হাসিল। অত দুঃখে লোকে হাসিতে পারে! আশ্চর্য্য হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম—"যমুনা, আবার ফিরিয়া আসিলি কেন?" যমুনা বলিল, "দিদি, ভাঙ্গা জিনিস কি যোড়া লাগে? শুনিলাম অন্যের নিকট স্বামী আমাকে '—' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন—তাই চলিয়া আসিয়াছি।"

কথাগুলি সে হাসিয়া বলিতে চেষ্টা করিল—সে হাসিতে মর্ম্ম বিদ্ধ হইল, বুঝিলাম সে কি কষ্টের হাসি, বুঝিলাম অশ্রুতে সে কষ্টের সান্ত্বনা নাই, তাই এ হাসির উপেক্ষা। যমুনা বুঝি আমার কষ্ট বুঝিল, বলিল—"দিদি, মানুষের জন্য মানুষের কি কষ্ট হয়! —মিথ্যা কথা—সব কষ্ট আপনার জন্য।"—আর কথা কহিলাম না,—স্তব্ধ হইয়া গেলাম,

বুঝিলাম যমুনা সে যমুনা নহে।

কিছু পরে আমি বলিলাম, "যমুনা, আমাদের বাড়ী চল না?"

যমুনা উত্তর করিল, "দিদি, শ্মশানই আমার আপনার ঘর, এ ঘর আর ছাড়িব না।"

অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই তাহাকে বাড়ী আনিতে পারিলাম না, তাহার দগ্ধ হৃদয় লইয়া জীবন্তে সে শ্মশানবাসী হইল। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাকে একবার করিয়া দেখিতে যাইতাম। একদিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কুটীরদ্বারে আসিতেই কতকগুলা শৃগাল কুক্কুর আমার দিকে চাহিয়া একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল, হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—অভাগিনীর মৃতদেহ ভূমিতে লুটাইতেছে, শিহরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পেনে প্রীতি

আমরা এখন টুরে ফিরিতেছি, অর্থাৎ ঘুরে বেড়াইতেছি, বেদিয়া জাতির জীবন যাপন করিতেছি। আজ কোন এক গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষছায়াসঙ্কুল নিস্তব্ধ নিভৃত বিজন ক্ষেত্রস্থল আমাদিগের বস্ত্রাবাসমণ্ডলী এবং সিপাই সান্ত্রী ভৃত্যাদিবর্গে পরিবৃত হইয়া জাগ্রত জনালয় হইয়া উঠিল, সেখানে আবেদনপত্রধারী গ্রাম্যলোকের দলে দলে সমাগম চলিল ; শুষ্ক বিবর্ণ চিন্তাপীড়িত আসামীর নীরব বেদনায়, ফরিয়াদীর ক্রোধ ও ঈর্ষাজনিত অব্যক্ত আস্ফালনে, উভয়পক্ষীয় উকীল মোক্তারের বক্তৃতা কলরবে, এবং একই সাক্ষীর তিন তিন বার নাম ডাক-চীৎকারে বনতল ব্যথিত কম্পিত হইতে লাগিল, আবার দুদিনে সমস্তই অন্তর্ধান! প্রান্ত প্রদেশ পূর্ব্ববৎ বিজনতা বক্ষে ধারণ করিয়া একাকী ধ্যাননিমগ্ন, আর আমরা আমাদের গড়া বাসা ভাঙ্গিয়া, ভাঙ্গাবাসা পুনর্ব্বার গড়িতে, কভু ক্ষেত্র, কভু প্রান্তর, কভু চড়াই, কভু উৎরাই, কভু সজল, কভু শিলাকঙ্করময় শুষ্ক নদী গহ্বর দিয়া সমান অগম্য পথে, বিষম ঝাঁকানি খাইতে খাইতে অন্যত্র টঙ্গায় ধাবিত। ইহাই ক্যাম্প লাইফ। আয়াস আছে বলিয়া ইহাতে আয়েসও আছে। নিত্য নবদৃশ্য, বিশ্ব তাই বড় মধুর, নিত্য নব গতিতে স্থিতিটুকু অতীব শান্তিজনক। অন্যান্যরূপ সুখস্বচ্ছন্দতারই বা এখানে অভাব কি। ভৃত্যগণ অবিরাম আরাম যোগাইয়া চলিয়াছে। আমরা নূতন কোন জায়গায় যাইব, আমাদের এক দিন বা এক বেলা পূর্ব্বে অধিকাংশ তাম্বু ও আসবাব দ্রব্যাদি গরুর গাড়ীর উপর বোঝাই দিয়া সিপাহী এবং বাবুর্চি খানসামা এক দল, নির্দ্দিষ্ট স্থানে আড্ডা বাঁধিয়া, আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে চলিল, আমরা পরে সেখানে পৌঁছিয়া সমস্ত ঠিক পাইলাম। আমাদিগের শেষ পরিত্যক্ত তাম্বু প্রভৃতি লইয়া অন্য ভৃত্যদল পরে আসিতেছে। অসুবিধার মধ্যে ভৃত্য এবং ভ্রমণসরঞ্জাম এজন্য যা কিছু অধিক সংখ্যায় রাখিতে হয়।

এইরূপ আসিস্টেণ্ট কলেক্টারগণ এদেশে বৎসরে সাতমাস ধরিয়া বনচারী যদি বা না হন, বিজনচারী। হেড কোয়ার্টর ছাড়িয়া এ কয় মাস কাল ইঁহাদিগকে সব্‌ডিভিসনের গ্রামে গ্রামে অধীনস্থ ক্ষুদ্রতম কর্ম্মচারীটি হইতে উচ্চপদ মামলৎদারের পর্য্যন্ত রাজকার্য্য তত্ত্বাবধান এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রামনিবাসীগণের আর্জ্জি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ডিস্‌ট্রিক্‌টের সুবিচার রক্ষায় ভ্রমণনিযুক্ত থাকিতে হয়। বৎসরের অন্য পাঁচ মাস বৃষ্টির কাল, সেইজন্য সেই সময় তাঁহারা হেডকোয়ার্টরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আপাততঃ এই সঙ্গে ইঁহাদিগের আর একটি কার্য্য বাড়িয়াছে।

প্লেগের তদারক, তাহার সংক্রামক কোপপ্রশমনসঙ্কল্পে সুনিয়ম প্রচার, এবং সেই সকল নিয়মাবলী যাহাতে পালিত হয় তদ্দর্শন, ইঁহাদের অধুনাতন একটি প্রধান কর্ত্তব্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সবডিবিষন প্রান্ত শব্দে অনুবাদিত, ইহা হইতে আসিস্টেণ্ট কলেক্টারগণ প্রান্তসাহেব নামে অভিহিত। অনুবাদ কি সুসঙ্গত?

কোলাবা ডিশ্‌ট্রিক্‌ট বম্বে সহরের খুবই কাছে, আলিবাগ ইহার হেডকোয়ার্টার। আলিবাগ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান, বম্বে সহর হইতে ষ্টীমারে এক ঘণ্টার পথ মাত্র। আমি অতি অল্প দিন এ ডিস্‌ট্রিক্‌টে আসিয়াছি, একমাসও এখনো হয় নাই, আসিয়া অবধি ইহার

পদপ্রান্তেই ঘুরিতেছি। তবে মনসুন্ সন্নিকট, শীঘ্রই মাথায় চড়িব এরূপ আশা করিতেছি। প্রতি গ্রাম ছাড়িয়া সমুদ্রের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতেছি ; এখন পেনে আসিয়াছি, এখান হইতে বম্বের তোপ শুনা যায়।

কলিকাতা হইতে একটানা মেলট্রেনে কল্যাণজংশনে পৌঁছিতে প্রায় ৪৪ ঘণ্টা লাগে। সেখান হইতে ভিন্ন লাইন ধরিয়া আরো দুই ঘণ্টার মধ্যে কর্জ্জৎষ্টেসনে নামিয়া একখানি ডগ্‌কার্টে ওঠা গেল। গাড়ীতে উঠিবার অবসরটুকু মাত্র দিয়া, তৎযোজিত, ঘনঘোর লোহিতকান্তি (Bay), সুচিক্কণ, সুগঠন, সুদর্শন আরব্যাশ্ব মুহূর্ত্তে কেশরগুচ্ছ বিকম্পিত, বক্র গ্রীবা স্ফীত করিয়া, সুবঙ্কিম সুঠাম পদবিক্ষেপণে বায়ুগতিতেই যেন দাবিত হইয়া, দুই চারি মিনিটের মধ্যে এক নিভৃত নিকুঞ্জতলস্থাপিত বস্ত্রাবাসমণ্ডলীর নিকট আমাদিগকে আনিয়া ফেলিল।

প্রায় এক মাইল ধরিয়া আম্রকানন ; নিবিড় নহে, বৃক্ষদল শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভক্ত ও বিরাজিত হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ভ্রমণপথ রাখিয়া গিয়াছে। কাননের এক প্রান্তে সুনির্ম্মিত গ্রাম্যপথ, অন্য প্রান্ত অবধি জলপূর্ণ নদী ; নদীর তীরে এক দিকে কর্জ্জতের গ্রাম্য সহর, অন্য দিকে স্থানে স্থানে কুটীরাবলী ; দূরে চতুর্দ্দিকে ছবির মত পাহাড় চিত্র। কাননাভ্যন্তরে এক একটি তরুচ্ছায়াতলে আমাদিগের এক একটি তাম্বু স্থাপিত। ইহা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নয় ; আফিস, আফিসের লোকদিগের ঘর, ভৃত্যদিগের ঘর, স্নানাগার, রন্ধনশালা, আমাদিগের দুই জনের স্বতন্ত্র শয়নকক্ষ প্রভৃতিতে এই আবাসকুঞ্জ বহুদূরবিস্তৃত। এখানে পদার্পণ করিবামাত্র সুকণ্ঠ পক্ষীগণ শাখার মধ্যে লুকাইয়া তাহাদের এই শান্তিনিকেতনে আমাদিগকে স্বাগত করিয়া লইল ; কি এক অমৃতময় ভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

বনতলে একটি বস্ত্রছাউনির মধ্যে একাকী এই আমার প্রথম শয়ন। পূর্ব্বেও এই বম্বে প্রেসিডেন্সিতেই অল্প দিন তাম্বুবাস করিয়াছি, কিন্তু এরূপ একাকী স্বতন্ত্র তাম্বুতে রাত্রিবাস করি নাই। আমার তাম্বুটি খুব ছোট এবং অন্যগুলি হইতে খানিকটা তফাতে। ছায়াবহুল গাছ বাছিয়া তাহার নীচে তাম্বু খাটাইতে হয়, এই কারণে আমার তাম্বু অন্য তাম্বু হইতে প্রায়ই অল্প বিস্তর দূরে পড়িয়া যায়। রাত্রিকালে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে জনমানবের ত্রিসীমায় আছি, ইহা বুঝিতে পারি না ; পরিপূর্ণ বিজনতার মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া সহসা স্নায়ু প্রণালীতে কি এক প্রকার নূতনতর অনুভূতির ক্রিয়াতরঙ্গ সঞ্চারিত হইয়া আবার মিলাইয়া পড়ে ; চিরাভ্যস্ত মনুষ্যশ্বাসনিশ্বাসপূর্ণ বদ্ধ প্রাসাদ ভবনে, তাহার রঞ্জিত কড়ি বরগা, মার্জ্জিত মেজিয়াতল, কাষ্ঠময় দ্বার বাতায়ন ও প্রজ্জ্বলিত দীপালোক দেখিতে গিয়া, তরু লতা শুষ্কতৃণময় স্তব্ধ মাঠের অন্ধকার ও আকাশের শান্ত ম্লান তারকালোক নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। দ্বিতল ত্রিতল গৃহের পরিবর্ত্তে, ভূমির সমতলে একাকী আপনাকে খট্টাঙ্গ শায়িত দেখিয়া প্রথমে কেমন যেন একটা বিস্ময় বিভ্রমভাবে সমস্ত ভুল হইয়া যায়, পরে ঈষৎ আতঙ্কে যেন দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে, ক্রমশঃ সম্পূর্ণ জাগরণে এই অজ্ঞাত আতঙ্ক স্পষ্ট আশঙ্কায় পরিণত হয়। কোন বন্য পশু গৃহে প্রবেশ করিয়া যদি আক্রমণ করে এইরূপ ভয় হইতে থাকে। কিন্তু চারিদিকের পরিপূর্ণ শান্তিময় নিস্তব্ধতায় সে ভয় ধীরে ধীরে অতি শীঘ্রই আবার নিদ্রাবিলুপ্ত

হইয়া পড়ে। বলিব কি এতদিন তাম্বুবাস করিতেছি, একটি শৃগালের ডাক পর্য্যন্ত শুনি নাই।

কর্জ্জতে আমরা ছয় দিন ছিলাম। মধ্যাহ্ন হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সেখানে কি ভয়ানক গরম হইত। উষ্ণ বাতাস দেহের যেখানে স্পর্শ করিয়া যাইত মনে হইত যেন ফোস্কা পড়িতেছে। এই শান্তি-কাননের সহিত বিদায় গ্রহণের সময়ও তাই শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। এখন মনে হয় গরমের সময় তাম্বুর পরদা কেন ফেলিয়া দিতাম না। ক্রমশঃ শিক্ষা লাভ করিতেছি। কর্জ্জৎ হইতে চৌক্ ছয় মাইল, চৌক্ হইতে পানুয়েল (Panuel) ১২ মাইল। আমরা দুই রাত্র চৌকের বাঙ্গলায় বাস করিয়া এক রাত্র পানুয়েলে কাটাইয়া পরে পেনে আসিয়াছি। চৌকের বাঙ্গলাটি বেশ উচ্চ স্থানের উপর। ইহার চারিদিকে গোলক চাঁপার গাছ, নিষ্পত্র গাছের শাখায় শাখায় থরে থরে ঝাঁকে ঝাঁকে কেবলি ফুল, গাছতলা পর্য্যন্ত ফুলে ফুলে ঢাকা। প্রবল বাতাসে সেই ফুলদল উড়িয়া উড়িয়া আমাদের পূজা লইয়াই যেন বারান্দায় আসিয়া জমা হইত।

পানুয়েলের চিঠিপত্রাদি বহিয়া সমুদ্র খালের যে বন্দর হইতে ষ্টীমার বম্বে যাতায়াত করে সেই বন্দরের নাম উলুয়া বন্দর, ইহা পানুয়েল হইতে ৭ মাইল দূরে। উলুয়া গ্রামের পুরাতন অংশ এখন কি শোচনীয় শেষ দৃশ্যময়। গ্রামকে গ্রাম শূন্য, পরিত্যক্ত; ভগ্ন কুটীরের মৃত্তিকা প্রাচীর মাত্র অবশিষ্ট, প্লেগের প্রাদুর্ভাবেই ইহার এইরূপ দশা। কয়েকখানি অবরুদ্ধ সুন্দর বাঙ্গলা দেখিলাম—শুনিলাম এক সময় এক দিনের জন্যও খালি পড়িয়া থাকিত না। তৎসংলগ্ন বহুদূরবিস্তৃত আম্র কাননে অসংখ্য আম ফলিয়াছে, বৃক্ষরাশি ফলভারে যেন অবনত; কিন্তু সে সকল ফল ভোগ করিবে কে, কে জানে? দেখিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়।

পানুয়েল ও পেন বেশ.বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, বাড়ী, ঘর, দোকান প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র সহর তুল্য। এমন কি এখানে রাস্তায় কলের জল, দীপ আছে।

পানুয়েলে আমরা যেখানে ছিলাম, আর পেন গ্রামপ্রান্তে যেখানে আছি, ইহার মধ্যে পথ ব্যবধান ২২ মাইল। যাতায়াতে মধ্যে দুই বার দুইটি জল পার হইতে হয়। পানুয়েল হইতে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা প্রথম জলের নিকট পৌঁছিলাম। শুনিয়াছিলাম জল এখানে খুবই কম, ঘোড়া মানুষ ইহার উপর দিয়া পায়ে চলিয়া যায়। কিন্তু তীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বিপরীত; সুবিস্তৃত সুগভীর ভরা নদী কূলে কূলে ছাপিয়া স্রোতের বেগে বহিয়া চলিয়াছে। টঙ্গায় পার হইব কিরূপে? তখন জানিলাম আসলে ইহা নদীই নহে, সমুদ্রের খাল, জোয়ারে বড় নদীর মত জলে ভরিয়া উঠে; ভাঁটায় নাবিলেই ঘোড়া মানুষ স্বচ্ছন্দে ইহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হয়। আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন ভরা জোয়ার, একজন কৌপিনধারী প্রবীণ মাঝির সহিত কথা কহিয়া জানা গেল পাঁচটার আগে এ জলে গাড়ী যাইবে না। আমরা একটার সময় তীরে আসিয়াছি, তাহা হইলে আর ৪ ঘণ্টা কাল এই রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে হইবে। সে বড় সুখের কল্পনা নহে। আমাদিগের বিপন্ন ভাব দেখিয়া মাঝি বলিল, "পার হইবে ত নৌকায় চল না, টঙ্গা ঘোড়া সবই পার করিতেছি।" দেখিলাম নিতান্ত ক্ষুদ্র একখানি ডোঙ্গা তীরের নিকট জলে ভাসিতেছে। দেড় হাত পরিসর হইবে কি না সন্দেহ, লম্বায় হাত আষ্টেক দশ হইতে

পারে। এই নৌকায় টঙ্গা ঘোড়া সব পার করিবে। প্রান্তসাহেব অবিশ্বাসজনক বিস্ময় দৃষ্টিতে নীরব হইয়া রহিলেন। সে তাঁহার অবিশ্বাস বুঝিয়া সদর্পে গম্ভীর ভাবে কহিল "বড় বড় বয়েল ও বয়েল গাড়ী আমি অনায়াসে পার করি," তথাপি টঙ্গা পারের হুকুম না পাইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিতান্ত নিস্পরোয়াভাবে অদূরে গাছের তলায় গিয়া তামাকু টানিতে বসিল। তাহার ভাবটা এই, "ভাল পরামর্শ দিলাম শুনিলে না, আচ্ছা সেই ৫টা পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া থাক না, আমার ত ভারী গরজ।" তাহার সেই খাতিরনদারৎ ভাবটা লাগিল ভাল, আমার ত মনে হইল ইহার হাতে আত্মসমর্পণ করা যায়। তাহা ছাড়া ৫টা পর্য্যন্ত তীরে বসিয়া থাকাটাও কিছু বিশেষ লোভনীয় নহে ; আমাদের আপনাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটু কথাবার্ত্তা হইবার পর টঙ্গাওয়ালাকে বলা গেল, "মাঝিকে বল, নৌকায় টঙ্গা পার করুক", তাহারা গাড়ী ভাসাইতে গেল, আমি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, ঐটুকু ছোট ডিঙ্গিতে অত বড় গাড়ী উঠায় কিরূপে। দেখিলাম অতি সহজ। গাড়ী ঠেলিয়া তাহার দুই চাকার মধ্যে নৌকাখানি প্রবেশ করাইয়া নৌকা ভাসাইয়া দিল, তাহার পর টঙ্গাওয়ালা ডিঙ্গিতে উঠিয়া গাড়ী ধরিয়া বসিলে, মাঝি তাহার বাঁশের লগী ঠেলিয়া নৌকা ওপারে লইয়া লাগাইল। তখন এত জল যে এক বাঁশে ঠাঁই পাওয়া যাইতেছিল না। নৌকা চলিবার সময় গাড়ীর দুই চাকা, নৌকারি দুইটি চাকার মত তাহার দুই পাশে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া পার করা ইহা হইতেও সরেশ। ঘোড়ার মুখের লাগাম নৌকার মাঝির হাতে রহিল, ঘোড়া দুইটি নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল। সর্ব্বশেষে আমরা পার হইলাম।

এই সমস্ত ক্ষণের মধ্যে মাঝিকে একবার গাম্ভীর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই। কিন্তু ওপারে গিয়া প্রান্তসাহেব বক্সিস্ সমেত মেহনতি যখন তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তখন সহসা তাহার আত্মবিস্মৃতি জন্মিল, ছেলেমানুষের মত গালভরা হাসিতে তাহার আকর্ণ কুঞ্চিত হইয়া পড়িল।

ইহার পর আরো একবার ডিঙ্গিতে সমুদ্রখাল পার হইয়া, দুই বার টঙ্গা চক্রে দুইটি ছোট নালা উত্তীর্ণ হইয়া, ঘোড়াকে বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত দুইবার সেই রৌদ্রে পদব্রজে দুইটি চড়াই পথ ভাঙ্গিয়া অবশেষে ২২ মাইল পথ ৫ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া অপরাহ্নে পেনে আসিয়া পড়িলাম।

এখানে আমাদের বাসক্ষেত্রে আসিয়াই প্রথমে নজরে পড়িল একটি ভাঙ্গা কুটীর ; কুটীর খানি আমাদের তাম্বুর এত কাছে। শুনিলাম এইখানে কোন্ ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিত, একজনের প্লেগ হওয়াতে সকলকেই গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে, এখন কুটীরের এই দশা, তাহাদের দশা কি হইয়াছে কে জানে!

এখানেও আম্রনিকুঞ্জতলে আমাদের বস্ত্রাবাস ; কিন্তু কর্জ্জতের ন্যায় ইহা পরিষ্কার সুমার্জ্জিত নিকুঞ্জকানন নহে। এই শুষ্কক্ষেত্র প্রান্তরের সর্ব্বত্রই প্রায় লাঙ্গল চষা উচ্চ নীচ ভূমি ; এক পা বাড়াইতে শুষ্ক তৃণগুল্মে, তাহা আটকিয়া যায়। তরুরাজি এখানে অসংলগ্ন অসম্বদ্ধভাবে যত্র তত্র বিক্ষিপ্ত ; এক একটি আম গাছ বহু পুরাতন, প্রকাণ্ড ও বহুল শাখাকাণ্ডে বিপুলকায়, তাহার এক একটি সুবিস্তৃত শাখার নীচে সুবিশাল ছায়া। গাছগুলি পরগাছায় ভরা, কোনটিওবা বৃহৎ অশ্বত্থ তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এত আম গাছের

মধ্যে মোটে দুইটি গাছে দুই চারিটি করিয়া আম ঝুলিতে দেখিলাম, আর সবে মাত্র এ ক্ষেত্রে যে একটি কাঁঠাল গাছ তাহা কাঁঠালে কাঁঠালে ভরা। এখানে নানা জাতীয় সুকণ্ঠ পক্ষী নাই, শ্যামা দোয়েলেরই ডাক সারাদিন শুনিতে পাই, এমন বনতল কোকিল পাপিয়ার গীতরবে ধ্বনিত হইয়া উঠে না। এখন শুক্লপক্ষ, হঠাৎ দুই দিন হইতে সন্ধ্যার ম্লান জ্যোৎস্নায় একটা পাপিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠে, ডাকিয়াই আবার নীরব হইয়া পড়ে, বুঝি তাহার প্রতিধ্বনি গীতি শুনিতে পায় না বলিয়া। কর্জ্জতের ন্যায় এখানেও এই ক্ষেত্রস্থলের এক প্রান্তে গ্রাম্য পথ অহরহ গরুর গাড়ীর চক্রঘর্ষণে পেষিত নিনাদিত, আর অন্য প্রান্তে নদী, কিন্তু কর্জ্জতের সে ভরা নদী নহে, ইহা শিলা কঙ্করময় শুষ্ক গহ্বর সার। দূর দূরান্তর প্রসারিত এই শুষ্ক গহ্বরের কদাচ কোন অংশে একটু খানি জলের চিহ্ন দেখা যায় ; কোন শিলাতলে বা একটু খানি জল গুপ্তভাবে বিরাজিত। এপারে ওপারে পরস্পর হইতে দূরদূরান্তরসংস্থিত দুই চারিখানি করিয়া যে কুটীর গৃহ দেখা যাইতেছে, তাহার লোকেরা এই গুপ্তস্থানের সন্ধান জানে।

পেনে আসিয়াছি বটে কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার সহিত আমার সম্পর্ক রহিত, পেন হইতে এই বিজন ক্ষেত্রস্থল প্রায় দুই মাইল দূরে ; কিন্তু আমি ইহাকেই পেন বলিয়া জানি। নাগরিক সুবিধা স্বচ্ছন্দ আয়েস বিলাসের চিহ্নমাত্র এখানে নাই, তথাপি লোকালয়চিহ্ন আছে! এক দিকে সুদূরব্যাপী মাঠ, অন্য দিকে স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রমোন্নত শ্যামকান্তিশূন্য শুষ্ক শৈলমালার পদপ্রান্তে, বক্ষে, চূড়ায় পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে কুটীর। এবং এই পার্ব্বত্য দুর্গম পথেও এক একখানি গরুর গাড়ী মাঝে মাঝে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগ্রামের কোন একখানির উদ্দেশ্যে চলিয়াছে দেখা যায়। সাহস দেখিয়া অবাক হইতে হয়। রেলগাড়ীর গতি সুনির্ম্মিত যত্নগঠিত মসৃণ পথে, আর গরুর গাড়ীর গতি, সম অসম, সুগম দুর্গম সর্ব্বস্থানে। কাহার কার্য্যকারিতা অধিক বলা দুঃসাধ্য।

এ দেশে কাটকরী বলিয়া একরূপ আদিম অসভ্য জাতি আছে, পাহাড়চূড়ার বিরল কুটীরগুলি তাহাদেরই বাসস্থান। ইহারা সভ্য জাতির সংস্রবে বড় একটা আসিতে চাহে না, মাঝে মাঝে কেবল কাষ্ঠ ফল মূল প্রভৃতি বন্যজাত দ্রব্যাদি সহরে বিক্রয়ার্থ আনে। তীর ধনুকে বন্য পশু শীকার করিয়া প্রায় ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নদীর ধারে উচ্চ পাড়ে একটুখানি বেশ সমতল মসৃণ বেড়াইবার স্থান আছে। আমি রোজ বিকালে ঐখানে বেড়াইতে বেড়াইতে শৈলপ্রদেশস্থিত দূর দূরান্তর বিক্ষিপ্ত ঐ কুটীরগুলির প্রতি চাহিয়া ভাবি—এখানেও লোক আছে! কে জানে কোনও অজ্ঞাত অনুপম সুকোমল রূপচ্ছায়ায় এই নীরস শুষ্ক রুদ্র কঠোরতাও তাহাদের নেত্রে সুকুমার কমনীয় কান্তিতে বিভাসিত কি না? কে বলিবে, কোনও সুদুর্ল্লভ স্নিগ্ধ সুধাসিঞ্চিত হইয়া এখানকার শত অভাব, শত অসুখ লইয়াও তাহারা পুলকপরিপূর্ণ কি না?

আমার পার্শ্বদেশে যূথিকার ন্যায় আর একরূপ বনফুল এক বৃন্তে রাশি রাশি ফুটিয়া দুলিতে থাকে, দুলিয়া দুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া' যেন উত্তরে কহে, "এখানকার এই রুদ্র প্রকৃতির মধ্যে সুকোমল সুখ কি চাহিয়া দেখ।"

খাতা একখানি কোলে, কলমটি হাতে লইয়া তাম্বুর মধ্যে আরাম চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছি,

কি লিখি; অনেক দিন হইতে গল্প লিখিতে অনুরুদ্ধ, লিখিতে ইচ্ছাও খুব, কিন্তু শূন্য মস্তিষ্ক মন্থনে বিষামৃত কিছুই উঠাইতে পারিতেছি না, নিরাশচিত্তে মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া আছি, দেখিলাম পুষ্পগুচ্ছহস্তা, পীতবসনা একটি মহারাষ্ট্রী কন্যা। এই আম্র নিকুঞ্জতলে প্রবেশ করিয়া অদূরে তাম্বুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, একজন সিপাহী তাহাকে আমার তাম্বু দেখাইয়া কি বলিল, সে প্রফুল্ল হরিণীর ন্যায় দ্রুতপদে ইহার দ্বারবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ একটু যেন থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর হাস্যমুখে সেলাম করিয়া ফুলের তোড়াটি আমাকে সমর্পণ করিল। দেখিলাম বালা কিশোরী, শ্যামা, সুবদনী, ললিতা। তাহার সুকোমল সহাস্য আনন, তাহার সুহাবভাব, এমন কি ফুল সমর্পণে তাহার সেই যে ভঙ্গীটি, তাহাতে পর্য্যন্ত আমার প্রীতি উৎপাদন করিল। কেবল তাহাই নহে, আমাকে দেখিয়া লজ্জাবতী লতাটির মত সহসা সে যে একটু বিষম কুণ্ঠিত ভাব ধারণ করিয়াছিল, পরিচিত প্রার্থিতের স্থলে অপরিচিত অজ্ঞাত মূর্ত্তি দর্শনে তাহার যে একটুখানি হতাশ জন্মিয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত আমার লাগিল ভাল। আমি ফুল লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা থেকে ফুল নিয়ে এলে" : সে বলিল, "গাঁ থেকে।" অবশ্যই গাঁ থেকে ; এই ক্ষেত্রপ্রান্তরের ত্রিসীমায় গোলাপ বেল প্রভৃতি কাননফুলের চিহ্নও দেখিতে পাই না। কিন্তু—"কোন গাঁ থেকে? গাঁ কি কাছে? ওপারে?" ভাবিয়াছিলাম নিকটের গ্রাম হইতেই আসিয়াছে। সে বলিল, "অনেক দূরে"—আর কিছু জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়া ও অতঃপর অভিবাদন পূর্ব্বক চলিয়া গেল। প্রান্তসাহেব প্লেগ তদারকী হইতে গৃহে ফিরিলে তাঁহাকে বলিলাম, "একটি মেয়ে একটি ফুলের তোড়া এনেছিল," তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "নিয়েছ ত?" "ঐ যে টেবিলেব উপর।"

"তার সঙ্গে ভাল ক'রে দুচারটে কথা কইলে? শুনেছি বেচারা অনেক দূর থেকে ফুল আনে।"

"তা অবশ্য কইলুম। কিন্তু আমাকে নতুন দেখে সে যেন একটু থম্‌কে গেল। পুরান লোকের হাতেই ফুলটি দিতে পারলে যেন বেশী খুসী হতো!"

"সত্যি নাকি?"

"আমি কি ঠাট্টা করছি? ও মেয়েটি কে? কেন ফুল আনে?" আমাকে তিনি চেনেন, একজন গরীব ফুলবিক্রেত্রীর সম্বন্ধে এইরূপ অপরূপ প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, বুঝিলেন ইহার মধ্যেই কোন একটি কল্পনা-শিখরের অনেক দূর উঠিয়াছি। হাসিয়া বলিলেন—

"বলতে পারছিনে ও মেয়েটি কে?"

"তা যেন নাই পারলে, কিন্তু ফুল দেয় কেন,—তার উত্তর?"

"ওদের ফুলের বাগান আছে বলে।"

"ফুলের বাগান ত অমন অনেকেরই আছে।"

"ভাগ্য ফেরে এই ব্যক্তিটিই কলেক্‌টারের ফুল যোগাত। নিশ্চয়ই পূর্ব্বজম্মের কোনরূপ নির্ব্বন্ধ ছিল—না?"

"কিন্তু কোন্ নির্ব্বন্ধে"—

"আমাকে যোগাচ্ছে; সেটা নির্ব্বন্ধ নয়, নিতান্তই বিধির বিপাক। একদিন ব্যক্তিটি

কলেক্‌টারকে ফুল দিতে এসে দেখলে আমি এখানে তাদের ছবি তুলছি, আমাকেও একটি দিলে।"

"সেই বাড়তিটি বুঝি? রোজই ওর হাতে কেন একটি তোড়া দেখি, বোধ হয় অন্য কাউকে দেবার জন্যে নিয়ে আসে, এখান থেকে সেখানে যায়।"

"কিম্বা নদীর জলে মানৎ ভাসাবার জন্যেও নিয়ে আসতে পারে ; যে জন্যই আনুক, আমার জন্য অবশ্য আনেনি।"

"তা কি করে বলা যায়! সেদিন হয়ত শুনেছিল"—

"হাঁ শুনেছিল! একটা কাজে আগের দিন পেনে এসেছি, পর দিন চলে যাব, এই দু একদিন মাত্র কলেক্‌টারের অতিথি ; এ খবরটা অমনি গাঁ রাষ্ট্র হয়ে গেল।"

"তা বুঝি হতে পারে না?"

"পারে? তবে হয়েছিল। ফুলগুলি আমার উদ্দেশ্যেই যদি সেদিন গুচ্ছাবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তাতেই বা এত দুঃখ কি?"

"সুখ হবারই ত কথা।"

"তা যদিও হচ্ছে না। বক্সিসটা দিয়ে যাওয়া হয়নি—তাই মনে মনে একটু অপরাধী আছি।"

"এবার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সহজেই হবে।"

"হাঁ, এবার ত আমাকে কলেক্‌টারের পদবীতে বসিয়ে রীতিমত খরিদ্দারভুক্ত করে ফেলেছে। যাহোক বেচারা অনেক দূর থেকে ফুল আনে, ওকে একখানি ভাল কাপড় দিও, তার উপর আর যা দাও", বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমি ভাবিলাম—"তা যেন দেব, কিন্তু সবই মিথ্যা! যাহা ভাবিয়াছিলাম তার কিছুই নয়। সুন্দরী মালিনীর ফুলোপহারে মধুর সুন্দর কোন ভাবেরই বিজড়ন নাই! পয়সার জন্য এ শুধু ফুল বিক্রয়!" অত্যন্ত নিরাশ হইলাম। প্রান্তসাহেব মিথ্যা আঁচেন নাই, আমি সত্যই ইতিমধ্যে বাতাসে মস্ত প্রাসাদ ফাঁদিয়া বসিয়াছিলাম। প্লেগ সম্বন্ধে ইঁহার খুব সুনাম আছে জানি। এখানে অবশ্য অল্প দিন আসিয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যেখানে ছিলেন সেখানে ইঁহার সকরুণ যত্নে গরীব গ্রামবাসীগণ কিরূপ বশীভূত ছিল সে সব গল্প শুনিয়াছি, তাহাই স্মরণ করিয়া, সেই ভিত্তির উপর ঐ ভগ্ন কুটীরে—প্লেগশুশ্রূষানিরত এই বিপন্ন বালিকা, এবং তাহার বিপদভঞ্জন পুরুষপ্রবরকে, ঔপন্যাসিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গাঁথিয়া, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই ফুলোপহারে গরীব ফুলওয়ালীর কৃতজ্ঞতারূপ অসীম হৃদয়বিভব উৎসর্গীকৃত দেখিয়া মনে মনে দিব্য আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলাম। ভ্রম সংশোধনে তাই বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলাম। এতক্ষণ ধরিয়া ফুলওয়ালীর সম্বন্ধে এত যে কৌতূহল, এতটা যে ভাবোচ্ছ্বাস, কল্পনাভঙ্গে সে সমস্তই যে শুধু শূন্যে বিলীন হইল এমন নহে, অধিকন্তু তাহার প্রতি এতটা অশ্রদ্ধা জন্মিল যে পরদিন তাহার মূর্ত্তির মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্যটুকু পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, অন্নচেষ্টারত সাধারণ গ্রাম্যকন্যার ভাব ধরিয়াই সে আমার নেত্রগোচর হইল।

তথাপি ভদ্রতার নিয়ম সর্ব্বস্থলেই অভঙ্গনীয়, আমি তৎপ্রদত্ত ফুলগুচ্ছ হস্তে লইয়া পূর্ব্ব দিনের মতই সাদরে বলিলাম—

"চমৎকার ফুল! বাগান তোমার নিজের হাতে?"

সে সেলাম করিয়া কহিল, "না সাব, মালী আছে, আমরা শুধু দেখি।"

"বাড়ীতে তোমার কে কে আছে?"

"মা।"

"আর কেউ নেই তোমার?"

"আছে। বিদেশে।"

"ফুল বিক্রীতে যা পাও তাতে তোমাদের বেশ চলে?"

"না, আমাদের ধানের ক্ষেত আছে।"

"ফুল কি তুমিই রোজ বাজারে বিক্রয় করিতে নিয়ে যাও?"

সে ইহার উত্তরে কোন কথা কহিল না, কেবল জিহ্বা ও তালুকার সংস্পর্শে একরূপ শব্দ করিয়া জানাইল, বাজারে ফুল বিক্রয় করিতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে অপমানজনক। আমি ভাবিলাম, স্বার্থকুশল বুদ্ধিতে মানুষ কিরূপ যুক্তির বিরোধী। বাজারে ফুল বিক্রয় করিতে যাওয়া যদি অপমানজনক হয় তাহা হইলে এখানে বিক্রয় করিতে আসাই বা অপমানের নয় কিসে? বলিয়াও ফেলিলাম, "এখানে যে আস তবে?" সে তাম্বুর স্তম্ভে ঠেসান দিয়া নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। এই নীরবতা তাহার হৃদয়লুক্কায়িত গুপ্ত রহস্যের সন্ধান করিয়া দিল, আমার স্বাভাবিক কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "তুমি বাজারে যাও না; আর একলাটি ছেলেমানুষ এতদূরে ফুল বিক্রী করতে এস; তাতে তোমার মা কিছু বলেন না?"

"তিনি জানেন না।"

"তিনি জানেন না? তুমি নিজে লুকিয়ে আস? কেন?" সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার যাহা বলিবার আছে, বলিবে কি না ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমি তাই বিশেষ অনুনয়ের ভাবে মিষ্ট করিয়া বলিলাম।

"বল না, বল, তাতে তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না; আমিও খুব খুসী হব।" সে বলিল—"যদি তার দেখা পাই, দেখতে।"

"কার?"

"প্রান্তসাহেবের।"

কি আবার আজগুবি কথা! আস্পর্দ্ধাও কম নহে,—যদিও আমি নিজেই পূর্ব্বেই প্রান্তসাহেবের সহিত এবিষয়ে কৌতুক করিয়াছি, কিন্তু এখন ভারী রাগ ধরিল, অথচ কি বলিব হঠাৎ যোগাইল না। সে আমার ভুল বুঝিয়াই বোধ হয় তাড়াতাড়ি কহিল—

"এ প্রান্তসাব নন; আর একজন।"

"কে তিনি?"

"আমার বোনের স্বামী।"

"তিনি প্রান্তসাহেব? বিলাত ফেরত মহারাষ্ট্রী বুঝি?"

"না, ইংরেজ।"

ইংরেজ! কিছুদিন পূর্ব্বে একজন পারসি ইঞ্জিনিয়ার আমাদের ক্যাম্পে অতিথি

হইয়াছিলেন। তিনি এদেশের উচ্চপদধারী গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের নানারূপ গল্প করিতেন, তন্মধ্যে দু একজনের সম্বন্ধে এইরূপ "নেটিভ" বিবাহ রহস্যের কথাও বলেন। ফুলওয়ালীর কথায় তাই আমার দ্বিগুণ কৌতূহল জন্মিল। বলিলাম—

"ইংরাজ তোমার ভগিনীপতি, তোমরা ত হিন্দু?"

"না, মুসলমান। আমরা বিজাপুর নবাব কন্যার বংশ।"

মুসলমান! কিন্তু ঠিক হিন্দু কন্যারই বেশ! ইহার আগে আমি এদেশে মুসলমানী দেখি নাই। নবাব বংশীয় হউক, নাই হউক, সে যে ভদ্রবংশীয় তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল। হাবভাব ধরণধারণ কথাবার্ত্তা সবেতেই একটি কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রকাশ পাইতেছিল বটে। আমি বলিলাম—

"তোমার দিদিকে তিনি কি করে জানলেন?"

"আমার বাবা তাঁর সিপাই ছিলেন, মরবার সময় আমাদের ভার তাঁকে দিয়া যান।"

"তখন তোমার দিদির বয়স কত?"

"ষোল। দিদিকে প্রান্তসাব পুনার স্কুলে দিয়েছিলেন, সেইখানেই তাঁদের দেখাশুনা হোত।"

"বিয়ে হোল কতদিন পরে?"

"একবছর পরে পুনাতেই। তারপর এই পেনেই এই বাগানে প্রান্তসাহেব দিদিকে নিয়ে এসেছিলেন, আমরা সবাই এসে দেখা করলাম। সেসব কথা আমার খুবই মনে আছে।"

"তখন তোমার বয়স কত?"

"সাত বৎসর। মা আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন—সাহেব—তোমার জন্যে আমাদের জাতকুল গেল, আমার এ মেয়েকে এখন ভাল লোকে কেউ বিয়ে করবে না, একটিকে তুমি নিয়েছ। এটিকেও নাও, তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"তিনি কি বল্লেন?"

"তিনি তাঁর চৌকির কাছে আমাকে টেনে নিয়ে আমার চুলে হাত দিতে দিতে বল্লেন —এখন এর বিয়ে কি? এখনো খুব ছোট।"

"তা ত ঠিকই বলেছিলেন।" ফুলওয়ালী আমার কথা না শুনিয়াই আপন মনে কহিয়া গেল।

"আমার হাতে একটি ফুলের তোড়া ছিল, আমি সেইটি তাঁকে দিয়ে বল্লেম,—'বড় হলে বিয়ে করবে'?"

"তিনি কি উত্তর দিলেন?"

"তিনি হেসে আমাকে চুমো খেয়ে বল্লেন—'করব'।" বলিতে বলিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিল। আমি তাঁহার দুঃখের কারণ ঠিক উপলব্ধি না করিয়া কহিলাম—"দিদিকে বুঝি খুব ভালবাসতে? তারপর আর দেখাশুনা হয়েছে?"

"না। তাঁরা সেই যে চলে গেছেন, আর আসেননি। দশ বৎসর থেকে আমি তাঁদের পথ চেয়ে আছি, এখানে তাম্বু পড়লেই তাঁদের দেখব প্রত্যাশা করে আসি।"

"ফুল বুঝি তাঁদের জন্যই আন?"

"হ্যাঁ, তাঁদের জন্য এনে অন্যকে দিয়ে যাই।"

"তা দেও কেন? ফিরিয়েঁ নিয়ে গেলেই হয়।"

"কি ছুতায় তাহলে ফের এখানে আসব যাব? যেটি তাঁরই জন্যে মনে করে আনি, সেটি ফিরিয়ে নিয়ে যাই।"

ফুলওয়ালীর বাড়তি তোড়ার ইতিহাস এতক্ষণে পাওয়া গেল। বলিলাম, "কি কর সেটি?"

"বাবার গোরের উপর রেখে দিই।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, সে কহিল, "রোজ ফিরে যাই, রোজ মনে হয় পরদিন তাঁকে দেখব, সাহেবলোকদের কাছে কত বন্ধুলোক আসে, একদিন তিনিও ত আসতে পারেন।" বহুবচন ছাড়িয়া সে দেখিলাম এইবারে একবচনে আসিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ত কথা কহা চলে না, কি তবে বলি ; বলিলাম, "তোমার বয়স এখন সতের না?"

"হাঁ সাহেব।"

"এখনো বিয়ে হয়নি?"

সে নেত্রবিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কি করে হবে; তিনি ত আসেননি এখনো?"

বালিকার মনের কথা এতক্ষণে সমুদয় বুঝিলাম। সে তাহার ভগিনীপতির উপহাস-বাক্য অঙ্গীকাররূপে হৃদয়ে গাঁথিয়া তাহাতে নিজে অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভ্রান্তময় সরল বিশ্বাসে মুগ্ধ ব্যথিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি জান না ইংরাজেরা এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে না, আর শ্যালিকে বিয়ে করার নিয়মও তাদের মধ্যে নেই।" "তিনি ত মুসলমান। দিদিকে বিয়ে করার জন্যে মুসলমান হয়েছিলেন। আমাদের বংশে ত অন্য বিয়ে হবার যো নেই।"

বিয়ে করার জন্য মুসলমান হয়েছিলেন। সম্প্রতি বিগামির চার্জ্জে যে সিলন সিভিলিয়ান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্মচ্যুত হইয়া বিলাতে দরখাস্ত করিয়াছেন, তিনিই কি তবে ইহার ভগ্নিপতি? তিনি ত ইংরাজ পত্নী থাকিতে মুসলমান হইয়া মুসলমানী বিবাহ করেন, কিম্বা ভুলিতেছি ; প্রথম বিবাহিতা মুসলমানী ভার্য্যা ত্যাগ করিয়াই বুঝি পুনরায় স্বদেশীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এই দ্বিজাতি দ্বিপত্নী পরিণয়ের পর্য্যায় পরম্পরার আবৃত্তিতে আমার ভুলচুক হউক, কিন্তু মূল ঘটনাটি সত্য। উক্ত শোচনীয় পরিণাম ফুলওয়ালীকে কহিয়া তাহার মনঃক্ষোভ জন্মাইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না, আমি শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি সিলনের সিভিলিয়ান হইয়া যান?" সে বলিল, "সে কোথা? আমি জানি না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ভগিনীপতির নাম কি?"

সে যাহা বলিল সিলন সিভিলিয়ানের নামের সহিত মিলিল না। সম্ভবতঃ তবে এ আর একজন—যদি না ইহারা নাম বিকৃত করিয়া থাকে। আমি চুপ করিয়া এ সম্বন্ধেই ভাবিতেছি—সে সহসা বলিল, "সাব, একটি আর্জ্জি আছে।"

"কি বল।"

"প্রান্তসাহেব তসবীর তোলেন—না।"

"হাঁ।"

"তাঁর তসবীর এঁর কাছে আছে কি?"

হাসিয়া বলিলাম, "এ প্রান্তসাব্ সবে ৪ বৎসর এ দেশে এসেছেন, আর তুমি বলছ তোমার প্রান্তসাব্ ১০ বছর এখানে আসেননি?"

"অন্য জায়গায় ত দেখা হতে পারে?"

"তা বটে, কিন্তু ইনি ও-নামের কাউকে চেনেন বলে আমি ত জানিনে। জিজ্ঞাসা করব এখন।"

সে বহুদিন হইতে ভবিষ্যতের সুখপানে চাহিয়া, নিরাশ, ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, সুতরাং এই আকাঙ্ক্ষাটি পূরণের জন্য পর্য্যন্ত আবার ধৈর্য্য ধরিতে চাহিল না, বলিল, "সাব্, প্রান্তসাহেবের ছবিগুলি একবার আমাকে দেখান না!" আমি তাহাতে অসম্মত হইবার কোন কারণ না দেখিয়া সিপাইকে ডাকিয়া তাঁহার টেবিল হইতে ছবিগুলি আনিতে আদেশ করিলাম। জানিতাম অবশ্য তাহাকে নিরাশ হইতে হইবে, কিন্তু কি করিব।

সিপাই ছবির রাশি আনিয়া আমার শয্যায় রাখিয়া চলিয়া গেল। ফুলওয়ালী আমার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই সোৎসুকে একের পর একে ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একবারে বিস্ময়ে আহ্লাদে "এই এই" করিয়া উঠিল।

আমি এতক্ষণ ছবির দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। তাহার কথায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম প্রান্তসাহেবের ছবির সঙ্গে দুচারিখানি রং জ্বলা ফটোগ্রাফ রহিয়াছে, সেগুলি সেই পার্সি ইঞ্জিনিয়ারের সম্পত্তি, তিনি এক দিন আমাদের দেখাইবার জন্য বাক্স হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তাহার পর দেখিতেছি ভুলিয়া ফেলিয়া গেছেন। সেই ছবিরই একখানি দেখিয়া সে হর্ষবিহ্বল হইয়া উঠিল, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "সাব, আমাকে এইখানি দিতে হুকুম হোক্", আমি বলিলাম, "ছবিখানি আমাদের নয়, আমাদের একজন বন্ধুর, তিনি ফেলে গেছেন। আচ্ছা, তাঁকে চিঠি লিখব; যদি তিনি দিতে বলেন ত তোমাকে দিব।"

সে বলিল, "কবে টের পাব সাব?"

"কাল না পরশুই উত্তর পাওয়া যাবে।"

সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ছবিখানি রাখিল। শয্যার উপর অন্যান্য ছবির সহিত একত্রে না রাখিয়া আমার ক্ষুদ্র বেতের টেবিলটির উপর সেখানি রাখিয়া তাহার বাড়তি ফুলের তোড়াটি তাহাকে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তৃতীয় দিনে নহে, আজ চতুর্থদিনে পার্সি সাহেবের উত্তর পাইয়াছি, তিনি ছবিখানি আমাকে লইতে বলিয়াছেন। আমি তাই আগ্রহ সহকারে ফুলওয়ালীর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি। সে প্রতিদিন তাম্বু প্রবেশ করিয়াই সাভিবাদনে সর্ব্বাগ্রে ঐ প্রশ্ন করে;—উত্তরে হতাশ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে আমার ফুলের তোড়া আমাকে দিয়া, অন্যটি ছবিখানির পদপ্রান্তে রাখিয়া সজলনয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকে। তাহার পর মুখ তুলিয়া আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে সেলাম করিয়া চলিয়া যায়।

ঐ সে আসিতেছে! তাহার ফুলের রূপে, তাহার নিজের রূপে ফুল্লপ্রভাত ফুল্লতর করিয়া ঐ সে চঞ্চল চরণে আসিতেছে। এই তাম্বু প্রবেশ করিয়া সাভিবাদনে আমার

নিকটে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, আমি তাহার হৃৎকম্পন অনুভব করিতেছি!

আজ সে প্রথমেই ফুলের তোড়াগুলি যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল, "খবর পেয়েছেন আর?" আমি বলিলাম—"পেয়েছি, ছবিখানি তোমার।"

তাহার নয়নে, আননে কি আনন্দ বিভাসিত হইল, সর্ব্বাঙ্গে কি প্রীতি পুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠিল ; সেই তরঙ্গাবেগ আমাকেও স্পর্শ করিতেছে। সে মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু তাহার নীরব কৃতজ্ঞতা অভিবাদন অধিকতর মর্ম্মগ্রাহী! তাহার সে সুখে আমি কেমন দুঃখিত হইয়া পড়িলাম,—ভাবিলাম কি অপরূপ ঘটনা! এই যৌবনবতী রূপবতী রমণী কি ঐ নির্জ্জীব ছবিখানির দর্শনে পূজায় আপনার জ্বলন্ত জীবন্ত শতপ্রাণবস্তু অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা চিরসমাধিস্থ করিবে?

ফুলওয়ালীর মুখে এরূপ কোন দুঃখের ছায়াও দেখিলাম না ; প্রীতিময়ী রমণী তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত ধনলাভেই যেন অসীম প্রীতিপূর্ণ হইয়া অঞ্চল হিল্লোলে দিগদিগন্তে সে আনন্দ প্রীতি বিস্তার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

শুষ্ক নীরস কঠোর পেন কাহার রূপে নবীন সরস সুকোমল, এখানকার শত অভাব, শত অসুখ কোন স্নিগ্ধতা সিঞ্চনে পুলকপ্রচ্ছন্ন, তাহা আমি এইবার হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৬

ছোটখাট মিউটিনি

বম্বে প্রদেশের সিন্ধুতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র স্থানে আমরা বাস করিতেছিলাম। মিসেস এ—র বাঙ্গলায় আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। আহারান্তে ইংরাজী দস্তুর মত পুরুষদিগকে ধূমপান, মদ্যপান, এবং তজ্জাতিসুলভ গল্পের বিরল অবসর প্রদান জন্য কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদিগকে ডিনার টেবিলেই রাখিয়া আমরা কয়েকজন স্ত্রীলোকে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছি।

শুক্লপক্ষ রজনী। সম্মুখে জোয়ারে স্ফীত উচ্ছ্বসিত, চন্দ্রকিরণে খচিতবিখচিত নীলাম্বু নিজের প্রাণের আবেগ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইয়া বিশ্ব প্লাবন ইচ্ছায় যেন মাতিয়া উঠিয়াছে ; অদূরে কোলাবার দুর্গ জলে ভাসাইয়া, দূর দূরান্তরব্যাপী শুভ্র বালুচর আচ্ছন্ন করিয়া ঠিক বাঙলা প্রান্তের কৃষ্ণ প্রস্তরস্তূপের সন্নিকটে যেখানে দুইটি সতীস্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে তাহার পাদদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, সহসা সাগরের সফেন তরঙ্গ ভীমগর্জ্জন মুহূর্ত্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছে ; তৎস্পর্শসাহসহীন সিন্ধুবর সেখান হইতেই সবিস্ময়ে শত নমস্কারে শত স্তুতিগানে তাহাদিগের চরণ বন্দনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে আবার পিছাইয়া পড়িতেছে।

সুদূর পশ্চিমে সমুদ্রবক্ষে কাণ্ডারী ও আন্ধারী দুর্গদ্বীপ দুইটির অন্ধকার কায়া জ্যোৎস্নালোকে অস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। এক সময়ে কানহোজি আঙ্গ্রিয়ে নাকি তাঁহার বন্দীদিগকে এই দ্বীপে আবদ্ধ রাখিতেন। এখন আঁধারী দুর্গ একেবারে জনশূন্য, কাণ্ডারী দুর্গ একটি লাইটহাউসরূপে পরিণত। লাইটহাউসের কর্ত্তা একাকী এই বিজন দ্বীপে তাঁহার একটি মাত্র সহচর ভৃত্য ফ্রাইডের সহিত রবিনসন ক্রুসোর জীবন যাপন করেন। উক্ত দীপস্তম্ভের ঘূর্ণ্যমান আলোক এখন জোনাকি ভাতির ন্যায় মাঝে মাঝে আমাদের নেত্রে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার হীনপ্রভ হইতে হইতে মুহূর্ত্তকাল একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছিল।

এইরূপ দৃশ্যসমূহ সম্মুখে রাখিয়া আমরা নানারূপ গল্প করিতে করিতে পুরুষদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাঁহারা আসিলে তবে গানবাদ্য অথবা নীরব হেঁয়ালি নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইবে।

আপাততঃ আমাদের গল্প চলিতেছিল ট্রানসভ্যাল যুদ্ধের ঐকান্তিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে জাতীয় বীরত্বের কথা আসিয়া পড়িল,—গৃহকর্ত্রী সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন —"তিন জন ফ্রেঞ্চম্যান পাঁচ জন জর্ম্মানের সমান, আর একজন ইংরাজ সেই তিন জন ফ্রেঞ্চম্যানের সমান।" খুবই গর্ব্বপূর্ণ কথা অথচ অযথাও নহে। ইংরাজ সংস্পর্শে আমি ইতিপূর্ব্বে জাতিগত অসমকক্ষতা কখনো অনুভব করি নাই, বরাবরই তাঁহাদিগের নিকট হইতে সম্যক সম্মান ও বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ এই স্বাধীন বীর-ললনার উক্তরূপ জাতীয় আত্মগৌরবে তৎসত্ত্বেও আমার হীনতা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। লজ্জায় অপমানে আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে শুধু বাকী রহিল। মনে মনে দগ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে দাসজীবনের একমাত্র সান্ত্বনা স্বরূপ পুরাতন আর্য্যগৌরব

স্মরণ করিতে করিতে সহসা বলিলাম—"ঐ যে সতীস্তম্ভ, উহা আংগ্রে রাজরাণীদিগের —না?"

মিসেস বি—আর একজন নিমন্ত্রিতা, তিনি বলিলেন—"এই রকম ত শোনা যায়; কি ভয়ানক নিষ্ঠুর আচার!"

আমি বলিলাম—"কিন্তু কি ভয়ানক সাহস!"

কেহ আর একথায় কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু মিসেস বি—র নীরব অধরৌষ্ঠ ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, তিনি মুখে কিছু না বলুন—যেন মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন—"ভারি ত সাহস! পোড়াইয়া মারিতেছে ইহাতেও কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই, ইহাই তোমাদের সাহস বটে! আর অধীনতা পেষণে পেষিত হইয়া পুণ্য সুখ জ্ঞান করা তোমাদের মত সাহসী লোকেরই স্বভাবসুলভ বটে।"

ভাবিলাম তিনি যদি এইরূপ বলেন আমি কি উত্তর দিতে পারি? যাহা হউক সে কথা সেইখানেই বন্ধ হইল, আমি বলিলাম—"ঐ দ্বীপ দুটি আংরের বন্দীখানা ছিল—না? উঃ আংরে কি কাণ্ডই করিয়াছিল; পেশোয়া, ইংরাজ, মুসলমান, পর্ত্তুগীজ কেহই তাহাকে হার মানাইতে পারেন নাই।"

মিসেস এ—বলিলেন—"Horrid! But he was only a pirate!"

তাহা সত্য! একজন স্বাধীন ইংরাজের পক্ষে যাহা বীরত্ব, একজন দাস নিগরের পক্ষে তাহা ঘৃণ্য সাহস-দস্যুতা নয় ত আর কি!

মিস সি—সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়া মিসেস এ'র অতিথি হইয়া আছেন। তিনি উক্ত দস্যুতা সিপাহি বিদ্রোহেরই একটি অঙ্গীভূত ঘটনা ভাবিয়া বলিলেন—"Oh, how dreadful! মিসেস এ,—আপনি কি ইণ্ডিয়ান মিউটিনির সময় এদেশে ছিলেন?"

মিসেস এ—হাসিয়া বলিলেন—"না, আমি ছিলাম না, তার প্রধান কারণ আমি তখনো জন্মাই নাই—কিন্তু আমার বাপ তখন এ দেশে ছিলেন।"

মিসেস—একজন স্কচললনা—স্কটলণ্ডবাসিগণের রহস্য জ্ঞান কম—ইংরাজগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। গৃহকর্ত্রীর এই ব্যঙ্গোক্তিতে তাই আমরা সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিলাম—কিন্তু তিনি এ ঠাট্টাটা বুঝিলেন কিনা জানি না—সহজ ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাবা কি মিউটিনির মধ্যে কখনো পড়িয়াছিলেন?"

মিসেস এ—বলিলেন, "না, আমার বাবা ত সৈনিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি না পড়ুন —আমি একবার একটা মিউটিনির মধ্যে পড়িয়াছিলাম। উঃ, সেকি ভয়ানক!"

আমাদের আর কৌতূহলের সীমা রহিল না। মিসেস বি—বলিলেন, "সত্যি, নাকি? কিন্তু এ অঞ্চলে আবার কবে মিউটিনি হোল?"

মিস্ সি—বলিলেন, "ওঃ, কি ভয়ানক।"

আমি বলিলাম—"বেশ মজার ত!" এইরূপে সকলেই আমরা সংক্ষেপে নিজ নিজ কৌতূহল ব্যক্ত করিয়া তাঁহার মিউটিনির অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তিনি আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেলেন, আমরা ভীত স্তম্ভিত নির্ব্বাক হইয়া শুনিলাম। যাহা বলিলেন সমস্তই সত্য ঘটনা; শুনিয়া কাঁদিব কি হাসিব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ কথার সত্যতা পাঠককে অনুভব করাইবার ইচ্ছায় আমরা এখানে তাঁহার মুখ

দিয়াই গল্পটি পুনরাবৃত্তি করিতেছি,—যদি কৃতকার্য্য না হই তবে সে আমারই বর্ণন অপটুতা।

"আমি বিবাহের পর সবেমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছি। ছেলেবেলায় কিছুদিন বাঙ্গলা দেশে ছিলাম বটে, কিন্তু তখন আমি এত ছোট যে সে কথা মনেই পড়ে না, এ দেশের সহিত সজ্ঞান পরিচয় আমার এই প্রথম। বম্বে আসিয়া স্বামী শক্করের আসিষ্টেণ্ট কলেক্টার নিযুক্ত হইলেন। আমরা দুজনে সিন্ধু দেশের রাজধানীতে আসিয়া ঘরকন্না গুছাইয়া বসিলাম। স্বামী মাঝে মাঝে যখন 'টুরে' গমন করেন আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই; কিছুদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাটাই, আবার শক্করে ফিরিয়া স্থিতির আরাম অনুভব করি। কিন্তু এক বার স্বামীর শুধু দুই চারিদিনের জন্য মাত্র কোন একটি গ্রাম তত্ত্বাবধানে যাইতে হইল, আমি আর এই অল্প সময়ের জন্য তাঁহার সঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা না করিয়া বাঙ্গলাতেই একাকী রহিয়া গেলাম। একাকী কথাটা এখানে কতদূর সঙ্গত তাহা লইয়া যদিও তর্ক উঠিতে পারিত, কেননা দাস দাসী শিপাই শান্ত্রিতে বাঙ্গলা সমানই পূর্ণ রহিল। তথাপি স্বামীর অনুপস্থিতি কালে আমার একাকীত্ব বিনা আপত্তিতে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়া গেল, এবং পূর্ব্ব হইতেই আমার অরক্ষিতা অবস্থা কল্পনা করিয়া অনেকেই খুব ঔৎসূক্য প্রকাশ করিলেন, এমনকি পুলিসকর্ত্তা স্বয়ং অনুকম্পা করিয়া সে কয়দিনের জন্য তাঁহার কতকগুলি সিপাহী পর্য্যন্ত আমার রক্ষকতা কার্য্যে প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি তাহা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না। আমি ভাবিলাম,—তাহা হইলে আমার নিজের সিপাহিদের প্রতি অন্যায় সন্দেহ দেখান হইবে; তাহারা ভাবিবে তাহাদের উপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস নাই। তাহাদিগের মনে দুঃখ দিতে আমার ইচ্ছা হইল না, ধন্যবাদ প্রদানে পুলিসকর্ত্তাকে তাঁহার দানে নিরস্ত করিলাম।

দেশে থাকিতে এ দেশের ভৃত্যদিগের সম্বন্ধে নানারূপ কথা শুনিয়া মনে হইত বটে তাহারা না জানি কিরূপ কিম্ভূত কিমাকার! নির্ব্বুদ্ধি বর্ব্বর ত বটেই—উপরন্তু সিপাহী সৈনিকের দল পশুবৎ নিষ্ঠুর, ভীষণ প্রকৃতি ও বিশ্বাসঘাতক। আমাদের দেশের সৈনিকের আদর্শে এবং মিউটিনির নানারূপ বীভৎস অত্যাচারের কথা হইতে বোধহয় আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশে আসিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের তুলনায় এ দেশের ছোট লোকেরা সৈনিকেরা বহু গুণে শিষ্ট শান্ত; এবং চাকর দাসীরা নির্ব্বোধ ত নহেই অধিকন্তু খুবই প্রভুপরায়ণ। আমার নিজের সিপাহী পাটাওয়ালাদের উপর ত আমার অগাধ বিশ্বাস জন্মিল; এরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্যবেষ্টিত থাকিয়া আমি যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তাহা বেশ জানিতাম। তাই পুলিসকর্ত্তার প্রস্তাবে মনে মনে বরঞ্চ উত্ত্যক্ত বোধ করিলাম; কিন্তু তাঁহার সৌজন্যে সমাদর করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলাম, "আমার সিপাহীরা থাকিতে আমি অরক্ষিতা নই—তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" স্বামী আমার উচ্ছ্বাসে হাসিতে লাগিলেন, আর পুলিস সাহেব মনে মনে চটিয়া নানা তর্ক যুক্তিতে আমার মত পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু কিছুতেই আমার অভিপ্রায় টলিল না। পুলিস সাহেবের অনুগ্রহ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর গমনের পর রাত্রে শুধু আমাদিগের নিজের প্রহরীর

প্রহরীত্বে নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে শয়ন করিতে গেলাম। আয়া আমার কক্ষেই রহিল।

কিন্তু হা বিধাতা! কর্ম্মফল এত হাতে হাতে ফলিবে তাহা কে জানিত? রাত্রি যখন গভীর তখন ভয়ানক কলরবে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখনো সম্পূর্ণ চেতনা হয় নাই, নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গে নাই, সেই অর্দ্ধ জ্ঞান অর্দ্ধমোহের অবস্থায় বাহিরের চীৎকার কোলাহল যেন শত কামানের ধ্বনিতে আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, অস্ত্রের ঝনঝনাও আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম। সেই ভীষণধ্বনিতে জ্ঞাত অজ্ঞাত যত কিছু বি ভীষিকারাশি আমার মানস নয়নে নৃত্য করিয়া উঠিল, আতঙ্কের বিদ্যুৎশিখা সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত তরঙ্গিত হইল, ৫৭ খৃঃ অব্দের মিউটিনির কথা মনে পড়িল, তাহার সূচনাও স্থানে স্থানে এইরূপেই হইয়াছিল। বুঝিলাম ইহাও সেইরূপ একটি মিউটিনির আরম্ভ—আর রক্ষা নাই।

অকূলসমুদ্রে মানুষ যেমন তৃণ ধরিতে চেষ্টা করে আমিও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া আয়া আয়া করিয়া চীৎকার করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু আয়াই বা এখন কোথায়? কই, এ ঘরে ত সে নাই? সেও কি তবে মিউটিনিয়ারদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে? আমার এত বিশ্বাসের কি প্রতিফল ইহাই? হায়, কেন পুলিশের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম? যাঁহারা বহুদিন এদেশে থাকিয়া ইহার ধারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের সাবধানতায় কেন কর্ণপাত করিলাম না।

আসন্ন মৃত্যু কল্পনায় ভয়াতিশয্যে আমার সমস্ত শক্তি যেন অবসিত হইল। উঠিয়া আত্মরক্ষার যে কোনরূপ চেষ্টা করিব তাহার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইলাম। ভয়বিহ্বল জ্ঞানহীন ভাবে শয্যাসীন হইয়া শেষ দিন স্মরণ করিতে করিতে একমনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। এই সময় আয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"মাদামসাব!" তাহার স্বর পূর্ব্বের ন্যায় সমান সম্মানসূচক, সমান ভক্তিপূর্ণ ; তাহাতে আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া উঠিলাম ; —হাতের কাছে একটা সহায় বন্ধু দেখিয়া সহসা বিবেচনাশক্তি ফিরিয়া পাইলাম, এতক্ষণ ভয়ে আর সমস্ত মানসিক বৃত্তি যেন লোপ পাইয়া গিয়াছিল। আয়ার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়া আসায় সিপাহীদিগের প্রতিও বিশ্বাস ফিরিল। ভাবিলাম, আমার সিপাহী নহে, শঙ্করের সৈনিকগণ বিদ্রোহী হইয়া আমার বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়াছে। আমার কয়েকজন সিপাহী তাহাদের তুলনায় নিতান্ত সামান্য সংখ্যক, আমাকে রক্ষা করিবে কি করিয়া?

চকিতের মত এই অনুমান আমার মাথার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল ; আমি কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাহিরে কিসের কলরব? কি হইয়াছে? আমার সিপাহীরা কোথায়?" আয়া ইহার উত্তরে অনেক কথাই বলিল, কিন্তু আমি কি ছাই তাহার ভাষা বুঝি? অল্পদিন এ দেশে আসিয়াছি, দুএকটা কথার টুকরা বুঝিতে ও কহিতে শিখিয়া তাহার সাহায্যে আকার ইঙ্গিতে কোনরূপে কাজ চলাই মাত্র। আয়া যাহা বলিল তাহার মধ্যে তিনটি কথা আমার বোধগম্য হইল—"পুলিশ, সিপাই, লড়াই।" আমার অনুমানই ত তবে ঠিক! শুনিয়াছিলাম শঙ্করের গুপ্তদুর্গে বহুসংখ্যক সৈন্য আছে, তাহারাই যে বিদ্রোহী সে সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। পুলিশ সিপাহি আর সৈনিক সিপাহি যে স্বতন্ত্র তখন সে জ্ঞান ছিল না। আয়ার কথায় আমার পূর্ব্বাশঙ্কা আবার সবলে ফিরিয়া আসিল, পাগলের মত বলিলাম, "লড়াই, মিউটিনি? তাহারা আমাকে হত্যা করিবে? Oh! help help!" আয়া আমার সমস্ত কথা না বুঝুক, আমি যে খুব ভয় পাইয়াছি তাহা বুঝিয়া

বলিল, "নেহি নেহি মাদামসাব!"

"নেহি নেহি? No help. No hope! Oh, God save me! Oh, save me!"

বাহিরে অস্ত্রের ঝনঝনা যেন আরো বাড়িয়া উঠিল, কলরব ভীষণতর রূপে আমার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, আমি help me oh God বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বিছানার বাহির হইতে গেলাম ; কিন্তু পারিলাম না, সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। উঃ, কি ভীষণ রাত্রি!"

বলিয়া তিনি থামিলেন। আমরা এতক্ষণ নীরব ঔৎসুক্যে তাঁহার কাহিনী শুনিয়া যাইতেছিলাম। তিনি থামিলে বলিলাম, "কি ভয়ানক! তারপর?"

তিনি বলিলেন, "তারপর আমি মরি নাই নিশ্চয়ই, তাহা হইলে এ গল্প আর শুনিতে পাইতেন না।"

"কিন্তু শেষে কি হইল? সত্যই কি মিউটিনি!"

"না। এতটা ঝড় শুধু চাদানীর মধ্যে বহিয়াছিল।"

আমরা আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন—"মূর্চ্ছাভঙ্গে বা নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম আয়া তখনো আমার সেবা করিতেছে—রাত্রিও ভোর হইয়াছে, আর বাহিরের কোলাহলও একেবারে নিস্তব্ধ। আমি যেন দুঃস্বপ্ন ভঙ্গে সহসা জাগিয়া উঠিয়া প্রশান্ত প্রভাতালোকে বিস্মিত হইয়া চাহিলাম। কিন্তু তখনো কেমন মনে করিতে পারিলাম না যে, রাত্রের অত কোলাহল অত ভয় সমস্তই বৃথা স্বপ্ন, একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আয়া, এতক্ষণ একটা ভয়ানক চীৎকার গোলযোগ চলিয়াছিল?"

আয়া স্নেহকণ্ঠে বলিল—"না সাব, তুমি ঘুমাও।" রাত্রি ত প্রভাত হইয়াছে—তখন আর ঘুমাইব কি, আমি প্রতিবেশ পরিধান অভিপ্রায়ে বিছানা হইতে উঠিতে উঠিতে তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আয়া, আমার যেন মনে হইতেছে রাত্রে খুব একটা গোলমাল হইতেছিল—কি হইয়াছিল?"

আয়া আবার কত কি বকিয়া গেল—তাহার সেই বাক্যসমষ্টির মধ্য হইতে আমি আবার পূর্ব্বরাত্রের সেই কয়টি কথা সংগ্রহ করিলাম—"পুলিস, সিপাই, লড়াই।" কিন্তু শান্ত প্রভাতে আর পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় সে কথায় আমাকে ভয়াভিভূত করিল না। আসল ঘটনাটা কি জানিবার জন্য শুধু কুতূহলী হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আয়ার কথা হইতে তাহা বুঝিবার আশা করিতে গেলে পুনর্জ্জন্মের জন্য—doomsday পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। অতদিন সবুর করিতে আমার ধৈর্য্য নাই। কাজেই আমাকে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। একজন সিপাহী কিছু কিছু ইংরাজী বলিতে পারিত—আমি তাহাকেই ডাকিতে বলিলাম।

তাহার কাছে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বুঝিলাম যত অনর্থের মূল আমাদের পুলিশ সাব। আমার কথা না মানিয়া রাত্রিকালে তিনি তাঁহার কতকগুলি সিপাই আমার রক্ষার জন্য পাঠান, ইহাতে আমার সিপাইরা অপমানিত জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে কহে, এই কারণে ক্রমশঃ উভয়পক্ষে রীতিমত বাক্য সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সেই কলরবে নিদ্রোত্থিত হইয়া আমি ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ি।

পুলিশ কর্ত্তার উপর যে কি ভয়ানক রাগ হইল—কি বলিব?

তাঁহার মূর্খতাকে ধন্যবাদ! আমাকে রক্ষা করিতে গিয়াই তিনি অর্দ্ধমৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন!

কিন্তু পশ্চাৎ জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি একাই দোষী নহেন, প্রণয়দেবতারও ইহাতে কিছু হাত ছিল। আমার পাটাওয়ালাদের একজন, আয়ার প্রতি অনুরাগিণী, তাহাদের রোমান কাথলিক মতে শীঘ্রই বিবাহ হইবে। পুলিশ সিপাহির মধ্যেও একটি যুবকের সে আরাধ্যা, কিন্তু সে বেচারী অল্পদিন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, বেশী অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে নাই, তাই আয়ার অভিভাবকেরা তাহার বিবাহ প্রস্তাব গ্রাহ্য করে নাই, তাহার আশা নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে। তথাপি তাহাকে আমার বাঙ্গলায় আয়ার এত সন্নিকটে দেখিয়াই উহার ভাবী স্বামীর মন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রণয়ীদ্বয়ের এই ঈর্ষা-স্ফুলিঙ্গেই সে রাত্রের দুই পক্ষের সিপাহীগণের বিদ্বেষানল প্রথম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

ভারতী, আষাঢ় ১৩০৭

অমরগুচ্ছ

১.

আমি বালবিধবা। বিবাহের আনন্দ সঙ্গীত নীরব হইতে না হইতে নিরানন্দ ক্রন্দনে আমাদের গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তখন শিশু বলিলেও হয়। আমার বয়স তখনও বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। পিতার সেই শোকপীড়িত মূর্ত্তি, মাতার সেই হৃদয়-বিদারক বিলাপধ্বনি মনে পড়িলে এখন আমি যন্ত্রণাকাতর হইয়া পড়ি, কিন্তু তখন সে সকল কিছুই আমার মর্ম্মভেদ করিতে পারে নাই; নিজের পরিণাম বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত তখন আমার জন্মে নাই।

আমি পিতামাতার একটি মাত্র কন্যা; বড় সাধের আদরের কন্যা। আমার দুঃখে পিতামাতা আমা হইতেও অধিক কাতর। তাঁহাদের অজস্র করুণা শতসহস্রধারে অহরহ আমার প্রতি বর্ষিত, আমার কোন একটি সামান্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তাঁহারা অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু এত আদর যত্নেও কি আমি সুখী?

বলা বাহুল্য, বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত আমি আর শ্বশুর গৃহে যাই নাই। বিধাতার বিধানে পিত্রালয়ই চিরদিন আমার আলয়। আহারে, সাজসজ্জায় পিতামাতা আমাকে এতদিন বিধবার আচার পালন করিতে দেন নাই। কিন্তু আমি বুঝিতে শিখিয়া অবধি তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দিয়াও বিধবার আচার রক্ষা করিয়া চলি। ইহাতে লোকে আমাকে প্রশংসা করে, কিন্তু সেজন্য আমি চরিতার্থ জ্ঞান করি না। যাহার আসল সুখসম্পদ চলিয়া গিয়াছে, নকল সুখসম্পদে তাহার তৃপ্তি কোথায়! তাহাতে কেবল অতিরিক্ত অনুতাপবেদনা জাগাইয়া তুলে। ভগবান আমাকে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তব্য পথে চলা আমার আয়ত্তাধীন, তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিব কেন?

স্বামীকে আমার মনে পড়ে না। যাহার অভাবে আমার সমস্ত জীবন শূন্য, তিনি কে তাহা আমি ঠিক জানি না। তবুও তাঁহার স্মৃতিতে, তাঁহার ধ্যানে হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাই। ইহাই আমাদের আজন্ম শিক্ষা, চিরন্তন সংস্কার। তাহা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, পুণ্য কি পাপ সে তর্ক পর্য্যন্ত আমার মনে উদয় হয় না।—দূরাতীত সুখ-স্বপ্নের ন্যায় কখনও কখনও বিবাহের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটি ছায়াময় মূর্ত্তি মনোপটে বিভাসিত হয়। তাহা জীবন্ত আকারে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দারুণ আকুলতা জন্মে। কিন্তু মনের আবেগ মনে রুদ্ধ করিয়া, অশ্রুমলিন নয়নের সমক্ষে তখন একখানি ফটোগ্রাফ আনিয়া ধরি।

ফটোগ্রাফখানি আমার স্বামীদেবের, বহুদিনের তোলা, তাই রেখাবিলীন, অস্পষ্ট, লুপ্তসাদৃশ্য। এই ছবি তাঁহার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, সুতরাং ইহার মত মূল্যবান বস্তু আমার আর কিছুই নাই। একটি ক্ষুদ্র চন্দনকাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে ইহা আমি বহু যত্নে তুলিয়া রাখি। বাক্সটি আমার শয়নকক্ষের কোলঙ্গায় থাকে। আমি যেখানেই যাই ইহাকে সঙ্গছাড়া করি না।

এই ছবিখানি অকূলসমুদ্রে ভাসমানা আমার জীবন তরণীর পক্ষে ধ্রুবতারা স্বরূপ।

যে কারণেই হউক, যখন হৃদয়প্রাণ নিতান্ত শ্রান্তদুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি বিশ্বাস লোপ পায়, জীবন অসহ্য যন্ত্রণাময় এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার নিরাশা বলিয়া মনে হয়, তখন আমি এই ছবিখানি দেখি। ইহা কি সম্মোহন মন্ত্রপূতঃ জানি না, দেখিতে দেখিতে আমার দুর্ব্বল হৃদয় সবল হইয়া উঠে, নৈরাশ্যাভিভূত প্রাণে আশা সঞ্চারিত হয়, অন্ধকার ভবিষ্যৎ আলোকরেখায় রঞ্জিত হইতে থাকে। মনে হয় ভগবান সত্যই নিষ্ঠুর নহেন ; চির দুঃখ সংসারে নাই। অন্ধকার রজনী শেষে ঊষার আলোক অবশ্যম্ভাবী ; প্রচণ্ড ঝটিকাবসানে শান্তিমঙ্গল স্বতঃ উৎসারিত, আর এই বালিকার অদৃষ্টেই কি ভগবান চিরদুঃখ লিখিয়াছেন! তাহা হইতেই পারে না। মনুষ্যের জীবন, জন্মজন্মান্তরূপ বৃহৎ উন্নতি গ্রন্থের এক একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ, এক পরিচ্ছেদে যদি বা হাহাকার, অন্য পরিচ্ছেদে মহানন্দ। বিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আলয় নহে, হইতেই পারে না।

একবার আমি এই চন্দন বাক্সে আমার দেবপদতলে কতকগুলি ফুলঅর্ঘ্য রাখিয়াছিলাম। সচরাচর যেরূপ ফুলে লোকে দেবপূজা করে ইহা সেরূপ কোন ফুল নহে। জবার সৌন্দর্য্য কিম্বা গোলাপ বা শতদলের সুগন্ধ তাহাতে ছিল না। সেগুলি সামান্য শোভাময়, নির্গন্ধ, ক্ষুদ্র, পর্ব্বতকুসুম! সহজে শুখায় না, তাই তাহার নাম অমর পুষ্প। আমাকে আনন্দদানের জন্য এক নির্ভীক হস্তে তাহা আহৃত হইয়াছিল।

আমি তখন বয়সে ষোড়শী, আমার ভ্রাতার সহিত নৈনিতাল পাহাড়ে বাস করি। দাদা পশ্চিম প্রদেশের সিভিলিয়ান, প্রায় প্রতি বৎসরেই গ্রীষ্মের সময় ছুটী লইয়া এইখানেই অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, দাদা দেশে ফিরিয়া বিদেশী আচার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যখন তাঁহার কাছে থাকি, ইংরাজের সহিত আমার আলাপ করিতে হয়। তবে এখানেও স্বদেশী পুরুষের নিকট আমি বাহির হই না।

সেদিন রবিবার। আহারান্তে আমরা কাচের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছি। দাদা আরাম চৌকিতে শুইয়া গুড়গুড়ির নল টানিতে টানিতে ছবির কাগজ দেখিতেছেন—আর আমি তাঁহার পদপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মোড়ায় বসিয়া, তাঁহার মুখনির্গত ধূমপুঞ্জের দিকে চাহিয়া তাহা হইতে নানারূপ ছবি সৃজনের প্রয়াস করিতেছি। এই সময় চাপরাশি আসিয়া দাদাকে একখানি কার্ড আনিয়া দিল। দাদা নাম পড়িয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাল্লো! কে এসেছে বল্ দেখি! এঞ্জেল্! সিপয়, তাঁকে এখানে আন।"

এঞ্জেল দাদার একটি বিলাতী বন্ধু। ইঁহার গল্প দাদার মুখে যখন তখন শুনিতে পাই। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া আমিও আনন্দ সহকারে বলিলাম, "মিষ্টার চাটার্য্যী, সত্য নাকি? তুমি দেখছি এবার তা হলে দেশে বসেই বিলাত উপভোগ করবে?"

এই বলিয়া আমি সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার মানসে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দাদা আমার অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "সে হবে না। তুই যেতে পাবিনে। এখানে ইংরাজের সঙ্গে দেখাশুনা করিস, আর এঞ্জেল আমার এত অন্তরঙ্গ বন্ধু—তার সঙ্গে দেখা না করলে সে কি মনে করবে বল দেখি? তোর থাকতেই হবে।"

এইরূপে আমি সেখানে রহিয়া গেলাম! অল্পক্ষণ পরেই দাদার বন্ধু গৃহাগত হইলেন, এতদিন যাঁহার গল্প শুনিয়া আসিতেছি, তাঁহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলাম।—

২

এক সপ্তাহ তিনি আমাদের অতিথি হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের মত ক্ষণস্থায়ী অতি ক্ষুদ্র একটি মাত্র সপ্তাহ; কিন্তু এই কালবুদ্বুদবিন্দুর সংস্পর্শে, আমার সুপ্তহৃদয় কি অভিনব মধুর অভিজ্ঞতায়, কি অসীম সুখ হিল্লোলে চঞ্চল, জাগরিত হইয়া উঠিল। বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে—সে সপ্তাহ এমন আত্মহারাভাবে কাটিয়াছিল যে আমার সেই প্রতিদিন পূজ্য ছবিখানি পর্য্যন্ত দেখিতে মনে পড়ে নাই।

অতিথি যে কয়দিন ছিলেন প্রায়ই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু কথাবার্ত্তা কিছুই প্রায় হইত না। দাদাতে তাঁহাতে ইংলণ্ডের গল্প করিতেন, আমি মুগ্ধ কর্ণে শুনিয়া যাইতাম। কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইত,—কিন্তু কে জানে কেন জিহ্বাগ্রে আসিয়া সমস্তই নীরব হইয়া পড়িত।

অতিথি দূরে থাকিলে কত প্রশ্ন, কত কথা মনে মনে রচনা করিয়া রাখিতাম, কিন্তু তাঁহার পদশব্দ শুনিলেই হৃৎপিণ্ডে শোণিতরাশি এমন বেগে উথলিয়া উঠিত যে মনে হইত সে শব্দ যেন তাঁহার কাণে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতেছে। আমি লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িতাম। অতিথি নিকটে আসিয়া প্রতিদিন একটি দীনা, মলিনা, বাকশক্তিহীনা বালিকাকে মাত্র দেখিতেন! দেখিয়া কি মনে করিতেন তিনিই জানেন।

সকলেই বলিত আমাদের অতিথি বেশ সুপুরুষ। আমি মনে করিতাম তাঁহার মত সুন্দর পুরুষ সংসারে দ্বিতীয় নাই। যখন ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাকে একত্র দেখিতাম তখন আমার নয়নে নক্ষত্র বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি শোভা পাইতেন। কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টিতে, ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আমার কখনও সাহস হইত না। নয়নে নয়ন সংলগ্ন হইলেই দৃষ্টি আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িত। এই চকিত দর্শনেই কি মহাপুলক শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উঠিত! জানি না পূর্ণ দর্শনে, পূর্ণ বাক্যালাপে ইহা হইতেও অধিক সুখ সম্ভব কিনা!

সপ্তাহ প্রায় কাটিয়া আসিল। অতিথির বিদায়ের আর একটি দিন মাত্র বাকী আছে। দাদা সেইদিন আমাদিগকে লইয়া টাইগারহিলে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নইনিতালের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম টাইগারহিল। এখান হইতে তুষারাচল শ্রেণী—অতিশয় সুবিস্তৃত ও মনোহররূপে নেত্রগোচর হয়। দারজিলিং গিয়া সিঞ্চলশিখর হইতে প্রত্যূষে মেঘশূন্য নির্ম্মল দিগন্তে নব সূর্য্যকিরণদীপ্ত তুষারশৃঙ্গরাজির শোভা যিনি না দেখেন তাঁহার যেমন দারজিলিং যাত্রা বৃথা, টাইগারহিল হইতে হিমালয় শোভা না দেখিলে নইনিতাল যাত্রাও সেইরূপ সুসিদ্ধ হয় না।

আমরা পরদিন স্নিগ্ধ সূর্য্যালোকসিঞ্চিত প্রাতঃকালে ফুল্ল-বসন্তশোভিত পার্ব্বত্য পথে সুন্দর দৃশ্য ও সুগন্ধ বায়ু উপভোগ করিতে করিতে শিখর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

শিখর পথ স্থানে স্থানে প্রশস্ত, স্থানে স্থানে অতিশয় সঙ্কীর্ণ, এবং সর্ব্বত্রই কষ্টকর চড়াই। যাত্রাকালে দাদারা অশ্বারোহণে আমার ডাণ্ডির দুইপার্শ্ব অবলম্বন করিয়া চলিলেন, —কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তফাৎ হইয়া পড়িলাম। অশ্বারোহী দুইজন কখনও আমার পাশে, কখনও সম্মুখে, কখনও নিকটে, কখনো দূরে, কখনও আবার বাঁক পথে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন—কিন্তু পথিপার্শ্বের দৃশ্যমান গোলাপ

পুষ্পোত্থিত সুরভির ন্যায়, এবং দূরাগত অদৃশ্য বসন্তহিল্লোলের ন্যায়—দূরে বা নিকটে সর্ব্ব সময়েই আমি তাঁহাদের নৈকট্য অনুভব করিতেছিলাম।

বসন্তকালে নৈনিতালের মত রমণীয়শোভা অন্য কোন পাহাড়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পর্ব্বতের ঢালু অঙ্গে, উচ্চশৈলে, পথের আর্শ্বেপার্শ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে, যেখানে সেখানে, নবপল্লবিত, শৈবালজড়িত শ্যামকান্তি তরুরাজি। তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, শাখায় পাতায়, বন্য গোলাপলতা জড়িত বিজড়িত হইয়া একে দুয়ে, স্তবকে গুচ্ছে, ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। আমার মনে হইতে লাগিল, না জানি এ কোন মায়াকাননের মধ্য দিয়া, কোন পরীরাজ্যের দিকে প্রধাবিত হইয়াছি।

নয়নদৃষ্টিতে প্রতি পলকে পলকে অলকার এই সৌন্দর্য্য বিকাশ, নিশ্বাসের আকর্ষণে আকর্ষণে এই সুরভি উচ্ছ্বাস, এবং জানি না ইহা ছাড়া আর কি, আমাকে সুখোন্মত্ত করিয়া তুলিল। অতি সুখে আত্মহারা হইয়া ভুলিয়া গেলাম আমি বিধবা। এতদিনের সযত্ন অভ্যস্ত আত্মসংযম এক মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলিয়া বালিকা-স্বভাব-সুলভ চপল বাসনায় আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি স্বহস্তে কতকগুলি গোলাপ তুলিবার মানসে ডাণ্ডিওয়ালাদিগকে ক্ষণকালের জন্য ডাণ্ডি নামাইতে বলিলাম।

কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালাদিগের এখন গোলাপবাগানে কাটাইবার সময় নহে। স্কন্ধের বোঝা যথাস্থানে নামাইতে পারিলেই তাহারা আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচে। অতএব আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া হন হন করিয়া চলিতে চলিতে তাহারা বলিল—"উপরে ঢের ফুল আছে, সেখানে গিয়া তুলিলেই হইবে।"

কি করিব? সেই আশাতে প্রলুব্ধ হইয়া অগত্যা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

৩

কখন যে শিখরে আসিয়া পড়িয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সহসা একস্থানে ডাণ্ডিওয়ালাদের সমতান শব্দ অকারণে যেন নীরব হইয়া গেল, আর তন্মুহূর্ত্তে ডাণ্ডিখানাও তাহাদের স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূমে নামিয়া পড়িল। চমকিয়া উঠিলাম, মনে হইল একি এ কোথায় নামাইতেছে! কিন্তু অশ্বারোহীগণকে নিকটে দেখিয়া মুহূর্ত্তে আশ্বস্ত বোধ করিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কি মনোমুগ্ধকর চমৎকার দৃশ্য! চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলাম কি যেন ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে আমাদের পদতলের পাহাড় দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, আমরা তুষারদৃশ্য সম্মুখে করিয়া এক সমুচ্চ চূড়ায় চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি। তুষারাচল শ্রেণী, দিগ্বলয় বিলোপ করিয়া উচ্চনীচ শত শৃঙ্গে, স্তরে স্তরে, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে, নীল শুভ্র মেঘাম্বরে—হীরকমণ্ডিত স্তম্ভ শোভায়, শত নক্ষত্রদীপ্তিতে অপূর্ব্ব গম্ভীর মহিমায় বিভাসিত! ইহাই কি কৈলাশ! আমরা কি সহসা জীবন্মুক্ত, সশরীরে দেবনিকেতনে আগমন করিলাম! সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বিভ্রম হইতে লাগিল, ভয় হইতে লাগিল এখনি এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভৃত্যগণ আগে হইতে আসিয়া একটি ক্ষুদ্র শিবিরে খাদ্যাদি প্রস্তুত রাখিয়াছিল। —সেখানে বিস্তর কালক্ষেপ না করিয়া যথা সম্ভব শীঘ্র আমরা বাহিরে প্রত্যাগমন করিলাম। ডাণ্ডিওয়ালাদিগের আশ্বাস বাক্য তখন স্মরণ হইল; আমি চারিদিকে গোলাপ লতার

অন্বেষণে নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু হা অদৃষ্ট। গোলাপফুল ত দূরের কথা, কোন ফুলই সেখানে দৃষ্টিগোচর হইল না। এমন কি শিখরতলে তরুলতার শ্যাম শোভা পর্য্যন্ত নাই, ক্ষুদ্র তৃণগুল্মাদিতেই মাত্র তাহা আবরিত।

ডাণ্ডিওয়ালাদিগের প্রতারণা বুঝিয়া তাহাদের উপর মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম। —কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাই তাহাদের চূড়ান্ত অপরাধ হইলেও বাঁচিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিতে না বাজিতে তাহারা আমাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। —বলিল, নিম্নপথে অন্ধকার হইয়া গেলে বিপদ সম্ভাবনা। আমি ভাবিলাম—আবার একটা প্রতারণা, এ কেবল আমাদিগকে শীঘ্র গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ফন্দী মাত্র।

কি করিয়া আমি তাহাদের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব! ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা কি করিয়া তখন আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে? আমি যে তখন সংসারানভিজ্ঞ, নিতান্ত অদূরদর্শী, ষোড়শবর্ষের বালিকা মাত্র। আমি তখন কেবল অনুভব করিতেছিলাম আমার অন্তর বাহিরের মধুরতা, আমার মোহময়, সুখময় অস্তিত্ব। তাহার পরপার দর্শনের ক্ষমতা আমার তখন কোথায়? বর্ত্তমান সুখে মাত্র আমি তখন পূর্ণ ভাবে জাগ্রত, জীবন্ত, মগ্ন।

কিন্তু আমার ইচ্ছা আমার অসন্তোষ প্রকাশের সাহস আমার নাই। বালিকা হইলেও আমি যে বিধবা, চিরদিন সুখের ইচ্ছা গোপন করিতে অভ্যস্ত। আজ সহসা এ বাসনা জানাইলে দাদা কি মনে করিবেন? আর অতিথিই বা কি মনে করিবেন? তথাপি আমি আজ মৌন থাকিতে পারিলাম না, দাদাকে আগ্রহে বলিলাম ; "দাদা, আর একটু বেড়ান যাক্, নিদেন আমরা একটুখানি বরঞ্চ হাঁটিয়া নামি, ঐ মাইল ষ্টোনের কাছে গিয়া ডাণ্ডিতে উঠিব।" দাদা তাহাতে হাসিয়া সম্মত হইলেন। আমরা তিনজনে হাঁটিয়া নামিতে লাগিলাম, ভৃত্যেরা আমাদের অনুবর্ত্তী হইল।

৪

আমরা শতপদ নামিয়াছি কি না সন্দেহ, দেখিলাম আমাদের বামদিকে, অদূরের একটি শৈলগাত্রে কতকগুলি ফুল ফুটিয়া আছে। আজ আমার কি হইয়াছে কে জানে! এতদিনের সযত্নরুদ্ধ মনোদ্বার এই মুগ্ধ শিখরবায়ুতে সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়া বুঝি আর স্বস্থানে পুনঃস্থাপিত হইতে চাহে না! আমি লজ্জা সঙ্কোচ ভুলিয়া স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ভরে বলিয়া উঠিলাম,—"দেখ দাদা, দেখ, কি সুন্দর ফুল!"

দাদা বলিলেন—"তাই ত! কিন্তু তুই গোলাপ খুঁজছিলি, ও ত গোলাপ নয়।" আমি বলিলাম—"তবুও কি সুন্দর! তুলিবার যো নেই—না! যে দূরে!"

ইহাতে কি কাহারো প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরোধ ব্যক্ত হইল? কে জানে। অতিথি আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"এমনি কি দূরে ; আমি আনিতেছি।" বলিয়া তিনি কাহারো নিষেধ বাক্য স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বেই সোৎসাহে ক্ষিপ্রপদে খদে নামিতে আরম্ভ করিলেন।

যে পাহাড়ে ফুল ফুটিয়াছিল তাহা আমাদের দূরবর্ত্তী না হইলেও একটি স্বতন্ত্র শৈল। এদিক দিয়া সম্ভবত কেহ সেখানে যায় না—উভয় পাহাড়ের মধ্যে কোন পদচিহ্নই নাই। অতএব পথ যাহা তাহা সমস্তই বিপথ, প্রথম কিয়দংশ ঢালু পিচ্ছিল অবরোহণ, পরে

দুরূহ আরোহণ, এবং উভয় পাহাড়ের সন্ধিস্থলে প্রস্তরস্তূপ পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র পয়োপ্রণালী। বর্ষাকালে তাহা জলপূর্ণ হইয়া থাকে, এখন উহার কোথাও স্বল্পজল, কোথাও একেবারে শুষ্ক। তিনি এইরূপ বিপদসঙ্কুল বিপর্য্যয় পথে কখনো দ্রুত অবতরণে, কখনো সুধীর আরোহণে, কখনো বৃক্ষশাখা ধরিয়া, কখনও সাবধানে প্রস্তরখণ্ডে পদরক্ষা করিয়া গম্যস্থান উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

প্রশান্ত প্রভাতে সহসা ঝটিকা সূচনা দেখিলে লোকে যেরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠে, দাদা এই কাণ্ড দেখিয়া সেইরূপ বিব্রত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমিই এই অনর্থের মূল, —আমাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু ক্রোধে, তিরস্কারে কিছুতেই এখন আর এ কর্ম্মফল খণ্ডিত হইবার নহে, হঠাৎ যেন এই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, আমার প্রতি তাঁহার জনান্তিকে ভর্ৎসনা সংহরণ পূর্ব্বক, তিনি অতিথিকে, প্রকাশ্য উৎসাহ বাক্যে এই দুঃসাহসিক কার্য্য সমাধায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

আর আমি? পাঠিকা কি আমার তখনকার মনের অবস্থা কল্পনা করিতে পারেন? সত্যই আমি তাঁহার এই বিপদের কারণ। তাহা ভাবিয়া আমি কি ভয়ে অনুতাপে মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিলাম? মোটেই নহে। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে, মুগ্ধনেত্রে তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাতে ভয় বা অনুতাপের লেশমাত্র মিশ্রিত ছিল না। যদি শাখা হইতে শাখান্তরে হস্তচালনার সময় হস্ত স্খলিত হয়, যদি শৈল হইতে শৈলখণ্ডে পদরক্ষার সময় পদচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য্য। কিন্তু শিশু যেমন অগ্নিকে সম্মুখে দেখিয়াও তাহার দাহিকাশক্তিতে অজ্ঞান থাকে, আমিও সেইরূপ এই বিপদ প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহার সম্ভাবনা বোধ করি নাই। তাঁহার এই দুঃসাহসপূর্ণ গতিতে, বীরত্বপূর্ণ অঙ্গচালনায়, আমি কেবল তখন চৌম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া একটি পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার এই পৌরুষিক তেজ উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়া, জীবনে এই প্রথম আমি আমার অন্তর্নিহিত রমণী-শক্তির আস্বাদ লাভ করিলাম। তাহা কি সুমধুর! কি উপাদেয়! কি মোহময়!

তিনি যখন এই বিপদরাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফুল আহরণপূর্ব্বক নিরাপদভূমিতে পদার্পণ করিলেন, তখন যেন আমার চৈতন্যোদয় হইল। সেই সম্ভাবিত বিপদ কল্পনা করিয়া তখন আমার ভয়ের সঞ্চার হইল, তাঁহাকে বিপদমুক্ত দেখিয়া আমি রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলাম।

অতিথি আমাদিগের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই সূর্য্য দিগন্তে নামিয়া পড়িল। তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়াই ভ্রাতা আমাকে ডাণ্ডিতে উঠিতে আজ্ঞা করিলেন। যাহার জন্য এত কষ্ট করিয়া তিনি ফুল তুলিলেন, এখন আর তাহার হস্তে সেগুলি সমর্পণ করিবার অবসর ঘটিল না। তাঁহার নৈরাশ্য কল্পনা করিয়াই বোধহয় ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমি নিঃশব্দে ডাণ্ডির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

৫

ত্রয়োদশীর চন্দ্র, ঠিক পূর্ণচন্দ্র বলিয়াই ভ্রম হইতেছিল। অসম্পূর্ণকলা—তবুও পূর্ণোজ্জ্বল পরমসুন্দর শশিকলা কখনও শুভ্র, কখনও নীল, কখনও কৃষ্ণ মেঘের মধ্য দিয়া তরতর

বেগে ভাসিতে ভাসিতে, ক্ষণে ক্ষণে দূরের ও নিকটের পর্ব্বতমালা ম্লান মধুর সৌন্দর্য্যে প্লাবিত করিয়া, আবার ক্ষণে ক্ষণে চারিদিক জলদ আবরণে ঢাকিয়া সহসা পর্ব্বত আড়ালে লুক্কায়িত হইয়া পড়িতেছিল। ডাণ্ডিওয়ালারা যেন চন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাহার অপেক্ষাও তরতর বেগে ছুটিতে ছুটিতে আমাদের উদ্যানতলে আসিয়া আমাকে নামাইয়া দিল। জ্যোৎস্না-পুলকিত, সুগন্ধ-আকুলিত কাননখানি হাসিতে হাসিতে আমাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রীতিময়, সৌন্দর্য্যময়, জীবন অস্বাভাবিক সুখময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি একবার অতৃপ্তনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বাটী-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভৃত্যকে ডিনার আনিতে আদেশ করিয়া, অসমাপ্ত গৃহকার্য্য যথাশীঘ্র সমাপ্ত করিয়া ড্রয়িংরুমে আগমন করিলাম। অতিথিও প্রায় তখনি এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে সেই ফুলগুচ্ছ, নয়নে বীরগর্ব্ব, অধরে আনন্দ হাস্য, তাঁহাকে কি সুন্দর, কি সাহসী, কি সুখী দেখাইতেছিল। মানুষ যে এত সুন্দর হইতে পারে, দেবকল্পনা ছাড়াইয়াও ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহা ইহার আগে জানিতাম না। কেহ বলিলে বিশ্বাসও করিতাম না।

তিনি নিকটে আসিয়া হস্তে-ধৃত ফুলগুলি আমার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন, "এই নিন আপনার ফুল। ইহা কিন্তু গোলাপ নহে, অমরগুচ্ছ।"

ফুলগুলি গ্রহণ করিলাম, নীরবে গ্রহণ করিলাম। একটিও কথা ফুটিল না, আমার জন্য এত কষ্ট করিয়া তিনি ফুল তুলিয়াছেন, একটি মৌখিক ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না। কম্পিত দেহে, সলজ্জ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ফুলগুলি গ্রহণ করিলাম। এই প্রথমবার তাঁহার দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি পূর্ণভাবে স্থাপিত হইল, হস্তে হস্ত স্পর্শ হইল, শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক পুলকপ্রবাহ উথলিত হইয়া উঠিল, বায়ুমণ্ডলী কি এক মোহময় ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ; তাহার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়া আমি বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম।

সহসা সে মোহ সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ডিনারের ঘণ্টার শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। দাদাও তখনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিথির সাহসের প্রশংসা করিতে করিতে, তাঁহার হাত আপনার বাহুমধ্যে টানিয়া লইয়া ভোজনগৃহে যাত্রা করিলেন। আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। এখানে আসিয়া তাঁহারা খাইতে বসিলেন, আমি বিধবা, তাঁহাদের সহিত একত্রে খাই না, আমি বসিয়া তাঁহাদের আহার দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ সমস্ত দিনের আনন্দভাব কেমন করিয়া কে জানে ধীরে ধীরে অর্দ্ধ বিষাদভাবে পরিণত হইয়া পড়িল। অতিথিকে যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দাদা নানা কথা কহিয়া সে ভাব দূর করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, কিন্তু অতিথি অন্যদিনের ন্যায় পূর্ণহৃদয়ে তাহাতে যোগদান না করিয়া সংক্ষেপ উত্তরে মাত্র তাঁহার কথার সায় দিয়া যাইতেছিলেন। আহারান্তে অধিকক্ষণ তিনি ড্রয়িংরুমে বসিলেন না, জিনিসপত্র গুছাইতে হইবে বলিয়া শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করিলেন। দাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। আমরা সেক্‌হ্যাণ্ড করিতাম না ; যাইবার সময় অন্য দিনের ন্যায় হাসিয়া তিনি আমাকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর একটু থামিয়া good bye বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সেই হাসির মধ্যে, দৃষ্টির মধ্যে, বিদায় বাক্যের মধ্যে, এমনকি গমনের মধ্যেও

যেন প্রচ্ছন্ন বিষাদ ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহা কি সত্যই তাঁহার মনের ভাব? না আমার নিজের মনের ছায়া মাত্র! পরদিন প্রত্যূষে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি যখন নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলাম—তখন আত্মদমন অসাধ্য হইয়া উঠিল। হৃদয় যন্ত্রণায় শতধা বিদীর্ণ হইয়া উঠিতে চাহিল, বন্যার ধারায় অশ্রু উথলিয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন সুখোচ্ছ্বাসে যাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, দুঃখের সময় আবার তাঁহাকে মনে পড়িল। এতদিন পরে পুনরায় আমার চন্দন বাক্সের সেই ছবিখানি বাহির করিয়া, মেরি মূর্ত্তির পদতলে অনুতপ্ত রোমান ক্যাথলিকের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া আমার মনে পাপবেদনা উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

সেই অনুতাপ অশ্রুতে কি হৃদয় জ্বালা নিবৃত্তি হইয়া গেল? সেই আন্তরিক প্রার্থনায় কি তখনি আমি অসীম যন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভ করিলাম? হায়! কত কাল বাড়িয়া তবে বৃক্ষ ফললাভ করে! কত কাল চলিয়া তবে নদী সমুদ্রে মিলিত হয়! আর মনুষ্যের বাসনাই কি মুহূর্ত্তে সফল হইবে? তাহার প্রার্থনাই কি ভগবান তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিবেন? তপস্যা বিফল হইবার নহে, ভগবৎপ্রসাদ মিথ্যা নহে; কিন্তু সকল সফলতার মূলেই ধৈর্য্য, আত্মদমন ও কালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। আমি ছবিখানি পুনরায় বাক্সে তুলিবার সময় অনুতপ্ত হৃদয়ের উপহারস্বরূপ সেই ফুলগুলি আমার পুণ্য মন্দিরে রাখিয়া দিলাম।

৬

আবার যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি একা নহেন। দাদার বিবাহ উপলক্ষে আমরা বাটী যাত্রা করিতেছিলাম, তিনি তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া এলাহাবাদ যাইতেছিলেন; বাঁকিপুর ষ্টেসনে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাদের সহিত আমাদের দেখা। তখনো ট্রেন ছাড়িতে কিছু বিলম্ব ছিল, তাঁহারা ততক্ষণ আমাদের গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। দাদা তাঁহাকে বিবাহিত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে, বিবাহের নিমন্ত্রণ পান নাই বলিয়া সকৌতুক অভিযোগ বাক্যে কহিলেন, "চিরদিন থেকে এই ভোজটার দিকে হাপ্রত্যাশ করে চেয়ে আছি—আর শেষে কি না ছোকরা বন্ধু বান্ধবদের একেবারেই ফাঁকি দিয়ে—একা একাই মেঠাইগুলো পার করলে হে; আপনিই বিচার করুন দেখি মিসেস চাটর্জ্জি,—এ কি রকম ভয়ঙ্কর ফাঁকি,—এর শাস্তি আপনি কি ব্যবস্থা করেন?" মিসেস চাটর্জ্জি, নববধূ,—নববিবাহের আনন্দ তাঁহার সুসজ্জিত পরিচ্ছদ হইতে, মুখে চোখে, ভাবভঙ্গিতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মধুর হাসি হাসিয়া, স্বামীর দিক হইতে দাদার দিকে চাহিয়া মৃদু প্রফুল্লস্বরে বলিলেন, "তা যদি বলিলেন, তাহলে আমিও বলি, আপনি একলা ফাঁকে পড়েননি, আপনার বন্ধুটি তাঁর বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ না করে, আমাকেই বেশী রকম ফাঁকি দিয়েছেন। যা কিছু যৌতুক পাওয়া যেত, তা থেকে আমি একেবারেই বঞ্চিত!"

দাদা তাঁহার বন্ধুর এই অপরাধ—নিতান্তই অমার্জ্জনীয় জ্ঞান করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং অবিলম্বে ছয় মাস ফাঁসিতে দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বিচারকের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া ফেলিলেন। সকলের হাস্য কৌতুক থামিলে আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মিসেস চাটর্জ্জি, আমি আপনার জন্য একটি যৌতুক রাখিয়াছি।"

আমার লেখার বাক্সটি আমার কাছেই ছিল, মিসেস চাটর্জ্জির সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি তাহা হইতে আমার চন্দন বাক্সটি তুলিয়া, অমর ফুলগুলি বাহির করিয়া লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি সেগুলি হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন,—"কি চমৎকার অনুকরণ! ঠিক যেন আসল ফুল!"

আমি বলিলাম,—"সত্যই আসল ফুল, অনুকরণ নহে।" তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"সত্যই আসল ফুল! আমি ত কখনও এরূপ ফুল দেখি নাই! ইহার নাম কি!"

"অমর পুষ্প!"

"বেশ ত নামটি,—যেমন ফুল তেমনি নাম! কোথায় পাওয়া যায়?"

"ইহা পর্ব্বতের ফুল, পর্ব্বতভূমিতেই পাওয়া যায়।"

"কতদিন তুলিয়াছেন?"

"প্রায় ছয় মাস।"

"এখনো এমন ভাল আছে, আশ্চর্য্য ত! দেখুন মহাশয়, এমন সুন্দর ফুল কখনও দেখিয়াছেন কি? পরুন না!" স্বামী চকিত নেত্রে ফুলগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে একবার বলিলেন—"হাঁ, বেশ!" কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষার জন্য তাহা গ্রহণে অগ্রসর হইলেন না। স্ত্রী বড় আগ্রহে স্বামীকে তাহা দিতে গিয়াছিলেন, স্বামীর ব্যবহারে নিরুৎসাহ ক্ষুণ্ণ হইয়া অভিমান ভরে বলিলেন—"আচ্ছা বাবু থাক্—তোমায় পরতে হবে না—আমি না হয়"—তাঁহার কথা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। সহসা প্রকাণ্ড শব্দে ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তিনি চকিতে নীরব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বামী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"চল চল, আর সময় নেই, ওসব হবে এখন।" ত্বরিত বিদায় গ্রহণে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন ; একবার, দুইবার, তিনবার বাজিয়া ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেল, গাড়ীও পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

সে রাত্রে আমি একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখিলাম।—মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনী, চারিদিকের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই ঘন ঘোর নিবিড় গহনের মধ্যে একজন দেবপুরুষ আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া শূন্যমার্গে উঠিলেন ; আমরা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে, ব্যোম হইতে ব্যোমে ভাসিয়া চলিলাম। ভাসিতে ভাসিতে একটি অত্যুচ্চ শৈল শিখরে আসিয়া তিনি যখন আমাকে নামাইয়া দিলেন, তখন মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকের তিমির আবরণ অপসৃত হইয়া গেল ; দিক দিগন্ত বিভাসিত এক অপূর্ব্ব আলোকে সেই দেবপুরুষ আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিলেন। এ কি? ইনি কে? ইনি যে আমার স্বামী দেবতা! আমার সেই যত্নরক্ষিত ছবিখানির যে ইনি সাকার প্রতিরূপ! কেন তবে ইঁহাকে এতদিন মৃত মনে করিয়াছি! ইঁহার জীবন্ত মূর্ত্তি যে আজি আমার নয়নে প্রত্যক্ষ বিরাজিত, ইঁহার বরবপুর স্পর্শে যে আজি আমার সমস্ত ভ্রান্তি দূর করিতেছে! এতদিন তবে আমি বৃথা কষ্ট করিয়াছি কেন? অতিরিক্ত সুখোচ্ছ্বাসে আমি বিহ্বল হইয়া উঠিলাম, অমনি সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।—জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম অশ্রুধারায় নয়ন ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা সুখাশ্রু বা দুঃখাশ্রু কে বলিবে?

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩১৫

চাবি চুরি

অদ্য রবিবারে তাহার আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন, আগামী রবিবারে বিবাহ। বি এ পরীক্ষার পর গৃহে আসিয়া মাসাবধি কাল হইতে সুকুমার এই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। পূর্ব্ব রজনী তাহার জাগরণে কাটিয়াছে বলিলেই হয়। একটা অনির্দ্দিষ্ট আনন্দ উত্তেজনায় তাহার মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম শিরা বিশিরা—এমনকি প্রত্যেক অণুপরমাণুটি পর্য্যন্ত যেন আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ভোরবেলায় সামান্য তন্দ্রা আসিতে না আসিতে উৎসব বাঁশরীর ভৈরবীতানে —একটা দুঃস্বপ্ন লইয়া সে সহসা জাগিয়া উঠিল। তন্দ্রাবেশে সুকুমার স্বপ্ন দেখিতেছিল —যেন তাহার চাবি হারাইয়া গিয়াছে।

ছেলেবেলায়—যখন তাহার বয়স সাত আট বৎসর, তখন একবার তাহার একটি চাবি হারাইয়া গিয়াছিল। তাহার মামা বাড়ী আসিবার সময় কলিকাতা হইতে তাহাকে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র জাপানী বাক্স আনিয়া দিয়াছিলেন। বাক্সটি পাইয়া তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। বাক্সের চাবিটি ছিল ঠিক রূপার মতন। সুকুমার দিনের মধ্যে কতবার যে বাক্সটী খুলিত, বন্ধ করিত, আবার সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিত তাহার ঠিক নাই। এইরূপ অতি সাবধানতা বশতই বোধহয়—একদিন তাহার সেই সাত রাজার ধন এক মাণিক চাবিটি হারাইয়া গেল। চাবির দুঃখে সে একান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িল, এতদিন সকলে ভাবিত, বাক্সটীই তাহার প্রিয়সামগ্রী, এখন বুঝিল চাবির জন্যই বাক্সের আদর।

তখন মা বাঁচিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে আর একটি জাপানী বাক্স আনাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে সুকুমারের পূর্ব্ব চাবির বিরহদুঃখ ঘুচিল না। তাহার মনে হইল —ইহা ত পুরাতনটির ন্যায় সুন্দর নহে। দু-একদিন নাড়াচাড়া করিয়াই সেটি তাহারই নামধেয় প্রিয় বয়স্য আর এক সুকুমারকে সে দান করিয়া ফেলিল। এই বন্ধু-সুকুমার বয়সে কিছু বড় বলিয়া আমাদের সুকুমার ইহাকে সুখদা বলিয়া ডাকিত। পার্থক্য বুঝাইবার জন্য আমরাও সময় সময় ইহাকে সুখনামেই অভিহিত করিব।

সুখ বন্ধুদত্ত বাক্সটি আনন্দে গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে পকেট হইতে সেই হারান চাবিটি বাহির করিয়া দেখাইল। মুহূর্ত্তকাল সুকুমারের মূর্ত্তি আনন্দদীপ্ত হইয়া উঠিল ; পরমুহূর্ত্তে ক্রুদ্ধস্বরে কহিল ; "আমার চাবি। তুমি নিয়েছ! আর আমাকে দাওনি!"

সুখ বলিল—"আজ ত দিলুম। না দিলে ত তুই আজও পেতিস নে।"

বালক ভাবিল—তাহা ত ঠিক! সে তখন কৃতজ্ঞচিত্তে চাবিটি গ্রহণ করিল।

আজ আনন্দপ্রভাতে সুকুমার সেই চাবি হারানর স্বপ্নই দেখিতেছিল। তফাতের মধ্যে স্বপ্নের চাবিটি রূপার নহে সোনার, আর বাল্যকালের হারান চাবিটি সে ফিরিয়া পাইয়াছিল —স্বপ্নের চাবিটি খুঁজিয়া না মিলিতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া সে যখন বুঝিল ইহা সত্য নহে স্বপ্ন মাত্র,—তখন খুব একটা আরাম বোধ করিল। তথাপি এই ফুল্লপ্রভাতে গত রজনীর কল্পনানন্দ একটা বিষাদময় ভাবে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। উৎসব বাঁশরীর মধুর ভৈরবী রাগ সুরতরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া হৃদয়ে কেমন একটা করুণ তানই জাগাইয়া তুলিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার নয়নপাতে দুই বিন্দু অশ্রু সঞ্চিত হইয়া

উঠিল। এই সময়ে উন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া তাহার অশ্রুবিম্বিত নয়নপটে অপ্রত্যাশিত আনন্দবিস্ময় ফুটাইয়া তুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল আসিয়া ও কে? তাহার বাল্যবন্ধু সুখদা। সূর্য্যকিরণে যেমন নিমেষে সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়—সুকুমারের বিষাদম্লান হৃদয়ও সেইরূপ মুহূর্ত্তে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সে বলিল—"একি সুখদা যে! আজ সত্যই সুপ্রভাত!"

২

সুকুমারের বয়স বেশী নহে, আঠার মাত্র। ইহারি মধ্যে সে বি এ দিয়াছে। ইহাতেই পাঠক বুঝিবেন, সুকুমার বুদ্ধিমান। তথাপি সাংসারিক লোকে সম্ভবতঃ তাহাকে নির্ব্বোধ বলিবেন। কেননা এখনও সে বালকের ন্যায় সরলবুদ্ধি, কপটতা-অনভিজ্ঞ বিশ্বস্ত হৃদয়। তাহার কল্যাণবিশ্বাসময় মধুর হাসিতে, হৃদয়ের স্বচ্ছ রূপ দর্পণের ন্যায় বিভাসিত। তাহার হাসিতে, মূর্ত্তিতে, ভাবে, কথায় শুভ্র বিশুদ্ধ মঙ্গলভাব প্রস্ফুটিত কুসুমের মতই শতদলে বিকাশিত।

সুকুমারের সহিত তাহার বন্ধুর অনেক দিন হইতেই ছাড়াছাড়ি। সুকুমার এণ্ট্রেন্স ক্লাসে উঠিয়া পড়িতে গেল কৃষ্ণনগরে—আর সুখ তাহার এক বৎসর পূর্ব্বেই বাস করিতে চলিয়া যায় কলিকাতায়। বনগ্রাম তাহার মামার বাড়ী—শৈশবে মাতৃহীন হওয়াতে মাতামহী তাহাকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, মাতামহীর মৃত্যু হইবামাত্র তাহার পিতা তাহাকে কলিকাতায় আপনার নিকট লইয়া গেলেন।

ইহাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বড় একটা ছিল না। সুকুমার মধ্যে মধ্যে বন্ধুকে লিখিত—এবং দশখানার উত্তরে কদাচিৎ একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাইলেই সৌভাগ্য বিবেচনা করিত। সম্ভবতঃ এইরূপ উপেক্ষাই সুকুমারের বাল্য মিত্রতাকে সুদৃঢ় বন্ধনে এখনও তাহার স্মৃতিজড়িত করিয়া রাখিয়াছিল। বিবাহের খবর সে সর্ব্বাগ্রে সুখদাকেই দিয়াছিল—এবং উৎসবে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেও যে ত্রুটি করে নাই তাহা বলা বাহুল্য।

সুকুমার বিছানা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি মশারিটা তুলিয়া, সুখদাকে টানিয়া লইয়া আবার বিছানার উপর বসিল। কিছুক্ষণ কোন কথা না কহিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসি নীরব হইলেও মধুর আনন্দসঙ্গীতপূর্ণ। সুখ বলিয়া উঠিল, "তুই ভারী ছেলেমানুষ!"

"কেন?"

"বিয়েতে এত আনন্দ তোর!"

এ কথায় সুকুমারের আনন্দভাব কিছুমাত্র কমিল না, বিনা প্রতিবাদে নীরব হাসিতে এই অপবাদ সে শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

সুখ বলিল—"মেয়ে দেখেছিস?"

"দেখেছি বইকি! তুমিও ত দেখেছ। সত্যবালাকে মনে নেই?"

"সেই চার পাঁচ বছরের নোলক-নাকে, কাঁদন-চোখো মেয়েটা? কাঠের পুতুল হাতে চৌধুরীদের পুকুরধারে বসে থাকত—আর পুতুলটা কেড়ে নিতে গেলেই কেঁদে লুটিয়ে

পড়ত—সেই নাকি? রামঃ!"

সুকুমারের সহাস্যসুন্দর মুখশ্রী এই কথায় কৌতুকপূর্ণ হইয়া আরও মনোহর ভাব ধারণ করিল—সে হাসিয়া কহিল—"এখন আর রামঃ নয়—সুখদা; এখন তাকে সীতাদেবী বলাই সাজে!

"গেছি যে! একেবারে মাথা জল—হাবুডুবু! তোরা যে দেখছি লায়লা মজনু হয়ে জন্মেছিস! ভূমিষ্ঠ না হতেই দুজনের প্রেম দাঁড়িয়েছে। ছেলেবেলায় যদি তাকে একটা তাড়া দিয়েছি—অমনি আহা উহু!"

"ছেলেমানুষকে তুমি যা জ্বালাতন করতে সুখদা! আমার ভারী মায়া হোত! যা হক, এখন আর সে চার পাঁচ বছরের মেয়েটি নেই—এখন যদি একবার দেখ!"

"সেটা বোধহয় অদৃষ্টে ঘটছে না,—আমাকে আজই যেতে হবে। তুই বিশেষ অনুরোধ করেছিলি তাই একবার বলে যেতে এলুম।"

সুকুমারের প্রফুল্ল মুখশ্রী সহসা মলিন হইয়া পড়িল। সকাতর অনুরোধে সে কহিল —"না সুখদা, তা হবে না। এ হপ্তাটা তোমার থেকে যেতেই হবে। এত কি কাজ? —এখন ত ছুটি।"

"আমার ত বিয়ে করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়! তার চেয়ে ঢের মহত্তর কাজে আমি ব্রতী হয়েছি।"

"কি কাজ?"

"দেশের কাজ।"

"স্বদেশী হয়েছ? আমিও ত স্বদেশী।"

"নামে স্বদেশী হলে ত হবে না—কাজ করা চাই।"

"আইন পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আমিও কাজ করব। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।"

"মনে মনে ঠিক করলে ত হবে না; যে কাজই কর—আগে থাকতে ত প্রস্তুত হতে হবে।"

"আমি ভেবেছি দেশে একটা শিল্প স্কুল করব—চাষাদের জন্যে—"

"হাইহো! আবার ছেলেমানষি! তোর দ্বারা সংসারে দেখছি কিচ্ছু হবে না! টাকা আসবে কোথা থেকে যে স্কুল-কলেজ খুলবি?"

"কেন উপার্জ্জন করব! চাঁদা তুলব—আর আমার যা সম্পত্তি আছে—তা—"

"তবেই হয়েছে! তোর সম্পত্তি আর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করলেই দেশোদ্ধার হবে বটে! এদেশে দেশের কাজে চাঁদা কেউ দেবে না—দিতে যারা ইচ্ছা করবে ভয়ে তারাও পারবে না। এখানে টাকা তোলার একটিমাত্র উপায় হচ্ছে—"

"কি?"

"ডাকাতি। ঘাড় ধরে আদায় করা। গবর্ণমেণ্টও ত আসলে তাই করে। দেশের কাজে আমরাই বা তা না করব কেন?"

সুকুমারের প্রত্যেক শিরা ঘৃণাসঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল— "নিশ্চয়ই তুমি ঠাট্টা করছ সুখদা! সত্যি যে তুমি এরকম মনে কর—কিছুতেই আমি

তা বিশ্বাস করতে পারিনে। অত্যাচারে কখনও মঙ্গল হতে পারে? দেশানুরাগ শিক্ষা দিতে হলে, ন্যায়ানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, একতা এসব আগে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অধর্ম্মে, অত্যাচারে কেবল যে সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেবে—তা নয়—একতার মূলেই আঘাত পড়বে—"

"তোমার আর লেকচার দিতে হবে না। ওসব বাঁধা বুলি সব জানা আছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্য সবই অবস্থানুসারে ;—ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন—'মাক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে,—' পড়ে দেখ।" পকেট হইতে একখানা গীতা বাহির করিয়া সে সুকুমারের হাতে দিল। এই সময় একজন চাকর আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, বেলা হয়েছে, উঠুন। মঙ্গলস্নান করতে হবে—মাঠাকরুণরা ডাকছেন।"

সুকুমার বলিল—"আচ্ছা যাচ্ছি, তুই এগো।" ভৃত্য চলিয়া গেলে বন্ধুনির্দ্দিষ্ট খোলাপাতায় চোখ বুলাইয়া সুকুমার কহিল—"দ্বিতীয় অধ্যায়। আচ্ছা সুখদা, এখন থাক, বিকালে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দুজনে মিলে পড়ব এখন।" বলিয়া বইখানা সে বিছানায় রাখিল। সুখ বলিল,—"বিকাল পর্য্যন্ত আমি ত থাকতে পারব না—একটার ট্রেনে আমাকে যেতেই হবে।"

বিবাহ পর্য্যন্ত কয়েকটা দিন থাকিবার জন্য তাহাকে সুকুমার অনেক উপরোধ অনুরোধ করিল, কিন্তু কিছুতেই টলাইতে না পারিয়া অবশেষে কহিল—"আচ্ছা, আজ তবে যাও—বিয়ের দিন কিন্তু ভাই আসতেই হবে, কথা দাও।"

"দেখব,—তবে ঠিক বলতে পারিনে।"

আবার ভৃত্য আসিয়া ডাকিল, "দাদাবাবু এস। মাঠাকরুণরা ডাকাডাকি করছেন —শুভ সময় বয়ে যায়।"

উভয়ে তখন ভৃত্যের অনুবর্ত্তী হইল।

৩

গায়ে-হলুদ, স্নানোৎসব, ভোজ সকলি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চন্দনচর্চ্চিত, রক্তবস্ত্রপরিহিত সুকুমার সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, বিশ্রাম মানসে অপরাহ্ণে পালঙ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার বন্ধু সুকুমার আহারান্তে একটার গাড়ীতেই চলিয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া গীতাখানা হাতে লইয়া খুলিতেই এই শ্লোকটি তাহার চোখে পড়িল—

> যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়
> সর্ব্ব ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।

নিবিষ্ট চিত্তে ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া সুকুমার মনে মনে কহিল—"কি সুন্দর উপদেশ। আর সুখদা আমাকে কি যে বোঝাচ্ছিলেন!"

এই সময় বাহিরে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল উঠিল ; সুকুমার তাড়াতাড়ি বিছানার উপর গীতাখানি ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল পুলিশের লোকে উঠান পূর্ণ। একজন তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম সুকুমার?" উত্তর হইল, —"হ্যাঁ।" তখন বিনাবাক্যব্যয়ে তাহারা বাটীর সর্ব্বত্র প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা

ভয়বিকম্পিতা হরিণীর ন্যায় ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুইজন পুলিসের লোক সুকুমারের শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। বিছানার উপর গীতাখানা দেখিতে পাইয়া একজন তাহা উঠাইয়া লইয়া সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল—"গীতা, গীতা!" যেন আর্কিমিডিসের ন্যায় সেও একটা কোন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সহসা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আর একজন সাগ্রহে তাহার হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং দুই বন্ধুতে মিলিয়া তখন গীতার পাতাগুলি মন্থিত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। স্থানে স্থানে শ্লোকের নীচে যে সকল অস্পষ্ট ইঙ্গিত, মন্তব্য, টীকাটিপ্পনি ছিল, পুলিসের অনুবীক্ষণ নেত্রালোকে তাহা সুস্পষ্ট বিদ্রোহিতারূপে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল, এমন কি ডাকাতির তারিখটি পর্য্যন্ত তাহার প্রচ্ছন্ন আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া পড়িল। এই জ্বলন্ত অকাট্য প্রমাণ হস্তে ধরিয়া তাহারা আর অধিক জিজ্ঞাসাবাদের কোন প্রয়োজন দেখিল না, স্বাধিকারভুক্ত সম্পত্তির ন্যায় বিনাবাক্যব্যয়ে তখনই সেই পুলিস পুঙ্গব দুইটি সুকুমারকে দখল করিয়া ফেলিল।—বাড়ীতে কাতর ক্রন্দনরোল উঠিল, নিমন্ত্রণ, আনন্দজনতা মুহূর্ত্তে শোকবাত্যায় যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন ধরালুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে সুকুমারের মা নাই, পিতা উন্মত্ত আকুলকণ্ঠে বলিলেন—"ওকে কোথায় নিয়ে যাও? আগে আমাকে মেরে ফেল,—নিয়ে যেতে হয়—তারপর নিয়ে যেও—", এই বলিয়া তিনি একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিষণ্ন, গম্ভীর, বন্দী সুকুমার একান্ত বিশ্বস্তচিত্তে কহিল—"বাবা, আপনি ভাববেন না, আমি নিশ্চয় ফিরব, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ন্যায়বিচারের প্রতি সন্দেহ করবেন না, —আমাকে যেতে দিন।" চারিদিকের ক্রন্দন রোলের মধ্যে কন্যার পিতামহ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয় কাঁদিয়া কহিলেন,—"ছেড়ে দাও বাবা, সুকুমারকে ছেড়ে দাও, আগামী রবিবারে বিবাহ, আজ গায়ে হলুদ পড়ে গেছে। হিন্দুর সন্তান হয়ে বাবা তোমরা অধর্ম্ম করো না। আমাদের জাত যাবে—জাত যাবে—ওকে ছেড়ে দাও, ব্রাহ্মণের দোহাই তোমাদের,—ওকে ছেড়ে দাও বাবারা!" একজন ডেপুটি ইনস্পেকটার সে সবে মাত্র পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে—এরকম কার্য্যে এই তাহার হাতে খড়ি, ইহাদের আর্ত্তনাদে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রধান ইনস্পেকটার সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"ভাবনা কি মশায়! হিন্দু হয়ে কি আমরা হিন্দুর জাতধর্ম্ম মারতে পারি? কিচ্ছু চিন্তা করবেন না—আমরা ঠিক সময়েই এঁকে ফিরিয়ে আনব।"

পিতা কহিলেন, "নিয়ে যেও না বাবারা—ওকে নিয়ে যেও না;—ও গেলে এ ব্রাহ্মণ বাঁচবে না, তোমাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে।—"

সুকুমার সজলনেত্রে অথচ ধীরকণ্ঠে কহিল—"বাবা ভাববেন না, ধৈর্য্য ধরুন,—নিশ্চয় ফিরব,—আমি ত দোষী নই।" ইনস্পেকটার সাহেব সহাস্যে কহিলেন, "তাহলে নিশ্চয়ই ভাবনার কোন কারণ নেই। তবুও যদি না ফেরে—ঠাকুর মশায়—তাহলে কিন্তু আমাদের দায় দোষ নেই,—শাপটাপ দেবেন না,—তাহলে বুঝে নেবেন ছেলেই দোষী —অধর্ম্মের কি কখনও জয় হয়!"

দারুণ হৃদয় বেদনা—আর্ত্তনাদ হাহাকারের মধ্যে পুলিশ সুকুমারকে ধরিয়া লইয়া গেল।

৪

কন্যার পিতা নাই। পিতামহ গদাধর ভট্টাচার্য্যের ঘর-বার করিয়া দিন কাটিতেছে। তাঁহাদের বাড়ীর বাহির হইতে রেলের গাড়ী দেখা যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি সেই দিকেই চাহিয়া আছেন,—স্নানাহারের সময় গৃহে গমন করেন মাত্র—আবার মালা জপ করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। এমনই করিয়া নিমেষ মুহূর্ত্ত যায়, দিনও কাটে, সপ্তাহও প্রায় কাটিতে চলিল—তবু সুকুমারের বা তাহার পিতার দেখা নাই। তাহার পিতাও মকদ্দামার তদ্বির করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছেন।

কন্যার মাতা ভটচাযমহাশয়ের পুত্রবধূ—শ্বশুরকে কিছু বলেন না, ভগবানকে ডাকিয়া, তাঁহার উপর একান্ত-প্রাণে নির্ভর করিয়া নীরবে ধৈর্য্য ধরিয়া আছেন। কিন্তু কন্যার পিতৃস্বসা, ভটচাযমশায়ের বিধবা কন্যা পিতাকে অন্য পাত্রের সন্ধানে তৎপর না দেখিয়া প্রতিদিনই তাঁহাকে অনুযোগ করেন। যে সকল আত্মীয় স্বজন বিবাহনিমন্ত্রণে আসিয়া এখনও এখানে রহিয়া গেছেন তাঁহারাও অন্যান্য আমোদ আহ্লাদের অবসর সময়টুকু কর্ত্তাকে উত্ত্যক্ত করিবার সুখ উপভোগে অতিবাহিত করিতে ত্রুটি করেন না। ভটচাযমহাশয়ের কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস সুকুমার নির্দ্দোষ, অতএব সে ফিরিবেই, যথাসময়ে ফিরিবে,—তিনি ভগবানের নাম জপিতে জপিতে সকল অভিযোগ অনুযোগ নীরবে সহ্য করেন।

তাঁহার এ বিশ্বাস সত্ত্বেও কিন্তু সাত দিন কাটিয়া গেল—সুকুমার আসিল না ; এমন কি সুকুমারের পিতাকে তিনি আকুল আগ্রহভরে যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার একখানিরও উত্তর পর্য্যন্ত এখনও পাইলেন না।

রবিবার প্রাতঃকালে তাঁহার বিধবা কন্যা শুষ্ক মলিন মুখে নিকটে আসিয়া কহিল —"বাবা, জাতকুল যে যায়! আজ মেয়ের বিয়ের দিন, আজ পাত্র ঠিক না করলে আর কবে হবে! তার আশা ছেড়ে দাও।"

বাহিরবাটীর সম্মুখে পাঁথরবাঁধান নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে একখানা মাদুরের উপর বসিয়া কয়েকজন আত্মীয়স্বজন পাশা খেলিতেছিলেন, আর কেহ কেহ নিকটে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন। ভটচাযমহাশয় তাঁহাদেরই পাশে রেল অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া মালা জপিতেছিলেন, এমন সময় কন্যার আবির্ভাবে এবং তাহার মুখের এই কঠোর সত্য কথায় নৈরাশ্যবেদনায় তীব্র সচঞ্চল হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"সে কি হয় মা—সে যে নির্দ্দোষ।"

পাশা খেলার একজন দর্শক নিধিরাম চক্রবর্তী হাতের হুঁকাটি বৈঠকে রাখিতে রাখিতে এই কথাগুলি শুনিলেন, শুনিয়া খেলা দেখার লোভ সম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চানন্দলাভের আশায় অবিলম্বে নিকটে আসিয়া উত্তর-স্বরূপ কহিলেন—"ভটচাযমহাশয়, অনেক সময় নির্দ্দোষ লোককেও ত দোষী হতে দেখা যায়।" ভটচাযমহাশয় যুবাকালে ন্যায়শাস্ত্র কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে সব এখন প্রায় কিছুই মনে ছিল না —তথাপি নিধিরামের যুক্তিটা তাঁহার মনে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যে নির্দ্দোষ সে আবার দোষী হইবে কিরূপে? তিনি মাথা নাড়িয়া কহিলেন— "হতেই পারে না,—সে যে বড় ভালমানুষ।"

"জানেন ভটচাযমহাশয়—ভালমানুষ বলেই আরও ভয়! ভালমানুষ লোকই

আজকাল দেশ দেশ করে পাগল, ভালমানুষ লোকই দুষ্টুরা যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছে। দেশের নামে—খুন ডাকাতি—"

শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে ভটচাযমহাশয়ের ধৈর্য্য রহিল না। তিনি অবিশ্বাসসূচক মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"ছোটবেলা থেকে জানি যে তাকে,—সে তা নয়।"

"কিন্তু আরও একটা কথা ত ভাবতে হবে। দোষী হোক নির্দ্দোষী হোক হাজতে ত রয়েছে—সকল জাতের ছোঁয়া নাড়া ত খাচ্ছে, জাত ইজ্জত ত আর রইল না—দাগী ত বটে!"

ভটচাযমহাশয়ের চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল—দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"তবে তোমরা যা ভাল বোঝ তাই করো। কিন্তু—কিন্তু সৎপাত্রই বা কই?"

তাহার কন্যা কহিলেন, "সে আমরা ঠিক করেছি, শ্রীমন্ত বিয়ে করতে রাজি।" ভটচাযমহাশয় আকুল মর্ম্মব্যথা বাক্যে প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"শ্রীমন্ত! তার ছেলে, বৌ নাতি নাতনী—সে যে আমার নগেনের চেয়েও বড়! হা ভগবান—নগেনকে তুমি ডেকে নিলে—তার এই দুগ্ধপোষ্য সন্তানটিকে আমার কাছে রাখলে কি আমার হাত দিয়ে তাকে বলিদান নেবে বলে! মা, ওকথা বলো না মা,—আমি তা পারব না।"

"কি করবে বাবা—সবই বরাত! আমাকে ত ছেলেমানুষ বরের হাতেই দিয়েছিলে। আমার কপাল পুড়লো কেন বলো! যদি অদৃষ্টে থাকে এতেই সে সুখী হবে। আর দোজবরে বর আদরযত্ন খুব করবে—পয়সাকড়িরও দুঃখ নেই।"

নিধিরাম চক্রবর্তী তাহার মতে সায় দিয়া গেলেন,—"তা বই কি, সবই ত কপালের কথা। আর এখন পাঁচটা দেখাশোনারই বা সময় কোথা— মেয়েকে ত আজই পাত্রস্থ করতে হবে, নইলে জাত রক্ষা হয় কই?"

বৃদ্ধের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে গভীর অনিচ্ছাময় আতঙ্ক ঘূর্ণিপ্রবাহে আলোড়িত হইয়া উঠিল—কিন্তু তিনি বুঝিলেন, সেই ঘূর্ণিপাকে আজীবন তাঁহাকে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকিবে ; তথাপি কন্যাকে তিনি অবিবাহিতা রাখিতে পারিবেন না।

অনেকক্ষণ হইতেই রেলগাড়ীর শব্দ হইতেছিল,—এই সময় শব্দটা বাড়িয়া উঠিল, প্রবল শব্দে বাঁশিও বাজিয়া উঠিল। তিনি শেষবার আকুল প্রার্থনা করিয়া সুকুমারের আগমন প্রতীক্ষায় গাড়ীর দিকে চাহিলেন। গাড়ী থামিল, যাহারা নামিবার তাহারা নামিয়া পড়িল, আবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল ; হুসহুস শব্দে গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা ভটচাযমহাশয়ের বিবর্ণ মুখে জ্যোতি নির্গত হইল। একজন দ্রুতবেগে এইদিকেই আসিতেছে দেখিলেন। কিন্তু সে যখন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধের ঔৎসুক্যপূর্ণ উজ্জ্বল মুখ মুহূর্ত্তে নিরাশামলিন হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি সুকুমার! আমাদের সুকুমার কোথায়? আসছে কি না জান?"

সুকুমারের বাড়ী যাইতে পথের ধারে ইঁহাদিগকে সমবেত দেখিয়া বন্ধু সুকুমার প্রথমে এইখানেই আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভটচাযমহাশয়ের প্রশ্নে সবিস্ময়ে উত্তর করিল —"কেন, সে কোথা? আজ যে তার বিয়ে?" তখন নিধিরাম এবং ভটচাযমহাশয়ের কন্যা উভয়ে মিলিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা ইনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, সে শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কথা শেষ হইলে নিধিরাম বলিলেন, "এ বিপদে সুকুমার তুমি যদি রক্ষা কর তবেই বৃদ্ধ দায়মুক্ত হন। জান ত হিন্দুর মেয়ে—তার গায়ে হলুদ পড়ে গেছে—সুকুমার আসুক বা নাই আসুক, আজ মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—তুমি বিয়ে করলেই জাতকুল বজায় থাকে।"

সুকুমারকে কে যেন সহসা অতল সমুদ্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া সে যন্ত্রবৎ বলিল—"সে যে আমার বন্ধু!"

"তুমি বিবাহ করিলে বন্ধুতার কাজই হবে। ভেবে দেখ, তুমি যদি বিয়ে না কর ত বিয়ে বন্ধ থাকবে না,—আজই মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—শ্রীমন্তের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে।"

সুকুমারের হৃদয়ে একটা করুণ শিহরন উঠিল। তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"সুকুমার, বাবা বাঁচাও—অমত কোরো না। আমি এখনি তোমার মামাকেও ধরে পড়ছি।"

বিধাতাও সুপ্রসন্ন—এই সময় রায়মহাশয় পাশায় জিতিয়া সহাস্য মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ভটচাযমহাশয়ের করুণ অনুরোধ বৃথা হইল না,—তখনই দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল। তাঁহাকে এই দায় হইতে মুক্ত করা সুকুমারের মামা বন্ধুত্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞান করিলেন। সুকুমার বন্দী হইল।

বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষ, আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিয়া চলিয়াছে, নীলাম্বরে মেঘকণা নাই, দিকবিদিক শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ; দিগন্ত বেলায় আঘাত করিয়া দক্ষিণানিল সুখতরঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোকিল পাপিয়া দ্যুলোক ভূলোক মাতাইয়া কুহুকুহু পিউ পিউ তান তুলিয়াছে। বনগ্রামের দুঃখের কথা এখানে যেন আর কাহারও মনে নাই, তাহার অন্তরে বাহিরে দীপ্তি, মধুরতা শত ধারায় আজি উচ্ছ্বসিত। এই আনন্দ পূর্ণিমায় শুভক্ষণে শুভলগ্নে বর সভায় আসিয়া বসিল। এও সুকুমার—কেবল সে দুর্ভাগ্য সুকুমার নহে।

হায়! ক্ষণ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—যে তাহাকে ধরিতে পারে সেই সৌভাগ্যবান, যে পারে না—সে হতভাগ্য সকলেরই অবজ্ঞাভাজন, তাহার দুঃখ অধিকক্ষণ কাহারও মনে স্থান পায় না! পরিবর্ত্ত সুকুমার যখন বর বেশে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিল, তখন সমানই আনন্দে উলুধ্বনি উত্থিত হইল, শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, পুরবালাগণ সমানই আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে সমাদর করিয়া লইলেন। জামাতাবরণ, স্ত্রী আচার, অঙ্গুরীবিনিময়, মাল্যবদল, শুভদৃষ্টি, সকলের মধ্যেই আনন্দপ্রবাহ বহিতে লাগিল, লঘুচিত্ত হইয়া প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাবে ভটচাযমহাশয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

বিবাহ মন্ত্র শেষ হইয়া গেলে বরকন্যা অন্তঃপুরে যাইবেন বলিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন সেই সময় সভাতলে একটা অস্ফুট কানাকানি পড়িয়া গেল। "এ কি? এই যে সুকুমার! এখন—এত বিলম্বে?" সুকুমার মলিন বিবর্ণমুখে ছায়াখানির ন্যায় স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া বরকন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল,—তাঁহারা গ্রন্থিবন্ধনে এক হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন,—সুকুমারের সেই স্বপ্ন মনে জাগিয়া উঠিল। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল :—"স্বপ্ন না সত্য? সত্যই কি আমার চাবি হারাইয়া গেল।"

প্রকৃত প্রতিশোধ

এতদিন তাহাকে খুলিয়া বলি নাই, যে আগুনে নিজে দগ্ধ হইতেছি, যে-কথা মনে করিলে —এখনও প্রতিশোধ-আলোড়িত হৃদয়ের অভিসম্পাতরাশি সর্পগর্জ্জনে গরল উদগীরণ করে,—সেকথা তাহাকে বলিয়া কেন আর তাহার বালকহৃদয়ের শান্তি অপহরণ করি? যাহা হারাইয়াছি তাহা আর ফিরিয়া পাইব না ;—যিনি আমাদের এ দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ তিনিও আজ আমাদের প্রতিশোধের বাহিরে, তবে কেন আর সে সব কথা বলিয়া বংশগত একটা বিদ্বেষভাবে আমার ন্যায় তাহার হৃদয়কেও বিষাক্ত করিয়া তুলি। ইহাতে জগতে কাহারও মঙ্গল নাই। এই ভাবিয়া এতদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কোন কথা খুলিয়া বলি নাই, কিন্তু আর না বলিয়া কিছুতেই চলিল না।

আমাদের দেশ আঁধুল, কিন্তু থাকি আমরা দুই ভাইয়ে কলিকাতায়। আমি চাকরী করি,—সুবোধ স্কুলে পড়ে। যতদিন পর্য্যন্ত সুবোধ এণ্ট্রেন্স ক্লাশে উঠে নাই—ততদিন তাহার পড়াশুনায় বেশ মন ছিল, কিন্তু এণ্ট্রেন্স ক্লাশে উঠিয়া অবধি তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। ভূতটি কোন মৃত লোকের অজানিত অশরীরি আত্মা নহে, আমাদেরই জ্ঞাতিসম্পর্কীয়, জীবন্ত, মূর্ত্তিমন্ত সশরীরী ভ্রাতা কৃষ্ণনাথ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছেন। যেদিন হইতে কৃষ্ণনাথ ওরফে কালু পড়িবার ছুতায় দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া মেসের আশ্রয় লইয়াছে, সেইদিন হইতে সুবোধ আর সে সুবোধ নাই,—তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আগে আফিস হইতে আসিয়াই প্রায় সুবোধকে গৃহে দেখিতাম,—সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবামাত্র টেবিলের নিকট বসিয়া সে পাঠ্যাভ্যাস করিত, শুনিয়া সমস্ত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া একটা নবীন আশা-উৎসাহে আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিত। কিন্তু প্রায় বৎসরকাল হইতে আটটা না বাজিলে আর সে গৃহে ফিরে না, কোন কোন দিন আরও বেশী দেরী করে। এত বকি, এত বোঝাই, তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় না। বেশী রকম উত্ত্যক্ত করিলে বলে,—"পাঁচজনে মিলে পড়ি—তাতে আরও ত·পড়া ভাল হয়,—এতে আপনি রাগ করেন কেন? যখন ফেল হব—তখন বরঞ্চ বক্‌বেন।"

নিজের ভাইকে আঁটিয়া উঠিতে পারি না, রাগ করি—কেলে ভূতটার উপর, তাহার নামে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া ওঠে। বাগে পাইলে ভূত ভাগাইতাম সন্দেহ নাই,—কিন্তু সুখের বিষয় বা দুঃখের বিষয় জানি না—সে কিছুতে আমাকে ধরা দেয় না। যখনি 'মেসে' তাহার সন্ধানে যাই শুনি কেলেঙ্গারটা সেখানে নাই। এই ত আমার অন্তর-বাহিরের অবস্থা, —ইহার পর সত্যই যেদিন শুনিলাম সুবোধ ফেল হইয়াছে—সেদিন আমার পক্ষে ধৈর্য্যরক্ষা—আত্মসংযম অসম্ভব হইয়া উঠিল—আমি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না। হায়! হায়! কে জানিত—ইহার কি পরিণাম! বলিলাম —"আমাদের জ্ঞাতি পিতৃব্য রমানাথ—দেশে যাঁহার কোটা বাড়ী, রূপার বাসন, দেবদেবীর মন্দির, বার মাসে যাঁহারা ঘরে তেরো পার্ব্বণ, যাঁহার টাকার জোরে প্রজা জব্দ, রাজা বশ, সেই রমানাথ খুড়া আমাদের রক্ত খাইয়াই মানুষ, আর এই যে তোমার প্রাণের বন্ধু কৃষ্ণনাথ, ইনি সেই নরপিশাচ পাষণ্ডেরই পুত্র। পিতার নখদন্তাঘাতেও আমাদের যেটুকু

শোণিত অবশিষ্ট আছে, ইনি তোমার স্কন্ধে চাপিয়া সেই রসটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিতে উদ্যত। সাবধান হও, সাবধান হও।"

উন্মত্তের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া এই সকল কথা বলিয়া গেলাম,—আমার কথায় সুবোধের যে মনের ভাব কিরূপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর তখন ছিল না। নিজের কথা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না, রুদ্ধ উৎস মুক্ত হইয়া এমনি প্রবলবেগে উথলিয়া উঠিতেছিল।

একটানে কথাগুলা বলিয়া গিয়া নিশ্বাস লইতে যখন থামিলাম—তখন সুবোধ বলিল —"কিন্তু তার কি দোষ—তার কি দোষ!" আমি বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম,—কথাটার অর্থ বুঝিতে একটু সময় লাগিল,—তাহার পর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝনঝন করিয়া উঠিল,—ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলাম—"নাঃ, তার কিচ্ছু দোষ নেই,—তার বাপ খুনডাকাতী করে ধন এনেছে—সে শুধু আরামে বসে ভোগ করছে বই ত নয়! নরাধম, পাষণ্ড, ব্ল্যাগার্ড—"

সে মুখনত করিয়া নীরব হইয়া রহিল, আমি আপন মনেই বলিয়া চলিলাম,— "রাস্কেল—! কেবল তাহলেও ত রক্ষা ছিল! আমাদের ধন ভোগ করেই তোমার প্রাণের বন্ধু ক্ষান্ত নন—আমরা যাতে চিরকাল ওদের পায়ের তলায় পড়ে থাকি, এই চেষ্টাতে সে তোমার ইহকাল পরকাল খেতে বসেছে। এই সব জেনেশুনে বুঝেসুঝেও যদি তুই তার সঙ্গে মিশতে চাস্—বেশ—কিন্তু আমার সঙ্গে তাহলে এই পর্য্যন্ত! আর যদি মানুষ হতে চাস্—ত এর প্রতিশোধ কিসে নিবি সেই চেষ্টা কর। তার মনভুলানে কথায়—"

আমার কথা এইখানে থামিয়া পড়িল,—দেখিলাম তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া টসটস করিয়া জল পড়িতেছে—সেই অশ্রুজলে কি তীব্র বেদনা প্রকাশিত!

মা যখন আমাকে এই সকল কথা বলিতেন, তখন আমার কিরূপ যন্ত্রণা হইত মনে পড়িল—বুঝিলাম সুবোধের হৃদয় আজ সেইরূপ যন্ত্রণায় আলোড়িত—সেইরূপই প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রজ্জ্বলিত, আর এই মানসিক সংগ্রামে বন্ধু কৃষ্ণনাথকে সে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহাতেই তাহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা!

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনের অবস্থা আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তাহার যন্ত্রণা নিজের মত করিয়াই হৃদয়ে অনুভব করিলাম, মনটা ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া পড়িল ;— কিন্তু না—এ যন্ত্রণা হইতে তবুও তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না,—এ কষ্টই তাহার পক্ষে মঙ্গল ;—সুদৃঢ়ভাবে বলিলাম—"পিতার যে কর্ম্মফলে পুত্র আজ তাহার ধনসম্পদের অধিকারী—সেই কর্ম্মফলে আমাদেরও সে ঘৃণার ভাজন। যদি তুমি মানুষ হও—ত, তাকে পিশাচবোধে তার সঙ্গ ত্যাগ কর।"

দেখিলাম তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে,—বুঝিলাম কথার ফল ধরিয়াছে—হৃদয়ে পরমানন্দ অনুভব করিলাম।

২

আহা, এই চালটা যদি আগে চালিতাম—তাহা হইলে আর সুবোধ এণ্ট্রেন্সে ফেল হইত না। বড়ই আপশোষ রহিয়া গেল। সেই কথা বলার পর হইতে সুবোধ এখন একেবারেই

[illegible] বালক,—বাড়ী ফিরিতে প্রায়ই বেশী দেরী করে না, পড়াশুনাতেও অসম্ভব রকম মন দিয়াছে। যখনই তাহার ঘরে যাই, দেখি বই হাতে লইয়া সে বসিয়া আছে। এতটা বাড়াবাড়ি বরঞ্চ আমার ভাল লাগে না—একটু Recreation—আমোদ প্রমোদ খেলাগল্পও ও দরকার,—কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেকথা বলিতে সাহস হয় না—কি জানি তাহাতে পাছে উল্টা উৎপত্তি হয়—আবার দলে ভিড়িয়া পড়ে। ঘরে ব্যায়াম করিতে উৎসাহদানের জন্য একসেট স্যাণ্ডো কিনিয়া দিয়াছি,—বারান্দায় বার টাঙ্গাইয়া দিলাম,—কিন্তু তাহাতে বড় একটা ফল হইল না, কেবল বৃথা অর্থ নষ্ট। আর এক উপায় অবলম্বন করিলাম, দুই চারখানা বাঙ্গলা মাসিকপত্রের গ্রাহক হইলাম—পাঠ্যপুস্তক পাঠের অবসরে সময় সময় এ-সকল পড়িলে মাথার একটু বিশ্রাম হইবে। আফিসের ফেরতা একদিন কয়েকখানা উপন্যাসও কিনিয়া আনিলাম। সেদিন সুবোধ তখনও গৃহে ফিরে নাই। সন্ধ্যায় যখন সে বাটী আসিল, তখন আমি আফিসের যে এক রাশ কাজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম—তাহা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ;—তাই তৎক্ষণাৎ আর তাহাকে উপন্যাস ক'খানি দেওয়া হইল না। কার্য্য শেষে তাহাকে বই ক'খানি দিতে গিয়া দেখিলাম—প্রতিদিনের ন্যায় টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়া সে পাঠ্য পুস্তকে নিমগ্ন রহিয়াছে—বড়ই মনটা আর্দ্র হইয়া উঠিল। বেচারার আমোদ আহ্লাদ—গল্প-গুজব—সবই আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি!—ডাকিলাম, "সুবোধ!" সে আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া ফেলিল। নিকটে আসিয়া বইখানা তুলিয়া দেখিলাম—সেখানি কোন পাঠ্য পুস্তক নহে, একখানা বাঙ্গলা নাটক—নাম 'প্রকৃত প্রতিশোধ'। মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল,—চাহিয়া দেখিলাম টেবিলটা বাঙ্গলা বহিতে ভরা—আশ্চর্য্য! এতদিন এগুলা নজরে পড়ে নাই!

উপন্যাস ক'খানা টেবিলে রাখিয়া বলিলাম, "তোমার ত বাঙ্গলা বই অনেক আছে দেখছি?"—সুবোধ বলিল—"হ্যাঁ—যখন পাঠ্য পুস্তকগুলো পড়তে পড়তে মাথাটা বিগড়ে ওঠে—তখন মাঝে মাঝে এগুলো পড়ি।"

সে ত বেশ কথা! আমি ত তাই চাই! মনটা তখন হালকা হইল। এই সময় আমাদের আফিসের বড়বাবু—মিষ্টার মজুমদার—হঠাৎ পিঠে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাল্লো—এখানে কি হচ্ছে? সুবোধের পড়ার তদারক হচ্ছে বুঝি? একি—টেবিল যে রাবিশে ভরা!" বলিতে বলিতে বাঙ্গলা বই—দুএকখানা হাতে তুলিয়া আবার দুমদাম শব্দে সেগুলি টেবিলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"Very bad—very bad—এই সব রাবিসে মাথা ভরাট করলে এবারও তুমি নিশ্চয় ফেল হবে—দেখছি। কান্তিবাবু, যদি ভাল চান একে এসব জিনিষ ছুঁতে দেবেন না—বুঝলেন ত?" মজুমদার মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ অ্যান্টি-স্বদেশী—তাঁর উপদেশ গ্রহণ করিবার পাত্র আমি নই। আমাদের মনে যতটুকু তেজ যতটুকু ঔদ্ধত্য সবই স্বদেশীর ফল, বাঙ্গালী যে এমন খুনাখুনী করিতে পারে—কিছুদিন পূর্ব্বে কে তাহা বিশ্বাস করিত! আমি তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া আসিলাম।—তিনি বলিতে আসিয়াছিলেন,—কাল আফিসে বড় সাহেব আসিবেন—যেন একটু সকাল সকাল সেখানে যাই।

৩

আমার ভাবিবার বিষয় অন্য বড় কিছু নাই ; কাজকর্ম্মের অবসরে সুবোধই আমার মনের সব স্থানটা জুড়িয়া বসে। সেদিন রাত্রিকালে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তখন একে একে তাহার সম্বন্ধে সেদিনকার সমস্ত কথাই মনে হইতে লাগিল। আমি দেখিয়াছি রাত্রির নিস্তব্ধতায়—খুব ছোট জিনিষও বেশ বড় অক্ষরে মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

সেই বইখানির নাম 'প্রকৃত প্রতিশোধ'! কি রকম আগ্রহের সহিতই সে বইখানি পড়িতেছিল। আমি যখন গৃহে প্রবেশ করি—সে জানিতেও পারে নাই ; যখন ডাকিলাম, কিরূপ চমকিতভাবে বইখানি যে মুড়িয়া রাখিল! কেন এরূপ ভীত ভাব? এত গোপনতা কিসের? সত্যই কি তার মনে এতই প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলিয়াছে যে এইরূপ বই পড়িতে পড়িতে সে একেবারে তন্ময় হইয়া উঠে! মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল ; এইরূপ দুশ্চিন্তার মধ্যে কখন যে নিদ্রাদেবী আশ্রয় দান করিলেন—বুঝিতে পারিলাম না।

পরদিন বড় সাহেব আফিসে আসিবেন—তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম গুছাইয়া লইয়া আফিসে চলিয়া গেলাম। সাহেব চলিয়া যাইবার পর সেদিন বেশ সকাল সকাল ছুটিও পাইলাম। পরদিন হইতে পূজার ছুটি আরম্ভ,—মনে বেশ একটা স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম।

সুবোধের তখনও বাড়ী ফিরিবার কথা নহে, কিন্তু বাড়ী আসিয়া দেখিলাম—সুবোধের ঘরের দ্বার বন্ধ, আর ভিতরে যেন কি একটা কলহ বিবাদ হইতেছে। দ্বারদেশে কর্ণপাত করিয়া শুনিলাম সুবোধ বলিতেছে—"দুরাচার—দুর্ব্বৃত্ত—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!" সঙ্গে সঙ্গে একখানা তরবারী ঝন্ ঝন শব্দে ভূমিতে আহত হইল।—আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—বুঝিলাম সত্যই সে রক্তপিপাসু—প্রতিশোধ লইতে উন্মত্ত—আর আমিই তাহাকে এইরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছি! আশঙ্কায় অনুতাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল ;—ডাকিলাম, "সুবোধ, সুবোধ" ;—মুহূর্ত্তে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল কিন্তু দ্বার যেমন বন্ধ তেমনিই রহিল। আমি দ্বারে করাঘাত করিলাম—তথাপি দ্বার খুলিল না—কেবল ত্বরিতগমন পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম—অন্য দ্বার দিয়া সুবোধ বাহিরে চলিয়া গেল। আমি ঘুরিয়া সেই দ্বারপথে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম গৃহে কেহই নাই। এইমাত্র যে একখানা তরবারীর ঝন্ ঝন্ শুনিলাম সেখানাই বা কোথায়? তবে সেখানাও দেখিতেছি সে হাতে করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ কি! মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্বস্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখনি কৃষ্ণনাথের বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম,—তাহাকে সাবধান করা একান্তই প্রয়োজন হইয়াছে—একথা আমার অন্তরাত্মা বার বার করিয়া বলিতে লাগিল। তাহার বাসায় গিয়া শুনিলাম সে দেশে গিয়াছে—শুনিয়া মনটা একটু আশ্বস্ত হইল। বাড়ী ফিরিয়া সুবোধের অপেক্ষায় রহিলাম। সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিবেই জানিতাম—কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল—সুবোধ আসিল না ; আহারের সময় উপস্থিত হইল, সুবোধ আসিল না—রাঁধুনীকে, বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সুবোধ কিছু বলিয়া গিয়াছে কি না? তাহারা বলিল—"না।" আবার কৃষ্ণনাথের মেসে গিয়া, পাড়ার অন্য দু'এক জায়গায় গিয়া খোঁজ করিলাম, কোথাও সুবোধের সন্ধান মিলিল না। ইহার পর চাকরদের অব্যাহতি দিবার জন্য আহারে বসিলাম। কিন্তু বলা বাহুল্য, সে রাত্রে আহার নিদ্রা কিছুই হইল না। প্রাতঃকালেও সুবোধ বাড়ী ফিরিল না—১০টা বাজিয়া গেল, সুবোধের দেখা নাই—মন

অস্থির হইয়া উঠিল, হঠাৎ মনে হইল নিশ্চয়ই সুবোধ কৃষ্ণনাথের উদ্দেশে দেশে গিয়াছে—হয়ত—হয়ত সেই তরবারী এতক্ষণে তাহারি রক্তে প্লাবিত। আমি বাধা দিব বলিয়া আমাকে লুকাইয়া পালাইয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমিও পাগলের মত হইয়া উঠিলাম। একটা ছোট মনিব্যাগ মাত্র সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ ট্রেন ধরিতে ছুটিলাম। কি ভাগ্য, এখন ছুটির দিন।

ষ্টেসনে গাড়ী থামিল ঠিক ৫টায়। নামিয়াই কাকার বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। উম্মত্তের মত ছুটিলাম, আশেপাশে কে আছে বা না আছে, কে আমাকে দেখিতেছে বা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে—সে সবদিকে একেবারেই লক্ষ্য নাই—আমি কেবল হনহন করিয়া ছুটিয়াছি আমাদের গ্রামের দিকে। আমাদের বাড়ী যাইতে ডান হাতি একটা ছোট জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্য দিয়া গেলে একটু শীঘ্র যাওয়া যায়। আমি দ্রুতপদে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলাম ; কিন্তু এ কি! সুবোধের কণ্ঠ না? সেই ভীষণ চীৎকার—"দুর্ব্বৃত্ত, পাষণ্ড"! উৎকর্ণ, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাই! আর সন্দেহ নাই, সত্যই সুবোধ এক হাতে কৃষ্ণনাথকে ধরিয়া, অন্য হাতে তরবারী ঘুরাইয়া চীৎকার করিতেছে, "দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড, এই নে প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!"

এখনও সময় আছে, এখনও তরবারী বক্ষে বিদ্ধ হয় নাই। আমি ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"থাম থাম, রক্ষা কর—মেরো না মেরো না।" বলিতে বলিতে তীরবেগে সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু হায়! নিয়তি কে খণ্ডন করে! সেস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তরবারী আমূল কৃষ্ণনাথের বক্ষে বিদ্ধ হইয়া গেল—কৃষ্ণনাথ আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িল—আমিও সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম—সুবোধ ও কৃষ্ণনাথ আমারই পার্শ্বে বসিয়া। শুনিলাম রমানাথ খুড়ার বাড়ী পূজা উপলক্ষে 'প্রকৃত প্রতিশোধ' অভিনয় হইবে, তাহারা দুইজনে এখানে গোপনে তাহারই অভিনয় করিতেছিল।

ভারতী, কার্তিক ১৩১৯

পূজার তত্ত্ব

কর্ত্তা হাঁকিলেন—"কোথা গো গিন্নি! এই পুজোর তত্ত্বের কাপড়চোপড় সব বুঝে নাও। উঃ, কদিন থেকে কি হেঙ্গামাটাই লাগিয়েছিল! ভিতর-বাড়ীর চৌকাট ত ডিঙ্গানই দায় ;—বার-বাড়ীতে দু চারজন বন্ধুবান্ধবে মিলে যে নিশ্চিন্ত মনে দুদণ্ড বসে কাটাব তারও যো ছিল না। সেখানেও পঞ্চাশবার লোক পাঠিয়ে তাগাদা!—এস গো এস, আমার কি আর কোন কাজ-কর্ম্ম নেই নাকি?"

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস যে মস্ত-একটা কাজের লোক একথা তাঁহার একজন মহাশত্রুকেও স্বীকার করিতে হইত। এমনকি তাঁহার কাজের দায়ে তাঁহার চাকরবাকরদের পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। তিনি দিনের বেলাটা যেরূপ অবিশ্রাম ধূম-সেবনে এবং রাত্রিবেলাটা ধান্যেশ্বরী-পূজায় কাটাইতেন তাহাতে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিও তাঁহাকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিত না।

গিন্নি ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন ;—স্বামীর ডাকে বঁটি, তরকারী ফেলিয়া সোৎসুকে দালানের দিকে ছুটিলেন। ভবি দাসী এমন সুযোগটা ছাড়ে ত সে ভবিই নয় ; বিড়ালের ভাগ্যে কিছু সবদিন শিকা ছেঁড়ে না। অনেকদিন হইতে তাহার বড়ি চিংড়ির অম্বল আর পুঁই-চড়চড়ি ও কলাই-দাল-পোড়া ঠিক দেশের মত করিয়া রাঁধিয়া খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। যথাসম্ভব শীঘ্র ইহার উপকরণসমূহ তাহার কোঁচড়ে আবদ্ধ হইল। বাড়তি ভাগ, কিছু চালও সে সংগ্রহ করিল ; ভাতটার অবশ্য তাহার কোনদিন অভাব হয় নাই, তবে এ চালগুলির বদলে একদিনকার মুড়িমুড়কির যোগাড়টা হইয়া রহিল। তখনও গৃহিণী ফিরিলেন না দেখিয়া সহসা গুড়-তেঁতুলের কথাটা মনে পড়িয়া তাহার রসনা লোলুপ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে হাঁড়িটা ছিল—সর্ব্বোচ্চ স্তরে, পাড়া একটু কঠিন, বিশেষ যদি সে সময় কেহ আসিয়া পড়ে—হাতের গুড়ের দাগটা সামলান দায় হইবে। লোভ ও যুক্তি যখন এইরূপে তাহার মনের মধ্যে যুদ্ধ-নিরত তখন সহসা কর্ত্তা-গিন্নির বাদানুবাদ শুনিয়া সে দ্বারদেশে আসিয়া দালানের দিকে উঁকি মারিল।

কর্ত্তা দালানের একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া কাপড়গুলা ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন—গিন্নি নিকটে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকখানি হাতে লইয়া ভাল-মন্দ বিচার করিয়া দেখিতেছিলেন।

গৃহিণীর সাজসজ্জার আড়ম্বর বিশেষ-কিছু ছিল না—তাঁহার পরণে একখানি লালপেড়ে সাড়ী, হাতে দুগাছি সোনার বালা আর গলায় একখানি সরু হার। কিন্তু মুখশ্রী এমন উজ্জ্বল সুন্দর যে এই সামান্য সাজেই তাঁহাকে সুসজ্জিত দেখাইতেছিল। সিঁথির সিঁদুরটুকু সত্যই যেন তাঁহার রূপে হাসিতেছিল। আর যে দেবতার আশীর্ব্বাদ এই সিন্দূর-রেখা—সেই স্বামীদেবতা তাঁহার স্থূলদেহ, বিরক্তিবিকৃত মুখশ্রী এবং মদ্যগন্ধমুখর কথাবার্ত্তা লইয়া পত্নীর পার্শ্বে বেশ-একটু বেমানান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গৃহিণী মেয়ে-জামাইয়ের কাপড় দেখিয়া বলিলেন—"এখন কত-রকম বারাণসী শাড়ী হয়েছে—দেখতে কত ভাল, আর দামও তেমন বেশী নয়, তাই কোন্ একখানা

মেয়ের জন্য দিলে? ঐ এক বই ত আর দশটা মেয়ে নেই তোমার। আর জামাইয়ের উড়ানীখানা অন্ততঃ রেশমী দিলে ভাল হোত। জান ত গেল-বারের তত্ত্বে কত কথা শুনতে হয়েছিল। জামাই ত সেজন্য এ-মুখো হোল না—এবারও দেখছি আসবে না।"

"আবার প্যানপ্যানানি। আমি ত আর পেরে উঠিনে! তাদের পছন্দ না হয়—তত্ত্ব পাঠিয়ো না—।"

"জগৎসুদ্ধ লোক তত্ত্ব পাঠাবে,—আর আমরা পাঠাব না, কি করে যে একথা তুমি বল। তোমার তত্ত্বের জন্য ত তারা বসে নেই, পেলে বড়-মানুষও হবে না, তবে মেয়েটার তাতে নানা কথা শুনতে হবে—সেইজন্যই আমার বার বার বলা।"

"মেয়েকে ত ঢের দিয়েছি। বিয়ের সময় ত জামাই ছেড়ে কথা কয়নি। যদি চিরকালই ওদের মন যোগাব তবে আমার ছেলেদের কি হবে? তাদেরও ত লেখা পড়া চাই, অন্নসংস্থান চাই।"

"হায়রে আমার কপাল! তাদের জন্য যদি ভাবতে তাহলেও ত দুঃখ ছিল না। তোমার মদের সংস্থান ত আগে হোক্।"

আর কি রক্ষা আছে! কর্ত্তা রাগিয়া কাপড়গুলা তক্তা হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তবে থাক, আর কিছু পাঠাতে হবে না, কোথায় রে হরে—কাপড়গুলো নিয়ে যা ত।—আমি গরীব মানুষ, তোমার খাঁই মেটাতে পারব না। তোমার লক্ষপতি বাপকে বলো, তিনি কিংখাপ বেণারসী যোগাবেন এখন।—ওসব আমার কর্ম্ম না।"

কর্ত্তা ত রাগিয়া চলিয়া গেলেন। গিন্নি চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাপড়গুলা তুলিতে লাগিলেন। ভবি তখন তাহার রসনা পরিতৃপ্তির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। সেও অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া গৃহিণীর সাহায্যে তৎপর হইল।

লক্ষ্মীমণি সত্যই লক্ষ্মী। যাহা পাইলেন তাহা লইলেন, যাহা পাইলেন না, তাহা কষ্টসঞ্চিত সামান্য অর্থ হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিলেন। সুতী চাদরের পরিবর্ত্তে একখানা রেশমী চাদরও আনাইয়া লইলেন। অবশেষে ঘরে নানারকম মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া জামাইবাড়ী তত্ত্ব পাঠাইয়া দিলেন। গতবারে পিতার নিকট কিছু চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবার আর চাহিলেন না ;—কেন না—জামাতার মতিগতি দেখিয়া বড় ছেলেটার শিক্ষার ভার পিতাই গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতা বড়-মানুষ নহেন। স্বামীর আয় তাঁহাপেক্ষা অনেক অধিক।

তত্ত্ব দেখিয়া শ্বশুর-বাড়ীর সকলে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—সে সকল কথা যে কন্যা সুশীলার শ্রবণ সুখকর হইল না—তাহা বলা বাহুল্য। সুশীলা নীরবে শুনিল, নীরবে অশ্রুপাত করিয়া মনে মনে বলিল, বাবা কি সত্যি এর চেয়ে একটু ভাল তত্ত্ব পাঠাতে পারতেন না? বোঝেন না কি যে এজন্য আমায় কত সহ্য করতে হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে মাকে স্মরণ করিল—তাহার দুঃখিনী মা,—তাহার জন্য তাঁহাকে কত কষ্টই সহ্য করিতে হয়। মাতার কষ্টের স্মৃতির মধ্যে তাহার নিজের কষ্ট চাপা পড়িয়া গেল।

২

গতবারে সুশীলার স্বামী পূজার সময় শ্বশুর বাড়ী যান নাই বলিয়া মা বড় দুঃখ করিয়াছিলেন। এবারও সুশীলাকে লিখিয়াছিলেন—তাহারা দুজনে জোড়ে তাঁহার কাছে না আসিলে তাঁর বড়ই দুঃখ হইবে।

সুশীলা জানিত স্বামীকে রাজি করা সহজ হইবে না; শ্বশুরের প্রতি জামাতার অনুরাগের উচ্ছ্বাস ত ছিলই না—ইহার উপর অন্য পাঁচজনে অনবরত এই বিরাগ-অনলে আহুতি দান করিতে ছাড়িত না।

রাত্রিকালে দেখা হইবামাত্র সুশীলা স্বামীকে বলিল—

"এবারে যাবে ত?"

"কোথা?"

"কেন কাল যে সপ্তমী পুজো। আরবারে তুমি গেলে না—মা কত দুঃখ করেছিলেন, চিঠিখানা পড় না—দেখ না কি লিখেছেন?"

সুশীলা কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্বামী বলিল—"না, আর চিঠি দেখাবার দরকার নেই। আমি যাচ্ছিনে। আদর ত খুব। তত্ত্ব দেখলুম—যা পাঠিয়েছেন—তা চাষাভুষোরাও অমন তত্ত্ব পাঠায় না।"

"বাবার যে টাকার টানাটানি!"

"টানাটানি? কিপটে, কঞ্জুষ, মাতাল!"

সুশীলা ভাবিয়াছিল আজ আর স্বামীর কোন কথায় সে রাগিবে না, শান্ত সংযত ভাবে তাহাকে সাধিয়া অনুনয় করিয়া—যেমন করিয়া পারে কাল সঙ্গে লইয়া যাইবে। কিন্তু আর বুঝি সে-সঙ্কল্প সে রক্ষা করিতে পারে না। তবু চোখের জল কষ্টে চোখে বাঁধিয়া শান্ত স্বরে বলিল—"ধুতীখানা যেমনই হোক, চাদরখানা ত রেশমী দিয়েছেন—আর আর—সেণ্ট, চিরুণী—বুরুস—রুমাল—এ সবই দিয়েছেন।"

"হায় হায়! রেশমী চাদর—তার চেয়ে একখানা সুতী দিলে তবু পরার মত হোত। আঃ ছোঃ! এ সেই মার্কামারা সস্তা বিজ্ঞাপন দেওয়া চাদর! তোমার বাপ এ তত্ত্ব পাঠালে কি করে। এমন ছোটলোকের ঘরেও বিয়ে করেছিলুম।"

সুশীলার আর ধৈর্য্য রহিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন একলাই বাপের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তখন দ্বিপ্রহর। পিতা বাড়ীর ভিতর আহারে বসিতেছিলেন। স্ত্রীর সৌভাগ্যবশতঃ দিনের মধ্যে এইসময়টা একবার তিনি ভিতরে আসিয়া দেখা দিতেন। কন্যা আসিয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মা আশীর্ব্বাদ করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—"মথুরা এল না?"

পিতা বলিলেন—"জামাই আসেনি? তা না এলেই ভাল। তার ত আমাদের সঙ্গে কেবল পয়সার সম্পর্ক। এমন জামাই-এর মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না।"

মা স্বামীকে চোখ টিপিলেন—কিন্তু কর্ত্তার কি না সেদিকে লক্ষ্য। বলিলেন—"সব সমান; যেমন বাপ তেমনি বেটা। টাকাটাই সংসারে চিনেছেন—এমন যক্ষির হাতেও মেয়ে দিয়েছিলুম।"

সুশীলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিজে স্বামীর সহিত ঝগড়া করুক,

—কিন্তু অন্যের মুখে স্বামীর নিন্দা অসহ্য। হায় সতীর মত যদি এ নিন্দা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত!

কিন্তু পশুপতি সতীর প্রাণত্যাগে উন্মত্ত হইয়া প্রলয়-উৎপাদন করিয়াছিলেন। আর তাহার পতি? হয়ত পত্নীর মৃত্যুতে সে মঙ্গলই জ্ঞান করিবে!

"মা, মা!"

"বাছা আমার, ধন আমার!"

"আর পারিনে।"

"না পারলে চলবে কেন মা? আমরা যে মা কষ্ট সইতেই এসেছি।"

"এত কষ্টের জীবনে দরকার কি মা?"

"দরকার আছে বই কি? ভগবান তোমাকে জীবন দিয়েছেন কর্ত্তব্য পালনের জন্য।"

"এমন দুঃখের জীবন নিয়ে কি মা, কর্ত্তব্য পালন করা যায়?"

"যায় বই কি?"

"তা ত দেখছি মা; কি কষ্ট সয়েই তুমি আমাদের মানুষ করেছ।"

"মানুষ কি করেছি মা? তা যদি করে থাকি—তবে আর মৃত্যুর কথা মনেও এন না। সহ্য করে কর্ত্তব্যপালনেই মনুষ্যত্ব। স্ত্রীলোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ ক'রে—প্রকৃত মানুষ করে তুলবে—তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।"

"মা আশীর্ব্বাদ কর—চরণ ধূলি দাও, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করতে পারি। কত সৌভাগ্য যে তোমার মত মা পেয়েছি, সকল মা তোমার মত হোক্—এই প্রার্থনা করি।"

সুশীলা মাতার বক্ষে তাহার তপ্ত মস্তক রক্ষা করিল।

ভারতী, আশ্বিন ১৩২১

ট্যালিসম্যান

কর্ণেল টড সাহেবের আর্দালি ছিল পঞ্জাবি রণবীর ; নামে, কাজে কিন্তু কাণ্ডারী। যতরকম বিপদে আপদে সে তাঁহাকে রক্ষা করিত।

তীরবেগে মোটার না চালাইলে সাহেবের মন উঠিত না ; মোটারে বসিয়া কল্পনা করিতেন, তিনি উড়িয়াছেন ব্যোমযানে।

প্রভু চালাইতেন মোটার, পাশে বসিয়া থাকিত ভৃত্য রণবীর। রণবীরের ইঙ্গিত কৌশলে, বা 'অকাল্ট' প্রভাবে, ঠিক বলা যায় না, এমন বেগগতিতে অর্থাৎ বেগতিতেও চৌরাস্তা অতিক্রমকালে কোন একটি দিন সাহেবের হাতে accident হয় নাই, বা চৌরঙ্গির পথে তিনি পুলিস সারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। আর যে দিনটি রণবীর তাঁহার পাশে ছিল না—ঠিক সেইদিনই কিনা বাড়ীর রাস্তার মোড়ে একটি লোক তাঁহার মোটরে চাপা পড়িয়া গেল!

মেম-সাহেবের চাকর-মহলে বড় একটা সুনাম ছিল না। তিনি নাকি অন্যকে ন্যায্য আহার্য্য সঞ্চিতেও বঞ্চিত করিতেন, আর নিজে পানাপানেও দোষ জ্ঞান করিতেন না। পান অর্থেই বা তাহাদের অভিধানে কি লেখে, আর অ-পান অর্থেই বা তাহারা কি ইঙ্গিত করিত সে কথাটা মেমসাহেবের লবণভোগী দলেরা স্পষ্ট করিয়া কখনো বলে নাই। তবে ঘটনাচক্রে তাঁহার ধূমপান প্রীতির কথাটাই বাজাররাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

কোন একটি বিশেষ মেল-দিবসে মেমসাহেব সিগারেট-খণ্ড মুখে লইয়াই নাকি লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন ; কখন বা কেমন করিয়া বহ্নি হইতে ভস্ম বা ভস্ম হইতে বহ্নিকণা নির্গত হইয়া কার্পেটখানি যে ধূমায়িত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। সহসা পায়ের দিকটা গরম বোধ হওয়ায় নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এ শুধু ধূম নয়, তাঁহার ঘাগরাপ্রান্তটি অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই যদি না রণবীর তৎক্ষণাৎ আসিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিত, তবে তাঁহার এই নবীন-কোমল সুমূর্ত্তির যে কিরূপ বিদগ্ধ বিকৃতরূপ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সাজসজ্জার সময় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই এই চিন্তায় বহুদিন ধরিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটা আতঙ্ক-শিহরণ উঠিত।

টিমবাবা তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। তাহার জন্মদিনে জু-গার্ডেনে ছেলের দল লইয়া তাঁহারা গিয়াছেন পিকনিক করিতে। কতকগুলি মানবশিশু বানরশিশু দেখিতে ছুটিয়াছে, কোন দল বা সর্প কুম্ভীরের আড্ডায়, কেহ কেহ বা বাঘ সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়াইয়া ডাক শুনিবার অভিপ্রায়ে নির্ভয়ে লাঠির খোঁচা দিতে উদ্যত ; কিন্তু গর্জ্জন শুনিবামাত্র সভয়ে পিঞ্জরের নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছে। এক এক ছেলের দলের সহিত দু-একজন সাহেব মেম বা ভৃত্য।

কয়েকটি বালক নৌকা করিয়া হ্রদ-ভ্রমণ করিতেছিল ; হালী স্বয়ং বাবা টিম। রণবীর এ দলের নেতা, তাহার ইচ্ছা ছিল সে নিজেই কাণ্ডারী হইয়া ছেলেগুলিকে কম্পানীর হ্রদ পার করে। কিন্তু টিমবাবা পিতামাতার একটি সন্তান—জেদ ধরিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকেও তিনি

হার মানাইতে চান, রণবীর ত সামান্য ভৃত্য। সে বেচারা হাল ছাড়িয়া ম্লান মুখে তীরে আসিয়াই দাঁড়াইল, কিন্তু নিশ্চিন্তমনে নহে। হায় রে! যা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল ; অল্পদূর না যাইতেই নৌকাখানি উল্টিয়া পড়িল। যদি না রণবীর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে ধরিয়া ধোবার কাপড়ের মত ছেলেগুলাকে তীরে আছড়াইয়া ফেলিত, তবে এই আনন্দের দিনে একটা শোকাভিনয় কাণ্ড ঘটাও বিচিত্র ছিল না।

এইরূপে জলে স্থলে, কর্ণেল সাহেবের শ্রীমধুসূদন ছিলেন আর্দ্দালি রণবীর। তাই প্রভু আদর করিয়া এই উপকারী 'পেয়ারে'র চাকরের নাম দিয়াছিলেন ট্যালিসম্যান।

২

তিন বৎসরের ফার্লো লইয়া সাহেব যখন বিলাতযাত্রা করিলেন তখন রণবীর আর অন্য কাহারও চাকরী গ্রহণ করিল না। প্রয়োজনও ছিল না, সাহেবের অনুগ্রহে সে বেশ দু পয়সা সংস্থান করিয়া লইয়াছিল। দেশে জমীজিরাৎ দু'দশ বিঘা যাহা ছিল তাহার চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া সে গৃহবাসী হইল। বিবাহ তাহার বাল্যকালেই হইয়াছিল।

রণবীর জাতিতে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত না হইলেও চলনসই লেখাপড়া জানিত, প্রত্যুৎপন্ন মতিও তাহার চমৎকার, পরের উপকারেও বিমুখ নহে, কাজেই গ্রামের মধ্যে সে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। চিঠিপত্র পড়াইতে, বিবাদে সালিসি মানিতে, মকদ্দমা মামলার পরামর্শ লইতে গ্রামের সকলেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে—এমন কি পাঁজিপুথি দেখাইতেও এখন বড় একটা কেহ গণকের নিকট যায় না।

গ্রামখানির নাম বামনিয়া, ব্রাহ্মণ-স্থান বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। নিজের এই ক্ষুদ্র বাসভূমিতে, গ্রামের লোকের আদর সম্মান এবং স্ত্রীপুত্রের প্রীতিযত্নের মধ্যে রণবীরের জীবন বেশ সুখেই কাটিতেছিল, এমন সময় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইয়োরোপে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিল।

আশ্বিন মাস, আকাশে বাতাসে, বনে উপবনে দিগ্‌দিগন্তে শরতের প্রভাব—শরতের শোভা। আকাশে ঘননীলিমার ছটা, শস্যশীর্ষ ক্ষেত্রে, তরুঘন—বনপ্রান্তে, তৃণময় শুষ্ক প্রান্তরে স্তবকে স্তবকে, স্তরে স্তরে শুভ্রশ্বেত কাশপুষ্পের ঘটা!—প্রভাতে সন্ধ্যায় শেফালি পুষ্পের মধুর গন্ধ এই বর্ণলালিত্যের প্রাণে কি মোহ—উম্মাদনা জাগাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে কাহার অভিসার উদ্দেশে গমন করে—কে জানে?

এবার ক্ষেত্রের অবস্থা বড় ভাল, কৃষক পরিবারের আনন্দের সীমা নাই। সমস্ত ধান্য-ক্ষেত্রই প্রায় পীতশ্যামল, মাসখানেকের মধ্যেই হৈমন্তিক শস্য কাটিবার সময় আসিবে, এখন হইতেই তাহার আয়োজন চলিতেছে।

রণবীর ক্ষেত্র-কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিতেছিল। রবির আলো অস্ত যাইতেই পশ্চিমগগনে শুকতারা হাসিয়া উঠিয়াছে, মধ্যগগনে নবমীর চন্দ্রকলা ভাসমান, গ্রীষ্মের পর প্রথম শীতের বায়ুপ্রবাহ নবীন বসন্তের মতই সুখসঞ্চার করিয়া ফিরিতেছে।

আকাশের সেই স্নিগ্ধ আলো, ক্ষেত্রের সেই শ্যামল শোভা, বাতাসের সেই চঞ্চল পুলক রণবীরকে কি এক যেন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে অভিভূত করিয়া তুলিল। অতি সুখের

বিহ্বলতায় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে ক্ষণকাল উর্দ্ধমুখ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এই চিত্রবিচিত্রা ধরণী যাঁহার শোভা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যাঁহার মহিমা, এই সুখদুঃখভোগী জীব যাঁহার সৃজন, ক্ষুদ্র মনুষ্যের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত অগম্য সেই বিশ্বপতি পরমকারণের উদ্দেশে সে পরিপূর্ণ প্রাণে বারবার নমস্কার করিয়া পুনরায় গৃহাভিমুখী হইল।

রণবীরের পত্রছায়িত মৃন্ময় গৃহে গোময়লেপিত সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পাথরের একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির। গ্রামে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই পত্নী পার্ব্বতী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া স্বামীর অপেক্ষা করিতেছিল। রণবীর আসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া জয় মহাদেব জয় জয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিয়া দিতেই, সীতা সতী রুক্মিণী ভবানী প্রভৃতি আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক দুই চারিটি বালকবালিকা সহ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে কেহ বা রণবীরের আশ্রিতা,—কেহ বা অল্পদিনের জন্য আত্মীয়ভবনে আসিয়াছে, কেহ বা পাড়া প্রতিবাসী, একঘণ্টার জন্য দেখাশুনা করিতে আসিয়া সারাবেলাটা এইখানেই কাটাইয়া আরতির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তৎপূর্ব্বে বারবেলায় কি দ্বারের বার হইতে আছে? এতক্ষণ ইহাদের গানের ধুম লাগিয়াছিল রান্না-ঘরের রোয়াকে। সেখানে দুইজনের হাতের ঘূর্ণায়মান চাকির সম লয়ে সমবেত সকলের সম্মিলিত কণ্ঠতান এতক্ষণ বেশ সমজোরেই ঘুরপাক খাইতেছিল। তাহারা আসিলে সকলে মিলিয়া দীপারতি শেষ করিয়া দেব প্রণাম করিবার পর যে যাহার স্থলে গমন করিল।

পার্ব্বতী সাধারণ হিন্দুকন্যার ন্যায় সুগৃহিণী এবং নিষ্ঠাবতী পত্নী। পূজা শেষে স্বামীর পা ধুয়াইয়া দিয়া, তাহাকে খড়ম পরাইয়া সে গেল চা আনিতে। চা পানটা অনেকদিন হইতেই রণবীরের এমন অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে যে ভাতরুটি না পাইলেও বরঞ্চ একদিন চলে কিন্তু সকালে সন্ধ্যায় চা টুকু না পাইলে প্রাণটা ঠোঁটের আগায় আসিয়া জমে।

রণবীর ততক্ষণ মাদুরপাটির উপর তৈলদীপের সম্মুখে বসিয়া পকেট হইতে একখানি হিন্দুস্থান কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছু পরে স্ত্রী আসিয়া মস্ত একবাটী নাতিউষ্ণ চা তাহার সম্মুখে ধরিতেই কাগজখানা একবার নীচে রাখিয়া দুইহাতে চা-পাত্র ধরিয়া এক নিশ্বাসে সমস্তটা নিঃশেষপূর্ব্বক বাটীটা পার্ব্বতীর হাতে দিয়া পুনরায় পাঠে প্রবৃত্ত হইল।

পার্ব্বতী তখন ক্ষুদ্র একটী আলবোলা রণবীরের নিকটে রাখিয়া বসিল তামাক সাজিতে। রোয়াকের একপাশে ছোট একটি কড়ায় গুলের আগুন প্রস্তুত ছিল, সেইখানে বসিয়া সে টিকা ধরাইয়া তাহা কলিকার তামাকের উপর রাখিয়া ফুঁক পাড়িতে লাগিল। সে ফুঁক কৌশলে তামাক একদণ্ডও স্থির থাকিতে না পারিয়া অচিরাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তখন আলবোলার মাথার উপরে তাহাকে স্থানদান করিয়া নলটা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিবামাত্র, কাগজ পড়িতে পড়িতেই তিনি তাহাতে টান সুরু করিয়া দিলেন। তাহার শিশুপুত্র কিষণদাস আজ বাহিরের ছেলেদের সহিত সমস্ত দুপুরবেলাটা মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়া ঠিক সন্ধ্যাবেলাতেই রোয়াকের একখানা খাটিয়াতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; আলবোলার শব্দে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে লাফাইয়া নীচে নামিয়া পিঠের দিক হইতে আসিয়া রণবীরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিল, "বাবুজি, পিতাজি!"

পিতা কিন্তু আজ এমন পাঠনিমগ্ন যে পুত্রের আদরের বিনিময়ে তাহার প্রতিদিনের ন্যায্য পাওনাটা পর্য্যন্ত তাহাকে দিতে ভুলিয়া গেলেন, এমন কি হাসিয়া তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

রণবীর পড়িতেছিল, একবিংশ পঞ্জাবী রেজিমেণ্টের নায়ক হইয়া কর্ণেল টড সাহেব ফ্রান্সে লড়াই করিতে যাইতেছেন। সমস্ত পঞ্জাবে সেজন্য নবসৈন্য সংগ্রহ চলিয়াছে। এই গ্রামে সৈন্য ভর্ত্তি হইবার শেষ দিন আগামী কল্য। এই সংবাদেই তাহাকে এতদূর বিমনা করিয়াছে। টড সাহেবের সঙ্গে সে যদি না থাকে তবে তাঁহাকে রক্ষা করিবে কে? সে যে তাঁহার ট্যালিসম্যান—রক্ষাকবচ! আর তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে ইংলণ্ডেরও ত সমূহ ক্ষতি। সে জানে তাহার কর্ণেল সাহেবই ইংলণ্ডের একটিমাত্র সেনাপতি যাঁহার জীবন মৃত্যুর উপর সমগ্র রাজ্যেরই জয় পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

রণবীরের মন দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল। "কি করিবে সে? যাইবে না থাকিবে? কি তাহার কর্ত্তব্য?"

খোকা আরো দুএকবার পিতাজি—বাবুজি—বলিয়া ডাকিল, কিন্তু উপেক্ষিত হইয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রণবীর তখন কাগজখানা আছড়াইয়া নীচে ফেলিয়া শিশুকে বুকে টানিয়া লইয়া বারবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, দু'একবিন্দু অশ্রুজল শিশুর মুখে পতিত হইল।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল—"লড়াইকা ক্যা খবর পতিজি?"

মুখ নত করিয়াই রণবীর উত্তর করিল "কুছ নেহি, কুছ নেহি।"

৩

"আরে ভাইজি রণবীর, ডেরামে হো।"

তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা মহাবীর এইরূপে হাঁকিয়া পরদিন প্রায় বেলা দ্বিপ্রহরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন অসময়ে এত প্রখর রৌদ্রে, বাড়ীতে আরাম করিয়া নিদ্রা যাইবার পরিবর্ত্তে গ্রামের ডাকসাইটে অলস মহাবীরের এখন এখানে আসিবার অবশ্যই একটু নিগূঢ় কারণ ছিল। কারণটা এই, তাহার গর্ভবতী পত্নীর মূর্চ্ছা হইতেছে, পাঁচজনে বলিতেছে ঝাড়ফুঁক কর। রণবীর যদি এ কার্য্যের ভারটা লয় তাহা হইলে আর অন্য ওঝার সন্ধানে যাইতে হয় না। তাহার মাথার একটা বোঝা নামে।

পার্ব্বতী এতক্ষণ উঠানের ছায়ার ধারটাতে বসিয়া বিচালি কাটিতেছিল, কাজটা শেষ করিয়া সবে মাত্র বঁটিখানা রোয়াকের গায়ে ঠেসাইয়া কাটা বিচালির রাশি থলির মধ্যে ভরিতে আরম্ভ করিয়াছে ;—কৃষাণ গরু লইয়া আসিয়াই যাহাতে জাব দিতে বিলম্ব না হয়, এমন সময় মহাবীরের আবির্ভাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ঘরমে ত নেহি হ্যায়, ভাইজি, খবর ক্যা হো?"

খবর যে বড় ভাল নয়, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিয়া ক্ষুণ্ণহৃদয়ে সে অন্য ওঝার তল্লাসে চলিয়া গেল ; কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল রণবীর আসিলেই তাহাকে যেন পার্ব্বতী পাঠাইয়া দেয়। ঝাড়ফুঁক না করিলেও সে সময়টা সেখানে তাহার উপস্থিত থাকাটা চাইই চাই।

পার্ব্বতী খবরটাতে বড় দুঃখিত ও চিন্তিত হইল। কাজকর্ম্ম শেষে সন্ধ্যাবেলাটা সেখানেই কাটাইবে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিচালিগুলা থলি বোঝাই করিয়া লইল ; তাহার পর উঠানটি একবার পরিষ্কাররূপে ঝাঁটাইয়া শয়নগৃহের দিকে যাত্রা করিল। আজ বাড়ির আর সকলেই কিষণদাসকে লইয়া শিবনারায়ণের কথা শুনিতে পার্ব্বতীর ভ্রাতৃভবনে গিয়াছে। ভ্রাতা স্বয়ং আসিয়া তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কাজকর্ম্ম দেখিবার ছুতায় পার্ব্বতী কেবল যায় নাই, আসল কথা সে গেলে রণবীরের অসুবিধা হইবে যে। কিন্তু ভাইয়ের কাছে পার্ব্বতী কথা লইয়া ছাড়িয়াছে যে তিনি আজই কিষণদাসকে আবার নিজে রাখিয়া যাইবেন। সে একটি রাতও ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না যে।

তখনো অনেকটা বেলা ছিল ; কিষণদাসের অভাবে আশ্বিনের বেলাও পার্ব্বতীর আষাঢ়ের বেলার ন্যায় সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল। কাজকর্ম্মেও কেমন মন লাগিতেছিল না। কিষণদাস ঘরে থাকিলে সমস্ত বাড়ীটা গুলজার করিয়া রাখে, ছোটে, খেলা করে, দোলনায় দোলে, আর মায়ের সকল কর্ম্মের সহযোগী হইতে গিয়া প্রতিকর্ম্মে বাধা দেয় —তবুও সকল কর্ম্ম কত সহজে কত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়। আজ তাহার মা বেলায় বেলায় বিছানাপত্র ঠিক করিয়া লইয়া বেলায় বেলায় রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। উনুনে আগুন দিয়া সন্ধ্যার তরকারীটা কুটিয়া লইয়া রুটির ব্যঞ্জনটা প্রস্তুত করিয়া রাখিল, স্বামী আসিলে শুধু গরম গরম রুটি কয়খানা তৈয়ার করিয়া দিয়া তাঁহার আহারের পর দুজনে মহাবীরের স্ত্রীকে দেখিতে যাইবে। তরকারীটা নামাইয়া চায়ের জলটা উনুনে চড়াইয়া সে বাসনগুলা কূয়ার তলায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় দরজায় উঁকি মারিল নিহিল সিং, রণবীরের গ্রামবন্ধু। তাহার ছোট ভাইটির বরাত প্রেরণ উপলক্ষে সপরিবার রণবীরকে সে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। তাহারা কাল না যাইলে এ কাজটা যে সুসিদ্ধ হইতেই পারে না,.ভাবে ইঙ্গিতে, বাক্যে ভাষ্যে, তর্কযুক্তিতে নানারূপে ইহা সপ্রমাণ করিয়া, রণবীরসহ পার্ব্বতী নিশ্চয়ই কাল সেখানে যাইবে, পার্ব্বতীর নিকট হইতে এই কথা লইয়া তবে শুভ গোধূলি লগ্নে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গোয়ালে তখন গরুগুলির হাম্বারব শুনিয়া পার্ব্বতী সেখানে গিয়া প্রত্যেক গরু বাছুরের নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিল ; প্রতি গামলায় জাব ঠিকমত পড়িয়াছে কিনা দেখিল, দুএকটা গামলা খালি রাখিয়া কৃষাণ জল আনিতে গিয়াছিল, কৃষাণ আসিতে না আসিতে পার্ব্বতী ভূষি বিচালি প্রভৃতি গামলায় ঢালিয়া ঠিক করিয়া রাখিল। তাহার পর গোশালে ধূঁয়া দিয়া দীপ হস্তে যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল তখন গ্রামে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার যে এখানে আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে, সে বুঝিতেই পারে নাই। আকাশে চাহিয়া দেখিল, দিনের আলো একেবারেই নিবিয়া গিয়াছে ; ঠিক মাথার উপরে সুনীল আকাশে মস্ত চাঁদখানা হাসিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে আলোকে তাহার হাতের দীপ একান্ত ম্রিয়মান।

এত দেরী হইয়াছে, এখনো আজ রণবীরের দেখা নাই! আরতির যে বিলম্ব হইয়া যায়!

একেই ছেলেটা কাছে নাই বলিয়া মনটা খারাপ আছে ; মহাবীরের পত্নীর খবরেও

মনের উপর একটা চাপ পড়িয়াছে—এ সময় স্বামীকে অনাগত দেখিয়া কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা, অকারণ আকুলতা তাহার মনের মধ্যে যেন চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে কিনা একটা টিকটিকি গৃহকোণে টিক টিক করিয়া উঠিল! একটা বাদুড় পাখনার ঝাপটা দিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল! ইহা অলক্ষণ বা সুলক্ষণ! কি জানাইতে চাহে ইহারা?

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য দিবার আজ তাহার সময় নাই! সন্ধ্যা যে বহিয়া যায়। কষ্ট দুঃখ আশঙ্কা মনে চাপিয়া লইয়া একাকী সে সন্ধ্যারতি সমাপন করিল; রণবীর চাকরী ছাড়িয়া গৃহে আসিবার পর আজি এই প্রথম এ সময়ে সে ঘরে নাই। আরতির শেষে স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনায় একান্তপ্রাণে দেব প্রণাম করিয়া উঠিয়া আবার সে দরজার দিকে চাহিল! দূরে যেন নাগ্‌রা জুতার শব্দ শুনিল; শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। এতক্ষণে রণবীর আসিতেছেন। দরজা ভেজান ছিল, আগন্তুকের হস্তস্পর্শে খুলিয়া গেল—কিন্তু উঠানে প্রবেশ করিল কে? রণবীর নহে; তাহার দেবরপুত্র রণজিৎ। নৈরাশ্যের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা খবর বেটা?"

ধীর কণ্ঠে রণজিৎ কহিল, "পলটন চলা গিয়া।"

"যানে দেও বেটা! সরকারজিকা জয় জয়কার!"

"কাকাজি বি গিয়া।"

"কাঁহা?"

"পলটন কা সাৎ।"

"পলটন কা সাৎ? কাঁহেরে?"

"লড়নেকো!"

"লড়নেকো! হমারা বেটাকো পিতাহীন করকে গিয়া! হা ভগবানজি!"

এই বলিয়া মর্ম্মভেদী আকুল ক্রন্দনে ভূমিতলে সে লুটাইয়া পড়িল।

৪

ভারতসৈন্য ফ্রান্সে পৌঁছিয়া যেরূপ অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে যে মাথাগুলা তাহাদের পায়ের দিকে লুটাইয়া পড়ে নাই ইহাই আশ্চর্য্য। সংবাদপত্রে সে সময় ইহার যে বিশদ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে,—ফ্রান্সের নরনারী সিপাহী সৈনিকের উপর কেবল জয়ধ্বনি এবং ফুল বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অনেক প্রবীণা—এমন কি অনেক নবীনাও—চুম্বন-আশীর্ব্বাদে তাহাদিগকে সমাদৃত করিয়া লইয়াছিল। উজ্জ্বলকান্তি সুরূপ সুপুরুষ রণবীর প্রমুখদলের উপর যে এইরূপ সম্মান অতিমাত্রায় বর্ষিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। লজ্জাবতী স্ত্রীলোকের মতই এই আদর-ভারে রণবীর মুহ্যমান কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত আনন্দ উল্লাসের মধ্যে যখন সিপাহীর দল গম্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহাদের হর্ষহাসি "ট্রেঞ্চে"-র অন্ধকারের মধ্যেই বিলীন হইয়া পড়িল।

যুদ্ধ কোথায়? যুদ্ধ কাহার সঙ্গে? কোথা হইতে গোলাগুলি পড়ে, কাহার উদ্দেশে

কামান ছোটে? রণতূর্য্যই বা বাজায় কে? যুদ্ধের আহ্বান ইঙ্গিত কোথা হইতে ভাসিয়া আসে? সেনানায়কই বা কে তাহাদের?

রণবীর টড সাহেবের রেজিমেন্টের সৈনিক, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত মুখোমুখি ভাবে একটি দিনের জন্যও সে তাঁহার দেখা পায় নাই। এ কিরূপ দানব যুদ্ধ?

তবুও তাহাদের এ যুদ্ধে অভ্যস্ত হইতে খুব যে বেশীদিন লাগিয়াছিল তাহাও নহে। বলিতে গেলে যুদ্ধারম্ভেই তাহারা সুনাম অর্জ্জন করে। ভারতসৈন্য ইয়োরোপ পৌঁছে শীতের প্রারম্ভকালে—অক্টোবরের প্রথমদিকে। মাসান্তেই ৩১শে অক্টোবরের যুদ্ধে সিপাহী গোলন্দাজ খুদদাদ এই সমরাগ্নি পরীক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ ভি সি উপাধি লাভ করিল। যখন তাহার দলের সকলেই নিহত, আহত, একটি কেহ আর তাহার সহায় সম্বল নাই, তখনও চতুর্দ্দিকের সেই মৃত্যুবেষ্টনের মধ্যে একাকী বসিয়া দ্বিতীয় "কাশিবিয়ানকা" খুদদাদ অকুতোভয়ে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল—এক মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কামান ত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

কামানের প্রাণান্ত ধ্বনির মধ্যেও ১৯১৪ সাল নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। জর্ম্মাণরা এখন কোথায়? যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহারা বেলজিয়ম ছারখার বিধ্বস্ত করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু একান্ত ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও প্যারিসের ফটকে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নগরীর প্রায় ৬০ মাইল দূরে আইন নদীর ধারে আটকা পড়িয়া গিয়াছে।

মিত্রদল ছোটখাট যুদ্ধে তাহাদের হটাইয়া মাত্র রাখিয়া জর্ম্মাণ-নিপাত-যজ্ঞের আয়োজনে আপনাদিগের সর্ব্বশক্তি প্রায় ব্যাপৃত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। যুদ্ধারম্ভের প্রায় ৮ মাস পরে ২২শে মার্চ্চে নুভেস্যাপলে যে যুদ্ধ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই ইংরাজের প্রথম জর্ম্মাণ আক্রমণ। এই আক্রমণে সিপাহীগণ যেরূপ অসম সাহস এবং অপূর্ব্ব পরাক্রম দেখাইয়াছিল তাহা-ইতিহাসের চিরকীর্ত্তি। সিপাহী গণবীর সিং (গোবর সিং) এই যুদ্ধে V. C. উপাধির অধিকারী হন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ইহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই, সম্রাট এই সম্মান দ্বারা মৃত বীরের স্মৃতি ভূষিত করিয়াছিলেন।

অনুজ্ঞা পাইবামাত্র এই মহাবীর বায়নেট হস্তে কতিপয়মাত্র সহচর অনুচর সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে জর্ম্মাণদিগের সর্ব্বপ্রধান (main) ট্রেঞ্চে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার প্রত্যেক বিভাগ এমন অসীম বলে ও কৌশলে আক্রমণ করেন যে শত্রুগণ অচিরাৎ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। যে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যের সহায়তায় গণবীর জর্ম্মাণদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, রণবীর তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

ইহার পর ষাট পাহাড়ের (Hill 60) যুদ্ধ। আমাদের এই ক্ষুদ্রগল্পের নায়ক রণবীরের ভাগ্য ইহারই সহিত বিশেষরূপে জড়িত।

৫

ওয়াইজার (Yzer) নদীর ধারে শত্রুমিত্র উভয় পক্ষই নিজ নিজ কোটর-সদনে (trench) থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। জর্ম্মাণেরা প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, মিত্রদল হটাইয়া দিতেছেন। যদি কোন একটা অশুভ মুহূর্ত্তে শত্রুদল পার্শ্বের উচ্চস্থান Hill 60

অধিকার করে তবে তাঁহাদের সমূহ বিপদ, আর তাঁহারা যদি পূর্ব্ব হইতেই ইহা লইতে পারেন তবে তাঁহাদের সংস্থিতি (Position) অনেকটা নিরাপদ। এই অধিকারের চেষ্টায় কোন পক্ষেরই ছল বল কৌশলের ত্রুটি নাই।

ব্যোমযান উপরে উঠিয়া সৈন্যাবাসের সংবাদ লইতেছে, কামানসংস্থান লক্ষ্য করিতেছে। শত্রুদল মিত্রবেশ ধরিয়া ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে! মিত্রদল বনের মধ্যে লুকাইয়া অগ্রগামী। গ্রামপথে যুদ্ধক্ষেত্র সহসা রাতারাতি বনে পরিণত হইতেছে। বিস্ফোটকপূর্ণ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইতেছে। বারুদ-বিদীর্ণ ধরাতলে লুকাইয়া শত্রুর কাছে থাকিয়াও একপক্ষে আত্মরক্ষা সহজ হইবে, অন্যপক্ষে এই সুড়ঙ্গ পথে শত্রুর ট্রেঞ্চে অগ্নি দিতে পারিলে ত মহা মঙ্গল।

কত রকমের কামান, উভয়পক্ষের ট্রেঞ্চের স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে রক্ষিত। ইহার মধ্যে জর্ম্মানের হাউইটজার (Howitzer) কামানই ধ্বংসসাধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার গোলাগুলি সঙ্কীর্ণ ট্রেঞ্চের মুখেও আসিয়া পড়ে, অন্য কামানের দ্বারা এ-কার্য্য সাধিত হয় না। অথচ এই নিশ্চিত মৃত্যুও ব্যর্থ করিয়া কৌশলী সেনাদল অগ্রসর হইতেছে।

উভয়ের ট্রেঞ্চ-বাসভূমি সম্মুখাসম্মুখী, এত কাছাকাছি যে কোন কোন অংশ হয়ত বা ৫০ হাতও দূরে নয়। ট্রেঞ্চে লুকাইয়া বসিয়া অনুমানে অথচ অঙ্ক গণনার মত অব্যর্থ সন্ধানে পরস্পরের আবাসের উদ্দেশে গোলাগুলি চলে। ট্রেঞ্চের পরিখায় বালির স্তূপ, ট্রেঞ্চের বাহিরে জলের বেষ্টন, তাহা ভেদ করিয়া শত্রুর অধিকারে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে।

তিনজন সৈনিক একটা সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতেছিল। একজন ইংরাজ, একজন ফ্রেঞ্চ, একজন হিন্দুসিপাহী। তিনজনের অবস্থা অনেকটা একই রকম। ঘরে মরাইভরা শস্য, সুন্দরী স্ত্রী, নয়নমনোহারী শিশু। এমন সুখের গৃহবাস ছাড়িয়া তিনজনেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতে আসিয়াছে। এখানে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ণের বা জাতির ভেদাভেদ নাই; তিনজনেই ইহারা অকৃত্রিম বন্ধু। রণবীরের প্রতি ইহাদের পরম শ্রদ্ধা, অসীম বিশ্বাস। ইহার প্রত্যুৎপন্নমতি, রণকুশলতা কতবার তাহাদিগকে আসন্ন মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কাজ করিতে করিতে ইহারা নীরব নির্ব্বাক ছিল না। ফ্রেঞ্চ বলিতেছিল, গৃহের এত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া সে যে এখানে আসিয়াছে, তাহার কারণ তাহার দেশ, to sauver sa Patrie, la France, ইংরাজ বলিল, আর তাহার আসিবার কারণ, তাহার জাতি to save his Nation ; এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর তাহাদের জাতীয় মান সম্মান প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। এই বলিয়া উভয়েই চাহিল তাহার হিন্দুসহযোগীর প্রতি। মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, কিন্তু ফরাসী সৈনিকের নীরব নয়নের প্রশ্ন রণবীরের কর্ণে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইল, "তুমি কেন আসিয়াছ? Pour quoi etes vous venu?" সে উত্তর কি দিবে এ প্রশ্নের? সত্যই ত, সে কেন আসিয়াছে? তাহার দেশের জন্যও আসে নাই, জাতির জন্যও নহে। সৈনিক কর্ত্তব্যপালনেও সে আসে নাই, কেননা সে সৈনিক ছিল না। তাহার কর্ত্তব্য ছিল স্ত্রীপুত্রপালন। তাহা অবহেলা করিয়াই সে আসিয়াছে, কি উত্তর দিবে তবে সে? সে উত্তর দিতে যাইতেছিল—"জানি না কেন আসিয়াছি, প্রাণ

দিতে আসিয়াছি শুধু এইটুকু জানি।”

কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, ভেরী বাজিল, ইহাই রণসজ্জার ইঙ্গিত। তিনজনে উঠিয়া ত্রস্ত গতিতে সৈন্যের সারিতে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল।

অবিরাম গোলানিক্ষেপে শত্রুপক্ষ পরস্পরকে সাদর বন্দনা জানাইল অর্থাৎ Bombardment আরম্ভ হইল।

৬

অনবরত গোলাগুলি পড়িতেছে, একস্থানে গোলা পড়িয়া সহস্রখণ্ডে ঠিকরিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, বিষাক্ত গ্যাসে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতেছে, জ্বলন্ত তৈল দ্রাবের পিচকিরি ছুটিয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, তবুও এই অসীম যন্ত্রণায় লক্ষ্যপাত না করিয়া অনুজ্ঞা পাইবামাত্র অকুতোভয়ে সিপাহীর দল সম্মুখীন হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বায়নেট উঠাইয়া শত্রুর দিকে ধাবিত হইল, ইহাকেই বলে বায়নেট charge। দলে দলে হতাহত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, দলে দলে পশ্চাতের সৈন্য তাহার স্থান পূরণ করিতে লাগিল। কিন্তু জর্ম্মাণ হাউইটজার কামানের গোলায় অল্পক্ষণে লৌহপ্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়া যায়, মনুষ্যপ্রাচীর আর কতক্ষণ টিঁকিবে। এই মহাবিপদে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়, যদি ব্যাটারি নিস্তব্ধ করিতে পারা যায়। ব্যোমযান কিছু পূর্ব্বে জর্ম্মাণ ব্যাটারির সংস্থান কোথায় তাহার সংবাদ দিয়াছে। একবিংশ পঞ্জাব রেজিমেণ্টের সেনাপতি আগুয়ান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে তোমরা আমার সৈনিকেরা এই সাহসের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবে? শত্রু নিধন করিয়া জয় সম্মানের অধিকারী হইবে, এস, অগ্রসর হইয়া দাঁড়াও। কে তোমরা আমাদের রক্ষা করিয়া, ইংরাজ ফ্রেঞ্চ মিত্রমণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিবে, এস, দাঁড়াও,—আমার বীর সৈনিকেরা, আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হও।”

প্রত্যেক দলের সেনানায়ক আপন আপন সৈন্যদলকে এইরূপে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দল হইতে দুই চারিজন সাহসী পুরুষ আসিয়া তাহাদের সেনানায়কের সম্মুখীন হইল। রণবীর আসিয়া দাঁড়াইল সর্ব্বাগ্রে। তাহার সেনাপতির সহিত মাঝে মাঝে ইতিপূর্ব্বে তাহার কয়েকবার দেখা হইয়াছে, কুচ করিবার সময়, রণে প্রবৃত্ত হইবার সময় সৈনিকশ্রেণীতে দাঁড়াইয়া কতবার সে তাঁহার দিকে চাহিয়া নীরবে অভিবাদন জানাইয়াছে, কিন্তু এত নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের আহ্বানবাণী সে ইতিপূর্ব্বে আর শুনে নাই।

রণবীর অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই কর্ণেল সাহেবও তাহাকে যেন এই প্রথম চিনিতে পারিলেন, উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন,—“তুমি ট্যালিসম্যান! আমার brave follower, তুমি আছ এ-যুদ্ধে, আমার কোন ভয় নাই, আমাদের নিশ্চয় জয়।”

এক অপূর্ব্ব আনন্দে রণবীরের মনোপ্রাণ সহসা পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেহ অপরিমিত দৈববলে যেন বলীয়ান বোধ হইতে লাগিল। জয়-সম্মানে ভূষিত হইলে কি ইহার অধিক আনন্দ, ইহার অধিক আত্মপ্রসাদ সে লাভ করিবে? রণবীর তাঁহার সাদর বাক্যের উত্তরে

নীরব প্রফুল্ল হাস্যে পুনরায় সাহেবকে অভিবাদন করিল, ইহাই তাহার অন্তরের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৭

অসাধ্য সাধিত হইয়াছে, গোলন্দাজগণ নিহত, বন্দী; ব্যাটারি নীরব। কিন্তু যাহারা এ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈনিকই জীবিত, আর কেহই প্রায় অনাহত নাই।

রণবীর যখন শেষ গোলন্দাজকে হত করিয়া রক্তাক্ত বায়নেট তাহার বক্ষ হইতে খুলিয়া লইল, তখন সহসা অস্ত্রখানা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। তুলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল তাহাতে সে অক্ষম, স্কন্ধমূল হইতে বাহুমূলে অসীম বেদনা, বস্ত্র বর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছে। তবুও বামহস্তে বায়নেট উঠাইয়া সে ধীর পদে অগ্রসর হইল। দুঃসাহসী বাহকদল ইতিমধ্যেই রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া নিহত, সংজ্ঞাহীন এবং চলৎশক্তিরহিত আহতদিগকে শিবিকার মধ্যে উঠাইয়া লইয়াছে, রণবীর তাহাদের পাশে পাশে চলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, শিবিকা দ্রুত চলিয়া গেল।

তখন মধ্যাহ্ন, কিন্তু সূর্য্য কোথায় কোন্ গগনে লুকাইয়া আছেন কিছুই বুঝা যায় না। আকাশ মেঘে ঘোলা, রাস্তা জলে কাদা, রাত্রি হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহার বিরাম যে কখন হইবে বা কবে,—কেহ বলিতে পারে না। জর্ম্মাণরা এ যাত্রা পরাজিত; ট্রেঞ্চও দূরে নয়; তবুও পথ নিরাপদ নহে, যে কোন মুহূর্ত্তে একজন জর্ম্মাণ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বায়নেট বিদ্ধ করিতে পারে, দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতেও পারে। সে এখন অক্ষম,—ছুটিয়া পলাইতে পারিবে না বা যুদ্ধ করিতে পারিবে না। রণবীর কৌশলে বনপথে পড়িয়া কিছুক্ষণ একটা বৃক্ষতলে বসিল। আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেশের উজ্জ্বল সূর্য্যের মূর্ত্তি কল্পনা করিল। আব কি কখনো নিজের দেশের সেই মেঘশূন্য সূর্য্যচন্দ্রবিভাসিত নীলাম্বর সে দেখিবে? আর তাহার সেই সাধ্বী পত্নী— প্রাণাধিক পুত্র—কোথায় পড়িয়া রহিল তাহারা? একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্রেঞ্চে পৌছান চাই।

প্রায় তাহাদের ট্রেঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এইসময় এ কি দৃশ্য! একপদহীন টড সাহেব কোনরূপে আপনাকে বনমধ্যে টানিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন,—এখান হইতে কেমন করিয়া কি উপায়ে এখন ট্রেঞ্চে যাইবেন? তাঁহার দলের লোক কেহ ত তাঁহার সন্ধান জানে না। সহসা রণবীরকে দেখিয়া তিনি বিস্ময় আনন্দে অবাক হইয়া গেলেন। সত্যই যে সে তাঁহার ট্যালিসম্যান। রণবীরের ডান হস্তে বল নাই, তথাপি কি এক দৈবশক্তিতেই প্রণোদিত হইয়া সে যে এক হস্তের সাহায্যেই তাঁহাকে পিঠে চাপাইয়া লইয়া গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিষাক্ত গ্যাসে ফুসফুস এখনো পরিপূর্ণ —কষ্টে সে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছিল, দাবানলে গণ্ডদেশের কিয়দংশ বিদগ্ধ বিকৃত, বাহুমূল হইতে রক্তধারা প্রবাহিত, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা তাহার মনেও পড়িতেছে না, তাহার একমাত্র ভাবনা সে যদি টড সাহেবকে লইয়া হাসপাতালে পৌছিতে না পারে।

কিন্তু পৌছিল—সে পৌছিল। হাসপাতালের পাদদেশে আসিবামাত্র, সেবকের দল

যখন তাহার পৃষ্ঠ হইতে টড সাহেবকে নামাইয়া লইল তখনই সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল ; তাহার আগে নহে। টড সাহেব ভিতরে যাইবার পূর্ব্বে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতায় দুই হাতে তাহার হাত ধরিলেন। রণবীরের কর্ত্তব্য সমাধা হইয়াছে, তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া সংসারনির্লিপ্ত সেই হিন্দুবীর, ভগবদ্‌গীতার আদর্শ কর্ত্তব্যসাধক—আনন্দের হাসি হাসিয়া তখনি প্রাণত্যাগ করিল।

কর্ণেল টড সাহেব আরোগ্য লাভ করিয়া ভি সি সম্মানে ভূষিত হইলেন। সম্রাট যখন স্বহস্তে এই ক্রস্ অলঙ্কার তাঁহার বক্ষে পরাইয়া দিলেন, তখন সাহেবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু!

ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

১

পৌষ মাস ; পুরা শীতের দিন। বারুণী কিন্তু উত্তরের নির্জ্জন ছোট বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—"এবার কি শীত আসিবে না কি?" হিমালয়ের তুষার-শীতল বায়ু তাহার অঙ্গে যেন বসন্ত-হিল্লোল ছড়াইয়া দিতেছিল।

বারুণীর বয়স উনিশ বৎসর। এই বয়সে সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের তরুণীগণ একাধিক সন্তানের মাতা হইয়া পড়েন। বারুণী তাঁহাদের মত সংসারের জ্বালায় এখনও ঝালা-পালা হয় নাই ; সে অবিবাহিতা ; তাই ষোড়শীর মতই তাহার রূপলাবণ্য। পল্লবিনী লতার মতই তাহার প্রফুল্ল হাবভাব।

অবিবাহিতা হইলেও বারুণী বাগ্‌দত্তা। তাহার ভাবী পতি মিষ্টার দত্ত I. C. S. পাশ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। এখন যুদ্ধের সময়, সমুদ্রপথ যৎপরোনাস্তি বিপৎসঙ্কুল। জর্ম্মাণ ডুবো-জাহাজগুলি সমুদ্রগর্ভে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে এবং সুবিধা বুঝিলেই শত্রু-জাহাজের তলা ফুটা করিয়া দিয়া শত্রু নাশ করিতেছে। কিন্তু বিপদের ভয়ে কর্ম্মপ্রবাহ বন্ধ রাখা আর জীবনপ্রবাহ বন্ধ রাখা ইংরাজের মনে একই কথা। সুতরাং এই ঘোর সঙ্কটময় বাধাবিঘ্নের মধ্যেও যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বনে নিয়মিতভাবেই ইংরাজ সমুদ্রবক্ষে ষ্টীমার চালাইতেছেন। আমাদের নব সিভিলিয়ান দত্ত সাহেব এ সময় প্রেমের টানে প্রাণের মায়া অগ্রাহ্য করিয়া ভারতগামী 'ডুনেরা' জাহাজে চড়িয়া বসিয়াছেন।

জাহাজ মধ্যপথ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছে, কলিকাতায় জাহাজ-আফিস হইতে এ খবর পাওয়া গিয়াছে। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ষ্টীমার বোম্বাই জেটিতে আসিয়া পৌঁছিবে। তাহার পর রেলে কলিকাতার পথ দুই তিনদিন মাত্র। তাই বুঝি আনন্দের আতিশয্যে শীতবাতাসও আজ বসন্তের ন্যায়ই বারুণীর এত উপভোগ্য মনে হইতেছিল। নীলাকাশে শুভ্র মেঘের স্তরে কতরকম বিচিত্র চিত্রাঙ্কন ভাসিয়া চলিয়াছে। বারুণী সেই মেঘ-চিত্রের দিকে চাহিয়া একখানি জাহাজ-চিত্র কল্পনা করিয়া লইল। ঐ যে তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি! মুখখানি কি হাসি হাসি! হাসিয়া কি যেন তাহাকে বলিতেছেন। কি সে কথা, তাহা কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না ; হঠাৎ ছবিখানি মিলাইয়া গেল। কোথা হইতে সহসা রসুনচৌকি বাজিয়া উঠিল। এ যে অসময়ের বাঁশী! পৌষমাসে ত কোন পূজাপার্ব্বণ বা বিবাহোৎসব নাই। তাঁহারই প্রাণের কথা বাঁশীতে কহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন না কি? রসুনচৌকির ভৈরবীতে বারুণী সাহানা তান শুনিতে পাইল। তাহার মাসতুতো বোন সুষমা আসিয়া তাহার এই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া কহিল—"এই যে দিদিমণি, এখানে? আমি ভাবলুম, বুঝি বা সশরীরে নক্ষত্রলোকে যাবার পাখা-টাকা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ!"

বারুণী কহিল, "কেন রে? এরই মধ্যে নক্ষত্রলোকে যাওয়াতে চাস আমাকে? আমি ত় মোটেই তাতে রাজি নই।"

"তোমার মনটিকে ত ধরাতে ধরা-ছোঁয়া যায় না ; তাই ভাবলুম, বুঝি বা দেহটাকেও

উড়োকল বানিয়ে তুল্লে তুমি। বাতাসী বল্লে, সাত রাজ্যি খুঁজেও তোমার দেখা পেলে না।”

“তা খোঁজা-খুঁজিরই বা এত দরকার কি ছিল?”

“তাই ত? কটা বেজেছে, সে হুঁসটা পর্য্যন্ত নেই দেখছি।”

“কটা বেজেছে?”

সুষমা হাসিয়া উত্তরে কহিল, “এই সবে ভোর পাঁচটা। প্রভাতী নহবৎ শুনছ না?”

বারুণীও হাসিয়া তাহার খোলা চুলে একটা টান দিয়া বলিল, “আর ঠাট্টা করতে হবে না। সত্যি কটা বেজেছে?”

সুষমা “উঁহু উঁহু” করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ঘড়ীতেও ১০টা বাজিয়া উঠিল। সুষমা কহিল, “ঐ শোনো কটা বাজছে, তোমার জন্য কি সূর্য্যদেব আটকা প’ড়ে থাকবেন নাকি?”

“তাই ত! এরই মধ্যে ১০টা, এখনই বাবা খেতে আসবেন, চল চল—”

“তাঁর খাওয়া হয়ে গেছে, তিনি আফিস চ’লে গেছেন।”

বারুণী এতক্ষণে ঠিক বাস্তব রাজ্যে ফিরিয়া আসিল, মনটা খারাপও হইয়া পড়িল। সে রাগ করিয়া কহিল, “বাবা খেতে এলেন, আর তোরা আমাকে একটা খবরও দিলি নি, বেশ ত?”

সুষমা রাগিয়া বলিল, “হাঁ, দোষ আমাদেরই বই কি! বাতাসী ত তোমার হাল ছেড়েই দিয়েছিল ; আমি তবু আবার এলুম, তোমার অন্ধি-সন্ধি জানি কি না!”

এই সময় স্বয়ং বাতাসীর আবির্ভাব হইল। হাঁপ ছাড়িয়া, হাঁকডাকে বারান্দা সরগরম করিয়া সে কহিল, “বাপ রে বাপ, সারা রাজ্যি খুঁজে খুঁজে জানটা বেরিয়ে গেল, চল গো ঠাকরুণ, মা ঠাকরুণ ডাকতে নেগেছে।”

বারুণী বলিল, “আমি যাচ্ছি, তোরা এগো, স্নানটা ক’রে নিয়ে শীগ্‌গিরই আসছি।”

সুষমা বলিল, “তোমার ত শীগ্‌গির? নাবার ঘরে গিয়ে যেন আবার ভাবতে বসো না।”

অল্পক্ষণের জন্য নহবৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আবার বাজিয়া উঠিল। বাতাসী বলিল, “ওদের বাড়ী আজ নূতন জামাই আসছে গো।”

বারুণী হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “ও, তাই বুঝি। আমি ভাবছিলুম, অসময়ে কেন আজ বাজনা বাজছে?”

উত্তরে বাতাসী বলিল, “বাজবে গো বাজবে, এখানেও বাজনা বাজবে। এই বর এল ব’লে।”

বারুণী রাগ প্রকাশ করিয়া ধমক দিয়া কহিল—“চ’লে যা এখান থেকে, তোর আর রসিকতা করতে হবে না।”

সুষমা হাসিতে লাগিল ; দাসী বলিল, “তা যাচ্ছি গো, যাচ্ছি। বর আসুক না আগে, তখন কি আর তোমার কথা মানব। তানার সামনে রস-কথার তুবড়ি ছড়াব, চন্নু আমি।

একটুকু শীগ্‌গির আপুনি এস।"

তাহারা চলিয়া গেল। বারুণী রেলিংএ হাতের ভর দিয়া রসুনচৌকির সুরের দিকে মনোনিবেশ করিল। এবার বাঁশী ললিতে বাজিতেছিল। বারুণী গাহিল—

ললিত রাগে ঐ বাঁশরী বাজে!
থেকো না, বঁধু, হে শুধু আর
আমার গোপন মনের মাঝে।
এস মোর অন্তরতম
দাঁড়াও হে বাহির ভরি,
দেখাও হে সুতৃষিত আঁখিরে মরি,
রূপ তব, চিত্তরঞ্জন হে,
নেত্ররঞ্জন বর-সাজে।
ওহে মানসমোহন
কেবলি হে রাখিও না স্বপনে,
দরশনে পরশনে তব প্রেম সত্য বচনে
ভাঙ্গ হে ভাঙ্গ হে ওগো যতনে
আমার মিথ্যা সরম-লাজে।

গান করিতে করিতে বারুণী স্নান করিতে গেল।

২

স্নান-ধৌত শুভ্রবেশে এলায়িতকুন্তলা বারুণী জলদেবতার প্রতিমূর্ত্তিটির মতই যখন মাতৃসমীপে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মাতার সর্ব্বান্তঃকরণ আনন্দপুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহপ্রান্তে তখন বসিয়াছিলেন একজন সন্ন্যাসিনী। বারুণীকে দেখিয়া তাঁহারও কাঠিন্যরেখামণ্ডিত মুখমণ্ডল কোমল স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিল।

ত্রিবঙ্কলামার ন্যায় আলখাল্লাধারী বলিয়া এই সন্ন্যাসিনীকে বাহিরের লোক বলে ভুটিয়া-ভৈরবী, আর দলের লোকের নিকট ইঁহার ডাকনাম ক্ষেপা ভৈরবী।

বারুণীর মাতা অরুন্ধতী আনন্দকল্যাণবর্ষী মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, "বারু, দেখ দেখি কে এসেছেন?"

বারুণী গৃহপ্রবেশকালে আশে-পাশে নজর দেয় নাই, এখন সচকিত দৃষ্টিতে মুখ ফিরাইয়া ভৈরবীকে দেখিয়া কুণ্ঠিত ও অপ্রসন্ন হইয়া পড়িল। ইঁহার সহিত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামে অন্নপূর্ণামন্দিরে বারুণীদের দেখাশুনা। সেই হইতে ইঁহারা যে ভৈরবীর কিরূপ সুনজরে পড়িয়াছেন, কলিকাতায় আসিলেই ইনি একবার ইঁহাদের দেখিতে আসিবেনই আসিবেন। ভৈরবী অর্থপ্রত্যাশী নহেন, অতএব অরুন্ধতী ইহাতে তাঁহার নিঃস্বার্থ দর্শনানুরাগই দেখিতে পায়েন। কিন্তু বারুণী, তাঁহার এই নিঃস্বার্থ স্নেহের মর্ম্মগ্রহণে একেবারেই অক্ষম। কারণ, যেরূপ বাহ্যিক রঙচঙে ভাবে বালহৃদয় সহজে মুগ্ধ হয়, তাহার অভাব ইহাতে সম্পূর্ণ। ভৈরবীর চেহারাখানিও প্রিয়দর্শন নহে, আর সাজসজ্জাও বেশ একটু কিম্ভূতকিমাকার। লামাদের ন্যায় মুণ্ডিত মস্তকে সদ্য-গজান সজারুর কাঁটার

মত খোঁচা খোঁচা চুল আর রেখাবলী-ভরা ছাইপাঁশ-মাখা মুখের মধ্যে গাঁজা-ধূমপানজনিত জ্বলন্ত অঙ্গারসম রক্তবর্ণ দুই চক্ষু দেখিলেই বারুণীর প্রাণের ভিতর কেমন একটা ভয়-শিহরন উঠিত।

তখন অরুন্ধতী থালা সম্মুখে রাখিয়া একখানি আসনের উপর বসিয়া পান সাজিতেছিলেন। কিছুদূরে ঘরের কোণে আসনের উপর উপবিষ্ট ভৈরবী বাম হস্তে গাঁজা রাখিয়া ডান হস্তের আঙ্গুল দ্বারা তাহা মলিতে মলিতে বারুণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আয় কলকেমুখী বেটী, কাছে এসে বস।" কলিকা হইল তাঁহার প্রাণদাতা গঞ্জিকার আধারবস্তু, অতএব অন্য কোন্ সম্বোধনে আর তৎপ্রতি তাঁহার প্রাণের অনুরাগ এমন পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন!

কিন্তু ভৈরবীকে দেখিলেও যেমন বারুণী বিরক্ত হয়, তাঁহার কথা শুনিলেও তেমনই তাহার গায়ে জ্বালা ধরে। এমন কি, তাঁহার আদরবাক্যও গালিগালাজের মতই তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতে থাকে। বারুণী বসিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভৈরবী তাঁহার হাতের গাঁজা কলিকার মুখে রাখিয়া তাহা নামাইয়া রাখিয়া, বারুণীর জন্য আনীত টিপ-কৌটা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। আল্‌খাল্লার এই থলিটি তাঁহার সম্পত্তি-ভাণ্ডার ; যত কিছু প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভরপুর। তিনি চলিবার কালে ইহা জাহাজের পালের মতই ফুলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র দেহটির অগ্রে অগ্রে চলে, আর বসিলে উদরীরোগের আনুমানিক সিদ্ধান্তে ভক্ত-হৃদয় মমতা-পূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার আলখাল্লার এই চলন্ত মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু বাস্ রে! হাসিলে কি আর রক্ষা আছে! ক্রুদ্ধ অভিশাপবাক্যে তৎক্ষণাৎ তাহার লয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণ অশ্রাব্য গালিগালাজের বুলি যদিও তিনি ব্যবহার করেন না, কিন্তু তিনি বিড়বিড় করিয়া যাহা বলেন, অভিধান-অলব্ধ সেই দুর্ব্বোধ্য ভাষা তাহাকে অধিকতর ভীত করিয়া তোলে। ভৈরবী খুঁজিয়া প্যাতিয়া বুকের ভিতর হইতে অবশেষে কৌটাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "আয় রে তুফান-তুলুনীর বেটী আয়, টিপ পরিয়ে দিই।"

বারুণী নড়িল না। মা বলিলেন, "যা, ভৈরবী-মাকে প্রণাম কর গিয়ে।"

এই সময় বাতাসী জ্বলন্ত টীকা আনিয়া কলিকার উপরে রাখিল। যদিও ভৈরবীর আলখাল্লার মধ্যে চকমকি প্রভৃতি আগুন প্রস্তুতের সরঞ্জামাদি থাকিত, কিন্তু গৃহস্থ-বাটীতে আসিলে তিনি নিজে আগুন জ্বালাইতেন না। জ্বলন্ত গাঁজার কলিকাটি বাতাসী তাঁহার হাতে ধরিয়া দিবামাত্র ভৈরবী টিপের কৌটা নীচে রাখিয়া দুই হাতে কলিকাটি ধরিয়া সজোরে একবার টান দিয়া ধোঁয়াটা উড়াইয়া দিলেন।

কি বীভৎস-দৃশ্য! বারুণীর অসহ্য হইয়া উঠিল ; সে মৃদু স্বরে মাকে বলিল, "মা, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।"

ভৈরবী তাহা শুনিতে পাইলেন। গাঁজার ধূম তখন তাঁহার মাথায় বেশ চড়িয়া উঠিয়াছে ; ক্ষেপা মেজাজে বলিলেন, "চলে যাওয়া হচ্ছে! কোথা যাবি রে দেমাকী বেটী! আয় বলছি, নইলে ভাল হবে না।"

অরুন্ধতী ভীত হইয়া পড়িলেন। দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপের মতই কথাটা তাঁহার প্রাণে গিয়া বাজিল। করুণ অনুরোধে তিনি ভৈরবীকে বলিলেন, "ভৈরবী-মা,

ছেলেমানুষের উপর রাগ করবেন না। যা বারু, যা, প্রণাম কর ওঁকে।"

অতঃপর অরুন্ধতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বারুণীর হাত ধরিয়া তাহাকে ভৈরবীর নিকটে টানিয়া আনিয়া আবার বলিলেন, "প্রণাম কর।" বারুণী এবার বিনা বাক্যে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। ভৈরবী গাঁজার কলিকাতে জোরে আর একটি টান দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভাল হবে, ভাল হবে বৈ কি, দাও ত মা, দাও ত মা অরুন্ধতী, ধুমধুমানী বেটীকে একটা টিপ পরিয়ে, আমি এবার আক্‌ড়ায় যাই।" অরুন্ধতী মেঝের উপর হইতে কৌটাটি হাতে লইলেন, তাহার পর ঢাকনা খুলিয়া একটি টিপ কন্যাকে পরাইয়া দিলেন। ভৈরবী আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ ম'রে যাই, ঠিক যেন সাগরজলে তুফানদুলুনি!" বলিয়া তিনি তাঁহার আলখাল্লার মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র হুঁকা বাহির করিলেন। এইটি তাঁহার থলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসবাব। দরকারমত ইহার মস্তকে চড়ে তাঁহার গাঁজার কলিকা, —আর বিনা দরকারে ইহার দেহে চড়ান তারে তাঁহার আঙ্গুলের আঘাত পড়ে। ভৈরবী কলিকার ছাইটা মেঝের উপর ঢালিয়া দাসীর হাতে দিলেন। সে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া জল ঢালিয়া কলিকাটা ঠাণ্ডা করিয়া আনিয়া দিল। তখন তিনি কলিকাটি থলির মধ্যে পুরিয়া হুঁকার বীণাটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর প্রীং প্রীং করিয়া গান ধরিলেন—

"বম বম ববম্ ববম ভৈরবা ভৈরবী!
দুনিয়াভরা সাগর তুফান
তোরা—কে মর্‌বি আর কে রবি?
হ্রীং হ্রীং হ্রীং প্রীং প্রীং প্রীং,
কি করলি তুই ও ঠাকুর!
পুণ্যি নিয়ে মন্যি দিলি
ভক্তি ভক্ত সব ফতুর।
বম্ বম্ বম গাঁজায় দে দম্ ভৈরবা ভৈরবী।
ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি সাধন
ফাঁকিজুঁকি আর সবই?"

গাহিতে গাহিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন বৈকালবেলা খবর আসিল, মিষ্টার দত্ত যে জাহাজে আসিতেছিলেন, সে জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে।

৩

য়ুরোপব্যাপী মহাসমরের আরম্ভকাল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। নিম্নলিখিত কাহিনীটি তাহার বহু বৎসর পূর্ব্বে—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। অতএব এখন হইতে ধরিলে সে আজ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

তৃতীয় প্রহর রাত্রি, উর্দ্ধদেশে চন্দ্রহীন আকাশ—তারকারাজ্যের একখানি বিরাট-বিচিত্র চিত্রপটের ন্যায় প্রতিভাত। অগণ্য নক্ষত্রঘন মৃদু জ্যোতিঃ ছায়া-পথের উভয় পার্শ্বে কোথাও বা বড় বড় দুই চারিটি উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্র, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকারাজি

শ্রেণীতে শ্রেণীতে, গুচ্ছে গুচ্ছে, মাঝে মাঝে বা বিরল সংখ্যায় সঙ্গিহারা বিজনচারী বেশে দ্যুতি বিস্তার করিতেছিল। নিম্নে গঙ্গাসাগর এই আলোকচ্ছটা বক্ষে ধারণ করিয়া তরঙ্গলীলায়িতরূপে অবিরাম গর্জ্জনে মহাসাগরের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইয়াছিল।

এমন সময় দুইজন স্ত্রীপুরুষ তীরদেশে বালুকাপারে কাঁটা-বনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারা স্বামি-স্ত্রী। স্ত্রীর বক্ষে একটি নিদ্রিত শিশু সন্তান। সন্ধ্যাকালে পুরুষটি কলাগাছের একটি ভেলার উপর তালপাতার একটি ডোঙা আঁটিয়া এই ঝোপের নীচে রাখিয়া গিয়াছিল। এখানে আসিয়া কলার ভেলা টানিয়া লইয়া স্ত্রীর সহিত সে উপকূলে পৌঁছিল,—তরঙ্গস্পর্শ হইতে দুই এক হাত তফাতে ভেলাখানি নামাইয়া রাখিয়া স্ত্রীর বক্ষ হইতে শিশু সন্তানটিকে লইয়া ডোঙার মধ্যে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। শিশু জাগিল না, কান্দিল না, সামান্যমাত্রায় অহিফেন-সেবিত হইয়া সে বেশ অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

পত্নী মৃতবৎসা, তাহার সন্তান হইয়া রক্ষা পায় না। এই নিমিত্ত সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই সাগরের উদ্দেশে তাহারা শিশুকে মানত রাখিয়াছে। শিশু এখন এক বৎসরের। মাতা আবার অন্তঃসত্ত্বা, এবার মানত রক্ষা না করিলেই নয়। বিলম্ব হইলে দেবতার ক্রোধানলে বর্ত্তমান পুত্র ও ভাবী সন্তান উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল।

শিশুকে ভেলায় শোয়াইয়া, সমস্ত প্রাণ তাহার উপর ঢালিয়া দিয়া, মর্ম্মভেদী আকুল দৃষ্টিতে পিতামাতা উভয়েই মুহূর্ত্তকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নক্ষত্র-দেবতাগণ একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিয়া বালকের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। মাতা ক্ষিপ্তের ন্যায় কান্দিয়া শিশুকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইতে গেলেন। স্বামী বনমালী সবল হস্তে তাহাকে বাধা দিয়া মনের বেদনা ক্রোধের আগুনে জ্বালিয়া কহিলেন,—"সর্ব্বনাশী, ক্ষান্ত দে, চিরকাল সর্ব্বনাশ ক'রে এসে এখনও তোর আশ মিটল না? নতুন ক'রে আবার সর্ব্বনাশ করতে চাস?"

এ ভর্ৎসনা পত্নী ক্ষেমঙ্করীর মর্ম্মের শিরায় শিরায় বিঁধিল। স্বামী ত ঠিক কথাই বলিতেছেন, অভাগিনী-ই ত সর্ব্ব অনর্থের মূল। সে মৃতবৎসা না হইলে ত আজ এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় তাহাদিগকে পড়িতে হইত না। স্ত্রী উত্তোলিত হস্ত গুটাইয়া লইয়া চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল। স্বামীর নয়নও অশ্রুজলে অন্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে চোখের জল ঝাড়িয়া ফেলিয়া নরম স্বরে কহিলেন, "একে ঘরে নিয়ে গিয়ে কি রক্ষা করতে পারবি গো তুই? এ যে দেবতার মানত, দেবতার নিবেদিত ধন, কত রকম ছদ্মবেশে ঘরে ঢুকে সাগর-দেবতা তাঁর ধন তুলে নিয়ে যাবেন। একেও বাঁচাতে পারবিনে, আর যেটিকে গর্ভে ধ'রে আছিস, সেটিকেও হারাবি। তুই স'রে দাঁড়া।"

স্ত্রী দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামী দুই হাতে ভেলা ধরিয়া জলে ভাসাইল। কিন্তু মনের কঠোর কর্ত্তব্য কার্য্যতঃ সে ঠিক পালন করিতে পারিল না। সমস্ত প্রাণে ভেলা ঠেলিয়া দিতে সে অক্ষম হইল ; কম্পিত দুর্ব্বল-হস্ত-চালিত ভেলা বেশী দূর গেল না ; একটিমাত্র বিপরীতগামী তরঙ্গবলে তাহা পুনরায় পিতার হাতের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। মাতা ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ফিরে এল গো বাছা আমার। সাগর দয়া ক'রে ফিরে দিলেন আমার কোলের ধনকে, তুলে নাও গো, তুলে নাও। আমার

বুকে তুলে দাও, বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাক।"

ভক্তিসংস্কারান্ধ বনমালী কহিল, "কি ক'রে জানব যে, তিনি দয়া ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছেন? আমরা যে কাঁদতে কাঁদতে দান করেছি, যদি অশ্রুহীন চোখে কর্ণরাজার মত বিশ্বাসে ছেলে দান করতে পারি, আর সাগরদেব তখনও যদি ফিরিয়ে দেন, তবেই বুঝব তাঁর দয়া।"

হৃদয়ে ভক্তিবল সংগ্রহ করিয়া অশ্রুহীন নেত্রে সবল হস্তে এবার বনমালী ভেলা ঠেলিয়া দিল। ভেলা আর ফিরিল না,—তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া চলিল। একবার যেন শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—একবার যেন দুইটি ছোট হাত উর্দ্ধে উঠিয়া পিতামাতার ক্রোড় প্রার্থনা করিল। তাহার পর আর কিছুই দেখা বা শুনা গেল না। দূর হইতে দূরান্তরে চলিতে চলিতে ভেলাখানি অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

পিতা-মাতা মানত রক্ষা করিল বটে, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাস তাহাদের মনঃকষ্ট দূর করিতে পারিল না। পুত্রশোকে ক্ষেমঙ্করী পাগল হইয়া গেল। উন্মত্তাবস্থাতেই তাহার একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ইহার পর হইতে ক্রমশঃ তাহার বাতুলতা যদিও কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি সে পুরাপুরি ফিরিয়া পাইল না। একদিন যে ইহার অগ্রজকে তাহারা সাগরজলে বিসর্জ্জন দিয়াছে, এ কথা তাহার মনে নাই। নবজাত শিশুকে সে তাহার পূর্ব্বশিশু বলিয়াই জানে। পাগলিনী ভুলিল না কেবল পূর্ব্ব-মানতের কথা। একদিন ইহাকে সাগরজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে, এ কথা মনে করিয়া আতঙ্কে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতেই সে কন্যাকে স্তন্য দান করিত।

স্ত্রী পুত্রশোক ভুলিল পাগল হইয়া, স্বামী পুত্রশোক ভুলিতে চেষ্টা করিল গুরু ধরিয়া। গুরুর কৃপায় ধূমপানমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষেপামীতে তিনি স্ত্রীকেও ছাড়াইয়া উঠিলেন।

মেদিনীপুর জিলার রাঘবপুর গ্রামে বনমালীর নিবাস। গ্রামের মধ্যে সে ছিল একজন সম্পন্ন লোক। জমী জমা, গরু-বাছুর, ধানের মরাই, কৃষাণ, ভৃত্য এ সবই তাহার ছিল, ইহা ছাড়া সে মহাজনী কারবারও চালাইত। ইহার দৌলতে গ্রামভরা চালাঘরের মধ্যে তাহারই ছিল একখানি কোটাবাড়ী। তাহারা নিঃসন্তান, এই দুঃখ ছাড়া সাংসারিক কোনরকম দুঃখই তাহাদের ছিল না, কিন্তু রোগমুক্ত হইয়া ক্ষেমঙ্করী এক নূতনতর দুঃখের ভিতর পড়িল। সে দেখিল, স্বামী গাঁজার মোহে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন। দিবারাত্রি প্রায় তাঁহার ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর সহবাসে কাটে। তিনি এখন চেলা নহেন, স্বয়ং গুরু। বাটীর উঠানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে তিনি বোম ভোলানাথ গুরু সাজিয়া বসেন, আর বামাচারী, কামাচারী, তান্ত্রিক, শৈব, উদাসপন্থা, নাগা প্রভৃতি সর্ব্বদলভুক্ত চেলাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বীভৎস অনাচারে রত থাকে। ক্ষেমঙ্করী সেদিকে মোটেই ঘেঁসেন না, কখন কখন দূর হইতে উঁকি মারিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন উঠানের অগ্নিকুণ্ড হইতে ঝলক উঠিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া দিয়া যায়। তিনি ঘরে ঢুকিয়া কন্যাকে বুকে লইয়া সে জ্বালা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এরূপ ভাবে বেশীদিন চলিল না। চেলাদের রসদ যোগাইতে ক্রমশঃ বনমালী যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইলেন। জমী-জমা, ধান-চাল,

গরু-বাছুর, গহনাপত্র সমস্তই দেনার দায়ে বিকাইল, বাড়ীটিও ক্রমে নীলামে চড়িল। চেলার দল বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। বনমালী স্ত্রী-কন্যা লইয়া নদীতীরের শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামের লোক চাঁদা করিয়া সেইখানেই একখানি খড়ো-ঘর তাহাদের জন্য বাঁধিয়া দিল। আহার্য্যও তাহারাই যোগান দিতে লাগিল। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীর অন্নকষ্ট কখনও ঘটে না।

মেয়েটি এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মাতৃস্নেহে দুই বৎসরের হইয়া উঠিল। তখনও যে স্বামী মানতপালন জন্য তাহাকে গঙ্গাসাগর তীর্থে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন না, এই ভাবিয়া ক্ষেমঙ্করী মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য বোধ করিত। তাহার মনে হইত, নেশার ঘোরেই সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে ক্রমশঃ সে বেশ আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। এই দৈন্য-দারিদ্র্যের মধ্যে কন্যার মুখ দেখিয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্বামী ভুলিলেও নিষ্ঠুর নিয়তি যে সে কথা ভুলে নাই, ক্ষেমঙ্করী একদিন ভাল করিয়াই তাহা বুঝিল। সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় সে কন্যাকে হারাইল। স্নানান্তে একদিন নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল, কন্যা অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে, নেত্রতারকা উৰ্দ্ধে তুলিয়া সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছে। ক্ষেমঙ্করী কন্যাকে একবার নাড়াচাড়া করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কান্দিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণবায়ুটুকু বাহির হইয়া গেল।

সর্পাঘাতে কন্যার মৃত্যু হইয়াছে এই অনুমানে বনমালী মৃত কন্যাকে বক্ষে লইয়া জলে ভাসাইতে চলিল, আজ সঙ্গে আগত ক্ষেমঙ্করীর নয়নে জল নাই—মুখে হাহাকার নাই, মৃত কন্যাকে যে তাহারা জলে ভাসাইতে চলিয়াছে, এ জ্ঞান তাহার নাই। তাহার মনে হইল, তাহারা মানত রক্ষা করিতে চলিয়াছে। স্বামী কন্যাটিকে জলে ফেলিয়া দিবার সময় সে যখন চক্ষু বুজিল, মুহূর্ত্তের জন্য পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মানসপটে সহসা ভাসিয়া উঠিল ; কিন্তু আবার যখন সে চোখ খুলিল, সে স্মৃতি তখন মনের কোণে মিলাইয়া পড়িয়াছে। মানত রক্ষা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াই সে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সযত্নে পত্নীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া বনমালী তাহার হস্তে গাঁজার কলিকা তুলিয়া দিয়া কহিলেন, "সৰ্ব্বদুঃখ দূর হোক তোর ক্ষেমা, আমাকে গুরু ব'লে মেনে এই ধোঁয়া পান কর ত লক্ষ্মীটি।"

ক্ষেমঙ্করী স্বামীর চরণে নত হইয়া গাঁজার কলিকা লইয়া মুখে ঠেকাইল। অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া ইহার কিছুদিন পরে স্বামীও ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। সংসার-বন্ধনমুক্ত ক্ষেমঙ্করী ভৈরবীর দলে মিশিয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৪

ইহার ১২ বৎসর পরে কাকদ্বীপের জমীদার নিখিলচাঁদের পত্নী করুণাময়ী বৈদ্যনাথ-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অদূরে একটি নির্জ্জন গাছের তলায় এক ভৈরবী বসিয়া আছেন এবং সম্মুখস্থ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এই ভৈরবীর মাহাত্ম্য তিনি বৈদ্যনাথের অনেকের মুখেই শুনিয়াছেন। করুণাময়ী নিকটে আসিবামাত্র মন্ত্রপাঠ বন্ধ করিয়া ভৈরবী প্রাতঃসূর্য্যের দিকে একবার

চাহিলেন, তাহার পর মাটী হইতে শূন্য কলিকাটি হাতে লইয়া তন্মধ্যে গাঁজা ঠাসিতে লাগিলেন। করুণাময়ী নীরবে বসিয়া রহিলেন। কার্য্য শেষ হইলে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া করুণাময়ীকে ভৈরবী বলিলেন, "ভাল হোক্ বেটী, তোর ভাল হোক্। কি চাস তুই?" বলিয়া তিনি চিমটার দ্বারা অগ্নিকুণ্ডের আগুন উঠাইয়া গাঁজা ধরাইয়া তাহাতে টান দিলেন।

করুণাময়ী বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদই চাইতে এসেছি, ভৈরবী-মা। আমাকে দয়া করুন।"

ভৈরবী তখন মুখ হইতে ধূম ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কেই বা ভাল করে, কেই বা মন্দ করে! কি বা ভাল, কি-ই বা মন্দ রে বেটী?"

করুণাময়ী বলিলেন, "ও কথা শুনবো না আমি, ভাল করতেই হবে আমার, নইলে পায়ে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাকব।"

ভৈরবী গাহিলেন,—

"বম্ বম্ বম ববম্ ববম্ ববম ভৈরবা ভৈরবী,
দুনিয়া জোড়া সাগর-তুফান, তোরা কে
মরবি আর কে র'বি।"

তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুই কি বেটী সন্তানহারা?"

করুণাময়ীর ভক্তি আরও বাড়িয়া উঠিল ; অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "তুমি ত বুঝতেই পারছ সব। আমি অধিক কি আর বলব। আমি, মা, বড় দুঃখী, অনেকগুলি সন্তানকে অকালে যমের হাতে তুলে দিয়েছি। সম্প্রতি কোলের ছেলেটিকেও তাঁকে দিয়ে এসেছি। আশীর্ব্বাদ কর, ভৈরবী-মা, যে ক'টি এখনও বাকী আছে, তাদের যেন না হারাই। গ্রহশান্তির জন্য যা তুমি চা'বে, তাই দেব আমি।" করুণাময়ী এই কামনায় সাধু-সন্ন্যাসী, দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অনেকেরই উদরপূর্ত্তি করিয়া আসিতেছেন।

ভৈরবী একটু হাসিয়া কলিকাটা মুখ হইতে হাতে লইয়া বলিলেন, "টাকা-কড়ির ভাবনা অনেক কাল এড়িয়েছি, বেটী! শান্তি-অশান্তিও আমার হাত ধরা নয় রে ; ভজন-পূজন, সিদ্ধি-সাধন সব মিছে রে বেটী, সব মিছে। তার পিছে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছিস?"

করুণাময়ী দেখিলেন, টাকার কথা বলিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। মিনতির স্বরে কহিলেন, "ভৈরবী-মা, অজ্ঞানের দোষ নিও না। আমার ছেলেগুলি যেন রক্ষা পায়, এই দয়াটুকু তোমায় করতেই হবে।"

ভৈরবী বলিলেন, "তোর এখন ক'টি ছেলে, বেটী?"

করুণাময়ী বলিলেন, "সাতটি ছেলের মধ্যে এখন মোটে দাঁড়িয়েছে তিনটি, ভৈরবী-মা।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে ১৩ বৎসরের একটি বালক আসিয়া মাতার পিঠের দিকে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। করুণাময়ী ভৈরবীকে বলিলেন, "এইটি আমার বড় ছেলে।"

ভৈরবী প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মাতা পুত্রকে

বলিলেন, "যা সাগর, ভৈরবীকে প্রণাম কর।"

বালক প্রণাম করিবার পর ভৈরবী ভূপতিত এক খণ্ড অঙ্গার হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা বালকের কপালে তিলক-রেখা টানিয়া দিয়া কহিলেন, "যা বেটা, তোর আর কোন মার নেই।"

করুণাময়ী আনন্দিত চিত্তে ভৈরবীকে পুনঃ প্রণাম করিয়া পুত্রকে কহিলেন, "যা বাবা, তুই তোর ভাই দু'টিকে এখানে নিয়ে আয় দেখি।"

বালক চলিয়া গেল। ভৈরবী বলিলেন, "তোর এমন সব ছেলে রয়েছে বেটী, তুই তবু কাঁদিস?"

করুণাময়ী কহিলেন, "আগে ত বলেছি, মা, সাতটির মধ্যে এখন তিনটিতে ঠেকেছে, তাইতে ভয় পাই।"

ভৈরবী বলিলেন, "তবু ত তিনটিও তোর সঙ্গে আছে, বেটী, আমার যে একটিও নেই।"

এই দুঃখের স্বর করুণাময়ীর মর্ম্ম স্পর্শ করিল। ভৈরবী আবার বলিলেন, "তোর সন্তানগুলি যে যম গ্রহণ করেছে, আর আমি যে আমার নিজের ছেলেকে নিজের হাতে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।"

করুণাময়ী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বকার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার প্রথম গর্ভের শিশু হারাইয়া তিনি তখন বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামী নিখিলচাঁদ স্ত্রীকে সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের ষ্টীমলঞ্চে জলভ্রমণে জমীদারী কাকদ্বীপ পরিদর্শনে আসিলে সেই সময়ে বালকটিকে তিনি একদিন তীরদেশে লাভ করেন। শিশুহারা করুণাময়ী এই শিশুটিকে পাইয়া দেবাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ইহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি অনেকগুলি সন্তানের মাতা হইয়াও ইহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রতুল্যই স্নেহচক্ষুতে দেখেন। সাগরলব্ধ বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে সাগরদত্ত।

ভৈরবীর কথায় করুণাময়ীর সহসা মনে হইল, তবে কি আমার সাগরদত্ত এই ভৈরবীরই সন্তান না কি! তিনি একটু দম লইয়া থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "যে ছেলেটিকে আপনি দেখলেন, ভৈরবী-মা, সেটিকে আমি গর্ভে ধরিনি, সাগরতীরেই আমরা ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।"

ভৈরবী চোখ বুজিলেন, কিছু পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু সেটি যে আমার কন্যাসন্তান।" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

৫

প্রায় দশ মাস কাল 'ডুনেরা' জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে সাগরদত্ত ও বারুণী উভয়েরই পিতামাতার চোখের জল যদিও অনেকটা শুকাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু মনের আগুন এবং প্রাণের আশা এখনও নিঃশেষে নিবিয়া যায় নাই। মৃতের তালিকায় তাহার নাম না মেলায় হতাশ্বাসভরা প্রাণও মাঝে মাঝে আশাদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জীবিতের লিষ্টেও ত তাহার নাম নাই। সে বাঁচিয়া থাকিলে কি কোন না কোনরকমে সে খবরটা মিলিত না, এই ভাবিয়া সেই আশালোকও আবার নিরাশাক্ষীণ হইয়া

পড়িতেছে। এইরূপ আশানিরাশার স্বপ্ন-প্ররোচনায় কখনও বিশ্বাসে, কখনও সন্দেহে, কখনও ধীরচিত্তে, কখনও অধীরপ্রাণে তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছেন।

নিখিলচাঁদের কেবলই মনে পড়ে সেই পুরাতন দিনের কথা,—যেদিন তিনি সাগরকে তীর হইতে কুড়াইয়া আনিয়া স্ত্রীর তাপিত বক্ষ জুড়াইয়া দিয়াছিলেন। কি সুন্দর দেখিতে ছিল শিশুটি! তাহার মাথাভরা কালো চুল, জলে ভিজিয়া যত্নকুঞ্চিত অলকদামের ন্যায়ই গুচ্ছে গুচ্ছে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রাতঃসূর্য্য বালকের রূপমুগ্ধ হইয়াই যেন সস্নেহে তাঁহার যত কিছু সোনার রং তাহার অঙ্গে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। শিশু তীরদেশ আলো করিয়া ঘুমাইতেছিল। আহা! কাহার শিশু এ! কেমন করিয়া এখানে আসিয়া পড়িল? বুঝি বা কোন নৌকাডুবি হওয়াতে বালক জলে পড়িয়াছিল ; বরুণদেব তাহাকে রক্ষা করিয়া তীরে রাখিয়া গিয়াছেন! শিশুকে কোলে তুলিয়া তাঁহার সেদিন এইরূপ কথাই মনে হইয়াছিল। আজ মনে হইল, সাগরদেব শিশুকালে যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, যৌবনেও কি তাহাকে রক্ষা করিবেন না? তাহা যদি না করেন, তবে যে তাঁহার দয়া অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

সাগরদত্তের কথা মনে করিতে করুণাময়ীর বেশী করিয়া মনে পড়িত ভৈরবীকে। তিনি প্রাণ ভরিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে? বালকের কপালে তিলকরেখা টানিয়া দিয়া তিনি যে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন, দেবীতুল্য ভৈরবীর সেই 'মা ভৈঃ' বাক্য কি নিষ্ফল হইবে? কখনই না—কখনই না। তাহা হইলে সাধন, সিদ্ধি, দৈবশক্তি সবই মিথ্যা।

সাগরকে হারাইয়া বারুণীর মাতারও তাহার শৈশবকালের কথাই অধিক করিয়া মনে পড়িত। তখনও অরুন্ধতীর কোন সন্তানাদি জন্মে নাই। তিনি এই সুন্দর বালকটিকে দেখিবামাত্র করুণাময়ীর সহিত "বেয়ান" পাতাইয়া লইলেন। বলিলেন, "এই ছেলেকেই জামাই করব আমি।"

করুণাময়ী বলিলেন, "ছেলের যদি তোর মেয়েকে পছন্দ না হয়?"

কথাটা অরুন্ধতীর হাস্যকর লাগিল, বলিলেন, "তা হবে না বৈ কি! দেখে নিস তখন। তোর ছেলের নাম সাগর, আমার মেয়ের নাম রাখব আমি বারুণী, জানিস ভাই!"

"কেন, সাগরিকা নাম ত আরও ভাল।"

অরুন্ধতী বলিলেন, "আরে তোর ছেলের যেন সাগরে জন্ম হয়েছে, আমার মেয়ে ত আর সাগরে জন্মাবে না। তুই যদি ছেলের নাম বরুণ রাখতিস, তা হলে বরঞ্চ আরও ভাল হত, একটু নতুন রকম শোনাত। সাগর নামটা কিন্তু বড় পচা।"

এইরূপ রহস্যালাপের মধ্যে অরুন্ধতীর পরে পরে কন্যা-সন্তানের পরিবর্ত্তে দুইটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। করুণাময়ী বলিলেন, "তুই আমাকে দেখছি ফাঁকি দিলি, এখনও ত তোর মেয়ে হ'ল না?"

কিন্তু সাত বৎসর পরে তাঁহাদের আশা ও ইচ্ছা সফল করিয়া বারুণী জন্মগ্রহণ করিল।

তাঁহাদের এতদিনকার আশা-অভিলাষ কি সত্য-সত্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে? এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারও মনে পড়িয়া যায় ভৈরবীকে। হায় রে, তাঁহার

অভিশাপবাক্য ত ফলিয়াছে, তাঁহার আশীর্ব্বচন কি ফলিবে না?

সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত ছিল বারুণী। তাহার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। তাহার বিশ্বস্ত হৃদয় বলিত, ফিরিবেনই তিনি—নিশ্চয় ফিরিবেন। সূর্য্যের আলোকে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, নক্ষত্রের জ্যোতিতে, মেঘের বর্ণে সে তাঁহার প্রফুল্ল স্বাগত মুখই দেখিত। বাতাস কহিত, তিনি আছেন গো, তিনি আসিতেছেন। তরুলতা, ফুল বা মঞ্জরী সকলেই কহিত, তিনি আছেন, তিনি আসিতেছেন। অটল বিশ্বাসে, দৈববলে বারুণী আশ্বস্ত ছিল।

বারুণীর পিতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের পার্শ্বে গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাটী ছিল, কিছুদিন হইতে বারুণীরা সেইখানে আসিয়া আছে। আজ বিজয়া-দশমী। স্বামী কলিকাতায় গিয়াছেন, অরুন্ধতী বিকালে করুণাময়ী ও নিখিলচাঁদের সহিত গঙ্গার সম্মুখস্থ বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহাকে বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। ইঁহারা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন সাগরেরই সম্বন্ধে। অরুন্ধতী কহিলেন, "আর কিছু কি খবর এসেছে?"

নিখিলচাঁদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন, "খবর ত আর কিছুই পাচ্ছিনে।"

করুণাময়ী বলিয়া উঠিলেন, "আমার কি মনে হয় জান? তুমি একদিন যেমন না চাইতে তাকে আমার কোলে এনে তুলে দিয়েছিলে, তেমনই একদিন সে হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। কে জানে, সর্ব্বদাই আমার এই কথাই মনে হয়।"

পাশের বোটানিক্যাল গার্ডেনের জেটীতে ফেরি ষ্টীমার একখানা লাগিল। দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক ষ্টীমার হইতে নামিয়া পড়িল, অনেকেই তাহাদের মধ্যে হ্যাটকোটধারী। করুণাময়ী তাড়াতাড়ি রেলিংএর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, ঠিক যেন আমার সাগরের মতই শরীরের গঠন না ঐ ছেলেটির? বিলাত যাবার দিন ঠিক ঐ রকম দেখাচ্ছিল আমার সাগরকে। মুখটা যদি একবার তোলে, তা হ'লে ভাল ক'রে দেখতে পাই।"

এই কথায় সকলেই রেলিংএর নিকটে আসিলেন, কিন্তু ততক্ষণ যাত্রীরা জেটী হইতে বাগানে নামিয়া পড়িয়াছে। নিখিলচাঁদ বলিলেন, "হ্যাটকোট দেখলেই যাকে তাকে তোমার মনে হয়, ঐ বুঝি তোমার সাগর। এ ষ্টীমারে সে আসতে যাবে কেন?"

করুণাময়ীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, সত্যই ত এ বৃথা আশা। ষ্টীমার যখন রাজগঞ্জ অভিমুখে চলিয়া গেল, তখন আবার তাঁহারা চৌকিতে আসিয়া বসিলেন। করুণাময়ী আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে, ও সাগর।"

অরুন্ধতী কহিলেন, "তা হ'তেও পারে। হয় ত কলকাতায় এসে খবর পেয়েছে যে, আমরা এখানে আছি।"

নিখিলচাঁদ বাস্তব জগতের লোক। তিনি পুরা অবিশ্বাসের স্বরে বলিলেন, "তা হ'তে পারে না। তা যদি হ'ত, এতক্ষণ এখানে এসে পড়ত।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে সত্যই সাগর তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে মুহূর্ত্তকাল বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। করুণাময়ী আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন, "সত্যই কি তুই বাবা, সাগর? দেবতা দয়া ক'রে তোকে ফিরে পাঠালেন?"

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগরের গলা ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক আনন্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কখন যে বারুণী আসিয়া বারান্দার ধারে দাঁড়াইয়াছে, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সাগর তাহা দেখিল এবং উভয়ের মনের তরঙ্গ অন্যের অলক্ষ্যে উভয়ের চোখের মধ্য দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

সহসা আর একজন নবাগতের আগমনে এ নিস্তব্ধ ভাব সহসা তিরোহিত হইল। এ কি! এ যে ভৈরবী! ভৈরবী আজ সে আলখাল্লা ধারণ করিয়া আইসেন নাই। তিনি এখন গৈরিকধারী, তাঁহার কেশগুলিও ঈষদ্দীর্ঘ হইয়া মুখখানিকে অভিনব শ্রীযুক্ত করিয়াছে। করুণাময়ী পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "প্রণাম কর এঁকে, সাগর, ইনিই তোমার গর্ভধারিণী।" ভৈরবী পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছেন, তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, "তুমি মা গর্ভধারিণী না হইয়াও প্রকৃত মাতা, তুমি ইহার ধাত্রী—পালয়িত্রী। নিজের স্তন্যদানে তুমি ইহাকে জীবন দান দিয়াছ। আমি কুন্তীর মত নিষ্ঠুরা মা, ইহাকে পুত্র বলিয়া ডাকিবার অধিকার আমার নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন, "এ শুভদিনে ও কথা মুখে আনবেন না, ভৈববী-মা!"

অরুন্ধতী ইতোমধ্যে বারুণীকে দেখিয়া তাহাকে টানিয়া সাগরের পাশে দাঁড় করাইয়া কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ কর, মা, তোমার পুত্রকন্যাকে।"

ভৈরবী সানন্দ কণ্ঠে কহিলেন, "স্বস্তি, স্বস্তি, কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক তোদেব।"

নীচে গঙ্গার তীরে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। তাহার মধ্য হইতে মধুর বাঁশরীতান ধ্বনিত হইয়া উপরের কয়েকটি লোকের প্রাণে বিজয়ার দিনে আগমনীর মিলন-সঙ্গীতধারা ঢালিয়া দিল।

স্বপ্ন না কি?

১

পূজার ছুটীতে শিমুলতলায় বেড়াইতে আসিয়াছি। ভগিনীপতি জীবনচন্দ্র সরকার এখানকার টেলিগ্রাফ আফিসের হেড বাবু। আজ তাঁহার ডিউটী রাতের বেলা, দিনের বেলা কোন কাজ-কর্ম্ম নাই। তাঁহার আশা ছিল, দিনটা আরামে ঘরে বসিয়া মাসিক কাগজগুলার পাতা উল্টাইবেন। কিন্তু আমাদের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহাকে সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইল। আমরাও কিছুদিন হইতে এই দিনটির মুখের দিকেই তাকাইয়া আছি। নিকটের পাহাড় হলদি-ঝোরায় গিয়া সেদিন বন-ভোজন করিব, ইহাই ছিল আমাদের সঙ্কল্প। অতএব তিনি রেহাই পাইলেন না। প্রত্যূষে আমরা রুটী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বেশ এক পত্তন ভোজন করিয়া লইলাম। তাহার পর দিদি বাঁশ-বাঁধা একটা ইজিচেয়ারের ডুলিতে বাহক-স্কন্ধে উঠিলেন, আমরা তাঁহার প্রহরী-স্বরূপ পদব্রজে চলিলাম। পাহাড়টি যদিও বেশী উঁচু নয়, কিন্তু চড়াই-পথে উঠিতে নিতান্ত কম পরিশ্রম হয় না। ডুলীওয়ালারা স্থানে স্থানে বসিয়া, কোমরে বাঁধা থলি হইতে তামাকের পাতা বাহির করিয়া হস্ততালুকায় চূণের সহিত মলিয়া খৈনী প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা সেবনে প্রবৃত্ত হইল। আমরাও ইহাতে বিশ্রামের অবসর পাইয়া অসন্তুষ্ট হইলাম না। এইরূপ ঢিলা চালে চলিতে চলিতে আমরা যখন হল্‌দিঝোরার নিকটে সমতল ভূমিতে পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় ৯টা। এখানে আসিয়াই দিদি রন্ধনে মনোনিবেশ করিলেন। ভগিনীপতি নিকটে বসিয়া তল্পী-তল্পা খুলিয়া তাঁহাকে যোগাড় দিতে লাগিলেন। আমি পাশে বেকারভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, "ভাগ্যিস মেয়েজাতটা এখনও নিছক মেয়েমানুষই আছে, তাই তবু এখনও একটু-আধটু সেবা-শুশ্রূষা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আজকাল মেয়েদের যে রকম পুরুষ গ'ড়ে তোলার প্রস্তাব হচ্ছে, তাহাতে ভবিষ্যৎটা একেবারেই তিমিরাচ্ছন্ন, পুরুষবংশটা তা হ'লে একেবারেই নির্ব্বংশ হবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। কিন্তু তা হ'লেই বা এমন কি ক্ষতি! এই ত জামাইবাবু দিদির পাশে ব'সে রান্নার ধোঁয়াটা চুরুটের ধোঁয়ার চেয়েও আরামে উপভোগ করছেন। তখন না হয় নিজের মুখের চুরুটটা ফেলে দিয়ে উনুনেই দিয়াশলাই ধরান যাবে।"

অতঃপর মনের ভাবটা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া দিদিকে বলিলাম, "চল না ভাই, দিদি, একবার একটু ঘুরে আশা যাক।"

দিদি বলিলেন, "তা হ'লে রাঁধবে কে, মশায়?"

আমি বলিলাম, "জামাইবাবু রয়েছেন কি করতে? উনি ব'সে খিচুড়ীর হাঁড়িতে কাঠি দিন। তুমি এস, ভাই, বেড়াতে।"

ভগিনীপতি একটা কাষ্ঠদণ্ড আমার দিকে উঠাইয়া বলিলেন, "বটে, খাওয়াচ্ছি তোমাকে ভাল ক'রে। একবার এদিকে এস ত।" আমি হাসিয়া পলাইলাম।

তাঁহারা রান্না-বান্না লইয়া রহিলেন, আমি ঘুরিয়া অল্প একটু উপরে উঠিয়া ঝরণার পাশের একখানা পাথরের উপর বসিলাম। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে বনানীর কি শোভা! দুই

দিকে লম্বা লম্বা তরুশ্রেণী কোথাও অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া-মিশিয়া, কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে বন-প্রহরীর ন্যায় নীল আকাশের অঙ্গে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মধ্যভাগে শিখরপ্রদেশ হইতে ঝরণার জলরাশি যেন মহাদেবের জটাজুটপ্রবাহিত গঙ্গাধারার ন্যায় কোথাও বা উৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসে, কোথাও বা ক্ষীণধারায় নীচের পাষাণদেহে পড়িয়া নিরুদ্দেশ প্রবাহে দূরদূরান্তরে যাত্রা করিতেছিল। এই বনস্থলের কোন অদৃশ্য স্থানে বসিয়া গৌরী তপস্যারত, কে জানে! কি রুদ্রগম্ভীর দৃশ্য! দেখিয়া মনে হইল, এমন মর্ম্মস্পর্শী শোভা বুঝি আর কখনও দেখি নাই। গত বৎসর দার্জ্জিলিংয়ে বার্চ্চহিলের রূপেও যে এইরূপ মোহিত হইয়াছিলাম, সে কথা এখন একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। হায় রে বিভ্রান্তচিত্ত মানব! কতক্ষণ আমি এইরূপ মুগ্ধচিত্তে বসিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। আহারের ডাকে হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। তখন দেখিলাম, বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, অবিলম্বে রন্ধনস্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম। দিদি আমার পাতে খিচুড়ী ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "দেখার সাধ মিটেছে ত? এবার ক্ষিদে মিটিয়ে ভাল ক'রে খা দেখি।"

এই সময় কাঠের বোঝা বহিয়া কতকগুলি বুনো মেয়ে কিছু দূরে একটা গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। জামাইবাবু বলিলেন, "দেখার সাধ না মিটে থাকে ত ঐ বনদেবীদের একবার ভাল ক'রে দেখে নাও। দেশে গিয়ে এমন রূপ আর দেখতে পাবে না।"

আমি বলিলাম, "কেন, ওরা কি দেখতে মন্দ না কি? কেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ! আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে একজনেরও যদি ও রকম চেহারা দেখতে পেতুম ত রাজার হালে বাজারে ব'সে স্বরাজ ঘোষণা করতুম। আহা, ক্যামেরাটা সঙ্গে না এনে বড় ভুল করেছি।"

জামাইবাবু খিচুড়ীর গ্রাস মুখে তুলিয়া বলিলেন, "বাস রে, শুনছ ত তোমার ভাইটির কথা। দেখো ভায়া, বনের মাঝে যেন মনটি হারিয়ে রেখে যেও না—তা হ'লেই সর্ব্বনাশ, এ আমি ব'লে খালাস।"

এইরূপ হাসাহাসি গল্পে আহারটি জমিল ভাল, কিন্তু খাওয়া শেষ করিয়াই ভগিনীপতি গৃহে ফিরিবার ধুয়া ধরিলেন। তখন মাত্র বেলা ২টা। পাহাড়ের দিগ্বিদিক্ সূর্য্যোজ্জ্বল, বনের ছায়াগুলাতেও সোনার রং ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ই ত এই। আমি জিদ ধরিলাম, "তা হবে না। আর একটু ঘুরে ফিরে সেই ৪টার সময় বাড়ী ফেরা যাবে।"

জামাইবাবু কিন্তু নিজের মতলবে অটল থাকিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি তা হ'লে আর একটু থেকে যাও। মগরাকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম না করলে ত আমার চলবে না। আর পথে নারী-বিবর্জ্জিতা ক'রেও যেতে পারব না। দেখিস রে মগরা, বাবুকে ভাল ক'রে পাহাড় দেখিয়ে দিস। তবে ফিরতে যেন রাত না হয়। তোদের এ ভুতুড়ে দেশ থেকে সন্ধ্যার আগেই নিশ্চয় বাড়ী ফেরা চাই।"

মগরা বলিল, "যে আজ্ঞে।" বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর বাড়ী কাজ করিয়া সে বেশ একরকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা চলনসই বাঙ্গালা বলিতে পারিত।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি একটু এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া খানিকটা উপরে উঠিয়া ঝরণার ধারে বসিয়া খোসমেজাজে গান ধরিলাম—

"ওগো মানসপুরপ্রবাসী,
আঁখি তব দরশন-পিযাসী—
আশায় স্বপনে মিলায়ে,
থেকো না গো দূরে, ভুলায়ে—
এস এ বক্ষ আলয়ে দুঃখ-কুয়াসা নাশি।"

গানের শেষ কথাটায় ই—ই করিয়া বেশ একটু টান দিয়াছিলাম। পিছনে হাসির রোল উঠিল ; ফিরিয়া দেখি, হাসির আবেগে মগরার মোটা-সোটা শরীর কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গীতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিতেছে। আমিও হাসিলাম। না হাসিয়াই বা কি করিব? অসভ্য বুনো মগরা যে আমার গানের সমজদার হইবে, এরূপ মনে করাই ত বোকামী! স্বয়ং তানসেনও ইহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন না। তাই অক্ষুব্ধ চিত্তে বলিলাম, "ব্যাপারখানা কি? এত হাসি কেন তোর?"

মগরা। বাবুজীর গান শুনে বড় খুসী আসিল।

আমি। বটে, তা বেশ। আচ্ছা, তবে এবার তুই একটা গান শুনিয়ে আমার মেজাজটা খুসী কর দেখি।

মগরা। শুনবে, বাবুজী? তোমাদের রসিকবাবু আমার জন্য একটা গান বেঁধে দিয়েছে।

আমি। রসিকবাবু লোকটা কে?

মগরা। জান বা বাবুজী?

সে খানিকটা হাসিল, তাহার পর বলিল, "রসিকবাবু, তিনি রসের কথা কন।"

আমি। আচ্ছা, কি গান বেঁধেছেন তিনি, আমাকে শুনিয়ে দে দেখি।

সে গাহিল—

"তোম্ তোম্ তানা নানা তা ধিন ধিন্ তা ধিয়া।
আও রে মোর পিয়ারী জান্
আও রে পিয়ারীয়া।
তোরে গলায় দিব মটরদানা
কানে ঢেঁড়সিয়া।
তোরে খাইতে দিব মৌয়াপানা
করব তোরে বিয়া।।
বাজবে মাদল ধুম্ ধুম্ গুম্ গুম্
ক্যা বাৎ কেক্কা হিয়া।
আও রে মোর পিয়ারীজান্
নাচ রে পিয়ারীয়া।"

গান শুনিয়া আমারও অবস্থা তাহারই মত হইয়া পড়িল। হাসিতে যেন পাঁজরা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মগরার কিন্তু সে হাসির ছোঁয়াচ লাগিল না। সে গম্ভীরভাবে মৃদুহাস্যে বলিল, "বাবুজীর বড্ড হাসি লেগেছে।"

আমি বহু কষ্টে হাসি সামলাইয়া বলিলাম, "তোর পিয়ারীজান্ গান শুনে খুসী হয়েছিল ত?"

সে বলিল, "তা আর হবে না? ভারি নাচন নেচেছিল তানা।"

এই সময় নীচের রাস্তায় মেয়েলী গানের চীৎকার উঠিল। মগরা ত্রস্তে বলিল, "ঐ গো, সব ঘরে চলেছে, সাঁজ আসছে। চল, বাবুজী, আর বিলম্ না।"

আমি চারিদিক্ চাহিয়া সাঁজের লক্ষণ কিছুই দেখিলাম না। চারিদিক তখনও বেশ উজ্জ্বল। কেবল আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা ম্লানাভ বৃহৎ নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখা গেল। ইহা সিরিয়াস বা বৃহস্পতি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা করি নাই বলিয়া আজ হঠাৎ মনে একটা আপশোষ জাগিয়া উঠিল। যাহা হউক, আমি মগরার কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়া চলিলাম। সে উপর হইতে নীচে তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি আমাকে দেখাইয়া দিল। সেই দিকেই তখন কাষ্ঠবাহী নরনারী দ্রুত চলিতেছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ পাহাড়ের এক জায়গায় অদ্ভুত ত্রিকোণ চূড়া দেখিতে পাইলাম। মগরা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল ; ভীত কটাক্ষে বলিল, "ওঃ, এ কোন পথে এসে পড়েছি! যে গান গাওয়ালে, বাবুজী, রাস্তা ভুল হ'য়ে গেল।"

আমি। কেন, এখানে কি?

মগরা। কথা ক'য়ো না মশাই, তফাতে চ'লে এস।

সে এমন হেঁচকা টানে আমাকে কতকটা দূরে আনিয়া ফেলিল যে, তাহার হস্তের ভর না পাইলে নিশ্চয়ই আমি পড়িয়া যাইতাম। সে সেই ত্রিকোণ প্রস্তরচূড়া ছাড়াইয়া পাশের বনের মধ্যে আসিয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিবামাত্র আমি একটা গুঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর কিছুক্ষণ দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত ভয় পেলি কেন?"

মগরা। ওটা ভূতের পাহাড়, মশাই।

আমি। দিনের বেলা ভূতের ভয় কি?

মগরা। সাঁজ ত এল।

আমি। ঠিক যেন একটা কাটা গম্বুজের মত দেখতে। উপরে কি পথ আছে?

মগরা। নীচের দিক্ থেকেও একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে।

আমি। চল্ না, একবার দেখে আসি।

সে সভয়ে বলিল, "ও যে ভূতের রাজ্যি। পুরান দুষ্টু রাজার আমলে ওটা ছিল জেলখানা। উপর থেকে মানুষকে নীচে ফেলে দিত। আর এখন পাহাড়-পারের কবলা জাতরা এসে ঐখানে মানুষ বলি দিয়ে দেও-পূজা করে।"

হঠাৎ যেন একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুনিলাম, কল্পনা না কি? "শুনছিস্ মগরা?"

মগরা। চল মশাই, ওঠ ; পা চালিয়ে চল।

আমি উঠিলাম। আবার সেই অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি! আমাকে তাহা নির্ভীক, সবল, সতেজ করিয়া তুলিল।

মগরা কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "ও ভূতের ডাক মশাই—মানুষের কান্না নয়।"

আমি বলিলাম, "মানুষের স্বর এটা নিশ্চয়ই, ভয় কচ্ছিস্ কেন? চল্ আমার সঙ্গে।" আমি তাহার হাত ধরিলাম! এক টানে হাত ছাড়াইয়া চলিতে চলিতে সে বলিল, "ভূতের সঙ্গে লড়াই করব কি, মশাই, চ'লে এস, আপনি।"

আমি তাড়াতাড়ি তাহার কোমরের কাপড় ধরিলাম, বাধা পাইয়া মুহূর্ত্তকাল সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আমি তাহার কোমরের ছোরাখানা টানিয়া লইলাম।

আবার সে দ্রুত চলিতে চলিতে বলিল, "থাম, মশাই, একটু সবুর কর। রাস্তা ছেড়ো না, আমি ওঝা নিয়ে আস্‌ছি।"

বলিতে বলিতে সে অন্তর্দ্ধান করিল।

২

পাহাড়ের কোন্ দিক্ হইতে অস্ফুট মনুষ্যনাদ উঠিয়া কোন্ দিকে যে মিলাইয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম না। মগরা থাকিলে তাহা বলিতে পারিত ; কিন্তু সে ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ পাহাড়স্তম্ভের পাদমূলে সত্যই কি তবে কোন গুহা আছে না কি? আর সেখান হইতেই কি ঐ ধ্বনি উঠিল?

তখনও অন্ধকার হয় নাই। পড়ন্ত সূর্য্যালোকে চারিদিক্ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি তরু-পত্রঢাকা সেই পাহাড়তলে আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলাম ; কিন্তু কৈ, কোন শব্দই ত শুনিতে পাওয়া যায় না! ফিরিতে গিয়া হঠাৎ গাছের শিকড়ে পা বাধিয়া গেল, পা ছাড়াইতে গিয়া হোঁচট খাইয়া একটা পাতরের উপর বসিয়া পড়িলাম। কি আশ্চর্য্য! পাশেই কি ঐ একটা গুহার মুখ নহে? কে যেন পাতরখানা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল ; বাহির হইবার সময় তাড়াতাড়িতে গুহামুখ বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। একটা উগ্র কৌতূহল আমাকে উদ্রিক্ত করিয়া তুলিল, আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, সত্যই ইহা একটা সুড়ঙ্গ-মুখ, মুখটা নিতান্ত ছোটও নহে! আমি আস্তে আস্তে মাথা ঢুকাইয়া ভিতরটা দেখিতে চেষ্টা করিলাম, স্থানটা খুব অন্ধকার মনে হইল না, পাশের একটা কোন ফাঁক দিয়া সেখানে আলো ঢুকিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার মৃদু মৃদু শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। কে জানে, এই শব্দই বা তখন গুহাগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া মনুষ্য-কণ্ঠের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল কি না! একবার মনে হইল, ফিরিয়া যাই, কিন্তু কি যেন একটা অলৌকিক শক্তি পিছন হইতে আমাকে গুহামধ্যে ঠেলিয়া দিল। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখের পরিসর নিতান্ত কম নহে, কিন্তু দাঁড়াইয়া চলিবার উপায় নাই—কারণ, পাহাড় মাথায় ঠেকে। যে পথে আলোক প্রবেশ করিতেছিল আমি সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিলাম। একটা বাঁকা পথে ঢুকিতেই হঠাৎ ঊর্দ্ধদেশ যেন ফাঁক হইয়া পড়িল। আমি সহজভাবে দাঁড়াইয়া তখন আর মাথায় কোন ঠোক্কর পাইলাম না। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, ইহা একটা ঝরণার ধার। উৎক্ষিপ্ত জলরাশির ছিটায় আমাকে এমন আর্দ্র করিয়া তুলিল যে, আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। কিন্তু ফিরিয়া পূর্ব্ব-বাঁকের পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে অপর একটা বাঁকপথে ঢুকিয়া পড়িলাম। সেখানকার দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গেল। পাহাড়গাত্র সত্যই মনুষ্যকঙ্কালে পরিপূর্ণ। এতক্ষণ পরে আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা আতঙ্ক-শিহরণ উঠিল। দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া একটা মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেলাম। কিন্তু ইহা কি মৃতদেহ? নহে ত ; ইহার নিশ্বাসস্পর্শ যে অনুভব করিতেছি। এই ব্যক্তিই কি তখন আর্ত্তনাদ করিয়াছিল? কিন্তু এ ত আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া আছে। কোমরের ছোরাখানা

লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধন কাটিয়া দিলাম, তাহার পর আর্দ্র উড়ানিখানা নিঙড়াইয়া তাহার মুখে চোখে জল দিতে লাগিলাম। হঠাৎ সে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল; ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া, ভূপতিত ছোরাখানা তুলিয়া লইয়া আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। তাহার দুর্ব্বল হস্ত হইতে সহজে যদি ছোরাখানা টানিয়া লইতে না পারিতাম, তাহা হইলে এই গুহাই যে আমার কবর হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সে আর একবার ভীত কটাক্ষে আমার দিকে চাহিল, তাহার পর সন্ত্রস্ত-পদে উঠিয়া ঝরণার ধারের একটা গাছ ধরিয়া নামিয়া পড়িল। বাঁচিল কি মরিল, কে জানে? তাহার আতঙ্কদৃষ্টিতে বুঝিলাম, সে ভাবিয়াছিল, আমি তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছি।

সে চলিয়া যাইবার পর আমি মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম; তাহার পর উঠিয়া রুদ্ধশ্বাসে পূর্ব্বপথ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম, এবার আর কোন বাধা পাইলাম না। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, চারিদিক কুয়াসাচ্ছন্ন। অন্ধকারে তরুলতা প্রেতের আকারে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আমি নীরব স্তব্ধ হইয়া ভাবিলাম—এ স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? বেশীক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে থাকিতে হইল না—আবার জাগরণরাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম। মনুষ্যকণ্ঠস্বর—বনপ্রদেশ হইতে উঠিয়া আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, মনে হইল যেন, ডুলীবাহকদিগের চাপা মৃদুকণ্ঠ। ক্রমশঃ একখানা ডুলী বহন করিয়া চারিজন বাহক আমার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। ডুলীস্থিত রমণী, অনুচ্চ কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মা গো!" বুঝিলাম, ইহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি সহসা একটা অসীম বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলাম। আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে ছোরাখানা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। সেই স্থানে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিবামাত্র আত্মরক্ষার জন্য একটা শাখা ভাঙ্গিয়া হাতে লইলাম এবং সেই শাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভীষণ স্বরে বলিলাম, "ডুলী এইখানে রাখ্!" ভীত ও আশ্চর্য্যভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে ডুলীখানা মাটীতে ফেলিয়া বাহকরা পলায়ন করিল। বাহকদের সঙ্গের দুইজন লোক আমাকে দেখিবামাত্রই নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

প্রতিপদের চাঁদ পাহাড়ের আড়াল হইতে ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়া তাহার সমস্ত আলো রমণীর মুখে ঢালিয়া দিল। কে এ ভুবনমোহিনী প্রতিমা! কোন্ স্বর্গরাজ্য হইতে হঠাৎ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিল?

আমার বিস্ময় মোহ না ভাঙ্গিতেই রমণী আবার অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মা গো!" কথার স্বরে মনে হইল, তাহার পূর্ণ সচেতন অবস্থা নহে, যেন একটা নেশার ঘোরে সে আচ্ছন্ন। আমি কি করিয়া তাহার চেতনাসঞ্চার করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উড়ানিখানা খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম, তাহাও গুহার মধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই সময় মগরা তাহার ওঝার সহিত আসিয়া হাজির হইল। আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম। আসিয়াই ইহাকে দেখিয়া মগরা সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি, বাবুজী? একে কোথায় পেলে?"

আমি। যেখান থেকেই পাই, এখন একে নিয়ে চল।

মগরা। কোথায় গো?

আমি। কোথায় আবার—বাড়ীতে।

মগরা। এ দেখছি, কবলাদের জিনিষ। আমরা নিয়ে যাব কি, বাবুজী? জান্‌লে আর রক্ষে রাখবে না।

আমি। সে ভাবনা তোর নেই। ডুলী ওঠা—

আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া সে বালিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "নেশা ধরিয়েছে। নাক দিয়ে ধোঁয়া দিয়েছে।"

ওঝা তখন কি মন্ত্র পড়িয়া তাহার মুখে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্য! রমণী যেন চমকিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল ; চারিদিকে চাহিয়া ভয়ে বিস্ময়ে বলিল, "কোথায় নিয়ে এলে আমাকে!"

আমি বলিলাম, "ভয় নেই, তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। উঠা মগরা, দুইজনে বাঁশ ধর, শীগ্‌গির শীগ্‌গির চল্‌।"

মগরা বলিল, "সেই ভাল। বাড়ী গিয়েই ঝাড়ফুক হবে। কেউ হঠাৎ যদি এসে পড়ে।" বলিয়া ভয়ে ভয়ে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সে ডুলীর এক পাশ ধরিয়া পরে ওঝাকে অন্য দিকের বাঁশখানা ধরিতে অনুরোধ করিল। যদিও রমণী তম্বঙ্গী বালিকা —নিতান্ত লঘুভার ; আমার মনে হইতেছিল, আমি একলাই ইহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু ডুলী উঠাইয়াই মগরা গন্‌ গন্‌ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি ত হুকুম দিলে শীগ্‌গির চল—চলি কি ক'রে, পথটা ত কম নয়।"

আমি বলিলাম, "আমিও কাঁধ দিচ্ছি, চল্‌ এখন।" পথের মধ্যে থামিয়া থামিয়া মগরা বলিল, "কি করলে, বাবুজী! এ যে কবলার জিনিষ, ভূতের খানা। সইবে না—তোমাকে গো সইবে না।"

৩

আমাদের ঘরে আসিয়া সেবা-যত্নে বালিকা যখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন তাহার মুখে শুনিলাম, তাহারা মাতা-পুত্রীতে কিছুদিন হইতে মাতুলাশ্রয় শিমুলতলায় আছে। আমাদের বাড়ীর নিকটেই থাকে। মাতুল কার্য্যবশতঃ আপাততঃ কলিকাতায় ; ভৃত্যেরা সব সময় বাড়ী থাকে না ; মাতা তখনও রন্ধনশালায়। মনোরমা দুপুরবেলা আহারের পর ঘরে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিল, হঠাৎ কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। স্বর পরিচিতের মত, কিন্তু তখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, ঠিক বুঝিতে পারিল না—কাহার গলা। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রাচীরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিবামাত্র হঠাৎ কে একজন পিছন হইতে তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া কোলে উঠাইয়া একেবারে বনপথে প্রবেশ করিল। তাহার পর কি হইল, সে কিছুই জানে না ; কারণ, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

আহা! বালিকার মাতা কন্যাকে এতক্ষণ না দেখিয়া না জানি কিরূপ শোকোন্মত্ত অবস্থায় আছেন! দিদি মগরাকে কিছু বক্‌শিশ দিয়া সেই রাত্রিতেই তাহার মাতার নিকট কন্যার সংবাদ পাঠাইলেন ; তিনিও ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মগরার সহিত এখানে চলিয়া আসিলেন।

শোকোচ্ছ্বাসের মতই সেই ব্যথাকাতর মিলনদৃশ্য আমাদিগকেও কিরূপ অভিভূত ও আনন্দপীড়িত করিয়াছিল, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম—কবি হইলে হয়ত বা পারিতাম। দুঃখের বিষয়, আমি কবি নহি ; আর সুখের বিষয় এই যে, শোকের তীব্রতা কিম্বা আনন্দের উগ্রতা মানুষের মনে চিরদিন সমভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে

না। তাহা হইলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইত?

তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে সুস্থ অক্ষতভাবে চিতাগ্নি হইতে যেন ফিরিয়া পাইয়াছেন, এই আশাতীত অসম্ভব ঘটনা যখন সত্য বলিয়া মাতার মনে প্রতীতি জন্মিল, তখন তাঁহার আনন্দও ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল এবং কন্যার অপহরণ বৃত্তান্ত তিনি আমাদিগকে খুলিয়া বলিবার অবসর পাইলেন।

ইঁহার স্বামী হরনাথ মিত্র সুনামগঞ্জের জনৈক জমীদার ; কয়েক বৎসর যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগিয়া মাস কয়েকমাত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অনেকদিন হইতেই তিনি বিষয়কর্ম্ম নিজে তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না, কিন্তু সে জন্য তাঁহার মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। তাঁহার আত্মসম্পর্কীয় প্রিয়-বন্ধু ঘনশ্যাম ঘোষের হস্তে এই ভার দিয়া তিনি খুবই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইহার উপর তাঁহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, উইলেও ঘনশ্যামবাবুকে তিনি কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের দুইটি সন্তান ;—একটি পুত্র ও একটি কন্যা। বিষয়ের অধিকারী পুত্রটি সম্প্রতি বিলাতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছে, ৩/৪ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিবে ; কিন্তু কন্যাকেও তিনি উইলে একখানি বাড়ী ও ৫০ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন ; বিবাহের সময় সুদে-আসলে যৌতুকস্বরূপ ইহা তাহার প্রাপ্য।

দিদি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "মেয়েকে ত মিত্র মশায় বেশ দিয়ে গেছেন।"

মিত্রাণী বলিয়া উঠিলেন, "আর যত অনর্থ ত এর জন্যই ঘট্‌ছে।"

দিদি বলিলেন, "ঘনশ্যামবাবু তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে টাকাটা হাত করবার চেষ্টায় আছেন বুঝি? ছেলেটি কি সুপাত্র নয়?"

মিত্রাণী বলিলেন, "তা নয় গো তা নয়, তাঁর নিজের দৃষ্টিই এইদিকে পড়েছে।"

"তবে যে তুমি বললে, তোমার স্বামীর বন্ধু! তাই আমি ভেবেছিলাম, তিনি বুড় মানুষ।"

"বুড় নয় ত কি? নাতী-নাতনীতে ঘর ভরা। হালে পরিবার মারা গেছে, এখন আমার রত্নটি গ্রাস করবার চেষ্টায় আছেন।"

দিদি হাসিয়া বলিলেন, "সাবাস রে বুড়ো!"

মিত্রাণী বলিলেন, "তুমি ত ভাই হাসছ, কিন্তু সেই ভয়ে আমি দেশছাড়া হয়ে শিমুলতলায় দাদার আশ্রয়ে পালিয়ে এসেছি ; কিন্তু এখানেও নিস্তার নেই। আজ তোমরা রক্ষা না করলে আমাদের যে কি অবস্থা হ'ত বল দেখি?"

আমি অদূরে নীরবে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম। মিত্রাণী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে প্রথমে আমার দিকে চাহিয়া, পরে দিদির পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দিদি ব্যস্তসমস্ত-ভাবে প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "ও কি কর ভাই! রক্ষা করেছেন ভগবান্, আমরা উপলক্ষমাত্র। কিন্তু তুমি কি মনে কর, ঘনশ্যামবাবু সত্যই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত?"

"নিশ্চয়ই। তাতে কোন সন্দেহই নেই। সপ্তাহখানেক হ'ল, তিনি শিমুলতলায় এসে পুজোর সময় আমাদের দেশে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছিলেন। আমাকে কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে শেষে মেয়েকেই চুরী ক'রে নিয়ে গেলেন।"

"কিন্তু হল্‌দিঝোরাতে নিয়ে গেলেন কেন?"

"এটা আর বুঝলে না, দিদি! সোজা রাস্তায় গেলে যে লোকের নজরে পড়বে! তাই বনের মধ্যে খানিকক্ষণ লুকিয়ে রেখে রাতারাতি ষ্টেশনে নিয়ে যাবার মতলবে ছিলেন।"

এতক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "কিন্তু কোন ভদ্রলোক ত ডুলীর সঙ্গে ছিল না।"

"তা কেন থাকবে? বুড়ো ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল। অন্ধকারে রোগী ব'লে চালিয়ে রেলে তুলে দিত। কিন্তু এর পর যে কি করবে সেই ভাবনাই এখন আমাকে পাগল ক'রে তুলছে, দিদি।"

দিদি বলিলেন, "যদি অবিলম্বে মেয়ের একটি বিয়ে দিয়ে দিতে পার, তবেই কিন্তু তিনি জব্দ হয়ে যান।"

তা ত ঠিকই বলেছ, ভাই, আর দাদাও একটি সুপাত্র ঠিক করেছেন। ছেলেটি ওকালতী পড়ছে, মেজাজও ভাল মনে হয়; সে-ও শিমুলতলায় এসেছে আর মাঝে মাঝে দাদার বাড়ী আসা-যাওয়া করে, কিন্তু তবু তার প্রতি আমার মনটা কেমন প্রসন্ন নয়; ঘনশ্যামের সঙ্গে তার একটা কি রকম দূর-সম্পর্ক আছে—ভাইপো না কি হয়।"

দিদি বলিলেন, "এ ভাই তোমার অন্যায়। কথায় বলে কায়েতের কুটুম। সম্পর্ক ধরতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়!"

মিত্রাণী বলিলেন, "কিন্তু সে ছেলে সেদিন সকালে এসে ব'লে গেল যে, হল্‌দিঝোরা দেখতে যাচ্ছে, তারপর এই ৩/৪ দিনও আর তার দেখা নেই। সে-ও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত নেই ত?"

এই কথা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনে সেই যুবার কথা জাগিয়া উঠিল—যাহাকে আমি গুহার মধ্যে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলাম। এই ত সেই যুবা নয়! হয়ত বা পথের কণ্টক বিবেচনায় ঘনশ্যামবাবুই ইহাকে এইরূপে সরাইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু এই অসম্ভব কল্পনা বেশীক্ষণ মনে স্থান পাইল না।

মিত্রাণী দিদির হাত ধরিয়া সকাতর অনুরোধে বলিলেন, "ভাই, একবার যাকে রক্ষা করেছ, আর তাকে বিপদের মুখে ফেলে রেখো না। তোমাদের বউ ক'রে একে ঘরে তুলে নাও।"

দিদি আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা মেয়ে ত অপছন্দের নয়—কি বলিস তুই?"

আমি মনে মনে বলিলাম, "অমৃতে অরুচি কার?" কিন্তু ইহা ত প্রকাশ করিয়া বলা যায় না, তাই মৃদু হাসিয়া মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলাম। ঘরে আসিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, "চেহারাখানা বড় বেমানান ব'লে মনে হচ্ছে। তা মন্দই বা কি? রাধা ত শ্রীকৃষ্ণের কালো রূপেই মজেছিলেন।"

"শুভস্য শীঘ্রম" বলিয়া ভগিনীপতি কৃষ্ণপক্ষ পার হইতে দিলেন না। তাড়িতবার্ত্তা বহন করিয়া তাঁহার মেজাজটিই হইয়াছে ত্বরিতগতি; তাহার পর এ ক্ষেত্রে তিনি ঘনশ্যামবাবুকে ব্যর্থ করিবার পক্ষে এই চালটাকেই অব্যর্থ জ্ঞান করিলেন। নবমী তিথিতে যে শুভলগ্ন পাওয়া গেল, সেই লগ্নেই তিনি মঙ্গল অনুষ্ঠান সমাধা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

দিদির বাড়ীতেই বিবাহের আয়োজন—খুব চুপচাপে—পুরোহিত ও ২/৪ জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কাহাকেও বলা হইল না।

বৈকালে বরসজ্জা শেষ করিয়া দিদিরা কনে সাজাইতে গেলেন। আমি রাঙ্গাবস্ত্র ও ফুলচন্দন পরিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। তখনও সূর্য্যের আলো কনক ঝরণায় দিগ্‌দিগন্তে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তার অভ্রগুলা দিবা-খদ্যোতের ন্যায় ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছিল; পাশের মাঠে কাশগুচ্ছের উপরে সূর্য্যের কনকপ্রভা খেলিয়া যাইতেছিল। শিউলী ফুলের সুগন্ধ শরৎকালে বসন্ত জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বর্ণের শোভায়, গন্ধের হিল্লোলে চারিদিকে যেন সুখের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল! কিন্তু এই আলোকদৃশ্য সম্মুখে রাখিয়া আমার মনে জাগিয়া উঠিল সেই অন্ধকার-গুহার কথা। কে সে যুবক? হইতে পারে, ইহারই সহিত মনোরমা বাগদত্তা হইয়াছিল। বালিকা যে মনে মনে তাহাকে ভালবাসে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিবাহের মুহূর্ত্তে সে যদি আসিয়া উহাকে দাবী করে—তখন? বুদ্ধিতে বুঝিতেছিলাম যে, ইহা একটা আজগুবী অসম্ভব আশঙ্কা; কিন্তু ভূতের ভয়ের মত এই চিন্তা কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এই সময় রসিকদাদাকে আসিতে দেখিয়া মনটা খুসী হইয়া উঠিল। আসিয়াই তিনি বলিলেন, "এই শুভদিনে এমন গোমসামুখ দেখছি কেন, ভায়া? তা আমারও কিন্তু সেদিন মনটায় ভারী ভাবনা ধ'রে গিয়েছিল?"

"সে কোন্‌দিন, রসিকদাদা?"

"এই তোমারই মত যেদিন সাজসজ্জা ক'রে বসিয়ে রেখেছিল। তারপর কিন্তু বাসরঘরে যেমনি কানের উপর টান পড়লো, অমনি প্রাণের গান আপনিই খুলে গেল।"

"আমার ত দাদা, গান-টান আসে না; তুমি আমায় একটু তালিম দিয়ে দাও না।"

"তা বেশ ত, আমি সেদিন যে গানটা গেয়েছিলুম, সেই গানটাই শিখে নাও", বলিয়া রসিকদাদা সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন—"তা না না না, আহা হা হা, উহু হু হু।

মরি মরি উহু উহু,
কুহু কুহু মুহু মুহু কোয়েলা বোলে।
বায়স বুলায় চঞ্চু বায়সী-গলে!
হায় রে হায়! প্রেয়সী বলে,
আমি আজ ঝাঁপ দিব জলে।
ঝল্‌কে উঠবে চলকানো ঢেউ,
জানবে না গো শুনবে না কেউ,
তলিয়ে পড়বো চুপে চুপে অতল জলে।
হায় রে হায়! প্রেয়সী বলে,
আমি আজ প্রাণ ত্যজিব যমুনা-জলে!"

আমার কিন্তু গানটি শুনিয়া হাসি আসিল না; যে অন্ধকার মন হইতে মিলাইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার ঘনাইয়া আসিল; মুখে বলিলাম, "বেশ রসিকদাদা, বেশ! এই

গানটাই আমাকে আজ গাইতে হবে।"

হঠাৎ দেখিলাম, অনেকগুলি লোক বাড়ীর দিকে আসিতেছে। এ আবার কি? ভগিনীপতি যে বলিয়াছিলেন, বেশী কাহাকেও বলা হইবে না! দেখিতে দেখিতে তাহারা কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। রসিকদাদার গানের তান একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ের দিনে এরা আবার কেন? এ যে পুলিসের দল!"

আমি বিস্ময়স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম।

নিকটে আসিয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম?"

"রমাপ্রসাদ।"

"রমাপ্রসাদ বসু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

একজন পাহারাওয়ালার হস্ত হইতে গুহা-পরিত্যক্ত আমার সেই উত্তরীয়খানা লইয়া আর একজন তখন জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি আপনার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কোথায় পাইলেন?"

"আর এই ছোরাখানা?" দেখিলাম আমার বটে, কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

"দেখিতেছেন, ইহা রক্তমাখা?"

দেখিলাম বাস্তবিকই রক্তমাখা; কিন্তু উহা দিয়া সেদিন যুবকের বন্ধনরজ্জু কাটিয়াছিলাম মাত্র, উহাতে রক্তের দাগ আসিল কিরূপে? বুঝিলাম, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কি উত্তর দিব, স্থির করিতে না পারিয়া নীরবেই রহিলাম। দারোগাবাবু উগ্রস্বরে বলিলেন, "উত্তর দিন না, চুপ ক'রে রইলেন যে?" আমি অপরাধীর মত আস্তে আস্তে বলিলাম, "ছোরাখানা আমার বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ও ছোরা দিয়ে ত আমি কোনদিন রক্তপাত করিনি।"

"রক্তপাত করেছেন কি না, সে কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিনে, সে সব কথা থানাতে হবে।" বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিবামাত্র, একজন পাহারাওয়ালা অগ্রসর হইয়া আমার হাতে খুনীর হাতকড়ি আঁটিয়া দিল।

বিবাহের দিনে আনন্দ-সঙ্গীতের পরিবর্তে শোকক্রন্দনে গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বন্দী অবস্থায় যে আমার সময় কিরূপে কাটিয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল, বলিবার ক্ষমতাও নাই। সে নরক-যন্ত্রণার জ্বালা এখন ভাল করিয়া মনেও আনিতে পারি না, তাই নিষ্কৃতি; নহিলে মুক্তিলাভেও প্রকৃত মুক্তির সুখলাভ করিতে পারিতাম না। সেই বিষম দুর্দ্দিনে বিধাতা পুরুষকে যন্ত্রণাকাতর প্রাণে অভিশাপ দিতে দিতে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, ফাঁসীদণ্ডেই জীবনের সমাপন হইবে; কেন না, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সঙ্গীণ—ঘনশ্যামবাবু লাসকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়াই সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দৈব মানুষ অপেক্ষাও প্রবল ষড়যন্ত্রী।

আজ আমার বিচারের শেষ দিন। বিচারগৃহ লোকে লোকারণ্য। দুই পক্ষের উকীলের বক্তৃতা শেষ হইয়া গিয়াছে। জুরীগণ মতস্থির করিয়া নিজ নিজ অভিমত জজকে জানাইলেন ; জজসাহেব কালো টুপী ধীরে ধীরে মাথায় পরিয়া রায় পড়িয়া শুনাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় আদালতের বাহিরে একটা বিষম কোলাহল উত্থিত হইল —কে যেন জোর করিয়া প্রবেশ করিতে চাহিতেছে অথচ বাধা পাইতেছে বলিয়া পারিতেছে না। দেখিতে দেখিতে ভিড় ঠেলিয়া সেই গুহার যুবা বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইল ও উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আসামী নির্দ্দোষ। আমি মরি নাই—জীবিত। এই যুবকই আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, নহিলে কুচক্রীর চক্রে আমার প্রাণ যাইত।" আমার কানের মধ্যে সমুদ্রের জলকল্লোল শুনিতে পাইলাম ; কি যে হইতেছিল, ঠিক বুঝিবার পূর্ব্বেই আমার সংজ্ঞা লোপ হইল!

যখন চেতনা ফিরিয়া পাইলাম, তখন রসুন-চৌকির মধুর তান আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এ কোথায় আমি? মরণের পর কি স্বর্গরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি! এ কি স্বপ্ন না কি!

নব ডাকাতের ডায়েরি

১

নাঃ, আর পারা যায় না! দুর্ব্বল মনটার সঙ্গে কিছুতেই আর পারিয়া উঠিতেছি না। আগে বিশ্বাস ছিল, 'স্বদেশী' হইবামাত্র মনের কাপুরুষতা-মালিন্য আপনা হইতে মুছিয়া পুঁছিয়া যায়। কিন্তু বিপরীত জ্ঞানের টনটনে বেদনায়—গ্লানিজর্জ্জর আত্মাপুরুষ হতাশ্বাসে মর-মর হইয়া পড়িতেছে—উপায় কি করি? কিমৌষধং?

দুঃখের জ্বালায় এক একবার এমনও ইচ্ছা হয় যে, দুর্ব্বলতা-দুর্দ্দান্ত এই হৃৎপিণ্ড-অরিটাকে দুই হাতে চিরিয়া হিরণ্যকশিপু-বধের আনন্দলাভ করি,—তাই বা পারি কই? ইহা ত আর অসহায়া বাঙ্গালী-বধূকে ঘরের কোণে ঠাসিয়া মারা নয়—এ হইতেছে প্রবল দৈত্য আত্মাপুরুষ—ইহাকে মারিতে গেলে নিজেই মরিতে হইবে, তাহা পারি কই? অতএব আবার জিজ্ঞাসা করি—কিমৌষধং? মনের কাপুরুষতা ঘুচাই কিরূপে?

শুনা যায়, আমার পূর্ব্বপুরুষ হরিহর শর্ম্মার নামডাকে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। রঘো ডাকাত আমাদের বাস্তুভিটার ধার দিয়া নদী বাহিয়া ডাকাতী করিতে যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে তাঁর নাম জপ করিতে করিতে নৌকা চালাইত। হরিকর্ত্তা ছিলেন রঘুর অস্ত্রগুরু। লাঠি-তলোয়ারে তিনিই নাকি তার হাতে খড়ি দেন। গুরুভক্ত রঘুবীর ডাকাতীর পর প্রতিবারই নবরত্ন ডালি তাঁহার চরণতলে ধরিয়া দিয়া গুরুপ্রণাম পূর্ব্বক সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত। তখনকার দিনে এরূপ উপহার গ্রহণ মানহানিকর বা রাজ-অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল কি না, আমার জানা নাই—তবে রঘুবীরের এই সম্মানে হরি-শর্ম্মার নামডাক যে খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল, দেশের সর্ব্বসাধারণ যে তাঁহাকে অতিরিক্ত ভক্তি-সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত, ইহা বেশ ভাল করিয়াই জানি। এ হেন প্রবলপ্রতাপ হরিহর শর্ম্মার সন্তান যে আমি—আমার সকল তেজ, সকল উদ্দীপনা,—একটা নরম কথাতেই কিনা ঠাণ্ডা জল হইয়া যায়! হায় রে! প্রকাশেও এ দুঃখের উপশম নাই—কেবল লজ্জা!

আমার পিতৃঠাকুর ছিলেন—হেয়ার কলেজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র। কলেজের ইংলিশ প্রোফেসর ডাক্তার কেমিক্যাল তাঁহাকে সন্তানতুল্য স্নেহ করিতেন। তখনকার দিনে নাকি গুরুশিষ্যে বিজাতীয় বিসংবাদ ছিল না। এই পুরাদস্তুর পিঠ-থাবড়ান সম্পর্ক—ইংরাজীতে যাকে বলে Patronising ভাব, তাহা যে আমাদের জাতীয়তার তেজখর্ব্বকর—তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এ রকম গায়ে হাত-বুলান স্নেহ তাই আজকাল আমরা মোটেই পছন্দ করি না, তবে পিতৃদেব অন্যরূপ বুঝিতেন, শিক্ষকের স্নেহে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

পিতার মৃত্যুকালে আমার বয়স ছিল ১৫ বৎসর। তিনি যখন রোগশয্যায় পড়িয়া, তখন ডাক্তার কেমিক্যাল প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, আমাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলে, অজস্র মিষ্ট কথা আমার উপর বর্ষণ করিতেন, আমার বালক-মন সহজেই তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িত।

মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে একদিন বাবা কেমিক্যাল সাহেবকে বলিলেন, "জানেন ত সাহেব, অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে এই ছেলেটি আমার বেঁচে আছে, একে আমি মানুষ ক'রে যেতে পারলাম না, আপনার উপরই সে ভার রইলো, দেখবেন, ভবিষ্যতে এ যেন মানুষ হয়।"

বলা বাহুল্য, আমিও হেয়ার স্কুলে পড়িতাম। পিতৃবিয়োগের পর আমার পড়াশুনার প্রতি কেমিক্যাল সাহেবের এমন তীব্র দৃষ্টি পড়িল যে, আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। বছরখানেক টিঁকিয়া থাকিতে পারিলে, এণ্ট্রেন্সটা সহজেই পাশ করিতে পারিতাম। কেন না, তিনি নিজে যত্ন করিয়া সন্ধ্যাবেলা আমাকে পড়াইতেন, ছাত্র-জীবনে ইহা পরম সৌভাগ্য। কিন্তু অতিরিক্ত সুখ-সৌভাগ্য বহু সময়ে অসুখেরই কারণ হইয়া উঠে। অন্ততঃ এ সৌভাগ্য আমি বরদাস্ত করিতে পারিলাম না। বছর ত বছর বটে, দিনও নয়, মুহূর্ত্ত ত নয়ই। বারোটা মাসে ছুটীগুলা সব পুরাপুরি বাদ সাদ দিয়া তবুও ত অন্তত দুশ পঁয়ত্রিশ দিন বই হাতে করিয়া দিন কাটাইতে হইবে বৎসরে! পিতৃমৃত্যুতে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া এই দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় কি কাটান যায়! মনে করিতেও দম বন্ধ হইয়া উঠিত! ইহার উপর, আমার উপর ক্লাশের ছাত্র-বন্ধুরা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, কেমিক্যাল সাহেব মানুষ গড়িবার ছলে আমাকে বাঁদর বানাইবার চেষ্টায় আছেন ; তখন আর আমাকে পায় কে? নিজেকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার নিজের হাতে লইয়া, মাসকতক যাইতে না যাইতেই স্কুল ত্যাগ করিলাম।

আবাল্য আমি 'স্বদেশী'। দুধে দাঁত বোধ হয় তখনও আমার সব ভাঙ্গে নাই, যখন আমি সদলবলে দোকানীদের বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া আসিয়াছি। এবার স্কুল ছাড়িয়া রীতিমতভাবে বিপ্লবপন্থী হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু এমন গোপন কথাও কেমিক্যাল সাহেবের নিকট গোপন রহিল না। কি করিয়া যে এ খবর তাঁহার কানে পৌঁছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত আমার নিকট রহস্যপূর্ণ। ইচ্ছাশক্তির এ কোনরূপ অবিদিত ক্রিয়া না কি? কে জানে? কিন্তু আমার খবরকে ধরা আর আমাকে ধরা ত আর এক কথা নয়। তাঁহার চিঠি বহাবহিতে ডাকপিয়নের জুতার তলাটাকে ক্ষয়রোগে ধরিল, শিকলকাটা মুক্ত পাখী আমি, কিন্তু তবু তাঁহাকে ধরা দিতে চাহিলাম না। না চাহিলে কি হয়—? দৈব যে স্বয়ং ক্ষমতার অধীন, ইচ্ছাশক্তির দাস —আমরা যদি শুধু এই সত্যটুকুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে জানিতাম, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যলিপি উল্টাইয়া যাইত। যাক। ধরা না দিয়াও একদিন আমি ধরা পড়িয়া গেলাম।

তখন বেলা ২টা, আমি শ্যামবাজার হইতে ট্রামে ভবানীপুর যাইতেছিলাম, কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দেখিলাম, একজন হ্যাটকোটধারী সেই গাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছেন। কে ও? কেমিক্যাল সাহেব ত নন? হইতেও পারেন তিনি, এই সময় লেকচার শেষ করিয়া কোন কোনদিন তিনি বাড়ী যান। আর ঠিক এ সময়েই কি না আমি চৌরঙ্গীর ট্রামে চড়িয়া বসিলাম—কি দুর্ব্বুদ্ধি আমার! আপশোষটা লজ্জায় এবং সন্দেহ সত্যে পরিণত করিয়া কেমিক্যাল সাহেবের পা'দুটা গাড়ীর পাদানীর উপর যখন

চড়িল, তখন আমার বুকটা দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ; ইচ্ছা হইল, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এ লজ্জাভয় নিবারণ করি ; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সাহেব আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া 'হ্যাল্লো' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার সুরে তাঁহার সমস্ত মুখে কি আনন্দ-স্ফূর্ত্তি! সেই আনন্দধারা আমার লজ্জানুতাপপূর্ণ মনকেও বেশ একটু আর্দ্র করিয়া তুলিল, বিস্মৃত অনুরাগ-প্রীতি আমার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

সাহেব বলিলেন—মর্ম্মান্তিক অনুনয়পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তোমার পিতার কাতর মৃত্যুবাণী আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারিনে, তুমি স্কুল ছেড়ে গিয়ে পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। কথা রাখ নবকুমার, স্কুলে আবার ভর্ত্তি হও— জীবনটা নষ্ট কোরো না—তোমার প্রতিভাশক্তির বিকাশ কর।" বলিয়া এক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন ; তাহার পর শক্তি সংগ্রহ করিয়া যেন বলিলেন—"ও পথ ছাড় নবকুমার, ওতে দেশেরও মঙ্গল নেই, তোমারও মঙ্গল নেই, প্রকৃত বন্ধুর উপদেশ শোন, ও পথ ছাড়। আবার—পড়াশুনা ধর।"

তাঁহার কাতরতায় মনটা বড়ই নরম হইয়া গেল, বলিতে লজ্জা করে—আমার চোখদুটা জলে ভরিয়া উঠিল। আমি আন্তরিকভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"বল স্কুলে ভর্ত্তি হবে—আমি আজই তোমার নামে টাকা জমা দিয়া দিব।"

"বেশ।"

"বলো ও-দলে আর মিশবে না? কথা দাও নবকুমার ; প্রতিজ্ঞা কর?"

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। মন বলিল,—"তাও কি কখনো হয়?" কিন্তু মনের মত পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ এ দুনিয়ায় বোধ হয় আর দুটি নাই—অন্ততঃ আমার পক্ষে। সাহেবের জুতার দিকে চাহিয়া মন যে কথা ভাবিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহা ভুলিয়া গেল—তাঁহার অনুনয়পূর্ণ কাতর-দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিয়া আমি বলিতে যাইতেছিলাম —"আচ্ছা, বেশ, তাই হবে।" কিন্তু মনের কথা মুখে ফুটিবার পূর্ব্বেই গাড়ীটা সশব্দে থামিল—আর ধীরেন গুরুগম্ভীর মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র আমার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। এতক্ষণ গাড়ীর এ অংশে আমরা দুইজন মাত্র ছিলাম। তৃতীয় ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া কেমিক্যাল সাহেবও নীরব হইয়া গেলেন ; ট্রামও চৌরঙ্গীর পথে আসিয়া পড়িল,—তিনি নামিবার সময় এইটুকু শুধু বলিয়া গেলেন—সন্ধ্যার সময় আমি যেন তাঁহার কাছে যাই—তিনি আমার প্রতীক্ষায় থাকিবেন।

তিনি চলিয়া গেলে ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হচ্ছিল শুনি?"

আমি একটু বাদসাদ দিয়া মোটামুটি সবই তাহাকে বলিলাম। সে শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, সাহেবের তোমার ইচ্ছা চিরদিনই আমরা ওদের পদানত হয়ে থাকি। দেখিস্, ওসব মিষ্টি কথায় ভুলিসনে।"

"আরে ক্ষেপেছ? কোথায় যাচ্ছ ধীরেনদা?"

"যাচ্ছি—কামাখ্যাধামে একটা কাজের চেষ্টায়, বুঝলে ত?"

"কামাখ্যাধামে! আমাকে কিন্তু এবার সঙ্গে নিতে হবে।"

"পারবি তুই?"

"নিশ্চয়?"

"বিশ্বাস হয় না। তুই যে রকম দুর্ব্বল! রাস্তার কুকুর একটা এক ঘা লাঠী খেয়ে কুঁই কুঁই করলে তোর চোখে জল আসে, কালীঘাটে পাঁঠা বলি দেখলে মূর্চ্ছা যাস।"

"আরে সে আলাদা কথা। নিরপরাধ বেচারা জীবগুলির প্রতি নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থের জন্য তাদের বলি দেওয়া—"

"তা বল্লে চলবে না! রক্তপাতে অভ্যস্ত হতে হবে। পরীক্ষা দিতে পারবি?"

"নিশ্চয়। কি করতে হবে বল?"

"শান্তার পাঁঠাটাকে নিয়ে এসে, স্বহস্তে তার মুণ্ডপাত করে—কাল আমাদে.. ·ন-ভোজন করা দিকি?"

শান্তা আমার পিসীমার মেযে, আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। পিসীমা বিধবা, মেয়েটিকে লইয়া আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। পিসীমার যত্ন আদরে মাতৃহারা শিশু আমি কোনদিনই মাতার স্নেহের অভাব বুঝি নাই, বরঞ্চ অতিরিক্ত স্নেহ পাইয়া স্নেহের অনাদর করিতেই শিখিয়াছি।

শান্তা একটি কুকুর ও একটি ছাগশিশু পালন করিয়াছিল, এই দুই জীবের আশ্চর্য্য রকম ভাব—তাহারা দুটিতে জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিত, যেন দুটি বিড়ালছানা। শান্তা দুপুরবেলা মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া শুইয়া থাকিত—তাহার এই বন্ধু বাচ্ছা দুইটি তাহার গায়ের উপর ডিগবাজি খেলিয়া বেড়াইত। ছাগশিশুটিকে লইয়া গেলে, বাড়ীটা যে কি রকম বিষাদপূর্ণ হইবে, মনে করিতেও মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু দেশমাতৃকার চরণে সর্ব্বস্ব বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি, এ রকম কষ্ট দুঃখ ত তাহার তুলনায় সামান্য।

ভোরবেলা বাড়ীর কেহ উঠিবার পূর্ব্বেই ছাগশিশুটাকে গোয়ালঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া চম্পট দিলাম। আশ্চর্য্য! বাচ্চাটা একবার ডাকিল না! সে ভাবিল, আমি তাহাকে স্নেহের আশ্রয়েই উঠাইয়া লইলাম। তখনও শান্তা শয়নকক্ষে, তার কুকুরটা সে সময় তাহারই ঘরে ঘুমাইতেছিল। অতএব আমার কার্য্যে কোনই বাধা পড়িল না। আমি তাহাকে লইয়া বালিগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া অনতিদূরে একটি নিভৃত জঙ্গলে আসিয়া থামিলাম, সেখানে আমার বন্ধুগণ বন-ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল।

তাহার পর যাহা ঘটিল, সেই নিষ্ঠুর ব্যাপারের বর্ণনা না করাই ভাল। বধকালীন ক্রন্দনপরায়ণ ছাগশিশুর স্নেহ অনুনয়পূর্ণ কাতর ভৎর্সনা-দৃষ্টি আমার প্রাণে যে শেল বিদ্ধ করিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে উচ্ছ্বসিত নর-রক্তধারাও আমার মনে সেরূপ অনুতাপ বিধাইতে পারে নাই।

২

যাহা ভাবিয়াছিলাম, দেখিলাম, মোটেই তাহা নয়। স্বদেশী ডাকাতীতে ভয়-ভাবনার কারণ—ষোল আনায় কড়াক্রান্তি মেলে কি না সন্দেহ—এক কথায় বাধাবিপত্তি নাই বলিলেই হয়। যাত্রার সময় অতীত যুগের আর্য্যবীর্য্য-কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে কালীমাতার নামডাকে বিজন জঙ্গলপথ যখন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলাম—তখন আপনাদিগকে ভীমার্জ্জুন তুল্যই মহারথী বলিয়া মনে হইয়াছিল, অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শনে ইতিহাসে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার আশায় মনঃপ্রাণ আত্ম-গৌরবে নাচিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র প্রাণের সেই ভরপুর উপন্যাস শূন্যে বিলীন হইয়া পড়িল—বুঝিলাম, এ রণও নহে, মরণও নহে, একতরফা শূন্য আস্ফালন মাত্র। হায়! হায়! কার্য্যান্তে মনটা বড়ই দমিয়া গেল!

মুখোসধারী আমরা সংখ্যায় ছিলাম—১৮জন। যাত্রা করিয়াছি—শ্রীবাবুর বাড়ীর উদ্দেশে—লক্ষ্মীপুর। আগেই পথ-ঘাট বাড়ী-ঘর দেখিয়া চিনিয়া ম্যাপ আঁকিয়া লওয়া হইয়াছে। আজ যে শ্রীবাবু বাড়ী নাই, কার্য্যোপলক্ষে এখন তিনি কলিকাতায়—সে খবরও আগেই জানিয়াছি। শ্রীবাবু একজন মহাজন, তেজারতি কারবারে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন, ঘরে নগদ টাকা-কড়ি তাঁর যথেষ্ট থাকে। একতলা পৈতৃক কুঠী শীঘ্রই দোতলা হইবে শুনিতেছি; কিন্তু আমাদের লুণ্ঠন-কার্য্যে সুবিধা জোগাইবার জন্যই বোধ হয়, এখনও একতলাই রহিয়া গিয়াছে। পুলিসথানা তাঁহার বাড়ী হইতে অধিক দূরে নহে, আধ ক্রোশ অপেক্ষাও নিকটে—তাহা ছাড়া একালে ডাকাতীর ভয়ও লোকের মন হইতে এক রকম ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, ডাকাতের বীরত্ব এখন গালগল্প মাত্র। অতএব শ্রীবাবু তাঁহার কানন-ভবনদ্বারে দুইজন ভোজপুরী প্রহরী রাখিয়াই এ যাবৎ নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাততুল্য আমরা তাঁহার শান্তি ভবনের শান্তি নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। আমরা সকলে বাগানের সীমানা ধীরে ধীরে পার হইয়া, সদর দ্বারে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বহির্ভাগে দুইখানা খাটিয়ার মধ্যে একখানা অনধিকৃত, সম্ভবতঃ ইহার মালিক প্রভুজীর সহিত কলিকাতা যাত্রা করিয়াছে, অন্য খাটিয়াখানির অধিকারী দিব্য আয়েসে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে। সার্চ্চলাইট তাহার মুখে পড়িবামাত্র, সে ঘুমাচ্ছন্ন চোখেই পাশের লাঠীখানার উদ্দেশে হাত বাড়াইয়া "কোন হ্যায় রে, কোন হ্যায় রে", করিয়া ডাক ছাড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। সর্দ্দার মহাশয় তাহার মুখের কাছে পিস্তল ধরিয়া বলিলেন, "কথা কহিবে কি গুলী তোমার বুকে পড়িবে।" অন্যেরা অচিরাৎ খাটিয়ার সহিত তাহাকে দড়ী-বুনন করিয়া ফেলিল। ইহার পর একজন পিস্তলধারীকে তাহার নিকটে এবং কয়েকজনকে বাহিরে পাহারায় রাখিয়া আমরা ৮জনে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বার দেখিলাম ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দৈব আমাদের সহায় হইলেন, দ্বার ভাঙ্গিবার আর প্রয়োজন হইল না। ভিতর আঙ্গিনায় যে চাকর শুইয়া থাকিত—বাহিরের অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনিতে পাইয়া, প্রভু আসিয়াছেন ভাবিয়া সে যেমন দরজা খুলিয়া দিল, অমনই আমরা কয়েকজন হুড়মুড় করিয়া গৃহে প্রবেশ

করিলাম। চাকরটা "ডাকাত ডাকাত, সাবধান হও বাবু" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে কোথা দিয়া কোথায় যে পলাইল, তাহাকে আর ধরা গেল না। লোহার সিন্দুক থাকে বাড়ীর ভিতরে অর্থাৎ অন্তঃপুরে, সে খবরও আমরা আগেই পাইয়াছিলাম। দরজায় চারিজনকে রাখিয়া, আমরা চারিজনে ভিতর-বাড়ীতে ছুটিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীবাবু সেদিন বাড়ী ছিলেন না—তাঁহার বাবা, কাকা বা মামা এমনই কোন একজন বৃদ্ধ একটি ছোট বাক্স লইয়া গুড়ি মারিয়া অন্দরের সুঁড়িপথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সর্দ্দার তাঁহার পিঠে আস্তে আস্তে বন্দুকের আগার দ্বারা দুই একটি টোকা লাগাইয়া সসম্মানে কহিলেন, "পালাবার পথ বন্ধ, বাক্সটি ফেলে দিতে আজ্ঞা হোক।" বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কি সে করুণ ভীতভাব! সভয়দৃষ্টি! সহযোগীর হাতের টর্চ্চলাইটের রঙ্গিন আলোক যেন শবের পাংশু মুখে নাচিয়া উঠিল। বৃদ্ধ কম্পিতহস্তে বাক্সটা ভূতলে রাখিয়া ক্রন্দনপরায়ণ হইয়া কহিলেন—"আমার তরঙ্গিণী এ বাক্স আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। তার বিধবা মেয়ের গহনা। কি জবাবদিহি করব তাকে?"

"বলবেন—তার ধন খুব সৎকাযেই লেগেছে ; চাবির গোছাটা দিলেন না ত? ফেলে দিন ঠাকুরমশায়!"

বৃদ্ধ ভাবিতেছিলেন, বাক্স ফেলিয়া দিলেই তিনি রেহাই পাইবেন, কিন্তু আমাদের আব্দার তাহাতেই নিবৃত্ত নহে দেখিয়া অগত্যা চাবির গোছাটাও ফেলিয়া দিয়া একটু ক্ষীণ অভিমান প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এই নে বাবারা এই নে, দেখিস্ যেন কাউকে প্রাণে মারিসনে।"

অতঃপর তিনি কাতরচিত্তে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সারসপক্ষীর ন্যায় অন্ধ সাজিয়া বসিয়া রহিলেন। আমরা আলমারি, সিন্দুক লণ্ডভণ্ড করিয়া মাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। স্ত্রীলোকরা ছেলে কোলে করিয়া ঘোমটা টানিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমরা সম্মানভরে নমস্কারপূর্ব্বক নম্রকণ্ঠে বলিলাম, "যান মাঠাকরুণরা, যান, আপনাদের আমরা কিছুই বলব না কিন্তু—"

"কিন্তু দেশের কাযে কিছু ভিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, বেশী কিছু নয়—হাতের অনন্ত দু'গাছি খুলে দিয়ে যান।"

"গলার হারগাছাও দান ক'রে ফেলুন।"

"নথটাও বাদ রাখবেন না, আজকাল নথের ফ্যাসান একেবারেই উঠে গেছে—জানেন ত?"

"লোহাগাছি হাতে রেখে বালাজোড়া দিতে কি কষ্ট বোধ কর্ব্বেন? বাঙ্গালীর মেয়ে ত আপনারা ; পুণ্যলাভের জন্য কোলের ছেলেকেও ত সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে থাকেন। দিন মাঠাকরুণ—দেশের কাযে এ দান দিয়ে পুণ্যলাভ করুন।"

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে অলঙ্কারহীন হইতে লাগিলেন, মাতাদের অলঙ্কারে দেশমাতাকে সাজাইবার মানসে আমরা উৎফুল্লভাবে সে দান গ্রহণ করিলাম।

মা'র অঞ্চলধারী একটি ছোট মেয়ে মুখোসগুলার দিকে চাহিতেছিল, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। একজন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এস ত লক্ষ্মী এদিকে।" সে খুব জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সময় সহসা আমার মুখোসের দড়িটা

খুলিয়া মুখোসটা আমার মুখ হইতে নামিয়া পড়িল। মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল, তাহার বোধহয় মনে হইল, এই ভীষণ দৈত্যকুলে আমি প্রহ্লাদ, আমার নিকট হইতে করুণা পাইবে সে। সে ঠিকই আঁচিয়াছিল, আমার ইচ্ছায় কার্য্য হইলে, আমি তাহার গহনা লইতাম না ; কিন্তু আমি এখন যন্ত্রমাত্র, সর্দ্দারের ইঙ্গিতচালনায় আমি তাহার হাত হইতে বালা দু'গাছি খুলিয়া লইলাম। একটা অনুতাপের তীব্র ঝাপটায় অন্তস্তল ভেদ করিয়া সে কাতর-ক্রন্দনে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বার বার "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের জপে সে আলোড়ন শান্ত করিয়া লইলাম।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল মাত্র আমাদের কার্য্যের সময় নির্দ্দিষ্ট। তাহার মধ্যেই আমরা টাকা-কড়ি অলঙ্কারাদি যথেষ্ট বাঁধিয়া লইয়া থলি-স্কন্ধ-সৈনিকবেশে সদর-দ্বারে উপনীত হইলাম।

এই সময় পলাতক ভৃত্যের সহিত কয়েকজন পাড়া-প্রতিবাসী এবং জন দুই চৌকিদার পুরুষ আমাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। সকলের হাতে বড় বড় লাঠী, কিন্তু তাহা চালনার অবসর তাহাদের ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে তাহাদিগকে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, চোরাই মালসহ আমরা তাহাদের পাশ দিয়াই বীরদর্পে বুক ফুলাইয়া চলিয়া গেলাম।

৩

ইহাই স্বদেশী ডাকাতী! এত সহজে এরূপ সর্ব্বনাশা জয় লাভ এক বাঙ্গালাদেশেই সম্ভবে! আত্মরক্ষার জন্য একখানা খাঁড়া—অর্থাৎ বড় রকম দা ঘরে রাখিতেও বাঙ্গালীর অধিকার নাই। এই অবাধ জয়লাভে আত্মপ্রসাদ লাভ করিব কি, মন দুঃখগ্লানিতেই ভরিয়া উঠিল। বাঙ্গালার প্রকৃত অসহায় অবস্থা বেশ ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তবুও যে এ দেশে ঘন ঘন ডাকাতী হয় না, রাজভয় তাহার প্রকৃত কারণ নহে, বাঙ্গালী জাতি যে কিরূপ শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির লোক—ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। হায় হায়! কত শৌর্য্যবীর্য্য মনুষ্যত্বের বিনিময়ে এই শান্তিটুকু আমরা কিনিয়াছি!

দ্বিতীয়বারে আমরা নৌকা-ডাকাতী করি। সেবারেও বেশ সহজে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয়বারে আমরা নিরাপদে ফিরিতে পারি নাই। আমাদের কৃপায় ক্রমে লোকরাও সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। এই মুমূর্ষু নির্জীব জাতিকে প্রাণবন্ত সজীব করিয়া তুলিলাম আমরা অঙ্গুলিগণ্য নগণ্য কয়েকজন বালক! ইহা কি আমাদের গৌরবের কথা নহে? রাজপুরুষগণও আমাদের ধরিতে না পারিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছিলেন!

তৃতীয়বারেও নৌকাযোগে ডাকাতী করিতে যাই। ডাকাতীর পর মালপত্রসহ আমরা যখন নদীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, সপুলিস জমীদারের লোকজন দুই পাশ হইতে আমাদের আক্রমণ করিল। Fire করিতে অর্ডার পাইলাম—পুলিসও বন্দুক ছুড়িল। তবে অন্ধকার রাত্রি—পুলিসের হ্যারিকান লণ্ঠনের আলো মাঝে মাঝে এক একবার এক একদিকে মাত্র আলোক নিক্ষিপ্ত করিতেছিল, সেই জন্য আত্মরক্ষার সুযোগ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছিলাম। একটিমাত্র ছেলে বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া পড়িল, কিন্তু সে অবস্থায়

তাহাকে নৌকায় তোলা সহজ নহে বুঝিয়া, সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুই জন দেহ লইয়া গেল, ছিন্ন মস্তক তুলিয়া নদীতে নিক্ষেপের ভার পড়িল আমার উপর। একদিন আমার পাঁঠা কাটিতে কষ্টের সীমা ছিল না, আর আজ সেই আমিই সর্দ্দারের হুকুমে অনায়াসে বন্ধু বালকের ছিন্নমুণ্ড তুলিয়া লইয়া অন্ধকার পথে তীরের দিকে ছুটিলাম। সোজাপথে নৌকা ধরিতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, সকলেই আমরা ঘুরপথে যাত্রা করিলাম। পথ-ঘাট আগে হইতেই যদিও চেনা-জানা, তবুও অন্ধকারে আমি কেমন দিশাহারা হইয়া দলবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। নৌকায় উঠিবার যখন শেষ সঙ্কেত-ধ্বনি পড়িল, তখনও আমি তীরে পৌঁছিতে পারি নাই। ছুটিয়া ছুটিয়া পথ চলিয়া দু' মিনিটের মধ্যেই যদিও একটা আঘাটায় আসিয়া পৌঁছিলাম, কিন্তু নৌকা তখন প্রায় মধ্য-জলে সশব্দে বাহিত হইয়া চলিয়াছে ; তাহার নিশানখানা অন্ধকারেও দুলিয়া দুলিয়া আমার পরিত্যক্ত অসহায় অবস্থা বেশ পূর্ণভাবেই ইঙ্গিত করিয়া জানাইল।

বিজন নদীতীরে তৃতীয় প্রহর নিশাকালে যূথভ্রষ্ট মেষসম আমি একা, না, ঠিক একা নহে—আমার সাথী হস্তে সেই ছিন্ন মুণ্ডটি! আমারি সমবয়সী বালক ছিল সে—কি ভালই বাসিতাম তাহাকে! মুণ্ডটি দুই হাতে ধরিয়া গভীর স্নেহভরে সেই মৃত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—নক্ষত্র-জগতের সমস্ত কিরণ-কণা তাহার উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিল,— কি প্রশান্ত, কি প্রফুল্ল সে মৃতমুখ,—হাসিভরা চোখ দুটি আমাকে যেন সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল, তবু কষ্টে চখে জল ভরিয়া উঠিল, আমি চক্ষু নিমীলিত করিলাম। কতক্ষণ এরূপে বসিয়াছিলাম, জানি না—সহসা যেন পশ্চাতে পদশব্দ শুনিলাম, আর ত ভাবনা-চিন্তার সময় নাই—আত্মরক্ষার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া দাঁড়াইয়া মুণ্ডটা নদীর গভীরতর প্রদেশে নিক্ষেপ করিলাম, পরে উঠিয়া অন্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন ভোরের আলোক ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, দেখিলাম—পিরাণটা রক্তমাখা ; তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া, নদী পাড়ের নীচে নীচে কভু বা বালু-পথে, কভু বা কাদা-পথে, কভু কাঁটা-ঝোঁপের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম।

কি সে উৎকট ঔৎসুক্য! বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। যিনি ভুক্তভোগী, তিনিই মাত্র আমার সে সময়ের নিদারুণ যন্ত্রণা বুঝিতে পারিবেন। একবার নিশ্বাস গ্রহণের জন্য একটা ঝোপের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম,—তখন ধুতীর উপরেও দুই এক স্থানে রক্তের দাগ লক্ষ্য করিলাম। কাপড়খানা কাচিতে আবার জলে নামিলাম।

ঐ, ঐ, আবার পদশব্দ! তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঝোপের মধ্যে বসিলাম। পদশব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, দীর্ঘকায় দুইজন লোক ঝোপের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়া জলের দিকে নামিল ; আমি ধীরে ধীরে জ্বালাময় রুদ্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেখিলাম—তাহারা ধীবর, নৌকাখানা জলে টানিয়া দাঁড় বাহিয়া যখন তাহারা চলিয়া গেল—তখন মনে হইল, আমিও ত উহাদের সহিত যাইতে পারিতাম ; নিশ্চয়ই বলিলে উহারা আমাকে লইয়া যাইত। কিন্তু হায়! তখন সময় চলিয়া গিয়াছে!

আবার পদশব্দ! উঁকি মারিয়া চাহিলাম—লালপাগড়ীর চূড়া নজরে পড়িল। আর রক্ষা নাই। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল ; কিন্তু পাগড়ীধারী এদিকে আসিল না ; অন্য পথে

চলিয়া গেল ; হাঁফ ফেলিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া জলে নামিলাম। কি তৃষ্ণা! যেন মুমূর্ষু ব্যক্তির পিপাসা! জলপান না করিতে পারিলে এখনই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। অঞ্জলি ভরিয়া অমৃত পান করিলাম, দেহে বলসঞ্চয় করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—পূর্ব্বগগন লাল হইয়া উঠিয়া—তাঁহারই উদয় অপেক্ষা করিতেছে, —এখনও নদীতীর নির্জ্জন, সবেমাত্র দুই একজন বৃদ্ধা অনতিদূরে ঘাটে নামিতেছেন ; দুই একজন চাষা লাঙ্গলধারী বলদ লইয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে। জমীদারবাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। মাত্র দুই ঘণ্টা আমি এই তীরে ঘোরা-ফেরা করিতেছি ; মনে হইল, এই দুই ঘণ্টার মধ্যে যুগ-যুগান্তর আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেছে! কোথায় লুকাই! কোথায় পলাই! হে ভগবান্, রক্ষা কর, পথ দেখাও ; এই অসহায় বালককে আশ্রয় দাও।

আমি একমনে সেই বিপদের কাণ্ডারীকে ডাকিতে লাগিলাম। আবার পদশব্দ! উঠিবার শক্তি হারাইলাম। নিদারুণ ঔৎসুক্যে হৃৎপিণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, আমি সকল শক্তি হারাইলাম! এ কষ্টের অপেক্ষা বন্দী হওয়া ত ভাল! ভগবান্ সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। দুইজন লোক হন্ হন করিয়া আমার নিকটেই এবার আসিতে লাগিল। একজন বলিল, "এই যে—এই যে! দেখ দেখি, ও কে একজন বসে ওখানে?" মুহূর্ত্তমধ্যে উভয়েই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি বন্দী হইলাম।

রাজনীতিক বন্দীর যে কিরূপ অবস্থায় দিন কাটে—তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ইহা এখন আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বস্তুতঃ, এ জাতীয় জীবের অবস্থা করাত-মধ্যবর্ত্তী শঙ্খের ন্যায় শোচনীয়। একদিকে নির্জ্জন কারাবাসের মানসিক পীড়ন, অন্যদিকে স্বীকার-গৃহের শারীরিক পীড়ন। এই উভয়বিধ নৈষ্ঠূর্য্যই যে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হইতে বৃহত্তম মাহাত্ম্যে সুসভ্য-জাতির মহত্তম কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই মহাপীড়ন সহ্য করিয়াও বন্দী বালকেরা যে বাঁচিয়া ফিরে, ইহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! তাহারা মহাপ্রাণ বা মহাপাষাণ!

ব্যাটারির আঘাতে হাত-পা ভাঙ্গে না ; কিন্তু হাড়ে হাড়ে যে ভীষণ বেদনা অনুভূত হয়, তাহাতে মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া আরও দুই একরূপ ভয়ঙ্কর পীড়ন আছে, তাহা লেখনীমুখে প্রকাশযোগ্য নহে। কেন যে দুর্ব্বলপ্রকৃতির লোক এই পীড়ন-মুখে approver হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি কিন্তু এতদিনে বুঝিলাম—আমি কাপুরুষ নহি। নরম কথায় আমি যতই টলমল করি না কেন, পীড়ন-কষ্টে আমি অটল ছিলাম! তবে সে কষ্ট হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতিলাভের জন্য মিথ্যা কথা অজস্র বলিয়া যাইতাম। এ সব উপায়ে আগে হইতেই শিক্ষিত হইয়াছিলাম! পুলিসকে ধাঁধা দিবার জন্য স্বীকার-উক্তিতে প্রায়ই অজানা-অচেনা এমন সব জমীদারপুত্রের নামোল্লেখ করিতাম—যাহাদের ধরা-ছোঁয়াও সহজ নয় এবং বিদ্রোহিতা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু আজকালকার কালে কি যে সম্ভব, কি যে অসম্ভব, তাহা ত বুঝা যায় না। পুলিস মহাজনরা সেই সব কল্পিত সহযোগীদের সন্ধানে শূন্যে ফাঁদ পাতিতে ছাড়িতেন না। একবার কিন্তু সত্য সত্যই বড় অনর্থ ঘটিয়াছিল। শান্তিপুরের জমীদারপুত্র শশধর আমাদের

একজন সহযোগী, এই খবরটা আমি পুলিসকে দিই। অথচ কোথায় যে শান্তিপুর, তাহাও কখন দেখি নাই ;—সেখানে জমীদার আছে কি নাই, তাহার পুত্রই বা কে, তাহাও জানি না। একদিন সত্যসত্যই পুলিস শান্তিপুর হইতে শশধর নামক একটি ছেলেকে আমার নিকট আনিয়া হাজির। এ জমীদারপুত্র নয়, তাহার শ্যালক-পুত্র। তাহাতে কি আসে যায়! শশধর নামও সে ধরে আর স্কুলেও পড়ে। তার ঘরে কংগ্রেসওয়ালার দু' একখানা ছবি, দু'একখানা যুগান্তর, সর্ব্বোপরি গীতার ছোট্ট এডিসন পকেট-বুক দু'একখানাও নাকি পাওয়া গিয়াছে ; প্রমাণ চূড়ান্ত! তবুও আমি কিন্তু তাহাকে চিনিলাম না! ইহার ফলে লাঠির সামান্য গুঁতো খাইয়া সে বেচারা বিদায় লাভ করিল—কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে পীড়নলাভ হইল, তাহা এমনই ভীষণ হইতে ভীষণতর যে, অবশেষে তাহার নিবৃত্তি হইল কোথায়—তাহা আমার মনে নাই। কষ্টে যখন চোখ বুজিলাম, তখন মনে হইল, যমদূত আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া! কিন্তু আমার ত বাঁচিবার সাধ তখনও মিটে নাই! ধরণী কি সুন্দর! পিতার স্নেহ, পিসীমা'র আদর, বয়স্যপ্রীতি, শান্তার ভালবাসা সকলই কি সুন্দর! (পিতা যে লোকান্তরে, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।) সর্ব্বোপরি সুন্দর আমার দেশ। তাহার বন্ধন এখনও ঘুচাইতে পারি নাই,—আমার কাযও ত ফুরায় নাই।

ঐ দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতার উম্মুক্ত অমৃত-ভাণ্ডারদ্বার, দুই পদ অগ্রসর হইবামাত্র ব্যাকুল প্রাণের তৃষ্ণা দূর হইবে, অমৃতপানে জীবন অমর হইয়া উঠিবে,—পারিব না, আমি মরিতে পারিব না, আমার কায এখনও ফুরায় নাই, আমার দেশমাতৃকা এখনও অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা!

চোখ খুলিয়া গেল! এ কি, কোথায় আছি! এ ত আমার সে কারাগৃহ বা পীড়নগৃহও নয়! পুলিসের লোকরাই বা কোথায়? আমি পাশ ফিরিলাম ;—এ কি! কাহার স্নেহময় চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত? কেমিক্যাল সাহেব না? কেমিক্যাল সাহেব আমার কপালে হাত দিয়া আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "ভাল আছ তুমি, নবকুমার?"

"হ্যাঁ ভালই আছি। এখানে কি ক'রে এলুম? আপনি এনেছেন?"

"এ হাসপাতালে। তোমার অসুখ করেছিল—তাই এখানে আছ। আর একটু ভাল হও, তখন বাড়ী যেতে পারবে। তুমি মুক্তি পেয়েছ।"

এ কথায় বিশ্বাস করিতে যেন সাহস হয় না। ক্ষীণকণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে আনন্দ-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মুক্তি পেয়েছি?"

"হ্যাঁ, তুমি মুক্তি পেয়েছ। মিথ্যা-মিথ্যি পুলিস তোমাকে কষ্ট দিয়েছে—নিশ্চয়ই তুমি দোষী নও।"

কেমিক্যাল সাহেবের হাত ধরিয়া আনন্দকৃতজ্ঞতায় বালকের ন্যায়ই আমি কাঁদিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, কেমিক্যাল সাহেবই আমার পক্ষে দাঁড়াইয়া—আমি যে সুচরিত্র—এই প্রমাণে আমাকে পুলিসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

আশ্বিন মাস ; বোধন-বাদ্যের আগমনী-সঙ্গীতে চারিদিক আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—আমি মহাশক্তিকে ভক্তি জানাইতে গিয়া কেমিক্যাল সাহেবের প্রতিই ভক্তিনত হইয়া ভাবিলাম—"যদি ভারতে এইরূপ দশ বিশটাও কেমিকেল সাহেব থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরাজ-রাজ্য আজ প্রেম-রাজ্য হইয়া উঠিত।"

এখন আমি প্রকৃতই good boy, এণ্ট্রেন্স দিবার মানসে আবার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, খুন ডাকাতী যে স্বাধীনতার পথ নয়, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তবুও—! তবুও আমার চিত্ত প্রশান্ত হয় নাই। অধীনতাবন্ধন ছেদন করিবার আকুলতাও এখনও নিবে নাই। যদি সময় আসে, যদি কোন পথি-প্রদর্শক কাম্যফল লাভের উজ্জ্বলতর উৎকৃষ্টতর পথ দেখাইয়া দেন—তবে আমি যে সর্ব্বাগ্রে জীবন-মরণ-পণে পুনরায় তাঁহার নিশানতলে গিয়া দাঁড়াইব, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

কে বলিতে পারে, কেমিক্যাল সাহেবের ন্যায় কোন বিদেশী মহাপুরুষই তাঁহার হস্তের বিশাল মশাল-আলোকে আমাদের অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া তুলিবেন না? হিউম সাহেবও ত ছিলেন বিদেশী!

মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩২৯

কান্তিবাবুর খোসনাম

শ্রীমান কান্তিচন্দ্র নবনামকরণে কবিব্যসন; লাইব্রেরীঘরে বসিয়া তিনি কবিতা লিখিতেছিলেন এবং দুই চারি ছত্র শেষ করিয়া, মনের আনন্দে তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। কবিতাটি অদ্য সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের নবসাহিত্য-সভায় পঠিত হইবে।

"মবি আজ দখিণা হাওয়ায়
কোন কাননেব বিদেশিনী কোন সুরে গান গায়?
কম্পিত থর-থর—পল্লব মর-মর,
হৃদয় হা-হুতাশে করে হায় হায়!
মরি দখিণা হাওয়ায়।
মধুর চাঁদিনী আজি
ফুটেছে ফুলের সাজি
যেন স্তব্ধ ভোজবাজি—
নিশার দিশায়!
মরি দখিণা হাওয়ায়।
আমার প্রাণের ফুলটি কেন—
শুকাইয়ে যায়।
ওরে বাতাস দে রে আশাস
দে রে রঙিন দোল,
মনকে আমার মদির রসে
মাতাইয়ে তোল।
কলি ফুটুক মুঞ্জরিয়া—
অলি উঠুক গুঞ্জরিয়া
নদী ছুটুক কল্লোলিয়া
প্রেমের মমতায়,
মরি দখিণা হাওয়ায়।
আয় বসন্ত আয় রে ভূমা
ছড়িয়ে দে রে রঙ্গে চুমা—
অঙ্গ আঙ্গিনায়,
ছল-ছলিয়ে কল-কলিয়ে
প্রাণের কলস দে ভরিয়ে
কাণায় কাণায়—
মরি দখিণা হাওয়ায়।"

কান্তিচন্দ্রের দক্ষিণ হাওয়ার কবিতা দক্ষিণ হাওয়াতেই কিন্তু মিলাইয়া যায় নাই, আরও একজনের কানের মধ্য দিয়া মরমে পশিতেছিল।

এখন সবেমাত্র বেলা দুইটা, কিন্তু পাশের খালি বাড়ীর মালীমহলে সন্ধ্যাবেলা আজ সুমিত্রা দাসীর নিমন্ত্রণ আছে! সেখানে আজ মালীরা সখের কৃষ্ণযাত্রা করিবে;—নামজাদা

উড়ে কনসার্টওয়ালারাও সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে—তাহারা যাত্রার পর্ব্বে পর্ব্বে হারমোনিয়ম-বেহালাতে গড়ের বাদ্য বাজাইবে, যাত্রা অপেক্ষা ইহা শুনিবার লোভই সুমিত্রার অধিক। তাই আজ বেলাবেলি সান্ধ্যপাট শেষ করিবার অভিপ্রায়ে দাদাবাবুর ঘরের কিরোসিন-বাতিটা সে লইতে আসিয়াছিল। আসিয়া কবিতাপাঠ শুনিয়া—সুমিত্রা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া গেল ; পড়া থামিলে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"বড় ভাল লাগে মোর দাদাবাবুর গান—শুনিকিরি খালি কান্না পায়।" বলিয়া সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুমিত্রা উড়েনী, আধাবয়সী ; কিন্তু সাজসজ্জার আড়ম্বরে বয়সটাকে একান্তই কাঁচাইয়া তুলিয়াছে সে। তাহার খাট চুলের ঝুঁটিটি শাড়ীর ছেঁড়া পাড় দিয়া অতি মনোমোহনরূপে বাঁধা, —দুঃখের বিষয়, এই যত্ন-রচিত কেশ-বিন্যাস তাহার সচরাচর লোকের নজরে পড়ে না —মাথার কাপড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু সীঁতির দুই পাশ হইতে তাহার সম্মুখের কপালের উপর তেল জব-জবে পেটে-পাড়ান চুলের যে বাহার খুলিয়াছে, তদ্দর্শনে বৃদ্ধ কুণ্ডলিমালীর অন্ধ নয়নেও সহসা সৌন্দর্য্যজ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়াছে। সুমিত্রাকে দেখিলেই সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যেও বার বার সেই মনমাতানো রূপ-সজ্জার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারে না। সুমিত্রার পরণে লালপেড়ে শাড়ী, গলায় পুঁথির মালা, কানে সোনার চাকতি, নাকে ঝুঁটা মুক্তার নাকছাবি, হাতে রূপার বাউটি, এতদ্ব্যতীত বাকী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উলকিভূষণে ভূষিত। সহসা সুমিত্রার আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া, চমকিয়া কান্তিচন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুই এলি কোথা থেকে! চলে যা বলছি! আমাকে বিরক্ত করিসনে।" সুমিত্রা দাদাবাবুর বকুনিতে বিন্দুমাত্র না টলিয়া, উল্‌কির উপর রসকলিকাটা 'চেপটা-চোপটা' মুখখানা দেরাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আরসির প্রতিবিম্বে একবার দেখিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "আহা মরি—সীতে ঠাকুরাণী অশোকবনে হায় হায় করুছেন—শুনি বুক ফাটিকিরি উঠিছে।"

কান্তি আবার ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"হাসি হচ্ছে দেখ না, চ'লে যা বলছি এখান থেকে!"

সুমিত্রা দমিবার পাত্রী নয়—বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর করিল, "হাসুচি না দাদাবাবু —কান্নায় মোর বুক ফাটিকিরি যাউছি—হায় রে সীতে ঠাকরুণ, জনমদুখিনী জনক-কন্যে!"

কান্তিচন্দ্র আবার তাহাকে একটা তাড়া দিল—তাড়া খাইয়া সে অনুরোধের স্বরে বলিল—"দাদাবাবু গো, আর একবার গানটি বল না গো।"

এই সময় কান্তির একজন বয়স্য যদি না আসিয়া দেখা দিত, তবে আরও কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ অভিনয় চলিত, কে জানে। নবাগতকে দেখিয়া, ঝুঁটির উপরকার অঞ্চলটা মাথার উপরে আর একটু টানিয়া দিয়া, তেলের বাতিটা মেঝের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। গৃহের বাহিরে গিয়াই এমন অপরূপ স্বরে হাসিয়া উঠিল যে, তাহা হাসি বা কান্না, নিপুণ দার্শনিকই তাহা বলিতে পারেন।

বিনয় কান্তিবাবুর কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া টেবলের কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "লিখছ তা হ'লে? আমি তোমাকে তাড়া দিতে এসেছিলুম—বন্ধু!"

"এসেছ, বেশ করেছ—শোন দেখি একবার—বল দেখি, কেমন লাগে?"

বিনয় বলিল, "একবারে রাত্রেই শোনা যাবে; একটু কায আছে—এখনি যেতে

হবে।” কান্তি চৌকি হইতে উঠিয়া—বন্ধুর হাত ধরিয়া তৈলমলিনতায় প্রতিদ্বন্দ্বিপরায়ণ পাশের চৌকিখানার উপর তাহাকে বসাইয়া বলিল—“ছোট্ট কবিতা, বেশী সময় যাবে না, শুনতেই হবে বিনদা? যদি তোমার ভাল লাগে, তবেই কমপিটিসনে যেতে মন যাবে।”

কবিতাটি সে সুরে-লয়ে-তানে আবৃত্তি করিয়া বন্ধুবরকে শুনাইল। শুনিয়া বিনয় মাথা নাড়িয়া প্রশংসিতদৃষ্টিতে কহিল, “হ্যাঁ, হয়েছে ভাল, ছন্দটা ঠিক যেন রবিবাবুর—আর অনেক কথাও এর মধ্যে তাঁর.—অথচ ঠিক অনুকরণও নয়—আজ সভা থেকে নিশ্চয়ই তুমি উপাধিভূষিত হবে। ভাল কথা, ভারতলক্ষ্মীর বিজ্ঞাপনটা কি দেখেছ?”

“না, সময় কই? কাগজখানাও ত আমি এখনও পাইনি।”

“প’ড়ে দেখিস তবে সুবিধামত। রেখে যাচ্ছি কাগজখানা—আমি এখন চল্লুম।”

বিনয় চলিয়া গেল, সগর্ব্বে সানন্দে কান্তি আর একবার কবিতাটা পড়িল—তাহার পর খাতাখানা যথাস্থানে রাখিয়া বলিল, “আচ্ছা, এইবার দেখা যাক, কি খুঁৎ ধরেন আমার বিদুষী ভগিনী,—তাঁর কাছ থেকে ত একদিনও একটু মনখোলা প্রশংসা পেলুম না। এণ্ট্রেন্স পাশ করেছেন তিনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে, এই গরবেই গেলেন—প্রশংসা যা কিছু সব যেন তাঁরই প্রাপ্য। আরে, কবিতা লেখা—আর পাশ করা কি এক কথা না কি? পাশ হচ্ছে ত লাখো লোক—আর কবিতা লিখতে পারে ক’জন। তিনিও কবিতা লিখতে সুরু করছেন—তা যদিও বুঝতে পেরেছি—ছেঁড়াখোড়া দু’ একটা কাগজের টুকরতে তার নমুনা পাওয়া গেছে, ভাঙ্গা টুকরিতে স্থান পাবারই তা জিনিষ বটে। যা হ’ক, এটা যদি ভাল না বলে ত নিশ্চয় বুঝব jealousy—সেরেফ jealousy! তা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।”

শান্তির বিধবা মাতা শান্তিকে লইয়া ভ্রাতার বাড়ীতেই থাকেন। কান্তিচন্দ্র শান্তির মামাতো ভাই। উভয়ে প্রায় একই বয়সী, কান্তি বছরখানেকের মাত্র বড়। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়াছিল দুইজনে একই সঙ্গে, কিন্তু শান্তি পাশ হইল প্রথম বিভাগে—আর কান্তিচন্দ্র টায়টোয়ে দুই চার নম্বর গ্রেসে—থার্ড ডিভিসনে পাশ-নাম রক্ষা করিল। পরীক্ষকদিগের একান্ত পক্ষপাতিতাবশতঃই যে এমনটা হইল, মেয়ে বলিয়াই যে শান্তি তাঁহাদের নেকনজরে পড়িয়াছে, ইহাতে কান্তিচন্দ্রের বা তাহার বন্ধুগণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই উপলক্ষে কিছুকাল ধরিয়া প্রত্যেক পরীক্ষকের আদ্যশ্রাদ্ধের আলোচনায় কান্তিচন্দ্রের মজলিসঘরটি বেশ সরগরম হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার পর কান্তিবাবু যখন শুনিলেন, শান্তি এল্-এ পরীক্ষায় দাঁড়াইবারও সঙ্কল্প করিতেছে, তখন তাঁহার মন এতই খারাপ হইয়া গেল যে, বন্ধুদিগের খাস মজলিস এবং খোসগল্প কিছুই আর তাঁহাকে খুসী করিতে পারিল না। বে-ইজ্জৎ হইবার ভয়ে, স্কুল-কলেজের সহিত সম্পর্ক উঠাইয়া—গান্ধী মহারাজের জয়গানে মাতিয়া তিনি নন্‌কো-নিশান ধরিলেন।

পিতা অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, “গান্ধী মহারাজার জয়গান গাচ্ছিস—গা বাবা, বেশ ; আমরাও ত গাচ্ছি—বিশ্বসংসারসুদ্ধ সবাই গাচ্ছে, কিন্তু স্কুল-কলেজ ছাড়বি কেন

বাবা, সেজন্য, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকবি!"

ছেলে উত্তর করিল, "গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকা ত আমার উদ্দেশ্য না,—পড়াশুনা আমি ঘরেই করব, পরীক্ষা না দিলে কি আর লোকে বিদ্বান্ হয় না? রবিবাবু ত এত বড় বিদ্বান লোক, তিনি ক'টা পাশ করেছেন, বলুন ত?"

কান্তিচন্দ্র পিতা-মাতার সবেধন নীলমণি! কি জানি, বেশী পীড়াপীড়ি করিলে যদি বা সে বিবাগীই হইয়া যায়, অতএব আর উচ্চবাচ্য না করিয়া ছেলের পড়ার জন্য ঘরে মাষ্টার রাখিয়া দিয়াই তিনি মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিলেন।

এ দিকে দৈবনির্ব্বন্ধে, শান্তির ভাগ্যবলে,—হইতে পারে কান্তিরও অদৃষ্টজোরে—হঠাৎ শান্তির একটি ভাল বর জুটিয়া গেল, ফলে পাশের সংকল্পে তাহার এইখানেই ইতি পড়িল। কান্তিচন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন! ননকোর কৈফিয়ৎ যতই টানুন না, তিনি বি-এ এম্-এ-ধারী বোনের পাশে এণ্ট্রেন্স পাশ ভাই! কথাটা এমন বিশ্রী শুনাইত! এ খর্ব্বতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া বন্ধুদের লইয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়া সে একদিন পিকনিক করিয়া আসিল।

পাশের পড়া ছাড়িল বলিয়া শান্তি কিন্তু লিখাপড়া ছাড়িল না। বিবাহের অল্পদিন পরেই ইঞ্জিনিয়ার হইবার মানসে স্বামী বিলাতে চলিয়া গেলেন—আর শান্তি স্বামীর মনের মত হইবার মানসে ঘরে বসিয়া যথাসম্ভব বিদ্যাবুদ্ধির পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইল। ছেলেবেলা হইতেই শান্তির গল্প-কবিতা লিখার দিকে ঝোঁক ছিল, যত্ন-পরিশ্রমে তাহার রচনা-প্রতিভা দিব্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটি গল্প-কবিতা বেনামা সহীতে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট সে পাঠাইয়া দিত এবং পরে আনন্দ-বিস্ময়ে দেখিত, কোন কোনটি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এ খবর কিন্তু শান্তি কান্তিবাবুকে কোনদিন জানায় নাই, কারণ, সে জানিত—দাদা এ কথা শুনিলে সন্তুষ্ট হইবেন না। হইলে কি হয়—সত্যের মহিমা স্বতঃ-প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুই একখানা ছেঁড়া কাগজের টুকরা কান্তিবাবুর হাতে আসিয়া পড়ায় তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন,—মাথা নাড়িয়া ভাবিলেন, "শান্তি দেখছি পরীক্ষার পড়া ছেড়ে চুপচাপ ব'সে নাই—ভিতরে ভিতরে একটা কাণ্ডকারখানা বাধাবার চেষ্টায় আছে। যাক্, এ ক্ষেত্রে আমাকে হার মানাতে পারবে না। দেখা যাক, তার বিদ্যার কত দৌড়।"

কান্তিচন্দ্রও স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন, এবার রীতিমত উদ্যমে লিখা আরম্ভ করিলেন। রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থে তার সেলফ, আলমারি ভরিয়া গেল এবং অবিলম্বে সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা হইল। তাহার পিতা ভাবিলেন, নন্‌কো দলে মিশিয়া পিকেটিং করিয়া কোন্‌দিন ছেলে জেলে যাইত—তাহার অপেক্ষা ইহা ভালই হইয়াছে'। কাশীরামের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ তিনি এই সভায় দান করিলেন।

শান্তি তাহার লিখার কথা দাদার কাছে প্রকাশ করে নাই, কিন্তু কান্তি কবিতা লিখিয়াই সগর্ব্বে বোনকে শুনাইতে আসিত। এ ক্ষেত্রে যশোলাভের প্রত্যাশা সে বড় একটা করিত না; জানিত, এ বড় কঠিন ঠাঁই, কিন্তু শেলি বায়রণের ন্যায় তাহার কবিত্ব-প্রতিভা যে সমালোচনা এবং সমালোচকের বহু উর্দ্ধে, নিন্দা-প্রশংসার অতীত অমরশক্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত, ইহাই সে শান্তিকে অনুভব করাইতে আসিত।

কান্তি যখন শান্তির ঘরে ঢুকিল, তখন সে লিখিতেছিল। কান্তিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলা দেরাজবন্দী করিল—কিন্তু দীর্ঘ কাগজের লিখা পৃষ্ঠাটা কান্তির নজর এড়াইল না। কান্তি হাসিয়া বলিল, "কি লিখা হচ্ছিল। আমাকে দেখেই অমনি ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়! কা'ল বুঝি মেল-ডে?"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "সে খবরটাও ত রাখ দেখছি।"

কান্তি বলিল, "তোর জন্যে রাখিনে—আমার টিটবিটটা আসে যে। কিন্তু কাল মেল আসবে—মেল যাবে ত সেই পরশু। বাস রে, কি বড় বড় চিঠি। ফেল করাবি দেখছি তুই জামাইবাবুকে। কি যে মাথামুণ্ডু এত লিখিস, আমি ত ভেবেই পাইনে।"

"আচ্ছা, তোমার সময় আসুক না, দেখা যাবে তখন তুমি কি কর।"

"আমাকে এমন fool পাসনি। সে সময়টা কবিতা লিখলে আমার পরকালের কায হবে। একটা নতুন কবিতা লিখেছি—শোন দেখি!" ভাবসহযোগে কবিতা পাঠ করিয়া শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগলো?"

শান্তি বলিল, "বেশ।"

অপ্রত্যাশিতভাবেও কান্তি এই উত্তরই প্রত্যাশা করিতেছিল। শান্তি ঠেকিয়া শিখিয়াছে, দাদার কবিতার প্রশংসা করিতে পারে না—তাই দাদা এমন চটিয়াছে তাহার উপর যে, লাইব্রেরীর বই একখানা চাহিয়া আর সে পায় না। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, অতএব আজ আর সে অপ্রিয় সত্য কথা কহিল না; আরও এক কথা, তাহার পূর্ব্বের কবিতা হইতে ইহা অনেক ভাল।

কান্তি শান্তির প্রশংসালাভে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "বিনয়েরও এ কবিতাটা খুব ভাল লেগেছে।"

"সেই আসল কথা। আমি আর সত্যি কবিতার মর্ম্ম কি বুঝি। শুনে কি বল্লে বিনয়?"

"সে ত একেবারে মসগুল! বল্লে, ঠিক যেন রবিবাবুর কবিতাই সে শুনছে।"

এতটা বাড়াবাড়ি শান্তির সহ্য হইল না; বলিয়া ফেলিল, "তোমরা দশে মিলে দেখছি রবিবাবুর অস্তিত্বটাই লোপ ক'রে ফেলবে।"

কান্তি কিন্তু এ কথায় রাগ না করিয়া প্রসন্নমুখেই বলিল, "কি যে বলিস? তাঁর অনুকরণে তাঁকে ত আমরা বাড়িয়েই তুলছি।"

"তা সত্য! কাকের রব নইলে ত সূর্য্য প্রকাশ হয় না। আচ্ছা, তোমার সে কবিতাটা 'ভারতী' কি নিয়েছে!"

"ভারতী? সে হ'ল মেয়ের কাগজ, হাড়হদ্দ পক্ষপাতী! যদি তোর নাম দিয়ে দিতুম, তা হ'লে হয়ত বা নিত।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "কোনও এক সময়ে মেয়ের কাগজ ছিল বটে 'ভারতী', কিন্তু এখন ত তোমার স্বজাতিরাই 'ভারতী'র সম্পাদক।"

"আমার স্বজাতিদের ত বিজাতির প্রতি আরও বেশী মায়া, 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় আমাদের আশা-ভরসা বড়ই কম।" বলিতে বলিতে কান্তির হাতের কাগজখানা হঠাৎ

নীচে পড়িয়া গেল, সে তুলিতে গিয়া দেখিল—আরও একখানা কাগজ সেখানে পড়িয়া আছে। শান্তির খাতা হইতে সেখানা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, শান্তি তাহা লক্ষ্য করে নাই। কাগজখানা হাতে লইয়া কান্তি বলিল, "এও যে কবিতা, তুইও দেখছি আমার দেখাদেখি কবিতা লিখতে ধরেছিস—তা ভাল।"

শান্তি অনুনয় করিয়া কাগজখানা ফিরিয়া চাহিল, কান্তি না দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"সত্য কহি সখি সত্য কহি,
চঞ্চল বায়ু আমি চপল নহি।
আমি—ভালবাসি ভালবাসাতে
ভালবাসি সবে হাসাতে
পুলক রঙ্গে ভাসাতে
আমি অধীরে বহি।
আমি কাহারও দুঃখ ভুলি না,
কাহারে কভু ত ছলি না,
কুসুমে ফোটাই গন্ধে
পাখীরে ডাকাই ছন্দে
তরঙ্গে নাচায়ে তটিনী
রসেতে ভরায়ে ধরণী
প্রমোদমত্ত রহি।
আমি প্রেমের নিপুণ সারথি,
চির-কৈশোরে চির-নিপুণগতি।
যৌবন-মদ-রঙ্গে, বরণ ফুটায়ে অঙ্গে
মিলনে বিরহ আনিয়া
সুখেতে দুঃখ টানিয়া
জীবন স্বপনে মোহি
কৌতুক-নট আমি কপট নহি।
সখি কপট নহি।"

পড়িয়া কান্তি বলিয়া উঠিল, "ভারী মজা ত। আমরা দু'জনেই লিখেছি বাতাসের কবিতা। আচ্ছা, মজা করবি একটু, ভাই?"

"কি মজা?"

"তোরটা আমার নামে—আর আমারটা তোর নামে 'ভারতী'তে পাঠান যাক—দেখ, কোনটা তাঁরা নেন? নামের মাহাত্ম্যে তারা চলে কি না, এতেই বুঝতে পারবি।"

"বেশ! আমার তাতে আপত্তি নেই।"

রাত্রিতে সাহিত্যসভায় দুই কবিতাই কান্তি তাহার বলিয়া পাঠ করিল। সভায় বাহ্‌বা রব পড়িয়া গেল এবং সাহিত্যিকরা মিলিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন, অমৃতাম্বুজনিধি কবিব্যসন।

৩

'ভারতলক্ষ্মী' কাগজে কান্তি বিজ্ঞাপন দেখিল—একটি ভাল গল্পের জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার!

এত দিন সে কবিতাই লিখিতেছিল—এইবার সে গল্প লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। শুধু কবিতা লিখিয়া বাহিরে সে সাহিত্যিক নাম লাভ করিতে পারিবে না—গল্পও লিখিতে হইবে, ইহা সে বুঝিল। কিন্তু গল্প লিখিতে বসিয়া সে দেখিল, কবিতা লিখা তাহার পক্ষে যতটা সহজ, গল্প লিখাটা সে রকম নয়। প্লটগুলি মাথায় যেমন আসে, কাগজে কলমে লিখিতে গেলেই অন্যরকম হইয়া যায়, একের মুণ্ডু অন্যের ধরে গিয়া পড়ে। অনেক কষ্টে একটি গল্প শেষ করিয়া সে বিনয়কে শুনাইল; কিন্তু এ হেন বন্ধু বিনয়—যে তাহার কবিতা চোখ বুজিয়া শুনিয়া আহা উহু করে; সেও কিন্তু আজ কান্তির গল্পের প্রশংসা করিতে পারিল না। অগত্যা কান্তি আর একটা লিখিল, খ্যাতনামা লেখকদিগের রচনাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া নিজের আখ্যানটি কোনরকমে সাজাইয়া তুলিল। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, শান্তি যদি গল্পটি দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনের মত করিয়া লিখিয়া দেয়—তবে ইহার শ্রী ফিরিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ত শান্তির কাছে ন্যূনতা স্বীকার করিতে হয়! তবে দায়ে পড়িয়া মানুষ কি না করে! অনিচ্ছাসত্ত্বেও গল্পটা হাতে লইয়া সে শান্তির ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, শান্তি ঘরে নাই—টেবলের উপর তাহার অসমাপ্ত একখানা চিঠি পড়িয়া আছে। বুঝিল—লিখিতে লিখিতে সে কোথাও গিয়াছে, এখনি আসিবে। চিঠিটা সে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"প্রিয়তম—"

এ কি রকম সম্বোধন? বন্ধু বিনয় তার স্ত্রীর নিকট হইতে যে সব চিঠি পায়—তাহাতে সম্বোধনের কি চমৎকার ঘটা।—প্রাণ আমার, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, হৃদয়সর্ব্বস্ব, এইরূপ কত অপরূপ মনমাতান ডাকে ভরা সে চিঠি! আর শান্তি লিখিতেছে শুধু—ছোট্ট একটি প্রিয়তম শব্দ! "ছি!" নিমেষের মধ্যে এইরূপ ভাবিয়া লইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"প্রতি সপ্তাহে তোমার চিঠিখানির জন্য কিরূপ আকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকি, তা কি বুঝতে পার না তুমি? নিশ্চয়ই তা পার না। পারলে হাজার কাযের মধ্যেও একটু সময় ক'রে নিয়ে দু'লাইনও লিখতে। কেন বল দেখি, গত মেলে চিঠি পেলুম না? অসুখ করেনি ত? কত রকম ভাবনাই যে হচ্ছে। আসছে মেলে যদি চিঠি না পাই ত কি যে করব জানি না। মিস ক্রিষ্টিকে তা হ'লে চিঠি লিখব। হয় ত বা তার সঙ্গেই তুমি আমোদ ক'রে কোথাও বেড়াতে গেছ—আর আমি এ দিকে ভেবে মরছি। তা যদি শুনি, তা হ'লে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব।

"আগের চিঠিতে লিখেছিলে, টাকার টানাটানি পড়েছে তোমার। বাড়ী থেকে যত টাকা পাবার আশা করেছিলে, তা পাওনি। টাকা পেলে কি না, জানার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে আছি। আমি যদি তোমাকে এ সময় কিছু পাঠাতে পারতুম! বার বার সেই কথাই ভাবছি। ভাবছি শুধু তা নয়—প্রাণপণ চেষ্টাও করছি।

"আমার ছোট গল্পগুলি সংগ্রহ ক'রে পাঠালে 'বসুমতী' ছাপতে রাজি আছেন, কিন্তু

তার সঙ্গে দু' একটা নতুন গল্পও দিতে হবে! একটা শেষ ক'রে ফেলেছি। আজ রাতে দু'টা পরিচ্ছেদ লিখে ফেলতে পারলে আরও একটা শেষ হয়ে যাবে। আমি তা হ'লে কালই সমস্তগুলা একসঙ্গে ডাকে দিতে পারব। গল্পগুলা পেলেই তাঁরা আমাকে তিনশ টাকা পাঠাবেন বলেছেন। তোমার জন্মদিনে শ্রীচরণে সে উপহার গিয়ে পৌঁছবে। ভাবতেও এত আনন্দ হচ্ছে।

"ভাল কথা, 'ভারতী'খানা পেয়েছ কি না, লিখলে না ত? তোমার কেমন লাগলো, জানবার জন্য আমি যে এ দিকে ছটফট করছি—"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া পিয়নের হাঁকে তাড়াতাড়ি শান্তি নীচে মেল-চিঠি আনিতে গিয়াছিল। পদশব্দ শুনিয়া, সে গৃহে ফিরিবার আগেই কান্তি সরিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে ভাবিল—"বাহা রে মেয়ে! তলে তলে কত কাণ্ডই করছ তুমি,—পুরুষদের হার মানালে দেখছি! এবার আমাদেরই হাতাবেড়ি নিয়ে রান্না-ঘরে গিয়ে বসতে হবে—আর তোমরা নিখিল কাব্যের ম্যানেজারি করবে। সেটি কিন্তু হঠাৎ করতে দিচ্ছিনে, ঠাকরুণ।"

"ও সুমিত্রা, বলি ও সুমিত্রারাণি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

সুমিত্রা দাদাবাবুর এই আদরের ডাকে গলিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল—"দিদিমণির চিঠিপত্র ডাকে দিতে যাউছি, দাদাবাবু।"

"কি চিঠিপত্র দেখি।" এই বলিয়া সুমিত্রার হাতের কাগজপত্রগুলা কান্তি নিজের হাতে উঠাইয়া লইল।

সুমিত্রা ফিস ফিস করিয়া বলিল—"দিদিমণি রাগ করবে দাদাবাবু, বলো না—তুমি দেখিছ চিঠিপত্তর।"

"তা কেন বলব; সুমিত্রারাণীকে কি আমি বকুনি খাওয়াতে পারি।"

গল্পগুলি হাতে পাইয়া কান্তির হৃদয় আশানন্দে কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল, "তা তুমি আর কেন যাবে, আমিই ত ডাকঘরে যাচ্ছি—অমনি এগুলোও ডাকে দিয়ে দেব।"

"তা দিও দাদাবাবু, দিদিমণিকে বলিব, মুই ডাকে দিউছি। মালী ডাকুছি কেন, শুনিকিরি আসি।"

কম্পাউণ্ড হইতে ঘরে আসিবার সময় কান্তি আকাশপথে চিঁহি চিঁহি কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিল। উপরে চাহিয়া দেখিল, উড়ন্ত চিলের মুখে একটা মুরগির বাচ্ছা! তাহার বক্ষে একটা করুণ কম্পন উঠিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা মিলাইয়া গেল!

শান্তি হা-প্রত্যাশা করিয়া দিন গণিতে লাগিল, সপ্তাহ কাটিল—মাস যায়, কই, 'বসুমতী'র নিকট হইতে ত কোন উত্তর পাওয়া গেল না। স্বামীর জন্মদিন আসিতেও ত আর বেশী বিলম্ব নাই—শান্তি সম্পাদককে আর একখানি পত্র লিখিল। উত্তর আসিল—লেখিকা শান্তিবালার কোন গল্পই আফিসে পৌঁছে নাই। শান্তির বুকের পাঁজরখানা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিছুদিন পরে ভারতলক্ষ্মীতে প্রকাশিত "চৌর্য্য-মাহাত্ম্য" নামে একটি গল্পের

প্রশংসা নানা কাগজে বাহির হইতে লাগিল। আর কোন গল্প যদি লেখক নাও লিখেন —এই গল্পটিতেই তিনি সাহিত্যজগতে অমর নাম লাভ করিবেন, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছে। ভারতলক্ষ্মী একখানা কিনিয়া শান্তি গল্পটি পড়িল, এ কি! এ যে তাহারই গল্প, কেবল নামের বদল—এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটা কথার পরিবর্ত্তন।—লেখক স্বনামধন্য শ্রীকমলাকান্ত মর্ম্মমস্থিত অমৃতাম্বুজকণ্ঠ কবিব্যসন।

মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩০

তিনটি দৃশ্য

কর্ণবেধের নিমন্ত্রণ! নহবতে ভৈরবীর আলাপ শুনিতে শুনিতে দালানে উঠিলাম ; উঠিয়া দেখিলাম, মেয়েকে কলাতলায় বসাইয়া একজন রমণী তাহার কাণ বিঁধিতেছেন ; অন্য সকলে তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উৎসবের দিনে এরূপ চুপচাপে কার্য্য সম্পন্ন কিছু নূতন বলিয়া ঠেকিল। মেয়েটি ৬/৭ বৎসরের হইবে। তাহার ক্ষুদ্র মুখে প্রকাণ্ড গাম্ভীর্য্য। কাণ বিঁধান হইয়া গেলে রমণী যখন মাকড়ী দুইটা কাণের এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও মেয়ে টুঁ-শব্দ করিল না। কন্যার মাতা এতক্ষণ একটু আড়ালে ছিলেন, নাপিত আসিয়া রমণীর পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া মাকড়ীর আঁকড়া দুইটা আটকাইয়া দিবার পর তিনি আসিয়া মমতাপূর্ণ চিত্তে মেয়ের কাণে জল দিতে লাগিলেন। মেয়ের চোখ দিয়া তখনও এক ফোঁটা জল পড়িল না। সে বীর-নারীর ন্যায় ধীর, মৌনভাবে সময়োচিত গুরুত্ব রক্ষা করিল। ইহার পর হুলুধ্বনি বাদ্যধ্বনির মধ্যে মাতা তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া মাথায় মুকুট পরাইয়া বরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার কচি মুখে যে প্রফুল্লভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহার মধ্যেও কিন্তু মেঘ-চাপা বজ্রের মত প্রচ্ছন্ন আত্মসম্মানের মস্ত একটা আভাস পাওয়া যাইতেছিল। দেখিয়া মনে হইল, মুকুট ধারণের দিন কুইন ভিক্টোরিয়াও বুঝি এ হেন তেজোদৃপ্ত ভাব ধারণ করিতে পারেন নাই।

আমার মনে পড়িয়া গেল, বন্ধুবর মিত্র মহাশয়ের কথা। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তাজ্জব কি, তিনি অসঙ্কোচে বলিয়া উঠেন, "বাঙ্গালীর মেয়ে। এই দেখ না, একজন কুলবধূ—সাত চড়ে যার মুখে রা বাহির হয় না, আধ হাত ঘোমটা টানিয়া ষ্টেশনের পথে চলিতে চলিতে যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে পথ হারাইয়া বসেন, স্বামী বিলাত হইতে ফিরিতে না ফিরিতে তাঁহার পূর্ব্বের এত লজ্জা-সরম চলিয়া গেল কোথায়? তিনি এখন পরিপূর্ণ মেমসাহেব। স্বামীকে পাশে বসাইয়া নিজে টমটম হাঁকাইয়া চলেন ; ইংরাজী বোলচালে ডিক্রীধারী পুরুষকেও হারাইয়া দেন।

"কেবল বালিকা বধূ কেন, সেদিন দেখিলাম, পঞ্চাশ বছরের এক বর্ষিয়সী, শিবপূজা না করিয়া যিনি জলগ্রহণ করিতেন না, মেম দেখিলে অস্পৃশ্য বস্তু বিবেচনায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আট হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন, আজ তিনি অসঙ্কোচে স্বামীর সহিত বিলাতযাত্রা করিলেন। পূজা ছাড়িলেন, গাউন ধরিলেন, টেবলে বসিয়া খানা খাইতে সুরু করিয়া দিলেন। ইহাকে তাজ্জব ব্যাপার বলিব না ত কি?"

মিত্র মহাশয়ের সেই কথা আজ আমার নেহাৎ বেঠিক বলিয়া মনে হইল না। এমন ছোট মুখে এত বড় গুরুগম্ভীর ভাব অন্য কোনও দেশে কেহ দেখিয়াছে কি?

মেয়েটির নাম ধনিষ্ঠা। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, গণৎকার তাহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। মাতা ও দিদিমার ইহাতে গর্ব্বের সীমা রহিল না। দিদিমা ভাবিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন। মাতা কল্পনার মানসপটে

রাজপুত্র জামাতার ছবি আঁকিতে লাগিলেন। কন্যা দুগ্ধ পান করিতে করিতে যখন তখন অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে 'দেয়ালা' করিয়া হাসিয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে, মাতা ইহাতে ভীত হইয়া স্বামীকে এই কথা জানাইলেন। স্বামী স্বল্পবেতনের কেরাণী। বাড়ীর মধ্যে কেবল তাঁহারই কন্যালাভের আনন্দে মস্তিষ্ক বিকল হয় নাই। বরঞ্চ বিপরীত। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কন্যা পার করিবার চিন্তাতেই বিব্রত—এমন কি, পৈতৃক ভিটাখানির দিকে চাহিয়া যখন তখন তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। হায় রে! সবেধন নীলমণি এই সম্পত্তিটুকু কন্যাদায়ে কোন দিন না বাঁধা পড়িয়া যায়! স্ত্রীর কথায় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া দ্রুতপদে তিনি আফিসে চলিয়া গেলেন। আমি সখীর মর্ম্মবেদনা শুনিয়া গণক ঠাকুরকে ডাকাইয়া স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিলাম। সুফল ফলিল—মাতার কল্পনা সফল হইল। ১২ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে বংশীপুরের রাজবংশীয় জমীদারপুত্রের সহিত ধনিষ্ঠার সম্বন্ধ হইল। পিতা অগাধ ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহারা টাকা চাহেন না, কুল করিবার অভিপ্রায়ে বিনা পণে শুধু মেয়েটি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

ইনি রাজপুত্র না হইলেও রাজভ্রাতার পুত্র—তাঁহার নিজ বাড়ীতে চাকররা তাঁহাকে 'কুমার' বলিয়াই ডাকে; সুতরাং শ্বশুরবাড়ীর লোকরা যে গর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে রাজা জামাই বলিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

আমরা থাকি বাঁকীপুরে। আমার স্বামী তথাকার প্রোফেসর। কর্ণবেধের ৬ বৎসর পরে আবার ধনিষ্ঠার বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইলাম। স্বামী আসিতে পারিলেন না; আমি আহারাদি শেষ করিয়া ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া ট্রেনে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ও মা, গাড়ীতে উঠিবার সময় শুনি, আমার আদুরে গোপালী ধনুর্দ্ধারী দাসীটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সে এই দেশেরই লোক, দেশ সুদ্ধ তাহার সাঙ্গাৎ সাঙ্গাতনী; বুঝিলাম, তাহাদের নিকট বিদায় লইতে গিয়া চোখের জলের আঁধারে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে আমার পেয়ারের দাসী। তাহাকে ছাড়িয়া এক পা চলিতে আমি নারাজ; সুতরাং পোঁটলা-পুঁটলী গাড়ীতে উঠাইবার পর "ভোজিয়া কাঁহা রে, ভোজিয়া কাঁহা" এইরূপ একটা হৈ-চৈ রব পড়িয়া গেল। ইহার প্রায় ঝাড়া ১৫ মিনিট পরে আদরে গরবে হেলিতে দুলিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভোজিয়া আসিয়া দেখা দিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠিয়া আমার পদতলে বসিল। আমি তখন এতক্ষণকার জমা রাগের ঝাল তাহার উপর বর্ষণ করিতে লাগিলাম, সে কিন্তু কথাটি না কহিয়া মৌনভাবে আমার পা টিপিতে লাগিল। বকুনীতে কখনও সে কথা কহে না, এই গুণেই আমি তাহার বশ।

দ্রুতবেগে কোচম্যান গাড়ী চালাইয়াও যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌছিতে পারিল না, ফলে ট্রেন মিস করিলাম। সুতরাং আমার ভাগ্যে বিবাহ দেখা আর ঘটিল না। পরদিন রওনা হইয়া বাসিবিবাহের দিন বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

২

এমন জাঁকজমক কখন দেখি নাই—কখনও দেখিব না! কি সে দুই ধারে বাঁধা রোশনাই—কিবা ময়ূরপঙ্খীর উপর নাচ-গান—কি সে শোভাযাত্রা—কত বা প্রাণ-মাতান গড়ের বাদ্যি। বরসজ্জাই বা কি অপরূপ! চতুর্দ্দোলার উপর রাজপোষাক-পরা মণিমাণিক্যে মোড়া

বর—দেখিলে মরি মরি, চোখ আর ফিরান যায় না! "দিদিমণির কি জোর বরাত গা!" দেউড়ীতে ঢুকিতে না ঢুকিতে এইরূপ বর্ণনা আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতে লাগিল— আর আপশোষে আমার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়—হায়! এমন ঘটার বিবাহ কি না আমি দেখিতে পাইলাম না! মনে মনে ভোজিয়াকে অভিসম্পাত করিতে করিতে উপরে উঠিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া কিন্তু বর-দর্শনে এই আপশোষের জ্বালা ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। বরের বর্ণ যদিও একটু মলিন, কিন্তু মুখশ্রী প্রিয়দর্শন এবং রাজপুত্রের মত পোষাকে, হীরা-মুক্তার আভরণে সাজিয়া তাহাকে রূপকথার রাজপুত্রের মতই দেখাইতেছিল। বরকন্যাকে মসলন্দের আসনে বসাইয়া মেয়ের দল তখন তাহাদিগকে ভাঁড় খেলাইতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রসিকতার ফোয়ারা ছুটিতেছিল। একজন রসিকা গান করিতেছিলেন :

রসিক জামাই বটে দিদি রসিক জামাই বটে!
কাণ মল্‌লেই নৃত্য করেন
হার মেনে যায় নটে।
হায় রে, হার মেনে যায় নটে!
শুনলে তাহার রসের কথা,
বুকে বাজে শেলের ব্যথা,
গানের তানে কুত্তা কাঁদে শিয়াল বনে ছোটে॥
গাধার বাচ্ছা খোস মেজাজে,
লাফিয়ে ওঠে পথের মাঝে,
রজক গুঁপোর দেহ কুঁপো কাদার উপর লোটে।
সাবাস জামাই বলিহারি রঙমহালে রটে॥

আমি পাশে দাঁড়াইয়া আনন্দিতচিত্তে এই সকল দেখিতেছিলাম, এমন সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল, "ওগো, রাজবাড়ী থেকে কুমার বাহাদুর ও বৌরাণী এসেছেন, দিদিমণিকে নিতে।" ইহা শুনিয়া ধনিষ্ঠার মাতার সহিত আমিও দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলাম। ধনিষ্ঠার পিতা তখন কুমার বাহাদুরকে গাড়ী হইতে নামাইয়া উপরে লইয়া গেলেন আর লাল ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কীখানি অন্দরের উঠানে আসিয়া নামিল। সঙ্গের আসাসোটাধারী পেয়াদা দুইজন দাসীকে পাল্কীর নিকটে রাখিয়া সরিয়া গেল। আমরা বৌরাণীকে সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া উপরে লইয়া আসিলাম। দাসী দুইজনের মধ্যে একজনের হাতে জরীর ঝালরযুক্ত পাখা ও সোনার পানের পাটা। অন্যজনের হাতে দুইটা হাতীর দাঁতের বাক্স। বৌরাণী ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বর রেহাই পাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমরা কণেকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার আভরণ-সজ্জা দেখিতে লাগিলাম। বাক্‌সের মধ্যে ডালার ভিতর ডালা ; ক্রমশঃ ডালা নামাইয়া বৌরাণী গহনা বাহির করিতে লাগিলেন। হীরা-জহরতের আভায় ঘর যেন ঝকমকিয়া উঠিল, মুকুট, ঝাপটা, কাণ, কর্ণফুল, তাবিজ, বাজুবন্ধ, খাড়ু, কণ্ঠী, চিক্‌ বালা, চূড়, রতনচক্র, চরণচক্র, আরও কত যে কি, বলিতে লজ্জা করে —সে সবের নামও জানি না। সাত রাজার ধন মণিমাণিক্য যেন এই দুইটা বাক্সের ভিতর বন্দী হইয়া আসিয়াছে! এইরূপ আভরণ-সজ্জিতা ধনিষ্ঠাকে দেখিয়া

সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, আজ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-দর্শন হইল! মাতা আনন্দে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। কিন্তু দিদিমা সেকেলে মানুষ, তিনি এত আনন্দ নীরবে সহিতে পারিলেন না। নিজের পেট চাপড়াইয়া মেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওরে বিরাজ, মোর কোঁক আর তোর কোঁক, তোর কোঁক আর মোর কোঁক।"

এইরূপ নিরতিশয় আনন্দের মধ্যে আমার মন সহসা যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিষণ্ন হইয়া পড়িল। রত্নাভরণ-সজ্জিতা ধনিষ্ঠাকে দেখিয়া রূপকথার সেই প্রবাদটি মনে পড়িয়া গেল—"পর পর মা, গয়না পর।" কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাবটা মন হইতে দূর হইয়া গেল—নহবতের তান শুনিতে শুনিতে ছেলে-মেয়ে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে আমরা ননদের বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। আসিবামাত্র মেয়েটি যে মন্তব্য প্রকাশ করিল, তাহাতে আমার পূর্ব্বচিন্তার একটা ধারা দেখিতে পাইয়া মনটা আবার একটু যেন দমিয়া গেল।

ঠাকুরঝি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে ফুলি, কেমন বর দেখ্‌লি? তোর মনে ধরেছে ত?"

ফুলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া উঠিল, "পিসীমা, আমি কখ্‌খনো বিয়ে করবো না।"

ঠাকুরঝি হাসিয়া বলিলেন, "কেন রে, কি হয়েছে?"

মেয়ে বলিল, "বাপ রে, আমি অত গয়না পরতে পারব না। কি বিশ্রী।"

আমি মনে মনে বলিলাম, এরই মধ্যে মেয়ের একালের হাওয়া লাগিল যে। আমার ছেলেটি পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে গম্ভীর মুখে বলিল, "ইস্! গয়না পরবে না! পেলে ত! তোমার ত আর রাজপুত্তুর বর আসছে না?" বলিয়া সে মসমস্ করিয়া চলিয়া গেল। ফুলি কাঁদিয়া বলিল, "মা, দাদা কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।" ঠাকুরঝি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোর দাদাকে খুব বকে দেব এখন, তুই কাঁদিসনি। তোকে আর ভারী গয়না পরতে হবে না, এবার তোর জন্মদিনে খুব সরু দু'গাছি চুড়ি গড়িয়ে দেব, কেমন রে?" বলিয়া তিনি তাহাকে একটা খেলনার বাক্স দিলেন। সে গোঁ হইয়া বসিয়া ছবির গরু বানাইতে বসিল।

৩

কাল-স্রোত দ্রুত চলে বা স্মৃতি-স্রোত,—তাহা বৈজ্ঞানিকরাই বলিতে পারেন ; কারণ, কাল বহে সমানে সটানে ; স্মৃতি বহে পিছনে উজানে। বিপরীত অঙ্ক ধারাপাতের নিয়মে এতদুভয়ের সঠিক মাপবৈচিত্র্য নির্ণয় করা আমার মত আনাড়ীর কর্ম্ম নহে। আমরা তাই মনগড়া চালে চলিয়া স্মৃতিকেই প্রাধান্য দিয়া থাকি। পূর্ব্বঘটনার পর প্রায় ১০ বৎসরকাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে—সে ত সেদিনের কথা।

প্রথম কিছুদিন ধনিষ্ঠাদের খবর মাঝে মাঝে পাইয়াছিলাম। কিন্তু বিরাজ চিঠিপত্র লিখিতে বড়ই অপটু ; আমি দশখানা চিঠি লিখিলে হয়ত বা একখানা চিঠি পাইতাম, তাহাও হিজিবিজি অক্ষরে ও নিতান্ত সংক্ষেপে, যথা—

"প্রাণের সই,

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি, কিছু মনে করিও না। কি আর লিখব। তুমি ত জান, লিখতে গেলে আমার কথা জোগায় না। কবে আসিবে? দেখা হ'লে সুখ-দুখ্‌খুর সব কথা বলব। আমরা ভাল আছি। আমি লিখতে পারি না পারি, তোমরা কেমন থাক, তাহা লিখতে ভুলো না। ইতি—

তোমার ভালবাসার সই,
বিরাজ।"

কিন্তু এক তরফা অনুরাগ যদি বা চলে, তাহার প্রকাশ থামিয়া যায়। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের চিঠি লেখালিখি বন্ধ হইয়া গেল ; কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা নহে ; সর্ব্বদাই তাহাদের কথা মনে পড়িত। কালের পরিবর্ত্তনে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, যেমনটি দেখিয়া গিয়াছিলাম, তেমনটি না-ও দেখিতে পারি, এ কথা কিন্তু আমার মনে হইত না। তাহাদেব মনে পড়িলেই সেই বিবাহের আনন্দ-দৃশ্যই আমার মনে ভাসিয়া উঠিত। ইতোমধ্যে আমরা কয় বৎসরের জন্য বিলাত গিয়াছিলাম। কলিকাতায় ফিরিয়া সখীর বাটী যাইয়া সহসা নিরানন্দ শোকদৃশ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম ; দেখিলাম, সখীর বৈধব্য-বেশ। কিছুক্ষণ আমরা দুইজনে দুইজনের হাত ধরিয়া কতই না কাঁদিলাম। তাহার পর আমি আগেই বলিলাম, "দিদি, এমন হয়েছে, তা ত জানাওনি?"

তিনি বলিলেন, "কি আর জানাব ; আর তোমরাও ত এখানে ছিলে না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাকে দেখছি না যে?"

"তিনি কি আর আছেন, দিদি? আমাকে একলা ফেলে তাঁরা সবাই চলে গেছেন।" বলিয়া তিনি আবার অশ্রুধারা মুছিতে লাগিলেন।

আমি একটু পরে বলিলাম, "মেয়ের খবর ভাল ত? আজ ত পূজার ষষ্ঠী ; ভেবেছিলাম, তাকে এখানে দেখব, মেয়েকে যে আননি!"

তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দুঃখের কথা কি বলব ভাই! রাজবাড়ীর নিয়ম নেই বউ পাঠানর। সেই পর্য্যন্ত মেয়ে আর এ বাড়ী ঢোকেনি।"

আমি বলিলাম, "কি নিষ্ঠুর গো তারা!"

তিনি বলিলেন, "সাধের সময় একদিন এনে যে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত খাওয়াব, তা-ও হল না। বাড়ী বয়ে সাধ পাঠিয়ে দিলুম।"

আমি বলিলাম, "না পাঠালেই ত চলত।"

"তা ঠিক ; কিন্তু মা'র প্রাণ তা ত বোঝে না। প্রসব হবার সময় মান অপমান ভুলে সেখানে গিয়ে দু'দিন কাটিয়ে এলুম।"

আমি সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম, "তা মেয়ে ত পরের ঘরে যাবার জন্যই জন্মায়। সে ত সুখে আছে ভাই?"

তিনি বলিলেন, "সেই মনে করেই ত এতদিন প্রাণ ধরে ছিলুম, কিন্তু বেহাই যাবার পর কু-সঙ্গীর ফাঁদে পড়ে জামাই একেবারে গোল্লায় গেছে। এক বাইজীর মন যোগাতে দু' হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। শুনলুম, বাঁদরের বিয়ে দিতে সেদিন নাকি লক্ষ টাকা খরচ করেছে।"

আমি অবাক্ হইয়া সখীর দুঃখের কাহিনী শুনিতেছি, এমন সময় নীচে পাল্কীর শব্দ পাওয়া গেল। একজন দাসী দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "ওমা, দিদিমণি এসেছেন গো।"

"দিদিমণি! হঠাৎ এতদিন পরে? ব্যাপার কি?"

আমরা ছুটিয়া নামিয়া গিয়া দেখিলাম, সত্যই ধনিষ্ঠা পাল্কী হইতে বাহির হইতেছে। সে নামিয়া আমাদিগকে প্রণাম করিল।

মাতা তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন, আমি তাহার গাল টিপিয়া বলিলাম, "ওমা, ধনী বুড়ী, তুই এতবড় হয়েছিস!"

সে একটু হাসিল। সে হাসিটুকু কি সুমধুর!

ইত্যবসরে তাহার সঙ্গের দরোয়ান পাল্কী হইতে দুইটা গহনার বাক্স বাহির করিয়া বলিল, "মাইজী, বাক্স দু'টো সাবধানে তুলিয়া রাখুন।"

বিরাজের আদেশে দাসী বাক্স দুইটা হাতে লইয়া আমাদের সহিত উপরে আসিল, উপরে শয়নকক্ষের পালঙ্কের উপর বাক্স দুইটা রাখিল। বিরাজ তাহার উপর বালিস দু'টা চাপাইয়া দিলেন, তাহার পর কন্যাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মা, খবর সব ভাল ত?"

কন্যা একটু থামিয়া থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ, একরকম সব ভালই। সকলে ভাল আছেন।" মাতা বলিলেন, "আজ কি ক'রে এলে মা! জামাই কি এতদিন পরে রাজী হলেন?"

সে বলিল, "না মা, তিনি কিছু জানেন না; বৌরাণী তাঁর একজন দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "বৌরাণীর খুব দয়ার শরীর ত! পুজোর দিন নিজের মাথায় সব ঝক্কি নিয়ে মেয়েকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

"হ্যাঁ, তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। এই গয়নার বাক্স দু'টো শ্বশুরমশায় তাঁর কাছেই রেখেছিলেন। এখন এই বাক্স ফিরিয়ে নেবার জন্য উনি বৌরাণীকে খুব বিরক্ত করছেন। কিন্তু গয়নাগুলো হাতে পেয়ে পাছে দু' দিনে সব নষ্ট ক'রে ফেলে, এই ভয়ে তোমার কাছে বাক্স দু'টো রাখবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসীমা, আপনার যে দেখা পাব, এটা ভাবিনি। কত যে খুসী হলুম, তা বলতে পারিনে।"

আমি এতক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলাম। তাহার যৌবনোজ্জ্বল রূপতরঙ্গ বর্ষার ভরা নদীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে যেন উথলিয়া উঠিতেছিল। হৃদয়ের বিষাদরেখাপাতে সেই কমনীয় কান্তি আরও যেন মহিমান্বিত ভাব ধারণ করিয়াছিল। হায় রে! সে জন কি হতভাগ্য—যাহার নিকট এ অতুল রূপের কোন মর্য্যাদা নাই!

ধনিষ্ঠার কথার উত্তর দিতে যাইতেছি, হঠাৎ ফটকে সশব্দ গাড়ী থামার আওয়াজে নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলাম। কিছু যে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিবে, তাহা যেন স্বতঃই মনে হইল। বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এমন সময় কার গাড়ী—কে এল?"

ধনিষ্ঠা ধীরভাবে বলিল, "বোধহয় উনি এলেন।"

বিরাজ ভীত হইয়া ত্রস্তে বলিয়া উঠিল, "তবে বুঝি জান্‌তে পেরেই তোমাকে নিতে এসেছেন?"

আমি বলিলাম, "তাই ত! একটা কোন বিভ্রাট না ঘটে।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই জামাতা বাবাজী সশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে মদের গন্ধ ভুরভুর্ করিতেছে, নয়নদুটি রক্তবর্ণ। আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উগ্রভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, "লুকিয়ে চ'লে আসা হয়েছে বড়!"

স্ত্রী উত্তর করিল, "লুকিয়ে আসিনি, বৌরাণী আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বোরাণী তোমাকে পাঠাবার কে? আমার অনুমতি নিয়েছিলে?"

"তুমি থাক কোথায়? আর বাপের বাড়ী আসব, তার আবার অনুমতি কি, আমি ত আর এখনও ছোট্ট বউটি নেই?"

জামাতা বলিল, "আগে বাড়ী চল, তারপর এ কথার বোঝাপড়া হবে।"

ধনিষ্ঠা বলিল, "বাড়ী? আমার বাড়ী কোথায়? বাড়ীতে ত অন্য লোককে বসিয়েছ। আমি ত রাজবাড়ীর এক কোণে প'ড়ে রয়েছি।"

জামাতার এতদূর অধঃপতন হইয়াছে, মাতা তাহা জানিতেন না। তিনি যেন হতচেতন হইয়া ক্ষণেক শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

জামাতা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "বড় যে কথা ফুটছে দেখছি। গয়নার বাক্স কোথায়, নিয়ে এস এখনই।"

ধনিষ্ঠা অকুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "গয়না আমি দেব না। ঐগুলিই আমার মেয়ের একমাত্র সম্বল।"

জামাতার স্বর আরও চড়িয়া উঠিল, "দেবে না? এখনই নিয়ে এস বলছি, নইলে ভাল হবে না। চোর তুমি।"

ধনিষ্ঠা বলিল, "আমার ধন আমি এনেছি, আমি চোর—আর তুমি তা কেড়ে নিতে এসেছ—তুমি সাধু!"

জামাতা তীব্র স্বরে বলিল, "বটে! তোমার ধন! তোমার বাবাকেলে ধন!"

আমি থাকিতে না পারিয়া বলিলাম, "বাপের ধন নাই হল ; ওর স্ত্রীধন ; ওতে ত তোমার কোন অধিকার নেই, বাছা!"

জামাতা এ কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্ত্রীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "দেবে না? চোর! ছোটলোকের মেয়ে! এখনই দাও বল্‌ছি।"

ধনিষ্ঠা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "দেখ, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, কিন্তু বাপ-মায়ের অপমান সহ্য করব না। এমন করে যদি বল—"

তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে স্বামী বলিল, "কি, তোমার কথায় আমি ভয় পাব না কি? একবার কেন—এক্‌শোবার বল্‌ব, ছোটলোক—জুয়াচোরের মেয়ে। গহনা চুরি করে এনেছিস, ফিরিয়ে নিয়ে আয়।"

ধনিষ্ঠা ক্ষণকাল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বালিসের নিম্ন হইতে বাক্স দুইটা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে ফেলিয়া

দিল। বাক্সের ডালা ভাঙ্গিয়া গিয়া তম্মধ্যস্থ মণিমাণিক্যরাশি ঝকমকিয়া উঠিল। সেই হীরাজহরতের জ্যোতিকে ম্লান করিয়া দিয়া ধনিষ্ঠার দেহকান্তি হইতে দেবী-সদৃশ তেজস্বিনী আভা বিনির্গত হইল। স্বয়ং সূর্য্যদেব জানালাপথে গৃহমধ্যে রশ্মি প্রেরণ করিয়া তাহার শিরে আলোকমুকুট রচনা করিয়া দিলেন। পত্নীর তেজস্বিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া জামাতা স্তম্ভিত হইয়া গেল, সেই তেজঃকটাক্ষে তাহার মোহভ্রান্তি সহসা অপসৃত হইল, মস্তক নত হইয়া পড়িল। ধনিষ্ঠার পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বুঝেছি, আমি বুঝেছি, কি পাষণ্ড—কি নরাধম আমি, বুঝেছি! তবুও তুমি ক্ষমা কর, দেবি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো না, পায়ে রাখ, আশ্রয় দাও। আমাকে পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার কর।"

ধনিষ্ঠা তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল। আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দূরে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। পাশের বাড়ীর একটি বালক হারমোনিয়ম বাজাইয়া গাহিল :

চিনিনি তোমারে গো যখন ছিলে কাছে, গৃহপুরে।
তোমায় জানিলাম, বুঝিলাম,
যখন অনাদরে গেলে দূরে॥
আমার—অন্ধনয়ন গেল খুলে,
ভুলিনু সকল ভুলে,
আজি তব লাগি সর্ব্বস্ব তেয়াগি
আমি উদাসীন ভবঘুরে।
ওগো দেবি, মোর জীবন-অরুণা,
কর গো কর করুণা
বাজিয়ে দাও মোর একতারাটি তোমার প্রেম-সুরে॥

বার্ষিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩৪

প্রবন্ধ

ভূ-পঞ্জর

প্রথম প্রস্তাব

সূর্য্য হইতে খসিয়া ক্রমে পৃথিবীর বাষ্পচক্র কিরূপে একটি গ্রহরূপ ধারণ করিয়া পরে আবার তাহা উষ্ণ সমুদ্রে মগ্ন হইল, তাহা আমরা "পৃথিবীর উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি, পরে সেই আদিম মহাসমুদ্র হইতে কিরূপে আবার অল্পে অল্পে দেশ মহাদেশ জীব জন্তু উদ্ভিদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, যখন পৃথিবীর বাষ্পাবরণের উত্তাপ ২০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পরিমাণ ছিল, তখন সেই বাষ্পাবরণের লৌহ প্রভৃতি ধাতব ও নানাপ্রকার আকরিক পদার্থ বাষ্পাকারে মিশ্রিত ছিল। উষ্ণতার হ্রাস সহকারে ক্রমে সেই বাষ্পরাশি জলরূপে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া যখন সমুদ্র উৎপন্ন করিল, তখন সেই বাষ্পাকার ধাতব ও আকরিক পদার্থ-রেণুও সেই বৃষ্টিজলের সহিত মিশিয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়াছিল। সেই সকল রেণুই কালে সমুদ্রতলে স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্তরসংস্থিতি দ্বারা ক্রমে দেশ মহাদেশ সৃষ্ট করিয়াছে। ইহা ছাড়া ভূগর্ভস্থ অগ্নির কার্য্য হেতুও পৃথিবীর পৃষ্ঠে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে।

সকল দ্রব্যই প্রায় তরল হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় আয়তনে ছোট হইতে থাকে। দ্রব ধাতব পদার্থ ঘন হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া আয়তনে অনেক কমিয়া যায়। সেই নিমিত্ত ভূগর্ভ কালে শীতল হইয়া ঘন হইবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্বায়তন হইয়া পৃথিবীর কঠিন আবরণের সহিত অসম্বন্ধ হইতে লাগিল। যেমন একটি তুলাপূর্ণ বালিসের কতকগুলি তুলা খুলিয়া লইলে বালিসটি তুবড়াইয়া যায়, তেমনি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পদার্থের আয়তন হ্রাসবশতঃ পৃথিবীর কঠিন আবরণ অন্তরে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভর না পাইয়া, তুবড়াইয়া কোন কোন স্থানে দমিয়া গেল, কোন কোন স্থানে উচ্চ হইয়া পর্ব্বত-মালায় পরিণত হইল। হিমালয় আলপ্ প্রভৃতি আধুনিক উচ্চ পর্ব্বত সকল অধিকাংশ এইরূপে নির্ম্মিত। তাহাদের নিম্নস্থ স্তর প্রথম যুগের নিম্নভূমি কিম্বা সাগরতল বটে, কিন্তু ভূ-গর্ভের উষ্ণতার হ্রাস সহকারে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হঠাৎ বিপ্লব দ্বারা চারিদিকের ভূমি দমিয়া গেলে হিমালয় ও আলপ্ প্রভৃতি পর্ব্বতরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পর্ব্বতশ্রেণী দেখিলে আমাদের মনে কি ভাব হয়? আমরা মনে করি, চিরকাল হইতেই ইহা এইরূপ উন্নত অবস্থায় বিরাজমান। কত অল্পে অল্পে কত যুগযুগান্তের স্তর সংস্থিতি দ্বারা ইহার ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়া, অবশেষে উপরোক্ত প্রকারে উচ্চ হইয়া পর্ব্বতশ্রেণীরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমরা হঠাৎ কল্পনা করিতে পারি না।

এইরূপ প্রণালী ছাড়া, অন্তরস্থ অগ্নির প্রভাবে কোন কোন অপেক্ষাকৃত পাতলা স্থান ফাটিয়া সেই গহ্বর দিয়া ধাতুস্রোত নির্গত হওয়াতে কালে তাহা জমিয়াও বড় ছোট নানাপ্রকারের পর্ব্বত হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপে প্রথমে যে সকল পর্ব্বত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সমুদ্রজলে পুনরায় বিনষ্ট হইয়াছে; তাহার ভগ্নাবশিষ্ট মৃত্তিকা ছাড়া এখন আর কিছুই নাই। সেই গহ্বর দিয়া গ্র্যানিট প্রস্তর (granite) ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ ব্যতীত, ধাতব ও আকরিক পদার্থ মিশ্রিত উষ্ণ জলস্রোতও বহমান হইতে লাগিল। ঐ জলমিশ্রিত ধাতুরেণুও স্থিতাইয়া কালে ভূ-পঞ্জর গঠিত করিয়াছে।

নদীতে যে প্রণালীতে চর পড়ে, সেই প্রণালীতে সমুদ্রস্থ পদার্থরেণু স্থানে স্থানে স্থিতাইয়া স্থল হইয়া উঠিল, আবার কোন স্থানের বা নবনির্ম্মিত স্তররাশিকে অমনি চুরমার করিয়া আপন প্রভাবে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহা হইতে কালে আবার অন্যত্রে স্থল উৎপন্ন হইয়াছে। কত পর্ব্বত সমুদ্র জলে গলিয়া, কত স্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সেই রেণুরাশিতে অবশেষে এই সকল দেশ মহাদেশ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন আমরা যে সকল দেশ মহাদেশ দেখিতেছি, এইরূপ কত দেশ আবার সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারও স্থিরতা নাই। পার্ব্বত্য গ্রিক উপদ্বীপ অ্যাটিকা যে এককালে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নানা বৃক্ষ সমাকুল বনপূর্ণ একটি দেশ ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূবেত্তাগণ বলেন, তাহা নহিলে তৎস্থানীয় সমুদ্রস্তরে এত বৃহৎ জন্তুর দেহাবশেষ কোথা হইতে আসিবে? ভূবেত্তাগণ নানা কারণ দেখাইয়া বলেন, যখন হিমালয় সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, তখন ভারতবর্ষ মাডাগাস্কার দ্বীপ ও মধ্য-আফ্রিকা সংযুক্ত ছিল এবং ইহার পূর্ব্বে এক সময়ে উক্ত দেশ ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জ ও অষ্ট্রেলেসিয়া এবং এক সময় আমেরিকা ও ইয়োরোপ যে যুক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল পদার্থে ভূপঞ্জর গঠিত হইয়াছে, তাহা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

প্রথম—উৎপাত-জনিত মৃত্তিকা।*

(Eruptive Rocks) অর্থাৎ যে সকল তরল পদার্থ সকল যুগেই মাঝে মাঝে ভূগর্ভ হইতে সবলে নির্গত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী-স্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা উৎপাত-জনিত মৃত্তিকা। এ মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন বটে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃত্তিকার মত স্ফটিকাকৃতি দানাদার (Crystalline)। রাজমহল পাহাড়ে ও আসানসোলের ডাকবাংলার নিকট এবং অন্যান্য স্থানে এই জাতীয় মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়—মূল মৃত্তিকা। যে উত্তপ্ত পদার্থ সর্ব্বপ্রথমে শীতল হইয়া পৃথিবীর আবরণ সৃজিত করিয়াছিল, (যাহা আমরা 'পৃথিবীর উৎপত্তি'তে বরফের দৃষ্টান্তে উত্তপ্ত ভূগর্ভের উপর জমাট বাঁধিতে দেখিয়া আসিয়াছি,) সেই সর্ব্বপ্রথমের মৃত্তিকা পরে রূপান্তরিত হইয়া স্ফটিকাকৃতি দানাদার হইয়াছে। এই মৃত্তিকাকেই মৌলিক মৃত্তিকা (Fundamental Gneiss) কহা যায়। এই মৃত্তিকা হাজারিবাগ,' ছোটনাগপুর প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে প্রাপ্তব্য।

* প্রস্তর ধাতুকর্দ্দম ইত্যাদি যত প্রকার পদার্থে পৃথিবীর পঞ্জর গঠিত, তাহার সমস্তই 'মৃত্তিকা' নামের বাচ্য হইবে।

পর্ব্বত প্রভৃতি যে সকল স্থানে স্তরাবলি পর্য্যায়ক্রমে মূল দেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারা যায়, সেখানে সর্ব্বশেষ স্তরে ইহা অবস্থিত বলিয়া এই মৃত্তিকা সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন স্থির করা যায়।

তৃতীয়—স্থিতান মৃত্তিকা (Sedimentary Rocks)। নানা প্রকার ধাতব ও আকরিক পদার্থ যাহা সমুদ্রে স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্থল উৎপন্ন করিয়াছে—তাহাকেই স্থিতান মৃত্তিকা বলা যাইতে পারে। যেমন বালি চূণ ম্যাগনেসিয়া ইত্যাদি। বাঙ্গালার সমুদ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশমাত্রেই এরূপ মৃত্তিকা অপরিমেয়।

এই সকল ধাতব ও আকরিক দ্রব্যের দ্বারা সামুদ্রিক স্তর সংস্থিতির এমনি একটি পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে তাহাদের উৎপত্তির সময় স্পষ্টই ব্যক্ত করে।

প্রত্যেক স্তর যে সকল আকরিক পদার্থে নির্ম্মিত, এবং তাহাতে যে সকল প্রাণী-দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তাহারা পরস্পর এরূপ অসমধর্ম্মী যে, সে সকল পরীক্ষা করিয়াই স্তরের উৎপত্তির সময় নিরূপিত হয়। ভূগর্ভ হইতে মাঝে মাঝে গ্র্যানিট পরফায়েরি ইত্যাদি প্রস্তর ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সবলে উঠিবার সময় যদি সমস্ত স্তর-পর্য্যায় লণ্ডভণ্ড না করিত, যদি মাঝে মাঝে সমুদ্র দ্বারা সমস্ত স্তর ধৌত হইয়া আবরণ-বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে ভূতত্ত্ববিদ্যা আয়াস-সাধ্য হইত না। প্রত্যেক স্তর চিরকাল একই রূপ সাজান থাকিলে ভূবেত্তারা মাটি খুঁড়িয়া অতি সহজেই তাহার উৎপত্তির সময় নিরূপণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সর্ব্বদা গ্র্যানীটাদির উৎপাত হেতু এবং বন্যা প্রভাবে ঐ সকল স্তর এত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে অনেক কষ্টে ভূবেত্তাদিগকে স্তরের বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

পৃথিবীতে প্রত্যহই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু এক এক সময় কিছু কাল ধরিয়া এক প্রকার বিশেষ পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়, এই পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলা তাহার পূর্ব্ব কিম্বা পরবর্ত্তী শৃঙ্খলা হইতে বিভিন্ন। এক প্রকার পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলার দ্বারা যে সকল প্রাণী কিম্বা মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে, অপর প্রকার পরিবর্ত্তন শৃঙ্খলাদ্বারা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন প্রাণী ও মৃত্তিকা উৎপাদিত। এইরূপ এক একটি পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খলার সময়কে ভূতত্ত্ববিদ্যায় এক একটি যুগ কহা যায়। যুগ আবার অন্তর যুগে, ও অন্তর যুগ গর্ভযুগে বিভক্ত। পৃথিবীর জীবনকাল দুইটি প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম, যুগের পর্য্যায় অনুসারে, আর দ্বিতীয়, তৎসাময়িক প্রাণীর প্রকৃতি অনুসারে। পৃথিবীর যুগ বিভাগ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

যুগ		অন্তর যুগ
প্রারম্ভ বা ইনফ্রা-সাইল্যুরিয়ণ (Infra-Silurian) কাল	আদি জীব বা Paleozoic	লরেনসিয়ন বা মৌলিক মৃত্তিকা Laurentian or Fundamental Gneiss ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian)
১ম যুগ (Primary Epoch)		সাইলুরিয়ন (Silurian) ডিবোনিয়ান (Devonian) অঙ্গারজনক বা কার্বনিফেরাস (Carboniferous)

২য় যুগ (Secondary Epoch)	মধ্য জীব বা Mesozoic	Neo-zoic	ট্রায়াসিক বা ত্রিস্তর (Triassic) জুরাসিক (Jurassic) কৃটেসস বা চা-খড়ি (Cretaceous)
৩য় যুগ (Tertiary Epoch)	নব্য জীব বা Cainozoic		ইয়োসীন (Eocene) মায়োসীন (Miocene) প্লায়োসীন (Pleiocene)
৪র্থ যুগ (Post Teritary Epoch)			বর্ত্তমান কাল

উপরের তালিকায় দুই প্রণালীতে পৃথিবীর যুগ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম স্তম্ভে পর্য্যায়-ক্রমানুসারে যুগ-বিভাগ হইয়াছে, আর দ্বিতীয় স্তম্ভের বিভাগ তৎসাময়িক প্রাণীর প্রকৃতি অনুযায়ী ; তৃতীয় স্তম্ভে অন্তর-যুগবিভাগ সন্নিবেশিত। যুগ পরম্পরার মধ্যে চারিটি স্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় সে রূপ নহে সেই জন্য তাহাকে সাধারণতঃ প্রারম্ভ বা সাইল্যুরিয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী (Infra-Silurian) কাল কহা যায়। দ্বিতীয় স্তম্ভের নামকরণের আর ব্যাখ্যা আবশ্যক করে না।

এখন প্রত্যেক যুগ ও তাহার অন্তর যুগ কিরূপ মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত, কিরূপ জীবজন্তু ও উদ্ভিদ সে যুগের উৎপন্ন তাহার সংক্ষেপে আলোচনা আরম্ভ হইতেছে।

আদিম কালের সেই ভয়ানক ঝটিকা, সেই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাৎ যাহা আমরা 'পৃথিবীর উৎপত্তি'তে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা ক্ষান্ত হইলে প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর হইয়া পড়িল। প্রারম্ভ কালে যখন পৃথিবীর প্রথম আবরণ নির্ম্মিত হয়, তখন কোন প্রাণীমাত্রেরই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন পৃথিবীর উত্তাপ এত অধিক ছিল, যে সে উত্তাপে কোন প্রাণী* জন্মান অসম্ভব। তারাহীন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় নানাপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থ সমাচ্ছন্ন অন্ধকার পৃথিবীর নিবিড় মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য তখন কিরণ দিতে পারিত না। সেই উত্তপ্ত এবং চিররাত্র অন্ধকার পৃথিবীতে কি করিয়া প্রাণী দেখা দিবে? এই সময়কে Azoic অর্থাৎ জীবশূন্য সময় কহা যায়।

ক্রমে একদিকে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি হইয়া মেঘমুক্ত সূর্য্য দেখা দিতে লাগিল, আর একদিকে পৃথিবীর আবরণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণীর বাসোপযোগী হইতে লাগিল। সূর্য্যালোকই পৃথিবীর জীবন, সূর্য্যালোক না থাকিলে প্রাণী-উৎপত্তি হইতে পারিত না।

অগ্রে উদ্ভিদ কিম্বা অগ্রে জন্তু জন্মাইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করা দুরূহ, অতি পুরাকালের সমুদ্র কর্দ্দমে (argillaceous schists) উদ্ভিদ ও জন্তু—উভয়েরই দেহাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু প্রথম যুগের অধিকাংশ সময়ে, বিশেষতঃ অঙ্গারজনক যুগে উদ্ভিদই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সে যুগে প্রাণী অতি বিরল। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় যে উদ্ভিদই জীবের অগ্রে জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ, পৃথিবীর জীবন আলোচনা

* বিজ্ঞানে জীবজন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং এই প্রস্তাবে প্রাণী শব্দে উদ্ভিদাদিও বুঝাইবে।

করিয়া দেখিলে যখন দেখা যায় পৃথিবী অল্পে অল্পে ক্রমশই উন্নতির দিকে গিয়াছে, তখন উদ্ভিদ হইতে জীবজন্তু উন্নততর প্রাণী বলিয়া অগ্রে উদ্ভিদ হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

প্রারম্ভ বা ইনফ্রা-সাইল্যুরিয়ান কাল

ইনফ্রা-সাইল্যুরিয়ান, অর্থাৎ সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগের নিম্ন স্তর দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম, লরেনসিয়ান বা মৌলিক মৃত্তিকা, দ্বিতীয়, ক্যামব্রিয়ান।

সেন্ট লরেন্স নদীর নাম হইতে মৌলিক মৃত্তিকার নাম লরেনসিয়ান হইয়াছে। 'পৃথিবীর উৎপত্তি'তে বলা হইয়াছে যে প্রাচীন কালে পৃথিবীর বাষ্পাবরণের ভার এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল। এই প্রভূত চাপ ও ভূগর্ভ নিঃসৃত উষ্ণ জলের কার্য্যদ্বারা প্রথম-উৎপন্ন ভূপৃষ্ঠ মৃত্তিকা এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে তাহার আদিম রূপ এখন স্থির করা যায় না, সেইজন্য ইহার আর একটি নাম রূপান্তরিত মৃত্তিকা। এই দ্রবীভূত মৃত্তিকা পুনর্ব্বার ঘন হইবার সময় স্ফটিকাকৃতি দানাদার হইয়াছে। মৌলিক মৃত্তিকা ছাড়া অন্য দুই জাতীয় মৃত্তিকাও উক্তরূপ কোন নৈসর্গিক কারণে সময় সময় রূপান্তরিত (Metamorphosed) হইয়াছে। লরেনসিয়ান কালে ভারতবর্ষে হিমালয়ের ও আসাম এবং ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে মূল মৃত্তিকা মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সাময়িক স্তরে কোথাও কোথাও ফরমানিফেরা (Formanifera) নামক কীটাণুর দেহাবশেষ দেখা যায়। তাহা ছাড়া এ মৃত্তিকায় আর কোন প্রাণী-চিহ্ন দেখা যায় না।

ক্যামব্রিয়ান কাল

যে সকল পরিবর্ত্তন দ্বারা ভূপৃষ্ঠ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে তাহা এই কেমব্রিয়ান সময় হইতেই আরম্ভ। ওয়েল্‌স্ দেশে প্রথমে এইরূপ মৃত্তিকা আবিষ্কৃত হয়, সেই জন্য ওয়েল্‌সের প্রাচীন নাম কেমব্রিয়া হইতে ইহার নাম ক্যামব্রিয়ান হইয়াছে।

ভূবেত্তাগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কেমব্রিয়ান যুগের মৃত্তিকায় অতি অল্পই জীবনের চিহ্ন পাইয়াছেন।

কেমব্রিয়ান মৃত্তিকার কোন কোন স্থানে কেবল কীট-চিহ্ন ও কোন কোন স্থানে পুরুভুজের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়। এইরূপ প্রাণী-বিরল স্তরের উপরিভাগেই শম্বুক-জাতীয় প্রাণীবহুল স্তর-সংস্থিতি দেখিয়া বোধ হয় ক্যামব্রিয়ান যুগের শেষ সময়ে হঠাৎ ভূপৃষ্ঠের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত ইহার পরের স্তর-সংস্থিতি হইতেই প্রকৃত পক্ষে প্রথম যুগের আরম্ভ ধরা যায়। কেননা এই সময় হইতেই পৃথিবীতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণী সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

কাশ্মীরের উত্তরস্থ ল্যাডাকের সন্নিহিত পীরপঞ্জল এই যুগে উৎপন্ন।

প্রথম যুগ

প্রথম যুগে জল দ্বারাই প্রায় সমস্ত পৃথিবী বেষ্টিত ছিল, এবং সেই জলেই আমরা প্রথমে উদ্ভিদ ও জীবের জন্ম দেখিতে পাই। ব্র্যাকিওপোডা (Brachipoda)—বা বাহুপদী এবং অর্থসিরেটাইটীস (Orthoceratites) বা ঋজুশৃঙ্গ এবং আরো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়

শম্বুক, এবং ট্রাইলোবাইটীস (Trilobites) বা ত্রিকুণ্ডলী বলিয়া একরূপ কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী অতি পুরাতন সমুদ্র জীব। ইহা ভিন্ন প্রবালকীট অতি পুরাতন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। একরূপ জলজ উদ্ভিদ এই সকল প্রাণীর সমকালীন। যখন সমুদ্র সরিয়া পড়িয়া আরো দেশ মহাদেশ বিস্তৃত হইল, তখন ক্রমে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতীয় উদ্ভিদ যেমন Equisetaceae জাতীয় শরগাছ ও দুই একপ্রকার পর্ণীতরু (Fern) এবং অন্যান্য প্রকার উদ্ভিদ জন্মাইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, প্রথম যুগের আবার অন্তর-যুগ আছে। প্রথম যুগটি ৪ ভাগে বিভক্ত—সাইল্যুরিয়ান, ডিবোনিয়ান বা লোহিত প্রস্তর, কারবনিফরস বা অঙ্গারজনক, পারমিয়ান।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগ

সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগ কেমব্রিয়ান কালের পরবর্ত্তী। এ যুগের মৃত্তিকা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড দেশের স্রপসিয়র ও ওয়েল্‌স দেশে এই মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত প্রদেশের সাইলিয়োরিস নামক প্রাচীন অধিবাসীদিগের নাম হইতে বিখ্যাতনামা ভূবেত্তা মারকিসন এই মৃত্তিকার সাইল্যুরিয়ান নামকরণ করেন।

সাইল্যুরিয়ান যুগে প্রাণী চিহ্ন—অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং জীব দেহাবশেষ বহুল-রূপে লক্ষিত হয়। এ সময়ে এখনো পৃথিবী অন্ধকার। মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্য এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তবে অনবরত বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীর বাস্পাবরণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, কালে যে সূর্য্যরশ্মি প্রভাবে পৃথিবীর উন্নত অবস্থা হইবে তাহার লক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই যুগের অতি বিস্তৃত স্বল্প-গভীর সমুদ্রমধ্য দিয়া স্থানে স্থানে কোথাও বা অনুর্ব্বর, কোথাও বা জলজ-উদ্ভিদ-বেষ্টিত ভূখণ্ড, কোথাও বা অনুচ্চ পাহাড়গুলি মস্তক তুলিয়া আছে। নানা জাতীয় শম্বুক এবং স্ফুটাঙ্গ (Articulated) জীব সেই বিস্তৃত সমুদ্র এবং সেই সঙ্কীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর। একরূপ পুষ্পহীন জলজ উদ্ভিদ সাইল্যুরিয়ানের সর্ব্ব নিম্নস্তরে পাওয়া যায়। সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগ আবার দুই গর্ভ-যুগে বিভক্ত। অধঃ-সাইল্যুরিয়ান এবং ঊর্দ্ধ-সাইল্যুরিয়ান। আমরা এই যুগের অধস্তরে প্রথম উদ্ভিদচিহ্ন দেখিতে পাই। ইহার আগে আর উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায় না, কেমব্রিয়ান যুগে কেবলমাত্র পোকা ও পুরুভুজ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে উদ্ভিদ যে জীবজন্তুর পরবর্ত্তী, ভূবেত্তারা এরূপ নিষ্পত্তি করেন না। তাঁহারা বলেন, সম্ভবতঃ উদ্ভিদই অগ্রে জন্মিয়াছে, তবে উদ্ভিদ যেরূপ অল্পে বিনষ্ট হয়, তাহাতে সেই বিপ্লবপরায়ণ লরেন্সিয়ান ও কেমব্রিয়ান কালে উদ্ভিদ জন্মাইলেও তাহাদের চিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার হুকার বলেন সাইল্যুরিয়ান যুগের ঊর্দ্ধ স্তরে উন্নত জাতীয় একরূপ শৈবাল (Lycopodacen) উদ্ভিদের অসংখ্য বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অরথোসেরাটাইটিস বলিয়া এ সময়ে যে একরূপ সমুদ্রজীব ছিল তাহাদের শারীরিক গঠন দেখিয়া বোধ হয় তাহারা অন্যান্য সমুদ্রজীব আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত।

তাহা ছাড়া, এই সময়ে কাঁকড়া ও শম্বুকজাতীয় বহুসংখ্যক জীব দেখিতে পাওয়া যায়। সমেরু জীবের (Vertebrata) মধ্যে সাইল্যুরিয়ানের ঊর্দ্ধ স্তরে এক জাতীয় মৎস্যের

দেহাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাই সর্ব্বপ্রথম মৎস্য।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগে যেরূপ স্তর বিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কোন যুগে নহে। দর্বিঞিঁ (D'Orbigny) সমুদ্র হইতে ৪৬০০০ ফুট উচ্চ আণ্ডিস পর্ব্বত শিখরে প্রাণী দেহাবশেষ সহ সাইল্যুরিয়ন মৃত্তিকাস্তর পাইয়াছেন। কি ভয়ানক বিপ্লব দ্বারাই ইহা এত উচ্চে উঠিয়াছিল! ওয়েলস পর্ব্বতশ্রেণী সাইল্যুরিয়ান যুগে উৎপন্ন।

সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ জলমগ্ন ছিল, ইয়োরোপে কেবল কয়েকটি দ্বীপ সমুদ্র হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। ব্রিটনের পশ্চিম প্রান্তে একটি দ্বীপ, ফ্রান্সের বর্ত্তমান ব্রিটনি ও ফ্রান্সের মধ্যদেশে অপর কএকটি দ্বীপমাত্র তখন হইয়াছিল। উত্তরে নরওয়ে, সুইডেন ও রুসিয়া পরস্পর সংযুক্তভাবে একই মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। উত্তর আমেরিকায়, নিউ ব্রিটন, দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি ও ব্রাজিলের কতকাংশ, ভারতবর্ষে বাঙ্গালার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আরবলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, পঞ্জাব, ছোটনাগপুর ইত্যাদি সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল।

ডিবোনিয়ান বা লোহিত প্রস্তর অন্তর যুগ

এই দুই জাতীয় মৃত্তিকা একই যুগে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। সাইল্যুরিয়ান যুগের সমুদ্র ক্রমে যখন আরো শুকাইয়া আসিল, যখন স্বল্প গভীর সমুদ্র হইতে স্থানে স্থানে কোথাও বা মিষ্ট কোথাও বা লবণাক্ত জলাশয় হইয়া সময়ক্রমে আবার সেই জলাশয় সমুদ্র হইতে দূরে স্থিত হ্রদরূপে পরিণত হইল, তখন সেই হ্রদে যে স্তর-সংস্থিতি হইয়াছিল সেই মৃত্তিকাই লোহিত প্রস্তর, অর্থাৎ লাল বেলে পাথর। আর সেই একই সময়ে হ্রদের পরিবর্ত্তে সমুদ্রমধ্যে যে সকল মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাকেই ডিবোনিয়ান মৃত্তিকা নামে ভূবেত্তারা আখ্যাত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ডিবন নামক স্থানে এই মৃত্তিকা প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া এই যুগকে মারকিসন এবং সেজবিক ডিবোনিয়ান নাম দিয়াছেন।

লোহিত-প্রস্তর-মৃত্তিকা-স্তর লাল, এবং তাহাতে প্রাণীচিহ্ন বিরল দেখিয়া অধ্যাপক র‍্যামজে বলেন তাহা সমুদ্রজাত নহে, হ্রদজাত।

ডিবোনিয়ান অন্তর যুগের যে সকল প্রাণী দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর। পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীসকল যে ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। সর্ব্বপ্রথম লরেনসিয়ান কালে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দুই একস্থানে কীটাণুর চিহ্নই পাওয়া যায়, কেমব্রিয়ান কালে কেবলমাত্র পোকা ও পুরুভুজের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার পর সাইল্যুরিয়ান অন্তর-যুগে জলজ উদ্ভিদ, শম্বুক, কাঁকড়া ইত্যাদি দেখা যায়। ডিবোনিয়ান অন্তর যুগে শম্বুক কাঁকড়া ও মৎস্যজাতীয় জীব অপেক্ষা উচ্চতর জীব জন্মে নাই বটে, কিন্তু ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতর। বাহুপদী শম্বুকই এ সময়ের প্রধান জীব। এখন ইহারা যেমন বহুসংখ্যক তেমনি বর্দ্ধিতায়তন। অন্যান্য মৎস্য ছাড়া এখন অর্দ্ধভাগ আঁইস ও অর্দ্ধ কঠিন চর্ম্মাচ্ছাদিত একরূপ আশ্চর্য্যজনক মৎস্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ভিদ ছাড়া ক্যালেমাইট ও ব্যাঙের ছাতার ন্যায় একপ্রকার উদ্ভিদ এ সময়ে প্রথম জন্মে। সাইল্যুরিয়ান যুগের ক্রমশ অল্প অল্প পরিবর্ত্তন দ্বারা হঠাৎ আর একটি

ভিন্ন যুগ আসাতে সাইল্যুরিয়ানের শেষভাগ ও ডিবোনিয়ানের প্রথমাংশ এত মিশিয়া গিয়াছে, যে ডিবোনিয়ানের আরম্ভস্থান নির্ণয় করা বড় সহজ নয়।

কারবনিফরস্ বা অঙ্গারজনক অন্তর যুগ

অঙ্গারজনক অন্তর-যুগ ডিবোনিয়নের পরবর্ত্তী। এই সময়ের উদ্ভিদ হইতেই মৃদঙ্গারের উৎপত্তি। কার্ব্বনিফরস দুই গর্ভযুগে বিভক্ত, মৃদঙ্গার গর্ভ-যুগ, এবং চুণে পাথর (Carboniferous Limestone) গর্ভ যুগ। কার্ব্বনিফরসের যে সময়ে উদ্ভিদ হইতে ক্রমে মৃদঙ্গার হইয়াছে সেই বিভাগেই মৃদঙ্গার গর্ভ-যুগ। এবং যে সময় সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ-সঙ্কুল-স্তরের সংস্থিতি হইয়াছে তাহাই লাইমস্টোন অর্থাৎ চুনে পাথর গর্ভ-যুগ। ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া গ্র্যানিট পরফায়েরি প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত নির্গত উষ্ণ জল, চুণ ও বালি পূর্ণ ছিল। সমুদ্র জলে মিশ্রিত সেই চুণ দ্বারা শম্বুক জাতীয় জীবের কঠিন আচ্ছাদন নির্ম্মিত। সুতরাং এই আচ্ছাদন হইতেই আবার পরে চুণ উৎপন্ন হয়। চুণে পাথরের স্তরগুলি মৃদঙ্গার স্তরের নিম্নস্থিত, অতএব ইহা তাহার পূর্ব্ব-সাময়িক। চুণে পাথরের পর্ব্বত সকল সমুদ্রের স্থিতান মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত। এই সকল পর্ব্বতে পুরুভুজ ও দুই তিনপ্রকার শম্বুকজাতীয় জীবের এবং মৎস্যের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তাহাতেই এই সকল পর্ব্বতের সামুদ্রিক উৎপত্তি প্রমাণীকৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ-বহুলত্বই কার্বনিফরসের বিশেষ লক্ষণ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল যেমন উদ্ভিদ বিরল, ইহা তেমনি উদ্ভিদ-বহুল। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বের অসীম সমুদ্রবক্ষে এখন উদ্ভিদাবৃত বহুসংখ্যক দ্বীপপুঞ্জ উঠিয়া স্থলের পরিমাণ বাড়াইয়াছিল।

এ সময়ের জলবাতাস নিতান্ত স্যাঁতসেঁতে ও গরম ; নহিলে যে প্রকার উদ্ভিদ হইতে মৃদঙ্গার জন্মিয়াছে, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব হইত। তখনকার উদ্ভিদাদি পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে তখন ঋতুর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইত না, সমস্ত বৎসরেই একটিমাত্র গ্রীষ্ম ঋতু প্রবল থাকিত। তখন পৃথিবীর কোন অংশেই শীতাতপের বৈষম্য ছিল না, প্রায় সকল অংশেই সমান গরম ছিল। ইহার অনেক পরে, তৃতীয় যুগেই শীতের প্রাধান্য দেখা যায়। তখন আভ্যন্তরিক উত্তাপেই সমস্ত পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে সূর্য্যের উত্তাপে তাহার বিশেষ কোন হ্রাসবৃদ্ধি হইত না। বিসুব রেখার সন্নিহিত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে উত্তর মহাসাগরের চিরতুষারময় মেলবিল দ্বীপ পর্য্যন্ত এবং স্পিউজবর্জেন হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই এ সময়ে সমজাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভিদ-প্রাচুর্য্য এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ, এবং মৃদঙ্গারের তৈলময় পদার্থে (bituminous matter) অধিক পরিমাণে অঙ্গারাম্ল এবং জলজান বাষ্প দেখিয়া বোধ হয় এ গর্ভযুগে অঙ্গারাম্ল বাষ্পের প্রাচুর্য্যবশতই প্রাণীর সংখ্যা এত বিরল। যাহা হউক, কেবল অনুমান ছাড়া এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবল এইটুক আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, আমাদের বর্ত্তমান যুগে যে সকল জাতীয় পর্ণীতরু (Fern) নিতান্ত ক্ষুদ্র, অঙ্গারজনক অন্তর যুগে সেই সকল জাতিই অতি বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর বৃক্ষ ছিল। এখনকার যে সকল শৈবাল-লতা (Lycopod) দুই হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না, তখন সেই জাতীয়েরাই আশি নব্বই ফুট

উচ্চ বৃক্ষ হইত। একপ্রকার শল্কদেহী বৃক্ষ (Lepedodendrons) দ্বারাই তখন প্রায় সমস্ত জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। ইহার এক একটি পাতা ২০ ইঞ্চি লম্বা, এবং স্কন্ধ দুই হাত পরিমাণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এইজাতীয় আর একরূপ বৃক্ষ ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘায়তনের। এ সময়ের আর একরূপ বৃক্ষ (Sigellarias) কখন কখন দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুট ছাড়াইয়া উঠিত। এই সকল বৃহৎ বৃক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র পর্ণীতরু দ্বারা তখনকার জঙ্গল পূর্ণ ছিল। সমুদ্রতীরও এই সময় নানাপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষে আবৃত থাকিত। ক্যালামাইট নামে একপ্রকার শরগাছ তখন উর্দ্ধে বিশ কি ত্রিশ ফুট এবং বেড়ে এক কিম্বা দুই ফুট হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের ক্ষুদ্রায়তন বংশজ এখন ইংলণ্ডে অশ্বপুচ্ছ (Mare's Tail) নামে বিখ্যাত। এ সময়ে ঝাউজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুষ্টিকর কোন ফল কিম্বা ফুল তখনো জন্মে নাই। ফুলহীন ফলহীন বৃক্ষাদিপূর্ণ হরিৎক্ষেত্রই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। বৃক্ষাদি সংখ্যায় বহুল, অথচ জাতিতে অত্যল্প। এই অন্তর-যুগের শেষভাগে কাঁকড়াজাতীয় ট্রাইলোবাইট জীব একেবারে লোপ পাইয়াছিল।

মৃদঙ্গার গর্ভ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যে ভাগে জীব-দেহ-সঙ্কুল স্তর হইয়াছিল তাহা চুণে প্রস্তর গর্ভ যুগ। শম্বুক জাতীয় ৪০০ প্রকার প্রাণী, কাঁকড়া ও মৎস্য জাতীয় অল্পসংখ্যক প্রাণী, এবং পুরুভুজ এই সময়ের অধিবাসী। এ সময়ে একরূপ জলজ সরীসৃপের (Archegosaurus) কেবল মস্তক মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই সময়েই প্রথম সরীসৃপ জন্মে। এতদিন যতপ্রকার জীব জন্মিয়াছে, তাহার মধ্যে এ সময়ের গ্যানয়েড (Ganoid) নামে একপ্রকার মৎস্য দেখিতে অতি সুন্দর। এ সময়ের উদ্ভিদ হইতেও অল্প পরিমাণে মৃদঙ্গার উৎপন্ন হইয়াছে।

এই চুণে পাথরের স্তর নির্ম্মিত হইতে যে বহু সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রোফেসর ফিলিপস্ গণনা করিয়া বলেন যে এক লক্ষ ২২ হাজার ৪০০ বৎসরে ৬০ ফুট মাত্র মৃদঙ্গার কিম্বা চুণে পাথরের স্তর নির্ম্মিত হইতে পারে। এইরূপ মৃদঙ্গারের স্তরের উপরস্তর নির্ম্মিত হইতে কত সহস্র বৎসরই লাগিয়াছে। এতাবৎকাল কোন বিশেষ ভৌতিক বিপ্লব লক্ষিত হয় না। কিন্তু মৃদঙ্গার গর্ভ যুগের শেষকালে ভূপৃষ্ঠের প্রবল বিপ্লব দ্বারা অঙ্গারশৈল সকল উৎপাদিত রূপান্তরিত ও ভগ্নাবয়ব হইয়া ভিন্ন অন্তর যুগ উৎপন্ন হইয়াছে।

পারমিয়ান অন্তর যুগ

অঙ্গারজনক অন্তর যুগের পরেই পারমিয়ান অন্তর যুগের আরম্ভ। রুসিয়ার পার্‌ম্ প্রদেশের স্তর-সংস্থিতি দেখিয়া মারকিসন ইহার এই নাম দিয়াছেন। সায়েঁনাইট ও পরফাইরি প্রস্তর এই যুগে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই উৎপাৎজনিত উত্তাপে সমুদ্র হইতে বহুল পরিমাণ বাষ্প উত্থিত হইতে লাগিল, এই বাষ্প উপরে উঠিতে উঠিতে শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে আবার পৃথিবীতে পড়িল। সেই বৃষ্টি-সিক্ত মাটিতে সরীসৃপ জাতির পদচিহ্ন লক্ষিত হয়। পারমিয়ানের প্রাণী প্রায় কার্বনিফরসেরই অনুরূপ, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী যুগের জীব দু একটিও এই যুগে দেখা যায়। এ যুগেই প্রথম ঝিনুক জন্মে। শম্বুক প্রভৃতি অন্যান্য জীব ছাড়া গ্যানয়েড ও প্লাসয়েড মৎস্য এ সময়ে অনেক দেখা যায়। এ সময়ের আবহাওয়া

অনেকটা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তর-যুগের ন্যায়, কিন্তু অধ্যাপক র‍্যামজে দেখাইয়াছেন যে এ সময়ে দুই এক স্থানে হিমশৈলের কার্য্য (glacial action) লক্ষিত হয়।

এই তো প্রথম যুগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দেখা গেল, প্রাণীর প্রথম আবির্ভাবই বর্ত্তমান যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রাণীদিগের মধ্যে মনুষ্য এখন যেমন শ্রেষ্ঠ জীব তেমনি এ যুগের সমুদ্রে গেনইড নামক যে উজ্জ্বলবর্ণ মৎস্য বাস করিত, তাহারা তখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ট্রাইলোবাইট জাতীয় কাঁকড়া এই যুগে জন্মে এবং এই যুগে তাহা লোপ পায়। পক্ষী কিম্বা স্তন্যপায়ী জীব এখনো জন্মে নাই। উদ্ভিদাদি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই, এ যুগের শেষদিকে দু-একটি সরীসৃপের পদচিহ্ন পাওয়া যায়। এই কালের পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় আবহাওয়া একরূপ, মেরুসন্নিহিত প্রদেশেও যেরূপ আর বিষুবরেখা-সন্নিহিত প্রদেশেও সেইরূপ। পৃথিবী নিজে এই যুগে এত উষ্ণ ছিল যে তাহার উপর সূর্য্য-উত্তাপের বিশেষ প্রভাব ছিল না। পৃথিবীর উত্তপ্ত তরল গর্ভ হইতে প্রথমে গ্র্যানিট (Granite) তৎপরে পরফায়েরি এবং শেষে সায়েনাইট উৎক্ষিপ্ত হয়। স্কটল্যাণ্ডের বেন নেবিস পর্ব্বতে ইহা অতিসুন্দর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতশ্রেণীর মূল প্রদেশ গ্র্যানিটের; তন্মধ্য দিয়া পরফায়েরি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং এই পর্ব্বতের সর্ব্বোপরিস্থ সায়েনাইট স্তর পরফায়েরি ভেদ করিয়া উৎপন্ন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

প্রথম যুগের শেষভাগে পৃথিবীর অধিকাংশই জলমগ্ন ছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী সময়োৎপন্ন স্কটল্যাণ্ড, উত্তর রুষ ও স্কানডিনেবিয়াকে উত্তরে রাখিয়া পারমিয়ান অন্তরযুগের য়ুরোপীয় সমুদ্র একদিকে আয়ারল্যাণ্ড হইতে ইয়ুরেল পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং সম্ভবতঃ স্পিটজবার্জেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্য ভাগে সম্ভবতঃ পিরিনীসের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ফ্রান্সের মধ্যদেশ লইয়া একটি দ্বীপ, আধুনিক ব্রিটনি লইয়া আর একটি দ্বীপ, এবং পাঃদে ক্যালে ও দুনর প্রদেশ হইতে রাইন নদীর বিপরীত কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেলজিয়াম আর ইংলণ্ডে রথ অন্তরীপ হইতে ল্যাণ্ডস এণ্ড অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই, এ সময়ে য়ুরোপের স্থলভাগ।

ভারতবর্ষে বাঙ্গলার কতকাংশ, বুন্দেলখণ্ড, আরাবলি পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি ব্যতীতও পঞ্জাব, সিকিম, ভূটান ও কাশ্মীরের কতকাংশ এবং ব্রহ্মদেশের মূলমেন প্রদেশ—পারমিয়ান অন্তর যুগে বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে এই সকল দেশই কেবল দ্বিতীয় যুগের প্রারম্ভ দেখিয়াছে।

জীবদিগের মধ্যে কাঁকড়া ও মৎস্যই যেমন প্রথম যুগে প্রধান, তেমনি দ্বিতীয় যুগে সরীসৃপই প্রধান জীব। এই নিমিত্ত প্রথম যুগকে মৎস্যের এবং দ্বিতীয় যুগকে সরীসৃপের যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগের আশ্চর্য্যরূপ বৃহদায়তন অসংখ্য সরীসৃপ দেখিলে মনে হয় ইহারাই এ সময়ের রাজা। জীবরাজত্বের প্রভাব বৃদ্ধি হেতু এ সময়ে উদ্ভিদরাজ্যের প্রাধান্য হ্রাস হইয়াছিল। ভূবেত্তাগণ দ্বিতীয় যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১। ত্রিস্তর বা নূতন লোহিত প্রস্তর অন্তরযুগ (Triassic or new red period)

২। জুরাসিক অন্তরযুগ (Jurassic)

৩। চা-খড়ি বা ক্রিটেসস্ অন্তরযুগ (Cretaceous)

ত্রিস্তর অন্তরযুগ (Triassic)

এই অন্তর যুগের মৃত্তিকা তিন স্তর বিশিষ্ট বলিয়া ভূবেত্তাগণ ইহার ত্রিস্তর নাম দিয়াছেন।

ইহার সর্ব্বনিম্নভাগ নূতন লোহিত প্রস্তর স্তর, মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ চুণে-প্রস্তর ও শেষ অর্থাৎ সর্ব্বোপরিভাগ লোনা বেলে প্রস্তর স্তরে নির্ম্মিত। এই অন্তর যুগের প্রথম অর্থাৎ লোহিত প্রস্তর স্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাহুপদী ও মস্তকপদী শম্বুক, গেনইড ও প্লাকইড মৎস্য অল্পই পাওয়া যায়।

এখন জীবজগতের পরিবর্ত্তনের সহিত উদ্ভিদেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যে সকল বৃক্ষ ও লতা অঙ্গারজনক যুগে বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহাদের স্থান এখন অন্য জাতি আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উদ্ভিদ এখন অল্প সংখ্যক, কেবল ঝাউ-জাতীয় বৃক্ষই (Conifer) কিছু অধিক।

কতক পুরাতন জীবজাতির এ সময় যেমন লোপ পাইয়াছে, তেমনি অসংখ্য অসংখ্য নূতন জাতীয় জীব তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই অন্তর যুগের লোহিত প্রস্তর স্তর সংস্থিতির সময়ে কচ্ছপের প্রথম জন্ম ও এই সময় হইতেই সরীসৃপদিগের আধিপত্য আরম্ভ।

পরে কৃষ্ণবর্ণ চুণে প্রস্তর স্তর সংস্থিতি হইবার সময়ে সমুদ্রে অসংখ্য নূতন শম্বুক জাতীয় জীব ও কচ্ছপ, বার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সরীসৃপ এবং কঠিন আচ্ছাদন বিশিষ্ট ছয় প্রকার নূতন মৎস্য উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকার কনেকটিকাট নদীর লোণা বেলে পাথর স্তরে উষ্ট্রপক্ষীর মত বৃহৎ পক্ষীর তিনটি পদাঙ্গুল চিহ্ন দেখিয়া এই সময়েই প্রথম পক্ষীর আবির্ভাব অনুমান করা হয়। কিন্তু পক্ষীর কঙ্কাল না পাওয়াতে অনুমান ছাড়া ইহার অন্য প্রমাণ নাই। এ সময়ের মৃত্তিকাতে অনেক প্রকার সরীসৃপের পদচিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভেকজাতীয় (Cheirotherium or Labyrinthodon) একরূপ সরীসৃপ অত্যন্ত অদ্ভুত আকার। এই সময়ে অন্য একরূপ বৃহদায়তন অদ্ভুত কুম্ভীর (Nothosaurus) জন্মিয়া ইহার পরবর্ত্তীকালে আরো বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

হ্রদ-শুষ্ক ভিজা মাটিতেই, এই সকল সরীসৃপের পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া যে মাটি ভিজা থাকে তাহাতে কোন চিহ্ন নিবদ্ধ রহিতে পারে না, অঙ্কিত চিহ্ন আবার জোয়ার আসিলেই ধৌত হইয়া যায়। আমেরিকার লোঁণা হ্রদের শুষ্কতটে এখনো এইরূপ চিহ্ন নিবদ্ধ হইতে দেখা যায়।

দ্বিকোষক মুক্তবীজ বৃক্ষজাতি (Dicotyledonous Gymnosperm) এই সময়েই প্রথম উৎপন্ন। এ সময়ের জঙ্গল ভিন্ন ভিন্নপ্রকার ঝাউবৃক্ষ এবং পর্ণীতরু ও ক্যালেমাইট শরগাছ দ্বারাই পূর্ণ।

লোণা বেলেমাটির স্তর কৃষ্ণবর্ণ চুণে প্রস্তর স্তরের পরবর্ত্তী। এই মৃত্তিকাতে যে বহুল পরিমাণে লবণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই সমুদ্রের জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উঠিয়া যাইলে অবশিষ্ট লবণাদি পদার্থ এই সকল স্তরে জমাট রহিয়াছে।

সিন্ধু নদের ব-দ্বীপের সন্নিকটস্থ একটি স্থানে এখনো এইরূপে লবণ সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। কচ্ছ-রণ ঠিক সমুদ্রও নহে, শুষ্ক স্থলও নহে। গ্রীষ্মকালে এ স্থানের জল শুকাইয়া স্তরে স্তরে লবণ জমিতে থাকে, বৎসরের অপর সময়ে আবার ইহা জলে আবৃত হয়। একবার সমুদ্রের কার্য্য দ্বারা এই ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিক বালুকার প্রাচীরে বদ্ধ হইলে ইহা আর সর্ব্বদা জলপ্লাবিত হইবে না। সেই সময় সমস্ত আবদ্ধ জল শুষ্ক হইয়া লবণস্তর নির্ম্মিত হইতে থাকিবে। পরে সময়ে সময়ে সমুদ্রজল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আবার নূতন স্তরের উপকরণ যোগাইবে। ত্রিস্তরের লোণা বেলেমাটির স্তরও উপরোক্ত প্রকারে উৎপন্ন। এই স্তরের অতি অল্পস্থানেই প্রাণী-চিহ্ন পাওয়া যায়—তাহাও কোন নূতন জাতির নহে। এই সময়ে বৃহৎ হ্রদবেষ্টিত দ্বীপ উপদ্বীপে মাঝে মাঝে দুই চারিটি পর্ব্বতও দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রকূলে উদ্ভিদের অভাব নাই, সেই উদ্ভিদাবশেষ এখনো অপর্য্যাপ্ত। লোণাস্তরের উদ্ভিদ অনেকটা পরবর্ত্তী অন্তর যুগের ন্যায়।

কটক হইতে ত্রিরুঞ্চিনাপল্লী এবং পুণা হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ত্রিস্তর যুগের প্রস্তর পাওয়া যায় বলিয়া ভূবেত্তাগণ ঠিক করিয়াছেন, ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের উভয়পার্শ্বস্থ সমুদ্র উপকূল এই সময়ে উৎপন্ন। এই সময়ে সিকিম ও ভূটান লইয়া প্রায় চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল।

জুরাসিক অন্তরযুগ

এই যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং ত্রিস্তর অন্তর যুগের অব্যবহিত পরে উভয়ের মধ্যে আর একটি মৃত্তিকাস্তর পাওয়া যায়। ইহা দুই যুগের কোন যুগেরি অন্তর্গত নহে। এই স্তর অতি অল্পই গভীর বলিয়া ইহার আর বিশেষ বিবরণের আবশ্যক বোধ হইল না, ভূবেত্তারা ইহাকে রিটিক অথবা পেনার্থ গর্ভযুগ বলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে জুরাসিক অন্তরযুগ একটি প্রধান। ফ্রান্সের জুরা নামক পর্ব্বতশ্রেণী এই যুগের মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এই যুগের নাম জুরাসিক হইয়াছে। জুরাসিক যুগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। লায়াস—অর্থাৎ কর্দ্দমময় চুণস্তর, এবং ওয়োলাইট অর্থাৎ ডিম্বাকার প্রস্তর-স্তর। এই দুইরূপ বিভাগ জুরা পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই দুই ভাগে জুরাযুগকে ভাগ করা গিয়াছে। জুরাসিক যুগের উদ্ভিদ ও জীবসমূহে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

পূর্ব্ব সময়ের অনেক জাতীয় জীব এ যুগে লোপ পাইয়া নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ৪০০০ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতীয় জীব এ-সময়ে উৎপন্ন। দানাদার চুণে পাথর ও চুণযুক্ত বেলে-কর্দ্দম দ্বারা জুরা যুগের প্রথম স্তর লায়াস মৃত্তিকা নির্ম্মিত। লায়াস গর্ভযুগ আবার দুই তিনটি স্তর-বিশিষ্ট। প্রত্যেক স্তরে মৃত্তিকার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

আমোনাইট * ও বেলেম্‌নাইনট † নামক শম্বুক এবং ঝিনুক এই সময়ের সমুদ্রে প্রচুর। অনেক প্রকার নূতন জাতীয় শম্বুক, মৎস্য, পুরুভুজ, ঝিনুক প্রভৃতি সামুদ্রিক

* অর্থাৎ মেষশৃঙ্গের ন্যায় বক্রাকার।

† অর্থাৎ তীরবৎ সূক্ষ্মাগ্র।

জীব ব্যতীত, অসংখ্য অদ্ভুদাকার সরীসৃপ এই সময়ে উৎপন্ন। এই অদ্ভুত সরীসৃপদিগের মধ্যে তিনটি প্রধান। এক প্রকার সরীসৃপের (Ichthyosaurus) শরীর বড় আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত ; এখনকার ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইহার মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, শরীর ও লেজ চতুষ্পদ জীবের ন্যায়, অস্থি গ্রন্থি (Vertebra) মৎস্যের ন্যায় এবং পাখ্‌না তিমি মৎস্যের ন্যায়।

ইংলণ্ডের লাইম রিজিস নামক স্থানে মেরি অ্যানিং নামক একটি গ্রাম্য বালিকা তৎস্থানীয় পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর কঙ্কাল আনিয়া বিক্রয় করিত। সে ১৮১১ খৃস্টাব্দে জীব-কঙ্কাল খুঁজিতে খুঁজিতে প্রস্তরের মধ্য হইতে নির্গত একখণ্ড অস্থি দেখিতে পায়, এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহা একটা প্রস্তরীভূত প্রকাণ্ড জীবের দেহাবশেষ বুঝিয়া লোক দ্বারা তাহাকে স্থানান্তরিত করে। এ প্রকার প্রকাণ্ড জীব এইরূপে প্রথমে মানুষের নেত্রগোচর হইল। এই অদ্ভুত জীব প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। ইহার চোয়াল প্রায় ৬ ফুট এবং চক্ষুদ্বয় এক একটা বড় রেকাবির মত। ইহার চক্ষুদ্বয় এমনি সুন্দর অবস্থায় প্রস্তরীভূত হইয়াছিল যে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা এমনি হিংস্র জন্তু যে নিজের জাতিকেই নিজে ভক্ষণ করিত।

দ্বিতীয় প্রকার সরীসৃপ (Plesiosaurus) আরো অদ্ভুত, ইহাও সামুদ্রিক হিংস্র-জন্তু। ইহারও মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, কিন্তু ইহার গলা রাজহংসের গলার মত, অথচ লম্বায় অনেক বড়। ইহার পঞ্জর বহুরূপীর ন্যায়, এবং তিমি মৎস্যের পাখনার ন্যায় ইহার চারিটি পাখনা। ইহার দেহ ও লেজ হ্রস্ব বলিয়া, দেখিতে ইহা অনেকটা কচ্ছপের ন্যায়। এই সরীসৃপের তুলনার দ্বারা বোধ হয় যে প্রথমোক্তটি গভীর জলবাসী ও শেষোক্তটি কূলের নিকটে থাকিত।

তৃতীয় প্রকার সরীসৃপ (Pterodactylus) কতকটা বাদুড়ের মত, কিন্তু ইহার ঠোঁট কুক্কুটের মত লম্বা, দন্ত কুম্ভীরের ওষ্ঠাগ্রের মত, অস্থি-গ্রন্থি, পঞ্জর ও পদাদি কৃকলাসের মত। ইহার শরীরে ডানা আছে অথচ পক্ষীদিগের পালক কিম্বা বাদুড়ের ন্যায় লোম ছিল না। বাদুড়দিগের ন্যায় ইহাও রাত্রিচর ও পতঙ্গভুক, কিন্তু ইহার শরীরের প্রধান প্রধান অস্থির গঠন সরীসৃপের ন্যায়। এই জন্তুর শারীরিক গঠন দেখিয়া বোধ হয় পক্ষ সত্ত্বেও ইহা উড়িতে পারিত না। এই সকল সরীসৃপ-জীবদেহ যেরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাতে ইহারা হঠাৎ কোন বিপ্লবে বিনষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। এই সময়কার উদ্ভিদ ইহার পূর্ব্ব অন্তরযুগের মত। কেবল এক জাতীয় নূতন উদ্ভিদ (Cyccad) এই যুগে প্রথম জন্মে।

ওয়োলাইট গর্ভ যুগ

এই গর্ভ যুগের মত্তিকা গোল-গোল দানা-বিশিষ্ট, সেই নিমিত্ত গ্রীক ভাষায় ইহা উয়োলাইট অর্থাৎ ডিম্বাকৃতি গর্ভ যুগ আখ্যাত হইয়াছে। এই যুগের বিশেষ লক্ষণ স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব। স্তন্যপায়ী জীবের সন্তান জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয়, অন্যপ্রকার জীব অণ্ডজ। সর্ব্ব প্রথমে যে সকল স্তন্যপায়ী জীব জন্মে তাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। এ প্রকার জীবের সন্তান প্রসূত হইয়া মাতার উদরের নিকটস্থ একটি চর্ম্মের থলিয়ায় অবস্থিতি করে এবং সেইখান হইতে স্তন পান করিয়া বড় হইলে বাহির হয়, যেমন আধুনিক কাঙ্গারু।

এইরূপ স্তন্যপায়ী জীবকে মারসূপিয়াল জাতি (Marsupial) কহে। ওয়োলাইট গর্ভযুগে এইরূপ স্তন্যপায়ী জাতিরই জন্ম হয়। পূর্ব্ব অন্তর যুগের ন্যায় এ যুগেও শম্বুক ঝিনুক ইত্যাদি নানাপ্রকার নূতন সামুদ্রিক জীব ও প্রবালকীট জন্মে। এই যুগেও আবার ৩/৪ প্রকার প্রকাণ্ড নূতন সরীসৃপ-কঙ্কাল দেখা যায়। ইহারা অনেকটা আমাদের গাঙ্গেয় কুম্ভীরের মত। ইহার মধ্যে একটি (Ceteosaurus) পঞ্চাশ ফুট লম্বা, এই প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যাকার সরীসৃপ দেখিয়া অধ্যাপক ফিলিপস বলেন যে ইহার ন্যায় বলবান ও প্রকাণ্ডকায় জীব পৃথিবীতে কখনো জন্মে নাই।

এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নানাপ্রকার বৃহৎ আরণ্যবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্ব গর্ভ যুগের ন্যায় এ গর্ভ যুগও তিন স্তরে বিভক্ত। ওয়োলাইট যুগের চুণে প্রস্তর কি প্রকারে দানাদার হইয়াছে তাহা এখনো সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। অনেকে বলেন, যেমন এখন টেনেরীফ জলমগ্ন শৈলে এবং ইটালির ত্রিবলির জলপ্রপাতে জল ঘর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকা দানাদার হয়, তেমনি জলের ঘর্ষণ দ্বারাই ওয়োলাইট মৃত্তিকা দানাদার হইয়াছে। কিন্তু যেখানে জলের ঘর্ষণ সম্ভাবনা নাই, সেখানেও যখন ঐরূপ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বোধ হয়, যেমন অপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ফাটিক পদার্থের একটি বিশেষ আকৃতি হয়, ইহাও সেইরূপ একটি নিয়মের বশবর্ত্তী। এই জুরাসিক যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবী নিয়মিত সমানরূপে শীতল হইয়া আসিতেছিল এবং এখন অবারিত বৃষ্টির প্রাচুর্য্য অনেক কম। পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার অদ্ভুত জন্তুই এখনকার পৃথিবীর প্রধান অধিবাসী ; সমুদ্র শম্বুকবহুল এবং প্রকাণ্ড কচ্ছপে পরিপূর্ণ।

কেবল এক জাতীয় স্তন্যপায়ী জীবমাত্র এখন জন্মিয়াছে, পতঙ্গাদি জীবই শূন্যের অধিপতি, পক্ষী এখনো জন্মায় নাই। ভারতবর্ষে রাজমহল কচ্ছদেশ শ্রীহট্ট ও ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এই সময় উৎপন্ন।

•

চা-খড়ি বা ক্রিটেসস্ অন্তরযুগ

এই যুগের সমস্ত স্তরই প্রায় চা-খড়ি নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম চা-খড়ি অন্তর যুগ। কিন্তু এই সময়েই যে প্রথম পৃথিবীতে চা-খড়ি দেখা দেয় এমন নহে, সাইল্যুরিয়ান অন্তরযুগ হইতে ক্রমাগতই চা-খড়ি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু চা-খড়ি স্তর সংস্থিতিই এই সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

শম্বুক জাতীয় জীবের কঠিন আচ্ছাদনের উপর উষ্ণ জলের প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা বহুকাল ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে চা-খড়ির স্তর জমিতেছিল। পরে কি প্রকারে এই সকল স্তর সমুদ্র-গর্ভ হইতে উন্নমিত হইয়া শৈলশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। এবিষয়ের যথার্থ কারণ এখনো নিশ্চিতরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে সর চারল্স্ লায়েল এবং অধ্যাপক রামজে ইংলণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ চা-খড়ি পর্ব্বত উৎপত্তি সম্বন্ধে এই বলেন যে, এখনকার গ্রেট ব্রিটন ও তৎসন্নিহিত দেশ পুরাকালের কোন এক বৃহৎ মহাদেশের মধ্য দিয়া বহমান প্রকাণ্ড নদীর জলমগ্ন বদ্বীপের অবশেষ মাত্র। জোয়ার ভাঁটার কার্য্যবশতঃ সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত চা-খড়ি, সেই নদীর মোহানায় জমিয়া জমিয়া ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতরূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ মহাদেশ য়ুরোপ নহে,

উহা এক্ষণে জলমগ্ন হইয়াছে। লায়েলের মতে উহা আমেরিকা কিম্বা আসিয়া অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল ; তিনি আরো বলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ অনেক মহাদেশ বারম্বার জলমগ্ন হইয়াছে। চা-খড়ির যে পর্ব্বতগুলি স্থানে স্থানে দেখা যায় তাহা সেই মহাদেশের চিহ্নাবশেষ মাত্র। এই সময় হইতে পৃথিবীর বর্ত্তমান আকৃতির সূত্রপাত। ফরাসী ভূবেত্তা লিকক বলেন যতই আমরা বর্ত্তমান কালের নিকট আসিতেছি, ততই দেখিতে পাই যে মেরুসন্নিহিত প্রদেশে মৃত্তিকা স্তর সংস্থিতি বন্ধ হইয়া মধ্যদেশই নূতন মৃত্তিকা সংস্থিতি দ্বারা ফুলিয়া উঠিতেছে। এখনকার শীতাতপ প্রধানতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এখন বৎসরে ঋতুর বিভাগ আরম্ভ হইল। শীতাতপের বৈষম্য হেতু পৃথিবীর উপরিভাগে কোটিবন্ধ প্রথম উৎপন্ন হইল। এখনকার উদ্ভিদ আমাদের বর্ত্তমান উদ্ভিদের প্রথম সোপানস্বরূপ। এ অন্তর যুগের উদ্ভিদজাতিই ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান উদ্ভিদরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এখনকার ও তখনকার জীবজন্তুর মধ্যে সেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। তালজাতীয় বৃক্ষ পৃথিবীতে এই প্রথম উৎপন্ন হইল এবং এই সময়ে উৎপন্ন ওক আকরোট ও বটবৃক্ষ এখনো পৃথিবীতে বর্ত্তমান। এ সময় পর্ণীতরু খুব কমিয়া আসিয়াছিল। জন্তুর মধ্যে এখন সরীসৃপ প্রধান। এখন প্রকাণ্ড দুই জাতির সরীসৃপ দেখা যায়।

একটি (Iguanodon) লম্বায় ৫০/৬০ ফুট এবং ইহার দেহ একটি বৃহদাকার হস্তীর ন্যায়। অপরটি ইহা অপেক্ষাও লম্বা। বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে অনেক বাদানুবাদের পর দ্বিতীয়টি (Megalosaurus) সামুদ্রিক সরীসৃপ বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ইহা লম্বে প্রায় ৬০/৭০ ফুট, এবং দেখিতে কতকটা কুম্ভীরের মত।

এই সময়েই প্রথম পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে নর্ম্মদা প্রদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সংলগ্ন উপকূল, এই সময়ে উৎপন্ন।

তৃতীয় প্রস্তাব

তৃতীয় যুগ

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ আফ্রিকা সংলগ্ন একটি মহাদেশভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্বে আধুনিক আসামের অধিকাংশ, পশ্চিমে সম্পূর্ণ না হউক প্রায় সমস্ত পারস্য, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু নদীর সন্নিহিত প্রদেশ, এবং গাঙ্গেয় প্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া সমুদ্র অবস্থিত ছিল। এই পশ্চিম সমুদ্রের এক শাখা কাশ্মীরের মধ্য দিয়া ল্যাডাক উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে তিব্বত ও হিমালয় প্রদেশ সমুদ্র হইতে অল্পই উচ্চ ছিল, পরে যে বিপ্লব দ্বারা ক্রমশ হিমালয় উন্নত হইয়াছে, যাহার দ্বারা হিমালয়ের স্তর সকল লণ্ডভণ্ড হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা ইয়োসিন অন্তরযুগের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান কালেও চলিতেছে।

হিমালয় পর্ব্বত আসাম প্রদেশ ব্রহ্মদেশ কচ্ছ ও সিন্ধুদেশে মাঝে মাঝে এখনো যে প্রবল ভূকম্পন দেখা যায় তাহা সেই বিপ্লবের ধারাবাহিত্যের প্রমাণ। এই বিপ্লবের

কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ সত্ত্বেও এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশের অভ্যন্তর শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হওয়াতে সেই সকল স্থান দমিয়া হিমালয়কে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে।

এ সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের সহিত সংলগ্ন ছিল কি না নিশ্চয় বলা যায় না, তবে সংলগ্ন থাকাই আধুনিক ভূবেত্তাগণ সম্ভবপর মনে করেন।

অনেক ভূবেত্তাদের মত যে এতাবৎকাল দাক্ষিণাত্য ও হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, পরে ইয়োসিন অন্তরযুগের শেষ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া তৃতীয়যুগেই প্রথম গঙ্গা ও সিন্ধু মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র শুকাইয়া উপরোক্ত উভয় প্রদেশ সংলগ্ন হইল। কিন্তু ভূবেত্তা ব্ল্যানফর্ড বলেন * সম্ভবতঃ চা-খড়ি অন্তর যুগের শেষ হইতেই ভারতবর্ষ-উপকূল স্থূলতঃ আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা হইতে দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। একটি, যদি চা-খড়ি অন্তর যুগের শেষে ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ একই-সংলগ্ন-ভূখণ্ড না হইয়া সমুদ্রদ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকিত, তাহা হইলে তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে উৎপন্ন সমুদ্র-মৃত্তিকা-স্তরে সামুদ্রিক জীব কঙ্কাল পাওয়া যাইত, কিন্তু রাজমহেন্দ্রী হইতে গারো পর্ব্বত পর্য্যন্ত এ সময়ের মৃত্তিকায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে স্থূলচর্ম্মী জন্তু (Pachyderm) হস্তী মহিষ ইত্যাদি জন্মিবার আগে ভারতবর্ষের উত্তরভাগেই এই সকল জন্তু উৎপন্ন হয়, কেননা উত্তরেই তৃতীয় যুগের প্রথম ভাগ ইয়োসিন অন্তর যুগের মৃত্তিকায় হস্তী মহিষ জাতীয় স্থূলচর্ম্মী জীব কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। পরে শীতের তাড়নে উহারা উত্তর হইতে দক্ষিণে পলায়ন করে। যে সকল প্রাণী উত্তরে লোপ পাইয়াছে, তাহারা ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে এবং ইহার সম-নিরক্ষান্তর প্রদেশে এখনো বর্ত্তমান, এবং দাক্ষিণাত্যে আবার যে সকল জীব এখন বিলুপ্ত, তাহা আফ্রিকায় দেখা যায়। যদি চা-খড়ির শেষে ভারতবর্ষ উপকূল সংলগ্ন না থাকিত, তাহা হইলে তৃতীয় যুগের প্রথমেও সমুদ্র দ্বারা উত্তর দক্ষিণ বিচ্ছিন্ন থাকিলে কি করিয়া স্থূলচর্ম্মী জাতি দক্ষিণে উপস্থিত হইবে? তাহা হইলে তৃতীয় যুগের মধ্য অন্তর যুগ মায়োসিন কালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মৃত্তিকাতে হস্তী মহিষ কঙ্কাল পাওয়া যাইত না।

ব্ল্যানফর্ডের মতে ভারতবর্ষের উপকূল চা-খড়ি অন্তর যুগের শেষাংশ হইতে স্থূলতঃ প্রায় একইরূপ আছে, তবে চা-খড়ি অন্তর যুগে ভারতবর্ষের উপকূলে মাঝে মাঝে যে সকল সমুদ্র শাখা প্রবিষ্ট ছিল তাহা কালে শুকাইয়া স্থলে পরিণত হইয়াছে।

কচ্ছ ও কাটিবার প্রদেশ পূর্ব্বে দ্বীপাকার ছিল, ইহা তৃতীয় যুগেই বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশ তৃতীয় যুগের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে তাহা এরূপ সমতল ক্ষেত্র কি করিয়া হইল? সমুদ্র-গর্ভ শুকাইয়া মাটী হইলে সেই নূতন স্থল প্রথমে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নীচু হয় এবং প্রায় সর্ব্বত্রই একরূপ উচ্চ বলিয়া সমতল ক্ষেত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশ যদি বহুদিন উৎপন্নস্থল হয় তবে ইহা কি করিয়া সমতল হইল?

* See Medlicott and Blandford's *Manual of the Geology of India.* Vol I—Int.

যে কারণে হিমালয় উচ্চ হইয়াছে সেই কারণে সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশও সমতল হইয়াছে। একটা গোলাকার বস্তুর কোন স্থান নীচু হইয়া চেপটা হইয়া পড়িলে অর্থাৎ কোন গোলাকার পদার্থ ক্রমশঃ সরলরেখার অনুরূপ হইতে সচেষ্ট হইলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং অধিক স্থানের অভাব হইলে একদিক উচ্চ ও একদিক নীচু হইয়া পড়ে। সেই নিয়ম অনুসারে ভূগর্ভের সঙ্কোচন হেতু সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশ নীচু ও হিমালয় উন্নত হইয়াছে।

কিন্তু গণনা দ্বারা দেখা যায় যে, সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশের অবনতিবশতঃ হিমালয়ের বর্ত্তমান উচ্চতা উৎপন্ন হইতে পারে না; উহাতে হিমালয়কে ঊর্দ্ধসংখ্যা সাত হাজার ফুট উন্নত করিতে পারে। সুতরাং সিন্ধু-গাঙ্গ প্রদেশের অবনতি ও হিমালয়ের উন্নতির পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই—এতদুভয়ই পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তির ক্রিয়াফল।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ইয়োরোপের ভূপৃষ্ঠ অবস্থা কিরূপ ছিল এইবার দেখা যাউক।

ক্রিটেসস অন্তর যুগের শেষে ইয়োরোপে সমুদ্রভাগই অধিক। স্পেন এবং ইটালির অধিকাংশ, হলাণ্ড, সুইজারলাণ্ড, প্রসিয়া, হানগেরি, ওয়ালেকিয়া, উত্তর রুসিয়া ও পারিসের কতকাংশ লইয়া চা-খড়ি অন্তর যুগের শেষে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। এ সময় জুরাসিক যুগ উৎপন্ন সারবর্গের (Cherbourg) ভূখণ্ডের দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সংযুক্ত ছিল। পরে ঐ ভূখণ্ড সমুদ্রগ্রস্ত হওয়াতে অধুনা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় যুগে ক্রমশঃ ক্রিটেসস অন্তর যুগের এই বিস্তৃত মহাসমুদ্র শুকাইতে আরম্ভ করিয়া ইয়োরোপের আধুনিক স্থলভাগ উৎপন্ন হইয়াছে।

এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ—সম্পূর্ণরূপে নূতন প্রাণীজাতির আবির্ভাব। এ সময় প্রায় সমস্ত পুরাতন স্থলচর প্রাণী অন্তর্হিত করিয়া স্তন্যপায়ী জীবের দ্বারাই পৃথিবীর স্থলভাগ পূর্ণ হইল। প্রথম যুগে কাঁকড়া, মৎস্য ও দ্বিতীয় যুগে সরীসৃপদিগের যেমন বিশেষ রূপ প্রাদুর্ভাব, তেমনি এই যুগে স্তন্যপায়ী জীবই প্রধান, সেইজন্য ইহার আর একটি নাম স্তন্যপায়ী যুগ। এই সময়ে যে কত আকৃতির কত অসংখ্য প্রকারের স্তন্যপায়ী জীব ছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয়ই করিতে পারেন না।

আমরা দ্বিতীয় যুগের জুরাসিক সময়ের যে কাঙ্গারু জাতীয় স্তন্যপায়ী জীবের কথা বলিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তৃতীয় যুগের স্থূলচর্ম্মী অর্থাৎ হস্তী মহিষ প্রভৃতি জাতীয় জীবই পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী জীব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তৃতীয় যুগকে যে তিন ভাগে ভাগ করা যায় তাহার প্রথম ভাগে এই জাতীয় জীবেরই অধিক প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এবং আর দুই ভাগের স্তন্যপায়ী জীব সকল এত প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত গঠনের যে, তাহাদের জাতীয় সাদৃশ্যও এখনকার জীবে পাওয়া যায় না, সে সকল জাতীয় জীব এখন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত। কেবল তৃতীয় যুগের শেষাংশে যে সকল জীব জন্মিয়াছে, তাহার অধিকাংশ এখনও বর্ত্তমান। এ যুগের শেষ দিকে অনেক পক্ষী ছিল বটে কিন্তু তাহারা স্তন্যপায়ী জীবের মত বহুসংখ্যক নহে। কুম্ভীরাকার একরূপ প্রকাণ্ড সরীসৃপ তৃতীয় যুগের সকল সময়েই দেখা যায়। আমাদের বর্ত্তমান সময়ের মত তৃতীয় যুগের সমুদ্রে নানা জাতীয় নানাপ্রকার জীবের বসতি, কিন্তু দ্বিতীয় যুগে আমরা অ্যামোনাইট বেলেমনাইট ইত্যাদি যে সকল শম্বুকজাতির প্রাচুর্য্য দেখিয়াছি তাহা আর এখনকার সমুদ্রে নাই। এ

যুগের শম্বুকজাতীয় যে সকল জীব দেখা যায়, তাহা অনেকটা আমাদের সময়ের মত।

এ যুগের আশ্চর্য্যরূপ প্রাণী প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এ সময়ে ফারমিনিফেরা ও নিউমিলাইট নামক শম্বুকজাতীয় ক্ষুদ্র জীব এত বহুসংখ্যক একত্রে বিচরণ করিত যে ইহাদের দেহাবশেষ দ্বারা এক এক স্থানে শতাধিক ফুট পরিমাণ স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নহিলে ইহাদের দেখাই যায় না।

এই যুগের কতক উদ্ভিদ আমাদের উদ্ভিদের কাছাকাছি, আর কতক একেবারে আমাদের মত।* দ্বি-পত্র উদ্ভিদ এ যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ফুল ও ফল এই প্রথম হইল। নানা বর্ণের ফুল ও নানারূপ ফল দ্বারা এখন চৌদিক সুশোভিত। বনফুল শোভিত হরিবর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গের সীমা নাই। বৃহৎ বৃহৎ ফুল-বৃক্ষ সঙ্কুল বনে নানা প্রকার পাখীদের বসতি। বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীর মেঘান্ধ বাস্পাবরণ ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া এই সকল সূক্ষ্ম ফুসফুস বিশিষ্ট (Delicate pulmonary) জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূ-পঞ্জর এখন এত স্থূল যে আভ্যন্তরিক উত্তাপ আর বড় উপরে উঠিতে পারে না। তৃতীয় যুগে পৃথিবীর উত্তাপ স্থূলতঃ বর্ত্তমান সময়ের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় ছিল, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপের ন্যূনাধিক্য বশতঃ পৃথিবীর দ্রাঘিমা ভেদে শীতাতপের বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং মেরুদেশে অল্প অল্প শীত দেখা দিয়াছে।

প্রচুর বৃষ্টি দ্বারা এই সময়ে যে সকল প্রধান প্রধান নদী ও পরিষ্কার জলের হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছিল পরে সেই সকল প্রকাণ্ড নদী-মোহানার ব-দ্বীপই ক্রমে নূতন নূতন দেশরূপে পরিণত হইল। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে এখন জল ও স্থল যে অবস্থায় দেখিতেছি, ইহা তৃতীয় যুগেরই শেষভাগে এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয় যুগটি বিখ্যাত লায়েল তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ইয়োসিন মায়োসিন ও প্লায়োসিন। ইয়োসিন অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রারম্ভ, মায়োসিন অর্থাৎ অল্পাধুনিক, প্লায়োসিন অর্থাৎ অধিকাধুনিক। এই সকল আখ্যাদ্বারা বর্ত্তমান সময়ের জীবজন্তু হইতে তৎসাময়িক জীবজন্তুর প্রভেদ দর্শাইতে তিনি এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

এখন এই তিন ভাগের স্থূল লক্ষণ সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এ অংশ শেষ করা যাউক।

ইয়োসিন অন্তর যুগ

পূর্ব্বের সেই মহা সমুদ্রের অনেক অংশ এখন স্থলে পরিণত। নানা নদ নদী হ্রদ ও তড়াগে শোভিত-স্থল এখন নানা প্রকার উদ্ভিদ ও জীবজন্তুপূর্ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উদ্ভিদ, এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান যুগের উদ্ভিদ এই যুগে একত্রে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা জাতীয় লুপ্ত বৃক্ষের সহিত আধুনিক বার্চ আকরোট ওক কেলু ও ঝাউ জাতীয় দেবদারু, ফার, ইউ, সাইপ্রেস ইত্যাদি নানাপ্রকার বৃক্ষ একত্রে বিরাজমান।

নানা জাতীয় পর্ণীতরু শৈবাললতা ও জল-উদ্ভিদের অভাব নাই। আশ্চর্য্য এই,

---

* যে বৃক্ষের অঙ্কুর উদগমকালে একটিমাত্র পত্র উদগত হয় তাহা একপত্র অর্থাৎ Monocotyledon, যথা, পেঁয়াজ যব ছোলা ইত্যাদি। যাহার দুইটি পত্র উদগত হয় তাহা দ্বি-পত্র অর্থাৎ Dicotyledon যথা, মটর পোস্ত কুল পেয়ারা ইত্যাদি।

তখনকার সরোবরে আধুনিক জলজ উদ্ভিদ অনেক দেখা যায়, যেমন একরূপ পানিফল (Water Caltrop)। তখনকার উদ্ভিদের মধ্যে ২০০০ জাতি বিদিত। ১৪৩ দ্বি-পত্র (Dicotyledon) জাতি ; ৩৩ এক-পত্র (monocotyledon) ; ৩৩ পুষ্পহীন (cryptogam) জাতি, যথা, শৈবাল, পর্ণীতরু, ঝাউ, সাইক্যাড ইত্যাদি। স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, পতঙ্গ, কীট, কচ্ছপ, শম্বুক ইত্যাদি এই যুগের জীব। এ সময়ে ইয়োরোপের উত্তাপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত ছিল বলিয়া আধুনিক গ্রীষ্ম দেশের জীব কঙ্কাল এ সময়ে ইয়োরোপের মৃত্তিকাতে অনেক পাওয়া যায়। এই যুগের স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে স্থূলচর্ম্মীরাই প্রধান। এই সময়ে প্যালিওথেরিয়াম অর্থাৎ পুরাতন জন্তু, অ্যানোপ্লথেরিয়াম অর্থাৎ নিরস্ত্র জন্তু ও জিফাডেন (Palaeotherium, Anoplotherium, Xiphodon) বলিয়া যে সকল স্থূলচর্ম্মী জন্তু ছিল তাহারা উদ্ভিদাহারী এবং পালে পালে থাকিত। তাহাদের শারীরিক আকার ঘোড়া গণ্ডার ও শূকরের মধ্যবর্ত্তী। এই জাতীয় নানা প্রকার ও নানা আয়তনের জীব কঙ্কাল এই যুগে দেখা যায়। পেলিওথেয়েরিয়াম, টেপার নামক শূকর ও গণ্ডারের মধ্যবর্ত্তী, ইহার অতি প্রকাণ্ড চক্ষু, ক্ষুদ্র কলেবর, চারিটা পা প্রকাণ্ড, খর্ব্ব ও মাংসাল, উচ্চতায় ইহা বৃহৎ ঘোড়ার ন্যায়। ইহার শূণ্ড টেপার শূকরের মত ক্ষুদ্র এবং দন্ত গণ্ডারের মত।

অ্যানোপ্লথেরিয়ম জন্তুর খুর গরুর ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত, পদের অগ্রভাগ উষ্ট্রের ন্যায় ও দন্ত গণ্ডারের ন্যায় ; আয়তনে ইহা গর্দ্দভের মত, ইহার লাঙ্গুল অতি বৃহৎ, এবং গোড়া মোটা। জলে সন্তরণের সময় এই বৃহৎ লাঙ্গুল হালের কাজ করিত।

জিফডনের আয়তন অনেকটা শামা হরিণের ন্যায়। ইহাদের লাঙ্গুল ছোট এবং কর্ণ হরিণের ন্যায় বৃহৎ, কিন্তু ইহাদের গাত্র লোমাচ্ছাদিত নহে।

এই সকল জন্তু ছাড়া ইয়োসিন অন্তর যুগে উৎপন্ন প্যারিসের সন্নিহিত সোহাগার আকরে শূকর প্রভৃতি অন্যান্য প্রকার স্থূলচর্ম্মী জীব কঙ্কাল এবং শ্বাপদ পশুর পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়েই নিউমিউলাইট নামক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শম্বুকদ্বারা সমুদ্র পূর্ণ ছিল এবং এই সকল মৃত জীব-স্তর দ্বারা পিরিনিস পর্ব্বতশ্রেণী স্থানে স্থানে নির্ম্মিত, এবং এই স্তর দ্বারাই ইজিপ্টের লোকেরা পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের কঙ্কাল দ্বারা শত শত ফুট উচ্চস্তর হইতে কত শত শত বৎসর লাগিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তৃতীয় যুগের এই নিউমিউলাইট মৃত্তিকা-স্তর ইয়োরোপ আসিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সকল স্থানেই পাওয়া যায়। এক এক স্থানে নিউমিউলাইট স্তর সহস্র ফুট উচ্চ।

ইয়োসিন মৃত্তিকার মধ্যভাগে নিউমিউলাইট স্তর সন্নিবেশিত, কিন্তু এই স্তর হিমালয়, কারপেথিয়ান, আল্প, পিরানিস পর্ব্বতের অতি উচ্চাংশে দেখিয়া মনে হয় এই যুগে পৃথিবীতে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিপ্লবের দ্বারাই ঐ সকল পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশ নির্ম্মিত।

ইয়োসিন অন্তর যুগে ভারতবর্ষে, সিন্ধু আসামের কতকাংশ এবং ব্রহ্মদেশে চুণে প্রস্তর স্তর উৎপন্ন। হিমালয় যে এই যুগ হইতেই পর্ব্বত রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মায়োসিন অন্তর যুগ

শীত গ্রীষ্ম উভয়দেশের উদ্ভিদ এই অন্তর যুগে একত্রে জন্মিয়া ইহাকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তরযুগ হইতে ভিন্ন করিয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা দেশের নানাপ্রকার বৃক্ষ এবং শীত দেশের ম্যাপল আকরোট পিচ এলম ওক, ও বাঁশ তাল প্রভৃতি বৃক্ষাদি ইয়োরপে এই অন্তর যুগে একসঙ্গে জন্মে। ইহা ছাড়া এ সময়ে ডুম্বুর বটবৃক্ষ প্রভৃতিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এক-পত্র বৃক্ষ শৈবাল-উদ্ভিদ-পর্ণী-তরু এবং ঝাউজাতীয় বৃক্ষ পূর্ব্ব অন্তর যুগ অপেক্ষা এখন সংখ্যায় অল্প এবং তালজাতীয় বৃক্ষই বহু সংখ্যক। পূর্ব্ব অন্তর যুগের বৃক্ষাদি ছাড়া এ সময়ে ঝাউ ও তালজাতীয় অনেক নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়াছে। সংক্ষেপে বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত বৃহৎ বৃক্ষেরই প্রথম ছাঁচ এই অন্তর যুগে দেখিয়া মনে হয় উদ্ভিদরাজ্য এ সময়ে তাহার উন্নততম অবস্থায় উঠিয়াছে। এই যুগের বৃক্ষাদি হইতে একপ্রকার নিকৃষ্ট অঙ্গার উৎপন্ন।*

স্তন্যপায়ী, পক্ষী এবং সরীসৃপ এ সময়ের প্রধান জীব। এ সময় অনেক নূতন স্তন্যপায়ী জন্মিয়াছে। এ সময়ে উৎপন্ন পশুদের মধ্যে বানর বাদুড় কাঙ্গারু জাতীয় নানাবিধ জন্তু, মাংসাশী ও রোমন্থক জীব, কুকুর ইঁদুর কাটবিড়াল এবং খরগোস জাতীয় অনেক প্রকার জীব ; পক্ষীদিগের মধ্যে চড়াই বক কাক ইত্যাদি, সরীসৃপদিগের মধ্যে সাপ ব্যাং গিরগিটি এখনো বর্ত্তমান। কিন্তু এ সময়ের প্রধান প্রাণী স্থূলচর্ম্মী স্তন্যপায়ী, এখন লোপ পাইয়াছে, তাহাদের কঙ্কালমাত্র এখন অবশিষ্ট। তাহারা এ সময়ে যেমন অসংখ্যক তেমনি অদ্ভুতদাকার ও বৃহদায়তন।

এসময়ের একরকম প্রকাণ্ড অদ্ভুত স্থূলচর্ম্মী জন্তুর কঙ্কাল দেখিয়া প্রাণীবেত্তারা তাহার নাম ভয়ঙ্কর জীব (Dinotherium) রাখিয়াছেন। ইহার আকার অনেকটা হস্তীর ন্যায়, কিন্তু হস্তী হইতে ইহা অনেক প্রকাণ্ড, এবং ইহার নিম্নের দন্তস্তর হইতে দুইটি দন্ত মহিষশৃঙ্গের ন্যায় নিম্নে বক্র হইয়া নির্গত। ইহা দেখিতে যদিও ভয়ানক, কিন্তু শষ্যাহারী। এই সময়ের হস্তীজাতীয় আর একরূপ স্থূলচর্ম্মীকে মাশটডন (অর্থাৎ স্তননিভকার দন্তবিশিষ্ট) কহা যায়। ইহাদের বাহ্যিক আকার অনেকটা হাতীর মত, তবে হাতী অপেক্ষাও ইহারা স্থূলচর্ম্মী এবং লম্বা। ইহাদের কসের দাঁতের বিভিন্ন গড়নই আধুনিক হস্তী হইতে ইহাদিগকে বিশেষরূপে ভিন্ন করিয়াছে।

পেনসিলভেনিয়া ইউনিভারশিটির অধ্যাপক বারটন, খড়ি মৃত্তিকাস্তরের ৬ ফুট নীচে যে মাশটডন কঙ্কাল পাইয়াছিলেন, তাহার একটি দন্ত সতের পাউণ্ড ওজনে হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকার আদিমবাসীরা ইহাকে বৃষের পিতা বলে। ফাব্রি নামে একজন ফরাসী, প্রাণীবেত্তা বুফঁকে লেখেন, ক্যানেডা এবং লুইশিইনা প্রদেশে যেখানে মাশটডন কঙ্কাল প্রচুর পাওয়া যায়, সেই প্রদেশ-বাসীদের প্রত্যেক শ্রুতি পরম্পরায় ও পুরাণ গানে এই জন্তুর কথা উল্লিখিত। তাহাদের একটি গানে আছে যখন মনিটর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীতে

* সুইজরল্যাণ্ডের এ অন্তর যুগের মৃত্তিকা এরূপ উদ্ভিদাবশেষ সমাকীর্ণ, যে অধ্যাপক হিয়ারের (Heer) মতে এস্থান তৎকালে ব্রেজিল ও জ্যামেকার সদৃশ নিবিড় অরণ্যময় ছিল। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান আমেরিক উদ্ভিদ এত প্রচুর পাওয়া যায় যে উঙ্গের (Unger) বলেন মায়োসিন অন্তরযুগে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর স্থলরূপে আমেরিকা ও ইয়োরোপকে সংযুক্ত রাখিয়াছিল।

নামিয়া, তাঁহার সৃষ্ট জন্তুসকল, কে কেমন সুখে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বাইসন অর্থাৎ আমেরিক মহিষ বলিল, "ঐ ভয়ানক বৃষপিতা পর্ব্বত হইতে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে নামিয়া আমাদের কখন খাইতে আসেন, তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিতে হইলে আমরা এই তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে চরিতে পাইয়া সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারিতাম।" আমেরিকার চৈন নামক প্রাচীন জাতির একটি প্রবাদ যে, পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড জন্তুরা, তাহাদের সমান প্রকাণ্ডাকার মনুষ্যের সহিত বাস করিত। কিন্তু ঈশ্বর অনবরত বজ্রাঘাত দ্বারা সেই সকল মানুষ ও জন্তু এককালে বিনাশ করিলেন। বর্জ্জিনিয়ার আদিম অধিবাসীদের আবার অন্যরূপ গল্প আছে। তাহারা বলে, এই ভয়ানক জন্তু অন্য জন্তুদের বধ করিত বলিয়া ঈশ্বর বজ্রদ্বারা সকলকে বিনষ্ট করিলেন, কেবল একটিমাত্র পুং মাশটডন বজ্র পড়িবার সময় মস্তক নাড়িয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু পালাইবার সময় গাত্রে বজ্র পতন দ্বারা আহত হইয়া যে হ্রদে সে লুকাইয়াছিল, সেইখানেই মরিয়া যায়। এই সকল গল্প হইতে মনে হয় মাশটাউন, মামথ হস্তীর সমকালীন, হয় আদিম মনুষ্যে ইহা দেখিয়াছে, কিম্বা ঠিক মনুষ্য জন্মাইবার আগেই ইহা লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক, ইহা যে মানুষ জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে নহে, তাহা এই সকল গল্প হইতে প্রকাশ পায়। এই মাশটাডন হস্তী সম্বন্ধে আর একটি ঐতিহাসিক সত্য গল্প আছে। রোন নদীর বাম পার্শ্বে ডফিনি প্রদেশে সোমঁ নামক দুর্গের সন্নিহিত বালুকা স্তর খুঁড়িতে খুঁড়িতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারিতে সেই খননকারী লোকেরা একটি হস্তির কতকগুলি অস্থি পায়। তখন এইরূপ পুরাতন জন্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। সেই দেশীয় মাজুইয়ার (Mazuyer) নামক একজন চিকিৎসক এই অস্থি সকল কিনিয়া রটনা করিলেন যে টিউটবকাশ রাজার (Teutobocchus Rei) নামাঙ্কিত ৩০ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া একটি কবরে তিনি এই অস্থি সকল পাইয়াছেন এবং আরো বলিলেন যে সেই কবরস্থিত মারিয়াস (Marius) মূর্ত্তি অঙ্কিত পঞ্চাশ মুদ্রা তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে।

টিউটোবোকাস কিম্ব্রি নামক প্রাচীন জর্ম্মান জাতির সেনাপতি হইয়া গল আক্রমণ করিতে গমন করেন এবং প্রভেন্‌স প্রদেশের আই নামক নগরে মারিয়াস কর্ত্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া রোমে আনিত হয়েন। মাজুইয়ার ২৫ ফুট লম্বা দশ ফুট চওড়া একটি অস্থি কঙ্কাল দেখাইয়া বলিলেন, ইহাই মৃত টিউটোবকাস দেহাবশেষ। তিনি এই মিথ্যা টিউটোবকাসের দেহ ফ্রান্স ও জার্ম্মনির প্রায় সর্ব্বত্রই প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত কঙ্কাল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এই কঙ্কাল লইয়া মহা বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। শরীরতত্ত্ববিদ রিয়োল্যাঁ টিউটোবোকাসের এই দেহ হস্তী কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নহে এই প্রমাণ করিবার জন্য হারবিকট নামক এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া মহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পরস্পর মহা লেখনীযুদ্ধ চলিতে লাগিল। গাসেনডি (Gassendi) বলিয়া আর একজন পণ্ডিত প্রমাণ করিলেন যে মারিয়সের মূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রাও মাজুইয়ারের প্রবঞ্চনা, কেন না সে মুদ্রায় গথিক অক্ষর অঙ্কিত।

এই মিথ্যা টিউটোবকাস-দেহ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোর্দোতে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে ইহা পারিসের মিউজিয়ামে প্রেরিত হয়। ব্ল্যাঁভিল ইহা দেখিযা মাশটডন অস্থি স্থির

করেন। এবং যাহারা এ অস্থি একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহা মনুষ্য কঙ্কাল বলিয়া ভ্রম হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক।

এই অন্তরযুগেই প্রথম বানরের জন্ম। এ সময়ের দুই তিন প্রকার বানর কঙ্কাল পাওয়া যায়। মায়োসিন সমুদ্রে ৯০ জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন নূতন জীব জন্মে। তাহার মধ্যে কয়েক জাতীয় জীব এখনো বর্ত্তমান, যেমন এখনকার কাঁকড়া, চিংড়িমাছ ইত্যাদি।

এই যুগের কয়লায় আর এক অপরূপ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হলদে ধূনা, Amber। তৃতীয় যুগের লুপ্ত দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ নির্য্যাস অনেকদিন ভূমধ্যে প্রোথিত থাকিয়া এইরূপ আকরিক ধূনা হইয়াছে। বালুকা ও কর্দ্দম-মধ্যস্থিত এই ধূনা ব্যালটিক-সমুদ্র-তরঙ্গ-ধৌত হইয়া কূলে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং ইহা দ্বারা বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ফৈনিসিয়েরা বাণিজ্যার্থে এই ধূনা কুড়াইতে ব্যালটিক-সমুদ্র-তীরে আরোহণ করিত। এখন গভর্ণমেণ্টে ইহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। এই ধূনা এখন প্রধানত ডানৎসিক ও মেমেলের মধ্যস্থিত জর্ম্মান উপকূলে প্রাপ্তব্য। অন্য মূল্য ছাড়া ইহার একটি বিশেষ মূল্য এই, তৃতীয় যুগের যে সকল প্রকার কীটপতঙ্গ-দেহ ইহাতে রক্ষিত, তাহাদের বর্ণ এবং আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

মায়োসিন অন্তর যুগে ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশের পেগু, আসাম ও সিন্ধুর কতকাংশ এবং মারি প্রদেশ উৎপন্ন।

প্লায়োসিন অন্তর যুগ

তৃতীয় যুগের এই শেষ অন্তর যুগে বিষম বিপ্লব চিহ্ন পাওয়া যায়। সকল সময়ের বিপ্লবের যে কারণ, ইহারও তাই। ভূগর্ভ শীতল হইয়া এই সময় এত সঙ্কুচিত হইয়াছিল, যে কঠিন ভূপৃষ্ঠ নিম্নে নির্ভর না পাইয়া তুবড়াইয়া উচ্চনীচ্চ হইতে লাগিল, এবং কোন কোন স্থান ফাটিয়া সেই গহ্বর-নিঃসৃত আভ্যন্তরিক দ্রব পদার্থ পর্ব্বতমালায় পরিণত হইল। প্লায়োসিন অন্তর যুগের এইরূপ উৎপাৎজনিত পর্ব্বতমালা ইয়োরোপে অনেক দৃষ্ট হয়। এই অন্তর যুগে হঠাৎ শীতের প্রাধান্য দেখা যায়। এখন পর্ব্বতচূড়া তুষারাচ্ছন্ন। দেশ মহাদেশ এই সময় হইতেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই অন্তর যুগের অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদ এখন শুষ্ক। এই সময়ের উদ্ভিদ প্রায় ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মত। পর্ণীতরুজাতির এখন আর আধিক্য নাই। শীতাতপ বৈষম্য হেতু ভিন্ন দেশে এখন ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে। ইয়োরপে আর গ্রীষ্মদেশের বৃক্ষের তত প্রাচুর্য্য নাই। এ অন্তর যুগেও নানা প্রকার অদ্ভুত স্থলচর জন্তু দেখা যায়। তবে এ সময়ে স্তন্যপায়ী এবং ভেকজাতীয় সরীসৃপেরই প্রাধান্য অধিক। এ অন্তর যুগের শেষ ভাগে মাস্টডন আর বড় দেখা যায় না। এ যুগের নূতন উৎপন্ন জন্তুর মধ্যে, জল-হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, বৃষ, শূকর ও হরিণ এখনো বর্ত্তমান। এ অন্তর যুগের অশ্ব আধুনিক জাতি অপেক্ষা আকারে ছোট, ইহা প্রায় গর্দ্দভের সমান।

এখন নানা জাতীয় অসংখ্য বানর দেখা যায়। মায়োসিন অন্তর যুগে গণ্ডারের প্রথম উৎপত্তি, এ সময়ে তাহার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সময় একরূপ দ্বি-খড়্গী গণ্ডার (Rhinocerous Tichorhinus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুমাত্রা ও আফ্রিকার

আধুনিক দ্বি-খড়্গী জাতি হইতে অনেক ভিন্ন। ইহাদের নাসারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্যে একটা হাড়ের ব্যবধান আছে, আধুনিক জাতিতে তাহা নাই।

এই পুরাতন অদ্ভুত-গণ্ডার-কঙ্কাল হইতে নানাবিধ অদ্ভুত গল্পের উৎপত্তি। আরব্য উপন্যাসে যে রকপক্ষীর গল্প পড়া যায়, ভূগর্ভে এই গণ্ডারশৃঙ্গ পাইয়াই সেই অদ্ভুত পক্ষীর গল্প সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়োরপের বিখ্যাত ড্র্যাগনের গল্পও ইহা হইতে সৃষ্ট।

ক্যারিনথিয়া প্রদেশের ক্ল্যাগেনভূর্থ নগরের ফোয়ারায় প্রকাণ্ড ৬ ফুট পরিমাণ এক-শৃঙ্গ-ড্র্যাগন মস্তক অঙ্কিত আছে।

প্রবাদ এই যে, এই ড্র্যাগন পূর্ব্বে এক পর্ব্বতগুহায় বাস করিত এবং মধ্যে মধ্যে গুহা নির্গত হইয়া দেশ ছারখার করিত। এক সাহসী বীর নিজ-প্রাণ দিয়া এই ড্র্যাগনকে হত্যা করেন। ক্লাগেনভূর্থের টৌনহলে রক্ষিত এই ড্র্যাগনমস্তক হইতে শেষে ফোয়ারায় তাহার অনুরূপ অঙ্কিত হয়। ভিয়েনাব হের উঙ্গের (Herr Unger) এই মস্তক-চিত্র দেখিবামাত্রেই গণ্ডার মস্তক বলিয়া চিনিতে পারেন।

কোন পর্ব্বত গুহায় এই মস্তক পাইয়া হয় তো এই অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিমালয়ের মার্কণ্ড উপত্যকায় এই সময়কার একরূপ অদ্ভুত রোমন্থনকারী জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজেরা শিবের নাম হইতে ইহার নাম শিবথেরিয়াম রাখিয়াছেন। ইহার শরীর বৃষের ন্যায় প্রকাণ্ড এবং আকারে অনেকটা আধুনিক এল্ক (Elk) জাতীয় হরিণের মত। ভিন্ন ভিন্ন শষ্যাহারী-জন্তুর অবয়ব মিশ্রণ সত্ত্বেও ইহার একটি নিজত্ব লক্ষিত হয়। ইহার বৃহৎ মস্তকে বর্ত্তমান সময়ের একজাতীয় আমেরিক হরিণের (Prong Buck) শৃঙ্গের মত শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট ৪টি শূন্যগর্ভ শৃঙ্গ।

বর্ত্তমান কালে জীবিত ভেকজাতীয় উভচর সরীসৃপ (যথা, গোসাপ ইত্যাদি) ২০ ইঞ্চের অধিক দীর্ঘ নহে। কিন্তু তৃতীয় যুগে এই জাতীয় এক একটি সরীসৃপ কুম্ভীরের ন্যায় দীর্ঘায়তন ছিল।

পূর্ব্বে এইসকল সরীসৃপ কঙ্কালকে চতুর্থ যুগের বন্যাহত মনুষ্য কঙ্কাল বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রম বিশ্বাসটি ঘুচাইবার জন্য ক্যাঁপে ও কুভিয়ের অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

হোরেশ দে সোস্যর (Horace de Saussure) তাঁর আল্প পরিভ্রমণ (*Voyage dans les Alpes*) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে রাইননদীর বামপার্শ্বে ইনিংগেন গ্রামের নিকটে একস্থানে প্রস্তর-তলে একটি অস্থি-কঙ্কাল পাইয়া মনুষ্য কঙ্কাল বোধে শ্যকজার (Scheuchzer) নামক একজন সুইশ প্রাণীবেত্তা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ট্র্যানজ্যাকসন পত্রিকায় ইহার বিশেষরূপ বর্ণনা করিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। এবং ১৭৩১ খৃঃ অব্দে তিনি আবার এই সম্বন্ধে "মনুষ্য বন্যার সাক্ষী" (*Homo deluvii testis*) নামক একখানি পুস্তক লেখেন। পবিত্র ভৌতিকবিদ্যা (*Physica Sacra*) নামক তাঁহার আর একখানি পুস্তকেও ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

"মনুষ্য বন্যার সাক্ষী" এই কথা লইয়া জার্ম্মনিতে মহা হুলস্থূল চলিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম উপদেষ্টা ও প্রাণীবেত্তা সুইজ পণ্ডিত স্যকজারের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না—কেবল পিয়ার ক্যাঁপার একাকী এই মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে নিজে এনিংগেন (Œningen) পর্য্যন্ত গিয়া এই কঙ্কাল পরীক্ষা দ্বারা

সরীসৃপ কঙ্কাল বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু কোন জাতীয় সরীসৃপ তাহা ক্যাঁপার ঠিক ধরিতে পারেন নাই ; কুভিয়ে পরে সে মীমাংসা করিলেন। এযুগের পক্ষীর মধ্যে শকুনি, ঈগল, ছাতারি, শুকজাতীয় ফেজ্যান্ট, কুক্কুট, হংস ইত্যাদি এখনো জীবিত।

এই সময়ে প্রথম আমরা জলচর স্তন্যপায়ী দেখিতে পাই, ডলফিন এবং তিমি মৎস্য এই সময়ে জন্মে। জিফিউস (Ziphius) বলিয়া আর একরূপ জলচর-জীবদের কুভিয়ে স্তন্যপায়ী জলচর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ভূমধ্যসাগরে এই জাতি এখনো বর্ত্তমান। এই সময়ে বহুসংখ্যক নূতন শম্বুক জাতীয় জীব জন্মে এবং পৃথিবী ফলতঃ আধুনিক আকারে পরিণত হয়।

চতুর্থ যুগ বা বর্ত্তমান কাল

তৃতীয় যুগের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া এখন পর্য্যন্ত চতুর্থ যুগ চলিয়া আসিতেছে। দু-একটি বিশেষ স্থানীয় ঘটনা ছাড়া পৃথিবীর সার্ব্বভৌমিক বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন এ-যুগে দৃষ্ট হয না। বন্যা এবং হিমশৈলের কার্য্যই এ যুগের বিশেষ লক্ষণ, এবং ইহা অপেক্ষাও এ যুগের আর একটি বিশেষ লক্ষণ মনুষ্যের উৎপত্তি। এই যে তিনটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতে এই যুগটি ভিন্ন তাহাদের পর্য্যায় এইরূপ—

প্রথম — ইয়োরোপীয় বন্যা ;
দ্বিতীয় — হিমশৈলের কার্য্য ;
তৃতীয়—মনুষ্যের উৎপত্তি এবং আসিয়ার বন্যা ;

চতুর্থ যুগের এই ঘটনাত্রয় বর্ণনা করিবার অগ্রে ইয়োরোপীয় বন্যার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। ভূবেত্তাগণ চতুর্থ-যুগকে দুইভাগে ভাগ করেন, প্রথম, প্লায়োসিনের পরবর্ত্তী বা চতুর্থ যুগের প্রারম্ভকাল ; দ্বিতীয়, আধুনিক কাল।

চতুর্থ যুগের শেষাংশ আধুনিক কালেই পূর্ব্বোক্ত তিনটি ঘটনার জন্ম।

প্লায়োসিনের পরবর্ত্তী কাল (Post-Pleiocene Period)

এই সময়ের উদ্ভিদের কথা বলা এখন বাহুল্য। চতুর্থ যুগের প্রারম্ভের ও আধুনিক সময়ের উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ জাতিভেদ লক্ষিত হয় না। জন্তু সম্পর্কেও সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে। তখনকার তিনচারি জাতীয় জীবমাত্র এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ; এবং পরে শীতাতপ বৈষম্য হেতু স্থান বিশেষের জন্তু বিশেষ লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল জাতীয় জন্তু পৃথিবীর অন্যত্র বর্ত্তমান।

চতুর্থ যুগের প্রারম্ভেও ইয়োরোপ যে, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি গ্রীষ্ম দেশীয় জন্তুর নিবাসভূমি ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ধীবরেরা শুক্তি সংগ্রহ করিতে গিয়া কেবলমাত্র নরফোক (Norfolk) তীরে আঠার হাজারেরও অধিক হাতীয় কষের দাঁত উঠাইয়াছিল। হস্তীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে যেরূপ সময় সাপেক্ষ, তাহাতে এই বহু-সংখ্যক দন্ত জমিতে নিশ্চয়ই বহু সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে।

আমেরিকাতে চতুর্থ যুগের প্রারম্ভে মিগেথেরিয়াম (১) মিগেলনিক্‌স্ (২) মাইলডন (৩) গ্লিপটোডন (৪) বলিয়া যে সকল জন্তু ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের ঐরূপ পুরাতন লুপ্ত জন্তুর কঙ্কাল যদিও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি বোধ হয় এখানেও ঐরূপ অনেক পুরাতন জাতির লোপ হইয়াছে। মকর বলিয়া আমরা পুরাতন গ্রন্থে যে জলজন্তুর উল্লেখ পাই, উহা যে কেবলমাত্র কল্পনা-সম্ভূত জীব, তাহা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? হয়তো সত্য সত্যই ঐরূপ কোনপ্রকার জীব পুরাকালে এদেশে বর্ত্তমান ছিল।

মামথ বলিয়া একরূপ হস্তী এই সময় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ছিল, তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে, ইহা আধুনিক বৃহত্তর হস্তী হইতেও প্রকাণ্ড। দন্তের গঠন প্রভেদ হেতুই মাশটডন হইতে মামথ ভিন্ন। মামথের দন্তবিন্যাস আমাদের হস্তীর ন্যায়। এই হস্তীর কঙ্কাল পুরাতন কালে কেহবা দেবতা কেহবা রাক্ষস দেহাবশেষ বলিয়া মনে করিত। গ্রীক-গণ এই হস্তীর একটা জানুর অস্থিকে গ্রীকযোদ্ধা এজ্যাক্‌সের (Ajax) জানু-অস্থি ভাবিয়াছিল এবং এইরূপ কোন অস্থি হইতেই এজক্‌স্‌পুত্র অ্যাস্‌টেরিয়াস (Asterius) এবং আরো সহস্র সহস্র প্রকাণ্ড শরীরী মনুষ্যের গল্প নির্ম্মিত।

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে (Middle Ages) রচিত *Gigantology* বলিয়া প্রকাণ্ড শরীরীদিগের যে বিবরণ পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অদ্ভুত গল্প সন্নিবেশিত : সে সকলই যে এইরূপ হস্তী-কঙ্কাল হইতে উৎপন্ন তাহার আর সন্দেহ নাই। স্পেনের ইতিহাসেও এইরূপ অনেক গল্প পাওয়া যায়। ক্রিস্টফার নামক সেন্টের একটি দাঁত বলিয়া ভেলেন্সের গির্জায় যে অস্থি রক্ষিত আছে তাহা ঐ হস্তীর কষের দাঁত। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বৃষ্টি কামনায় সেন্ট ভিন্‌সেন্ট গির্জ্জার পাদরিরা যে একটা কল্পিত রাক্ষসের হাত স্কন্ধে করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ প্রকাণ্ড হস্তীর পার্শ্বাস্থি (Femur) মাত্র। ফ্রান্সেও এইরূপ অনেক গল্প প্রচলিত।

১৮শ শতাব্দীতে মামথ হস্তীর কঙ্কাল ইয়োরোপের নানা স্থানে পাওয়া যায়। প্রথমে লোকের বিশ্বাস ছিল ইহা আধুনিক হস্তী-কঙ্কাল। কোন কোন বিদ্যাভিমানী বলিতেন, হানিবল ইটালি আক্রমণকালে, এই সকল হস্তী কার্থেজ হইতে লইয়া আসেন। ইহার ভ্রম সপ্রমাণ করিতে কুভিয়ের অল্পই প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ইয়োরোপ আমেরিকা আসিয়া ও আফ্রিকার সকল স্থানেই এইরূপ হস্তী-কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়।

লেনানদীর মোহানায় নূতন সাইবিরিয়া ও লাচৌ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশস্থান বালি তুষার ও হস্তীদন্তময়। প্রত্যেক ঝড়ে সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে যে সকল মামথ হস্তী-দন্ত তীরে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা দ্বারা তদ্দেশবাসীদের লভ্যজনক বাণিজ্য চলে। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে অসংখ্য যাত্রী, নৌকাপথে এই অস্থি-দ্বীপাভিমুখে গমন করে এবং প্রত্যেক শীতকালে

১ Megatherium অর্থাৎ প্রকাণ্ড জীব।
২ Megalonyx অর্থাৎ লম্ব-নখর।
৩ Mylodon অর্থাৎ জাঁতাদন্ত।
৪ Glyptodon অর্থাৎ খোদিতদন্ত।

অসংখ্য কুক্কুর-শকট হস্তী-দন্ত-পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করে। এক একটি দন্তের ওজন ৫০ হইতে ১০০ মণ পর্য্যন্ত। ৫০০ বৎসর ধরিয়া চীনেরা এই দ্বীপপুঞ্জ হইতে বাণিজ্যের নিমিত্ত হস্তী-দন্ত আহরণ করিতেছে। এবং ১০০বৎসর ধরিয়া ইহা ইয়োরপে ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইতেছে, তথাপি ইহার এখনো শেষ নাই। এই অপরিমেয় অস্থি-রাশি স্তূপীকৃত হইতে কত অসংখ্য অসংখ্য বৎসরই লাগিয়াছে!

সাইবীরিয়-ভাষা হইতেই এই হস্তীর নাম মামথ হইয়াছে। বিখ্যাত রুসিয়ান পণ্ডিত প্যালাশ যিনি প্রথমে মামথের রীতিমত বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাতারেরা পৃথিবীকে মামা কহে, এই মামা হইতে মামথ উৎপন্ন, মামথ অর্থাৎ পৃথিবী-বিবরবাসী। অন্য মতে, আরবিক মেহিমথ হইতে মামথ উৎপন্ন, মেহিমথ অর্থাৎ অসাধারণ আকার। আশ্চর্য্যের বিষয়, চীনের মধ্যেও এই সকল জন্তু বিবর-বাসী বলিয়া প্রবাদ, চীনে ইহাদের নাম টিয়েনসিউ অর্থাৎ যাহারা মাটিতে লুকায়।

এই সময়ে উৎপন্ন হিমালয়ের নিম্নস্তরে কয়েকটি কচ্ছপদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার উদর-নিম্নস্থ কঠিন-আচ্ছাদনী-অস্থি বার ফুট লম্বা ও ছয় ফুট চওড়া ; এবং ইহার পায়ের হাড় গণ্ডারের ন্যায় দৃঢ় ও প্রকাণ্ড।

এই সময়ের নানাপ্রকার স্তন্যপায়ী জন্তু-কঙ্কাল ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়ারস্থ বিখ্যাত কার্কডেল গহ্বরে এবং ডিবনসিয়ারে টর্কির নিকটস্থ কেন্ট গহ্বরে পাওয়া গিয়াছে। এই গহ্বর আবিষ্কৃত কঙ্কাল রাশি হইতে কত অনুমানই উত্থিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। সাধারণত এই বিশ্বাস, ইহা কোন মাংসাশী পশুর গহ্বর এবং সেই মাংসাশী পশু কর্ত্তৃক আনীত অন্যান্য পশুদের দ্বারা গহ্বর পূর্ণ। কেহ কেহ আবার বলেন, রুগ্ন অসামর্থ্য পশুগণ শত্রুর হাত এড়াইতে এই ভয়শূন্য গুহায় আসিয়া মরিত ; অপর কেহ বলেন, বন্যাতে মৃত পশু কঙ্কাল ভাসিয়া এই গুহায় আসিয়া জমিয়াছে। যে অনুমানটিই সত্য হউক না কেন, ইহা নিশ্চয় যে, চতুর্থ যুগের প্রারম্ভে এই সকল পশু ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিল। গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা দেশে এখন যেরূপ বৃহৎ জলহস্তী আছে সেইরূপ জলহস্তী, দ্বি-খড়্গী-গণ্ডার, নানা জাতীয় হরিণ, বৃষ, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, ভল্লুক, সিংহ, হায়েনা, বিবর প্রভৃতি যে সকল জন্তুর মধ্যে অধিকাংশই এখন ইংলণ্ডে নাই, তাহা তৎকালে ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিল। তখন ম্যাকাইরডশ্ (Machairodus) নামে ভল্লুক জাতীয় একরূপ হিংস্রক জন্তু ছিল, তাহা সিংহ ব্যাঘ্র হইতেও ভয়ানক। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ইয়োরোপস্থ চতুর্থ যুগের এই সকল পশু কেমন করিয়া হঠাৎ লোপ পাইল।

কুভিয়ে এবং পুরাতন ভূবেত্তারা বলেন, হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা দ্বারা একেবারে এই সমস্ত পুরাতন জন্তু বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক ভূবেত্তাগণের মতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন দ্বারাই এই সকল জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে, হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা-বশতঃ নহে। ক্রমশ শীতের আধিক্যই এই বিনাশের প্রধান কারণ।

তৃতীয় যুগের প্রারম্ভে ইয়োসিন অন্তর যুগের ইয়োরোপে তাল, নারিকেল ইত্যাদি গ্রীষ্মদেশীয় বৃক্ষ প্রচুর দেখা যায়। মায়োসিন অন্তর যুগে ইয়োরোপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে এস্থানে শীতের আধিক্য বৃদ্ধি হইয়াছিল ; পরে প্লায়োসিন অন্তর-যুগে আরো শীতল হইয়া সেই সময় চতুর্থ যুগের ভাবী শীতের লক্ষণ দেখা দিল।

এইরূপে ক্রমশই ইয়োরোপের উত্তাপ হ্রাস হইয়া ভীষণ শীত-প্রভাবে চতুর্থ যুগে ক্রমে হিমশৈলের কার্য্য আরম্ভ হইল।

হিমশৈলের পূর্ব্বে ইয়োরপে যে মহাবন্যা হইয়াছিল, সেই সমুদ্রবন্যায় ধৌত নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকাদ্বারা ইয়োরোপের স্থানে স্থানে যে স্তর সংস্থিতি হইয়াছে, সেই স্তর সংস্থিতি পরে ইয়োরোপের উত্তাপ একেবারে কমিয়া একটি ভয়ঙ্কর শীতকাল আসিয়া পড়িল, সেই শীতকালকেই হিমশৈল কাল বলা যায়। এই সময় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ এবং সম্ভবতঃ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও একটি ঘন হিমশৈল আবরণে আবৃত হয়। ইংলণ্ডে ব্রিশটল চ্যানেলের দক্ষিণে একটি ভূখণ্ড এবং টেমশ নদীগর্ভমাত্র তখন জলের উপরিভাগে ছিল। ইংলণ্ডের উত্তরাংশ এবং ব্রিটেনের উচ্চভাগ ও আয়ারলণ্ড এই হিমশৈল চালনে পেষিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই সুদূরব্যাপী বন্যা প্রভাবে টেমশ নদীর উত্তর দিক যে সেই সময় হইতে ক্রমশ সমুদ্রগ্রস্ত হইতে আরম্ভ হইল, ইহার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। র‍্যামজে প্রমাণ করেন ভীষণ শীতের প্রারম্ভে ইয়োরোপের স্থলভাগ এখনকার অপেক্ষা অধিক ছিল; তাহার পর, বন্যা আসিয়া ইয়োরোপের অধিকাংশ সমুদ্রমগ্ন করিয়াছিল, পরে আবার তাহা সমুদ্র হইতে উঠিয়া হিমশৈল-আবৃত হইল।

আধুনিক কাল

চতুর্থ যুগের শেষ ভাগ—বর্ত্তমান কাল—তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ইয়োরোপের বন্যা, (২) হিমশৈলকাল, (৩) মনুষ্যের জন্ম ও আসিয়ার বন্যা।

ইয়োরোপীয় বন্যা

ইয়োরোপের অনেক স্থানে তৃতীয় যুগের স্তরের উপরে নানা জাতীয় মৃত্তিকা মিশ্রিত স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইয়োরোপ সন্নিহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মৃত্তিকাই এই স্তরে প্রচুর। ইয়োরোপস্থ পাহাড় নিম্নের ক্ষয়-গ্রস্ত খোদিত ও বিস্তৃত উপত্যকাভূমি এবং স্থানে স্থানের স্তরীভূত মসৃণ গোলাকার কঙ্কররাশি দেখিলে তাহার উপর অনবরত জল-ঘর্ষণ-কার্য্য লক্ষিত হয়। এই সকল কঙ্কররাশি প্রবল বন্যাপ্রভাবে ধৌত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা দেখিলে মনে হয়, সমুদ্রের একটি মহা তরঙ্গ স্থল-পৃষ্ঠে পড়িয়া সমস্ত চুরমার করিয়া দূর দূরান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই ভীষণ বন্যা-নিক্ষিপ্ত পদার্থরাশির স্তরকে বন্যাসম্ভূত স্তর বলা যায়।

সহসা এই ভয়ঙ্কর বন্যাস্রোত আসিয়া ইয়োরোপ আক্রমণ করিল কেন? সম্ভবতঃ ইয়োরপের সমুদ্রগর্ভে কিম্বা এই সমুদ্র সন্নিহিত ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক অগ্নির কার্য্যবশতঃ কোন ভূখণ্ড উচ্চ হইয়া উঠিবার সময় সমুদ্র-আন্দোলন দ্বারা এইরূপ বন্যার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই ভূখণ্ড উঠিবার সময় তরঙ্গিত সমুদ্র জলরাশি ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া দেশ, মহাদেশ, উপত্যকা, ছারখার করিয়া দেয়। অগ্নি-সম্ভূত (volcanic) পর্ব্বত কিম্বা পর্ব্বতমালা যেমন হঠাৎ নির্ম্মিত হয়, এই বন্যা তেমনি সহসা হইয়াছিল; একবার হইয়াই ইহা ক্ষান্ত হয় নাই, এইরূপ বন্যা যে এক সময়ে একের অধিকবার ইয়োরোপ আক্রমণ করিয়াছিল, এই মহাদেশের অনেক স্থানের স্তর সংস্থিতি তাহার সাক্ষী।

এই স্তর সংস্থিতিই যে ইয়োরপের বন্যার কেবলমাত্র সাক্ষী এমন নহে, স্বস্থান বিচ্যুত আকরিক পদার্থের চাপড়াও এই বন্যার একটি বিশেষ প্রমাণ।

চতুর্থ যুগের এই বন্যার পূর্ব্বে অন্যান্য যুগেও যে এইরূপ অনেক বন্যা হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ হ্রাসবশতঃ ভূগর্ভ শীতল হইয়া হ্রস্বায়তন হইলে ভূপৃষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া সকল যুগেই প্রায় পর্ব্বত ও পর্ব্বতমালা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐরূপ পর্ব্বত সৃষ্টি হইবার সময় প্রত্যেকবার ভূগর্ভ আন্দোলন হেতু সমুদ্র উচ্ছ্বাসিত হইয়া বন্যা উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ যুগের বন্যার যেরূপ প্রত্যক্ষ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, এমন আর কোন যুগের নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চতুর্থ যুগে দুই সময়ে দুইটি বন্যা হয়, প্রথম, ইয়োরপীয় বন্যা, দ্বিতীয়, আসিয়ার বন্যা। ইয়োরপ এক সময়ের মধ্যে দুইবার বন্যাক্রান্ত হয়। নরওয়ের পর্ব্বতমালা সৃষ্ট হইবার সময় ইয়োরপের প্রথম বন্যা আরম্ভ। স্ক্যানডিনেভিয়ায় বন্যা উত্থিত হইয়া সুইডেন নরওয়ে ইয়োরপ-রুসিয়া এবং জার্ম্মানির উত্তরের সমস্ত স্খলিত মৃত্তিকা একত্রে জলমিশ্রিত হইল।

ভূগর্ভের অগ্নির প্রভাবে এই জলমধ্য দিয়া নরওয়ের পর্ব্বতমালা উঠিতে লাগিল। মেরু সন্নিহিত বন্যাজলরাশি হিমশৈলাকার ধারণ করিল, বন্যা-তরঙ্গ সেই হিমশিলার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া কর্দ্দম কঙ্কর ইত্যাদির সহিত অন্যত্রে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সেই হিমশিলার দারুণ আঘাতে মৃত্তিকা আরো সবলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল।

উত্তর ইয়োরপের সম-ভূমি ও নিম্নভূমিতে যেরূপ বিপর্য্যস্ত স্তরসমূহ দেখা যায়, তাহাই উত্তর ইয়োরপের এই বন্যার প্রাকৃতিক প্রমাণ। এই লণ্ডভণ্ড মৃত্তিকাস্তরে (unstratified deposits) যে সকল চাপড়া (block) পাওয়া যায় তাহা সাধারণত বৃহদায়তন। যে বন্যা-ভঙ্গ গ্রেনিট চাপড়ার উপর রুসিয়ার সেন্ট পিটরসবর্গে পিটরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান তাহা অত্যন্ত প্রকাণ্ড।

জর্ম্মনি পোলণ্ড এবং ব্রিটেনের ভিন্ন জাতীয় মৃত্তিকার মধ্যে নরোয়েদেশ-উৎপন্ন প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া বোধ হয় তাহারা নিশ্চয়ই বন্যা দ্বারা আনীত।

উত্তর প্রুসিয়ায় ৩৪০ টন ওজনের একটি এই জাতীয় গ্রেনিট চাপড়া পাওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রস্তর নরোয়ে হইতে উক্ত সকল দেশে আনিতে কতই না জানি বলের আবশ্যক হইয়াছিল।

আল্প পর্ব্বতশ্রেণীর কোন কোন অংশ উঠিবার সময় ইয়োরোপের দ্বিতীয় বন্যা হয়। আলপের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ যথা, ফ্রান্স, ইটালি, জারমানির উপত্যকাভূমি এই বন্যা নিক্ষিপ্ত পদার্থরাশিতে পূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত বন্যা হইতে ইহা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বাংশে প্রাণীদেহ সঙ্কুল প্রথম যুগের স্তর এবং ওয়োলাইট, ক্রিটেসস, এবং তৃতীয় যুগেরও স্তর দেখা যায়—কিন্তু মধ্য আল্পে এ-সকল কিছুই দেখা যায় না, এস্থানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইয়োসিন মৃত্তিকার অনেক স্থান রূপান্তরিত দেখিয়া মনে হয় এ সময়ে ক্রমাগত ভূগর্ভ হইতে নূতন নূতন উৎপাৎবশতঃ নূতন মত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই উৎপাৎবশতই ইয়োরোপে বন্যার দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিমশৈল কার্য্যকাল

প্রাণী-জগৎ যখন উন্নতির শেষ সোপানে উঠিতে যত্নবান, তখন সহসা উপরি উপরি পূর্ব্বোক্ত দুই বন্যা দ্বারা সমস্ত ইয়োরোপ জলমগ্ন হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীজগতেরও উন্নতির পদে কন্টক পড়িল। এই বিপদ না সামলাইতে সামলাইতে আর একটি বিপদ আসিয়া ইয়োরপের পুরাতন প্রাণীদের আর উঠিতে দিল না।

স্কান্‌ডিনেভিয়া হইতে ভূমধ্যসাগর ও ড্যানুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অর্থাৎ মধ্য ও উত্তর ইয়োরপে সহসা একটি অভূতপূর্ব্ব অসাধারণ প্রচণ্ড শীতকাল দেখা দিল, মেরুপ্রদেশের শীত সহসা ইয়োরপে উপস্থিত। ইয়োরোপের গ্রীষ্মদেশীয় সুন্দর বৃক্ষাদি দ্বারা সজ্জিত শ্যামলক্ষেত্র, যাহাতে আসিয়া ও আফ্রিকার বৃহৎ হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব প্রভৃতি পশু বিচরণ করিত, সেই সকল ক্ষেত্র সহসা দারুণ শীতে হিমশৈলাবৃত হইয়া পড়িল। বহমান নদীর পরিবর্ত্তে জমাট নীহাররাশি বহিতে লাগিল। বেগে বহমান এইরূপ নীহারনদীর ঘর্ষণে চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা কি ভয়ানক রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল তাহা অনুভব করাও দুষ্কর। এই দারুণ শীতের অখণ্ডনীয় কারণ এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই।

শীত গ্রীষ্ম ঋতু পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ সূর্য্যোত্তাপ, সেই নিমিত্ত সহসা সূর্য্যের উষ্ণতার হ্রাস না হইলে আর ওরূপ শীত আসিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন কেবলমাত্র সূর্য্যের উপরেই পৃথিবীর উত্তাপ নির্ভর করিত না, ভূগর্ভ তখনও প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীকে উত্তাপ দিত।

তবে ইয়োরোপীয় সমুদ্রের উত্তাপের কারণ ঔপসাগরিক উষ্ণ স্রোত কি হঠাৎ বিমুখে বহমান হইয়া ইয়োরপকে দারুণ শীতে মগ্ন করিয়াছিল? এরূপ অনুমানেরও কোন কারণ নাই।

এই প্রচণ্ড শীতকাল সম্বন্ধে যে জ্যোতিষিক কারণ অনুমানিত হইয়াছে তাহাই কেবল অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।

বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে শীতকালের সময় পৃথিবীর নিজের অয়নমণ্ডলের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের সন্নিকটস্থ, তথায় উপনীত হয়। সেই হেতু অর্থাৎ পৃথিবীর সূর্য্য-সান্নিকট্য হেতু উত্তরার্দ্ধে এখন শীতের প্রাদুর্ভাব কম, শীতকালে যে পরিমাণে হিমশিলা জম্মে, গ্রীষ্মকালে তাহার অধিকাংশ দ্রবীভূত হয়। কিন্তু পৃথিবীর অয়নমণ্ডল চিরকাল একভাবে নাই। পৃথিবীর এমন একটি মৃদুগতি আছে যাহার দ্বারা পৃথিবীর অয়নমণ্ডল অল্পে অল্পে ক্রমশ দিন দিন সরিয়া যাইতেছে। এই গতি হেতু ২৫৮০০ বৎসরে (কাহারো কাহারো মতে ২১০০০ বৎসরে), পৃথিবীর অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া যায়, তখন উত্তরার্দ্ধের পরিবর্ত্তে দক্ষিণার্দ্ধ বৎসরের মধ্যে শীতকালে সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটে আসে, উত্তরার্দ্ধ বৎসরের মধ্যে শীতকালে সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে পড়ে। এই ২৫৮০০ বৎসরে একবার পৃথিবীর দক্ষিণ, একবার পৃথিবীর উত্তর সূর্য্যের সন্নিকটস্থ হয়। ক্রমে আবার অল্পে অল্পে সরিতে থাকে। যে ভাগ শীতকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকে সেইভাগে শীতের ভীষণ প্রভাব বৃদ্ধি ও উত্তাপের হ্রাস হেতু শীতকাল উৎপন্ন সমস্ত হিমশিলা গ্রীষ্মকালে দ্রবীভূত না হইয়া উত্তরোত্তর জমিতে থাকে। এখন

পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকে বলিয়া, সেখানে শীতের প্রভাব অধিক, কিন্তু উত্তরার্দ্ধ শীতকালে সূর্য্যের নিকটস্থ হয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীত কম। দক্ষিণে অধিকাংশ স্থান চিরতুষারাবৃত ; হিমশৈলের কার্য্য দক্ষিণে অধিক বলবান। সুমেরু পৌঁছিবার আমাদের আশা আছে, কুমেরু পৌঁছিবার আশা নাই। পৃথিবীর উপরোক্ত গতি দ্বারা উত্তরার্দ্ধ সূর্য্য হইতে তখন দূরে পড়িয়া ক্রমশঃ ভীষণ শীতাক্রান্ত হইয়াছিল—এই যুক্তি ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কোন যুক্তি এখনো পাওয়া যায় নাই।

ইয়োরোপের এই প্রচণ্ড শীতে জীবজগতে বিনাশ আরম্ভ হইল, সমস্ত নদনদী, হ্রদ, সমুদ্র, হিমশৈলাকারে জমাট বাঁধিয়া গেল। মূর্ত্তিমান মৃত্যু সমস্ত ইয়োরোপকে অধিকার করিল। শত শত হস্তী গণ্ডার ইত্যাদি জীব একেবারে যে লোপ পাইল, আর ইয়োরপে সে জাতি জন্মাইল না। কতদিন ধরিয়া এই দারুণ শীত ইয়োরোপের অধিকাংশ স্থান হিমশৈলাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব।

ভারতী, পৌষ-চৈত্র ১২৮৭

প্রলয়

পৃথিবীর বুঝি একটি পুঁটিমাছের প্রাণ, তাই হাতের টিপে সকলে এক একবার ইহার প্রাণ পরীক্ষা করিতে যান। কখন যে ইহাকে কার হাতে মরিতে হয় বেচারা সদাই ভয়ে ভয়ে সারা। একবারে মরিয়া গেলে ছাই বিপদ চুকিয়া যায়—তাহাও হইবে না, কাপুরুষের মৃত্যুভয়ের ন্যায়—সদাসর্ব্বদা ভয়ে ভয়েই পৃথিবী মরিতেছেন। কেন না লোকের কথায় ইহার মৃত্যু, লোকও অগণ্য, কথা ফেলিতেও মূল্য লাগে না, সুতরাং পৃথিবীর আর নিস্তার নাই। তা যদি পৃথিবীর একার ঘাড়ের উপর দিয়াই সব চুকিয়া যাইত, তো কোন গোলযোগ ছিল না, দিনের মধ্যে সহস্রবার করিয়া মারিয়া পোড়াইতে গেলেও আমরা কথা কহিতাম না, দুঃখের মধ্যে পৃথিবী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও টানেন। আমাদের এই ক্ষুদ্রজীবনের মধ্যেই যে কতবার আমরা পৃথিবীকে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিতে দেখিলাম, পৃথিবীর কত ফাঁড়াই যে উতরিয়া গেল, তাহার ঠিক নাই। মাদার শিপটন, ন্যায়চাঁদ পরামাণিক, গোবর্দ্ধন দাস প্রভৃতি বাজে লোকের কথায় তো অসংখ্যবার পৃথিবীকে ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইয়াছে, তাহার পর বৈজ্ঞানিক বড় বড় লোকের দোহাই দিয়াও অনেকে অনেকবার ইহার প্রতি অস্ত্র তুলিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে এক ধূমকেতু হইতে কতবার যে পৃথিবীর প্রলয় আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই।

১৭৭৩ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে এই কারণে পৃথিবীর প্রলয়ের যেরূপ দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল সে রূপ বোধ হয় আর কখন হয় নাই। একটি কথা উঠিল, অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ লালাঁদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, সেই খৃষ্টাব্দে মে মাসের ২০ কিম্বা ২১ তারিখে একটি ধূমকেতু আঘাতে পৃথিবী নষ্ট হইবে। কথাটা উঠিবার তাৎপর্য্য এই মাত্র দেখা যায়—যে সকল ধূমকেতু পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে—তাহাদের সম্বন্ধে ফ্রান্সের বিজ্ঞান-

সভায় লালাঁদ একটি বক্তৃতা পাঠ করিবেন, এইরূপ একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতেই কথা উঠিয়া গেল ১২মে পৃথিবী ধূমকেতু আঘাতে নষ্ট হইবে। সকলে থরহরি কাঁপিতে লাগিল—লালাঁদ এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য আবার বিজ্ঞাপন দিলেন —"যে সকল ধূমকেতু পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে, এবং তাহার গতির পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধে লালাঁদের আর কিছু বলিবার সময় নাই—তিনি এইটুকু মাত্র বলিতেছেন—এইরূপ সংস্রবের সময় নির্ণয় করা অসম্ভব। সম্প্রতি যে ধূমকেতু আঠার বৎসর পরে উদয় হইবে তাহা দ্বারা পৃথিবীর অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই।"

এই বিজ্ঞাপনে সাধারণ অশিক্ষিত ফরাসীদিগের কিছুই শান্তি হইল না—২৪ ঘণ্টা প্রার্থনা করিয়া এই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে সকলে প্যারিসের আর্চবিসপকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, বিসপ অগত্যা তাহাতে সম্মতি দিয়া আবার হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। ফরাসী তত্ত্বজ্ঞানী ভলতেয়ার সেই প্রলয়ের ধূমকেতু সম্বন্ধে এই রূপে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন—

"কতকগুলি প্যারিসবাসী যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী (Philosopher) নহেন, এবং কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে, যাহাদের তত্ত্বজ্ঞানী হইবার সময়ও নাই, তাঁহারা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, যে, পৃথিবীর শেষ দিন আসিতেছে, এবং বে-ওজর এই পৃথিবী মে মাসের বিশ তারিখে লয় পাইবে।

"যে ভবিষ্যদ্বাণী কখনো করা হয় নাই, বিজ্ঞানসভার এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী হইতে তাঁহারা এই প্রত্যাশা করিতেছেন যে, সেই দিন আমাদের পৃথিবীর উপর একটি ধূমকেতু পড়িয়া ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে। এই ঘটনা হইতে আর কোন ঘটনাই অধিক সম্ভাব্য নহে। কারণ জেমস্ বারনুই ১৬৮০ খৃস্টাব্দের ধূমকেতু সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ধূমকেতু আবার ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া প্রলয় বাধাইবে—তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, 'সত্য বলিতে কি তাহার শিরোভাগ হইতে কোন আশঙ্কা নাই, তাহার পুচ্ছই বিধাতার রোষের অব্যর্থ সন্ধান হইয়া আসিবে।' জেমস বারনুই যে ভ্রম করিয়াছিলেন তাহা আর বিশেষ কি—তাহা ৫৪ বৎসর তিন দিনের প্রভেদ বই তো নয়!

"এরূপ সামান্য ভুল অঙ্কশাস্ত্র-বিশারদগণ এই অনন্তকালের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত মনে করেন। বিশে মে কিম্বা অন্য কোন বৎসরে পৃথিবীর শেষ দিনের যে আশা করা যাইতেছে, ইহা যে অতীব যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রত্যক্ষ। তবে যদি তাহা না হয়, নাই হইল —একটা ঘটনা ঘটিতে বিলম্ব হইল বলিয়া যে, তাহা একেবারেই ঘটিবে না, তাহা নহে। ('ce qui est defrèrè n'est pas perdu')

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আবার বিয়েলার ধূমকেতু পৃথিবীর উপর পড়িবে বলিয়া কথা উঠিল —কিন্তু তাহা হইতে সেবার জনসাধারণে একটা বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হইবার আগেই কথাটি চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু আবার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ এক আশঙ্কায় ইংলণ্ড কম্পমান হইয়া উঠিল। কথা উঠিল, সুইস্ জ্যোতির্ব্বেত্তা প্ল্যানটামুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে ১৮৭২ খৃস্টাব্দে ১২ অগস্টমাসে পৃথিবী একটি ধূমকেতু আঘাতে বিনষ্ট হইবে। কি কথা হইতে যে কি কথা ওঠে, আশ্চর্য্য! প্ল্যানটামুরের অপরাধের মধ্যে

উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"অগস্টমাসের ১০/১১ ও ১২ই তারিখে যে সকল উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে, তাহারা একটি ধূমকেতুর অনুচর, সেই ধূমকেতুটির কক্ষ পৃথিবীর অতি সন্নিকট।" ইহা হইতে কেমন করিয়া ভয়ের কথা উঠিল তাহা বুঝা অসম্ভব। এই আশঙ্কা নিবারণ করিতে জ্যোতিষীগণ বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, ধূমকেতুর কক্ষটি নিকটে বলিয়া পৃথিবীর অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখন এই আশ্বাস বাক্য ভস্মে ঘৃতাহুতি হইতে লাগিল। সাধারণে একবার শুনিয়াছে পৃথিবীর অনিষ্ট হইবে, আর রক্ষা আছে—তাহারা জ্যোতিষীগণের কথার বিরুদ্ধে সগর্ব্বে বলিতে লাগিল—"বিশেষ গণনা দ্বারা প্ল্যানটামুর জানিয়াছেন ১২ অগস্ট ধূমকেতু আঘাতে পৃথিবী নষ্ট হইবে, ইহার কি অন্যথা হইতে পারে।"— একজন শুনিয়াছিল তাহার মাসি মরিয়াছে, হঠাৎ মাসিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি, তুই নাকি মরেছিস?" মাসি বার বার তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন তিনি মরেন নাই, মরিলে আর স্বয়ং তিনি কি করিয়া সম্মুখে আসিয়া দেখা দিবেন—কিন্তু তথাপি তাহার বোনঝির কোনমতে বিশ্বাস হইল না, সে বলিল—"তাহা কি করিয়া হইবে—তুই নিশ্চয়ই মরিয়াছিস, তা নহিলে কথা ওঠে!" ইংলণ্ডের সাধারণ লোকে তাহাই করিল। ফ্র্যাঙ্কেনষ্টাইন একবার ভূত জীবিত করিয়া তাহাকে পুনরায় মারিতে যেরূপ মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন, জ্যোতিষীদিগেরও সেই দশা ঘটিল।

এইরূপে কতবার যে পৃথিবী যাই যাই হইয়াছেন তাহার তালিকা দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সম্প্রতি জ্যোতিষী প্রকটারের ধূমকেতু সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ হইতে পৃথিবীর আসন্ন মৃত্যুর যে একটি দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করা যাউক। প্রকটারের সেই প্রবন্ধ হইতে ১৫ বৎসর পরেই সকলে পৃথিবীকে লয় পাওয়াইতে বসিয়াছিলেন। আশঙ্কা এত প্রবল হইয়াছিল যে আমার বন্ধু চন্দ্রশেখর বাবু ত সমস্ত কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পারত্রিক চিন্তার ধ্যানে অহরহ নিমগ্ন ছিলেন। একটি কথা কহিতে গেলে মুহূর্ত্তের জন্য ধ্যানভঙ্গ করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিতেন, "ক্ষমা কর, আর কদিনই বা আছে—ইহার মধ্যে আর সাংসারিক চিন্তাকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।" ম্যানচেস্টারের বিসপ ত এই সুযোগে একটি বিষম বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আসন্ন শেষ দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিলেন। ইংলণ্ডের স্পেকটেটর প্রভৃতি বড় বড় কাগজে এই প্রবন্ধ লইয়া মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল, চারিদিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, পৃথিবীকে অকালে গঙ্গাযাত্রা করাইবার সমস্তই আয়োজন হইয়া গেল, খাটে উঠান মাত্র বাকী রহিল।

প্রকটারের কি কথা হইতে যে এত হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এইবার দেখা যাউক।

সকলেই জানেন, বহুকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে এক একটি তারকাকে সহসা অল্পদিনের জন্য অত্যুজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তি পাইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি দুই বৎসর পূর্ব্বে মাত্র Northern Crown তারকারাশির একটি তারকা ঐ রূপে সহসা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। একটি ধূমকেতু প্রপাতই এই আকস্মিক দীপ্তির কারণ অনুমান করিয়া প্রকটার তাঁহার প্রবন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন—ঐ তারকা যদি আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জীবপূর্ণ গ্রহ উপগ্রহ বেষ্টিত হয় তো সহসা উহার উত্তাপালোকের প্রাচুর্য্যে সেই জীবগণের প্রাণ

বিনাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অন্যস্থানে আবার বলিয়াছেন, যদি কখনো বহু-উল্কাবিশিষ্ট ধূমকেতু আমাদের সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে তো হঠাৎ সূর্য্যের উত্তাপ আলোক বৃদ্ধি হইয়া আমাদের পৃথিবীর জীবগণের প্রাণ নাশ করিবে। পরে আর এক স্থানে বলিতেছেন, "১৮৮০ খৃস্টাব্দের ধূমকেতুটির কক্ষ যেরূপ ছোট হইয়া আসিতেছে, অর্থাৎ তাহার কেন্দ্রাতিগ গতি যেরূপ কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে সে দুই একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণের পরেই সূর্য্যে মিশাইয়া যাইবে।" প্রকটারের তিনস্থানের এই তিনটি কথাকে একত্রে আনিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর উদয়কাল যখন আর ১৫ বৎসর পরে আসিতেছে, তবে ঐ সময় উহা সূর্য্যে মিশাইয়া পৃথিবীর জীবজন্তু বিনাশ করিবে। সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত তাহার অবশ্য কোন সন্দেহ নাই—তবে কি না প্রকটার যাহা বলেন নাই, তাহা তাঁহার মুখে না বসাইলেই ভাল হইত। প্রকটার বলিয়াছেন বটে বহু-উল্কাপিণ্ডবিশিষ্ট কোন ধূমকেতু আমাদের সূর্য্যের উপর পড়িলে সেই দ্রুতগামী পিণ্ডের গতিবেগ জনিত উত্তাপে আমাদের পৃথিবী জীবশূন্য হইয়া পড়িবে, কিন্তু তিনি কোন স্থানে একথা বলেন নাই যে ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ধূমকেতু হইতে তাহা হইবে। কেন না তাঁহার মতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত যেরূপ বহু-উল্কাবিশিষ্ট ধূমকেতু সূর্য্যে পড়া আবশ্যক, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতু সেরূপ নহে। এস্থলে বলা আবশ্যক, ধূমকেতুর শরীর সূর্য্যে পড়িয়া ভস্ম হইলেই যে উত্তাপ বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, যতই সে সূর্য্যের নিকট আসিতে থাকে ততই তাহার শরীরের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং সেই বেগ হইতেই উত্তাপ জন্মে। এই ধূমকেতুটি সূর্য্যে পড়িলেও যে পৃথিবীর কিছুমাত্র অনিষ্ট আশঙ্কা নাই, তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ এই, এই ধূমকেতু ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫০ মাইল বেগে সূর্য্যের ছটা মুকুটের ৩ লক্ষ মাইল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যদি ইহা হইতে পৃথিবীর কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দের সেই প্রভূত গতিবেগে তাহার আভাষ পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইতে সূর্য্যের স্বাভাবিক কোন বৈলক্ষণ্য হওয়া দূরে থাকুক, সূর্য্য দ্বারা ধূমকেতুটিরই বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সূর্য্যের ছটা মুকুট মধ্যে বারম্বার বাধা পাইয়া ধূমকেতুটিরই গতি হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সাধারণের আশঙ্কা দেখিয়া প্রকটার যখন সেই ভুল ভাঙ্গাইতে একটি প্রতিবাদ লিখিতে বাধ্য হইলেন তখন তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ধূমকেতুটি একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণের পর সূর্য্যে মিশাইবে ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইতে নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হইবে না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতু হইতে ১৫ বৎসর পরে যে পৃথিবী বিনষ্ট হইতেছে না, তাহা যেন সিদ্ধান্ত হইল—কিন্তু প্রকটার যে বলিয়াছেন, বহু উল্কাপিণ্ডবিশিষ্ট ধূমকেতু সূর্য্যে পড়িলে পৃথিবীর একদিন মৃত্যু হইবে, তাহার উত্তর কি? আজ যেন পৃথিবী বাঁচিয়া গেল, কিন্তু তাহার মরিবার সম্ভাবনা ত দূর হইল না। প্রকটারের প্রতিবাদে আশু আশঙ্কা একরূপ শমিত হইলে আবার কিছুদিন হইতে এইরূপ একটি দূর-কল্পিত আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। সত্য সত্য এরূপ হইলে মন্দ হইত না বটে, পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অনন্ত কালের জন্য আমরা সকলে পরিত্রাণ পাইয়া যাইতাম, কিন্তু দুঃখের মধ্যে

তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। প্রক্টার বলিতেছেন বটে, কোন বৃহৎ ধূমকেতু সূর্য্যে পড়িয়া তাহার উত্তাপ বাড়িলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর অনিষ্ট হইবে, এবং একথা বলিতেও অবশ্য কোন দৈবজ্ঞানের আবশ্যক নাই, সূর্য্যে অস্বাভাবিক উত্তাপ বাড়িলে যে আমরা পুড়িয়া মরিব ইহা একজন শিশুও বলিতে পারে, কিন্তু ইহার সম্ভাবনা কতদূর? আমরা এইখানে দুই শ্রেণীতে প্রধানতঃ ধূমকেতুদিগকে জমা করিলাম—এক শ্রেণী, সৌর পরিবারভুক্ত, তাহারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণী, সৌরজগতের বাহিরে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সৌরজগতের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সৌর পরিবারভুক্ত ধূমকেতু হইতেই প্রধানতঃ এইরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা করা যাইতে পারে, কেন না তাহারাই সূর্য্যের আকর্ষণের বিশেষ রূপ অধীন, যদি সূর্য্যের অধীনে বহু-উল্কাবিশিষ্ট হানিজনক কোন ধূমকেতু থাকে ত কালে কোন কারণে তাহা হ্রস্বগতি হইয়া সূর্য্যে মিশাইতে পারে বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ অনিষ্টোৎপাদক ধূমকেতু সৌরজগতে একটিও দেখা যায় না,—প্রক্টার বলেন, হয় ত এরূপ ধূমকেতু কোন কালেই সৌরজগতে ছিল না, যদিও বা কোন কালে ছিল এমন হয়, ত তাহা বহুকাল পূর্ব্বে সৌরজগৎ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সৌর-পরিবারভুক্ত কোন ধূমকেতু হইতে এইরূপ অনিষ্টের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। এখন দেখা যাক বাহিরের ধূমকেতু সূর্য্যে পড়িবার কিরূপ সম্ভাবনা।

প্রক্টার তাঁহার *Myths and Marvels of Astronomy*তে সৌরজগৎ বহির্ভূত ধূমকেতু সূর্য্যে পড়িলে আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা, এই অকাট্য সত্যটি বলিয়া আবার তাহাতেই লিখিয়াছেন—"We may dismiss as altogether unlikely the visit of a comet from the star depths to our sun on a course carrying the comet directly upon the sun's surface." প্রক্টারের পূর্ব্ব লিখিত এইরূপ কথা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি তাঁহার প্রবন্ধে রঙ্গচ্ছলে ধূমকেতু লইয়া অনেকটা বকাবকি করিয়াছেন। প্রক্টার তাঁহার প্রতিবাদপত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন আর ১৫ বৎসর কেন, তাঁহার মতে আর ১৫ কোটি বৎসরেও পৃথিবীর মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই।

যদি কেহ বাস্তবিক মুহূর্ত্তের জন্যও সূর্য্যে ধূমকেতু প্রপাত দ্বারা কালে পৃথিবীর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া থাকেন, ভরষা করি এখন তাহা দূর হইবে।

কি কথা হইতে যে কি কথা ওঠে উপরের সমস্ত গল্পগুলি হইতে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সর ওয়াল্টর রলি কারাগারে বসিয়া পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে লিখিতে বাহিরে দুইজন মিস্ত্রিকে ঝগড়া করিতে দেখিয়াছিলেন—সেইদিনই অমনি প্রতি জনের মুখে ঐ এক ক্ষুদ্র ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কারণ শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন—তাঁহার ইতিহাস লিখিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইল, ভাবিলেন তাঁহার চক্ষের সামনে যাহা ঘটিল তাহারি যখন কারণের ঠিক নাই, তখন অতীত কথার সত্যতার প্রমাণ কোথায়? রলি যদি তাহাতেই আশ্চর্য্য হইয়া থাকেন, তো বৈজ্ঞানিকদিগের লিখিত একটি কথার মধ্য হইতে আর একটি কথা উঠিতে দেখিয়া কে না অধিক আশ্চর্য্য হইবে?

ভারতী, আশ্বিন ১২৮৯

অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাসভূমি কি না?

অসীম আকাশতলে কত তারা কত নক্ষত্র ; আমরা যাহাদের দেখিতে পাইতেছি, আবার যাহাদের দেখিতে পাইতেছি না, এমন কত অগণ্য নক্ষত্র তারকায় বিশ্ব পুরিয়া রহিয়াছে। উহারা সকলেই এক একটি সূর্য্য, সকলেই এই সূর্য্যের মত গ্রহ উপগ্রহ বেষ্টিত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ঐ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, গ্রহগণ কি সকলেই পৃথিবীর মত জীবের নিবাসভূমি!

বিশ্বের এই অগণ্য তারকাভাণ্ডারে পৃথিবী একটি অণুকণা, অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র। একদিকে এইরূপে অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়াও পৃথিবী আর একদিকে অতি মহৎ। পৃথিবী জীবের নিবাসভূমি, কেবল তাহাই নহে, পৃথিবী মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের নিবাসভূমি।

ঐ অগণ্য গ্রহ-জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সকলেই কি পৃথিবীর মত তবে জীবপূর্ণ? সকলেই কি জীব প্রতিপালন করিবার উচ্চ উদ্দেশ্য বক্ষে ধারণ করিয়া সেই উদ্দেশ্যকে পোষণ করিতে করিতে চলিয়াছে? এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করে! এখানে বিজ্ঞান নিরুত্তর। দূর দূরান্তর-স্থিত সূর্য্যমণ্ডলী বেষ্টনকারী গ্রহগণ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত। মানুষের দৃষ্টিগম্য এই সৌরজগতের গ্রহ কয়েকটিই যখন পূর্ণ মাত্রায় বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে, তখন সেই অদৃশ্য গ্রহদিগকে বিজ্ঞান কি প্রকারে আয়ত্ত করিবে!

সৌরজগতের যে কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ আছে তাহার মধ্যে চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিজ্ঞানের আয়ত্তমধ্যে আসিয়াছে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র কতক পরিমাণে চন্দ্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভেদ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা জানিয়াছেন, চন্দ্রে জল নাই, চন্দ্রে বায়ু নাই। ইহা হইতে তাঁহারা বলেন চন্দ্র জীবশূন্য।

বৃহস্পতি শনি ইয়ুরেনস্ ও নেপচুন এত নিবিড় মেঘ ও বাষ্পাবৃত যে তাহা ভেদ করিয়া দূরবীনের দৃষ্টি চলে না।

কিন্তু সেই নিবিড় মেঘ ও বাষ্প সম্ভবতঃ গ্রহগণের আভ্যন্তরিক বিষম উত্তাপের ফল, এবং সেই উত্তাপে মুহুর্মুহুঃ ঘোর ঘনঘটায় বজ্র বৃষ্টি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া গ্রহদিগকে বিপ্লবস্থ করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহগণের সেই বিষম অবস্থা পৃথিবীর সাম্য অবস্থা হইতে এত ভিন্ন যে উহারা জীবের নিবাসভূমি নহে বলিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন।

বুধ, শুক্র ও মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থা যতদূর জানা যায় তাহাতে ইহারা অনেক বিষয়ে পৃথিবীর বড় কাছাকাছি, বিশেষতঃ, মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐক্য দেখা যায়। এ সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়া থাকেন যে তাহা মনুষ্যের বাসের অনুপযোগী। বুধ ও শুক্র সূর্য্যের অতিরিক্ত নিকট বশতঃ সূর্য্যের নিকট হইতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ ও আলোক পাইয়া থাকে, সেরূপ প্রচুর উত্তাপালোকে কোনরূপ জীবের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা জানেন না। মঙ্গল গ্রহ এ সম্বন্ধে ভাগ্যবান, সূর্য্যের নিকট পৃথিবী যে পরিমাণে উত্তাপ ও আলোক পাইয়া

থাকে, মঙ্গলও প্রায় সেই এক পরিমাণে উত্তাপালোক পায়। সুতরাং উত্তাপালোকের প্রাচুর্য্যবশতঃ মঙ্গলগ্রহ জীবদিগের বাসের অনুপযুক্ত নহে। কিন্তু উত্তাপালোক জীবে প্রাণরক্ষার প্রধান কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে। গ্রহের নিজের মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার উপরেও গ্রহস্থ জীবগণ গৌণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। অনেকেই জানেন পৃথিবীর আকার ও পদার্থ সমষ্টির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। যদি পৃথিবীর পদার্থ সমষ্টির পরিমাণ ঠিক এখনকার মত থাকিয়া আকারে ইহা এখানকার অর্দ্ধেক হইত তাহা হইলে ইহার আকর্ষণ-বল এখন যেমন আছে তাহার চতুর্গুণ হইত, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক দ্রব্যের ভার এখনকার অপেক্ষা চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইত।

মঙ্গল গ্রহের পদার্থ সমষ্টির পরিমাণ পৃথিবীর অপেক্ষা অল্প, এবং যে পরিমাণে অল্প তাহা হইতে গণনা দ্বারা স্থির করা যায় যে পৃথিবীর যে দ্রব্য এখানে ওজনে ২৭ সের সেই দ্রব্য মঙ্গলে লইয়া গেলে ওজনে ১০ সের মাত্র হইবে। পৃথিবীর আকর্ষণ হঠাৎ মঙ্গল গ্রহের মত কম হইয়া পড়িলে ইহার জীবদিগের পক্ষে তাহা যে কিরূপ হানিজনক তাহা সহজেই বুঝা যায়। হিউএল বলেন পৃথিবীর দ্রব্য সকল তাহা হইলে যেখানে রাখা যাইবে সেইখানেই ঠিক হইয়া বসিয়া থাকিবে না, মানুষ জীবজন্তু দাঁড়াইবার সময়, বেড়াইবার সময় ঠিক হইয়া চলিতে পারিবে না, জাহাজ যেমন সমুদ্রে টলমল করে সেইরূপ সর্ব্বদা টলমল করিতে থাকিবে। এই স্বল্পাকর্ষণে বাতাস অত্যন্ত লঘু হইয়া যাইবে। এখন পৃথিবীতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক বর্গইঞ্চ স্থানের উপর বায়ুর ভার প্রায় সাড়ে সাত সের, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ মঙ্গলের সমান হইলে, পূর্ব্বোক্ত পরিমিত স্থানের উপর পৃথিবীর বায়ুর ভার প্রায় পৌনে তিন সের মাত্র হইবে। সমুদ্রতীর হইতে ৫ মাইল উর্দ্ধে এখন পৃথিবীর এইরূপ লঘু বাতাস দেখা যায়। একরূপ পাখী ছাড়া এ বাতাসে পৃথিবীর অন্য কোন জীবজন্তুর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

মঙ্গলের চারিপাশে কত পরিমাণ বায়ু তাহা এখনো জ্যোতিষীগণ জানেন না, কিন্তু তাহা পৃথিবীর বায়ুর সমপরিমাণ হউক আর নাই হউক, পৃথিবীর জীবদিগের পক্ষে উহা সকল অবস্থাতেই হানিজনক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মঙ্গলের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা অল্প, সুতরাং মঙ্গল গ্রহের বায়ুর ঘনত্ব পৃথিবীর বায়ুর ঘনত্বের সমান হইতে গেলে মঙ্গলের বাতাসের পরিমাণ—পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক অধিক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলে আবার মঙ্গলের ন্যায় স্বল্পাকর্ষণ-বিশিষ্ট গ্রহে যখন ঝড় হইবে তখন সেই ঘন বাতাসের বল অত্যন্ত অধিক হইবে। সেই ভীষণ বলে পৃথিবীর মত জীবজন্তু সহজেই উড়াইয়া লইয়া যাইবে। অথচ এদিকে মঙ্গলের বায়ু পৃথিবী অপেক্ষা অধিক ঘন না হইলে মঙ্গলে অত্যন্ত শীতের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, কেননা পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে অধিক দূরে অবস্থান করিতেছে। মঙ্গলে বায়ুর ঘনাবরণ না থাকিলে আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহজেই সে বাহিরে ফেলিয়া দিবে। সুতরাং মঙ্গলের বায়ু পরিমাণ পৃথিবীর সমান হইতে আরম্ভ হইয়া যতই ইহার অধিক হইবে—ততই ঝড়ের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে—আর যত কম হইবে—ততই শীতের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে—কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর জীবগণ জীবনধারণ করিতে পারে না। তাহার পর মঙ্গল গ্রহের বৎসরের দৈর্ঘ্য

পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ। একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের ৬৮৭ দিন লাগে। পৃথিবীর বৎসর মঙ্গলের মত দীর্ঘ হইলে তাহাতে উদ্ভিদ-জগতে বিষম বিপ্লব বাধিবার সম্ভাবনা।

এইরূপে মঙ্গলের চারিদিকের অবস্থা পৃথিবীর অবস্থা সমূহের সহিত মিলাইয়া জ্যোতিষীগণ সিদ্ধান্ত করেন, সম্ভবতঃ মঙ্গল গ্রহও জীব শূন্য। এখন দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সৌরগ্রহগণে জীব আছে কি না সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়াও অন্যরূপে ইহার উত্তর দেন। পৃথিবীর অবস্থা অন্য গ্রহগণের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা দেখেন যে সে অবস্থায় পৃথিবীর জীবসকল বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর উত্তাপ ও আলোক কিছু অধিক হ্রাস বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, পৃথিবীর আকর্ষণের কিছু অধিক ন্যূনাধিক্য হউক অমনি পৃথিবীর প্রলয় উপস্থিত হইবে। তাঁহারা এই জ্ঞান দিয়া অন্য গ্রহগণের অবস্থাও বিচার করিতে চাহেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলেন সৌরজগতের অন্য গ্রহগণ জীবশূন্য—তাহার অর্থ এই, পৃথিবীতে যেরূপ জীব দেখা যায়, অন্য গ্রহে সেইরূপ প্রকৃতির জীব বর্ত্তমান নাই। ইহার অধিক আর তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথার যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া যাঁহারা নিষ্পত্তি করেন পৃথিবী ছাড়া সকল গ্রহই প্রকৃতপক্ষে বসতিহীন—তাঁহাদের নিষ্পত্তির কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। এই অবস্থায় জীবন সম্ভব আর এই অবস্থায় জীবন অসম্ভব, এইরূপ একটি সীমা আজও পর্য্যন্ত বিজ্ঞান দিতে পারে নাই। মেরুদেশবর্ত্তী স্থানে ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য দেখা দেয় না, সেই হিমশৈলাবৃত খণ্ডে যে মানুষ আছে ইহা না জানিলে কি আমরা তাহা মনে করিতে পারিতাম? সেইরূপ দারুণ শীত আমাদের দেশে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে আমাদের উদ্ভিদ জীবজন্তু সকলেরি প্রাণবিনাশ করিবে সন্দেহ নাই। সেইজন্য যথার্থ চিন্তাশীল যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ কি অবস্থায় জীবন সম্ভব আর কি অবস্থায় জীবন অসম্ভব—ইহা মীমাংসা করা অসম্ভব মনে করেন।

বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে অল্পদিন হইল অতি কঠোর শিক্ষা পাইয়াছে। সুগভীর সাগর-তলের অবস্থা বৈজ্ঞানিকগণ যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অতি গভীর সাগরতলে কোন প্রাণী থাকিতে পারে না, কেন না অধিক গভীর জলস্তর দ্বারা সিন্ধুতলে যতখানি চাপ পড়িবার কথা ততখানি চাপে আমরা যে সকল জীবজন্তু জানি তাহাদিগের কোনটিই বাঁচিতে পারে না। তাপ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা হইতে তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন যে সেই ঘোর জল-চাপে কঠিন কুম্ভীর-পৃষ্ঠ কিম্বা গণ্ডার-চর্ম্ম কিম্বা কঠিনতম ও ঘনতম কাষ্ঠও চুরমার হইয়া যাইবে।

অথচ এখন জানা গিয়াছে যে, সেই অতি গভীর সাগরতলে জীবের বসতি আছে, কেবল তাহাই নহে, তাহারা সাগরতলের সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়াও দেখিতে পায়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কোন স্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা ভেদে সেই অবস্থার অনুযায়ী জীব উৎপন্ন হইতে পারে, জীব জন্মিবার জন্য একটি বা কতকগুলি বিশেষ সার্ব্বভৌমিক উপযোগী অবস্থা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা নহে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন না—যে, "এই পর্য্যন্ত ইহার সীমা—ইহার অধিক নহে।"

ইয়োরোপের অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা গ্রহগণ যে জীবের নিবাসভূমি ইহাই কল্পনা করিয়া থাকেন। একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী ছাড়া—আর কোটি কোটি-

গ্রহমণ্ডলী যে জীব পালন-রূপ মহৎ উদ্দেশ্যহীন হইয়া অবারিত গতিতে অনন্তপথে অনন্তকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহাদের মতে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রাশি রাশি অগণ্য যে সূর্য্য রহিয়াছে, তাহারা কত উত্তাপালোক বিকিরণ করিতেছে! সে সকলি যে বৃথা ব্যয় হইতেছে, এইরূপ কল্পনাই উচ্চতম বৈজ্ঞানিক কল্পনা বলিয়া স্থির হইতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য নক্ষত্রের কথা ছাড়িয়া যদি কেবলমাত্র আমাদের সূর্য্যের উত্তাপের কথা ভাবা যায় তাহাতেই দেখা যাইবে যে, যে উত্তাপ পাইয়া পৃথিবী জীবিত আছে তাহা সূর্য্যের বিকিরিত উত্তাপের ২১, ৭০০, ০০, ০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সূর্য্যের এই উত্তাপরাশির অতি সামান্য অংশ পৃথিবীর উপকার সাধন করিয়া অবশিষ্ট সকলি কি বৃথা নষ্ট হইতেছে! তাহা নহে, ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই উদ্দেশ্যহীন নহে, কিছুই বৃথা নষ্ট হয় না। আমাদের এই সীমাবদ্ধ ধারণা-শক্তির দ্বারা এই বিশ্বজগতের অভিপ্রায় সীমাবদ্ধ করিতে গেলেই আমরা ভ্রমে পতিত হইব। জ্যোতিষী প্রকটার এ সম্বন্ধে সুন্দর কথা বলিয়াছেন, "ইহা অতি আশ্চর্য্য, যে আমরা মুখে বলিবার সময় ঈশ্বরের মঙ্গলময় ভাব তাঁহার সৃষ্ট বস্তুমাত্রেতেই অর্পণ করি এবং তাঁহাকে অসীম জ্ঞানবান অসীম ক্ষমতাবান বলিয়া থাকি, অথচ অন্য লোকে প্রাণী আছে কি না এ বিষয় মীমাংসা করিতে গেলেই তখন সেই অসীম ক্ষমতাশালী ঈশ্বরের ক্ষমতা ও জ্ঞান সীমাবদ্ধরূপে ধরিয়া লই। অন্য লোকের জীব কল্পনার সময় সেই লোকের স্থানীয়-অবস্থার উপযোগী করিয়া যে তিনি সেখানকার জীবদিগকে সৃষ্টি করিবেন ইহা না ভাবিয়া, যেরূপ জীবগণ আমাদের নিকট পরিচিত, আমরা তখনো সেইরূপ জীবগণের কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন লোকে সেরূপ জীব বাস করিতেই পারে না, আর যদিই বা পারে তবে তাহাদের সেখানে কষ্টের সীমা থাকে না।"

যদি প্রকৃতির মূল·নিয়ম, সকল বিশ্বব্যাপী হয়, তবে জীব উৎপাদিনী শক্তি এই পৃথিবীতেই একমাত্র আবদ্ধ এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়। ফরাসী জ্যোতিষী ডাক্তার কার্ল্ ডু-প্রেল 'গ্রহদিগের নিবাসীগণ' বলিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে বলেন, অন্য গ্রহে তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার উপযোগী আকার ও শরীরযন্ত্রাদি সম্পন্ন জীব উৎপত্তি (যেরূপ জীবের অস্তিত্ব আমরা জানি না) যে কেবল সম্ভাবনীয় এমন নহে। যদি উহা সৃষ্টির অবশ্য প্রয়োজনীয় নাও হয়—তাহা হইলেও যুক্তি-যুক্তরূপে যে উহা অবশ্য ঘটনীয় ইহা বলিতেই হইবে। এখন কথা হইতেছে, অন্য গ্রহে জীব থাকিতে পারে—কিন্তু পৃথিবীর মানুষের ন্যায় জ্ঞানবান জীব আছে কি না?

যদি অন্য গ্রহে কোনরূপ জীব থাকা সম্ভব হয়—তবে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব থাকা কেনই বা সম্ভব না হইবে? তবে গ্রহের অবস্থা ভেদে সে জীবদিগের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রাদি পৃথিবীর মানুষ হইতে ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। জীবগণ যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেই উদ্দেশে চারিদিকের অবস্থা ভেদে তাহাদিগের আকৃতি ও যন্ত্রাদির বিভিন্নতা দেখা যায়; এক লোকে কোন জীবের যে একটি শারীরিক যন্ত্রের আবশ্যক, অন্য লোকে তাহারি অনাবশ্যক হইতে পারে। সেই হেতু অন্য লোক নিবাসীদিগের আকৃতি, ভার, বল, ইন্দ্রিয়, জীবনের স্থিতিকাল, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এই

সমুদায়কেই বাসভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার উপযোগী হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কোন গ্রহের নিবাসীদিগের শারীরিক ও মানসিক গঠন, সেই গ্রহের উত্তাপালোক প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার সহস্থায়ী ফল মাত্র। সুতরাং অন্য কোন গ্রহে মানুষের ন্যায় জীব থাকাই অধিক সম্ভব, তবে সে জীব পৃথিবীর মানুষ হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন হইবে এই মাত্র।

আমরা দেখিতে পাই, উদ্ভবন, ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশ সৃষ্টির মূল নিয়ম। ভূতত্ত্ববিদেরা আমাদের দেখাইতেছেন ক্রমোন্নতির নিয়মে জড়ের পর উদ্ভিদ, উদ্ভিদের পর ইতর জীবজন্তু, তাহার পর মানুষ এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাইব, যখনি সৃষ্ট জগতে কোন বস্তু জড়পদার্থ রূপে ব্যক্ত হইল তখন প্রাণ উৎপাদিনী শক্তি তাহাতে নিহিতরূপে বিদ্যমান রহিল। এই শক্তি যে সে কোন নূতন স্থান হইতে লইয়া আসিল তাহা নহে, যখন সে জড়রূপে ব্যক্ত হয় নাই, যখন সে অতি সূক্ষ্মতম ভাবে বিশ্বে বিলীন ছিল—সেই আদি কাল হইতেই সে শক্তি তাহার সঙ্গে ছিল।

বাস্তবিক পক্ষে আমরা যাহাদের অচেতন পদার্থ বলি, তাহারা যে প্রকৃতপক্ষে চেতনাহীন তাহা হইতেই পারে না। তুলনায় মাত্র তাহারা এই নামের বাচ্য। বিজ্ঞান বলিতেছে জগতের শক্তি সমষ্টির হ্রাসবৃদ্ধি নাই, বাহির হইতে নূতন কোন শক্তি আসিয়া শক্তি সমষ্টির সংখ্যা বাড়াইতে পারে না, রূপান্তরভাবে মাত্র তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে জড় রাজ্যের বাহির হইতে কি করিয়া হঠাৎ জ্ঞান আসিবে? আমি যে এই দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করিলাম, আঘাত করিবার শক্তি আগে হইতেই অবশ্য আমাতে বিদ্যমান ছিল, তবে সে শক্তি আমাতে লুকাইয়া ছিল মাত্র, এখন তাহাই কার্য্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মুষ্ট্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইল। অচেতন জগৎও চেতনাময়—সমস্ত জগতেই প্রাণ ও চেতনা অস্ফুট ভাবে শক্তির আকারে বিরাজ করিতেছে। তাহারি ক্রমোন্নতি দ্বারা ক্রমে সে প্রাণ সে জ্ঞান উদ্ভিদ হইতে ইতর জীবজন্তুতে, ইতর জীবজন্তু হইতে মানবে অধিকতর রূপে পরিস্ফুট হইতেছে মাত্র।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে জড় ও প্রাণরাজ্যের বস্তুগত প্রভেদ কিছুই নাই—কেবল মাত্র শ্রেণীগত অর্থাৎ সোপানগত বিভেদ। ঐ যে কতকগুলি সোপান রহিয়াছে, উহারা একই পদার্থে নির্ম্মিত কেবল উচ্চ নীচতায়, পরস্পর প্রভেদ মাত্র। সেইরূপ জড় পদার্থে ও জীবিত পদার্থে সোপানগত প্রভেদ মাত্র।

জড় ও প্রাণময়, জড় ও চেতনাময় কেবল তাহার চেতনা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, সে চেতনা আপনার চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। যাহাকে আমরা জীব বলি তাহাতে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং জড়ের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চতম জ্ঞান-বিশিষ্ট প্রাণী-উদ্ভবনের সম্ভাব্যতা বর্ত্তমান রহিল।

ক্রমোন্নতির এই নিয়মেই পৃথিবীকে আমরা এখনকার এই অবস্থায় দেখিতেছি। প্রথম হইতেই ইহার এ অবস্থা ছিল না—প্রথমেই পৃথিবীতে মানুষ জন্মে নাই। আদিম সৌরজগৎ-ব্যাপী সূর্য্য নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথিবী-গোলক বাষ্পাবস্থা হইতে তরলাবস্থা—তাহা হইতে সংহত-কঠিন অবস্থা ধারণ করিল, তাহার পর পৃথিবী বাসোপযোগী হইলে ইহাতে ইতর জীব উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে মানুষ পর্য্যন্ত আবির্ভাব হইল, এবং এইখানেই

যে সেই উন্নতির চরম সীমা তাহাই বা কে বলিবে? বিজ্ঞান দেখাইতেছে যে ক্রমোন্নতির গতি ঘূর্ণ সোপানাবলীর ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। এই গতির সঙ্গে সঙ্গে জড়জগৎ হইতে প্রাণীজগৎ সকলেরি চলিতে হইতেছে। তবে যাহারা এই গতির সহিত সমান বেগে দৌড়িতে পারে তাহারাই ঊর্দ্ধ সোপানে উঠে, আর যাহারা তাহা না পারে তাহারা নীচে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে তখনকার মত লোপ পায়। ডারউইন এই নিমিত্তই বলিয়াছেন সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য জীবেরাই বাঁচিয়া যাইবে। ভূতত্ত্ববিদেরা দেখিতেছেন যে চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে যে সকল জীব আত্মরক্ষার উপযোগী শরীরযন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিতে না পারে, সে জাতি ক্রমে ক্রমে একেবারে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থান শূন্য হইয়া পড়ে না, কেন না অন্য উপযোগী জীব উৎপন্ন হইয়া সে স্থান অধিকার করে। অন্য গ্রহগণ জীবের নিবাসভূমি বলিয়া যদি একবার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে আরো অধিক দূর পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে, ঐ পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিতে পারা যাইবে না। যে লোকে জীব আছে, ক্রমোন্নতির নিয়মে সেখানে ইতর হইতে ক্রমে উচ্চতর জীবের আবির্ভাব অবশ্যই সম্ভাবনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে এই আবির্ভাব কোন গ্রহে ঘটিয়া গিয়াছে, কোন গ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এরূপ কল্পনা অসঙ্গত নহে।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১

পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা কিরন্ত পদার্থ

জগতের সকল পদার্থই আমরা কঠিন, তরল ও বাষ্পময়, এই তিনের কোন না কোন অবস্থায় অবস্থিত দেখিতে পাই। এতদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণও পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানিতেন না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ক্রক্‌শ্ পদার্থের চতুর্থ অবস্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা যে কি নিম্নে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

পদার্থ জগৎ যে পরমাণু দ্বারা গঠিত ইহা বিজ্ঞানের একটি সামান্য সত্য। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকেই পরমাণু বলা যায়, কিন্তু এই পরমাণুর অস্তিত্ব মনশ্চক্ষু দ্বারাই ধারণা করা যাইতে পারে। অতি ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণও কোন পদার্থের পরমাণু রাশি দেখাইতে পারে না। পরমাণুসকল পদার্থ মধ্যে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থান করে না। একাধিক পরমাণু একত্রিত হইয়া একটি বিন্দুরূপে স্থিত হয়—এইরূপ পরমাণুর সম্মিলিত বিন্দুকে অণু কহে।

পদার্থ মাত্রেই এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুরাশির সমষ্টি, এবং কি কঠিন, কি তরল, কি বাষ্পীয়, সকল অবস্থাপন্ন পদার্থেরি অণুদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান ব্যবধান আছে, অণুগুলি সেই স্থানমধ্যে বিকম্পন করিতেছে। কঠিন পদার্থের অণু সকল পরস্পর এত ঘন সংলগ্ন যে তাহাদের মধ্যে কোন স্থান ব্যবধান আছে বলিয়া মনেই হয় না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কঠিনতম প্রস্তর আর মসৃণতম ধাতুও অবিচ্ছিন্ন-অন্তরায়-বিহীন, অণুময়

নহে। তবে ইহাদের অণুগুলির মধ্যে স্থান ব্যবধান অতি অল্প, এবং সেই অল্প স্থানেই তাহাদের বিকম্পন আবদ্ধ, ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই—কেন না পরমাণু যেমন দৃষ্টির অতীত —অণুও তেমনি দৃষ্টির অতীত, অণুদিগের বিকম্পন পথও সেইরূপ দৃষ্টির অতীত, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিয়াই বিজ্ঞান পূর্ব্বোক্ত রূপ অনুমান সিদ্ধান্তে পৌহুঁছিয়াছে।

যদি কঠিন দ্রব্যের অণুদিগের মধ্যে স্থান ব্যবধান আছে বলিয়া বুঝিতে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সাধারণতঃ যে পদার্থের কঠিনত্ব যত অল্প, তাহার অণুগুলি তত দূর সন্নিবিষ্ট, অর্থাৎ সেই অণুগুলির মধ্যে তত স্থান ব্যবধানের মাত্রা অধিক। সুতরাং কঠিন পদার্থের অণুবিকম্পনস্থান হইতে তরল পদার্থের অণুবিকম্পনস্থান অধিক, কেন না কঠিন পদার্থের অণুসংযোগ যত ঘন, তরল পদার্থের অণুসংযোগ তত ঘন নহে। আবার তরল পদার্থ হইতে বাষ্পীয় অণুর বিকম্পন পথ আরো প্রশস্ত, কেন না পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থার মধ্যে বাষ্পীয় অবস্থাতেই অণুসকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে গমন করে।

কিন্তু কঠিন পদার্থ-অণুর অতি ক্ষুদ্র বিকম্পন পথ হইতে বায়ু-বিরল কাচ-পাত্র মধ্যস্থ অতি লঘু বাষ্পের (গ্যাস) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত অণুবিকম্পন পথও এতদিন বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক বিন্দুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। অনুমান ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত বসাইতে তাঁহারা এতদিন সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। ক্রুক্‌শ্ সম্প্রতি ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া বিজ্ঞানকে আর একটি উচ্চ সোপানের উপর দাঁড় করাইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এতদিন কোন বায়ু-নিষ্কাষণ যন্ত্র দ্বারা কাচনলকে অধিক মাত্রায় বায়ু-বিরল করা যাইত না, ক্রুক্‌শ্ যে নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন তদ্দ্বারা কোন নল হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বায়ু বাহির করিতে পারা যায়, এবং এইরূপে একটি কাচনলে বায়ু-অণুর সংখ্যা এত কমান যাইতে পারে যে, সেই অবস্থায় অভ্যন্তরস্থ অণুদিগের বিকম্পন পথ স্পষ্ট অনুভূত হয়। কেবল ইহাই নহে, এই বিকম্পন পথের মাত্রা পর্য্যন্ত তখন মাপা যাইতে পারে।

অণুদিগের এইরূপ অতি দূর-দূর অবস্থিত অবস্থাই পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। ইহাকেই কিরন্ত পদার্থ (Radiant matter) বলা যায়। কিরন্ত পদার্থ এস্থলে কিরণময় অর্থে ব্যবহৃত নহে। চতুর্থ অবস্থাপন্ন পদার্থ কতকগুলি বিশেষ নিয়মে বিকিরণ করিয়া থাকে, এই বিকিরণ হইতেই ক্রুক্‌শ্ ইহার কিরন্ত অর্থাৎ বৈকিরক—এই নাম দিয়াছেন। অন্য সকল অবস্থায়, স্থানাভাবে, চাকসংলগ্ন মৌমাছির ন্যায়, পদার্থ-অণু অবিরত একটির উপর একটি আসিয়া ঝাঁকিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় একটি অণু আর একটি অণুর গাত্র স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে পথমুক্ত পাইয়া স্বাধীনভাবে খানিক দূরে চলিয়া যায়, চলিয়া গিয়া আবার সেখান হইতে ফিরিতে থাকে, এবং এইরূপ গতির সময় সেই গতির পথ স্পষ্ট প্রত্যক্ষমান হয়। আরো স্পষ্ট বুঝিবার জন্য, কিরূপ পরীক্ষা দ্বারা এই বিকম্পন পথ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একটু বলা আবশ্যক।

চৌদিক-রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কোন একটি কাচের নলের দুই সীমায় মনে কর দুইটি প্ল্যাটিনম তার প্রবিষ্ট করান আছে। এই দুইটি তারকে কোন তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের সম বিষম বিদ্যুৎযুক্ত মেরুর সহিত যুক্ত করিলে নলমধ্যস্থ তারের এক সীমা হইতে আর এক সীমা

পর্য্যন্ত সমরেখায় একটি আলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্র দ্বারা যদি এই নল বায়ু-বিরল করা যায়, নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর ২৫ ভাগের ২৪ ভাগ যদি বাহির করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে তখন এই নলমধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে আর সমরেখায় আলোক লক্ষিত হইবে না। তাহার পরিবর্ত্তে তাহাতে নলের সমস্ত অভ্যন্তর সমান রূপে একটি গোলাপ বর্ণের আভায় প্রজ্জ্বলিত হইবে। কিন্তু ক্রুক্‌শের আবিষ্কৃত উপায় দ্বারা সেই নলে অধিকতর বায়ু বিরলতা উৎপাদন করিলে আর একটি সম্পূর্ণ নূতন ফল দেখা যাইবে।

যদি ২৫ ভাগের ২৪ ভাগ বায়ু বাহির না করিয়া নূতনাবিষ্কৃত উপায় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নলবায়ুর ৪০ ভাগের ৩৯ ভাগ বায়ু বাহির করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত নলের অভ্যন্তর-দেশ একরূপ অস্পষ্ট আলোকপূর্ণ হইবে, কেবল বিষম মেরু-তারের কাছাকাছি একটা স্থানে অন্ধকার দেখা যাইবে। কিন্তু এই অন্ধকার স্থান ও বিষম মেরুবিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গাঢ় নীলবর্ণের একটা আলোকের টুকরা দেখা যাইবে। ইহার পর যদি ৪০ ভাগের ৩৯ ভাগের স্থলে ১৬০ ভাগের ১৫৯ ভাগ বায়ু নল হইতে বাহির করিয়া ফেলা যায়, তবে সমমেরুর বিস্তৃত আলোকের মাঝে মাঝে কাল রেখা পড়িতে থাকিবে—এবং পূর্ব্বোক্ত বিষম মেরু-তারের অন্ধকারটির কলেবর আরো বর্দ্ধিত হইবে। ইহার পর আরো বায়ু বাহির করিয়া লইলে—সমমেরু-তারের মাঝে মাঝে যে কাল রেখা দেখা গিয়াছে, তাহার বিস্তৃতি ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে—এবং বিষম মেরুর অন্ধকারটিও আরো বিস্তৃত হইবে। তাহার পর নলটি আরো বায়ু বিরল কর, বিষম মেরু-তারের নিকট, পূর্ব্বে যেমন একটি অন্ধকার হইয়াছে, তাহার কাছাকাছি ঐরূপ আর একটি অন্ধকার হইবে, কিন্তু এই উভয় অন্ধকার স্থানের মধ্যে একটু আলো দেখা যাইবে। পশ্চাদুক্ত এই দ্বিতীয় অন্ধকারময় স্থানটি, ক্রুক্‌শের নামে অভিহিত, কারণ তিনিই ইহার বিশেষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। ক্রমে আরো বায়ু বাহির করিয়া লইতে লইতে শেষোক্ত অন্ধকারটি বাড়িয়া বাড়িয়া সমস্ত নলটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। এই অবস্থাতেও নলটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য নহে। এখন ঐ নলের ভিতর বায়ু যে অবস্থায় থাকে, তাহা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা নামে কথিত হয়—এই অবস্থায় নলাভ্যন্তরস্থিত বায়ু লঘু অপেক্ষাও লঘুতম, এবং এই অবস্থাপন্ন বায়ুর অণুগুলির বিকম্পন পথ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে তাহা মাপা যাইতে পারে। নলটি উপরিউক্ত রূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার কারণ কি তাহা এইবার দেখা যাউক। ইহা একটি বৈদ্যুতিক নিয়ম যে, যে দ্রব্যে বিদ্যুৎ আছে, তাহাকে স্পর্শ দ্বারা অন্য দ্রব্য বিদ্যুৎযুক্ত হয়—এবং এইরূপ বিদ্যুৎযুক্ত হইয়া সে দ্রব্য অন্য কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবামাত্র তাহাকে সেই বিদ্যুৎ দান করে—এবং এইরূপে বিদ্যুৎগ্রহণ করিবার সময় একবার—ও দান করিবার সময় আর একবার আলোক উৎপন্ন হয়। এখন নল-মধ্যস্থিত বায়ু-অণু এইরূপে মেরু-তারকে স্পর্শ করিবামাত্র একটি আলোক উৎপন্ন হয় ;—তাহার পর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া অন্য অণুকে স্পর্শ করিবামাত্র একটি আলোক উৎপন্ন হয়। যখন নল বায়ুপূর্ণ থাকে, তখন একটি অণু আর একটিকে এবং সে আর একটিকে, এইরূপে একের নিকট অন্যে এত অল্প' সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে—যে নলটির ভিতর এক মেরু-তার হইতে আর এক তার পর্য্যন্ত আলোক প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু নলটির বায়ু-অণুর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে যতই বিরল করিয়া ফেলা যায়—ততই একটি

অণুর, মেরু-তার হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করিয়া অন্যটির কাছে যাইতে কিছু দেরী হয় এবং তাহাকে বিদ্যুৎ দিয়া আবার মেরু-তারের নিকট ফিরিয়া আসিতেও সময় লাগে, এই মধ্যবর্ত্তী দুই সময় আলোক উৎপন্ন হয় না, কাজেই মেরুর কাছে ও নলের স্থানে স্থানে অন্ধকার উৎপন্ন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নলমধ্যে যতই বায়ু কমিতে থাকে, যতই অণুগুলির চলিবার পথ বাড়িতে থাকে, ততই একটির সহিত একটির সংঘটন বিরল হয় এবং সংঘটনজনিত আলোক উৎপাদনও ক্রমে কমিয়া মেরুতে অন্ধকার ঘনাইতে থাকে আর এই অন্ধকারের গাঢ়ত্বের ন্যূনাধিক্য অনুসারে অণুর সংখ্যা পরিমাণ করা যাইতে পারে। এইরূপে পাত্রমধ্যে বায়ু-অণুর সংখ্যা কমিতে কমিতে যখন নল-বায়ু একেবারে চতুর্থ অবস্থায় আসিয়া সম্পূর্ণরূপে উহার নিয়মাধীন হয়, তখন বিদ্যুৎপ্রবাহ একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়ে, তখন নলাভ্যন্তর একেবারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন অণু সকল এত স্বল্পতম হইয়াছে যে একটি অণুর এক মেরু হইতে অন্য মেরুতে আসিবার সময় পথে আর কোন অণুর সহিত স্পর্শলাভ ঘটে না।

একেবারে এইরূপ অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে সেই নলমধ্যস্থিত আলোক পরীক্ষা দ্বারা পদার্থের অনাবিষ্কৃত কতকগুলি গুণ জানা গিয়াছে।

নলমধ্যস্থিত প্লাটিনম তারের অগ্রভাগ যদি একটি ক্ষুদ্রবিন্দু না হইয়া একটি চাকতির মত হয়, এবং সেই চাকতি নিম্নাভিমুখী করিয়া রাখা হয়, তবে সেই অণুগুলি, দর্পণ হইতে আলোক বিক্ষিপ্ত হইবার ন্যায়, চাকতির গাত্র স্পর্শ করিয়া সমরেখায় বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। অন্য কথায়, স্ব-অঙ্গের বিদ্যুতালোক নলের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, নলের মধ্যে উহারা নির্ঝর প্রবাহে খেলিতে থাকে। এই সময় আলোক বিশ্লেষণী যন্ত্র দ্বারা এই আলোক বিশ্লেষণ করিয়াই পদার্থের অনেক গুপ্ত ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইতেছে। এই উপায় দ্বারা ইট্রিয়াম নামে একটি নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং ভবিষ্যতে যে ইহা দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান আরো বর্দ্ধিত হইবে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ এইরূপ আশা করিতেছেন।

পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে আজ ইয়োরপ এই এক নূতন জ্ঞান লাভ করিল, কিন্তু এ জ্ঞানও যে ভারতের বহু পুরাতন, তাহা শাস্ত্রের নানাস্থানীয় উল্লেখ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বৈশেষিক দর্শনের মতে পদার্থের দুই রূপ, সংঘাতরূপ ও পরমাণুরূপ : "তত্র তাবৎ পৃথিব্যাদয়ঃ নিত্যা অনিত্যা চ। পরমাণুরূপা নিত্যা, সংঘাতরূপা অনিত্যা" (পদার্থ-তত্ত্বগ্রন্থ)। যাহা কিছু পরমাণুর সংহতিতে গঠিত তাহাই এ মতে পদার্থের সংঘাতরূপ, সুতরাং কঠিন তরল ও বাষ্পীয় এই তিন অবস্থাই পদার্থের সংঘাতরূপ, কেন না এই তিনই পরমাণুর সংযোগ অবস্থা—কেবল এই তিনের অবস্থা ভেদে এই সংযোগের পরিমাণমাত্র প্রভেদ। যোগশাস্ত্র ইহা হইতে আরো অধিক দূর গিয়াছে। এই শাস্ত্রের মতে পদার্থের সপ্তবিধ অবস্থা।

স্থূল (কঠিন তরল ও বায়বীয়) স্বরূপ,—সূক্ষ্ম অন্বয় ও অথর্বত্ব।*

কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ অবস্থাসম্পন্ন পদার্থই আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট হয়—সেই জন্য এই তিন অবস্থাই স্থূল বলিয়া গণ্য। ঐ অবস্থাপন্ন পদার্থ যখন

* মাননীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

কার্য্য করে—তখন উহাদের স্বরূপ-অবস্থা। যাহা পরমাণুত্ব প্রাপ্ত হইল তাহা সূক্ষ্ম অবস্থা—অবশিষ্ট দুই অবস্থাকে আত্মার সুখ দুঃখাদিদায়ক সম্বন্ধ ধরিয়া অন্যগুলি হইতে প্রভেদ করা হয়। এইরূপে আমরা ইয়োরপের নবাবিষ্কৃত সত্য সম্বন্ধে আর্য্যদিগের স্থূল জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি।

কিন্তু প্রশ্ন এই, যদি বাস্তবিক প্রাচীন আর্য্যগণ বিজ্ঞানে এত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তবে ইয়োরপীয় শাস্ত্রকারগণের ন্যায় তাঁহারা কেন সে সকল বিষয় অতি সুস্পষ্ট বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই? শাস্ত্রমধ্যে তাহা এত প্রহেলিকাময় কুজ্ঝটিকায় আবদ্ধ কেন? প্রথমতঃ, আমরা যে সকল শাস্ত্রমধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উল্লেখ দেখিতে পাই তাহা বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক নহে। দর্শন, পুরাণ প্রভৃতিতে, অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে, প্রসঙ্গক্রমে মাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উল্লেখ দেখিতে পাই—সুতরাং এরূপ স্থলে ও-সকল বিষয়ের বিবৃত আলোচনা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, বেশ তাহা যেন হইল, কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রাচীন লুপ্তাবশিষ্ট পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতেও ত ইয়োরপ শাস্ত্রের ন্যায় আলোচ্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের যে সমস্ত পুস্তক বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও যে বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ আলোচনা ছিল, এমন সম্ভবে না। বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি হইলে কি এরূপ হইত?

কিন্তু বাস্তব পক্ষে ইহা বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত অবনতির পরিচয় নহে। সত্য বটে সংস্কৃত শাস্ত্র মাত্রেরি প্রকাশ প্রণালী ইয়োরপীয় শাস্ত্র প্রণালী হইতে ভিন্ন। কি দর্শন কি বিজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়েই ইয়োরপ শাস্ত্রকারগণ যে সিদ্ধান্তে আসিতেছেন তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান এবং সোপানগুলিতে উঠিবার নিয়ম দেখাইতেছেন—কিন্তু আর্য্যগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সোপান—তাহার প্রণালী, কিছু না বলিয়া কেবল সিদ্ধান্তটি বলিয়াই যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পাইতেছে না—কেবল সেই জ্ঞান প্রকাশের প্রণালীর অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সেই জ্ঞানশালী পণ্ডিতদিগের পুস্তকে এ অসম্পূর্ণতাটুকই কেন? একটু ভাবিয়া দেখিলেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তখন পণ্ডিতদিগের যে সকল জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা হইত, সে কাহাদিগের জন্য? সাধারণ পাঠকদিগের জন্য। যাহারা যথার্থ বিদ্যাপ্রয়াসী তাহাদের জন্য নহে? যাহারা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষী হইত, তাহারা পুস্তক মাত্র পাঠে তাহা লাভ করিত না, গুরু স্বয়ং তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। যাহারা তত গভীর রূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে অপারক কিম্বা শিখিতে ইচ্ছা করে না—তাহাদিগকে স্থূল জ্ঞান দিবার জন্যই বিশেষ রূপে শাস্ত্র প্রণয়ন হইত। সুতরাং এরূপ স্থলে—সকল সিদ্ধান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ সোপান শাস্ত্রে সবিস্তার আলোচনার সার্থকতাই তাঁহারা দেখিতেন না—কেন না—কত কষ্টে কত পরিশ্রমে তাঁহারা যাহা জানিয়াছেন ; পুস্তকে তাহা বুঝান অসম্ভব। সুতরাং তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলমাত্র জ্ঞানের সারাংশ মাত্র সাধারণকে জানাইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন।

ইহা ছাড়া তখন সমাজের গঠন ভিন্ন ছিল, সভ্যতার প্রকৃতি স্বতন্ত্র ছিল। তখন বাহ্যিক পদার্থগত উন্নতি যথার্থ সভ্যতা বলিয়া গণ্য হইত না—আত্মার উন্নতিই সভ্যতার মূল ও যথার্থ সভ্যতা বলিয়া গণ্য হইত।

যেরূপ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে—তাহাই পণ্ডিতগণ সাধারণের

শিক্ষার উপযোগী ভাবিতেন, বিজ্ঞানের যে সকল অংশ, যে সকল সোপান কেবল পার্থিব পদার্থের অন্তর্গত, যাহাতে পার্থিব জ্ঞানের মাত্র উৎকর্ষ সাধন করে—তাহা তাঁহারা সাধারণকে তন্ন তন্ন রূপে বুঝাইবার আবশ্যকতাই বুঝিতেন না। বিজ্ঞান-জ্ঞানকে পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ করিতে তাঁহারা যেন ঘৃণা করিতেন। আর্য্যগণের আচার, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রণালী প্রভৃতি সকলরূপ সামাজিক নিয়ম হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনই আর্য্যগণের চরম লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা জানিতেন, মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব সুখ শান্তি লাভ হইবে—কিন্তু কেবলমাত্র সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকেই যদি লোকের দৃষ্টি পড়ে, তাহাতে বিপরীত ফল দর্শিবে। সুতরাং পদার্থ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও, তাহা তাঁহারা সাধারণের জন্য ব্যাখ্যা করিবার উপকারিতা দেখিতেন না, তাহা কেবল পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেই জন্য আবদ্ধ হইয়া যাইত। সাধারণ যাহা সহজে বুঝিতে পারিবে, যাহাতে তাহাদের যথার্থ উপকার হইবে, আত্মার উৎকর্ষ সাধনের যাহা সাহায্য করিবে, তাহাই তাঁহারা বিশেষরূপে পুস্তকের আলোচ্য বলিয়া মনে করিতেন।

সাংখ্য প্রণয়িতা কপিল বলিতেছেন সংসারের বা গৃহকার্য্যের উন্নতিসাধক জড়পিণ্ডের গুণাগুণ ও স্থিতি প্রকার জানিলে কি হইবে? উহা অনর্থের মূল, উহা অসার, এবং বিবেকজ্ঞানের বা তত্ত্বজ্ঞানের বাধক ভিন্ন সাধক নহে। সংসার একপ্রকার রজ্জু বিশেষ, সুতরাং আপনিই আপনার বন্ধনের নিমিত্ত আয়োজন করা মূর্খের কার্য্য। অতএব যাহাদের কুতূহল নিবৃত্তি করাই অভিলষিত, শিল্প সাধন করাই যাহাদের পুরুষার্থ, চিরকাল বন্ধন দশায় থাকিতে যাহারা ক্লেশ বোধ করে না, তাহারাই উহার অনুষ্ঠান করুক, কিন্তু যাহারা জ্ঞান ভোগ করিবে, অধ্যাত্মতত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া আত্মাকে মুক্ত করিবে, তাহারা উহা করিবেও না, জানিবেও না। বিশেষতঃ, প্রত্যক্ষের উপর আবার ভাসমান পদার্থের উপদেশ কি? মনুষ্য বুদ্ধিবলই তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে। উৎপ্রেক্ষা বা উদ্ধার করিতে পারিবে। * কপিল ত একজন দার্শনিক, তিনি একথা বলা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু ইনি একা নহেন, শাস্ত্রকার মাত্রেরি যেন উহা মনোগত ভাব। তখনকার বিজ্ঞান, দর্শন ছাড়া নহে, কেন না যাঁহারা বিজ্ঞান আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহারাই প্রায় দার্শনিক ছিলেন। কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে, তাঁহাদের যে সকল ক্ষুদ্র পথ অতিক্রম করিতে হইত, তাহাতে যেরূপ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত, সেই কষ্ট ও পরিশ্রম যাহারা স্বীকার করিবে না, তাহারা তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল মাত্র ভোগ করুক, একের সিদ্ধান্ত অন্যে গ্রহণ করুক, প্রতি ক্ষুদ্র পথ দিয়া চলিতে সকলের যে সময় ক্ষেপ হইবে, বৃথা সময় ক্ষেপ হইবে, (কেন না তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেবল শাস্ত্রপাঠে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে না) সেই সময় পরমার্থ চিন্তায় ক্ষেপণ করিয়া মনের উন্নতি সাধন করুক, এই অভিপ্রায়েই আর্য্যশাস্ত্রের প্রকাশ প্রণালী ইয়োরোপশাস্ত্রের প্রকাশ প্রণালী হইতে ভিন্ন—এইরূপ ধারণা হয়।

ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১

* সাংখ্য দর্শন। শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত।

মঙ্গলে জীব থাকিতে পারে কি না

এ পর্য্যন্ত সৌরজগতের যতগুলি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তম্মধ্যে মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐক্য দেখা যায় ; সুতরাং যদি কোন গ্রহ পৃথিবীর জীবের মত জীবের বাসোপযোগী হয় ত সে মঙ্গল গ্রহ। আমরা দেখিতে পাই, উত্তাপ, আলোক, জল ও বায়ুই উদ্ভিদ হইতে পশু মনুষ্য সকল জীবের প্রাণরক্ষার প্রধান কারণ। যতদূর জানা গিয়াছে, এ সকল বিষয়েই মঙ্গল পৃথিবীর মতন। মঙ্গলে দিবসের দৈর্ঘ্য প্রায় পৃথিবীর সমান, এজন্য পৃথিবী সূর্য্যের নিকট যে পরিমাণে উত্তাপ আলোক পাইয়া থাকে মঙ্গলও প্রায় সেই পরিমাণে উত্তাপালোক পায় ; সুতরাং উত্তাপালোকের প্রাচুর্য্য কি অপ্রাচুর্য্যবশতঃ মঙ্গল জীবের বাসানুপযোগী নহে। তবে মঙ্গলে জল বায়ু আছে কি না?

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কিরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য আমরা জ্যোতিষী প্রকটার লিখিত একটি প্রবন্ধের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

মঙ্গলে জল আছে। দূরবীন দিয়া দেখিলে মঙ্গলের দুই প্রান্তভাগ অন্য সকল স্থান অপেক্ষা শুভ্র এবং উজ্জ্বল দেখা যায়। ইহা হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবীর মত মঙ্গলের দুই মেরুও বরফে ঢাকা। ম্যারাল্‌ডি প্রথমে এই বিন্দু দুইটি দেখিতে পান, এবং সেই সময় তিনি ইহাও লক্ষ্য করেন যে উহাদের মধ্যে একটি বিন্দু ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু ইহাতেও তিনি আসল কারণটি ধরিতে পারেন নাই। সেই বিন্দুদুটি সম্ভবতঃ পৃথিবীর মেরুর মত বরফাবৃত-স্থান বলিয়াই এইরূপ উজ্জ্বল দেখাইতেছে এবং তম্মধ্যে একটি গ্রীষ্মের আবির্ভাবেই আবার ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাঁহার মনে হইল না ; তিনি যথার্থ কারণ না ধরিতে পারিয়া এইরূপ এক অদ্ভুত নিষ্পত্তি করিয়া বসিলেন —যে ঐ শ্বেত উজ্জ্বল বিন্দুটি যখন আয়তনে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে তখন ক্রমে ক্রমে একেবারেই উহা লোপ পাইয়া যাইবে—এমন কি কমিতে কমিতে কোনদিন উহা একেবারে লয় পাইয়া যাইবে, তাহার দিন পর্য্যন্ত তিনি গণিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাহা মিলাইয়া গেল না, ইহার অর্ধশতাব্দী পরে সার উইলিয়ম হারসেল দূরবীণ দিয়া যখন মঙ্গল পর্য্যবেক্ষণ করেন তখনও উহা দেখা যাইতেছিল। এবং তিনিই ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করেন তাহাই এখন বিজ্ঞান সমাজে গৃহীত। সকলেই জানেন, আমাদের গ্রীষ্মকালে অ্যাটলাণ্টিক সমুদ্রের যতদূর পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে, শীতকালে বরফের জন্য ততদূর যাওয়া যায় না, সেইরূপ শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তনেই মঙ্গলের মেরুদেশ-বর্ত্তী বরফাবৃত স্থানের আয়তন হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে, কেহ বলিতে পারেন—পৃথিবীর মেরু বরফ-মণ্ডিত বলিয়া মঙ্গলের মেরুও যে বরফ-মণ্ডিত হইবে তাহার প্রমাণ কি? উহার প্রান্তভাগস্থিত উজ্জ্বল বিন্দু দুইটির কি অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না?

ইহা মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের দেখা আবশ্যক মঙ্গলে সমুদ্র আছে কি না? আমরা সকলেই জানি মঙ্গলের আলোক অন্য সকল গ্রহ অপেক্ষা রক্তবর্ণ। অথচ দূরবীন

দিয়া দেখিলে গ্রহের সমস্তভাগ লাল দেখিতে পাইবে না। তাহার দুই প্রান্তভাগে যে শ্বেত বিন্দু দুইটির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া মঙ্গলের মাঝে মাঝে পৃথিবীর সমুদ্রের বর্ণের মত সবুজ নীলবর্ণের নানা অপরূপ গঠনযুক্ত স্থান দেখা যায়। এই স্থানগুলি সমুদ্র হইলে মঙ্গলের স্থল ও জলের অংশ প্রায় সমপরিমাণ, আর তাহা হইলে মঙ্গলের মেরুর বরফ-আবরণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

কিন্তু ঐ সবুজ স্থানগুলি যে সমুদ্র তাহা সপ্রমাণ করিবার উপায় কি? যখন কোন জ্যোতিষী মঙ্গলে গিয়া ইহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিতে অপারক—তখন এ সমস্যা কি প্রকারে পূরণ হইতে পারে? এক উপায় আছে, বর্ণ-বিশ্লেষণী-যন্ত্র দ্বারা অব্যবহিতভাবে ইহার সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে, আর তাহাই হইয়াছে। কিরূপ পদার্থ হইতে এই সবুজ বর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে—এ যন্ত্র তাহা বলিতে পারে না—কিন্তু মঙ্গলের ঐ সবুজ স্থানগুলি যদি সমুদ্র ও উজ্জ্বল স্থান দুইটি যদি বরফাবৃত স্থান হয়—তাহা হইলে উহা দ্বারা যেরূপ ফল হইবে,—সেই ফল দেখিয়াই জ্যোতিষী ও বিজ্ঞানবিদেরা ইহার শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন। গ্রহে যদি দূর-বিস্তৃত সমুদ্র থাকে ও নীহারমণ্ডিত স্থান থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, যে সমুদ্র-উত্থিত-বাষ্পরাশি বায়ু আনীত হইয়াই নীহার-রূপে পরিণত হইতেছে। বর্ণ-বিশ্লেষণী-যন্ত্র দ্বারা এই জলীয় বাষ্পরাশির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে আলোক প্রচুর জলীয়-বাষ্প-রাশি অতিক্রম করিয়া আসে, বর্ণ-বিশ্লেষণী-যন্ত্রে তাহা নিক্ষিপ্ত হইলে সেই বিশ্লিষ্ট-বর্ণ-সমূহের (Spectrum) মধ্যে কতকগুলি বিশেষ রকমের কাল কাল দাগ পড়ে। এখন মঙ্গল হইতে আমরা যে আলোক পাই তাহা সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক মাত্র। কিন্তু পৃথিবীতে আসিবার আগে এই আলোককে দুইবার মঙ্গলের বাষ্পাবরণ ভেদ করিতে হয়। একবার সূর্য্য হইতে মঙ্গল-পৃষ্ঠে যাইবার সময়, আর একবার মঙ্গল-পৃষ্ঠ হইতে ফিরিয়া পৃথিবীতে আসিবার সময়। এইরূপে মঙ্গল-পৃষ্ঠে গিয়া সেখান হইতে আবার ফিরিয়া আসিবার সময় সে আলোক জলীয়বাষ্প অতিক্রম করিয়াছে কি না, বর্ণ-বিশ্লেষণীযন্ত্র তাহা নিশ্চিৎরূপে বলিয়া দিতে পারে। ডাক্তার হাগিংশ ইহার পরীক্ষায় কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন এইখানে দেখা যাউক।

তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চে বর্ণ-বিশ্লেষণী-যন্ত্রে মঙ্গল আলোক বিশ্লেষণ করিবামাত্র সেই বিশ্লিষ্ট-বর্ণসমূহে উল্লিখিত প্রকার কাল কাল দাগ দেখিতে পাইলেন।

সূর্য্য যখন দিগ্বলয়ের কাছাকাছি আসিয়া জলীয়বাষ্প-ভারাক্রান্ত বাষ্পাবরণের মধ্য দিয়া আলোক প্রদান করে—তখন সেই আলোক বিশ্লেষণ করিলে যেরূপ কাল দাগ দেখা যায়, মঙ্গল-আলোক বিশ্লিষ্ট বর্ণসমূহেও সেইরূপ দাগ পড়িল। কিন্তু উহা মঙ্গলের কিম্বা পৃথিবীর জলীয়বাষ্পের চিহ্ন তাহা ঠিক করিবার জন্য তখন তিনি সেই যন্ত্র মঙ্গল হইতে সরাইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত করিলেন। তখন চন্দ্র মঙ্গল অপেক্ষা দিক্‌বলয়ের আরো কাছে ছিল—সুতরাং পূর্ব্বকার কাল দাগ পৃথিবীর বাষ্পের হইলে—চন্দ্রের আলোক-পরীক্ষার সময় আরো সুস্পষ্টরূপে তাহা দেখা যাইত, কিন্তু চন্দ্রের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া একেবারেই সে দাগ পাওয়া গেল না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল, সে দাগ মঙ্গলের বাষ্প-চিহ্ন, পৃথিবীর নহে। তাহা হইলে সেই সবুজ স্থানগুলি যে সমুদ্র, আর মেরুদেশের

ক্ষুদ্র বিন্দু দুইটি যে হিমশৈলাবৃত-স্থান সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, এ সকল বিষয়ে মঙ্গল পৃথিবীরই মতন। মঙ্গলে পৃথিবীর মত সমুদ্র আছে, মঙ্গলে বাষ্প উঠিয়া ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেরুদেশে বরফ জমিতেছে—আবার গলিয়া সে বরফ আয়তনে ছোট হইয়া পড়িতেছে। কেবল ইহাই নহে—হাগিংশের পরীক্ষায় আর একটি বিষয় জানা যাইতেছে। মঙ্গলের সমুদ্র-উত্থিত সেই জলীয় বাষ্পরাশি এক উপায়ে মাত্র মেরুদেশে পৌঁছিতে পারে। যদি মঙ্গলের বাষ্পাবরণ থাকে—তাহার মধ্য দিয়াই সে জল-বাষ্প-রাশি মেরুতে পৌঁছিতে পারে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে মঙ্গলে পৃথিবীর মত বাষ্পাবরণও আছে। যদিও সে বাষ্পাবরণের প্রকৃতি ঠিক আমাদের পৃথিবীর বায়ুর মত কি না তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই, তবে যখন বর্ণ-বিশ্লেষণী যন্ত্রে মঙ্গল-আলোক বিশ্লেষণ করিয়া কোন অপরিচিত দাগ এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না, তখন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে পৃথিবীর বাষ্পাবরণে যে সকল গ্যাস আছে তাহা ছাড়া মঙ্গলের বাষ্পাবরণে অন্য কোন গ্যাস নাই। প্রথম প্রথম দূরবীণ দিয়া যাঁহারা মঙ্গল পরীক্ষা করেন, তাঁহারা মঙ্গলের বাষ্পাবরণ সম্বন্ধে এক বিষয়ে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। গ্রহটি নিরীক্ষণকালে বহুদূর লইয়া তাহার আশপাশ চারিদিকে অন্য কোন তারা না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, মঙ্গলের বাষ্পাবরণ বহু শত ক্রোশ বিস্তৃত, কিন্তু উহা যে দৃষ্টিভ্রম মাত্র (Optical) সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই।

গ্রহে জীবের প্রাণরক্ষার জন্য যাহা যাহা বিশেষ আবশ্যক মঙ্গলে আমরা সবই দেখিয়া আসিলাম। এখানে প্রকটারের আর একটি কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধটির উপসংহার করি। তিনি বলেন, মঙ্গলগ্রহের উত্তর ও দক্ষিণার্দ্ধে শীতগ্রীষ্মের আবির্ভাব, সেখানে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতি দিবসের কার্য্যফল, এমন কি প্রতি ঘণ্টায় সেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—যেমন মেঘ জমা, বৃষ্টি পড়া, রৌদ্রকিরণে কখনো মেঘ ছড়াইয়া পড়া—প্রভৃতি যে সকল পরিবর্ত্তন পৃথিবীর আকাশে আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, সে সকলি একটি ক্ষমতাশালী দূরবীণের সাহায্যে মঙ্গলে ঘটিতে দেখা যায়।

ভারতী, বৈশাখ ১২৯২

তারকা-বর্ণ ও তারকার নির্ম্মাণ উপাদান

সকল তারকার যেমন সমান জ্যোতি নহে, তেমনি সমান বর্ণও নহে। নীল, লাল, হরিৎ, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে আকাশে এত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের তারকা আছে, আর একের বর্ণ এত মৃদু ভাবে অন্যের বর্ণের সহিত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে, যে দর্শকেরা সহজে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারেন না।

যমক ও বহুসঙ্গিক* তারকাদিগের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপ বর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

* গত বৎসরের একাদশ সংখ্যক ভারতী দেখ।

সাদার্ণ ক্রস-রাশির তারকাগুচ্ছের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিয়া স্যর জন হারসেল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই তারকাগুচ্ছে এক শত তারারও অধিক তারা আছে। ইহার মধ্যে সাতটি মাত্র দশম শ্রেণীরও কিছু অধিক উজ্জ্বল। ইহার দুইটি লাল, দুইটি সবুজ, তিনটি ধানি, এবং একটি সবুজাভ নীল। এই ভিন্ন-বর্ণধারী তারাগুলি একখানি কারুকার্য্যখচিত অলঙ্কারের ন্যায় তাঁহার নয়নে প্রকাশ পাইয়াছিল। তারাদিগের জ্যোতির ন্যায় বর্ণও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পুরাতন কালের জ্যোতিষীগণ সিরিয়াসকে লাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এখন তাহা সবুজাভ, এবং ক্যাপেলা যাহা এখন ফিকে নীল তাহা তখন লাল ছিল।

কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল † তারকার বর্ণের আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দের নূতন তারকা প্রথমে শ্বেত, পরে পীত, অবশেষে লোহিত বর্ণ হইয়া উঠে।

জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে যখন তারাদিগের উজ্জ্বলতা হ্রাস হইতে থাকে তখনি সাধারণত তাহাদের বর্ণের লোহিতত্ব বাড়িয়া উঠে।

প্রধান কয়েকটি ভিন্নবর্ণ তারকার বর্ণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সিরিযাস বেগা আটেয়ার ডেনেব	হরিৎবর্ণ
অ্যালডিবেরণ অ্যানটেয়ার্স বেটেলগুস	লালবর্ণ
রেগুলাস ডেনেবোলা ফোমালহট ধ্রুব তারা	শ্বেতবর্ণ
আর্কটরাস	পীতবর্ণ

তারকাদিগের আয়তন অথবা ব্যাস নিতান্ত ক্ষমতাশালী দূরবীন দিয়াও জ্যোতির্ব্বিদগণ ধরিতে পারেন না, পৃথিবী হইতে তাহারা এতই দূরে অবস্থিত যে তাহাদের মাপা অসম্ভব। তবে তারকাগণ যে কি উপাদানে নির্ম্মিত ইহা তাঁহারা অনেক পরিমাণে জানিতে পারিয়াছেন। তারকাদিগের অন্তরে যাহাই থাকুক, প্রথমতঃ তাহাদের উপরিভাগে যে উজ্জ্বল আবরণ দেখা যায়* তাহা তারাদিগের আলোকাবরণ নামে কথিত। পৃথিবীর

† সময়ে সময়ে যে সকল তারকার ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তনশীল তারকা কহে। গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যক ভারতী দেখ।

* সূর্য্যের যে উজ্জ্বল গোলাকার মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই তাহা সূর্য্যের আলোকাবরণ।

উপরে যেমন বাষ্পাবরণ আছে, এই আলোকাবরণের উপরিভাগে আবার সেইরূপ বাষ্পাবরণ আছে।

আলোকাবরণের উপাদান পদার্থ এতই প্রচণ্ড-উত্তপ্ত অবস্থায় অবস্থিত যে যদিও আলোকাবরণে ধাতু প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান তথাপি তাহা তরল বা বাষ্পময়।

ধাতুদ্রব্য গলাইতে যে কিরূপ প্রচণ্ড উত্তাপের প্রয়োজন, তাহা মনে করিয়া দেখিলে আলোকাবরণের উত্তপ্ততা কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। নিরেট লৌহ ও নিরেট জল অর্থাৎ বরফ এ উভয়কেই উত্তাপ দ্বারা গলান যায়। সেনটিগ্রেড থারমমিটারের শূন্য ডিগ্রি পরিমিত উষ্ণতায় বরফ জল হয় আর উক্ত থারমমিটারের ১০০ ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণতায় জল বাষ্প হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু লৌহকে তরলাবস্থায় আনিতে হইলে সেনটিগ্রেড থারমমিটারের প্রায় দেড় হাজার ডিগ্রি উষ্ণতার আবশ্যক। আর কত পরিমাণ উষ্ণতা দিতে পারিলে যে লৌহ বাষ্প হয় তাহা এখনো অজ্ঞাত। সুতরাং তারাদিগের আলোকাবরণে কত পরিমাণ উষ্ণতা আছে অর্থাৎ সেখানে উত্তাপের প্রখরতা কিরূপ মাত্রায় অবস্থিত, তাহা এখনো জ্যোতির্ব্বিদগণ পরিমাণ করিতে পারেন নাই।

তবে তারাদিগের আলোক পরীক্ষা দ্বারা আলোকাবরণ কিরূপ উপাদান-পদার্থে গঠিত জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা কতকটা বলিতে পারেন।

যেমন, (হগিংসের কথানুসারে) সিরিয়াস হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়ম, এবং সম্ভবতঃ লৌহ বাষ্পময়, ক-লাইরা বা বেগা হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়ম, সোডিয়ম এবং লৌহ বাষ্পময়—ইত্যাদি।

তারাদিগের বাষ্পাবরণে বাষ্পসকল যখন জমাট বাঁধে, তখন তাহা আলোকাবরণে পরিণত হয়, আবার আলোকাবরণ যে আলোক নিক্ষেপ করে তাহা বাষ্পাবরণ কর্ত্তৃক শোষিত হয়।

আলোক শোষণক্রিয়া কিরূপ তাহা রঙ্গিণ কাচ দ্বারা সহজে বুঝান যায়। একটা সবুজ গ্লাস সবুজ, কেননা সবুজ বর্ণ ছাড়া অন্য সকল বর্ণের জ্যোতি ইহা নিজের মধ্যে শোষণ করিয়া লয়। ইহা যেন এক রকম চালুনি, সেই চালুনির ভিতর দিয়া সবুজ রং মাত্র বাহিরে আসে আর সকল রং তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, কাজেই আমরা তাহাকে সবুজ দেখি। কেবল গ্লাস বলিয়া নহে, কঠিন, তরল, বাষ্প সকলরূপ পদার্থই আলোক শোষণ করে। তারকাদিগের আলোকাবরণের উত্তাপ-পরিমাণ ভেদেই যে একমাত্র তাহাদিগের বর্ণের তারতম্য ঘটে তাহা নহে, বাষ্পাবরণ কর্ত্তৃক কোন তারকার আলোক কি পরিমাণে শোষিত হয় তাহার উপরও তাহাদের বর্ণ বৈষম্য নির্ভর করে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সূর্য্য অস্তে যাইবার সময় কখনো কখনো রক্ত-লোহিত বর্ণ ধারণ করে —ইহার কারণ পৃথিবীর বাষ্পাবরণ কর্ত্তৃক সূর্য্যের আলোক তখন অধিক পরিমাণে শোষিত হয়। বিকালের পরিবর্ত্তে যদি দ্বিপ্রহরে সূর্য্য রক্তবর্ণ হইত তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে হইত—সূর্য্যের বাষ্পাবরণে তাহা শোষিত হইয়াছে। কেননা নিম্নদিকে পৃথিবীর বায়ুস্তরের চাপ ক্রমশঃই অধিক এবং উপরের দিকে ক্রমশঃই কম, সুতরাং যখন সূর্য্য আমাদের মাথার উপর দিয়া কিরণ দেয় তখন সে কিরণ পৃথিবীর লঘু বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া আসে, সেইজন্যই আমরা এত উত্তাপ অনুভব করি আর সেই লঘু বাষ্পে অধিক কিরণ

শোষিত হয় না। কিন্তু অস্তে যাইবার সময় সূর্য্য দিক্‌মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইলে তখন তাহার কিরণরাশির পৃথিবীর ঘন বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয়, সুতরাং তাহাতে অধিক মাত্রায় সে কিরণ শোষিত হয়। তবে তারকাদিগের বর্ণ ও জ্যোতির পরিবর্ত্তনের কারণ এখনো জ্যোতির্ব্বিদগণ সবিশেষ আর কিছুই জানেন না।

এইখানে একটি কথা, যে সকল পদার্থ তারকাদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান—যেমন হাইড্রোজেন, সোডিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, লৌহ ইত্যাদি—এই সকল পদার্থের সহিত আমরা পৃথিবীর প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাই—সুতরাং কে বলিতে পারে তারকা-জগতেও প্রাণী নাই?

ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫

বৈজ্ঞানিক সংবাদ

বুরবুল ওয়াটার্স (Bourboule Waters) নামে এক প্রকার নূতন ধাতব জল নানা রোগের, বিশেষতঃ, বাত, শ্বাস, মুখের ব্রণ প্রভৃতি চর্ম্মরোগের ঔষধ বলিয়া কথিত হইতেছে। ডাক্তারগণও পরীক্ষা দ্বারা এই ধাতব জল স্বাস্থ্যজনক বিবেচনা করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া জ্বরের পব শরীরে তাহার যে বিষ অবশিষ্ট থাকে, এই জল পানে তাহাও ধ্বংস হয়।

চা পত্রে ট্যানিন্ (Tannin) নামে স্বাস্থ্যভঙ্গকারক একরূপ পদার্থ আছে। সম্প্রতি দার্জ্জিলিংয়ের সানথা (Santha) টি কোম্পানি এক প্রকার চা-সার প্রস্তুত কবিয়াছেন —তাহাতে ট্যানিন নাই। চা পত্রের পরিবর্ত্তে ইহা উষ্ণজল ও দুগ্ধাদির সংমিশ্রণে পান করিলে আর চা-পানজনিত স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা নাই।

ইংলণ্ডে ভিনোলিয়া সোপ (Vinolia Soap) নামে এক প্রকার নূতন সাবান বাহির হইয়াছে। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন অন্য যত প্রকার সাবান আছে—তাহার মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; চর্ম্মের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। এবার বুঝি পিয়ারকে হার মানিতে হয়!

প্রোফেসর ফোর্লানিনি প্লুরিসি রোগ (এক প্রকার ফুসফুস রোগ) আরোগ্য হইবার পর সংহত ঘন বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে বলেন। এই রোগে ফুসফুসে যে জল সঞ্চয় হয়—ইহা আরোগ্য হইলে সেই জল শুকাইবার সঙ্গে ফুঁসফুস সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; উক্তরূপ বায়ু গ্রহণে তাহা আবার বিস্ফারিত হয়। এতদিন এইরূপ চিকিৎসা প্রচলিত না হইবার কারণ, এই উপায় অতি জটিল এবং বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ ছিল, কিন্তু প্রোফেসর ফোর্লানিনির নূতন আবিষ্কৃত উপায়ে এই সকল অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে।

প্রোফেসর ফ্লাওয়ার সম্প্রতি মনুষ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে লণ্ডন ইনষ্টিটিউসনে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

হোমর, হিরোডোটস, অ্যারিষ্টটল, টিসিয়স, প্লিনি প্রভৃতির প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন পিগমি (Pygmy) জাতি অর্থাৎ বালখিল্য (ক্ষুদ্র মনুষ্য)দিগের অস্তিত্বে

পূর্ব্বকালীয়-লোকের সাধারণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এ বিশ্বাসের মধ্যে কতদূর সত্য আছে—তাহা কেবল গত শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে মাত্র অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। মনুষ্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চাধিক্য এবং ক্ষুদ্রতম বানরজাতির আবিষ্ক্রিয়াই এই অনুসন্ধান স্পৃহার মূল।

পারিসের মনুষ্যতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রধান ও বিখ্যাত প্রোফেসর এম্ ডি ক্যাডরফাজ প্রমুখ দল গত শতাব্দী হইতে এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ে যত্নবান হইয়াছেন, এবং পুরাতন লেখকগণ কেবলমাত্র তাঁহাদের কল্পনাশক্তিতে নীত হইয়াই যে মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আসিয়াকে পিগমিদিগের আবাসস্থল করিয়া তোলেন নাই—এতদ্দ্বারা তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন। দক্ষিণ আসিয়ার আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে যে ক্ষুদ্র মনুষ্যগণ বাস করিত—নবম শতাব্দীর আরব যাত্রীদিগের এতৎসম্বন্ধীয় লেখায় তাহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত যাত্রীগণ এই দ্বীপবাসীগণকে অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, বিদেশীয়ের যম স্বরূপ এবং মনুষ্যভক্ষক জাতি বলিয়া ইহারা কথিত হইয়াছে। তাহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত যে আর কোন জাতির আণ্ডামান যাত্রার কথা পাওয়া যায় না—এই বর্ণনাই সম্ভবতঃ তাহার মূল। কিন্তু আণ্ডামান দ্বীপ নির্ব্বাসিত ভারতবাসীর উপনিবেশ হইবার পর ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে, কিন্তু ইহারা যে মনুষ্যভক্ষক, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১২০০০ বার হাজার ভারতবাসী সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। আণ্ডামানবাসীগণ প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করিত,—এবং দূরে দূরে থাকিত ; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সদয় ব্যবহারে ক্রমে তাহারা সাহস প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের আচার ব্যবহার অনেক জানিতে পারা গিয়াছে। ইয়োরোপীয়গণের সম্পর্কে আসিবার আগে তাহারা চাষ করিতে জানিত না—জন্তু প্রতিপালনও করিত না। কোন ধাতুদ্রব্য তাহাদের ছিল না। বংশপাত্রে তাহারা জলপান করিত, হস্তনির্ম্মিত যেরূপ মৃত্তিকাপাত্র তাহারা ব্যবহার করিত, তাহা ফ্লাওয়ার দেখাইলেন। উত্তম চুপড়ি এবং মৎস্য জাল তাহারা প্রস্তুত করিত। তাহারা উত্তম ডুবারি ও সন্তরণকারী এবং ডোঙ্গা নৌকার নিপুণ মাঝি। ধনুর্ব্বাণই যদিও তাহাদের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু বর্ষা, হার্পুণও তাহারা ব্যবহার করিত। তাহারা কাঁচা মাংস খাইত না ; অগ্নিতে রন্ধন করিত, কিন্তু অগ্নির সাহায্যেই তাহারা অগ্নি করিত, প্রস্তরাদি অন্য পদার্থ হইতে অগ্নি করিতে তাহারা জানিত না। মৎস্য, মাংস, ফল, মূল, মধু এই সকল দ্রব্য তাহাদের আহার্য্য এবং জল তাহাদের একমাত্র পানীয় ছিল, ক্ষুদ্রাকার ইহাদিগের একটি বিশেষত্ব। অনেক আণ্ডামানবাসীর পরিমাপ লইয়া দেখা গিয়াছে—গড়ে ইহাদের পুরুষেরা ৪ ফুট ৯ ইঞ্চ এবং স্ত্রীলোকেরা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চ। ইহাদের বর্ণ ঘনশ্যাম কৃষ্ণবর্ণের কাছাকাছি, চুল সজারুর মত খাড়া এবং কোঁকড়া। দক্ষিণ আসিয়ায় ভারতবর্ষ, সায়াম, কোচিন-চীন এবং অন্যান্য স্থলে যে ক্ষুদ্র জাতিদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়—তাহাদের মধ্যে আণ্ডামানবাসীই একমাত্র অবশিষ্ট। তবে ঐ সকল স্থানের কোথাও কোথাও কখনো কখনো তাহাদের চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই উপনিবেশবাসীদিগের দৌরাত্ম্যে ধ্বংস হইয়াছে, কোন স্থলে উপনিবেশীদিগের সহিত বিবাহে ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িয়াছে। অল্প যাহা অবশিষ্ট আছে—অগম্য পর্ব্বত প্রদেশেই তাহাদের আশ্রয়, সুতরাং তাহাদের দর্শন সহজ ব্যাপার নহে। আণ্ডামানবাসী ব্যতীত আফ্রিকার দক্ষিণে জংলা নামক (Bosjesmen or Bushmen) এক ক্ষুদ্র জাতি পাওয়া গিয়াছিল—তাহাদেরও গড় পরিমাপ

আণ্ডামানবাসীদিগের মত এবং তাহাদের চুলও উহাদিগের ন্যায় খাড়া ও কোঁকড়া। তবে অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাহারা অন্য প্রকারের।

আফ্রিকার বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বস্থিত প্রদেশে আর এক ক্ষুদ্র জাতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহারা বৃহদায়তন কাফ্রিদিগের সহিত একত্রেই বাস করিত। অ্যাণ্ড্রু ব্যাটেল (Andrew Battell) ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার লোয়াংগো তীর (Loango Coast) বর্ণনা বৃত্তান্তে ইহাদের কথা বলিয়াছেন এবং দু স্যাইলু (Du Chaillu), ষ্ট্যানলি প্রভৃতি অন্য ভ্রমণকারীগণ পরে ইঁহার অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আক্কা নামক দলগণ অ্যালবার্ট নিয়াঞ্জা হ্রদের পশ্চিমে বাস করিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সুইনকার্থ কর্ত্তৃক তাহারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং আরো সম্প্রতি এমিন পাসা তাহাদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহারা জ্ঞাত ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে আবার ক্ষুদ্রতম। ইহাদের পূর্ণ বর্দ্ধিত স্ত্রী-পুরুষ চার ফুটের অধিক উচ্চ নহে।

সম্প্রতি হাংগারির বিজ্ঞান অ্যাকাডমিতে মিষ্টার জোজেফ ক্যর‍্যাসি পিতা মাতার বয়সের সহিত সন্তানের দীর্ঘ জীবনের কিরূপ সম্বন্ধ, এই বিষয়ে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি ৩০ হাজার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, ২০ বৎসরের মাতা এবং ২৪ বৎসরের পিতার সন্তানগণ অধিক বয়স্ক পিতামাতার সন্তানগণ অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদিগের শ্বাসরোগ প্রবণতা জন্মে। ২৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক পিতা এবং ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক মাতার সন্তানেরা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ সবল। ক্যর‍্যাসি বলেন, স্ত্রী অপেক্ষা স্বামী অধিক বয়স্ক হওয়াই মঙ্গলজনক, কিন্তু ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকগণ আপনাদিগের অপেক্ষা কিছু অল্প বয়সের স্বামী গ্রহণ করিলে সন্তান সুস্থতর হয়। ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের ২০ হইতে ৩০ বৎসরের যুবতী নির্ব্বাচন করা উচিত। যদি মাতা পিতাপেক্ষা পাঁচ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হন, তাহা হইলে সন্তানের স্বাস্থ্যহানি হয়।

ইয়োরোপে একদল লোক বলিতেছেন—অনাবশ্যক প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি না শিখাইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিজ্ঞানকেই শিক্ষার ভিত্তিভূমি করা উচিত। তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ফায়হিংগর এই বলেন যে, বিকাশ পদ্ধতির (Laws of Development) একটি প্রধান নিয়ম। ব্যক্তিগত বিকাশ ও জাতিগত বিকাশের পরস্পর সাপেক্ষতা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অতীত ইতিহাসের পথ দিয়া পরিস্ফুট হইতে হইবে, পূর্ব্বপুরুষদিগের উন্নতির সমস্ত বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আপনাকে লইয়া যাইতে হইবে। যেমন প্রত্যেক মনুষ্য ভ্রূণাবস্থায় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীমূর্ত্তি পরম্পরাক্রমে উচ্চ মনুষ্যাকারে পরিণত হয়, —ডারউইন-আবিষ্কৃত অভিব্যক্তিবাদ মনোরাজ্যে প্রয়োগ করিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রকেই প্রাচীন জাতির পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার সোপান-পর্য্যায় দিয়া উন্নতির পথে উত্থান করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলেন—ইয়োরোপীয়ের জীবনের মধ্যে তিন সভ্যতার স্তর আছে, গ্রীক-রোমীয়, খৃষ্টীয়, আধুনিক অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক। ইহার মধ্যে কোন একটিকে বাদ দিলে কোন ইয়োরোপীয়ের চরম মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৬

প্রকৃতি *

বঙ্কিমবাবু তাঁহার কোন এক লেখায়—যতদূর মনে পড়িতেছে কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবনীর ভূমিকায় বলিয়াছেন—একদিন তাঁহারা গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন, একজন মাঝি জলের উপর দিয়া গাহিয়া যাইতেছিল—

সাধ আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে।

মাতৃভাষার এই সরল সহজ গানটি শুনিয়া তাঁহার হৃদয় যেরূপ ভক্তিরসে উথলিয়া উঠিয়াছিল—এমন ইংরাজি কিম্বা আধুনিক বাঙ্গলার উচ্চতর মহত্ত্বের ভাবযুক্ত কবিতাতে হয় নাই।

প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ঠিক এইরূপ।—প্রকৃতিতে যে সকল প্রাকৃতিক জ্ঞানের কথা আছে তাহা কিছুই নূতন কথা নহে; পাশ্চাত্যজ্ঞানের সারসঙ্কলনমাত্র। এ সকল তত্ত্বের সহিত অল্পবিস্তর পরিমাণে ইতিপূর্ব্বেই যে আমাদের আলাপ পরিচয় না হইয়াছে এমন বলিতে পারি না। অথচ সেইসব কথাই এই বইখানিতে পড়িতে যতখানি আনন্দ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিলাম, এমন পূর্ব্বে করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কারণ আর কিছু নহে—কেবল ভাষার গুণে। বিদেশীয় ভাষায় এ সকল জ্ঞান আয়ত্ত করিতে যে শ্রম যে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, ইহাতে সে ক্লেশ নাই সে শ্রম নাই; আছে শুধু জ্ঞানলাভের আনন্দ—আর কাব্যপাঠের মুগ্ধতা। বস্তুতঃই প্রকৃতি পড়িতে এতই ভাল লাগে যে ভুলিয়া যাইতে হয় ইহা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ—মনে হয় যেন কাব্যপাঠ করিতেছি। লেখক ভূমিকায় হতাশভাবে বলিয়াছেন, "বাঙ্গলাভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্য সাধনের চেষ্টা; সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না।" কিন্তু আমরা অসঙ্কোচে বলিতেছি—ইহা যদি অসাধ্য সাধন হয় ত তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। জগৎ-অভিব্যক্তি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, আলোক তাড়িৎ তরঙ্গ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিগূঢ় কঠোর তত্ত্বসকল বাঙ্গলাভাষায় যে এমন সংক্ষেপে অথচ এত জলের মত পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করা যায়, এ বইখানি না পড়িলে তাহা ধারণা করা যায় না। লেখকের ভাষার সরলতা ও প্রকাশ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি একস্থানে আক্ষেপ করিয়াছেন, "দীনা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য; অন্যদেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে —এদেশে তাহা বর্ণনারও উপায় নাই।" একথা অস্বীকার করিবার নহে—কিন্তু প্রকৃতির ভাষা দেখিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আশা হয় যে, লেখকের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি এইরূপ বিজ্ঞান প্রচার উদ্যমে জীবন উৎসর্গ করেন—তাহা হইলে তাঁহাদের যত্নে বঙ্গভাষার এ কলঙ্ক একদিন মোচন হইবে, বিজ্ঞানের কোন কথা কহিতেই তখন আর শব্দের অভাব হইবে না।—নিউটনের বশীভূতা হইয়া প্রকৃতি যেমন তাঁহার নিকট আপনার যত্নলুক্কায়িত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন,—তেমনি বঙ্গভাষাও এইরূপ প্রতিভার নিকট আপন

---

* প্রকৃতি। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত।

রত্নভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন। হেলম হোলমজের 'গণিত মূলক বিজ্ঞান'; 'কেলবিনের Vortex theory', যাহা এমন বঙ্গভাষায় বর্ণনা একরূপ অসাধ্যসাধন—তখন তাহাই সহজ সিদ্ধির বিষয় হইবে। আমাদের দেশে, বিজ্ঞানের নবচর্চ্চার যুগে এইরূপ বৈজ্ঞানিক লেখকের উদয় অত্যাবশ্যক; নিতান্ত সুখের বিষয়—সেই আবশ্যক সিদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ, ভাল অনুবাদ করা কম ক্ষমতার কাজ নহে। যশে ওরিজিনাল লেখকের সিংহাসন অনুবাদকের প্রাপ্য না হইলেও পরবর্ত্তী আসন তাঁহার, এবং উপকার কল্পে উভয়েই সমকক্ষ; বরঞ্চ স্থানবিশেষে অনুবাদকের দ্বারা অধিক উপকার সাধিত হয়; —প্রভেদ এই, একজন নিজের নিকট প্রকাশিত সত্যকে কলেবর দান করিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন—অন্যজন পরের ভাব আপনার রূপে আয়ত্ত করিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন। উভয়েরি প্রতিভার আবশ্যক, কাব্য অনুবাদ করিতেও কবির দৃষ্টি চাই; বিজ্ঞান অনুবাদ করিতেও বৈজ্ঞানিক হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে সাহিত্যক্ষেত্র কখনই মরুপরিণত হয় নাই, অল্প বিস্তর পরিমাণে কালে কালে তাহার কর্ষণ সম্পাদিত হইয়া আসিয়াছে—তাই আধুনিক যত্নকর্ষণে এত অল্পদিনে সাহিত্যের এমন মধুর শ্রী। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা এ কথাও বলিতে পারি না। প্রকৃত প্রস্তাবে এতকাল ধরিয়া আমরা বিজ্ঞানবর্জ্জিত, যে ভাস্করাচার্য্য আর্য্যভট্ট প্রভৃতি মনস্বী বৈজ্ঞানিকগণকে স্বজাতি বলিয়া গৌরব করিলেও সে মানুষে ও এ মানুষে আমরা ঠিক এক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের শুধু ধ্যানধারণার বস্তু—স্বপ্নের কল্পনার দেবতা। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বিজ্ঞানে অনার্য্য বর্ব্বরই আমাদের প্রকৃত অভিধান। বহুযুগের বিজ্ঞানবর্ব্বর আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া অতি অল্পদিনমাত্র আবার বিজ্ঞান অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছি—কিন্তু এ অনুশীলনও অতি অল্পক্ষেত্রে আবদ্ধ। ইহা সত্ত্বেও এত অল্পদিনের শিক্ষাতেই আমরা যে এখনি জগদীশ বাবুর মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাই, ইহা আমাদের কম গৌরবের বিষয় নহে; এবং রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর মত কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিককে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করিতে দেখিতে পাই—ইহাও আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে। জগদীশ বাবু আমাদের গৌরবভাজন —কেননা তাঁহার প্রতিভা দূরবিস্তৃত—তাঁহার কার্য্য জগৎ সম্পর্কে, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর নিকট বঙ্গবাসী ঋণী অধিক, কেননা তাঁহার কৃত উপকার কেবল আমাদিগতেই আবদ্ধ। পাশ্চাত্য জগৎ বহুকষ্টে এ কয় শতাব্দী ধরিয়া যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছে —তাহা যতক্ষণ সাধারণভাবে আমাদের দেশের আয়ত্তীভূত না হইবে, ততক্ষণ তাহারি ধারাবাহিক উন্নতি স্রোতের নব নব সূক্ষ্মলহরী দেখিয়া চিনিবার দিব্য দৃষ্টি সে পাইবে কোথা হইতে? সুতরাং বিজ্ঞানচর্চ্চার এই প্রথম যুগে যাঁহারা দেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা করেন—এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন, তাঁহারা আমাদের সমধিক কৃতজ্ঞতাভাজন; এবং এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশই প্রকৃতির প্রকৃত সমালোচনা। প্রবন্ধগুলির বিশেষ করিয়া সমালোচনা করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র,—কেননা আমরা বৈজ্ঞানিক নহি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নির্ব্বাচন কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে, বঙ্গবাসীর প্রকৃতিতে বিজ্ঞানের প্রতি প্রীতিকারিতা বৃদ্ধির পক্ষে ইহা যথেষ্ট অনুকূল,—জ্ঞানলাভ ছাড়া ইহাতে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কল্পনারও যথেষ্ট অবসর

আছে। প্রলয়, মৃত্যু, ক্লীকোর্টের কীট, জ্ঞানের সীমানা, প্রকৃতির মূর্ত্তি—প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে মস্তিষ্কের স্থূলাবরণ পর্য্যন্ত সহসা যেন অনুভূতিময় হইয়া পড়ে, তাহাতে জ্ঞানের তরঙ্গ কল্পনাবর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন দিব্য চিন্তা, দিব্য দর্শন সৃজিত করে—সে অপূর্ব্বভাব আশা বিস্ময় জ্ঞান কল্পনার সমবায় চিত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাইসম্যানের থিওরি সম্বন্ধে আমাদের মনের চিত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

বাইসম্যান বলেন—"জীবশরীরের স্থূলত দুইটা ভাগ। উহার অস্তিত্বের অন্য এইরূপ নির্দ্দেশ প্রত্যেক জীবের ও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে খাটে। একটা ভাগকে বীজভাগ বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয় ভাগকে আবরণ ভাগ বলা যাইতে পারে। বীজভাগটাই প্রকৃত প্রাণী ;—উহাই প্রকৃত জীব। প্রকৃতির নিকট উহারই মূল্য। আবরণ ভাগটার অস্তিত্ব কেবল বীজভাগকে রক্ষা করিবার জন্য, উহাকে আবরণ করিয়া ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। উহার অস্তিত্বের অন্য অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। নাক মুখ চোক কান, স্নায়ু অস্থি পেশী ত্বক শিরাধমনী, —প্রভৃতি লইয়া সাধারণত যেটা জীবের শরীর বা দেহ বলিয়া পরিচিত, সেটা প্রায় সমগ্রই এই আবরণ কার্য্যের জন্য, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বীজভাগকে প্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান। এই আবরণ ভাগ আবার বীজভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। বীজ আপনার আবরণ আপনি প্রস্তুত করিয়া লয়। বীজ আপনাকে বিভক্ত করে ; এক ভাগ বীজই থাকে ; অপর ভাগ সেই বীজকে বাহ্য প্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গঠিত ও নির্ম্মিত হয়। আবরণ-শরীর বীজ-শরীর হইতে উদ্ভূত হয় ; কাজেই বীজের ধর্ম্ম আবরণে বর্ত্তমান। যে যেমন বীজ, তদুৎপন্ন আবরণ তেমনি। গাছের বীজ হইতে গাছের দেহ —মানুষের বীজ হইতে মানুষের দেহ জন্মে। বীজকে রক্ষা করাই আবরণের কাজ। বহিঃস্থ প্রকৃতির সহিত আবরণের কারবার। বহিঃস্থ প্রকৃতির যাহা কিছু অত্যাচার উপদ্রব, তাহা আবরণের উপর দিয়াই যায়। আবরণ বাহ্য প্রকৃতির সহিত কারবারের ফলে পীড়িত, দলিত, বিকৃত, পরিবর্ত্তিত হয়। বাহ্য প্রকৃতি আবরণকে ভেদ করিয়া বীজের উপর আক্রমণ বা তাহার বিকার সম্পাদন সহজে করিতে পারে না। বীজ আবরণকে সৃষ্টি করে, —কিন্তু আবরণ হইতে বীজ জন্মে না। বীজ শষ্য, আবরণ তাহার খোলা মাত্র। আবরণের বিকারে বীজের বিকার হয় না। আবরণের উন্নতিতে বীজের উন্নতি হয় না। জীবনের প্রথম বয়সে বীজ আবরণের সৃষ্টি করে—আবরণ উত্তরকালে বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজে পুষ্ট বিকৃত বা সংস্কৃত হইয়া বীজকে রক্ষা করে। জীবনে পূর্ণ বয়স উপস্থিত হইলে, বীজ জীবনের প্রধান কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। আপনি আপনাকে ভাগ করে, আপনার খানিকটা ভাগ আপন হইতে বিচ্যুত করে, এই ভাগটা পৃথক হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র জীবন লাভ করে ; আপনার স্বভাবানুযায়ী নূতন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া আপনার জীবলীলা আরম্ভ করে। এই ব্যাপারের নাম সন্তানোৎপাদন।

"বীজ ভাগ ক ও আবরণ ভাগ খ। ক ও খ উভয় লইয়া সম্পূর্ণ জীব শরীর। ক হইতে খয়ের উৎপত্তি। খয়ের উৎপত্তি ককে রক্ষা করিবার জন্য ; বাহিরে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ককে বিনষ্ট করিতে উদ্যত আছে, তাহাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য। খ বাহির হইতে আহার সংগ্রহ করে, আত্ম পুষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে ককে নিভৃতে সুরক্ষিত ও অবিকৃত রাখে। কয়ে যে সকল ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহাই জীবের সহজ-

ধর্ম্ম ; খ বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবে যে সকল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে তাহাই জীবের অর্জ্জিত ধর্ম্ম। খ সহজে বিকৃত হয়, কিন্তু ক সহজে বিকৃত হয় না। খ ক্রমশ পুষ্টি ও বৃদ্ধিলাভ করিয়া আপন সামর্থ্যের সীমায় বা পরিণতিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময় জীবের পূর্ণ বয়স বা যৌবনকাল। বাহ্য প্রকৃতির সহিত খয়ের যে সংগ্রাম তাহা চিরকাল চলিতে পায় না। যতদিন খয়ের জয় ততদিন উহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি। সে সময় আইসে যখন এই বৃদ্ধি ও পুষ্টি স্থগিত হয়। তখন বাহ্য প্রকৃতি খয়ের উপর জয়লাভ করিতে আরম্ভ করে। আবরণ তখন ক্রমে জীর্ণ হইতে থাকে। খয়ের পুষ্টির ও বৃদ্ধির অবস্থা জীবের বাল্য। খয়ের পরিণত অবস্থা জীবের বার্দ্ধক্য। যৌবনে বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে ক আপন বার্দ্ধক্যোন্মুখ আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চায়। তখন আর প্রাচীন বার্দ্ধক্যোন্মুখ জীর্ণ আবরণের উপর বিশ্বাস রাখিয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীন আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসে ; অথবা আপনারি খানিকটা অংশ বাহির করিয়া দেয়। ক প্রাচীন খয়ের আবরণ হইতে বাহিরে আসিয়া নূতন ঘর পাতিয়া নূতন সংসারযাত্রা নির্ম্মাণ করে। ক, খ হইতে এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরে আসে ও নূতন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। সেই নূতন আবরণের নাম যেন গ। পূর্ব্বতন পুরুষে খ যেমন ক হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী পুরুষে গ তেমনি সেই ক হইতেই নির্ম্মিত হয়। ক ও খ একত্রযোগে পিতা বা মাতা। জীবতত্ত্বে পিতা ও মাতা উভয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই ; উভয়েরই সংসারে স্থান একরূপ, উভয়েরই জীবনের উদ্দেশ্য একরূপ। ক ও গ একত্রযোগে পুত্র বা কন্যা। ক ও খ উভয়ের সমষ্টি পূর্ব্বপুরুষ—ক ও গ উভয়ের সমষ্টি পরপুরুষ। সহজ ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বপুরুষে বর্ত্তমান ছিল, তাহা পরপুরুষেও দেখা দেয়। কেননা সহজ ধর্ম্ম কয়ের ধর্ম্ম ; এবং পূর্ব্বপুরুষের ক অবিকৃত অবস্থায় পরপুরুষে যায়। পূর্ব্বে ক ছিল এক আবরণের ভিতর, এখন সেই ক আছে অন্য আবরণের ভিতর। পিতা ও পুত্রে এই মাত্র তফাৎ। পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ধর্ম্ম পরপুরুষে যায় না। কেননা গয়ের সহিত খয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। বাহ্যপ্রকৃতি খয়ে যে পরিবর্ত্তন সাধিত করে তাহা কয়ে সংক্রামিত হয় না, কাজেই তাহা গয়ে যায় না। পরপুরুষের ক এবং গ পূর্ব্বপুরুষের সহজ ধর্ম্ম পায় মাত্র। অর্জ্জিত ধর্ম্ম পায় না। তেমনি আবার গ যে সকল নূতন ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তাহা তৎপরবর্ত্তী পুরুষে যায় না ; আপন জীবনেই তাহার সমাপ্তি হয়।

"বীজ ক প্রাচীন জীর্ণ আবরণ খ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নূতন আবরণ গকে নির্ম্মাণ করে, ক মুক্তিলাভ করিয়া নূতন স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিলে খয়ের কাজ ফুরাইল। গয়ের কাজ যখন আরম্ভ হইল, খয়ের কাজ তখন শেষ হইল। প্রকৃতির আর তখন খয়ের উপর অণুমাত্র মমতা নাই। পুত্র জন্মিলে পিতা বৃদ্ধ। পিতার জীবনের উদ্দেশ্য এখন সিদ্ধ হইয়াছে। এখন তাহার অস্তিত্ব ধরার ভারস্বরূপ। তাহার অস্তিত্ব এখন জীবন সংগ্রামের তীব্রতা বাড়ায় মাত্র। শিশু স্ফূর্ত্তি ও আগ্রহ সহকারে নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া নূতন উৎসাহে জীবনসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধের জীবন এখন উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক। প্রকৃতি তাহাকে এক পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন। সে এখন সেই পন্থায় চলুক। সেখানে সে শান্তি লাভ করিবে। সেই পন্থার নাম মৃত্যুর পন্থা। বৃদ্ধের মরণই মঙ্গল। বৃদ্ধ যেন জীবিত থাকিয়া ভবের বোঝা ভারি না করে।"

দেখা গেল জীবে বীজভাগই যথার্থ প্রাণী, এবং এই প্রাণীভাগ এক আবরণ হইতে অন্য আবরণে স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিলে জীবের কাজ ফুরাইল ; "প্রকৃতির আর তখন তাহার প্রতি অণুমাত্র মায়া মমতা নাই ; পুত্র জন্মিলে পিতা বৃদ্ধ।" মৃত্যুই তখন তাহার একমাত্র পন্থা।

ইহাই যদি,—যদি প্রাণী উৎপাদনেই মাত্র ব্যক্তিগত প্রাণীর উদ্দেশ্য সাধন হয়, এমন কি সে তখন প্রকৃতপক্ষে প্রাণীহীন আবরণসর্ব্বস্ব মাত্র হয়, তাহা হইলে জীবের সন্তানোৎপাদনরূপ উদ্দেশ্য শেষ হইবামাত্র, অন্য কথায় এক আবরণ হইতে ভিন্ন আবরণে পুনর্জন্মগ্রহণ শেষ করিবামাত্র, সেই উদ্দেশ্যহীন প্রাণীহীন আবরণসার জীব প্রকৃতি কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ কেননা ধূলিসাৎ হয়? বৃদ্ধ বৃদ্ধরূপে বাঁচে কেন? কেবল তাহাই নহে—তাহার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই বা কেন, আর বৃদ্ধের প্রতি সংসারেরই বা দয়া মমতা কেন দেখা যায়?

বোঝা গেল সন্তানে আত্মরক্ষার জন্যই পিতা মাতার মনে স্নেহ মমতার উদয়, কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা দয়ামায়ার প্রবৃত্তিও ত জীবের স্বভাবধর্ম্ম ;—যদি বৃদ্ধের জীবনের কোন উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে সন্তানের বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষা করিবার অথবা বৃদ্ধের নিজেরই আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তির অর্থ কি? প্রকৃতিই বা জীবকে বৃদ্ধরূপে ক্রোড়ে আশ্রয়দান কেন করেন? কিন্তু দেখিতে গেলে বাঁচে কে? শৈশব কতটুকু? যৌবন কতটুকু? বার্দ্ধক্যই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু। বার্দ্ধক্যই বাঁচে অধিক। ক্ষুদ্র শৈশব আপন আবরণ পুষ্টি বৃদ্ধি করিতে করিতে অজ্ঞানে যৌবনে আসে, যৌবন আত্ম ভুলিয়া সংসারের কাজ করে, বার্দ্ধক্যই কার্য্যশেষে আপনাকে উপভোগ করে, নিজের অস্তিত্ব-সুখে নিজে ভোর হইয়া থাকে, এইরূপে বার্দ্ধক্যই সর্ব্বাপেক্ষা আত্মভোগী। যাহা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম তাহার বিপরীতে সমাজধর্ম্ম টিঁকিতে পারে না ; যদি বার্দ্ধক্যের জীবন নিরর্থক হইত, তাহা হইলে সমাজে বৃদ্ধহত্যাই পুণ্যরূপে গণ্য হইত, বৃদ্ধও আত্মরক্ষার ইচ্ছা করিত না, কেননা যাহার আত্মা নাই, তাহার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আসিবে কেন? তাহার আত্মা তাহার প্রাণ ত অন্য আবরণে। কিন্তু আসলে বৃদ্ধের জীবনের মায়া কিছুমাত্র কম নহে ; বরঞ্চ বেশী। কি শৈশব কি যৌবন কি বার্দ্ধক্য, সর্ব্ব অবস্থাতেই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জীবের প্রধানতম প্রবৃত্তি। এমন কি পিতা মাতার সন্তানস্নেহ হইতেও ইহা প্রবল। জীবন সংগ্রামে স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব বাধিলে সন্তানকেও পিতামাতা বলিদান দিয়া থাকেন। জীবের জীবনের কেবল সন্তানগত উদ্দেশ্য সন্তানগত প্রাণ হইলে এরূপ হইত কি? প্রাকৃতিক নিয়মে বর্জ্জিত বিধি নাই। একটি বিপরীত দৃষ্টান্তে বহু-যত্ন-গঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও অর্থহীন হইয়া পড়ে।

আর এক কথা, এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইলে—যৌবনরক্ষা—করতলস্থ আমলকীবৎ মনুষ্যের ইচ্ছাধীন হইত না কি? কিন্তু—

"যত্নে তৃণকাষ্ঠখান—রহে যুগ পরিমাণ
বহু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।"

কোন যতি ব্রহ্মচারী—কোন চিরকুমারী বার্দ্ধক্য হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন কি?

বাইসমান এ সকল সমস্যার পূরণ কিরূপে করিয়াছেন—জানিতে ইচ্ছা হয়। অথবা

ইহা এমনি অবৈজ্ঞানিক মনের প্রশ্ন যে, এ সম্বন্ধে কোন কথা বলাই তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই?

হিন্দু দার্শনিকেরা পিতা, পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াও জীবের জীবন রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হইল না বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদিগকে পরজন্ম পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ যুক্তির বিষয় নহে, তাহা অগ্রাহ্য। তখন ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রত্যক্ষ বিজ্ঞানও জ্ঞানগম্য বলিয়া ধারণা ছিল,—অন্তরিন্দ্রিয়ের x rays আবিষ্কার কল্লেই সেই জন্য তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ জীবনপাত করিতেন।—এখন সেকাল নাই, এখন x-raysও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া চাই; অন্তরিন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিজ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের অধীনে আনা চাই; তবেই তাহা জ্ঞানের বিষয়, বিশ্বাসের বিষয় হইবে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সেই সূক্ষ্ম শৃঙ্খল প্রকৃতি কাহার নয়নে খুলিবেন?

লেখক তাঁহার প্রাচীন জ্যোতিষে বলিতেছেন—"পূর্ব্বে এদেশে যে প্রণালীতে গ্রহগণের অবস্থিতি গণিত হইত, এবং এত জটিলতা সত্ত্বেও যেরূপ সূক্ষ্মভাবে ফল নিষ্কাষিত হইত তাহাতে বিলক্ষণ বাহাদুরি ও ওস্তাদি আছে। সেই বাহাদুরি ও ওস্তাদি দেখিলে একদিকে বাহবা না দিয়া থাকা যায় না, ও অপরদিকে যখন দেখা যায় তাঁহারা অসীম পরিশ্রমে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া পাহাড় কাটিয়া সহস্র পদস্খলন এড়াইয়া বিপুলবিক্রমে দুর্গম শৈলশিখরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কেবল আর একটা লাফ দিতে পারিলেই শৈলশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিরেখাবর্ত্তী ও আলোকিত দেখিতে সমর্থ হইতেন, তখন আর পরিতাপের ইয়ত্তা থাকে না।"

এখানেও সেই একটি লাফের মাত্র যেন শুধু বাকী। বিজ্ঞান জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছে, তাহার আকর্ষণ বিকর্ষণ গতিবিধি কূটপ্রণালী কত না আবিষ্কার করিতেছে, অথচ এত জ্ঞানের উন্নতিতে আসিয়া স্তম্ভিতভাবে অজ্ঞানের মত কহিতেছে—"মন কি তাহাও জানি না, জড় কি তাহাও জানি না। একই পদার্থের দুই ভাব—একদিকে জড়ত্ব, একদিকে চৈতন্য। সঙ্কেত লইয়া কারবার। টেলিগ্রাফের কেরাণী যেমন সঙ্কেত লইয়া কারবার করে, বিদেশের বন্ধুর মনের কথা টানিয়া আনে, চৈতন্য তেমনি কতকগুলা সঙ্কেত লইয়া কারবার চালাইতেছে। জড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই কল্পনা জীবনরক্ষার একটা উপায় ও কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন—যথা নিযুক্তবৎ করিতেছে। জড়জগৎ আছে কি নাই মহা সমস্যা।"

এমন দিন কি আসিবে না যখন এই সমস্যার পূরণ হইবে? কোন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি জড় ও চৈতন্য জগতের অন্তর্বর্ত্তী শৃঙ্খল আবিষ্কার করিয়া ইহাদের যথাযথ স্বরূপ—যথাযথ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন? আশা হয় বিজ্ঞানের সেই নবযুগ আসিবে,—পতঞ্জলি, কপিল, নিউটন, কাণ্ট একই আবরণে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই তত্ত্বকে এক করিয়া দেখাইবেন। বুঝি বা ভারতভূমিই আবার বিজ্ঞানের সেই অপূর্ব্ব আলোকবর্ত্তিকা হস্তে জগৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। জানি না ইহা বাতুলের আশা কিনা—এইমাত্র জানি, বাতুলতা হইলেও ইহা আমার আজিকার বাতুলতা নহে; আমার সত্যযুগের প্রপিতামহ ক স্বকীয়

বাতুল কল্পনা আমাতে বিকশিত তাঁহারই ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ধ্বনিত করিতেছেন।

উপসংহারে একটি কথা এই—বইখানির মধ্যে দুই এক স্থল সাধারণ পাঠকের পক্ষে একটু যেন জটিল বোধ হইল। "জ্ঞানের সীমানা" নামক প্রবন্ধে—"স্ত্রী পুরুষ ভেদ স্বভাবের নিয়ম নহে; স্ত্রী পুরুষ ভেদ সৃষ্টিরক্ষার একমাত্র উপায় নহে। ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী বা ব্যক্তিমাত্রই পুরুষ, অথবা ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী ও পুরুষ; কাহারো স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়ই অবিকশিত; কাহারও বা উভয়ভাবই সমান পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত, কোন পুরুষে স্ত্রীভাব পুরুষত্বে লীন, কোন ব্যক্তিতে পুরুষত্ব স্ত্রীভাবে আচ্ছাদিত।

"মৃত্যু স্বভাবের ধর্ম্ম নহে, জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে, জাতীয় জীবন বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিজীবনের উপার্জ্জিত, ব্যক্তিজীবনে অভিব্যক্ত ধর্ম্মমাত্র।"—এই সকল অংশের আর একটু ব্যাখ্যা করিলে ভাল হইত।

ভারতী, বৈশাখ ১৩০৪

একটি প্রস্তাব

দেশের স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিত না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে যে দেশের উন্নতি হইতে পারে না, ইহা আজকাল অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একটি গাছের একদিকে সূর্য্যকিরণ পড়িলে যেমন গাছটির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি বিকাশ হয় না, তাহার একদিক দুর্ব্বল, একদিক সবল, একভাগ ফলবান, অপর ভাগ নিষ্ফল হইয়া পড়ে, সেইরূপ যে জাতির এক ভাগ শিক্ষিত, অন্য ভাগ অশিক্ষিত, একভাগ মাত্র সুস্থ, অন্য ভাগ রুগ্ন, সে জাতির পূর্ণ শ্রী কোথায়? একথা কে না বলিবেন, কিন্তু আমি ইহা হইতেও অধিক বলিতে চাহি। বাস্তবিক পক্ষে, যেমন দেহের একভাগ রুগ্ন হইলে অন্য ভাগের স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে না—দেহের সহিত সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের এমনি যোগ আছে—যে উহাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যথিত হইলে সমস্ত দেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, সেইরূপ জাতির এক অংশের সহিত অপর অংশের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটিকে অশিক্ষিত রাখিয়া অপরটির শিক্ষা কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিত না হইলে সমাজ যে আধাআধি রকমে ক্ষতি-গ্রস্ত হইল এমন নহে, জাতির সম্যক উন্নতিই স্ত্রীলোকের সুশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিত রাখিয়া পুরুষেরা কখনই সুশিক্ষিত হইতে পারেন না। স্ত্রীলোকদিগকে নীচে রাখিয়া তাঁহাদের উচ্চে থাকিবার আশা করা বৃথা, তাঁহারা স্বর্গের যত উচ্চ-ধাপেই থাকুন না কেন, তাঁহাদের স্বর্গ হইতে রসাতলে তাহা হইলে নামিতেই হইবে।

বাহিরের শিক্ষাই কি পুরুষদের একমাত্র শিক্ষা? ঘরের শিক্ষা কি তাঁহাদের জীবনের উপর কোনই কার্য্য করে না?

মাতার দুগ্ধের সহিত, ভগিনীদের খেলাধূলার সহিত, আত্মীয় সম্পর্কীয় মহিলাদের কথাবার্ত্তার সহিত, স্ত্রীর গল্পের সহিত কি পুরুষদের শিক্ষা জড়িত নহে? কিন্তু যেখানে এই দুইরূপ শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেখানে শিক্ষার কি পরিণাম? যেখানে ঘরে মা শেখান একরূপ, বাহিরে মাষ্টার শেখান অন্যরূপ, হৃদয় একরকম বুঝিয়াছে, স্ত্রী-বোনরা আর একরকম বুঝাইতে চাহেন, যেখানে বাহিরের শিক্ষার সহিত, স্নেহ মমতার শিক্ষার আদপে মিল নাই, সেখানে কি শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে? যদি এই দুই শিক্ষায় সাম্য থাকে তবেই সে শিক্ষা যথার্থ কার্য্যকরী হইতে পারে, নহিলে পুরুষেরা কি শিখিতেছেন, আর কি না শিখিতেছেন, তাহা ত বুঝিয়া উঠা যায় না, তাই বলিতেছি ঘরের শিক্ষা প্রকৃত যতদিন না হইতেছে ততদিন পুরুষদেরও প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে না। একজন অসংখ্য উপাধিধারী হইলেও তাঁহার শিক্ষার অভাব থাকিয়া যাইতেছে। এখনকার এই কেন্দ্রহীন, টলমলে; বিকল শিক্ষা, শিক্ষার দিকে বেশী ঝুঁকিতেছে কি অশিক্ষার দিকে বেশী ঝুঁকিতেছে, তাহা ঠিক করা বড়ই কঠিন। এখন সমাজের অন্য সকলবিষয়ের ন্যায় এ

শিক্ষাটাও যেন খেচুড়ি পাকাইতেছে, যতদিন মা সন্তানদিগকে শিক্ষা না দিতে পারেন, স্ত্রী সঙ্গিনীর উপযুক্ত না হন, ততদিন এ শিক্ষার ডালে চালে আর মিশিবার আশা দেখিতেছি না। সেরূপ শিক্ষার মত শিক্ষা পাইলে কি আর সেদিন সামান্য একটু সুবিধার জন্য কলেজের ছাত্রগণ স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা কহিয়া দেশের মাথা হেঁট করিতে পারে —না আত্মসম্মানের মাথা খাইয়া দেশের মান্যগণ্য লোকগণ শ্বেতহস্তের লগুড় খাইয়া ম্লান শুষ্কমুখে গৃহে ফিরিয়া আসেন?

যদি আত্মসম্মানের মর্য্যাদা তাঁহারা বুঝিতেন, ইহা রক্ষার জন্য যত কিছু কষ্ট, অসুবিধা, ত্যাগস্বীকার সামান্য বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা পাইতেন—তাহা হইলে কি আর এরূপ কষ্টকর, হাস্যকর অপমানজনক ব্যাপার ঘটিতে পারিত? যদি আত্মসম্মান হারাইয়া গৃহে আসিলে মা বলিতেন, "এমন পুত্র আমার সন্তান নহে, দেশের কলঙ্ক," স্ত্রী বলিতেন, "স্বামী, তোমার এ নিন্দা শুনিবার আগে আমি মরিলাম না কেন"—তাহা হইলে কি আর দেশের এ ভাব থাকে? কিন্তু কুন্তীর মত মাতারই ভীমার্জ্জুনের মত সন্তান হইতে পারে, আর বীরাঙ্গনা রাজপুত-ললনারই যশোবন্তের ন্যায় বীর স্বামী শোভা পায়—যিনি পরাজিত স্বামীকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বলিতে পারেন—"আমার স্বামী নাই, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, আমি অনুমৃতা হইব—আমার স্বামী শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন—ইহা নিতান্ত অসম্ভব—"

আর এদেশের মাতাদের গর্ভে ভীমার্জ্জুন হন ত সে ভারতউদ্ধারের বিপিন ও কামিনীকুমার। সে ভীমার্জ্জুন অন্ধকার রাত্রে একাকী—"দ্রৌপদী পরাক্রমে" ("না সম্ভবে বাঙ্গালীর ভীম পরাক্রম") "বাম-জুতাতলে ক্ষিতিতল সংঘর্ষণ" করিয়া, "বিষম বাহু দুলাইয়া", "দন্ত কিটিমিটি করিয়া" "সঘনে ইংরাজ বঁটাইয়া" ভারত উদ্ধার করিতে পারেন বটে—কিন্তু বাতাসের শব্দে ভয়ে পলাইয়া যান। ইহা না করিয়াই বা পুরুষেরা কি করেন? এমন রুগ্ন দুর্ব্বল জাতির নিকট ইহা হইতে অধিক সাহস কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

যেখানে আপনার বলের উপর বিশ্বাস নাই, বরং বিপরীত বিশ্বাস, সেখানে কাজেই নীতির আদর্শ স্বরূপ হইয়া, এক গালে চড় মারিলে আর একটি গাল পাতিয়া দিতে হয়, তবে দুঃখ এই, সে সততার মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারে না, বীর সবল পুরুষের সেরূপ ব্যবহার দুর্ব্বলের হৃদয় স্পর্শ করে, কিন্তু সবলের প্রতি দুর্ব্বলের ওরূপ নিষ্ঠতাচরণ হাস্যজনক হইয়া দাঁড়ায়।

একমাত্র শরীরের বলের অভাবেই যে এরূপ হইয়া থাকে তাহাও নহে, মনের বল থাকিলে ভাঙ্গা শরীরও [সতেজ] হইয়া উঠে, সাহসী তেজস্বী দুর্ব্বল-কায়ের নিকট একজন ভীরু ভীম-মাংসপেশী পালোয়ানেরও অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। শরীরের বল থাকিলে স্থল বিশেষে মনের বল বৃদ্ধি করে সন্দেহ নাই, কিন্তু মনের বলের, নৈতিক সাহসের প্রভাব আরো অধিক,—তবে যেখানে এ উভয়েই পূর্ণ বিকাশ, সেখানে মণিকাঞ্চন-যোগ। বাঙ্গালী জাতির এই দুইরকম বলেরই অভাব। বাল্যকাল হইতে এ জাতির মনের স্বাস্থ্য ও শরীরের স্বাস্থ্যকে রীতিমত উপায়ে এমন পিশিয়া ফেলা হয় যে পরে যত্ন করিলেও সেই ভাঙ্গা শরীর ও নিস্তেজ মনকে আবার গড়িয়া তোলা একরূপ অসাধ্য। বঙ্গদেশের ভদ্র

পরিবারের মাতারা এ বিষয়ে একরকম উল্টাই বুঝিয়া থাকেন। ব্যায়াম প্রভৃতি কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমের কাজে, কিম্বা এমন কোনরূপ সাহসের কাজ যাহাতে একটুও বিপদের সম্ভাবনা—তাহাতেই ছেলেবেলা হইতে তাঁহারা সন্তানদিগকে নিরুৎসাহ করিয়া থাকেন।

ছেলেরা ছুটাছুটি করিলে—কি গাছে চড়িতে গেলে, কি কোনরকম একটা ব্যায়ামের মত খেলা করিতে গেলেই সেটা দুরন্তপনা ;—কোন ছেলে কুস্তি করিতে যদি গেল—অমনি মেয়েরা বলিয়া উঠিলেন—"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে অধঃপাতে গেলি—আরে লেখাপড়া কর, শেষ কালে কি দরোয়ানগিরি করে খাবি নাকি।" মারা চাহেন শিষ্ট শান্ত হইয়া, ছেলেগুলি সারাদিন বই হাতে করিয়া ঘরে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে, ছেলেদের লেখাপড়া করিতে হইবে এটা তাঁরা বেশ বুঝিয়াছেন—সেইজন্য আর কিছু না হৌক —বাঙ্গালা দেশে ছেলেদের লেখাপড়াটা হইতেছে, কিন্তু যে কাজে কলমের সঙ্গে যোগ নাই, তাহাই যেন অপমানের কাজ, ছোটলোকের কাজ। এরূপ শিক্ষায় ছেলেদের মান-অপমানের জ্ঞানটা কিরূপ টনটনে হইয়া উঠে—তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিই। একজন যুবা গল্প করিতেছিলেন—একদিন ট্র্যামগাড়ীতে যাইতে যাইতে ট্র্যামের ঘোঁড়াটা দুষ্টমি করিয়া ট্র্যামের লাইন হইতে গাড়ীখানা সরাইয়া ফেলিল—চালক অনেক কষ্টে লাইনের উপর গাড়ী আনিতে পারিতেছে না দেখিয়া যুবক নামিয়া গাড়ী ঠেলিতে গেলেন—ভাবিলেন দেখাদেখি আরো দুই একজন যাত্রী নামিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিবে। কিন্তু কেহই আসিল না, তিনি অশ্ব-চালকের সঙ্গে বহুকষ্টে গাড়ীখানি লাইনের উপর তুলিয়া যখন উপরে উঠিলেন তখন আর সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল —সে হাসির অর্থ এই, "এত নীচ কাজে তোমার প্রবৃত্তি হইল!—"

আর এরূপ স্থলে ইয়োরপের একজন ডিউকও অপমান জ্ঞান করিতেন না, বরং অমন অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই তাঁহার লজ্জা হইত।

কেবল শরীরের বলিয়া নহে, ছেলেবেলা হইতে বালকদের মনের নিস্তেজতারও বিধিমত প্রণালীতে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হয়। মা যদি জানালা হইতে একজন ইংরাজসৈন্যের কাছ দিয়া ছেলেকে যাইতে দেখিয়াছেন—অমনি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া তবে নিশ্চিন্ত। বাহিরে কোন গোলযোগ হইলে যুবা পুত্রকে যে মাতা দুর্ব্বলের সাহায্য জন্য পাঠাইবেন তাহা নহে—কোনমতে ছেলে যাহাতে সেখানে না যায় এই তাঁহার চেষ্টা, কি জানি যদি বিপদ ঘটে।

এইরূপ শিক্ষায় যদি বালকদের "দ্রৌপদী পরাক্রম"ও থাকে, সেও জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে, নহিলে ইহাতে ত পিপীলিকা পরাক্রমও থাকিবার কথা নহে। কাজেই যদি একস্থানে একজন ইংরাজ স্বদেশীয়দের প্রতি অত্যাচার করে ত আর দশজন দাঁড়াইয়া একটা তামাসার মত দেখিতে থাকিবে— এমন স্থলে যদিও শরীরের বলের অভাব হয় না, কেবল সাহসের অভাব ;—নানারকমে মন এমন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে একজনের বিরুদ্ধে দশজন অগ্রসর হইতেও যেন অপারক। ইহাতে হয় এই স্বাভাবিক প্রতিশোধ স্পৃহাটা থাকিয়া যায়, আর নিতান্ত অনুপযুক্ত স্থানে গিয়া তাহার তালটা পড়ে। খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম, ইলবার্ট বিলের হেঙ্গামার সময় দুর্ব্বল ইংরাজ স্ত্রীলোকদের একাকী পথে হাঁটিবার যো ছিল না, স্কুলের ছোকরাদের যত রোখ ইহাদের উপর হইত।

ইংরাজদের প্রচারিত ঐ সকল কথা যে সমুদয় সত্য তাহা না হইতে পারে, কিন্তু উহাতে যে কিছু সত্য ছিল না এমনও মনে হয় না। ইহা হইতে অশিক্ষা কাপুরুষতা আর কি হইতে পারে? স্ত্রীলোকের কেশস্পর্শ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুর্ব্বলের প্রতি ক্ষুদ্র অত্যাচারও যে-দেশে পাপ বলিয়া গণিত, সেই দেশের আজ এরূপ কাপুরুষতা, এরূপ নৈতিক অবনতি দেখিলে দুঃখের সীমা থাকে না।

মাতার হৃদয়ের শিক্ষা, ভগিনীর মমতার শিক্ষা, পত্নীর প্রেমের শিক্ষায় ছাড়া এ সকল নৈতিক ভাব—আর কিসে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারে? ইঁহারা ছাড়া আর কাহার যত্নে বুদ্ধির সহিত শরীরের বলবৃদ্ধি হইবে, নীতির সহিত ধর্ম্মের বলে হৃদয় বলীয়ান হইবে? কে আর দুর্ব্বলের রক্ষক, অত্যাচারের নিবারক হইতে শিখাইবে? যদি ঘরের শিক্ষায় এসব না হইল ত বাহিরের শিক্ষায় আর কতদূর হইতে পারে? মাতা যদি বোঝেন, পুত্রের লেখাপড়া শিখা যেমন দরকার—ব্যায়াম শিক্ষা তেমনি দরকার, তাহা হইলে প্রতি ঘরে ব্যায়াম শিক্ষা অবশ্যই চলিবে। মাতা যদি বোঝেন—বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি যেমনি আবশ্যক, নীতির বিকাশ তেমনি আবশ্যক, শরীরের বল যেমন আবশ্যক, মনের বল, ধর্ম্মের বল তেমনি আবশ্যক—তাহা হইলেই সন্তানদের যথার্থ শিক্ষা হইবে—তাহা হইলেই বঙ্গবাসীকে একদিন উচ্চজাতি হইতে দেখিবার আশা করা যাইতে পারে।

দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিলে, অন্যায় কার্য্য করিলে যদি আত্মীয় মহিলাদের প্রাণে আঘাত লাগে, যদি মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সহস্র বিপদে পড়িয়াও মাতার প্রসন্নমুখ, স্ত্রী বোনদিগের উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়—তবে কোন পুরুষ কণ্টকবন দিয়াও দ্বিগুণ বল-সহকারে কর্ত্তব্যের পথে চলিতে না পারেন? যদি পুরুষেরা জানেন, মনুষ্যোচিত, পুরুষোচিত কার্য্য করিলে তাঁহারা স্ত্রীলোকের ভালবাসার ও সম্মানের পাত্র হইবেন, এবং কাপুরুষ হইলে তাহাদের কষ্টের কারণ ও ঘৃণার পাত্র হইবেন—তাহা হইলে সাধ্য কি যে তাঁহারা সে ঘৃণা—সে সন্তুষ্টির দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবেন।

কেহ মনে করিবেন না—আমি গর্ব্ব করিতেছি—তাহা নহে—তবে মনুষ্যচরিত্র দেখিয়াই একথা বলিতেছি। পুরুষের সন্তোষ সাধনের দিকে যেমন স্ত্রীলোকের লক্ষ্য, তেমনি স্ত্রীলোকদের নিন্দা প্রশংসার দ্বারা—(জ্ঞাতভাবেই হউক অজ্ঞাতভাবেই হউক) পুরুষদের কার্য্যও পরিমিত হইয়া থাকে। নহিলে আর দুর্ব্বলা রমণীদের অন্য উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকদের অশ্রু-অস্ত্র পুরুষদিগের নিকট শাণিত কৃপাণ হইতেও অধিক ধারাল —এ ভরসাটুকু মনে আছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। তাই বলিতেছি—আমরা যদি সুশিক্ষিত হই, আমরা যদি বুঝিয়া সন্তানদের শরীর মন গঠিত করিতে পারি, ভালমন্দ প্রকৃতরূপে বুঝিয়া তাহাদের কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে—শিক্ষা দিই, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই কাল ফিরিয়া যায়।

এইজন্যই স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, এইজন্যই বাঙ্গালায় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু জমি বাঁধিয়া না লইলে যেমন অট্টালিকা দাঁড়ায় না, তেমনি শিক্ষাকে দাঁড় করাইবার জন্য প্রথমে শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করা চাই —নহিলে কাঁচা জমিতে যত কেন উঁচু করিয়া শিক্ষা নির্ম্মাণ কর না কেন—তখনি হুস করিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যতক্ষণ স্ত্রীপুরুষ উভয়ের

মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ না করিতেছে, ততক্ষণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় হইবে না, আজকাল স্ত্রীশিক্ষার দিকে এত লক্ষ্য পড়িয়াও সে সাধারণতঃ নভেল পড়িতে শেখা মাত্র স্ত্রীশিক্ষার সীমা হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার আর কোন কারণ নাই, কেবল ইঁহাদের মনে শিক্ষার আবশ্যক তেমন দাঁড়াইতেছে না বলিয়া। টাকার জন্যই বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন—পুরুষানুক্রমবাহী এ বিশ্বাস তাঁহাদের মন হইতে দূর হইতেছে না, সেইজন্যই শিক্ষার এত আড়ম্বরেও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি অল্পই হইয়াছে।

যাঁহারা 'শিক্ষিতা' নাম পাইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, কেবল যে অল্প তাহাও নহে, তাঁহারা যেন বাঙ্গালার একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়াছেন। ইঁহাদের শিক্ষা এতদূর ইংরাজি রকমে হইতেছে যে সাধারণ রক্ষণশীল সমাজ—কোনমতেই তাঁহাদের অনুকরণ করিতে প্রস্তুত নহেন, অনেকের আবার ইচ্ছা থাকিলেও—সমাজে থাকিয়া এরূপ স্ত্রীশিক্ষার সুবিধা হইয়া উঠিতেছে না। এরূপ শিক্ষার উপকার অধিক কি অপকার অধিক, দোষ অধিক কি গুণ অধিক, আমি তাহার এখন সমালোচনা করিতেছি না—কিন্তু কার্য্যে সে শিক্ষার ফল অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই বলিতেছি। ইহাতে আর একটি মন্দ ফল এই দেখিতেছি যে স্ত্রীমহলে একটি সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, এইরূপ শিক্ষিত আর অন্তঃপুরবদ্ধা স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটি পর-পর ভাব আসিয়া পড়িতেছে। শিক্ষিত স্ত্রীলোক শুনিলেই কি না জানি একটা অপরূপ জন্তু ভাবিয়া একজন অন্তঃপুর মহিলা তাহার কাছ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবেন—শিক্ষিতারাও এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাদিগকে দীনহীন কৃপানেত্রে দেখিয়া ইহাদের সহিত সমক্ষেত্রে দাঁড়াইতেও কুণ্ঠিত হইবেন। এইরূপে স্ত্রীসমাজের মধ্যেও পুরুষদের সমাজের ন্যায়—যা আগে কখনো ছিল না, এমন একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক পর-পর দলাদলি ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে—ইহাতে সাধারণ স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হওয়া দূরে থাকুক, শিক্ষাটা আদর্শ হওয়া দূরে থাকুক, বরং কেমন একটা গোলমেলে ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে, যেন ভালরকম শিক্ষা পাইলেই মেম সাজিতে হইবে, দেশী ভাব ধুইয়া ফেলিতে হইবে ইত্যাদি।—

এখন সুসঙ্গতরূপে স্ত্রীশিক্ষা সম্পন্ন করিতে হইলে—স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আস্থা জন্মাইয়া ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে। এজন্য অনেকে অনেকরূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আমিও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাই, প্রস্তাবটি আর কিছু নহে—অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত শিক্ষিত মহিলাদের সম্মিলন।

এইরূপ সম্মিলনে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইলে পরস্পরের দোষগুলি ভুলিয়া পরস্পরের নিকট পরস্পরে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারেন। অন্তঃপুরের মহিলাগণ—সমধিক বিদ্যাবতী মহিলাদিগের সহিত সমক্ষেত্রে মিশিলে কথায়বার্ত্তায় দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের কাছে অনেক বিষয় শিখিতে পারিবেন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অনেকটা শক্তি জন্মিবে, অনেক কুসংস্কার দূর হইবে, এবং এইরূপে শিক্ষার দিকে যথার্থ একটা টান হইবে। আর ইহাদের সংশ্রবে আসিয়া শিক্ষিত মহিলাদেরও অনেক ভ্রম ও কুসংস্কার দূর হইবে, যাহা কিছু দেশের তাহাই যে ত্যজ্য নহে, অন্তঃপুরের খাঁটি সরলতা, দেশীয় অনেক রীতি নীতি আচার ব্যবহারের বিশেষ সৌন্দর্য্য তাঁহারা ক্রমে বুঝিতে

পারিবেন—এক কথায়, বিদেশের অনুকরণে দেশের যাহা কিছু ভাল হারাইয়াছেন—আবার তাঁহারা তাহা লাভ করিতে পারিবেন—এইরূপে উভয়তঃ উভয়ের কাছেই শিক্ষালাভ হইবে।

আর একটি কথা, কেবল লেখাপড়া শিখিলেই ত আমাদের চলিবে না, ইহার আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় আমাদের শিখিবার আছে। বর্ত্তমান সমাজের যেরূপ বিপ্লবের অবস্থা, কালের স্রোতে যেরূপ দিকে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে দেশের উপযোগী করিয়া, দেশীয় ভাবের সহিত সাম্য রাখিয়া সমাজের পুরাতন আচার ব্যবহার কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া-পিটিয়া না লইলে চলিতে পারে না। তবে যিনি অন্ধ হইয়া নৌকায় বসিয়া থাকিতে চাহেন, তাঁহারও সেই ভাসিতে হইবে, তবে চোখ খুলিয়া যাইতে পারিলে তিনি যেমন হাল ধরিয়া ইচ্ছামত সুপথে যাইতে পারিতেন, তাহাই পারিবেন না। আজকাল স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী অনেকে মহিলাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাইতে চান, অনেকে বা ইচ্ছা না থাকিলেও দায়ে পড়িয়া স্ত্রীকে বাহিরে আনেন—অথচ ইহার আগে যে সোপান দিয়া উঠিতে হইবে—এজন্য স্ত্রীদের যেরূপ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক তাহা হয়ত অনেক স্থলে হইয়া উঠে না। ইহাতে দাঁড়ায় এই, সমাজে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়—এবং সেই দৃষ্টান্তে বিপক্ষ লোকদিগের হাতে একটা অস্ত্র দেওয়া হয়। গত ফাল্গুন মাসের ভারতীতে সমস্যাশীর্ষক প্রবন্ধে লেখক এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—আমরা তাহা এইখানে না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। "প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না—পথ অধিক এবং পথে বিপদও অনেক ছিল। এইজন্য তখনকার রীতি ছিল 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা', এই জন্য পুরাকালের পথিক-বধূজনের বিলাপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; রেলের প্রসাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথেও বিপদ নাই। দেশে বিদেশে বাঙ্গালীদের কাজকর্ম্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, ব্যয় অল্প, কোন বিপদ নাই, তখন স্ত্রীপুত্রের বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক একটি গাড়ি একলা অধিকার করিতে পারেন এমন সঙ্গতিও অল্পলোকের আছে। এইজন্য আজকাল প্রায় দেখা যায় পরপুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের পরিবার রেলগাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর এরূপ উদাহরণ আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনভ্যাসের সঙ্কোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআটি তত গুরুতর নহে। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার অনভ্যাস যদি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে সমাজনিয়মের বাধা আর বড় কাজে লাগে না। আর একটা দেখিতে হয়—পূর্ব্বে অবরোধ প্রথা সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ বা বাহিরে যান, কেহ বা যান না। যাঁহারা না যান তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে নানা গল্প শুনিতে পান, নানা উদাহরণ দেখিতে পান। সুতরাং স্বভাবতই বাহিরে যাওয়া মাত্রেই তাঁহাদের তেমন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে তাঁহাদের কৌতূহলও জন্মে। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, এবারকার এক্‌জিবিশনে যত পুরনারী সমাগম হইয়াছিল, বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার শিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রবল

প্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও, না দেখিবার ভান করা বৃথা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবেই, তবে অপ্রস্তুতভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে যাত্রা করেন অথচ তাঁহাদের বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অন্তঃপুরের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ্য রক্ষা কর আর না কর তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে —রীতিমত ভদ্র বেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের ভদ্রবেশ পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না, ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? ভদ্র পুরুষরা যখন জামা না পরিয়া বাহির হইতে বা ভদ্র সমাজে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কি করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি বহু যত্নে সম্বরণীয় সাড়ি পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিবিগর্হিত ব্যাপার যে ঘটিতেছে তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈর্য্য নাই, একটা হিজিবিজি কাণ্ড হইতেছে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাঁহাদের মতও নয়, অথচ আনিতেও হইবে—এইজন্য অত্যন্ত অশোভনভাবে কার্য্য-নির্ব্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বজন সমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরান অভ্যাস করাও তবেই বাহিরে আনিতে পার —নতুবা উচকা মত বা উপস্থিত সুবিধার খাতিরে এরূপ ভদ্রজন নিন্দনীয় ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিলে সমস্ত ভদ্র বঙ্গ সমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয়।"

কেবল পরিচ্ছদ সম্বন্ধ নহে—স্ত্রীলোকদিগের যদি অন্তঃপুরের বাহির হইতে হয়, জনসমাজে মিশিতে হয়—তবে আরো অনেক রূপ উপযোগী শিক্ষার আবশ্যক। যে সকল মহিলাগণ এ সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, ঠেকিয়া শিখিয়া ইহার মত পরণ পরিচ্ছদ চালচলনে অভ্যস্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে এ সকল বিষয়ে অন্য মহিলাগণ তাঁহাদের নিকট শিক্ষা পাইতে পারেন।

যাঁহারা স্ত্রীদিগকে জনসমাজে মিশাইতে চান, তাঁহারা আগে স্ত্রীলোকে-স্ত্রীলোকে মিশাইতে শিখাইয়া তাহার পথ সহজ করিয়া আনুন,—নহিলে 'অসূর্য্যম্পশ্যা' অন্তঃপুর কামিনীকে কোনমতেই শোভনভাবে বাহিরে আনা যায় না।

এইরূপ সম্মিলনীতে যে কতদূর উপকার হইতে পারে—তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। অনেক পুরুষে চাহেন তাঁহাদের স্ত্রীরা গান করিতে এবং বাজাইতে শিখুন—কিন্তু সমাজে থাকিয়া সেরূপ শিক্ষার উপায় নাই, এইরূপ সম্মিলনীতে তাঁহারা অনায়াসে এ-সাধ পূর্ণ করিতে পারেন—মেয়ে মেয়েতে গান বাজনা হইলে তাহাতে কেহই দোষ মনে করিবেন না।

আরো একটি কথা, এইরূপ সম্মিলনে নির্ব্বিঘ্নে, অনিষ্টের বিন্দুমাত্র বিনা-আশঙ্কায় মহিলাদের মনের প্রশস্ততা লাভ হইতে পারে। নিতান্ত সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবে—সংসারের অন্ধকার ভাবে ক্রমেই স্ত্রীলোকদিগের মনের আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে—তাহারা সম্মুখে যাহা দেখিতে পায় তাহাই কেবল দেখে, দূরের বস্তু তাহাদের

চক্ষে পৌঁছে না, তাহাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইয়া যায় ; এই সম্মিলনে তাহাদের নানারূপ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা। এইরূপে ভাবিয়া দেখিতে গেলে—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সম্মিলনী দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি যেমন দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, অন্য উপায়ে তাহা হওয়া সম্ভব মনে হয় না। স্ত্রীলোকদের এইরূপ সম্মিলনী যে বঙ্গদেশে একটা আকাশ কুসুম মাত্র একটা যে নিতান্ত নূতন কথা তাহাও নহে। কিছুদিন হইতে বঙ্গ-মহিলা সমাজ নামে শিক্ষিত ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের একটি সম্মিলনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। তবে এ সভায় পুরুষ যাইতে পারেন—এবং অন্তঃপুরের মেয়েদের লইয়া এ সভা নহে—সেজন্য এ সভার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ,—কারণ যে কয়েকটি ব্রাহ্ম মহিলা শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত, তাঁহারা আর কয়জন—আর দেশের সমস্ত মহিলাই প্রায় অন্তঃপুর-বদ্ধা—সুতরাং যদি অন্তঃপুর ছাড়িয়া দিয়া কয়েকটি মেয়ে লইয়া সভা করা হয় —তাহা হইলে দেশ আর সে উপকার পাইল না—দেশের একটি সামান্য ভাগে মাত্র সে উপকার আবদ্ধ থাকিল। তবে ইহাতেও যে লাভ নাই তাহা বলিতেছি না, প্রথমতঃ, বাঙ্গালার একটি মহিলার উন্নতি হইলেও দেশের উপকার কল্পনা করিতে হইবে, তাহার পর এমনি করিয়া—এক একটি সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে, এমন কি এক আধটি লোকের দৃষ্টান্তেও দেশের মধ্যে ক্রমে অনুকরণের ঢেউ উঠে।

সাধারণ মহিলা সম্মিলনী কিরূপ আবশ্যক হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে, শিক্ষিত যে সকল মহিলাগণ দেশের উপকার করিতে যত্নশীল—তাঁহারদের যত্নে যে শীঘ্রই এইরূপ একটি সম্মিলনীর উপায় হইতে পারে ইহা আমার বিশ্বাস। ইচ্ছা থাকিয়াও ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ এখন বরং তাঁহারা দেশের যতটা কাজ করিতে না পারিতেছেন তখন তাহা পারিবেন। এইরূপ সম্মিলনী করিতে হইলে একটি প্রধান নিয়ম এই করা চাই :

যে পুরুষের নামগন্ধ সেখানে থাকিবে না, তাহা হইলেই অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকগণ অবাধে সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তারপর এখানে মহিলাদিগের নানারূপ খেলা, গান-বাজনা গল্পস্বল্প প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের বন্দবস্ত থাকিবে। বিজ্ঞান-শিক্ষা, কি বক্তৃতা প্রভৃতি আড়ম্বর এখানে কিছুই থাকিবে না, তাহা হইলেই ক্রমে স্ত্রীলোকদিগের কাছে ইহার আকর্ষণ লোপ পাইবে—কেন না বক্তৃতা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আসক্তি জন্মিবার জন্য যেরূপ রুচির আবশ্যক, আমাদের সাধারণ মহিলাদের ভিতর তাহা এখন পর্য্যন্ত জন্মে নাই, তবে ছায়াবাজি, রাসায়নিক পরীক্ষা প্রভৃতি যাহা দেখিতে আমোদ হয়—তাহা কোন কোন মহিলা দ্বারা দেখান যাইতে পারে। নির্দ্দোষ আমোদ করিবার বাসনাটা মানুষের এত প্রবল—যে উপযুক্ত উপায়ে যদি সেই আমোদ দেওয়া হয়—তাহা হইলে তাহা দ্বারা যেমন যথার্থ শিক্ষা হয়—হাজার বক্তৃতাতেও তেমন হয় না। যদি শিক্ষিত মহিলাদিগের মনে উদ্দেশ্য থাকে যে তাঁহারা অন্য মহিলাদিগের সুশিক্ষা দিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে গল্প করিবেন, কথা কহিবেন তাহার মধ্যেই সে সকল থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া এইখানে মহিলারা অনেক বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারেন—কিরূপে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইবে, পরণ পরিচ্ছদ কিরূপ করিতে হইবে ইত্যাদি। তাহার পর সম্মিলনীটা একবার দাঁড়াইয়া গেলে তখন মহিলারা কি চাহেন, কিসে তাঁহাদের

যথার্থ উপকার হয়—ক্রমে বেশ বুঝা যাইবে এবং তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র উপায়ও বাহির হইতে পারিবে। কিন্তু প্রথমেই এইরূপ সম্মিলনীর জন্য একটি সভা স্থাপন করা কিছু সহজ নহে, এবং হইলেও প্রথমেই তাহাতে তত বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশের মেয়েদের বদ্ধ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের ভাবগতিক এরূপ বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে হঠাৎ এরূপ সভাতে তাঁহারা আসিতে চাহিবেন কি না সন্দেহ। এজন্যও আবার কতক পরিমাণে তাঁহাদের রুচিটাকে তৈয়ার করা আবশ্যক। তাঁহাদের এই সঙ্কোচ ভাঙ্গিতে হইলে প্রথমে আর একটি কাজ করিতে হইবে, প্রত্যেক শিক্ষিত মহিলা তাঁহার পিতা, ভ্রাতা এবং স্বামীর আলাপী লোকদিগের বাটীর স্ত্রীদিগকে (যাঁহারা আসিবেন) যদি তাঁর গৃহে মাঝে মাঝে বিকালে নিমন্ত্রণ করেন,—এবং নিমন্ত্রণ করিয়া সেইরূপ গল্পস্বল্প আমোদ প্রমোদ করিয়া মেশামেশি করিতে থাকেন তাহা হইলে মহিলাদিগের ক্রমে এরূপ দিকে একটি রুচি জন্মিবে এবং এরূপ স্থলে আসিবার সঙ্কোচও ভাঙ্গিয়া যাইবে। দেশীয় মহিলাদিগের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপিত করিবার জন্য আজকাল কোন কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা এই উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আর আমাদের ঘরে ঘরে, সদ্ভাব-স্থাপন করিতে কি দেশের শিক্ষিত মহিলাগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না? যদি প্রথমে এক একটি গৃহে ইহার সূত্রপাত হইয়া ক্রমে সহর গ্রামের বহু গৃহে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্মিলনী আরম্ভ হয়, তখন পরে সময় বুঝিয়া পুরুষদের ইণ্ডিয়া ক্লবের মত একটি সম্মিলনী সভা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে ত দূরের কথা—আপাততঃ সকল শিক্ষিত মহিলাগণ অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া যদি সমস্ত বঙ্গমহিলা সমাজকে এক করিয়া ফেলিতে যত্নশীল হন—তবেই যথেষ্ট হয়।

অনেক আশা করিয়া আমি এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছি। শিক্ষিত মহিলাগণ এবং দেশহিতৈষী পুরুষগণ এ প্রস্তাবটি যদি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া—ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন করেন, তবে কতদূর আনন্দিত হইব বলিতে পারি না। অন্ততঃ বিষয়টির প্রতি একটু মনোযোগ দিয়া তাঁহারা ইহার ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই প্রার্থনা করি।

ভারতী, বৈশাখ ১২৯২

আর একটি প্রস্তাব

গত বৈশাখ মাসের ভারতীতে 'একটি প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধে লেখিকা দেশের স্ত্রীলোকদের সুশিক্ষার উপর দেশের উন্নতি কতদূর নির্ভর করে তাহা দেখাইয়া সাধারণ স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি ও উপায় স্বরূপ আমাদের দেশের শিক্ষিতা ও অন্তঃপুরবদ্ধা মহিলাদিগের পরস্পর মেলামেশা সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। কয়েকটি কৃতবিদ্য মহিলা সেই প্রস্তাবটি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সেই উদ্দেশে এই বৈশাখ হইতে

সখিসমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিতেছেন। এই সমিতি আজ সাধারণের নিকট 'আর একটি প্রস্তাব' লইয়া আসিয়াছে।*

অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবাদের জন্যে সকলেই চিন্তিত। অনেকে তাঁহাদের দুঃখে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাদের বিবাহ দিবার নিমিত্তে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। অনেক বিধবা অল্প সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের গলগ্রহ স্বরূপ ; গৃহস্থ অতি কষ্টের সহিত বিধবাকে অন্নবস্ত্র দান করেন ; বিধবাও চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সেই দান গ্রহণ করেন ; একটুতেই দুইজনের মধ্যে খিটিখিটি বাধিয়া যায় ; গৃহস্থ ভাবেন, আমি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ইঁহার ভাত কাপড় যোগাইতেছি তথাপি কিছুতেই ইনি সন্তুষ্ট হন না ; বিধবা ভাবেন, হায়! আমার কি পোড়া অদৃষ্ট, একমুটা ভাতের জন্যে এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে!

এক্ষণে সমিতির প্রস্তাবটি এই যে, অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবারা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া, অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাদান ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। অনাথা বিধবাগণ এইরূপ সৎকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে সক্ষম হইলে তাঁহারা অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরাও সন্তুষ্ট থাকিবে, যে সকল বিধবারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমরা নিষেধ করিতেছি না। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মাচরণে বৈধব্যকাল অতিবাহিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকেই এই অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে হিন্দু রীতিনীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দান-ধর্ম্মই শাস্ত্রানুমোদিত বৈধব্যোচিত কর্ম্ম। বিদ্যাদানের পর দান আর নাই। পরোপকার পরম ধর্ম্ম। হিন্দুবিধবারা অন্তঃপুরশিক্ষার ভারগ্রহণ করিলে অশেষ উপকার দর্শিবে। এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোক দ্বারা এই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্যে অনেক পরিবারমধ্যে ইঁহাদের প্রবেশ নিষেধ। ইঁহারা বাঙ্গলা ভাল জানেন না। অন্যান্য বিষয়েও ইঁহারা যেরূপ শিক্ষাদান করেন তাহা বড় সন্তোষজনক হয় না। আর বিশেষতঃ, আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া এখন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, সেরূপ শিক্ষা ইঁহাদের দ্বারা আদবেই হয় না। যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকদের মনে হিন্দুভাব বজায় রাখিয়া দেশানুরাগ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতে পারে, সেই শিক্ষাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। কি মেয়ে, কি পুরুষ, সকল মানুষেরই বাল্যশিক্ষা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে। বাল্যশিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তিভূমি। স্ত্রীলোকদের মনে প্রবল দেশানুরাগ প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহা অতি দ্রুত দেশময় ছাইয়া পড়িবে। এ শিক্ষা বিদেশী স্ত্রীলোক দ্বারা কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এইজন্য হিন্দু বিধবাদিগকে আমরা বারবার অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া মূর্ত্তিমতী দেশানুরাগের ন্যায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করুন, অন্তঃপুর সকল তাঁহাদের ভাবে পরিপূর্ণ করুন। ইহাতে তাঁহাদের বৈধব্যোচিত ধর্ম্মপালন হইবে ; নিজের মঙ্গল, আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল, সমস্ত দেশের মঙ্গল হইবে।

যদি কোন অল্পবয়স্কা, সঙ্গতিহীন বিধবা, দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন

* ভারতীর উক্ত প্রবন্ধটির সহিত সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা দেখিতে চাহেন, ভারতী কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট চাহিয়া পাঠাইলেই পাইবেন।

এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া শিক্ষা পাইতে চাহেন, ত তাঁহাকে সাহায্য করা এই সমিতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই অভিপ্রায়ে এই সমিতিতে দান সংগ্রহ করা হইতেছে, ইহার মধ্যেই যতটা অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে আপাততঃ কয়েকটি বিধবাকে বেথুন স্কুলে দিতে পারা যায়। বেথুন স্কুলে দেওয়া অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-সাধ্য আর সেখানে থাকিলে এই সমিতির কর্ত্রীগণ সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন, এই জন্যই বেথুন স্কুলে দিবার কথা বলিতেছি। বিধবারা স্কুলে বাস না করিয়া শুদ্ধ পড়িবার নিমিত্তে সেখানে যাতায়াত করিলে বোধ করি তাহাতে ধর্ম্মবিরোধী আচরণ ঘটিবে না। তাঁহাদের নিজের শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহারা যখন অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন, তখন সমিতির নিকট হইতে তাঁহারা বেতন পাইবেন।

এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বিধবাদের নিজের এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদিগের বক্তব্য শুনিবার নিমিত্ত আমরা বড়ই উৎসুক রহিলাম।

ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৩

রাণা-বংশে ইরাণীত্ব আরোপ

কে না জানেন উদয়পুরের রাণাগণ সূর্য্যবংশ বলিয়া বিখ্যাত। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের পাণ্ডু-লেখ্য ইতিহাসাবলী,* তাঁহাদের ভাটগ্রন্থ তাঁহাদের মন্দিরস্থ খোদিত লিপি প্রভৃতি হিন্দুদিগের যে সকল লেখা হইতে টড মিবার-রাণাগণের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছেন, সে সকলেই রাণাগণ সূর্য্যবংশ বলিয়া উক্ত। মাঝখান হইতে কোন কোন যাবনিক গ্রন্থ কি

* খোমানরস, রাজরত্নাকর, রাজবল্লভ, জয়বল্লভ প্রভৃতি। উল্লিখিত ইতিহাসাদি হইতে টড রাণা বংশের মিবারে আসিবার এইরূপ ইতিহাস দিয়াছেন।

রাজপুত্র নবের বংশজাত একজন রাজপুরুষ নবকোট (আধুনিক লাহোর। নব কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া নবকোট।) হইতে সৌরাষ্ট্রে আগমন করিয়া ১৪৪ খৃষ্টাব্দে তথাকার প্রমর বংশীয় একজন রাজার রাজ্য অধিকার করিয়া সেই রাজ্যে বীরনগর রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার প্রপৌত্র-পুত্র বিজয়সেনের রাজ্যকালে কনকসেনের স্থাপিত রাজ্য আরো বিস্তৃতি লাভ করে, তিনি সৌরাষ্ট্রে বিজয়পুর বল্লভীপুর প্রভৃতি কয়েকটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। বল্লভীপুরই তন্মধ্যে প্রধান হইয়া উঠে। ৫২৪ খৃষ্টাব্দে যবন কর্ত্তৃক বল্লভীপুর অধিকৃত হয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধে সৌরাষ্ট্রের শেষ রাজা শিলাদিত্য নিহত হন। এই আক্রমণের সময় শিলাদিত্যের অন্তঃসত্ত্বা মহিষী পুষ্পবতী পিত্রালয় চন্দ্রবতীতে ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় অম্বা ভবানীকে পূজা দিতে গমন করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় পথে উক্ত সংবাদ পাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাহাড়-গুহায় তাঁহার সন্তানের জন্ম হওয়াতে তাহার গুহা নাম হইল। গুহা ব্রাহ্মণ কন্যা কমলাবতী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া মিবারের সন্নিহিত ভীলরাজ মন্দালিকের ইদর রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। তাঁহার নাম হইতেই তাঁহার বংশধরগণ গুহ-লুট আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধর গুহলুট বাপ্পাই চিতোরের প্রথম রাজা। ৭২০ খৃষ্টাব্দে তিনি চিতোরের যে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কালে সহস্র বিপ্লবের মধ্যে সেই সিংহাসন আজও তাঁহার বংশধরগণ অধিকার করিয়া আছেন।

রূপ যুক্তিহীন কথায় রাণাদিগের এই সূর্য্যকুলে ইরাণীত্ব আরোপ করিয়া পুরাতত্ত্ববিদদিগের একটা খোরাক জুটাইয়া গিয়াছে, পাঠকদিগকে আমরা তাহা দেখাইব।

"মাসার অল ওমরা" নামক গ্রন্থের উক্তি হইতেই প্রধানতঃ উক্তরূপ অনুমানের জন্ম।

শিবজির ইতিহাস লেখক 'লক্ষ্মীনারায়ণ সুফিক আরঙ্গাবাদি' (আরঙ্গাবাদের কাব্যলেখক) রাণা বংশ বলিয়া শিবজির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তাঁহার পুস্তকে উল্লিখিত গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। † টড আবার এই উদ্ধৃতাংশ অনুবাদ করিয়া রাজস্থানে যাহা সন্নিবেশ করিয়াছেন—আমরা এইখানে সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত করিতেছি। পাঠকগণ এখন দেখুন উক্তরূপ অনুমানের ভিত্তি কতদূর দৃঢ়।

"হিন্দু রাজকুল প্রধান উদয়পুর রাণাগণ 'নসিরান ই আদিলের' (ন্যায়বান) : (যিনি হিন্দুস্থানের অনেক প্রদেশ জয় করেন) বংশ বলিয়া পরিচিত। বৈজন্তিয়মের (আধুনিক কনষ্ট্যানটিনোপল) সম্রাট মরিসের কন্যা মেরিয়ানা পারস্যরাজ নসিরাণের এক মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভের সন্তান নসিজাদ পিতার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মাতার খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সসৈন্যে হিন্দুস্থানে আসিয়া সেখান হইতে পিতার বিরুদ্ধে ইরাণ যাত্রা করেন, সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়—কিন্তু তাঁহার যে পুত্রকে তিনি হিন্দুস্থানে রাখিয়া যান তাহা হইতেই রাণা বংশের উৎপত্তি।"

এই এক কথা—আর এক—

"পিতৃ বিদ্রোহী নসিজাদ ইরাণে গিয়া যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই ভ্রাতার বংশধর শেষ অগ্নি-উপাসক রাজা এজিদ ১৭ হিজরা অব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাভূত ও হৃত-রাজ্য হয়েন। এজিদের তিন কন্যা ছিল। যুদ্ধের পর দ্বিতীয় কন্যা সাহারবানু ইমাম হোসেনের পত্নী হইলেন, তৃতীয় কন্যা বানু একজন আরব কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক চিকিক অরণ্যে নীত হইয়া সেইখানে ঈশ্বর শরণ করতঃ অদৃশ্য হইলেন (এই জন্য পারসীদের ইহা একটি পুণ্য তীর্থ)। কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা মহাবানুর যে কি হইল ইরাণী পুস্তকে তাহার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু মহাবানু যে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন হিন্দু পুস্তক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহাবানু হইতেই শশোদিয়া* বংশের (রাণা বংশ) উৎপত্তি। এইরূপে যেদিক দিয়াই ধর মিবাররাজগণ হয় নসিরাণ-পুত্র নসিজাদের সন্তান, না হয় এজিদ-কন্যা মহাবানুর সন্তান।"

---

† The work which has furnished all the knowledge which exists on the Persian ancestry of the Mewar princes is the Masser al Omra, or that (in the author's possession) founded on it entitled Bisat al Ganaem, or 'Display of the Foe', written in A. H. 1204. The writer of this work styles himself Latchmi Narrain Shufeek Arungabadi, or the 'rhymer of Arungbad'. He professes to give an account of Sivaji the founder of—the Mahratta Empire ; for which purpose he goes deep into the lineage of the Ranas of Mewar from whom Sivaji was descended, quoting at length the Masser al Omra from which the following is a literal translation. Tod's *Rajasthan,* Vol 1, p 235.

* গুহা হইতে প্রথমে রাণাগণ গুহলুট আখ্যা পাইয়াছিলেন, পরে স্থানের নাম হইতে আহারিয়া ও শশোদিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন।

এই ত 'মাসার অল ওমরা'র উক্তি, কিন্তু ইহার মধ্যে মুখের জোর কথা ছাড়া রাণাদের ইরাণীত্ব প্রতিপাদন করে এমন ঐতিহাসিক যুক্তি কই?

ইতিহাস বরঞ্চ ইহার বিপরীতেই যুক্তি প্রদান করে।

টড বলেন—পারস্য ইতিহাসে নসিজাদের সৌরাষ্ট্র আক্রমণ ও তাহার সিংহাসন আরোহণের সময় (৫৩১ খৃঃ) যা পাওয়া যায়, তাহার সহিত হিন্দু ইতিহাসের বল্লভীপুর লুণ্ঠনকালের (৫২৪ খৃঃ) ঐক্য দেখা যায়।[১]

আরো বলেন—

বল্লভীপুরের কাছে বৈজন্তিয়ম নামে একটি নগর ছিল। বৈজন্তিয়ম-সম্রাট-কন্যার গর্ভজাত পারস্য-রাজপুত্র নসিজাদ যে এইখানে যুদ্ধ করেন এই নামটিই তাহার প্রমাণ। যুদ্ধ জয়ের পর মাতার দেশের নামে এই নগরের নামকরণ করিয়াছেন।[২]

টডের এই দ্বিতীয় কথাটির সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে।

টড যে নগরকে বৈজন্তিয়ম নাম দিতেছেন, যতদূর সম্ভব তাহার প্রকৃত নাম বৈজয়ন্তী। বৈজয়ন্তী একটি সংস্কৃত কথা, সুতরাং এই নাম হইতেই নগরটি নসিজাদের স্থাপিত এমন প্রমাণ হয় না। বিজয়সেন যখন বল্লভীপুর বিজয়পুর প্রভৃতি স্থাপন করেন, তখন বৈজয়ন্তী নামে আর একটি নগর তাঁহা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল ইহাই অধিক সম্ভবপর।

টড যে সংস্কৃত ভাষা জানেন না—'রাজস্থানে'র নানা স্থানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—ইহাও আর একটি প্রমাণ মাত্র।

কিন্তু যদি উক্ত নগর নসিজাদের স্থাপিত বৈজন্তিয়ম বলিয়াই মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে টডের উল্লিখিত দুইটি কথা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়—যে তাতারগণ নহে, পারস্য-রাজপুত্র নসিজাদই বল্লভীপুর আক্রমণ করিয়া শিলাদিত্যের রাজ্য অধিকার করেন। রাণাগণ যে নসিজাদের বংশ, উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ হয় না, বরঞ্চ পারস্যরাজপুত্রের সৌরাষ্ট্র আক্রমণকাল ও শিলাদিত্যের পরাভবকালের ঐক্য হওয়ায় শিলাদিত্য যে পারস্যরাজের সন্তান নহেন তাহাই প্রমাণ হইতেছে।

এইখানে একটি কথা, সূর্য্য উপাসক ইরাণীদিগের সহিত রাণাদিগের পূজা পদ্ধতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই সূর্য্য পূজা করেন—উভয়ের পতাকায় সূর্য্যের মূর্ত্তি। রাণার নগরের প্রধান দ্বার সূর্য্যদ্বার নামে খ্যাত, ইত্যাদি। ইহা হইতে কি রাণাগণ পারস্য রাজবংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না? না। ইরাণীগণ যে পুরাতন আর্য্যজাতির একটি শাখা—ইহা একটি সিদ্ধান্ত কথা, সুতরাং রাণাদিগের সহিত তাঁহাদের পূজা পদ্ধতির এই যে সাদৃশ্য, তাহাতে কেবল সেই সিদ্ধান্তই অব্যর্থ রহিতেছে, রাণাগণ যে নসিজাদের

---

১ The period of the invasion of Saurashtra by Noshizad who mounted the throne A. D. 531, corresponds well with the sack of Balabhi A. D. 524.

২ We have a singular support to these historic relics in a geographical fact, that places on the site of the ancient Balabhi a city called Byzantium which almost affords conclusive proof that it must have been the son of Noshirwan who captured Balabhi and Gajni and destroyed the family of Silladitya ; for it would be a legitimate occasion to name such conquest after the city where his Christian mother had birth. Tod's *Rajasthan,* Vol 1., p 238.

সন্তান, এ সাদৃশ্যে তাহার প্রমাণ হয় না।

এখন দেখা যাক 'মাসার অল ওমরা'র দ্বিতীয় উক্তি অর্থাৎ রাণাগণ মহাবানুর সন্তান, এই অনুমানটি কিরূপ যুক্তিসঙ্গত।

'মাসার অল ওমরা' লেখক বলিতেছেন বটে এজিদের জ্যেষ্ঠ কন্যা হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন—হিন্দু পুস্তকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন পুস্তক এ সম্বন্ধে কি বলিতেছে তাহা কিছুই বলেন নাই, সুতরাং তাহা না জানিলে এ কথার মূল্য আপাততঃ অতি সামান্য। তবে টডের মতে 'মাসার অল ওমরা'র প্রথম অনুমানটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে কিছু সত্য থাকিতে পারে। মগধি ভাষায় 'উপদেশ প্রধান' নামক গ্রন্থে শিলাদিত্যের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে—,

* গুজরাটের একটি নগরে দেবাদিত্য নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুভগা নামে তাঁহার একমাত্র বালিকা বিধবা কন্যা ছিল। কন্যা পিতার নিকট সূর্য্যমন্ত্র শুনিয়া অসাবধানে তাহা উচ্চারণ করায় সূর্য্যদেব তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

বিধবা কন্যাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া ব্রাহ্মণের ক্ষোভের সীমা রহিল না—কিন্তু যখন শুনিলেন সূর্য্যদেব তাঁহার জামাতা—তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা শান্ত হইলেন—কিন্তু অন্যে কন্যাকে কলঙ্কিত বিবেচনা করিবে, এই ভয়ে গর্ভিনী দুহিতাকে বল্লভীপুর প্রেরণ করিলেন। সেখানে তাহার যমজ সন্তান হইল—একটি পুত্র একটি কন্যা।

পুত্র বড় হইয়া পাঠশালায় যায়, সমপাঠীগণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে—সে বলিতে পারে না—সকলে তাহাকে উপহাস করে—এই উপহাসে একদিন সে ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে হত্যা-ভয় দেখাইয়া তাহার পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

এই সময় সূর্য্যদেব সন্তানের নিকট প্রকাশিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে একটি শিলাখণ্ড প্রদান করিলেন, এই শিলা স্পর্শ করাইবা মাত্র তাহার উপহাসকারী সমপাঠীর মৃত্যু হওয়ায় বালক রাজসমীপে আনীত হইল। রাজা তাহাকে দণ্ডভয় দেখাইলে বালক ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাখণ্ড দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিল। শিলা হইতে তাঁহার নাম শিলাদিত্য।

টড এই প্রবাদটির সহিত মহাবানুকে এক করিতে চাহেন। তিনি বলেন, মহাবানুর পিতা এজিদ রাজ্য হারাইবার পর সম্ভবতঃ মহাবানু হিন্দুস্থানে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নসিজাদের পুত্র হিন্দুস্থানে বসতি স্থাপন করেন) আশ্রয় লইতে আসেন। মহাবানুই সুভগা নামে খ্যাত হইয়া থাকিবেন। †

---

* See Tod's *Rajasthan,* Vol 1. *Annals of Mewer,* Chapter III.

† But though I deem it morally impossible that the Ranas should have their lineage from any male branch of the Persian house, I would not equally assert that Maha Banoo the fugitive daughter of Yezdegird may not have found a husband, as well as sanctuary with the prince of Saurashtra, and she may be the Soobhogna (mother of Silladitya) whose mysterious amour with the 'sun' compelled her to abandon her native city of Kaira. The son of Marian had been in Saurashtra and it is therefore not unlikely that her grandchild should there seek protection in the reverses of her family, p. 239.

পারস্য রাজদুহিতা মহাবানুকে সৌরাষ্ট্ররাজ কেহ যে বিবাহ করিতে না পারেন তাহা নয় ; তবে কি এ ঘটনাটি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে গেলে ইতিহাস বেঠিক হইয়া পড়ে। এই মাত্র আমরা দেখিলাম নসিজাদ যখন সৌরাষ্ট্রে আসেন সেই সময়ে বল্লভীপুরের শেষ সূর্য্যবংশী রাজা শিলাদিত্য নিহত হন। নসিজাদের আক্রমণের অনেক পরে এজিদ মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন, সুতরাং মহাবানু তখন সৌরাষ্ট্রে আসিয়া কিছু আর শিলাদিত্যের মাতা হইতে পারেন না।

তারপর, রাণাদিগের বংশের ইতিহাসে এ প্রবাদের কোনই উল্লেখ নাই, তাহাতে কনকসেনের বংশ পরম্পরায় ধারাবাহীক্রমে—শিলাদিত্য সোমাদিত্যের সন্তান বলিয়া উক্ত। (কোন কোন ইতিহাসে শিলাদিত্যের পিতার নাম সূরয রাও)।

টড এ সম্বন্ধে আবুল ফজেলের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাও ঐরূপ মুখের কথা। "রাণা পরিবার আপনাদিগকে নসিরাণের বংশ মনে করেন"—(Rana's family consider themselves descendants of Noshirwan) এই এক লাইনে তাঁহার উক্তি শেষ হইয়াছে।

সুতরাং কেবল এইরূপ কথা হইতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সন্তানকুলোদ্ভব বিখ্যাত সূর্য্যবংশ রাণাগণকে ইরাণী পিতামাতার সন্তান বলিয়া অনুমান করা নিতান্তই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শিশু যখন প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে উজ্জ্বল কিরণশালী চন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছে, তখন যদি তাহাকে বল—ঐ যে চন্দ্র দেখিতেছ, উহার কিরণ, জ্যোতি সকলি মিথ্যা,—প্রকৃত প্রস্তাবে উহা একটা মৃৎপিণ্ডমাত্র—তখন সে কথা শিশুর ত নিতান্তই অদ্ভুত মনে হইতে পারে, তাই বলিয়া উহার মধ্যে সত্যের কি কিছু সম্ভাবনা নাই? কে অস্বীকার করিবে?

তবে সম্ভাবনা যাহা তাহা পণ্ডিতদিগের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেই পৌঁছে, শিশু তাহার সহজ জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধি দিয়া তাহা দেখিতে পায় না। যদি পণ্ডিতগণ, পণ্ডিতপ্রবর টডের ন্যায় উপরোক্ত প্রমাণে আমাদের খৃষ্টান মহারাণীর সহিত সূর্য্যবংশ রাণাদিগের রক্ত সম্পর্কের সম্ভাবনা দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কিন্তু অজ্ঞ আমাদের টডের এ আহ্লাদ দেখিয়া পিকুইকের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারটিই মনে আসিয়া পড়ে।**

ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

** Whichever of the propositions we adopt at the command of the author of 'The Annals of Princes' namely "that the Sesodia race is of the seed of Noshizad, son of Noshirwan or that of Mahabanoo, daughter of Yezdegird" we arrive at a singular and startling conclusion, viz. that the "Hindua Sooraj descendant of a hundred kings", the undisputed possessor of the honours of Rama, the patriarch of the solar race, is the issue of a Christian princess: that the chief prince among the nations of Hind can claim affinity with the emperors of 'the mistress of the world' though at a time when her glory had waned and her crown had been transferred from the Tiber to the Bosphorus. Tod's *Rajasthan*, p. 239.

সরলতা কি নিন্দাপ্রিয়তা?

সরলতার নিবাস স্বর্গে, কুটিলতার বসতি নরকে। সরলতা তাহার সরল সোজা সুগম্য একটি মাত্র পথে প্রশস্ত উদার রাজ্যের দিকে মনুষ্যকে অগ্রসর করে, কুটিলতা তাহার সহস্র বাঁকাচোবা ঘোরপ্যাচ, গলি ঘুঁজির মধ্যে মনুষ্যকে দিশাহারা করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিনাশ করে। স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় সরল ব্যক্তির অন্তরে বাহিরে নির্ম্মলতা বিরাজ করে, তাহার মনোভাব তাহার ভাষায় পরিব্যক্ত হয়। তাহার সরল মনের সরল ধর্ম্ম দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সে বিচার করে, তাহার সহজ সুবুদ্ধি জগৎ সংসারে সে প্রতিফলিত দেখে।

ধারাল পেঁচাল বাঁকাবুদ্ধিদিগের ন্যায় সে প্রত্যেকের সোজা কথার মধ্য হইতে বাঁকা মৎলব, সহজ কাজের মধ্য হইতে গূঢ় উদ্দেশ্য টানিয়া বাহির করিয়া আত্মাভিমানে স্ফীত হইতে থাকে না। সত্যের প্রতি, মহত্ত্বের প্রতি, মঙ্গলের প্রতি তাহার সহজ হৃদয়ের সহজ বিশ্বাস লইয়া সে কাজ করে। এই জন্য অনেক সময় তাহার ঠকিতেও হয়, কুটিল লোকের মিথ্যা ছলনায় প্রতারিত হইয়া অনেক সময় সে যন্ত্রণা ভোগ করে, অনেক সময় সে প্রাণও হারায়।

কিন্তু নিজের বাঁকা নয়নের বাঁকা দৃষ্টিতে সমস্তই মন্দ দেখিয়া, পৃথিবীশুদ্ধ লোককে অবিশ্বাসী ভাবিয়া দিন দিন তিল তিল করিয়া সংশয়ে আশঙ্কায় প্রাণ হারান অপেক্ষা বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইয়া যন্ত্রণাভোগ করা—এমন কি প্রাণ হারানও কি সহস্র গুণে ভাল নহে? বিশ্বাস করিয়া যে যন্ত্রণাভোগ করা যায় সেকি যন্ত্রণা? সে যন্ত্রণার মধ্যে কতখানি তৃপ্তি কতখানি সুখ বিরাজ করিতেছে? বিশ্বাস করিয়া যে মরে, মরিবার কষ্ট তাহার নাই। সে মরে না, আত্মবিসর্জ্জন করে, যে আত্মবিসর্জ্জন করে সে অমর।

সরলতা শব্দের প্রকৃত অর্থ যাহা, সরল লোকের প্রকৃত ছবি যাহা, তাহাই উপরে বলিলাম। কিন্তু অধিকাংশ সময় প্রকৃত যাহা তাহা কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করে, প্রকৃত জগতের সহিত প্রকৃতের সম্বন্ধ অল্পই দেখা যায়। সরল ব্যক্তির উল্লিখিত পোষাকি ছবি —কল্পনা দ্বারা আমরা যাহা মনশ্চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করি—তাহার সহিত যদি আমরা আমাদের দৈনিক জীবনের আটপৌরে সরল ব্যক্তিদের—যাহাদের আমরা সচরাচর সরল নামে সম্বোধন করিয়া থাকি—সাদৃশ্য অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে বিষম অসাদৃশ্য বই আর কিছুই দেখিতে পাই না।

প্রকৃত জগতে সরল শব্দের প্রকৃত অর্থ একেবারেই লোপ পাইয়াছে। লঘুহৃদয়, নির্ব্বোধ বা নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তিই সংসারে সরল বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যেখানে একাধারে এই সমস্ত গুণগুলি বিরাজ করে, সেখানে সোনায় সোহাগা, তাঁহার সারল্যে জগৎ বিমুক্ত হয়।

আমি একজনকে জানি, তাহার প্রকাণ্ড শরীরের উপর ক্ষুদ্র গড়ানে মাথাটি দেখিবামাত্র তাঁহাকে নির্ব্বুদ্ধিতার একটি অবতার বলিয়া মনে হয়। সে ভাল্লুক মূর্ত্তি দেখিলে হঠাৎ ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ মনে পড়িয়া যায়, মতটা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। সরল বলিয়া ইঁহার দেশে বিদেশে একটা খ্যাতি আছে! ইনি দুদণ্ডের জন্য পরিচিত

অপরিচিত যাহাকেই নিকটে পান তাঁহার কাছেই মুক্ত কণ্ঠ হইয়া কিন্তু অতি গোপনে আপনার প্রাণের সমস্ত লুকান কথা প্রকাশ করেন! লুকান কথাটা আর কিছুই নহে —তাঁহার আত্মীয় লোকের নিন্দা,—সম্পূর্ণ মিথ্যা নিন্দা।

যে বেচারীদের নিন্দা লইয়াই এইরূপে তিনি দিন যাপন করেন—তাহারা তাঁহার নিকট অন্য কোন অপরাধ করেন নাই—অপরাধের মধ্যে আজন্মকাল তাঁহার উপকারই করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে, তাঁহার পরিবারগণকে চিরকাল প্রতিপালনই করিয়া আসিতেছেন, কেবল তাহাই নহে—আপনার স্ত্রীপুত্র ছাড়া মানুষ মানুষকে তেমন যত্ন করিয়া কদাচ প্রতিপালন করে। নিজের সম্বন্ধে যেখানে তাঁহারা হাত গুটাইয়া চলেন, তাঁহার সম্বন্ধে সেখানেও তাঁহারা মুক্তহস্ত।

পরের নিন্দা শুনিতে ভাল লাগে না, এমন অল্পই লোক আছে, বিশেষ বড় ঘরের নিন্দা—তা আবার ঘরের লোকেরি মুখে। নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ঐ নিন্দাগুলা বড়ই আস্বাদে ভোগ করেন, এবং চিরস্থায়ী বন্দবস্তে ঐ মজাটাকে ভোগ দখল করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ প্রশংসা ও উৎসাহবাক্যে উক্ত সরল ব্যক্তির সরলতা প্রবৃত্তিটাকে অনবরত প্রবল প্রতাপে বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

মজা এই, যাঁহারা বাস্তবিক নিন্দাপ্রিয় লোক নহেন, নিন্দার জন্যই নিন্দা শুনিয়া যাঁহারা আমোদ প্রাপ্ত হয়েন না—তাঁহারাও ঘরের লোকের মুখে ঘরের লোকের ঐরূপ গুপ্ত নিন্দা শুনিয়া আপ্যায়িত হইয়া যান। তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করেন—তিনিই একা —কিম্বা তাঁহারি মত দুচারজন মাত্র ঐ সরল ব্যক্তির বিশ্বাসভাজন—তাঁহাদিগকেই মাত্র অসাধারণ বিশ্বাস করিয়া লোকটা নিজের ঘরের কথা সব খুলিয়া বলে! এই মুক্তকণ্ঠতায় তাঁহারও দ্রবীভূত হইয়া যান, বন্ধুর সরলতায় আহাহা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

পরের বিশ্বাস লাভ করিয়াছি এই অহঙ্কার বড় অহঙ্কার। ইহাতে ভুলিয়া লোকে চারিদিক আর দেখিতে পায় না। যত দিন এ বিশ্বাসটা ভাঙ্গিবার কারণ না ঘটে, ততদিন নিন্দাকারীকে যথার্থই তাহার সরল বলিয়া মনে হয় এবং তাহার বন্ধুত্ব সে উপভোগ করে।

সেদিন আমি একটি বন্ধু লোকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম ; তিনি সর্ব্বাগ্রেই আহ্লাদ সহকারে আমাকে খবর দিলেন—যে, "সম্প্রতি তাঁহার সহিত একজনের আলাপ হইয়াছে, সে লোকটা এতই সরল যে ঘণ্টাকতকের মধ্যেই তাঁহার পেটের যত কথা সমস্তই তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছে।"

বলা বাহুল্য—সেই লুকান কথার অন্ততঃ অর্দ্ধেক তাহার নিজের আত্মীয়জনের নিন্দা।

আমার বন্ধুটি যদি জানিতেন—তাঁহার নব-লভ্য বন্ধুটি—তাঁহার নিকট বলিয়া নহে, সকলের নিকটেই ঐরূপ হৃদয় খুলিয়া থাকেন—তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার আনন্দটা অত মারাত্মক হইত না। বসুধা যাহার কুটুম্ব, তাহার প্রেম আদর্শপ্রেম সন্দেহ নাই, কিন্তু বসুধার কেহ সে প্রেমের জন্য আকাঙ্ক্ষী হইবে এরূপ বোধ হয় না।

এইখানে একটি কথা উঠিতে পারে—কেহ বলিতে পারেন, কেন অল্পক্ষণের মধ্যে কি প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন হইতে পারে না? আর অল্পক্ষণেই হৌক, বেশীক্ষণেই হৌক,

একবার বন্ধু বলিয়া মনে হইলে তাহার কাছে ত প্রাণ খোলাই স্বাভাবিক। নিন্দা বল, প্রশংসা বল, সুখ বল, দুঃখ বল—যাহা নিজের মনের ভিতর রহিয়াছে এবং যাহা প্রকাশ করিলে লোকের বিশ্বাস ভাঙ্গিতে হয় না—নিজের বন্ধুর কাছে তাহা বলিব না ত কি? ওরূপ স্থলে যে নিন্দা—তাহার অভিপ্রায় বাস্তবিক নিন্দা করা নহে,—তাহার অভিপ্রায় আপনার মনের কথা খুলিয়া মনের ভার লাঘব করা, সুখ দুঃখ দুজনে একত্র ভোগ করা, কথোপকথনে মনুষ্য চরিত্র সমালোচনা করা ইত্যাদি।

প্রকৃত বন্ধু মনে করিলে তাহাকে সব কথা (যাহা বলিলে পরের বিশ্বাস ভঙ্গ হয় না) বলা স্বাভাবিক—ইহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব বাস্তবিক দু'দণ্ডের মধ্যে যার তার সঙ্গে স্থাপিত হইতে পারে, এরূপ ত মনে হয় না। যাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি, যাহার স্বভাবের ভিতর প্রবেশ করিয়া সহানুভূতি সূত্রে যাহার সহিত গ্রথিত হইতে পারি, তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করিতে পারি, কিন্তু দু'দণ্ডের মধ্যে কি এরূপ বিশ্বাস স্থাপনের অবসর পাওয়া যায়? আমার ত বিশ্বাস প্রথম দৃষ্টিতে একজনের উপর ভালবাসা জন্মাইতে পারে—কিন্তু তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে না।

আর যদিই বা এমন হয়—সরলতার প্রভাবেই একজন মুহূর্ত্তমধ্যে একজনকে অকপট বিশ্বাস করিয়াই ফেলে, সেই বিশ্বাসের সেই বন্ধুতার আরম্ভই কি—পরনিন্দা পরচর্চ্চা? তাহা ছাড়া বন্ধুতার আর কি কোন কথা, কোন আলাপ নাই?

যাহার যে প্রবৃত্তি যত প্রবল তাহাই বাহিরে প্রকাশ পাইবার জন্য তত ব্যগ্র। মুহূর্ত্তের ভাবে যাহার তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া এইরূপ যে নিন্দা করা, ইহা সরলতার লক্ষণ নহে, লঘু হৃদয়তা, নিন্দাপ্রিয়তা, ঢাক বাজান স্বভাবেরই লক্ষণ। প্রকৃত সরল ব্যক্তি যে কখনো কাহারো নিন্দা করে না তাহা বলিতেছি না। কথা প্রসঙ্গে ভাল মন্দ নিন্দা প্রশংসা সকল কথাই উঠিতে পারে, কিন্তু নিন্দা করিবার জন্য প্রাণের যে একটা আকুলি ব্যাকুলি —তাহা সে নিন্দায় থাকে না ; কাহারো হানি করা সে নিন্দার উদ্দেশ্য নহে, কিম্বা নিন্দার জন্যই সে নিন্দা নহে। সরল হৃদয় মুক্তপ্রাণ বটে, কিন্তু মুক্ত বাতাস যেমন ঝড় নহে, মুক্তপ্রাণ তেমনি লঘুহৃদয় নিন্দুক ব্যক্তি নহে। সরল ব্যক্তির মনে এক মুখে আর নাই, তাই সে মুক্তপ্রাণ, অযথা লুকোচুরি করিয়া কথায় কার্য্যে ভাবে ভঙ্গীতে সে কাহারো নিকট হেঁয়ালি হইয়া দাঁড়ায় না, সরল ভাবে সরল প্রাণে সে কথা কহে, সরল ভাবে সরল প্রাণে সে জগৎকে বিশ্বাস করে, তাই সে মুক্তপ্রাণ।

সরোবর যেমন পাঁকডোবা নহে, মুক্ত বাতাস যেমন ঝড় নহে, ভালবাসা যেমন ইন্দ্রিয়পরতা নহে, পরের নামে ঢাক বাজানই তেমনি সরলহৃদয় মুক্তপ্রাণ ব্যক্তির লক্ষণ নহে। অথচ ইন্দ্রিয়পরতাকেই আমরা ভালবাসা বলি, নিন্দাপ্রিয়তাকেই আমরা সরলতা বলি। পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষা স্বভাবে অভাব আর কি হইতে পারে?

ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪

আমাদের সমাজ

কে না বড় হইতে চায়—আমরাও চাই। আমরা ধন চাই, মান চাই, গভর্ণমেণ্টের নিকট বড় বড় চাকরী চাই, আমরা ইংরাজের সমকক্ষ হইতে চাই, এক কথায় অধীন হইয়া আমরা স্বাধীন হইতে চাই। বেশ কথা, কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা কি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া জয় হউক বলিয়া গভর্ণমেণ্টের দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইলেই আমাদের পূর্ণ হইবে? ভিক্ষা করিয়া শাক ভাতের কড়ি মিলিতে পারে—তাহাই আমাদের মিলিতেছে—কিন্তু ভিক্ষায় কি আকাঙ্ক্ষা মেটে—বড়লোক হওয়া যায়?

তুমি বলিবে—কেন আমরা কি ভিক্ষা করিতেছি—আমাদের নিজের ধন নিজের অধিকার ফিরিয়া চাহিতেছি, ইহা কি ভিক্ষা? ইহা পাইব না কেন?

সংসার সেরূপ উদারতার উপর স্থাপিত নহে, যতক্ষণ চাহিতে হয় ততক্ষণ নিজের জিনিসও তোমার অধিকারের ধন নহে—তাহাও ভিক্ষা—আর ভিক্ষায় অধিকার মেলে না। যে আর্য্যজাতির বংশ বলিয়া তুমি গৌরব কর, যাহার উদারতা জগৎবিখ্যাত, সেই জাতি যখন ভারতের আদিমজাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তখন তাঁহারা পরাজিতের প্রতি কিরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন? সেই উদারতার গুণে এখনো তাহারা দাসের জাতি, শূদ্র। আর সেই বেদস্পর্শনিষিদ্ধ শূদ্র জাতি আজ নিজের যোগ্যতাবলে বেদ প্রকাশ করিয়া ধন্য নাম লাভ করিতেছেন—কোন ব্রাহ্মণ আর্য্য তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সমর্থ? যেদিন যোগ্য হইবে, সেদিন ভিক্ষার প্রয়োজন হইবে না, আপনা হইতে তোমাদের অধিকার তোমাদের হাতে আসিবে। যদি যোগ্য হইতে চাও ত সমাজকে মানুষ করিয়া তোল, সত্যের উপর, মহত্ত্বের উপর, জ্ঞানের উপর সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।

এখন আমরা কথায় কথায় সমাজ সমাজ করি, প্রতিকার্য্যে সমাজের দোহাই দিই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের সমাজ আছে কি? সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত করিয়া সমাজগত প্রতি ব্যক্তির অন্যায় কার্য্য হইতে সমাজের জনসাধারণকে রক্ষা করাই সমাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজশাসন ভয়ে কে আজ কোন অন্যায় কর্ম্মটা করিতে বাকী রাখিতেছে? কিছুদিন পূর্ব্বে বরং সমাজের একটা শাসন ছিল, কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সমাজ তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে পারিত,—এবং করিত, কিন্তু এখন? এখন সমাজের ভয়ে অন্যায় কার্য্য করিতে কাহাকে কুণ্ঠিত হইতে হয় না, কিন্তু ন্যায়কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়। মিথ্যার উপরেই এখনকার সমাজের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ই এই সমাজের শিক্ষা। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাহা তুমি সত্য বলিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া, শিক্ষা পাইতেছ, যদি সমাজ মানিয়া চল তবে তাহার বিপরীত তোমাকে করিতেই হইবে।—সমাজ ন্যায়কে দণ্ড বিধান করে—অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। বিধবা বিবাহ অন্যায়—কিন্তু গুপ্তভাবে শত সহস্র অপরাধ কর, তাহা মার্জ্জনীয়, নিয়মিত হোটেলে গিয়া অথবা মুসলমান চাকর রাখিয়া খানা খাও—তাহা সমাজ দেখিয়াও দেখিবে না—তাহা দেখিলেই ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যায়—সুতরাং তাহা অপ্রকাশ্য। আর বিলাত যে যায়— সে মার্কামারা,—নিয়মিত

যবনান্নাহারী আর্য্য হিন্দুগণ সেই প্রকাশ্য ম্লেচ্ছ-স্পৃষ্ট বিলাতীকে জাতিচ্যুত করিয়া তবে অন্য কথা কহেন। এই ত সমাজের অবস্থা। আমাদের শিরা-বিশিরার মধ্যে মিথ্যা প্রবিষ্ট করাইয়া সমাজ হাড়ে হাড়ে আমাদিগকে মিথ্যানুরাগী করিয়া তুলিতেছে—ইহার দিকে কাহার দৃষ্টি? মেকলে আমাদের মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকি, কিন্তু সমাজের এই মিথ্যা পালন করিতে আমরা কতদূর বিরক্তি প্রকাশ করি?

তোমরা বলিবে, এ সমস্তই পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল—ইংরাজ সমাজের আদর্শ। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে দোষ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার গুণগুলির স্থানে আমরা দোষই অধিক গ্রহণ করি কেন? তাহা ছাড়া, পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল আমাদের উপর যেরূপই হউক না কেন—কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজ সমাজের আদর্শ—যে মিথ্যা-সমাজ সমাজের একটা ভান মাত্র ছায়া সমাজ, ইহা বলিতে পারি না। ইংরাজ সমাজের আর সহস্র দোষ থাক, ইহা প্রকৃত সমাজ, তাই তাহাদের এত উন্নতি। একজন পরস্ত্রীহারকের সহিত আমাদের সমাজ স্বচ্ছন্দে একসঙ্গে বসিয়া পানাহার করিবে, কিন্তু ইংরাজ সমাজের এরূপ লোকের প্রতি কিরূপ আচরণ! সমাজের ঘৃণা কি ভয়ানক তাহা ইংরাজ সমাজই বুঝে, আমাদের সেরূপ সমাজও নাই, অন্যায়ের প্রতি হাড়ে হাড়ে ঘৃণাও আমরা অনুভব করিতে জানি না!

রাজনৈতিক ব্যবহারে আমরা তাহাদের যথেষ্ট অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই সত্য, —কিন্তু তাহাদের এই কার্য্যগত অন্যায়ের মধ্যে ন্যায়ের দিকে ভাবগত একটা দৃঢ় অনুরাগ দেখা যায়। এই অনুরাগবসে কত মহাত্মা ইংরাজ তাঁহাদের জাতির অন্যায় মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন, বুঝিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করেন, বিজিতের হইয়া নিজ জাতির সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করেন। এই মহাত্মাদিগের অভ্যুদয়ই তাঁহাদের সমাজের ফল, সমাজের মহত্ত্ব। এইখানেই তাঁহাদের জাতিগত উদারতা, এই মহত্ত্বে আমরা তাঁহাদের সহস্র সঙ্কীর্ণতা অন্যায়াচরণ ভুলিয়া তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমাদের যদি বড়লোক হইতে হয়—ত, আমাদের প্রকৃত সমাজ গঠন করা আবশ্যক। রাজনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যেমন রাজনৈতিক-কনগ্রেস স্থাপিত হইয়াছে —সামাজিক উন্নতির অভিপ্রায়ে এইরূপ একটা কিছু না করা হয় কেন?

ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৪

বিবিধ প্রসঙ্গ

১

ছোট নহিলে বড় হয় না, ছোট আগে বড় পিছে। তিল হইতে তাল হয়, কিন্তু একেবারেই তালটা হইয়া উঠিবার খুব কমই সম্ভাবনা।

তবে ছোট কাজের, অল্প কাজের এত অনাদর কেন? যাহারা এতটুক কাজ করিতেছে তাহারাও কাজ করিতেছে, আর যিনি প্রকাণ্ড একটা কাজ করিবার আশায়

চুপ করিয়া বসিয়া ঐ ছোট কাজগুলির দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঁকড়িয়া হাসিতেছেন আর বলিতেছেন 'ভারী ত কাজ,' তাঁহার কাজ হইবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

পাখীরা যখন বাসা করে, এক একটি ক্ষুদ্র কুটা বহন করিয়া আনে, কুটা কুড়াইতে যাহার লজ্জা, সে কি কোন জন্মে বাসা বানাইতে পারে! তাই বলিতেছি, ছোট কাজ বলিয়া উপেক্ষা করিও না, মহৎ উদ্দেশ্য চোখের সামনে ধরিয়া ছোট হইতে আরম্ভ কর, বড় আপনা হইতে হইবে—না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

"সিদ্ধি নহে মানুষের আজ্ঞার অধীন,
বিফল হতেই পারে হৃদয় যতন,
তা বলে মানুষ কি গো হবে লক্ষ্যহীন?
শুধুই কি স্বপনেতে কাটাবে জীবন।
উদ্দেশ্যে দোষিব কি গো সিদ্ধির শিখরে
উঠিবারে আমি আজ বিফল বলিয়া?
পর্ব্বতের পদতলে থাকি যদি মরে,
অন্যে ত উঠিতে পারে উপরে চড়িয়া!"

জীবনের বাকী কখনো পুরে না। বাকীতেই জীবন। মুহূর্ত্তের বাকী পুরাইতে দিবস, দিবসের বাকী পুরাইতে মাস, মাসের বাকী পুরাইতে বৎসর চলিয়া যায়, এইরূপে ক্ষুদ্র বাকীর স্থলে কেবল অসংখ্য বাকী জমা হইতে থাকে, জীবনের বাকী পুরাইতে শেষে জীবনটাই বাকী পড়িয়া যায়। সেই ভাগ্যবান যাহার জীবনের মুহূর্ত্তও বাকী পড়ে নাই।

ভাব কোথা? অভাবে।

মিলনের অভাব বিরহ,—বিরহে যতখানি প্রেমের ভাব, এমন কি মিলনে? যে মিলন বিরহ-ছাড়া নয় অর্থাৎ মিলনকালেও যেখানে বিরহের অনুভাব, সেইখানেই মিলনের যথার্থ তৃপ্তি, বাস্তবিক পক্ষে এ তৃপ্তি মিলনের নহে, যত বিরহের। তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে
বয়মিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তণ্যা;
সঙ্গে সৈব যদেকা
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।

একত্র থাকিব অথচ তাহাকে স্পর্শ করিব না! কি মধুর! কি সুন্দর। কি পবিত্র! বাহিরের মিলনের অভাবে অন্তরের মিলন, কবিই ইহা বুঝেন।

যে কবিতায় হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে, সেই কবিতাই তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ একটি কবিতা পড়িয়া যাহা পড়ি নাই এমন শত শত ভাবে যখন হৃদয় ভরিয়া তাহার সেই দৃশ্যত অভাবের সহিত অদৃশ্য ভাবের বন্ধনে হৃদয় এক হইয়া উঠে, তখনই কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি হয়, নহিলে যে কবিতায় সেই কবিতাটুক মাত্র পড়ি, তাহা হইতে আর কোন অভাব হৃদয়ে জাগে না,—তখন সেই অভাবের অভাবে কবিত্বের অভাব দেখা যায়।

তাই বলিতেছি, বৈষম্যের মধ্যে যেমন সাম্যের, স্বপ্নের মধ্যে যেমন সত্যের অধিষ্ঠান, তেমনি অভাবের মধ্যেই ভাব বিরাজমান।

স্বপ্নের মধ্যেই সত্য, এ বড় বিষম কথা, হইলে কি হয়—কথাটি সত্য। সত্য স্বপ্নজগতের ধন, যাহাকে আমরা সত্য জগৎ বলি তাহার সহিত সত্যের বড় কমই সম্পর্ক। আমরা সত্য জগৎ বলি কাহাকে? ইন্দ্রিয় জগৎকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি তাহাই আমাদের নিকট সত্য জগৎ। সংসারই আমাদের নিকট সত্য। কিন্তু সংসারে সত্য কোথায়? সংসারে পুণ্যের নামে পাপ, মঙ্গলের নামে অমঙ্গলেরই আধিপত্য, সংসার মিথ্যাতেই জর-জর। সংসারে সত্য কেবল স্বপ্নরাজ্যে, কল্পনায়। যদি সত্য দেখিতে চাও, তোমাদের সত্যরাজ্য ছাড়িয়া সংসারাতীত ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্নরাজ্যে সত্য অনুসন্ধান কর।

ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৫

২

গ্লিন ডাউয়ার। "আমি বলিতেছি—গভীর সমুদ্রের ভূত আমি ডাকিতে পারি।"

হটস্পার। "কে না পারে? আমিও পারি, প্রত্যেক মানুষেই পারে। কিন্তু তুমি ডাকিলে তাহারা কি আসিবে?"

গ্লিন ডাউয়ার। "আমি বলিতেছি—ভূতকে কি করিয়া আজ্ঞা করিতে হয় আমি তাহা তোমাকে শিখাইতে পারি।"

হটস্পার। "আর সত্য কথা বলিয়া কিরূপে ভূত তাড়াইতে হয় আমিও তাহা তোমাকে শিখাইতে পারি। সত্য কথা বলিলেই ভূত লজ্জায় পলাইবে। যদি ভূতকে জাগাইতে তোমার ক্ষমতা থাকে—তাহাকে এখানে আন—আমিও শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি তাহাকে লজ্জা দিয়া এখান হইতে তাড়াইব। যতদিন বাঁচিয়া থাক সত্য কথা বল, আর ভূতকে লজ্জা দাও।"

আমরাও গ্লিন ডাউয়ারের মত অবিরত বৃথা গর্ব্ব দ্বারা ভূত ডাকিতেছি, কিন্তু তফাৎ এই, কেহ সত্য কথা বলিলে আমরা ভূত ছাড়া হই না। আমাদের ভূতের লজ্জা নাই।

যেখানে কম কাজ সেইখানেই বৃথা গর্ব্ব। কিন্তু আমাদের দেখিতেছি উল্টা। আমাদের যেমন লম্বা চৌড়া গর্ব্ব—তেমনি লম্বা চৌড়া কাজ। ছোট কাজের ভার আমরা বহিতে

পারি না, বড় কাজের বেলুনের মধ্যে চড়িয়া সর্ব্বদা আপনাকে উড়াইয়া লইয়া চলি। আমরা নিজের কুসংস্কার দূর করিতে চাহি না, পরের কুসংস্কারের প্রতি সদাই দৃষ্টি রাখি, নিজের ঘরের অজ্ঞানতা দূর করিতে আমাদের আদপে প্রয়াস নাই, পরের ঘরের অজ্ঞান-তিমির দূর করিতে আমরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত! তাই কাজের ভিড় আমাদের বড় বেশী। একটি গল্প আছে, একজনের বাগানের একটি গাছে অত্যন্ত মুকুল ধরিত, কিন্তু ফল কিছুই হইত না, ইহা দেখিয়া তাহার বন্ধু পরামর্শ দিলেন, "গাছটির কতকগুলি শাখা কাটিয়া ফেল, মুকুল কম ধরিবে—কিন্তু সেই মুকুলে ফল ফলিবে।" তাহাই হইল। আমাদেরও সেই দশা। আমাদের কাজ বড় বেশীরকম ফলাও হইয়া পড়িয়াছে—কিছু কমান আবশ্যক।

একজন ধোবার একটি গাধা ছিল। গাধা একদিন তাহার গলার আলগা বাঁধা দড়ি খুলিয়া নদীর ধারে গিয়া পড়িল। নদীর কিনারায় একখানি জেলে-নৌকা ছিল, গাধা নদীতে জল খাইবার জন্য নৌকাখানিতে যেমন লাফাইয়া পড়িল—নৌকাখানি অমনি ভাসিয়া গেল। এইরূপে নৌকা ও গাধা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া ত গঙ্গাযাত্রা করিলেন, আর এদিকে ধোবা ও জেলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ করিল। ধোবা বলিল, "তোর দোষে আমার গাধা গেল, দুই কেন নৌকা অমন আলগা করিয়া বাঁধিয়াছিলি?"

জেলে বলিল—"তোর দোষে আমার নৌকা গেল, তোর গাধা আমার নৌকায় না চড়িলে ত আর আমার নৌকা যাইত না।"

এখন দোষ কার? দোষ যাহারই হৌক—প্রত্যেকেই যদি আপনার দোষ বুঝিয়া ভবিষ্যতে তাহা হইতে সাবধান হইতে চেষ্টা করে—তাহা হইলে কাজ অনেক সোজা হইয়া আসে, কাজের বোঝাও হালকা হইয়া পড়ে। কিন্তু উল্লিখিত ধোবা ও গাধার মত আমরা কেহ নিজের দোষ দেখি না, কেবল পরস্পরকে দোষারোপ করি'মাত্র, তাই আমাদের কাজের কিছু অভাব নাই, কিন্তু কাজও কিছু হয় না।

সবাই বলে প্রাণের মত মূল্যবান বস্তু আর কিছু নাই। অথচ প্রাণটা লোকে যেমন কথায় কথায় দিয়া ফেলে—এমন অন্য কিছু ত দিতে দেখি না।

আমার একজন বন্ধু গল্প করিতেছিলেন, তিনি একদিন একজনের কাছে চাঁদা চাহিতে গিয়াছিলেন; চাহিতেই সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "টাকা ত আর প্রাণ নয় যে চাহিলেই দিব।"

ঠিক কথা, মৃত্যুটা লোকে যেমন কঠিন ভাবে—আসলে তাহা নয়। আমরা যে বাঁচিয়া থাকি, তাহা কেবল মরিবার আশায়।

সেন্ট ফিলিপ নেরি রোমের রাস্তায় একজন যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"হে বিনয়ী যুবক, আমাকে বল তুমি কেন রোমে আসিয়াছ?

যুবক। মহাশয়, আমি পণ্ডিত হইতে আসিয়াছি।

ফিলিপ। যখন তুমি পণ্ডিত হইবে, তখন কি করিবে?

যুবক। আমি একজন পাদরি হইতে ইচ্ছা করি।

ফিলিপ। মনে কর তুমি হইলে—তাহার পর?

যুবক। তারপর আমি উচ্চ ক্যানন হইতে পারি।

ফিলিপ। আচ্ছা, তাহাই যেন হইলে? তারপর?

যুবক। তারপর? আমি একজন বিসপও হইতে পারি।

ফিলিপ। আচ্ছা তাহাই হউক, তারপর?

যুবক। কার্ডিনেল, তাহার অপেক্ষাও উচ্চ পদ—ওরূপ সৌভাগ্যও আমার হইতে পারে।

ফিলিপ। অনুমান কর তাহাই হইল, তারপর?

যুবক। কে বলিতে পারে—আমি একজন পোপই বা কেন না হইব?

ফিলিপ। বেশ—পোপের দণ্ড, লাল টুপি, আর ত্রিকোণ মুকুট ধারণ যেন করিলে, তারপর?

যুবক। এই পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ বাসনা আর কিছু দেখিতেছি না। ঈশ্বর যতদিন এই পদমর্য্যাদা উপভোগ করিতে দিবেন তাহা করিয়া তাহার পর আমাকে মরিতে হইবে।"

তখন সেণ্ট নেরি বলিলেন—

What ! must you die? fond
Youth ! and at the best
But wish and hope and may be all the rest !
Take my advice—whatever may betide.
For that which must be, first of all provide,
Then think of that which may be, and indeed,
When well prepared who knows what may succeed?
But you may be as you are pleased to hope
Priest ,canon bishop, cardinal and pope.

সবাই বলে ধার করিও না। কিন্তু ধার না লইলে চলে কই; ধারে ধারেই ত সংসার চলিতেছে। ধার না লইয়া জগতে আসিবারই যো নাই। পিতা মাতার ধার লইয়া তবে সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এই ধার শোধের নিয়ম কিন্তু বড় চমৎকার, যাহার কাছ হইতে যে ধার করে—তাহাকে আর সে ধার ফিরাইয়া দিতে হয় না, তাহাকে সুদের যদি কিছু অংশ দাও, তবেই যথেষ্ট, তাহা না দিলেও চলে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি যে ফাঁকি দিবে, তোমার যে ধার শুধিতে হইবে না, তাহা নহে। ধার নিলেই অবশ্য শোধ দিতে হইবে, দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণরূপে তোমাকে শোধ দিতে হইবে—তবে যাহার কাছ হইতে ধার লইয়াছ, তাহাকে না দিয়া আর একজনকে দিবে এই মাত্র। তোমার পিতার তুমি ঋণী—কিন্তু তুমি সুদে আসলে তোমার পুত্রকে তাহা ফিরাইয়া দিলে। তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন, সেই প্রেমের উত্তেজনায় জগতের কাজ করিয়া তুমি তাঁহার ধার শোধ দিলে। যে রাজা এক রাজার নিকট জেতেন—তিনি অন্য রাজার নিকট পরাস্ত হইয়া তাহার শোধ দেন। এক দেশের ঐশ্বর্য্য লইয়া অন্য দেশ আর এক দেশকে বড় করে। এইরূপে আমরা ধার

দিয়া শোধ দিই, শোধ দিয়া ধার দিই। কিন্তু লইবার সময় মনে করি না, ধার লইলাম, ফিরাইবার সময় ভাবি—ধার দিলাম। সেইজন্যই পৃথিবীতে এত নিরাশা! সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া দেখিলে নিরাশ হইতে হয় না, সংসারের নিয়মই এই যে, যে ধার দেয় সে শোধ পায় না, পায় আর একজন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়াই ধার দেওয়া ভাল। তাহা হইলে নিরাশ হইতে হয় না।

ভারতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৫

৩

ক

পৃথিবী একটা নীরব দুঃখময় মহানাট্য। মনুষ্যের প্রত্যেক বাসনা, প্রত্যেক অনুভূতি, প্রত্যেক হৃদকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃখাভিনয় হইতেছে—ইহা শোনাও যা—অঙ্কুর উদগমের শব্দ শোনাও তা। যদি আমরা অন্যের দুঃখ নিজের মত করিয়া অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে পৃথিবী হয় স্বর্গ, নয় নরক হইয়া উঠিত।

খ

আমাদের জীবন তৃতীয় খণ্ড উপন্যাসের মধ্য ভাগ। গোড়া নাই আগা নাই—মাঝের খানিকটা ; আর, ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই কল্পনা। এই অবোধ-গম্য রহস্যের মধ্যে যে একটা বিস্ময় ঔৎসুক্য আছে তাহাতেই জীবনের জীবনত্ব ; যখনি সে ঔৎসুক্য দূর হইবে, অনুধাবনা শেষ হইবে, তখনি আমাদের সুখ দুঃখের অবসান—তখনি নির্ব্বাণ। সুতরাং পূর্ণ জ্ঞান সৃষ্টিতে নাই, স্রষ্টারই তাহা একমাত্র উপাদান।

গ

স্থির নিরাশা ভাল, না সন্দেহ ভাল? সন্দেহে আশা আছে, কিন্তু নিরাশা আশাহীন,—তবুও নিরাশা ভাল, কেন না সন্দেহে যে আশা আছে তাহা নিরাশা হইতেও ভয়ানক। জর্জ এলিয়টের কথায়, What we often call despair is nothing but the strained eagerness of unfed hope. এই ক্ষুধার্ত্ত আশা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তফাৎ এই যে একটা কষ্টের মধ্যে মুক্তি, অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য অদৃষ্টের প্রতি নির্ভরবল ; আর একটা কূলকিনারাহীন যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ। লোকে যখন খেলায় যথাসর্ব্বস্ব পণ করে, তখন হৃদকম্পমান অবস্থায় যেমন হার জিতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, বাজি হারিয়া গেলে তাহা হইতে অনেক প্রশান্ত হইয়া আসে। আমরা জীবনের অধিকাংশ সময়েই জুয়া খেলিতেছি,—সময়ে সময়ে সামান্য জিনিষের জন্য আমাদের সমস্ত সুখ শান্তি, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পণ রাখিতেছি, কিন্তু হাত উঠিয়া গেলে যখন দেখি আমরা সর্ব্বস্বান্ত, তখন আমরা রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। যাহারা হারিবে জানিয়াও সমস্ত পণ করে তাহারা পাগল,

কিন্তু এরূপ পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নহে, অন্ততঃ অর্দ্ধেক—কেন না রমণীরা কি?

সূর্য্যমুখী সকালে উর্দ্ধমুখী হইয়া ফুটে, তাহার পর সমস্ত দিন সূর্য্যের আশায় থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা হতাশ্বাসভাবে নিম্নমুখী হইয়া ঝরিয়া পড়ে। কতকগুলো মানুষ তেমনি জগতে আছে ; তারা সারা জীবন হাঁ করে কোন মুখের পানে চেয়ে শেষে ঝরে যায়—সে চোখ আর তার দিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফেরে না। কিন্তু গোলাপ জুঁই প্রভৃতির মত কতকগুলি ফুল আছে যাদের সকলেই আদর করে বুকে পরে। ইহাই সংসারের নিয়ম। তবে সূর্য্যমুখী, কাঁদিয়া মরে কেন? সহস্র ক্রন্দনেও সে ত আর গোলাপ হইয়া ফুটিবে না? সূর্য্যমুখী সে চিরদিন সূর্য্যমুখই থাকিবে!

ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৮

৪

ক

লোকে ভালবাসে—বাসিয়া ভাবে, তাহার ভালবাসার ব্যক্তিকে কিনিয়া রাখিতেছে। কি নির্ব্বোধ! তুমি ভালবাসিতেছ বলিয়াই যে, তাহার তোমাকে ভালবাসিতে হইবে, এমন কি কথা! তুমি ভালবাস, অতএব তোমার কষ্টের জন্য সে দায়ী, এ কোন দেশী যুক্তি? তুমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছ, সেইজন্যই সে তোমার প্রতি হাসিয়া চাহিবে, এ কিরূপ প্রত্যাশা? তুমি আদর চাহ, সে আদর করে না, অতএব সে নিষ্ঠুর! তুমি আদর করিতে যাও, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধ দৃষ্টিতে চাহে ; তুমি অপমানিত হইয়া ভাব, সে Tyrant, কিন্তু ভাবিয়া দেখ Tyrant কে? তুমি ভালবাস বলিয়াই ভালবাসা চাহ, ইহা হইতে Tyranny কোথায়? যদি ভাল চাও, এ কুবুদ্ধি ত্যাগ কর। যদি প্রত্যাশাহীন হইয়া হাসিমুখে ভালবাসিতে পার ত বাস—কাহারো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, নইলে সরিয়া পড়—মর, যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু এই উপদেশটি মনে রাখিও, আপনাকে কাহারও উপর Thrust করিও না।

খ

অসুখ কাহাকে বলে? অর্থাৎ অভাব। শারীরিক অসুখ অর্থাৎ শরীরের স্বাস্থ্যের অভাব ; মনের অসুখ, আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্তিজনিত অভাব। অনেক সময় মনে হয়, এ অভাব, এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতো—যদি কেবল অন্যের অনুগ্রহ পাওয়া যেত। কি ভুল ; ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবন রক্ষা করিতে যাওয়া। তার চেয়ে মরণ ভাল, এটা কেন লোকে ভাবে না। পড়ে আছি একলা, জানালার দিকে চেয়ে। গাছপালা আকাশের দিকে চেয়ে

উৰ্দ্ধমুখে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিছে। আকাশ তারি মধ্যে ব্যাপ্ত! সে কেবল বুঝতে পারে না, কেবল ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে পিপাসিত নেত্রে চেয়ে আছে। আমরাও ঐরূপ করি। কেবল হাহাকার! কি যে চাই বুঝি বুঝিনে? মমতা, করুণা, সহানুভূতি, প্রেম,—একি আকৃতিময় বস্তু! যে তাকে ধরতে চাওয়া? সে ত সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; তবে কেন? শুধু কটাক্ষের জন্য, শুধু কথার জন্য, শুধু ভাষার জন্য, শুধু প্রকাশিত ভাবের জন্য ব্যাকুলতা।

গ

যদি আমরা আমাদের কাতর আর্ত্তনাদের সময় চারিদিক প্রফুল্ল দেখি—তখন আমাদের হৃদয় আরো শুষ্ক হয়ে যায়; সে প্রফুল্লতা কেবল মরুর প্রজ্জ্বলন্ত হাসি বলিয়া মনে হয়, আমরা তখন মৃত্যুকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া তাহারই ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই! কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সংসাব unsympathetic নয়, সংসারে ক্রন্দন বৃথা যায় না; তবে মিথ্যার ভ্রমে পড়িয়া যাহারা কাঁদে—যেমন শিশুর চাঁদের জন্য ক্রন্দন—তাহারি অদৃষ্টে সহানুভূতি নাই। কিন্তু বাসনা মিথ্যা হইলেও কষ্ট মিথ্যা নহে। শিশু যদি তাহার অকারণ কষ্টেও সে মাতার স্নেহ-সান্ত্বনা না পায়, তাহা হইলে কাঁদিয়া তাহার জীবন শেষ হইতে পারে; আর আমরা ত জীবনে প্রতিদিনই দেখিতেছি, সহানুভূতির অভাবে মানুষ নিঃশব্দে জীবন ত্যাগ করিতেছে! তবে কি করিয়া বল সংসারে ক্রন্দন বৃথা যায় না?

ঘ

আঃ কি প্রশান্তি! মৃত-মুখ কি প্রশান্ত! সংসারে প্রার্থনা করার কিছু নেই, আদরণীয় কিছু নেই, কেবল মৃত্যু! মুহূর্ত্তে সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান। আচ্ছা জ্বালা যন্ত্রণা! সংসারে কি আনন্দ নেই? আছে মৃত্যুতে। সেই আনন্দের ছায়া মাত্র জীবনে অনুভব করা যায়। যদি অত আনন্দ সম্মুখে, যদি অত প্রশান্তি সম্মুখে, তাহা হইলে কষ্টই বা কেন? এ সমস্তই দুদিনের জন্য, তাহার পর চিরনির্ব্বাণ! দুদিনের জন্য কেন হিংসা দ্বেষ, কেন মানাভিমান, কেন অহংকার, কেন বাসনা কামনা? প্রশান্তি, আনন্দ—পূর্ণানন্দ আমাদের সম্মুখে বিরাজিত! আর সমস্ত ভুলিয়া যাও, কেবল মৃত্যুর প্রশান্ত মূর্ত্তি ধ্যান কর।

ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৮

৫

আকাশ-কুসুম

বৈশাখের মধ্যাহ্নসূর্য্যের খরতাপে উত্তপ্ত বালুকাময় পথে অনাবৃতপদে তৈলকুম্ভ মস্তকে করিয়া চলিতে চলিতে নির্ব্বোধ কলু কত সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে; তৈল বিক্রয় করিয়া কিরূপে ভবিষ্যতে সুখৈশ্বর্য্যের দুরন্ত কামনা পূর্ণ করিবে, তাহাই ভাবিতেছে; কল্পনা বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যতের অনুসরণ করিল, বর্ত্তমান তিরোহিত হইল—ভবিষ্যৎ

করতলগত ;—অমনই সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ মধুর স্নিগ্ধতা বর্ষণ করিতে লাগিল, উত্তপ্ত বালুকা কুসুম-সুকোমল, স্নিগ্ধ মর্ম্মরে পরিণত হইল। সুখের তীব্র দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া অভিমানে মস্তক নড়িল, অমনই তৈলকুম্ভ ভূমিসাৎ হইল, সুখস্বপ্ন মুহূর্ত্তে শূন্যে বিলীন হইল,—অমনই আকাশে যেন দ্বাদশ আদিত্যের উদয় হইল, পদতলের বালুকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হইল। ললাটে মৃত্যু-স্বেদ দেখা দিল। ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে অন্ন-গ্রাস দিবার আর সম্বল নাই! সুখ-স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কেন জীবন-লীলা শেষ হয় না?

এই সুখ-স্বপ্নের নামই আকাশ-কুসুম। যাহারা সুখ-স্বপ্ন দেখে, যাহারা আকাশ-কুসুমের রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়, তাহারাই সংসার পথে নিতান্ত অর্ব্বাচীন ; তাহারা সুখের অন্বেষণে যাইয়া দুঃখের ভার লইয়া ফিরিয়া আইসে, সংসারাতীত প্রীতি বিতরণ করিতে যাইয়া কেবল অপ্রেমের বীজ বপন করে ; ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে যাইয়া তাহাদের ভাগ্যে কেবল তীব্র হলাহলই উঠিয়া থাকে। এই কল্পনাপ্রিয় আকাশ-কুসুম-মুগ্ধ লোক বাস্তবের অলঙ্ঘ্য সীমা বিস্মৃত হইয়া পদে পদে প্রতিহত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন? স্বপ্ন না দেখিলে চলে না? বর্ত্তমানের বাস্তব লইয়া কেন মানুষ সন্তুষ্ট হয় না? মেঘরাজ্যের জন্য কেন মানুষ লালায়িত হয়? ভবিষ্যতের কুহকজালে কেন মানুষ অন্ধ হয়?

এ 'কেন'র উত্তর, স্বপ্ন দেখা মানুষের স্বভাব ; স্বপ্ন না দেখিয়া মানুষ থাকিতে পারে না, বোধ হয় তাহা হইলে মানুষ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়াই যাইত। এই ক্ষুদ্র বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের হস্তগত বাস্তব লইয়া সারাটা জীবন অতিবাহিত করা!—ভাবিতে হৃদয়ের শোণিতস্রোত রুদ্ধ হইয়া আইসে। অনন্তাভিমুখী মানবাত্মা অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাই বর্ত্তমান ছাড়িয়া অপরিসীম ভবিষ্যতের অনুসরণ করে। যে অভীষ্টলাভে আজ মানুষ ব্যর্থ-মনোরথ হইতেছে, কালে তাহা লাভ হইবে ;—এই আশায় বুক বাঁধিয়া মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে আপন শক্তি নিয়োগ করিতেছে। এ আশা না থাকিলে কোন্ মানুষ কাজ করিতে সমর্থ হইত? মুহূর্ত্তের জন্যও কে জীবনপথে স্থির থাকিতে পারিত? তাই বর্ত্তমানের বাস্তব অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের কল্পনা লইয়াই মানুষ জীবিত রহিয়াছে, মানুষ—মানুষ হইয়াছে। এ কল্পনা ছাড়িলে আর জীবন কি?

তবে আকাশ কুসুম এত উপহাসের বিষয় কেন? কল্পনা-জীবী লোক সাধারণের এতটা কৃপাপাত্র কেন? আকাশ-কুসুম দেখে না কে?—তবে স্থানবিশেষে তজ্জন্য এতটা নিন্দা কেন?

দশজনে যে স্বপ্ন দেখে, তাহা বাস্তবের আকার ধারণ করে ; তাই, তাহা যে স্বপ্ন, সে কথা ক্রমে লোকে বিস্মৃত হয়। তোমার স্বপ্ন যদি দশজনের স্বপ্নের সহিত না মিলিল, তাহা হইলে অমনই দশ দিক হইতে দশজনে বলিয়া উঠিল, "লোকটা ক্ষেপিয়াছে, চোক্ চাহিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছে!" অমনই লোক-সাধারণ তোমাকে অবজ্ঞার চক্ষে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। এই দশের সহিত তোমার স্বপ্নের পার্থক্য যত বেশী, ততই তোমার বাতুলতা সুনিশ্চিত। দশজনে যাহা চায়, তুমি তাহা যদি পরিহার কর, দশজনে যাহার বিষয় ভাবে না, তুমি যদি স্বপ্ন-চরের ন্যায় তাহারই অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমার মতিচ্ছন্নের আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন কি? তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, যদি স্বপ্ন

দেখিতেই হয়, তবে দশজনের মত স্বপ্ন দেখিবে, নহিলে ডন্ কুইক্সোটের কথা স্মরণ থাকে যেন! নেহাৎ যদি সৃষ্টিছাড়া স্বপ্ন দেখ, তাহা হইলে, তাহা মনে মনেই রাখিবে। সাবধান, যেন লোকের কাছে প্রকাশ করিও না। স্বপ্ন জীবনে পরিণত করা?—সে ত বাতুলের কথা। আকাশ-কুসুম আকাশেই শোভা পায়, পৃথিবীর মাটিতে তাহা রোপণ করিবার বৃথা প্রয়াস কেন? তাহা হইলে পদে পদে লাঞ্ছনা! কল্পনার কথা কবিতাতেই শোভা পায়, জীবনের কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে সে সব কেন? তোমাদের শেলী যদি আপনার আকাশ-কুসুম কাব্যেই রাখিয়া যাইতেন, তবে কে তাঁহার নিন্দা করিতে সাহসী হইত? কিন্তু তিনি, আকাশ-কুসুম পৃথিবীতে ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন, তাই ত তিনি এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, নির্ব্বাসিত হইয়াই জীবন যাপন করিলেন। তুমি যদি দশজনের মত না হও, তবে দশজনের বিচারের হাত এড়াইবে কিরূপে? বলিবে, অন্যায় বিচার। দোষ কাহার? তুমি কেন দশ জনের মত হইলে না? তাহা হইলে ত লোকে তোমায় ভুল বুঝিত না।

যাহা কিছু আমাদের বুদ্ধির অতীত, যাহা কিছু তমসাচ্ছন্ন, তাহার সহিতই ভয়ের কারণ মিশিয়া থাকে। তুমি যদি এমন কথা বল, যাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না,—তোমার প্রাণের ভাবের গতি যদি এমন হয়, যে সাধারণ হৃদয় তাহার বক্র ও জটিল গতির অনুসরণ করিতে পারে না, তবে সাধারণ লোক তোমায় ভুল বুঝিলে তুমি দোষ দিবে কেন? অবিচারে বা নির্য্যাতনে কাতর হইবে কেন? যদি অদৃষ্টের বিযদৃষ্টিতে পড়িয়া সাধারণ বুদ্ধির অতীত কোন ভাবের অধিকারী হইয়া থাক; যদি ঐকান্তিক, আত্মহারা ভালবাসায় হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে, তবে যদি সুখে শান্তিতে থাকিতে চাও, তাহা লোক-চক্ষুর অন্তরালে, আপন হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে গোপনে রক্ষা করিবে। "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।" কে তোমার সততায় বিশ্বাস করিবে? সংসার দশজনের জন্য, দশজনের উপযোগী—তোমার ও-অসাধারণ ভাব সংসারের বাজারে চলে না। যদি মানে মানে থাকিতে চাও, ও জিনিস বাহির করিও না। সংসারের কষ্টিপাথরে উহা টিঁকিবে না। লোকে হিতে বিপরীত বুঝিবে।

তবে "Nothing so successful as success." একবার যদি সেই সর্ব্বজনপূজিত সাফল্য লাভ করিতে পার, ত সে স্বতন্ত্র কথা; তখন তোমার সে আকাশ-কুসুম আর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা হইবে না, তুমি সংসার-সংগ্রামে বিজয়ী, সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে; তখন তাহা মহাপ্রাণতা ও দূরদৃষ্টিতে পরিণত হইবে। একদিন বুদ্ধ ও খৃষ্টের, আলেকজাণ্ডার ও আকবরের আকাশ-কুসুম আকাশ-কুসুমই ছিল। সে স্বপ্নের কথা শুনিয়া একদিন কে উপহাস করে নাই? আর আজ? সে স্বতন্ত্র কথা।

"এত বড় আকাশ-কুসুম দেখিলে কে নিন্দা করে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্পনা লইয়া থাক কেন?"

ফুল ছোট বড় আছে, মানুষ ছোট বড় আছে, আকাশ-কুসুম কেন ছোট বড় হইবে না? আর তাই বা কি? বিফল-কাম লোকের আকাশ-কুসুম কি বড় হইলেই রক্ষা পাইয়াছে? ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য কি কখন কোন চেষ্টা করা হয় নাই? কেহ কি সে সুখ-স্বপ্ন দেখে নাই? কিন্তু বিফল চেষ্টা, বিফল কল্পনার কে খোঁজ খবর

রাখে? জীবন সংগ্রামে পরাজিত যে, কে কবে তাহার জীবনী লিখিয়াছে?

যদি সুখে শান্তিতে থাকিতে চাও, আকাশ-কুসুম দেখিও না, আকাশ-কুসুমের শোভায় বিমুগ্ধ হইও না। যদি সে কথা প্রকাশ কর, যদি আকাশ-কুসুম পৃথিবীতে ফুটাইতে চাও, তবে সংসারের ক্রুশের কথা স্মরণ রাখিও। আর যদি তোমার সে স্বপ্নের কথা প্রকাশ না করিয়া মনে মনে রাখিয়া দেও, তাহা হইলেও শান্তি নাই—আজীবন অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। তাই বলি, হে কবিতাপ্রিয়, কল্পনাজীবী, অল্পবুদ্ধি লোক, আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখিও না, কল্পনার পাখায় নির্ভর করিয়া মেঘরাজ্যে উড়িতে চাহিও না, সংসারের প্রস্তরে পড়িয়া তোমার অস্থি চূর্ণ হইবে। ইহাতেও যদি তুমি নিরস্ত না হও, তবে বলি, সংসারের নিন্দা প্রশংসা, অনুগ্রহ, অবিচার অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া আপন আকাশ-কুসুমের অনুসরণ কর, তোমার মস্তকের উপরকার প্রখর সূর্য্যকিরণ, পদতলের উত্তপ্ত বালুকা স্নিগ্ধ ও সুখস্পর্শ হইবে। তাহা হইলে তোমার হার হইলেও জিৎ।

ভারতী, শ্রাবণ ১৩০০

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

হত্যাকার্য্যই অমঙ্গলজনক, বোমা নিক্ষেপে হত্যার প্রয়াস ঘোরতর অমঙ্গলের সংঘটয়িতা। একদিকে দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিভেদে নরহত্যা ইহাতে অনিবার্য্য, অন্যদিকে এইরূপ গুপ্ত হত্যায় জনসাধারণের মনে যেরূপ বিভীষিকাময় অশান্তি বিস্তার করে, তাহা অতিশয় শোচনীয়। দেশের হিতস্বংকল্পী বালকদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া আমরা যারপর নাই সন্তপ্ত হইয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি কেবল ইহাই নহে, ডাকাতী লুটপাট করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা ইহাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেশের আশা ভরসা কোথায়! "অন্যায় অত্যাচারকে কার্য্যোদ্ধারের নীতি করিলে দেশের মঙ্গল না হইয়া কেবল উচ্ছৃঙ্খলতাই বর্দ্ধিত করিবে এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামকরূপে কাণ্ডজ্ঞানহীন উম্মত্ততায় পরিণত হইয়া মাতৃভূমিকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহারি হৃদয় বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।" ইহা রবীন্দ্রনাথের উক্তি।

কিন্তু নরেন্দ্র যে সকল বিজ্ঞ লোককে এই কার্য্যের উত্তেজক বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, তাঁহারা এতদূর দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ হইবেন যে নিরীহ অসহায় দেশের লোকের প্রতিও অত্যাচার অনুমোদন করিবেন, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অরবিন্দকে যাঁহারা জানেন—তাঁহারাও মনে করেন হত্যা কিম্বা চৌরকার্য্যে অনুমোদন করা ইঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু লোকে কি সম্ভব বা অসম্ভব মনে করে তাহার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন ঘটনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। তাহা বিচারে প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে অপরাধী নরেন্দ্র মুক্তির অভিপ্রায়ে এখন যাহা বলিবে, প্রচুর প্রমাণ ব্যতিরেকে সে সকল কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা সাধারণ সহজ বুদ্ধির কথা এবং ইংরাজ আইনেও

এইরূপ বলে। নরেন্দ্রের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য গভর্ণমেন্টের তরফে যেরূপ খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছে, অরবিন্দের পক্ষেও সেইরূপ কোন খ্যাতনামা উপযুক্ত ব্যরিষ্টার নিযুক্ত হইলেই তখন তাঁহার কূট প্রশ্ন ও বক্তব্য শুনিয়া বিচারক সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারিবেন।

অরবিন্দের ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনী সুযোগ্য ব্যারিষ্টার নিয়োগে ভ্রাতার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ জন্য সাধারণের নিকট অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু শুনিতেছি, অনেকেই এজন্য দান করিতে ভীত। আমরা এ ভয়ের কারণ বুঝিতে পারি না। অরবিন্দ যতক্ষণ বিচারে রাজবিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন না হন, ততক্ষণ তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ইংরাজি আইনই এইরূপ। এমন কি ক্ষুদিরাম খুণ করিয়াছে, এ কথা নিজ মুখে স্বীকার করিলেও, জজ কর্ণডাফ্ উকীলদিগকে তাহার পক্ষ সমর্থনে অনুরোধ করেন। জষ্টিস নর্ম্মাণকে যে খুন করিয়াছিল সে রক্তাক্ত হস্তে ধরা পড়িলেও তাহার পক্ষে এখানে কৌন্‌সিলি দাঁড়াইয়াছিলেন। যে সকল অপরাধে নির্ব্বাসন বা মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা, সেই সকল স্থলে এইরূপই নিয়ম। ইংরাজের আইন যে এ সম্বন্ধে কতদূর ন্যায়করুণাসঙ্গত তাহা ইহা দ্বারা দেখা যায়। নির্দ্দোষিতা প্রমাণের অবসর না দিয়া কাহাকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় না। তবে অরবিন্দের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য দেশের লোক সাহায্য করিলে গর্ভণমেন্ট ক্রুদ্ধ হইবেন ইহা মনে করাও গভর্ণমেন্টের ন্যায়পরতার উপর সন্দেহ প্রকাশ। এ সময়ে কি দেশী কি বিদেশী, ন্যায়ানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রীমতী সরোজিনীকে মুক্ত হস্তে ভিক্ষা দেওয়া উচিত।

এমপায়ার সংবাদপত্র তীব্র কটাক্ষে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছে যে, নাম লুকাইয়া দান করিবার কারণই এই যে, তাহারা অরবিন্দকে দোষী ভাবিতেছে। হায়! সত্যের প্রতি ইহারা কি এতই অন্ধ!! গভর্ণমেন্ট যাহাকে সন্দেহ করেন তাহাকে নির্দ্দোষ বিশ্বাসে অর্থ সাহায্য করিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় পাছে গভর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হইতে হয়, এই আশঙ্কাই যে এই কার্য্যের কারণ তাহা ত একজন বালকেও বুঝিতে পারে। তবে এরূপ ভীরুতা দেশের লোকের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার বিষয় এবং গভর্ণমেন্টের প্রতিও মর্য্যাদাজনক নহে। নরেন্দ্র যখন অন্য সুশীল সজ্জনকেও তাহাদের দলে টানিতেছে, তখন এ পক্ষীয় ব্যারিষ্টারের কূট প্রশ্নে ইহার সত্য মিথ্যা মীমাংসিত না হইলে গভর্ণমেন্টকে লোকে পক্ষপাতী বিবেচনা করিতে পারে। তাহা প্রার্থনীয় নহে। গভর্ণমেন্টের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আমরা এরূপ বলিতেছি।

যে দিন হইতে বোমা বিভ্রাট ঘটিয়াছে, সেই দিন হইতে দেশের সকলেই দুঃখ-সাগরে মগ্ন। বালকদিগের এ কিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি। তাহারা দেশের মঙ্গলে ব্রতী হইয়া অমঙ্গলকেই বরণ করিয়া বসিল! অত্যাচার নিবারণ মানসে অত্যাচারেই ব্রতী হইল। ভারতের যথার্থই দুর্ভাগ্য! বোমা নিক্ষেপের প্রথম ভয়ঙ্কর ফল, নিরীহ অসহায় মহিলা দুইটির জীবননাশ। ইঁহারা আবার কাহার স্ত্রী কাহার কন্যা? কনগ্রেসের পক্ষপাতী, ভারতের বিশেষ বন্ধু, সহৃদয় কেনেডি মহোদয়ের। এই হত্যায় কাহার না অন্তর্দাহ হইয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে দুর্ম্মতি বালকগণের বুদ্ধির প্রতি ধিক্কার না জন্মিয়াছে! যদি তাহারা ন্যায় পথে থাকিয়া দেশের

কার্য্যে প্রাণপাত করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগের জীবনপাত সার্থক হইত—এবং দেশে সাধুদৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে পারিত! হায়! এখন তাহাদের এই কার্য্যফলে অনর্থক দোষীর সহিত কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও অসহ্য পীড়ন সহ্য করিতে হইতে পারে, এবং এই পীড়নের শেষ কোথা, ভাবিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে! ইহা হইতে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার ইহা শিক্ষা লাভ করা উচিত, যে এরূপ কোন অন্যায় গর্হিত উপায়ে আমাদের পরিত্রাণ হইবে না। আমাদের পরিত্রাণ একতায়। অবৈধ গুপ্ত উপায় অবলম্বনে রাজবিদ্রোহী বালকেরা সেই একতার মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছে।

আমাদের মধ্যে চিরদিনই এই একতার অভাব। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করাই আমাদের ধর্ম্ম। চণ্ডাল যবন ম্লেচ্ছ—এ সকল নাম ঘৃণাসূচক সম্ভাষণ। নীচ বর্ণের হিন্দু গৃহে আসিলেও গৃহের ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমরা দূষিত বিবেচনা করি। ইংরাজের শিক্ষাতেই এত দিনে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, একতা ভাল। হিন্দু মুসলমান সকলেই ইহার একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে "ভারতীয় সমগ্র মুসলমান সমিতি" নামক সমিতির একটি শাখা স্থাপিত হইল। ইহার একটি উদ্দেশ্য ভারতের সর্ব্বজাতির মধ্যে সদ্ভাব এবং ঐক্যস্থাপন।—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রদ্ধাস্পদ আমির আলি সভাপতির আসনে বসিয়া এইরূপ বলিয়াছেন; "হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয়, এই কয় বৎসর ধরিয়া অনবরত আমি সেই চেষ্টা করিতেছি। কারণ ভারতে সর্ব্বসাধারণ জাতির স্বার্থমঙ্গল একই সূত্রে গ্রথিত।" কিন্তু ইচ্ছা এইরূপ হইলেও কার্য্যতঃ আমরা ত প্রতিদিন তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছি। বঙ্গচ্ছেদের পর হইতে হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাবের আশা প্রতিদিন ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশহিতৈষীগণও ভেদবুদ্ধিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। সাম্যপন্থী চরমপন্থীর অনৈক্য বশতঃই কনগ্রেসের পতন এবং সর্ব্বসাধারণকে তুচ্ছ করিয়া এই বালক বিদ্রোহীগণ দেশপাতে প্রবৃত্ত!

ইংরাজ শাসনই আমাদের প্রকৃত হীনতার কারণ নহে। যদি কখনও সত্য সত্য জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে আমরা সমগ্র ভারতবাসী দৃঢ়গ্রথিত প্রাচীরের ন্যায় এক হইতে পারি, তখনই সহস্র ঝটিকাঘাতে অটল থাকিয়া, আমরা একটা মহৎজাতি হইতে পারিব। বাস্তবিকই ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের শত্রু নহেন, আমাদের অনিষ্ট করাই গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে, আমাদের মঙ্গলের প্রতিও গভর্ণমেণ্ট উদাসীন নহেন। ইংরাজ অধীনে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, নানাবিষয়ে দেশের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তবে এ গভর্ণমেণ্ট আমাদের আদর্শ রামরাজ্য নহে ইহা সত্য। যেখানে শাসয়িতা এবং শাসিতের মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষ ঘটে, সেইখানেই আমরা পেশিত হই। কিন্তু এরূপ অত্যাচার স্বজাতিশাসিত রাজ্যেও হইয়া থাকে। আয়ারল্যাণ্ড, পারস্যদেশ, রুষিয়া তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আসল কথা ক্ষমতাশালী ও অক্ষমের মধ্যে, প্রভু ও দাসের মধ্যে, শাসয়িতা ও শাসিতের মধ্যে এরূপ দ্বন্দ্ব চিরকালই থাকিবে। বৈধ উপায়ে, বিচার বুদ্ধিতে, একতায়, দৃঢ়সঙ্কল্পে কাজ করিলে কতক পরিমাণ অত্যাচার অবিচার আমরা নিবারণ করিতে পারি। যোগ্যতার জয় সর্ব্বত্র। যেমন শুনিয়াছি, কোন কোন ইংরাজি ব্যাঙ্ক স্বদেশী ব্যবসায়ে ক্ষতি সম্ভাবনা

না থাকিলেও টাকা ধার দিতে চাহে না। দেশী ব্যাঙ্ক খুলিয়া সহজেই আমরা এরূপ নির্ভরতা ছিন্ন করিতে পারি। দেশের সাধারণ লোকের এদিকে অনেক পরিমাণে লক্ষ্য পড়িয়াছে। কিন্তু অল্প জমিদারদিগকেই এদিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। যখন ধনী মধ্যবিত্ত সকলে মিলিয়া দেশের এইরূপ উন্নতির লক্ষ্যে আপনাপন স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিবেন, তখনি আমরা অধীন হইয়াও যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করিব। যদি আমরা মনে করি এরূপ একযোট হইয়া কাজ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তাহা হইলে জাতিগত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

ইংরাজের অন্যায় কার্য্যেও দেশের লোক একযোট হইয়া প্রতিবাদ করিলে স্থলবিশেষে কিরূপ সুফল হয় ব্র্যানসনের প্রতি দেশীয় এটর্নি ও প্লীডারগণের বয়কট তাহার একটী দৃষ্টান্ত। অনেক স্থলে সমবেত প্রতিবাদে আপাততঃ কোন ফল দৃষ্ট না হইলেও, তাহার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অন্যায় দেখিলে যেমন তাহার প্রতিবাদস্বরূপ আমাদের অসন্তোষ প্রকাশ আবশ্যক, তেমনি বিনা কারণে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাও সুনীতি সঙ্গত নহে। রাজা প্রজার মধ্যে সদ্ভাব সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় এবং উভয় পক্ষ হইতেই ইহার চেষ্টা আবশ্যক।

নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল সংসারে নাই। আমরা যাহাকে খুব অমঙ্গল জ্ঞান করি, তাহার মধ্য হইতেও ক্রমশ একটু মঙ্গল ফুটিয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর বোমা বিপ্লবের ফলে রাজা প্রজা উভয়েরই জ্ঞানচক্ষু খুলিবে এইরূপ আশা করা যায়। দুর্ব্বুদ্ধি প্রজাগণও এরূপ কার্য্যের ভীষণতা উপলব্ধি করিবে এবং রাজাও বুঝিতে পারিবেন একমাত্র দলননীতিই রাজশাসনের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে।

বর্ত্তমান অরাজকতার জন্য গভর্ণমেণ্টও যে দায়ী, রাজনীতিবিশারদ চিন্তাশীল অনেক ইংরাজই এখন এই কথা বলিতেছেন। কোন বিপ্লব হইলেই বুঝিতে হয় রাজব্যবহারজনিত অসন্তোষই তাহার মূল কারণ। ইহা বুঝিয়া তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করাই রাজ কর্ত্তব্য। লর্ড কর্জ্জন প্রমুখ গভর্ণমেণ্ট প্রজার সমবেত ইচ্ছায়, তাহার ন্যায়-আবেদনে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াই দেশে যে অসন্তোষ অশান্তির কারণ ঘটাইয়াছেন এ ঘটনা তাহারই ফল।

ভারতবর্ষ লক্ষকোটি লোকের নিবাসভূমি। এই কোটি কোটি লোকের মধ্যে মুষ্টিপরিমেয় নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ যদি এইরূপ আকারে তাহার অসন্তোষ প্রকাশ করে, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বিশেষতঃ যাহারা এ কার্য্য করিয়াছে তাহারা সকলেই প্রায় অপরিণতবুদ্ধি, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালক। এখন যদি এইরূপ দুই চারিটা বাতুল ভ্রান্ত বালকের আচরণে এবং মুক্তিলোলুপ নরেন্দ্রের কথায় গভর্ণমেণ্টও যথেচ্ছাচারী বালকের ন্যায় সামান্য ছুতানাতায় প্রজাদলন আরম্ভ করেন, তবে গভর্ণমেণ্টও অকারণে প্রজাপীড়নের কারণস্বরূপ হইবেন। দেশের লোক সত্যই ইংরাজ রাজ্যের ধ্বংস চাহে না।—নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই আমরা তাহা চাহি না,—আমরা জানি আমরা এখনো সেজন্য প্রস্তুত নহি,—তাহাতে আমাদেরই অমঙ্গল। তবে আমরা কি চাই? আমরা একটু সুবিচার চাই, আমরা রাজনৈতিক উচ্চাধিকার চাই—আর মানুষে মানুষের নিকট যে আচরণ প্রত্যাশা করে, আমরা ইংরাজের নিকট সেই আচরণটুকু চাই—প্রভু ও

দাসসম্পর্কের পরিবর্ত্তে রাজপ্রজায় বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকু চাই। দেশের লোক অতি অল্পেই সন্তুষ্ট। যাঁহারা বলেন—'তাহা নহে'—তাঁহারা ভুল বলেন। ফ্লেচার—ব্রজেন্দ্রকিশোরের মোকদ্দমায় ক্লার্ককে সামান্য পাঁচশত টাকা দণ্ড করিয়াছেন, ইহাতেই লোকে সন্তুষ্ট। ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে, কিন্তু কর্ণডাফ যেরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন —তাহাতে সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে। কর্ণডাফের ন্যায় যদি সকলেই সহৃদয় পক্ষপাতশূন্য সুবিচারক হইতেন তাহা হইলে আমাদের আক্ষেপ বা অসন্তোষের কোনই কারণ থাকিত না। অপরাধী বা নিরপরাধ নির্ব্বিভেদে দেশের সকল লোকই এখন বিপন্ন। সমস্ত দেশে আশঙ্কা অশান্তি হাহাকার উত্থিত। সুবিচারের আশা সকলেরই মন হইতে অন্তর্হিত। এ সময় যদি গভর্ণমেণ্ট দলননীতির পরিবর্ত্তে লর্ড ক্যানিংএর অনুকম্পাপূর্ণ সুবিচার নীতির অবলম্বন করেন, তবেই প্রজার মন স্থায়ীবিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে; হাহাকার রবের পরিবর্ত্তে বৃটিশরাজের জয় জয়কারে রাজ্য ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৫

আমাদের কর্ত্তব্য

"তোমরা এ সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলে কেন?" নর্টনের এই প্রশ্নে নরেন্দ্র গোস্বামী উত্তর করিয়াছিল, "গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্য।"

দুই চারিখানা অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার কল্পনা মনে আঁটে তাহারা উন্মাদ নহে ত আর কি?

প্রফুল্ল চাকি ইনস্পেক্টর নন্দলাল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আত্মহত্যা করিবার সময় এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া মরিল, "তুমি বাঙ্গালী হইয়া এই কাজ করিলে?"

ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে? এই ভ্রান্ত বালকেরা মনে করিয়াছিল তাহারা সুশাসন ও স্বরাজপ্রাপ্তির জন্য যে বিদ্রোহনীতির অবলম্বন করিতেছে, তাহা দেশের জনসাধারণের অনুমোদিত; কেবল সাধারণ সকলেই এজন্য প্রাণ দিতে পারে না, উহারা তাহাদের হইয়া জীবন বলিদান ব্রত গ্রহণ করিল।

বালক-বুদ্ধির প্ররোচনায়, অসংযত কল্পনার মাদকতাসেবনে উন্মত্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা প্রকৃত কার্য্যের পথ ছাড়িয়া বিপথে ছুটিল। তাহাদের পরিশ্রম বিফল, সাধনা অসিদ্ধ, উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া পড়িল।

কর্জ্জনের বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থার সময় ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে জাতীয় ভ্রাতৃভাবের জ্বলন্ত উদ্দীপনা, স্বদেশী ব্রত গ্রহণ ও প্রচারের একান্ত একাগ্রতা দেখা গিয়াছিল। ১৬ই অক্টোবর ভারতবাসীর একটি স্মরণীয় দিন। সেইদিনকার বিরাট জনতায়, বয়নশিল্পের উন্নতি সংকল্পে লোকে চাঁদা দিয়া চাঁদা নিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকেরা এই সময় পদব্রজে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। বেঙ্গল

টেক্‌নিকাল বিদ্যালয়, ন্যাসনাল কলেজ, ন্যাসনাল ফণ্ড, প্রভৃতি সেই সময়কার উৎসাহের ফল। ইহা ছাড়া বঙ্গলক্ষ্মী মিল, ছোট ছোট বয়ন বিদ্যালয়, নানারূপ কলকারখানা স্থাপন, এবং স্বদেশীব্রত গ্রহণের উৎসাহে দেশ তখন জাগ্রত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা দেখিতেছি সেই উৎসাহ-বহ্নি উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর প্রভায় প্রজ্জ্বলিত না হইয়া সমভাবেই যেন অবস্থিত রহিয়াছে ; সেই আগ্রহ-স্রোত দিন দিন প্রবলতর ও পরিবর্দ্ধিত প্রবাহে সমগ্র বঙ্গভূমিকে উর্ব্বরা না করিয়া স্রোতের জল যেন একস্থানেই আটকা পড়িয়া গিয়াছে। ধনী, শ্রমজীবী, বা চাকুরে লোকের উৎসাহ স্বাভাবিক নিয়মে শিথিল হইয়া পড়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যে সকল নব্যদল দেশব্রত গ্রহণ করিয়া এই কার্য্যেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদেরও যেন এ সকলদিকে পূর্ব্বের প্রাণপণ উৎসাহের অভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া তাঁহারাও কি প্রকৃত কার্য্য ভুলিয়া থাকিবেন ; তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে অবহেলা করিবেন!

বঙ্গচ্ছেদের সময় স্বদেশী ব্রত গ্রহণের আরম্ভে আমরা যে পথ ধরিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় পথ। দেশে নানারূপ কল কারখানা, নানারূপ শিল্পের যাহাতে উন্নতি হয়, স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জ্জনের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তাহার দিকেই আপাততঃ আমাদের বিশেষ রূপে মনোযোগী হইতে হইবে। কিন্তু এখানেও ধৈর্য্যের আবশ্যক। দোকানদারের বিদেশী জিনিষ নষ্ট করিয়া, লোককে স্বদেশী গ্রহণে বাধ্য করিলে স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। একদিকে সকলকে বুঝাইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, অন্যদিকে দ্রব্য সুলভ করিবার ব্যবস্থা করা চাই। বস্তুতঃ, মূল্য সুলভতাই স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন ও বিদেশী বর্জ্জনের সহজ এবং স্থায়ী উপায়।

বস্ত্রের কল বহুব্যয়সাধ্য। তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় বয়নশিল্পের শিক্ষার আয়োজন করা উচিত। গ্রামে গ্রামে চিনির ছোট ছোট কল সহজেই হইতে পারে। বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, কলকৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় বিজ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ করিলে তাহারা যে শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোমা শিখিতে বালকগণ যদি বিলাত যাইতে পারে, তবে ব্যবসায় বাণিজ্য কলকারখানা শিখিতে কেনই বা বিলাত যাইতে পারিবে না। আসল কথা এই দিকে আকাঙ্ক্ষার গতি হওয়া আবশ্যক। শুনিতে পাই, এ দেশে কাচের চুড়ি বিক্রয় করিয়া বিদেশীগণ কোটি কোটি মুদ্রা দেশে লইয়া যান। ইহা বস্ত্রাদির ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় বস্তু নহে, সখের জিনিষ। ছেলেরা বুঝাইয়া অনেককেই ইহার ব্যবহারে নিবৃত্ত করিতে পারেন। আর দেশে যাহাতে ইহা প্রস্তুত হয়, বড়লোকেরা তাহার চেষ্টা করুন। কলকারখানা ছাড়া কতপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্র এ দেশে পড়িয়া আছে তাহার ঠিক নাই। বিলাত হইতে মাছ ফল দুধ প্রভৃতি নানাদ্রব্য এ দেশে টিনে আবদ্ধ হইয়া আসে, তাহার কৌশল শিখিয়া আসিলে আমাদের দেশের মাছ ফল প্রভৃতি বিদেশে পাঠাইয়া আমরা বিস্তর লাভ করিতে পারি। একান্ত প্রাণে, ধীর অধ্যবসায় সহকারে এইরূপ কার্য্যে মনোযোগী হইলে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর অতি সহজভাবে জাতীয় উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইতে থাকিবে।

যোগ্যতার জয় সর্ব্বত্র। ইংরাজ শাসনে উৎকণ্ঠিত হইবার কোনই আবশ্যক দেখি না। ভারতে বিদেশী শাসনের আবশ্যক আছে, তাই তাহারা আছে ; আবশ্যক বন্ধ হইলে আপনা হইতেই তাহারা চলিয়া যাইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। কেমন করিয়া তাহারা যাইবে আমরা জানি না, তাহা ভাবিবার দরকারও নাই। যখন অনাবশ্যক হইল তখন রোম আপনা হইতে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বোয়ারদিগকে পরাজয় করিয়াও ইংরাজ শেষে তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। কোন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সমগ্র সুইজরল্যাণ্ড যখন এক বাক্যে বলিল আমরা নরওয়ের অধীনতা মানিব না, তখন তাহাই হইল, ইহার জন্য একবিন্দু রক্তপতন হয় নাই।

প্রাকৃতিক নিয়ম পাশ্চাত্যজাতির উপর একরূপ, প্রাচ্যজাতির উপর অন্যরূপ নহে। আমরা যোগ্য হইলে আপনা হইতেই স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইব। সকলেই জানেন, হলাণ্ড সমুদ্রের সমতলভূমি। এই সমুদ্র কৌশলে প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া হলাণ্ডবাসী ইহা বাসযোগ্য করিয়াছে। ইয়োরোপ আমেরিকা পরিশ্রমপটু, অধ্যবসায়নিপুণ বলিয়াই বিজ্ঞান, শিল্পে, বাণিজ্যে সকল বিষয়েই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতেছে। মহৎজাতি হইবার গুণ সকল আমরা আয়ত্ত করিতে পারিলে কে আমাদের অধীন করিয়া রাখিতে পারে?

কিন্তু আমাদের গোড়াতেই গলদ। জাতিগঠনের প্রকৃত চেষ্টা আমাদের নাই বলিলেই হয়। চরিত্রবল বৃদ্ধির চেষ্টাই প্রকৃত জাতিগঠনের চেষ্টা। আধুনিক শিক্ষার ফলে বালকদিগের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য দেখা যায় তাহা চরিত্রবল নহে। পূর্ব্বকালে বালকগণের গুরুভক্তি প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু অধুনা বহুস্থলে নব্যদল স্ববুদ্ধি গর্ব্বে অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞলোকদিগকেও যেরূপ অশ্রদ্ধা অমান্য করে তাহা জাতীয় উন্নতির অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। বিলাতের ছাত্রগণ কিরূপ বাধ্যতার সোপান দিয়া চরিত্রবল সঞ্চয় করে তাহা আমাদের শিক্ষার বিষয়। ইয়োরপ আমেরিকার প্রতি গৃহে, প্রতি স্কুলে বালক বালিকাদিগকে যেরূপ শাসননিয়মে কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্যসাধন অতি সহজ হইয়া আসে। একজন আমেরিকাবাসী গল্প করিতেছিলেন, প্রতি স্কুলে বালকগণ অগ্নি পরীক্ষা দিতে বাধ্য। পাড়ায় আগুন লাগিলে কিরূপে তাহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া অগ্নি হইতে দ্রব্যাদি রক্ষা করিবে, অতি কঠোর নিয়মে তাহারা সে শিক্ষা পায়। এই শিক্ষার ফলে কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে শ্রেণীবদ্ধ বালকেরা প্রাণের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সদর্পে অনলে বিচরণ করে। আর এ দেশে কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে লোকে জনতা করিয়া দাঁড়াইয়া দেখে, কিন্তু বিপদে পড়িবার সম্ভাবনায় অসহায়কে রক্ষা করিতেও অগ্রসর হয় না। আমাদের দেশের প্রবাদই এই, চাচা আপন বাঁচা ; আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

স্বেচ্ছাসেবকদল পরোপকার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল যে প্রশংসার কাজ করিতেছেন এমন নহে ; যথার্থই জাতিগঠনের সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ইহা একটি উপায় মাত্র। সর্ব্ববিষয়ে আমাদের জাতিগঠনের চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের মহিলাগণ শিক্ষিত না হইলে যথার্থ জাতিগঠন হইতে পারে না। কিন্তু এতদিনেও আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে! গুরুকুল সমাচারপত্রে এ সম্বন্ধে একজন যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

লেখক বলেন, যে, "যদিও চরমপন্থীগণ প্রজাতন্ত্র, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি বিষয় লইয়া খুব আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু তথাপি জাতিভেদ সংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহারা নারীগণের অন্তঃপুরকারাগৃহের বাহিরে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ভোগের বিরোধী, অথচ তাঁহারা পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি বিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের নীচ জাতীয় দেশবাসীকে স্পর্শ করিতেও সঙ্কুচিত হন, অথচ সর্ব্ব বিষয়ে ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান অধিকারপ্রার্থী এবং রেলওয়ের কোন গাড়ি কেবল সাহেবদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট দেখিলে সহজেই আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্বেতাঙ্গের বিন্দুমাত্র প্রভুত্ব সহ্য করিতে চান না, অথচ অন্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াই ব্রাহ্মণগণ সমাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সংস্কার কেবল এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল লোকে সমাজ প্রভুত্বে পীড়িত, রাজনৈতিক অধীনতা তাহাদিগকে পীড়া দিতে পারে না। যাঁহাদের নিকট মনুষ্যের কোনরকম দাসত্ব একান্ত অসহ্য, তাঁহারাই বিধাতার আশীর্ব্বাদে স্বাধীনতা লাভের যোগ্য পাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতা সত্ত্বেও রোমে দাসত্ব ছিল। যে সমস্ত লোক পুরোহিতগণের ইঙ্গিতে অন্ধভাবে পরিচালিত এবং তাঁহাদের আদেশ নির্ব্বিবাদে আনতমস্তকে পালন করে, তাহারা স্বেচ্ছাচার অথবা নিয়মতন্ত্রে গঠিত প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া দ্বিধাশূন্যভাবে রাজপুরুষগণের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লয়। অতএব কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন কখনই সাধারণকে স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃভাবের কল্যাণময় পথে আনয়ন করিতে পারিবে না।"

ভারতী, ভাদ্র ১৩১৫

কর্ত্তব্য কোন পথে?

সংবাদপত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি বর্দ্ধমানে তিনটি বালক ধৃত হইয়াছে। বঙ্গেশ্বর ট্রেনে সেই পথ দিয়া যাইবেন শুনিয়া তাহারা নাকি তাঁহার হত্যা সঙ্কল্পে ঘুরিতেছিল। আগড়পাড়া ট্রেনেও আবার বোমানিক্ষেপের কথা শুনা যাইতেছে। এখনো যে বালকদিগের দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইতেছে না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এইরূপ অরাজকতা সংসাধনে শক্তিক্ষয় করিলে প্রকৃত মঙ্গলকার্য্যে শক্তি আসিবে কোথা হইতে?

ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে কয় জন? এই লক্ষ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ ভক্তসংখ্যা বোধ হয় অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। আর তাঁহারাই কি না ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের আত্মদান, পুণ্যশক্তি অন্যায় প্রয়োগে নিষ্ফল ব্যর্থ করিতে বসিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, দেশের কল্যাণ কল্পনায় দেশের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে সকল স্বদেশসেবকগণ অরাজকতার পক্ষপাতী, অনুরাগে জ্ঞানশূন্য না হইয়া এ সম্বন্ধে ধীরচিত্তে একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন —ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ইতিহাস কি বলে? বিদেশীয় দৃষ্টান্তেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? স্বাধীন রাজ্যের মধ্যেও রাজনিধনকামীদলকে সিদ্ধকাম হইতে দেখা যায় নাই। আর আমরা হৃতশক্তি, নিতান্ত অক্ষম দুর্ব্বল অধীন জাতি ; দু একটা ইংরাজহত্যা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, এরূপ মনে করা কি নিতান্তই মূঢ়তা নহে? কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের আগে যদিবা বুদ্ধির ভুল জন্মিয়া থাকে, অভিজ্ঞতায় অন্ততঃ এখন ত সচেতন হওয়া উচিত। এই অরাজকতার ফলে সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুলিসের অত্যাচার, শত নির্দ্দোষব্যক্তির শাস্তি, সংবাদপত্র দমন, কঠোরতর বিচারপদ্ধতির প্রবর্ত্তন প্রস্তাব প্রভৃতি দলননীতিতে ভারতবাসী দিন দিন নিপীড়িত, পেষিত হইয়া উঠিতেছে। এই পেষণ স্থায়ী হইলে কিছুদিনে যে আমরা একেবারেই নির্জ্জীব অসাড় হইয়া পড়িব না এমন কে বলিতে পারে? অন্ততঃ ইহা সুস্পষ্ট যে, উক্তরূপ মারকাট সঙ্কল্পে রাজপক্ষের ক্ষতি অপেক্ষা প্রজাপক্ষের ক্ষতি শত সহস্রগুণে অধিক। ইংরাজ যদি আজ প্রজাদমন অভিপ্রায়ে তোপের মুখে সমস্ত ভারতবাসীকে উড়াইয়া দিতে চায়—আমাদের এমন সাধ্য নাই যে আমরা তাহার প্রতিরোধ করি। বোম্বাই সহরের প্রজাবিদ্রোহে কি ঘটিল? বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর, ন্যায় বিচারের উপরই আমাদের একান্ত ভরসা। এ সত্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিলে চলিবে না। দেশের জন্য মৃত্যু পুণ্যকার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মৃত্যুতে যদি সিদ্ধির পরিবর্ত্তে অসিদ্ধি, মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল আনয়ন করে—তাহা হইলে? যাঁহাদের বাচাইবার জন্য তুমি মৃত্যুবরণে উদ্যত, তোমার কার্য্য যদি তাঁহাদেরই জীবন বলির কারণ হয়, তাহা হইলে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না!

ঝড়ের মুখে নৌকা চালাইয়া নৌকা ডুবান কোন নাবিকেরই কর্ত্তব্য নহে, শত্রুর অপরিমিত শক্তির মধ্যে মুষ্টিমেয় সৈন্য সঞ্চালনে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। স্বদেশ-সেবকগণ এরূপ অসম অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যুর সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। যেরূপ জীবনদানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়—যাহাতে মাতৃভূমির যথার্থ সেবা হয়—এখন সেই কার্য্যেই জীবনপাত করিতে হইবে ; অন্য কথায়,—এখন তাঁহাদের মরিবার সময় নাই, বাঁচিয়া কাজ করিতে হইবে।—সম্মুখে স্তূপাকৃতি কাজ পড়িয়া আছে ; তাহা দিয়া সযত্নে স্বরাজের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে ;—সেজন্য বিস্তর পরিশ্রম বিস্তর আয়োজনের প্রয়োজন, এক পুরুষের আজীবন ব্যাপী উদ্যমেও তাহা সম্পন্ন হইবে কি না সন্দেহ! উত্তেজনার মুহূর্ত্তে প্রাণদান অপেক্ষাকৃত সহজ বীরত্ব ; কিন্তু আমৃত্যু কষ্টকর অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগই অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক। ভারতবাসীর পক্ষে এই ব্রতই প্রশস্ত ব্রত। রাজাপ্রজার বিবাদে মারকাট অত্যাচারে সবলপক্ষেরই যখন জয়লাভের আশা নাই তখন দুর্ব্বল পক্ষের কোন কথা। ধীর সহিষ্ণুতায় অত্যাচার সহ্য করিয়া, সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, আত্ম সঙ্কল্পে অটল থাকিতে হইবে! গৃহবিবাদই আমাদের সকল অনর্থের মূল,—সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক। অধিক কি কথা ; এহেন জাতীয় মহাসমিতি, যাহার প্রভাবে আমাদের জাতীয় মহাদেহে গৌরবময় নবজীবন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাই আজি মতপার্থক্যজনিত অন্তর্ব্বিবাদে পুনর্বিচ্ছিন্ন, বলহীন,—মুমূর্ষুবৎ।—অতএব মাতৃভূমির পূজায় যতদিন আমরা সকলে অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ

লোকে বিবাদ বিসম্বাদ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে না শিখি, ততদিন কেবল মুষ্টিমেয় লোকের অবৈধ চেষ্টায় স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশা—বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন নীতির প্রচার, স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দেশভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষা বিস্তার, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে অর্থবল সংগ্রহ, সর্ব্বোপরি, একতার মহাবল সঞ্চয়ই আমাদের সফলতা লাভের মূল মন্ত্র। বলা বাহুল্য, অন্নপানের ন্যায় নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চায় স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহবলের উৎকর্ষ সাধন ও বিদ্যাচর্চ্চায় মানসিক বলের উৎকর্ষ সাধন সমস্ত সাধনার মূলে বর্ত্তমান। অতএব স্বদেশী হুজুকে বালকগণ যদি তাঁহাদের লেখাপড়া ও শরীর পালন ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে পরবংশে দেশের কাজ করিবার অল্প লোকই থাকিবে। বালকগণের নহে—সুশিক্ষিত যুবকগণেরই প্রতি গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে বৈধ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন দল সংগঠনে ভিন্ন ভিন্ন উন্নতিজনক ব্রতগ্রহণ করিতে হইবে। অধিকন্তু, যাহাতে গভর্ণমেণ্ট সন্দেহ না করেন—রাজপক্ষকেও আপনাদিগের সহায় গ্রহণে চেষ্টা করিতে হইবে। বস্তুতঃ, ইংরাজ বাঙ্গালীর বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া কোন কাজ সাধিত হইতে পারিলে তাহার আর বিনাশ নাই। কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিজের কোন কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইলে আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মানের হানি হয়। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি। প্রথমতঃ, অবিমিশ্র আত্মনির্ভরতা সংসারে নাই, কোন না কোনরূপে একের সাহায্য অন্যকে গ্রহণ করিতে হয়ই ;—রাজপক্ষ প্রজাপক্ষ উভয়ে মিলিয়া দেশ, আমরা যতই প্রতিজ্ঞা করি না কেন ; রাজপক্ষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরহীন হইতে পারিই না। সুতরাং উক্তরূপ কথার কোনই মূল্য নাই।—দ্বিতীয়তঃ, আমরা যদি আরামশয্যায় শয়ন করিয়া আমাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ডাকি—তাহাই প্রকৃত নির্ভরতা। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে কার্য্য সুসিদ্ধির জন্য রাজপক্ষের সহায়তা গ্রহণে আত্মনির্ভরতা বা আত্মসম্মানের ত্রুটি হইতে পারে না। কেননা উদযোগী প্রজাপক্ষের রাজপক্ষের সহায়তা ন্যায্যপ্রাপ্য—অনুগ্রহ ভিক্ষা নহে। বস্তুতঃ, আমাদের স্বজাতির মধ্যে সদ্ভাব যেমন আবশ্যক, রাজাপ্রজার মধ্যেও বন্ধুত্বস্থাপন তদপেক্ষা কম আবশ্যক নহে। এ সম্বন্ধে স্যর অ্যানড্রু তাঁহার বিদায়কালের বক্তৃতাতে যেরূপ উপদেশ দান করিয়াছেন তাহা কার্য্যতঃ কতদূর সফল হইবে জানি না ; তবে কর্ত্তৃপক্ষ ইহা যে বুঝিতেছেন তাহাও আশাজনক। সত্যই গভর্ণমেণ্ট আমাদের অমঙ্গলপ্রার্থী নহেন ; প্রজাপক্ষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাও তাঁহাদের নীতির অন্তর্গত নহে। রাজায় প্রজায় মিলন নাই বলিয়া, পরস্পরকে আমরা জানি না চিনি না বলিয়াই পরস্পরের বিরোধের এত কারণ ঘটে। কিন্তু সেলামবাজি পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বস্থাপনের উপায় নহে। “সেলামবাজি” কথাটা যে এস্থলে চলিত অর্থেই ব্যবহৃত, তাহার বোধ করি টীকার আবশ্যক নাই।—স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে দাসভাবে যেরূপ সম্মান দেখান হয়—তাহাই উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে অনুগ্রহলাভ হইতে পারে, সমভাব সৌহার্দ্দ্য লাভ হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্যই এই,—যাঁহারা রাজপক্ষের সহিত মেলামেশা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই হয়ত বা কোন ফাঁকা উপাধির প্রত্যাশায়, নয়ত বা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয়ে সতেজে সমকক্ষভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারেন না। এবং সেলামবাজিকেই হীন স্বার্থসাধনের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র বিবেচনা করেন। সুতরাং রাজপক্ষও

ইহাতে এমন অভ্যস্ত যে—ইহার ত্রুটি দেখিলেই তাঁহারা অসম্মান মনে করেন, এবং উভয়ত সমকক্ষ মিলন যে সম্ভবপর ইহাও তাঁহাদের মনের ত্রিসীমাতে প্রবেশ করে না। অনেক সময় তোষামোদকারীগণ দেশের সত্য মনোভাব (sentiment) প্রকৃত ইচ্ছা সংগোপন করিয়া স্পষ্ট বিপরীত বলিয়া রাজপক্ষের মন রক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। স্বরাজ বিরুদ্ধে কাশীর রাজার উক্তিই ইহার একটি দৃষ্টান্ত। দোষ রাজপক্ষের নহে; দোষ আমাদেরই; ইহা বুঝিয়া আত্মসংশোধন করিতে হইবে। মহতের বন্ধুত্ব মহত্ত্ব দ্বারাই অর্জ্জন করিতে হয়। তাঁহারা যদি দেখেন, তাঁহারাও যেমন মানুষ, আমরাও তেমনি মানুষ, তাঁহারা যদি দেখেন অনুগ্রহলাভের জন্য নহে, দেশের কল্যাণ উদ্দেশ্যেই আমরা তাঁহাদের বন্ধুতা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যদি বোঝেন, সেলামবাজি না করিয়া আমরা তাঁহাদের অসম্মান করিতেছি না, আমরা মনুষ্যোচিত ভদ্রতা বিনয় রক্ষা করিয়া ভারতের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি নির্ভয়ে তাহাই প্রকাশ করিতেছি মাত্র,—তাহা হইলে ক্রমশ পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বস্থাপন হইবেই হইবে।

রামমোহন বিদ্যাসাগর তাঁহাদের হৃদয়মাধুর্য্যে ও চরিত্রবলে লাটমহালাটদিগের যেরূপ শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু ছিলেন,—কোন রাজা মহারাজা অপর্য্যাপ্ত তৈলমর্দ্দনেও রাজপক্ষের সেরূপ সম্মানীয় বন্ধু? বর্ত্তমান অ্যাডভোকেট জেনেরল তাঁহার নির্ভীক ন্যায়কর্ত্তব্যপরায়ণতায় দেশের হিতসাধন করিয়া রাজপক্ষের শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু হায়! যাঁহাদের স্বার্থসাধনের গূঢ় অভিসন্ধি হৃদয়ে জাগ্রত, তাঁহাদের এ সাহস কোথা হইতে আসিবে? এমন লোকও আছেন, যাঁহারা রাজপক্ষের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য দেশের সর্ব্বনাশেও অকুণ্ঠিতচিত্ত! গভর্ণমেণ্ট দেশের শত্রু নহেন, আমরাই আমাদের নিজের শত্রু। বর্ত্তমান যুবকগণ যাঁহারা দেশের আশাভরসা, যাঁহারা নিঃস্বার্থতা মূর্ত্তিমান, গভর্ণমেণ্টকে উপেক্ষা না করিয়া, তাহার শত্রুতাচরণ না করিয়া—যাহাতে নিজের চরিত্রবলে তাহাদের সৌহার্দ্দ্য জয় করিতে পারা যায়, সেই দিকেই লক্ষ্যদান করুন। যদি আমরা কখনও এই মিলনযুদ্ধে জয়ী হই, একদিকে স্বদেশীর মধ্যে একতা স্থাপন, অন্য দিকে বিদেশীর নিকট হইতে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মানপূর্ণ সৌহার্দ্দ্য আকর্ষণ করিতে পারি, তখনি বিনা রক্তপাতে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। এখন একজন কটন, একজন ওয়েদারবর্ণ আমাদের উন্নতি কামনায় নিজ জাতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছেন,— আমাদের চরিত্রবল দেখিলে তখন শত কটন শত ওয়েদারবর্ণ অভ্যুদিত হইয়া আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকারদানে আপনাদিগকেই সম্মানিত জ্ঞান করিবেন।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—কে জানিত বঙ্গবালকগণ এত পাহারার মধ্যেও বোমার কারখানা সৃজন করিতে পারে! কিন্তু এরূপ কার্য্য আমাদের উন্নতিরই প্রতিকূল, ইহা বুঝিয়া যে পথ আমাদের স্বরাজের প্রকৃত পথ, তাহা নির্ম্মাণেই নববংশের বল নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভারতী, পৌষ ১৩১৫

কল্প্যবেশ-সম্মিলন

সন্ধ্যার নানারূপ খেলা আমোদ প্রমোদের মধ্যে কল্প্যবেশ বা ছদ্মবেশ-সম্মিলন ইয়োরপীয়দিগের একটি উপাদেয় প্রমোদ। এইরূপ নিমন্ত্রণে আহূত অতিথিগণের বিভিন্ন মনোহারী সজ্জায় মিলনগৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। কেহ দিবা, কেহ রাত্রি, কেহ বসন্ত ঋতু, কেহ শরৎ, কেহ পৌরাণিক কোন দেবতা, কেহ ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তি, কেহ ভিন্ন দেশবাসী,—এইরূপ নানাজনে নানারূপে সাজিয়া বেশভূষার নিদর্শনে তাহা ফুটাইয়া তোলেন। এই কলায় যিনি যত পারদর্শী তিনি তত প্রশংসা লাভ করেন। সাধারণতঃ ইয়োরপে নৃত্যোৎসবেই (Ball) স্ত্রীপুরুষগণ কল্প্যবেশে সজ্জিত হইয়া সমাগত হন। ইহাকে "ফ্যান্‌সি ড্রেস বল" বলে।

বোম্বাই বাসকালে আমি অনেকবার "ফ্যান্সি ড্রেস বল" দেখিয়াছি। সে এক অপরূপ দৃশ্য। বসন্তের দিনে যেমন মলয়হিল্লোল ছোটে, চাঁদ উঠিলে যেমন জ্যোৎস্নার তরঙ্গ খেলে, এও সেইরূপ। রমণীয়বেশা উন্মুক্তকণ্ঠা অপূর্ব্ববরণী সুন্দরীগণ সুন্দর পুরুষদিগের সহিত মিলিয়া সুসজ্জিত আলোকরঞ্জিত গৃহ চতুর্গুণ আলোকিত করিয়া যখন ব্যাণ্ডের তালে তালে দলে দলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকেন, তখন গৃহের চারিদিকে রূপের স্রোত বহিতে থাকে।

"ফ্যান্সি ড্রেস বলে" কাহারও একরূপ সাজ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই প্রায় এক একটা কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ সাজ করিয়া আসেন। দুইজনে এক নাম গ্রহণ করিলেও উভয়ের সাজের কিছু না কিছু তফাৎ হইয়াই পড়ে।

মনে কর দুইজনেই সাজিয়াছেন রাত্রি—দুইজনেরই কালো কাপড়ের উপর তারার ফুল ঝকঝক করিতেছে—কিন্তু কাহারও কাপড়ে বা ছোট ছোট তারা—কাহারো বড় বড় —কাহারও মাথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঝকঝকে মুকুট, কাহারও মাথায় চাঁদ নাই, কালো ওড়নার উপর কেবল জরির ফুল শোভা পাইতেছে।

যিনি ঊষা সাজিয়াছেন,—তাঁহার মৃদু গোলাপাভ শুভ্র বেশের উপর ইতস্ততঃ ফুলরাশি ফুটিয়াছে—মাথায় সোনালি রঙ্গের মুকুট হইতে শুভ্রশ্বেত সূক্ষ্ম বস্ত্র ঝুলিতেছে। কেহ বা বসন্ত সাজিয়াছেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ফুলে ভরা। কেহ বা শুভ্র পুঁতিখচিত শুভ্র বস্ত্র পরিয়া তুষার সাজিয়াছেন। কাহারও বা জিপসী রাণীর সাজ,—হাতে ট্যাম্বোরিন, গলায় স্বর্ণমুদ্রার মালা, পরিধানে ছোটখাট জিপসি-গাউন। কেহ বা নর্ত্তকীবেশী।— আজকাল বিলাতের একদল নর্ত্তকী এদেশের নর্ত্তকীদের ভাবভঙ্গীকে দখল করিয়া লইয়া তাহার উপর নিজেদের শিল্পচাতুর্য্য খাটাইয়া নৃত্য করে। এ নৃত্যের নাম ঘাগরা-নৃত্য (Skirt dancing)—ইহাদের কাপড় পরিবার ভঙ্গী বড় মনোরম। তাই একাধিক ললনা নর্ত্তকী বেশ ধারণ করিয়াছেন।

কেহ পারস্যললনাবেশী—কেহ জাপানীললনার, জাঁকালো কোর্ত্তা পরিয়াছেন। জাপানী রমণীটি স্থূলকায়। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন মহিলা নেপথ্যে বলিলেন—She is too fat for that dress. কেহ চতুর্দ্দশ কেহ পঞ্চদশ—কেহ বা ষোড়শ শতাব্দীর অভিজাত-

ললনা সাজিয়াছেন—যেমন কুইন মেরি—ডাচেস অব বকিংহাম ইত্যাদি! কাহারও বা শুভ্র বস্ত্রের উপর হরতন বা রুইতনের ছক্কা পঞ্জা—তাঁহারা সাজিয়াছেন হরতন-রুইতন। এইরূপ গৃহপূর্ণ বিচিত্র সাজসজ্জা, অধিকাংশ সাজই সুদৃশ্য সুশোভন। এক একটি সাজে যে কত খরচ পড়িয়াছে তাহার ঠিক নাই—হয়ত এই এক রাত্রিরই পরে এ কাপড় আর ব্যবহারযোগ্য থাকিবে না। হইলে কি হয়—যখন সুকৌশলময়ী সাজসজ্জার প্রতিফলকে সুন্দরীর সৌন্দর্য্যচ্ছটা অত্যুজ্জ্বলপ্রভায় বিকিরিত হইতে থাকে, শত শত মুগ্ধ মানব স্তম্ভিত প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই রূপজ্যোতিকে অভিবাদন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তখন সে রাত্রি কি শুধু একটি রাত্রি! তখন সুবেশীর নিকট মুহূর্ত্ত অনন্তে পরিণত হইয়াছে।

তবে যাঁহারা একরাত্রির জন্য এরূপ ব্যয়ে কুণ্ঠিত তাঁহারাই এ সময়ে ছক্কা পঞ্জা দাসী বাঁদি সাজেন। নহিলে সকল সুন্দরীগণেরই মনোগত অভিপ্রায় কিসে তিনি অন্যের সাজের উপর টেক্কা দিবেন।

পুরুষদের মধ্যে সেদিন অধিকাংশ লোকেই আমাদের দেশীয় সাজ পরিয়াছিলেন —অবশ্য বাঙ্গালী বাবুর সাজটি ছাড়া। কেহ কাবুলি, কেহ পারসী, কেহ নবাব—কেহ রাজা। চীনেম্যানের সাজই বেশীর ভাগ দেখিলাম ; কেহ বা সম্ভ্রান্ত কেহ গরীব চীন, কেহ চাষা, কেহ সৈনিক ; চীনেমেয়ের বেশও বাদ পড়ে নাই। —একজন সিন্ধীবেশী—চমৎকার অনুকরণ করিয়াছিলেন—রঙেও তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়া চেনা যাইতেছিল না।

একজন সর্ব্বাঙ্গে ছবির কাগজ পরিয়া বিজ্ঞাপন সাজিয়াছিলেন—একজন ভাঁড় সাজিয়া সকলের সঙ্গে ভাঁড়ামি করিতেছিলেন। একজন লাইট হাউস সাজিয়াছিলেন, —তাঁহার মাথায় লাইট হাউসের মত ক্ষুদ্র স্তম্ভ, তাহার মধ্যে প্রজ্জ্বলন্ত দীপ। সেই স্তম্ভ মাথায় বহিয়া তিনি কিরূপ স্বচ্ছন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছিল। তবে তিনি নাচেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সাজ—যিনি শয়তান সাজিয়াছিলেন তাঁহার। দেখিলে সত্যই শিহরিয়া উঠিতে হয়। মুখে কালি, মাথায় শিং এবং পিছনে এক গুটান ল্যাজ। আমার মনে হইতেছিল, তিনি নিশ্চয়ই নাচের সঙ্গী পাইবেন না। ওমা! নৃত্যের সময় দেখিলাম তাঁহার সঙ্গীর অভাব নাই। ইহা ছাড়া চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীর নাইট, দস্যু, রাজা—প্রভৃতির বেশ অনেকেই পরিয়াছিলেন। যেমন ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল—অমনি এই সকল বিচিত্রবেশী সুন্দর সুন্দরীগণ যোড়া যোড়া মিলিয়া ধীর চরণবিক্ষেপে মসৃণ কাষ্ঠগৃহতল তালে তালে ঘর্ষণ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—যেমন বাদ্য থামিল—তাঁহারাও থামিলেন—এবং মহিলাগণ পুরুষের বাহুন্যস্ত হইয়া চন্দ্রাতপাচ্ছন্ন পানাহার গৃহে গমন করিলেন। কোন দুইজন বা মুক্ত আকাশতলে জাপানী ল্যাণ্ঠানে আলোকিত সুদৃশ্য সুকোমল শোভা-মণ্ডিত কাননতলে বসিয়া মৃদু মৃদু কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। আবার ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিবামাত্র—যিনি যেখানে ছিলেন দ্রুতবেগে নাচঘরে আসিয়া পৌছিলেন। যাঁহার সহিত যাঁহার নাচিবার কথা আছে, দুজনে পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইলেন—নাচ আরম্ভ হইল। যাঁহারা নাচেন না শুধু দর্শক—তাঁহারা নাচঘরের দুই পার্শ্বের মণ্ডপে বসিয়া সেই অপূর্ব্ব উত্তেজনাময় ঘূর্ণ্যমান দৃশ্য দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন—তাহাও যথেষ্ট উন্মাদনাপূর্ণ।

সম্প্রতি লেডী জেনকিন্সের আলয়ে আমরা কল্প্যবেশ-সম্মিলনে নিমন্ত্রিত

হইয়াছিলাম। এ জেনানা পার্টি—পুরুষ নাই; নানা দেশের নানা বেশের মহিলাগণমাত্র এখানে সমাগত। লেডি মিণ্টো, লেডি বেকার হইতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ রমণী পর্য্যন্ত অনেকে এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। ইংরাজ রমণীর অনেকেই ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী মহিলা, কেহ বা বঙ্গরমণী, জিপ্‌সিরমণী, জাপানরমণী, তুর্করমণী, ইজিপ্টরমণী, কেহ ইংলণ্ডের গ্র্যাজুয়েট, কেহ প্যানজি ফুল,—এইরূপ কতজনে কতরকম বেশ ধরিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণকর্ত্রী লেডি জেনকিন্স স্বয়ং বারাণসী শাড়ী ও মণিমুক্তা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সাজিয়াছিলেন বঙ্গদেশের একজন মহারাণী। এ সাজে তাঁহাকে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল তাহা চিত্র হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন।* আমার বিশ্বাস ছিল—বাঙ্গালী মেয়েদের যেমন ইংরাজি পোষাকে মানায় না, ইংরাজ মেয়েদিগকেও বুঝি তেমনি শাড়ীতে বেমানান দেখায়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল,—আমাদিগকে ইংরাজি পোষাকে মানায় না, ইহাই ঠিক।

বাঙ্গালী মেয়েও অনেকে কল্পিত সাজে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাজ যে ইংরাজ মেয়েদের তুলনায় কম শোভন হইয়াছিল—তাহা নহে। ইঁহাদের কেহ পারসীরমণী, কেহ মহারাষ্ট্রী ললনা কেহ বা ইজিপ্টবালা, কেহ বা সন্ন্যাসিনী, কেহ ভিখারিণী। একজন সাজিয়াছিলেন, রবিবর্ম্মার চিত্রকল্পিত গঙ্গাদেবী; একজন ফতেমা; একজন তুর্করাজকুমারী। ইঁহাদের সাজ এমন সুন্দর হইয়াছিল যে, আমার মনে হয় প্রাইজ থাকিলে এই তিনজনের মধ্যেই কেহ পাইতেন।

নিমন্ত্রণে দুই একজন মুসলমানকন্যা ও দু'একজন নেপালকন্যা ছিলেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক বেশই আমাদের নিকট কল্প্যবেশ বলিয়া মনে হইতেছিল।

এই সুচারু সুন্দর দৃশ্য,—বিভিন্ন জাতির অপূর্ব্ব মিলন; সর্ব্বোপরি গৃহকর্ত্রীর আতিথ্য সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। ইঁহার আতিথ্য প্রকৃতই আদর্শ স্থানীয়। তিনি কেবল নিমন্ত্রিত মহিলাগণের আনন্দ আয়োজনেই তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাঁহাদের ভৃত্যবর্গ সইস কোচমান দ্বারবান প্রভৃতি আগন্তুকেরাও যাহাতে প্রভুপত্নীর অপেক্ষায় রাস্তায় হাই তুলিয়া না কাটায়—সেইজন্য প্রাচীরগাত্রে বায়স্কোপ হইতেছিল,—ভৃত্যগণ সকলেই রাস্তা হইতে দেখিতেছিল। আমি গাড়ীর সঙ্গে একজন অল্পবয়স্ক দ্বারবানকে লইয়া গিয়াছিলাম। বায়স্কোপ দেখিয়া সে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে বাড়ী ফিরিয়াই উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল —"আজ যাহা দেখিয়াছি—এমন তামাসা জীবনে দেখি নাই।" পরে শুনিলাম—সে উহা প্রকৃত ঘটনা মনে করিয়াছিল।

লেডি জেনকিন্স প্রকৃতই স্বামীর সহধর্ম্মিণী। দেশের লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশায়,—আদর যত্নে, কথায়, ব্যবহারে ভারী একটা সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়।—তিনি যে অন্তর হইতে আমাদের শুভকামনা করেন, এবং আমাদের সহিত মিলন ইচ্ছাও যে তাঁহার মৌখিক নহে, তাঁহার সহিত পরিচয়েই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ভারতী, ১৩১৭

* মূলের আলোকচিত্রটি এখানে ছাপানো হল না।

বেঙ্গলি

বিগত ৮ই মে বেঙ্গলি জাহাজের নামকরণ অনুষ্ঠানে আমরা নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভার কার্য্যবিবরণ অভিভাষণাদি তৎপর দিনই সংবাদপত্রপ্রমুখাৎ সকলে অবগত হইয়াছেন, কিন্তু তথায় সমবেত প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেদিন যে উৎসাহ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা যিনি সাক্ষাৎভাবে অনুভব না করিয়াছেন, তাঁহাকে কথায় সে ভাব বুঝান অসম্ভব।

সভাদৃশ্য—সে সুগম্ভীর সুমোহন! বৃহদাকার সুগোল সুদৃশ্য স্তম্ভাবলী শোভিত, চন্দ্রাতপশীর্ষ, সুসজ্জিত প্রিন্‌সেপ ঘাট-মণ্ডপে সপারিষদ গভর্ণর সাহেবের স্থান, তৎপার্শ্বে সামিয়ানার নিম্নে দর্শকমণ্ডলী সমাসীন, স্ত্রীপুরুষের স্থান পৃথক। তাঁহাদের পার্শ্বে উন্মুক্ত ময়দানে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান খাকি-পোষাকধারী স্বেচ্ছাসেবক বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ। ইহারাই আহত সৈনিকদিগের সেবার জন্য বেঙ্গলি জাহাজে আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে।

বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চেহারারও কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! বাঙ্গালী বলিয়া আর চেনাই যায় না, অন্ততঃ আমি ত চিনিতে পারি নাই। শিখ বলিতে পারা যায় না, গুর্খাদল বলিয়াই ভ্রম হয় ; অস্ত্রধারী হইলে এ ভ্রমটুকুও হইত না—অধিকাংশ যুবকই এমনি সুস্থ ও বলিষ্ঠকায়। যখন শুনিলাম ইহারাই স্বেচ্ছাসৈনিক—আমাদেরই দেশের ছেলে, তখন আনন্দে বুকটা যেন ভরিয়া উঠিল।

ইহারা অনেকেই বেশ ভদ্রঘরের সন্তান এবং উপার্জ্জনশীল ; কোন না কোন আফিসের ক্লার্ক ; কয়েকজন প্লীডারও ছিলেন। স্বদেশ, পরিবার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপার্জ্জন, সমস্ত ছাড়িয়া বীরোচিত পরোপকার কার্য্যে আত্মদান করিতে প্রবাসে চলিয়াছেন। কে জানে ইহার পরিণাম কি? চোখে জল আসিল। কিন্তু সে আনন্দ-হিল্লোলের মধ্যে অশ্রুর স্থান নাহি আজ, নয়নের জল নয়নেই লীন হইয়া পড়িল।

সভাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। যাহারা বাঙ্গালীর ভীরু নাম দূর করিয়াছে, তাহাঁদের সহিত একটা কথা না কহিয়া কি থাকা যায়! অবসর পাইবামাত্র নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইচ্ছা সুখে যাইতেছ ত?" এক বাক্যে উত্তর ধ্বনিত হইল, "অবশ্য, অবশ্য।" আকাশে প্রান্তরে জলে স্থলে সেই উৎসাহ-বাক্য শত উচ্ছ্বাসে যেন ছড়াইয়া মিলাইয়া পড়িল। আর গভর্ণর-প্রমুখ দলকে কি তাহার কণা স্পর্শ করে নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিল। সেদিনকার উৎসাহে রাজা প্রজা জেতা বিজেতার সমীকরণ হইয়া গিয়াছিল, তাই সেদিনটি বাঙ্গালির পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন।

একদিন বাঙ্গালী জাতির ভীরুতা অপবাদ কত ব্যঙ্গ কবিতার খোরাক জোগাইয়াছে, কিন্তু আজ! আজ হইতে ইতিহাস নূতন কাহিনী গাইবে ; আজ যে প্রাণদানের জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে!

এই যে অল্প বয়সের বীরভাব—আত্মদানের ইচ্ছা—গভর্ণমেন্ট যদি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সুপথে চালিত করেন, তবেই দেশের কার্য্যে গভর্ণমেন্টের কার্য্যে ইহা

সম্পূর্ণভাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই নীতিই রাজদ্রোহিতা নিবারণের একটি অমোঘ উপায়। যাহারা মরিতে চায়, রাজকর্ম্মেই তাহারা মরুক না!

আসল কথা, শুধু অস্ত্র বাঁধিলেই চলিবে না, ইচ্ছার গতি বাঁধা চাই। যখন অস্ত্র আইন ছিল না, যখন অবাধে সকলে অস্ত্র ব্যবহার করিতে পাইত, তখন কয়জন ভদ্রসন্তান খুন ডাকাতি করিত বা রাজদ্রোহী ছিল? রাজদ্রোহিতা বলিয়া একটা কথা তখন ভারতের —অন্ততঃ বাঙ্গালার আইন আদালতে উঠে নাই। আর এখন অস্ত্র আইন করিয়াও গভর্ণমেন্ট অস্ত্র ব্যবহার নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

যেদিন গভর্ণমেন্ট এই বীরভাবাপন্ন যুবকদিগকে সৈনিক করিয়া লইবেন, আমাদের বিশ্বাস, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে তাহারা গভর্ণমেন্টের সহিত এক হইয়া পড়িবে। এবং কাজে-কাজেই তখন হইতে গভর্ণমেন্ট-দ্রোহিতা অতীতের একটা কথা মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার দৃষ্টান্ত, বাঙ্গলার পুলিশ। পুলিশকে বিশ্বাস করিয়া এমন অকালেও গভর্ণমেন্টকে কোনদিন অনুতাপ করিতে হইয়াছে কি? আর এক কথা, সৈনিক আইন বড় কড়া আইন; একবার তাহার পাশে বদ্ধ হইলে কোন যুবকের গতি-বিশৃঙ্খলারও ভয় নাই।

যেমন অধুনা এই যুদ্ধ উপলক্ষে ইংরাজ-রাজছত্রের নিম্নে বিলাতে ভারত সৈনিকে-ইউরোপীয় সৈনিকে প্রাণের মিলন ঘটিয়াছে, সেইরূপ বাঙ্গালী-সন্তানকে যুদ্ধে গ্রহণ করিলে এদেশেও রাজা প্রজার মধ্যে বিশ্বাসের ও কার্য্যের একটি প্রেমময় মহামিলন ঘটিবে। রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই ইহা কি মহালাভ নহে?

যাক্ সে কথা, কত বড় বড় লোকে এই প্রস্তাব লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রাদপি লোকের এ প্রসঙ্গ উত্থাপন বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও মন যাহা বলে, মুখে তাহা বাহির হইয়া যায়।

গভর্ণর সাহেব জাহাজ দেখিয়া চলিয়া যাইবার পর আমরা জাহাজ দেখিতে গেলাম। জাহাজের বেঙ্গলি নামকরণ দেখিলাম সর্ব্বতোভাবে সার্থক। বেঙ্গলির ডাক্তার বাঙ্গালী, স্বেচ্ছাসেবক বাঙ্গালী, খালাসীরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালী। কাপ্তেন কেবল ইংরাজ—কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর বেতনভোগী। জাহাজের সমস্ত খরচই শুনিলাম বাঙ্গালীর দান, কেনার খরচ, চালাইবার খরচ, আসবাবপত্রের খরচ সবই বাঙ্গালীর; জাহাজের যে ইলেক্‌ট্রিক কারখানা তাহাও বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার কৃত; আর এত বড় একটা উদ্যোগের কর্ত্তা হইতেছেন সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ বাঙ্গালীর দল। বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক-কালিমা তাঁহারা আজ সর্ব্বজন সমক্ষে ক্ষালন করিলেন। তাঁহাকে অন্তরের সহিত আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

জাহাজের নীচের ডেক স্বেচ্ছাসেবকদিগের বাসস্থল, আর উপরের ডেক আহত-দিগের উদ্দেশে শুভ্রবস্ত্রশোভিত খট্টাঙ্গে পূর্ণ। ডেকের আশে-পাশে শবালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি।

উপর ডেকে যাইবার সিঁড়ি নিতান্ত ছোট, অনবরত দর্শক শ্রেণী সেই ক্ষুদ্র পথে উপর নীচে যাতায়াত করিতেছেন। আমরা যখন উপরে উঠিয়াছিলাম তখন ভিড় একটু কম ছিল,—নামিবার সময় দু একটি বাঙ্গালী যুবকের সহায়তা লইয়া নামিলাম। এইরূপ সহায়তা-দানেও তাহাদেরই বা কত উৎসাহ আর তাহা গ্রহণে আমাদেরই বা কত আনন্দ!

দেশের ছেলে আজ দেশের মেয়েদের সম্মান রক্ষা করিতে শিখিয়াছে।

ইহার পর আমরা নীচে নামিয়া একটি ছোট ক্যাবিনে গিয়া বসিয়াছি, হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল। পাশের ক্যাবিনে দু' একজন ইংরাজ চা পান করিতেছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম, একজনের হাতের পেয়ালা নীচে পড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে! শুনিয়াছিলাম কাচ-ভাঙ্গা কুলক্ষণ! হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

আজ ২৩শে মে সকালে সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, বেঙ্গলি জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে! হা ভগবান! এত আনন্দের এত উৎসবের পরিণাম কি ইহাই! কাগজখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে আবার সেখানা তুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, লোক কেহ মরে নাই, সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। কি সান্ত্বনা! ছেলেরা কেহই ভাগ্যক্রমে এ জাহাজে ছিল না; তাহারা অন্য পথে আগে হইতে মিলনে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এখন তাহারা কোথায় যাইবে? তাহাদের গতি কি?

ভারতী, আষাঢ় ১৩২২

পত্র

সোলাপুর
শ্রাবণ, ১৮৯২।

ভাই

তুমি আমাদের 'ল'কে জান কি? তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে একবার এইরূপ চিঠি লিখিয়াছিলেন,—My dear——

More next time

Yours—

রাগ করিও না ভাই, তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া আমারও তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে!—কি লিখি? এই নীরস শুষ্ক দেশ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া উপহার দেওয়া যে কি বিষম ব্যাপার—তাহা আমার অবস্থায় না পড়িলে তুমি বুঝিবে না। না আছে এখানে বর্ণনোপযোগী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, না আছে প্রাসাদ-শিল্প-নৈপুণ্য—কি লিখি বল দেখি? তুমি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সোলাপুর কি সমুদ্রের ধারে? শুনিয়া এখানকার সকলেই হাসিলেন, আমিও ভাবিয়া দেখিতেছি কথাটা একটু হাসিবার মতই বটে! এখানে পুকুর মেলে না তা আবার সমুদ্র! সমস্ত সোলাপুর সহরে মোট তিন চারিটি পুকুর। বম্বে সহর হইতে সোলাপুর যদিও ট্রেনে—১০-১২ ঘণ্টার রাস্তা মাত্র,—কিন্তু হইলে কি হয়; ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা ও দারজিলিং-এ যে প্রভেদ, ইহাদের মধ্যেও অনেকটা সেইরূপ। বোম্বাই নগরীর সে নগর-শোভা, সুপ্রশস্ত পরিষ্কার রাজপথ, সুসজ্জিত বিপণি, বিচিত্র ত্রিতল চৌতল হর্ম্ম্যাবলি, মনোহর উদ্যানবাটিকা, এবং সে প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুনীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শ্যামল স্তর—কিছুই এখানে নাই। এখানে প্রাসাদের মধ্যে ভগ্নাবশেষ এক পুরাতন দুর্গ, একটি কাপড়ের কল, দুই-তিনটি মন্দির; রোমান ক্যাথলিকদিগের দুইটি গির্জা, এবং পারসিদিগের একটি সমাধি মন্দির। ইহা ছাড়া বাসবাটী সমস্তই কুটিরগৃহ, ইংরাজদের বাঙ্গলা, দেশীয় ভদ্রলোকের দ্বিতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নিকেতন, দোকান পসারিও তথৈবচ, আর গরীবদিগের ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-গৃহ যেমন সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এই ত সোলাপুর সহর, তার পর ইহার প্রাকৃতিক চিত্র। এখানে নদী নাই, পর্ব্বত নাই, যত দূরে দৃষ্টি যায় নিম্নোন্নত শুষ্ক তৃণময় কঠিন ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, সেই শুষ্ক ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে কণ্টকাকীর্ণ ছোট ছোট গাছের শুষ্ক ঝোপ, স্থানে স্থানে ঘৃতকুমারীর ক্ষুদ্র জঙ্গল, ইতস্ততঃ দূরবিক্ষিপ্ত এক একটি সঙ্গীহীন তরু, অধিকাংশই মৃতপ্রায়, কঙ্কালাবশেষ মৃত-প্রায় বাব্‌লা, মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বট নীম প্রভৃতি সজীব তরু আছে বটে, কিন্তু তাহা বিরল এবং নিস্তেজ্। কোন কোন রাজপথের দু'ধারে কেবল অপেক্ষাকৃত সুশ্যাম তরুগণ। একে সোলাপুর স্বভাবতঃ বৃক্ষ-বিরল শুষ্ক কঠিন দেশ,

তাহার পর এ বর্ষায় এখানে বৃষ্টি নাই, পিপাসার্ত্ত, রুক্ষ তপ্ত প্রকৃতি কাতর প্রাণে আকাশের দিকে চাহিয়া আরো তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, আর লোকেরা হাহাকার করিতেছে। আসলে বর্ষাতেই এখানে বসন্ত জাগে। আর বারে এ সময় সোলাপুর কি শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছিল! ক্ষেত্রের যেদিকে চাহিয়া দেখ,—নবীন তৃণময়, গাছপালা সরস সতেজ, নবপল্লবিত, আকাশে অনবরত মেঘালোকের বিচিত্র খেলা, এই বৃষ্টি, এই রৌদ্র ; সঙ্গে সঙ্গে সুকণ্ঠ পক্ষীদের মধুর গীতিতে দিক্‌দিগন্ত উথলিত। এবার বর্ষাতে বর্ষা নাই ; তাই সোলাপুরের এই মরু দৃশ্য। তাই পাখীরা পর্য্যন্ত এবার গান গাহিতে ভুলিয়াছে, আমরা সকালে পেচকের ডাক শুনিয়া উঠি—! তাই ভাবিতেছি কি লিখি? বিশেষতঃ তোমার মত কবি লোককে!

বলিতে কি, মাঝে মাঝে আমার যেন মনে হয় এ সোলাপুর সে সোলাপুর নহে। না আছে বাহিরের সে নবীন সৌন্দর্য্য, না আছে ভিতরের সে প্রফুল্ল ভাব, পরস্পরের আত্মীয়তা সম্পর্ক। যাঁহাদের জন্য এই নির্জীব নীরস ক্ষুদ্র স্থান সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ-যুক্ত সরস সজীব থাকিত, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন—সোলাপুরের যেন এখন মুমূর্ষু অবস্থা। দেশে থাকিতে তাঁহাদিগকে একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহাদের অভাব বড়ই অনুভব করিতেছি, আর মনে হইতেছে, সত্যই কি এ সেই সোলাপুর? বলিব কি গ্রহের কথা! সোলাপুরের জমিতে পা না দিতে দিতে এবার আমার Rip Van Winkle-এর দশা ঘটিয়াছিল। দুই বৎসর আগে আমরা যখন সোলাপুরে আসি তখন ট্রেন এখানে বিকালে পঁহুছিত, আমরা জানি এবারো সেই সময় সোলাপুর আসিব, পূজনীয় জজ সাহেবেরও সেইরূপ ধারণা ছিল, —ইতিমধ্যে যে রেলওয়ে কোম্পানি ৬/৭ ঘণ্টা কাল চুরীতে বাহাদুরী করিয়া বসিয়াছে —তাহা কে জানে! চিরকাল সমানে সকলকে ফাঁকি দিয়া এই খানেই সে যে আপনাকে ধরা দিবে, ইহা হঠাৎ কাহার মাথায় আসে বল? কাজেই বিকালের পরিবর্ত্তে সকালে ৯টার সময় যখন সোলাপুরে ট্রেন থামিল, আমরা মহা আগ্রহভরে জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম ষ্টেসন জনশূন্য—এই অপরিচিত জনতার মধ্যে সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্নেহময় সহাস্য মুখটি দেখিতে পাইলাম না! এমন কি একজন পরিচিত সিপাহীর মুখ পর্য্যন্ত নজরে পড়িল না, কি ভয়ানক অবস্থা ভাবিয়া দেখ! এই অবস্থায় না হারাইয়া গিয়া যে ভালয় ভালয় ঠিক জায়গায় আসিয়া পঁহুছিয়াছি ইহাতে আমাদিগকে বাহাদুরী দেও কি না? কথাটা নিজের মুখে বলিতে ভাল শোনায় না, তাই তোমার মুখে শুনিবার আশায় রহিলাম।

যাহা হউক, ইহা সত্ত্বেও এই সোলাপুর সেই সোলাপুরই বটে। সেই বাড়ী, সেই রাস্তা, সেই জিমখানা, সেই সাক্ষাৎ প্রতি-সাক্ষাতের ধূম, সেই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, সেই বৈকালিক ভ্রমণ, সেই জিমাখানায় খেলাধূলা, ঘড়ির কাঁটার মত নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন-যাপন প্রণালী—সকলি সেইরূপ, কেবল যদি সেই পরিচিত মুখগুলি থাকিত!

মতিবাগ আমাদের প্রধান বৈকালিক ভ্রমণ-স্থান। মন্দির দেখিতেই যাই, ষ্টেসনেই যাই, সহরেই (দেশীয় পাড়া) যাই, দুর্গেই যদি, ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বশেষে একবার মতিবাগে না আসিলে সে দিন বেড়ানই মিথ্যা। পথে প্রতিদিন প্রায় সেই একই রূপ দৃশ্য। আমাদের

বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু দূরে—রাস্তার ধারে কয়েক ঘর তন্তুবায়ের বসতি। ময়লা রং জ্বলা, ২৫/৩০ হাত লম্বা রঙ্গিন সাড়ির কোঁচা ঝুলান আঁচল দুলান কাল কোল' তাঁতিনীরা কাষ্ঠদণ্ডে যন্ত্রাকারে সুদীর্ঘ রঙ্গিন সূতার বিন্যাস করিতে করিতে আমাদের দিকে চাহিয়া দেখে,—তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা "সাব সেলাম, সাব সেলাম", বলিয়া অভিবাদন করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে দুই একটি বেশ সুশ্রী মুখ। রাস্তার অন্য ধারে সুবিস্তৃত মাঠ ; কখনো কখনো মাঠে এক দল মলিনবেশ স্ত্রীপুরুষ পুঁটলি পাঁটলি লইয়া বসিয়া থাকে—তাহারা যাত্রীর দল, হয় অন্য কোথা হইতে সোলাপুরে সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিতে আসিয়াছে, কিম্বা অন্যত্র কোথায় যাইবার পথে এখানে আশ্রয় লইয়াছে। তাহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এখানে যে বন-ভোজন করিয়াছিল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শালপাতের রাশিতে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়, শকুনি গৃধিনী, এবং কাকের রাশি মিলিয়া সেই পাতগুলি লইয়া টানাটানি করিতে থাকে। আমাদের ঘোড়াটি এমনি বীরপুরুষ, ইনি আবার সেই কাকের দল দেখিয়া ভড়কিয়া পলাইবার চেষ্টা করেন! তবু ইনি বাঙ্গলার ঘোড়া নন! রাস্তায় পগ্‌গধারী পথিক দু'এক জন, কাষ্ঠের বোঝা মাথায় স্ত্রীলোক দু'এক জন হন হন করিয়া চলে, আর স্থানে স্থানে পুলিস প্রহরী বুক ফুলাইয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকে, আমাদের দেখিয়া সৈনিকি প্রথায় সেলাম করে। মাঝে মাঝে পথ আবদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ মেঘের মত গরু মহিষের পাল (অধিকাংশই মহিষ) চলিতে থাকে, গাড়ী তাহাদের মধ্যে আসিলে অল্পক্ষণের জন্য শ্রেণীভঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

রাস্তায় দু একটা টাঙ্গা—(একরূপ ঘোড়ার গাড়ী) আরোহীদিগকে ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে দ্রুত তরঙ্গ গতিতে চলিয়া যায়, কোনটার মধ্য হইতে একটি শ্বেত মুখ, কোনটার মধ্য হইতে বা সপগ্‌গ লম্ব-গুম্ফ মুখ দু একটি প্রকাশিত হয়। দরমার ছাওয়া একরূপ গরুর গাড়ীর মধ্যে কখনো কখনো এক রাশ স্ত্রীলোক ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছে, দেখা যায়। মতিবাগ যাইতে অর্দ্ধ পথে রাস্তার ধারে এদেশীয় যুবকদিগের ক্রীড়া স্থান। তাহাদের মস্তক কেশহীন, টিকি গুটানো ; অস্থি-পরিপুষ্ট মুখশ্রী দৃঢ়তা ও কার্য্যপটুতা ব্যঞ্জক, 'কুছ পরোয়া নেই'-ভাবে টেনিসের ব্যাট হাতে, খালি পায়ে ছুটাছুটি করিয়া তাঁহারা খেলিতে থাকেন ; দেখিয়া সেকালের বর্গির গল্প মনে পরে, ইঁহারাই এক সময় বাঙ্গালা কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। হ্যাঁ, সেইরূপ চেহারা বটে! কোন শ্বেত রমণী গাড়ীর মধ্য হইতে এই মুক্তপদ ও মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন ও তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট শ্বেত-পুরুষ-প্রবর তাঁহাকে অভয় প্রদান করিতে করিতে উঁহাদের দিকে নিতান্ত হীন কটাক্ষপাত করেন। ইহাকেই বলে নিয়তি ; এক দিন—বেশী দিন নহে, ইংরাজ ইঁহাদের ভয়ে কম্পমান ছিলেন!

এইরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমরা প্রতিদিন মতিবাগে যাই। কখন কখন পর্ব্ব দিনে অন্য নানারূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায়। মহরমের সময় মুসলমানেরা নানারূপ সাজে বাহির হইত। বাঘ, বানর—সাহেব মেম, নাচওয়ালী প্রভৃতি সাজিয়া তাঁহারা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া নাচিয়া বেড়াইত। আমাদের বাড়ীতেও দুই দল আসিয়াছিল, এক দল সাহেব মেমের সাজে, এক দল নাচওয়ালী বাজিয়ে ইত্যাদি সাজে। সাহেব বিবির সাজই কিছু মজার, দুজন ফিরিঙ্গি সাহেব ও ফিরিঙ্গি মেম, দুজন খাঁটি ইংরাজ ও খাঁটি মেম। খাঁটি

মেম মুখোসের আশ্রয় লইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার সাজ বড় মন্দ হয় নাই—তাঁহারা পরস্পর হাত ও কোমর ধরিয়া ইংরাজি অনুকরণে তালে তালে নৃত্য করিতেছিলেন। চারিদিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই গল্প মিষ্টার 'বি'কে করায় তিনি বলিলেন, তাঁহার বাঙ্গলায় আসিলে খুব খুসী হইবেন। কিন্তু একবার নাকি একজন ইংরাজ এই নাচ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। হওয়া আশ্চর্য্য নয়! ইহা নিতান্তই তাঁহাদের caricature, যেমন দেবকার্সেন বাঙ্গালীর caricature করেন। আমরা গরীব বাঙ্গালী জাত ; আমাদের প্রাণে সব সয় ; কিন্তু ইংরাজের প্রাণে ইহা সহিবে কেন? যাঁহার সহে, আমাদের চক্ষে তিনি নিতান্ত সমদর্শী! আর ইংরাজের চক্ষে সম্ভবতঃ তিনি গোবেচারা পদার্থহীন!

পর্ব্বের আর এক শোভা, রঙ্গিন বস্ত্র-ভূষিত রমণীদল তখন মাঠে পথে গাড়ীতে যেখানে সেখানে দেখা যায়।

বম্বে পুনায় যেমন পারসী রমণীর অভাব নাই, এখানে পারসী রমণীকে দৈবাৎ পথে দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন কেবল দেখিলাম দুই তিনটি পারসি মেয়ে মতিবাগের লোহার বেড়া ডিঙ্গাইয়া হাসিতে হাসিতে ভিতরে ঢুকিতেছে।

মতিবাগ শুনিয়া তুমি যদি ভাবিয়া বস, ইহা বুঝিবা ঈডন্ গার্ডেন্সের অনুরূপ কোন উদ্যান বিশেষ—তাই বলা ভাল, এখানে সারা বাগ খুঁজিয়া একটা বনফুল মেলে কিনা সন্দেহ। যখন মতিবাগে সেনা-নিবাস ছিল, তখন সম্ভবতঃ মতিবাগ উদ্যান ছিল। এখন আর সোলাপুরে সৈন্য নাই ; কেবল ব্যারাকের ভগ্নাবশেষ চিহ্নে, ছায়াময় তরু-ঘন পথে, ও পথপ্রান্তের পুষ্করিণীতে মাত্র এখন মতিবাগের পূর্ব্বশ্রীর কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। বাস্তবিক সমস্ত সোলাপুরে মতিবাগের মত সুন্দর তরুপথ আর নাই। ইংরাজের যাদুমন্ত্রে মরুভূমি সহসা এখানে অরণ্যানীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখানে খানিক দূর পর্য্যন্ত বৃক্ষাবলী গায়ে গায়ে ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া চূড়ায় চূড়ায় মিলিয়া মিশিয়া যে শ্যামল বন-পথ রচনা করিয়াছে তাহা দেখিলে দারজিলিং-এর পার্ক মনে পড়ে। এই তরুপথ অতিক্রম করিয়া সহসা আবার আকাশ-চুম্বিত দিগন্ত-প্রসারিত মুক্ত ভূমিতে আসিয়া পড়িতে হয়, সহসা এই দৃশ্য-বৈচিত্র্য অতি মনোহারী।

তুমি শুনিলে কি মনে করিবে জানি না,—কিন্তু এই তরুবিরল অশ্যামল, মরুবৎ মুক্ত দৃশ্যও আমার বড় ভাল লাগে। নিস্তেজ পত্রবিরল দূরবিক্ষিপ্ত গাছে গাছে প্রতিহত হইয়া সজোর বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া বহে ; নানারূপ পাখী নানা সুরে গান করে ; সুদুর প্রসারিত মাঠের সীমান্তে মেঘের সুন্দর রং খেলিতে থাকে, উচ্চ নীচ শুষ্ক কঠিন অসমতল ভূমি দূর হইতে তরঙ্গের মত শোভা পায়। মতিবাগ-পুকুরের একটুখানি সবুজ জল তাহার এক প্রান্তে ঢলঢল করিতে থাকে, Fairy Queen একখানি পালের ক্ষুদ্র জাহাজস্থিত বোট, যাহাকে বলে (Sailing Boat) দুলিয়া দুলিয়া তাহাতে নৃত্য করেন। চারিদিক উদাস সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মনে হয়। এই মুক্তপথে কি ভয়ঙ্কর বাতাস ; এখানে হাঁটিয়া চলা দায় ; সম্মুখে চুলগুলা নিশানের মত উড়িতে থাকে ; কাপড় পালের আকার ধরিতে চায় ; ঠিক থাকিয়া চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে ; তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া বসিতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত। এই বাতাসই এখানকার মেঘ-শত্রু, মেঘ করিতে না করিতে এই বাতাসে তাহা উড়িয়া যায়।

মতিবাগের পুকুরটি বড় মন্দ নহে। আগে মতিবাগে গিয়া ফেয়ারী কুইনে sail করিয়া বেড়ান একটি ফ্যাসানের মধ্যে ছিল ; কিন্তু অল্প দিনেই দেখা গেল, ফ্যাসানটি ঠিক নিরাপদ নহে। রাণীর মেজাজের কিছুমাত্র ঠিক নাই ; অল্প বাতাসেই তিনি টলমল করেন—একবার উল্টাইয়া পড়িয়া দুই জনকে জলে ফেলিয়াছিলেন ; ভাগ্যবশতঃ সে দিন কোন সন্তরণ-অপারক রমণী তাহাতে ছিলেন না। আর একবার তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেবার এখানকার ডাক্তার-পত্নী এই বোটে ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, সহজ অবস্থাতেই নড়াচড়া তাঁহার পক্ষে ব্যায়াম-স্বরূপ ; সুতরাং এ সময়ে তাঁহার কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা কল্পনা করা নিতান্ত কঠিন নহে। বোটও যেমন কাত হইয়াছে তিনিও বেঞ্চ হইতে বোটের তক্তায় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন ; আর তাঁহার সঙ্গী দুইজনের মধ্যে একজন, Mr. D. পাল সামলাইতে ব্যস্ত ; আর একজন সোলাপুরের বাজিয়ে সাহেব Mr. B. নিজের বেহালা সামলাইতে ব্যস্ত ; তাঁহার মতে এই দুই টুকরা গৃহ সরঞ্জামের মধ্যে—(স্ত্রী ও বেহালা)—বেহালাই সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়, কেননা ইহা দ্বারা সংসারের অধিক উপকার দর্শে। সুতরাং অবস্থাটা তেমন সুখজনক না হইলেও কিছুক্ষণ তাঁহার এই অবস্থাতে কাটাইতে হইয়াছিল, এবং এ জন্য তিনি পরে Mr. B-কে নিতান্তই স্নেহময় আশীর্ব্বচনে অভিবাদন করেন নাই। এই গল্পটি সোলাপুরের একটি রহস্যবাচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নবাগতের কানে এ কথাটি না উঠিয়া যায় না।

মতিবাগে আসিয়া যাঁহারা দাঁড় বাহিতে চাহেন তাঁহারা পরীরাণীর জলি-বোটে অধিকার করিয়া ভ্রমণ করেন। আমরা গতবারে জ্যোৎস্না রাত্রে অনেক দিন দাঁড় বাহিয়া বেড়াইতাম। চন্দ্রালোকে এই নির্জ্জন হ্রদে নৌকা ভ্রমণ করিতে করিতে স্কটের 'লেডি অফ্ দি লেক' মনে পড়ে, চারিদিকে চাহিয়া দেখি যদি কোন বিপন্ন নাইটকে তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই, কেহ না—কেহ না! কেবল কৃষ্ণবর্ণ তরু-শ্রেণী ও তাহার ছায়া আমাদের প্রতি উপহাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। পরীরাণী ও তাঁহার অনুচর—(জলি বোট) ছাড়া মতিবাগের অন্য আকর্ষণও আছে। এখানে নানারূপ শীকার মেলে, মাছ হইতে শূকর পর্য্যন্ত। একবার আমরা গাড়ীতে যাইতে যাইতে মাঠের মধ্যে একটা শূকরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। কখনো কখনো নগর নেকড়ে বাঘও পাওয়া যায়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা শৃগালই অধিকাংশ শীকারীর বধতৃষ্ণা নিবারণ করে, আমার বিশ্বাস ছিল মাছ ; কিন্তু এখন শুনিতেছি ; এ হ্রদের মাছেরা নাকি ভারী চতুর, সহজে ধরা দিতে চাহে না। Mr. B-র সে জন্য নিতান্ত মনস্তাপ ; প্রায় বৎসরাবধি তিনি এখানে আসিয়াছেন ; আর প্রতি দিনই প্রায় তিনি ছিপ ফেলেন ; কিন্তু দৈবাৎ কোন দিন ছাড়া তাঁহার ছিপে মাছ ওঠে না। বিপদে পড়িলে লোকের বুদ্ধি জোগায় ; এইবার তিনি শঠে শাঠ্য আচরণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন! তাঁহার এক (Idea) আসিয়াছে, ছিপ না ফেলিয়া Shoot করা, যেই তাহারা মাথা উঠাইবে অমনি গুলি-বর্ষণ। আমরা প্রস্তাব করিলাম, কেন, জাল ফেলা? এ উপায় তাঁহার মনঃপূত নহে, ইহাতে Originality নাই। M. B. এখানকার গোপালভাঁড়, খুব হাসাতে পারেন।

সোলাপুরে আর যে দুই তিনটি পুকুর আছে ; সকলি প্রায় কোন না কোন মন্দির সংলগ্ন। দেবপূজায় ফুল চাই ; সেই জন্য মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে পুকুর, বা পুকুরের নিকটেই

মন্দির। পুকুরগুলি পদ্ম-পত্র ও পদ্ম-কলিময়; ফুল ফুটিলে না জানি কিরূপ সুন্দর দেখিতে হয়। কিন্তু জলের এই অভাবেও সোলাপুরে তেমন জলকষ্ট নাই। এখান হইতে ৫।৬ মাইল দূরে একরুক নামক একটি বৃহৎ হ্রদ আছে, সেইখান হইতে কলে সহরে জল আসে। তবে তাহাতে লোকের ব্যবহার-কার্য্য সম্পন্ন ছাড়া ক্ষেত্রের জলের সুবিধা হয় না। শোনা যায় আমেরিকায় নাকি ডাইনামাইট দ্বারা মেঘ-বর্ষণ করা হইতেছে। মেঘের উপর পর্য্যন্ত আধিপত্য! আশ্চর্য্য কি? বিদ্যুৎ যখন ধরা পড়িয়াছে—তখনি একদিন মেঘও ধরা পড়িবে! তখন কোন স্থানে আর মরুভূমি থাকিবে না বোধ হয়! অন্যান্য মন্দিরের পুকুরগুলি অপেক্ষা সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পুষ্করিণীটিই বড়। সিদ্ধেশ্বরের মন্দির নাকি বহু পুরাতন। মন্দির মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত মহাদেব-মূর্ত্তি বিরাজমান। আমরা দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, একজন মহারাষ্ট্রী রমণী এক মনে আরাধনা করিতেছে দেখিলাম, বোধ করি স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রার্থনা করে। মন্দিরের পুরোহিত একার্দ্ধ নারিকেল মালা ও আর কয়েকটি খেজুর আমাদের হাতে দিলেন, তাহা দেবপ্রসাদ। পূর্ব্বে এখানে যে স্থূলোদর-ভারে সর্প-গতি, প্রফুল্ল-মুখ, অনাবরিত-গাত্র পুরোহিতকে দেখিয়া দেবদর্শনাপেক্ষা সমধিক আনন্দলাভ করিয়াছিলাম; এবার তাহাকে আর দেখিলাম না। এখানকার শৈবদিগকে লিঙ্গায়েৎ বলে—শৈবদিগের শবদাহ নাই, তাহাদের সমাধি হয়। শৈবেরা একরূপ বড় বড় রৌপ্য কবচ ধারণ করে, তাহা সূত্রে গ্রথিত হইয়া তাহাদের বক্ষ-শোভিত, এবং অন্যের নিকট তাহাদের সম্প্রদায় প্রকাশিত করে।

মতিবাগের নিকট রেবণসিদ্ধ নামক দেবের এক মন্দির আছে, তাহাও নাকি বহু-পুরাতন। মন্দিরের চূড়ায় কতকটা বুদ্ধের মূর্ত্তির অনুরূপ নানা মূর্ত্তি,—মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত রেবণসিদ্ধ। আমরা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রেবণসিদ্ধ মানে কি? সে বলিল, মহাদেব। আমরা বলিলাম, রেবণ কথার অর্থ কি? সে তাহা জানে না। এখানকার পুরোহিত গভর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক ৪০ টাকা বৃত্তি পায়। মন্দিরের পুরাতন বৃত্তি-ভোগীদিগকে গভর্ণমেণ্ট এখনো বৃত্তি দান করেন।

সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের পুষ্করিণীর পর পারে,—এখানকার প্রকাণ্ড পুরাতন দুর্গ। বিজাপুর-সোলাপুরে পূর্ব্বে যখন ক্রমাগত বিবাদ চলিত, তখন বিজাপুরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত এই দুর্গ-নির্ম্মিত হয়। দুর্গ তোরণ অতিক্রম করিয়া কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিয়া এক স্থানে সিন্দূর-চর্চ্চিত এক অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি। শোনা গেল ইনি দুর্গের অধিষ্ঠাতা নৃসিংহদেব। দুর্গ প্রতিষ্ঠার সময় নাকি ইঁহার সম্মুখে নরবলি হইয়াছিল। দুর্গের মধ্যে এখন পুলিসের কতক সৈন্য বাস করে।

সোলাপুরে যদিও দেব মন্দির বেশী নাই, তথাপি নগরবাসীদিগের সে জন্য পূজার কোন অসুবিধা হয় না। রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে কোন একটা বড়গোছ পাথর দেখিলেই তাহারা তাহাকে দেব বানাইয়া পূজা করে। আমরা দেখিলাম দুর্গের সীমানায় এক উচ্চ প্রস্তর-খণ্ডকে সিন্দূর চর্চ্চিত করিয়া এক রমণী পূজা করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানকার কলেক্টর সাহেবের বাড়ির কাছে ময়দানের এক প্রস্তর লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। গ্রামবাসীগণ সহসা সেই প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কার করিয়া বাদ্য বাজনা সহকারে তাহার পূজা আরম্ভ করিল। কলেক্টর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, গভর্ণমেণ্টের কোর্ট সংলগ্ন

স্থানে এইরূপে অধিকার করিতে তাহাদের ক্ষমতা নাই; এখানে তাহারা পূজা করিতে আসিতে পাইবে না। তাহারা জজ সাহেবের নিকট নালিশ করিল। জজসাহেব তাহাদের পক্ষে রায় দিলেন।

আমরা একদিন পারসীদিগের সমাধি মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সুদূর প্রসারিত মাঠের মধ্যে এক মুক্ত ছাত, গোলাকার ইষ্টক-বেষ্টন। একস্থানে একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বার,—দূর হইতে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই দ্বার দিয়া চির-মৌনীদিগকে এইখানে রাখিয়া আসা হয়, তাই ইহার নাম মৌন বা স্তব্ধ-নিবাস।

বিধর্ম্মীগণের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং ইহার বাহ্য আকার ছাড়া অন্তরের কিছুই আমরা দেখি নাই, তবে শুনিয়াছি মধ্যে নাকি স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকার স্বতন্ত্র তিনটি শবস্থান। মন্দিরের মাথায় মাঠের গাছে গাছে শকুনি গৃধিনীর দলে বসিয়া আছে। শব স্ব স্থানে পরিত্যক্ত হইয়া মন্দির দ্বার বন্ধ হইলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়। মাঝে মাঝে তাহাদের কেবল ভুক্তাবশিষ্ট অস্থিরাশি মানুষে পরিষ্কার করে। সে দিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছিল—দু একটা শকুনি আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, আমরা সেই 'তেপান্তর' মাঠে তিনটি প্রাণী নিস্তব্ধে অগ্রসর হইতেছিলাম; চলিতে চলিতে মনে হইতেছিল, যেন শবের সঙ্গী হইয়া চলিতেছি; তাহাদের স্তব্ধ রাজ্যের গুপ্ত রহস্য তাহারা আমাদের কাণে কাণে কহিতে কহিতে সেই দিকে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পারসীদিগের এই শব-বলি প্রথায় আমরা শিহরিয়া উঠি; ইহাতে পারসীদিগকে নির্ম্মম হৃদয়হীন বলিয়া বোধ হয়। অথচ ভাবিয়া দেখিতে গেলে, দাহ-প্রথাতে কি বিশেষ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে? যাহাকে চিরদিন যত্নে রাখিয়াছি, পূজা করিয়াছি, সেই ভালবাসার বস্তুকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া অগ্নি দগ্ধ করিতে যাহারা পারে—তাহারা কি কম নিষ্ঠুর? স্তব্ধ-নিবাসের স্তব্ধতা শকুনি গৃধিনীগণ মানব-নয়নের অসাক্ষাতে গোপনে গোপনে ভঙ্গ করে, আর চিতাশায়ীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ব্যক্তি,—তিনি তাহার মুখে অগ্নি প্রদান করেন; আর প্রিয়জনের আঘাতে তাহার সম্মুখে সেই দেহ ক্রমে অগ্নিসাৎ হইতে থাকে! কেবল তাহাই নহে; পারসীদের মনের এক শান্তি,—মৃত্যুর পর তাহার প্রিয়জনের প্রিয় দেহ অন্যের উপকারে আসিয়াছে! এইরূপ ধর্ম্মভাবের সংক্ষিপ্রণে ইহার হৃদয়হীনতাই বা কোথায়! কিন্তু আমাদের দাহ-প্রথার ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ যদি এ প্রথায় শিহরিয়া ইহাতে আমাদিগকে হৃদয়হীন বলেন, ইহাতে কি আমাদের বলিবার কিছু আছে? অথচ তাঁহাদের মতই কি আমরা পিতামাতাকে ভালবাসি না, সন্তানকে স্নেহ করি না, তাঁহাদের মতই আত্ম-বিসর্জ্জী দাম্পত্য-প্রেমে হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে পরিপূর্ণতা অনুভব করি না? আসল কথা আমরা যাহাকে পূজা করি, তাহা প্রাণ মন আত্মা বিশিষ্ট জীব; তাহা সম্পূর্ণ চেতন সৌন্দর্য্য, জড় দেহ নহে! আজকাল আমাদের দেশে মৃত্যুর পর ফটোগ্রাফ লওয়া প্রথা হইতেছে, আমার মনে হয় ইহাতে যেমন হৃদয়-হীনতা প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতে নহে! আমরা যে স্মৃতি হৃদয়ে রাখিতে চাই, তাহা তাহার আত্মাময় সৌন্দর্য্যের স্মৃতি, সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যশালী পূর্ব্বস্মৃতির স্থানে অচেতন শ্রীহীন বিকৃত মূর্ত্তি স্থাপন করা আমার মনে হয় শুদ্ধ ভালবাসার অপমান করা!

ভাদ্র।

দিন ১৫।২০ আর তোমাকে লেখা হয় নাই; ইহার মধ্যে সোলাপুর নতুন শ্রী ধারণ করিয়াছে; দিন কতক হইল তিন চার দিন ধরিয়া সোলাপুরে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমাদের টেনিস কোর্ট এবং কমপাউণ্ডের কোন কোন স্থান ত একবারে পুকুর হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের মালীকে প্রাণ খুলিয়া কখনো বৃষ্টির প্রশংসা করিতে শুনি নাই। এবার তাহারো বলিতে হইয়াছিল, বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। আর ভিস্তিগুলার ত কদিন পোহাবারো; তাহাদের আর জল তুলিতে হয় নাই। তবে আমার মনে হয় ভিস্তির চেয়েও ভিস্তির মশকেরই ইহা অধিক আনন্দের দিন। সম্বৎসর জলে ভিজিয়া এই সময়ই তাহারা শুকাইয়া বাঁচে। এখন আর বর্ষাবাদল নাই, এখানে এখন বসন্তের রাজত্ব।

চারিদিক শষ্প শ্যামল; পাখীরা অবিশ্রান্ত গান করিতেছে; মতিবাগের পুকুর নব যৌবনে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; সিদ্ধেশ্বরের এবং রেবণসিদ্ধ দেবের হ্রদ বিকশিত কমলে ঢল ঢল। আর আমাদের বাগানে গোলাপ যূথী যাতি ও বিচিত্র বর্ণের নানা রকম বিলাতী ফুল প্রাণ খুলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; গাছের পাতাগুলির কাঁচা কাঁচা রং হইয়াছে; প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড সবুজ ঘাসে ভরিয়া গিয়াছে।

আমরা মনে করি ঘাসের কোন দর নাই; কিন্তু প্রতি বৎসর এখানকার ঘাস নীলাম হইয়া ২০০ হইতে ৩০০ টাকায় বিক্রয় হয়; ও তখন হইতে পালে পালে গরু মহিষের দল চরিতে আসিয়া এখানকার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে। সোলাপুরে বাগান করা বহু ব্যয়-সাপেক্ষ। কেবল এখানে জলের অভাব, এমনো নহে; এখানকার মাটিও অনুর্ব্বর। অন্য স্থান হইতে সারমাটি আনাইয়া তবে জজ সাহেবের এই বাগান হইয়াছে! তবুও এখানে দু'চারিটি বেশ ভাল বাগান আছে। আমাদের দেশের বড় মানুষের মত এ দেশের বড় মানুষলোকেরও প্রায় এক একটি স্বতন্ত্র বাগান থাকে। এখানে জজ সাহেবের এই বাগান ছাড়া পারসীদের ধর্ম্মশালা, ও সোলাপুর বস্ত্রকল সংলগ্ন দুইটি বাগান; এবং বারদ ও মাটেশ্বর নামক এ দেশী দুইজন ধনী লোকের দুইটি বৃহৎ বাগান আছে। এ দেশের লোকের বাহ্যাকৃতি ও সাজ-সজ্জা দেখিলে মনে হয় ইহারা নীরেট জাতি; সারবান লোক; অনাবশ্যক সখের সঙ্গে ইহাদের বড় সম্পর্ক নাই। সাহসী সেনা, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, ডারউইন তত্ত্ববিৎ, কঠোর অঙ্ক-শাস্ত্র বিশারদ, অশেষ পাণিনীজ্ঞ; এ সকলি এ জাতিতে সম্ভবে, কিন্তু ফুল ও তারার সৌন্দর্য্য ভাবনায় ইঁহারা যে সময় নষ্ট করিবেন, এরূপটা হঠাৎ মনে হয় না। তথাপি কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরি এদেশে ফুলের সখ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের মালা খোপায় পরা মেয়েদের ত সাজগোজের একটি অঙ্গ। তবে আমাদের চোখে সেই বড় বড় অদ্ভুতাকৃতি মুক্তার নথ-ভরা মুখের সঙ্গে ঢ্যাবা ঢ্যাবা অদ্ভুত স্বর্ণ চাকী শোভিত অর্দ্ধ টাক অর্দ্ধ খোপাযুক্ত মাথার উপর সে ফুলহার যেন একটু খাপছাড়া দেখায়। বাস্তবিক আমার অনেক সময় মনে হয় এ দেশের মুণ্ডিত শীর্ষগণ, আর নথভারে-বিব্রতা টানা-খোপা পীড়িতাগণ কি পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া আত্ম-হারা হইয়া মনে করে—"দেখি দেখি আবার দেখি, দেখিবার সাধ মেটে না ত?" অবশ্য করেন, নহিলে এতদিন দেশের পুরুষদিগের ন্যাড়া মাথা চুলে ভরিয়া উঠিত; আর স্ত্রীলোকের সাজ সজ্জা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ হইয়া দাঁড়াইত। যদিও জ্ঞানে ইহা বুঝি, তবুও

কল্পনায় ঠিক ইহা ধারণা করিতে পারি না। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্ম্মা শকুন্তলা হইতে কয়েকটি দৃশ্য আঁকিয়াছেন; দু একখানি অতি সুন্দর হইয়াছে; বিশেষ সেইখানি, যেখানিতে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চুম্বন করিতে উদ্যত, আর শকুন্তলার অধরের মৃদুহাসিতে, নয়নের আবেশ দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে, দেহ ভঙ্গীতে, নব প্রণয়ের আধো বাধো লজ্জামাধুরী ও হৃদয়ের আগ্রহ ভাব; দুই একত্রে অতি মধুর তাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হইলে কি হয়, শকুন্তলা এখানে আধুনিক মহারাষ্ট্রী ললনা! তাহার পরিধানে কাছা আঁটা কোঁচা ঝুলান পরিচ্ছদ, তাহার মাথায় ফুলহারজড়িত কুণ্ডলাকৃতি বেণীবন্ধনের বাহার, মুখাবয়ব দেহগঠন সুশ্রী সুন্দর, কিন্তু মহারাষ্ট্রী জাতির আদর্শানুরূপ, সুতরাং চিত্র সুন্দর হইলেও —এ চিত্র দেখিয়া তপস্বী কন্যা বনবালা শকুন্তলাকে মনে পড়ে না। কি ভাগ্য, ইঁহার নাকে তবু মহারাষ্ট্রী ললনার নথ নাই! বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ দেশে চিত্রের অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। রবিবর্ম্মার এক একখানি ছবি ৫০/৬০ হাজারে বরদার রাজা কিনিয়া লইয়াছেন। মধ্যবিত্ত লোকেরা এ দেশে রবিবর্ম্মার শিষ্যদিগের অঙ্কিত চিত্রাদি ৩০০/৪০০ শত দামে এক একখানি ক্রয় করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আপাততঃ একটি সুখবর শুনা যাইতেছে; বোম্বাই নগরের একদল বণিকজাতি (বেণিয়া) পঞ্চায়েৎ করিয়া স্ত্রীলোকের নাকের নথ উঠাইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, কাজ কি এমন কাজে যাহাতে অন্য সব দেশের লোকেরা নিন্দা করে। এইবার হইতে যিনি নথ পরিবেন তাঁর দশ টাকা চারি আনা করিয়া দণ্ড দিতে হইবে। যদিও ১০ টাকার উপর আবার চারি আনাটা যে কেন সেটা ঠিক বোঝা গেল না। স্ত্রীলোকে পঞ্চায়েৎ করিয়া এখন পুরুষের ন্যাড়া মাথাটা উঠাইতে পারিলেই ঠিক হয়! তবে আপাততঃ অনুজ্ঞাটা অমনি ভালয় ভালয় পালিত হইবে, কিম্বা নথ খুলিবার আগে পুরুষদিগকে তাঁহারা একবার নাকখপ্তা দেওয়াইয়া লইবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এখানকার সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস, বিযুত স্ত্রীলোকদিগকে নথ-ধারণের আজ্ঞা দিয়াছেন। বুঝিবা সত্যযুগের সুদর্শন চক্র এ যুগে মহারাষ্ট্র ললনার নাসিকার নথরূপ ধারণ করিয়াছে! অন্ততঃ তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহার জোরে তাঁহারা অলক্ষ্যে ছিন্নহৃদয় করিয়া পুরুষ বিজয় করেন। এ বিশ্বাসটা যে তাঁহাদের নিতান্তই ভুল এমন মনে করিও না। সম্প্রতি পুনায় একটা Fancy Dress Ball হইবে; আমাদের যাইবার কথা আছে। আমি ভাবিতেছিলাম এ দেশী রাণী সাজিলে হয়। তাই এখানকার একজন ভদ্রলোককে কতকগুলি গহনা জোগাড় করিয়া দিতে বলায় তিনি বলিলেন, তাহা হইলে নাকে বড়বড় মুক্তার নথ, আর পায়ে মণখানেক আন্দাজ মল পরিতে হইবে। তাহা শুনিয়া ভাবিলাম, কাজ নাই আমার রাণী সাজায়! যাহা আছি বেশ আছি। এই ভদ্রলোকটি সুশিক্ষিত, মার্জ্জিত-রুচি; বঙ্গদেশে ইনি গিয়াছিলেন, বঙ্গভাষা জানেন, বাঙ্গালী বুদ্ধি, বাঙ্গালীরুচির প্রশংসা করেন। ইঁহার নথ কেমন লাগে? একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। অবশ্য আশা করা গিয়াছিল ইনি বলিবেন,—'যদবিশ্রী'—কিন্তু ইনি উত্তর করিলেন, "মন্দ না, নথ নাকে না থাকিলে মুখ কেমন খালি খালি দেখায়!" অথচ আমার মনে হয়, আমি যদি পুরুষ হইতাম আর শুভ দৃষ্টির সময় এইরূপ নথ-পরা মুখ আমার নয়নে পড়িত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই আলপনা পিঁড়ি হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া দৌড় দিতাম। এ দেশের মেয়েদের অনেককে বেশ দেখিতে; বিশেষতঃ ছোটবেলায়

ইহাদের মুখগুলি বেশ থাকে, বিবাহ না হইলে ত ইহারা আর নথ পরে না। সেই ছোট ছোট সুন্দর মুখগুলির দিকে চাহিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে, আহা দুদিনে এই শ্রী কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়িবে! বাস্তবিক এ দেশের আর সব ভাল ; এ দেশের লোকের বুদ্ধির বেশ একটা গভীরতা দেখা যায় ; বাঙ্গালীরা ইহাদের তুলনায় অবশ্য তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল বুদ্ধি কিন্তু তৈলঙ্গ, রাণাদে প্রভৃতি এ দেশীয় বুদ্ধিমানগণকে দেখিয়া ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত পাকা মাথা বলিয়া মনে হয়। এক কথায় ইহারা বুদ্ধিমান অথচ ভদ্র ; তেজস্বী অথচ বিনয়ী। স্ত্রীলোককে ইহারা যথোচিত সম্মান করে ; পথে অসহায় দেখিলে উপহাস দৃষ্টিতে দেখে না, বড় লোককে সম্মান করিতে অপমান জ্ঞান করে না। তাহাদের এই বিনয় অনেকে হীনতার পরিচয়-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা ঔদ্ধত্যের অভাব মাত্র, তেজের অভাব নহে। তাই বলিতেছি ইহাদের সব ভাল, কেবল যদি আর পুরুষদিগের মুড়ান মাথা, গুড়ান টিকি ও লম্ব গুম্ফ, এবং স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার ও বেশ-বিন্যাসে এরূপ বিকৃত রুচি না দেখা যাইত! অসৌখিনতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যেন স্ত্রীপুরুষেরা মিলিয়া এ দেশে প্রাণপণ যত্ন করিতেছে।

এ দেশের অভ্যর্থনা প্রথা বড় সুন্দর। যাঁহাকে সমাদৃত করিতে হইবে ; তাঁহাকে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সম্ভ্রান্তদিগকে পানসুপারির নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ সভায় প্রায়ই নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে, আহারাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই ; তাহার পর বিদায়কালে নিমন্ত্রেতাগণের হস্তে আতর মর্দ্দন ও ফুলের তোড়া ও রাংতা-মণ্ডিত পান দান করিয়া, গলে ফুলহার পরাইয়া, গাত্রে গোলাপজল বর্ষণ করিয়া, তাঁহাদিগকে সম্মানিত করা হয়। যাঁহার সম্মানের জন্য প্রধানতঃ সভা আহূত, তাঁহার ফুলহার ও ফুলের তোড়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জজ সাহেব যতবার এখান হইতে কলিকাতা যান, ততবারই প্রায় এদেশের লোকেরা তাঁহাকে এইরূপে বিদায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। কখনো কখনো পান সুপারির অভ্যর্থনায় আতস বাজি ছুড়িয়া ইংরাজি বাজনা আনাইয়া মহা ধূমধাম করে।

গণপতি উৎসব উপলক্ষে সে দিন একজন ভদ্রলোকের বাড়ী আমাদের পান সুপারির নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণকারী ঠিক এ দেশী লোক নহেন, কর্ণাটী—বাণিজ্য ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে বাস করিতেছেন। দু এক বৎসর তাঁহার বিবাহ হইয়াছে—স্ত্রী নিতান্ত অল্প-বয়স্কা নহেন, ১৬/১৭ এইরূপ বোধ হয়। আমরা কিছু আগে গিয়াছিলাম, তখনো অন্য নিমন্ত্রিতগণ কেহই আসেন নাই, নৃত্যগীতাদিও আরম্ভ হয় নাই। নিতান্ত খুবড়ির মত ঠাকুর-দালানে শিবদুর্গা গণেশ কার্ত্তিককে লইয়া বিরাজিত ; সম্মুখে নানা রূপ খেলানা আর দেওয়ালগিরিতে ঝুলান ল্যাম্পে ও ভূমিস্থ বাতিতে ছোট্ট দালান আগুণ হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরের কাছে একটি দেয়ালের নিকট কৌচে আমরা বসিলাম। গীত আরম্ভ হইল,একজন হারমোনিয়মে সুর দিতে লাগিল, একজন তবলা বাজাইতে লাগিল, আর একজন কাণে হাত দিয়া গান করিতে লাগিল। একটু পরে গৃহস্বামীর আহ্বানে নব-বিবাহিতা গৃহিণী সভায় সন্তর্পণে সভয়ে সমাগত হইলেন ; আসিয়া নিস্তব্ধে পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা উঠিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলাম, যেন তিনিই আমাদের নিমন্ত্রিতা। কিন্তু তিনি কিছুতেই বসিবেন না, আমরা কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম, তিনি হিন্দুস্থানী বোঝেন না, মহারাষ্ট্রী বোঝেন না ; আমরা কেহ কর্ণাটী জানি না ; সুতরাং বাক্যালাপ বন্ধ, তবু

ইঙ্গিতে যতদূর হয় সমাদরে সস্নেহে পিঠে হাত দিয়া তাঁহাকে নিকটে বসাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই ব্যবহারে তিনি এত আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া উঠিলেন, যে সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।—আমি তখন আর অনুনয় না করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বুঝিলাম তাঁহার পক্ষে ইহাই জুলুম। তাঁহার আত্মীয়েরা বারবার তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিল—কিন্তু তিনি নির্ব্বাক পুত্তলির মত তবুও দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা চলিয়া আসিলাম, আসিবার আগে একটা খেলনার ক্ষুদ্র ভাল্লুক কলচালিত হইয়া আমাদের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। শুনিয়াছিলাম নৃত্যগীত হইবে; গীতের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ভাবিয়াছিলাম নাচটা ফাঁক গেল, কিন্তু Programme সব ঠিক্ ঠিক্।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গদেশ অপেক্ষা এদেশ আরো পশ্চাৎপদ। আসলে সকল বিষয়েই বাঙ্গালি গতিশীল, ইহারা স্থিতিশীল। নিজ বোম্বাই নগরীতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখা যায় বটে, তাহা পারসীদিগের মধ্যেই অধিকাংশ নিবদ্ধ। সুশিক্ষিত হিন্দু রমণীর সংখ্যা সেখানেই বিরল, আর এরূপ জায়গায় একটিও পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাঝে মাঝে আমরা দেশীয় স্ত্রী-সমাজ নিমন্ত্রণ করিয়া আলাপ পরিচয় করিতে চাই, কিন্তু পরস্পরের ভাষা না জানায় তাহাতে তেমন সুবিধা হইয়া ওঠে না। যাঁহারা হিন্দুস্থানী বোঝেন তাঁহাদের সঙ্গে তবু একরূপ চলে, তাঁহারা মারহাট্টি বলেন, আমরা হিন্দুস্থানী বলি। মারহাট্টি বাঙ্গলাই অনেকটা কাছাকাছি, এক রকম করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়; তবে কহা অবশ্য চলে না। পারসী স্ত্রীলোকেরা কথাবার্ত্তায় আলাপ সালাপে বেশ পটু; এখানকার পারসী মেয়েরা যে তেমন শিক্ষিত তাহা নহেন, তবু তাঁহারা বেশ সামাজিক। হিন্দু রমণীগণ লাজুক, চুপচাপ, ত্রস্ত ভীত; দশবার কথা কহিয়া তবে একবার উত্তর পাওয়া যায়। তাহার অর্থ প্রথমতঃ, ইহারা বাহিরের লোকের সহিত একেবারে মেশেন না; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ইঁহারা নিতান্ত সম্মান দৃষ্টিতে দেখেন। কারওয়ারে যখন ছিলাম তখন একজন সব জজের স্ত্রী একদিন আমাদিগকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা কি তাঁহাদেরই মত স্নানাহার করি! এ দেশে দেখিতেছি নামে মাত্র জেনানা নাই, অর্থাৎ মন্দিরে কিম্বা বাড়ীতে কোন অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া তিনি ঘোমটা না টানিয়াও নিকটে পাশ দিয়া চলিয়া যাইবেন, কিম্বা গৃহে নিমন্ত্রিতদিগকে আবশ্যক স্থলে পরিবেশনেও করিতে পারেন, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু লেখাপড়ায় কিম্বা সামাজিকতায় তাঁহাদিগকে অজ্ঞ দেখা যায়। এদেশের রাজাগণের মধ্যে আবার পুরোপুরি জেনানা প্রথার চলন দেখা যায়। তাঁহাদের স্ত্রীরা একেবারে পরদানসিন। আক্কেলকোটের রাণী কখন কখন প্রকাশ্য স্থলে তামাসা দেখিতে যান; কিন্তু ঢাকা গাড়ীর ভিতরে বসিয়া গাড়ীর পরদার ভিতর হইতে দেখেন। বরদার রাজা দুই বার নিজে বিলাত গিয়াছিলেন, একবার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, তথাপি এখন তিনি পরদানসিন। বেশী দিন নহে, হপ্তা খানেক হইল, বরদার রাজা নীলগিরি যাইতে পথে সোলাপুরে দুদিন অবস্থিতি করিয়া গিয়াছেন। সে দুদিন সহরে হুলস্থূল পড়িয়াছিল। দেশের লোকের এখানে সভা সমিতি স্কুল লাইব্রেরী সাধারণাগার আছে, সে সকল স্থলে হইতেই নিমন্ত্রণ ও সমাদর-পত্র (address) লাভে রাজা সম্মানিত হইয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, ধনীলোকেরা রাজনিমন্ত্রণ করিয়া সমারোহের ত্রুটি করেন নাই। মোট দুই

দিন রাজা এখানে ছিলেন, দুইদিন সকালে বিকালে অবিশ্রান্ত তাঁহার উপর এত সমাদর বর্ষিত হইয়াছিল! তবুও রাজা সময়াভাবে, এবং শেষ দিন নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সকল address-গুলি শুনিতে পারেন নাই। এ দেশের লোকেরা কতদূর উৎসাহ-পরায়ণ সম্মানশীল ; এবং শ্রম নিপুণ তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে।

রাজার সঙ্গে এখানকার সম্ভ্রান্ত সকলেরি অবশ্য নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু আমরা প্রথম দিন বিকালে Union Club-এর নিমন্ত্রণে মাত্র গিয়াছিলাম। আমরা গিয়া দেখিলাম, প্রতিদিন যেখানে মহারাষ্ট্রী যুবকেরা টেনিস খেলে, সেই ক্রীড়াস্থল একেবারে লোকারণ্য ; অত লোকের মধ্যে যাইতে কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু যখন আসিয়াছি তখন আর কথা কি। ক্রীড়াস্থলে ঢুকিয়াই রাজ-দর্শন পাইলাম ; তাঁহার নিকটেই আমাদের বসিবার স্থল, একজন মহারাষ্ট্রী তাঁহার সহিত তৎক্ষণাৎ আমাদের পরিচয় করিয়া দিলেন, রাজা সাদরে আমাদিগকে নিকটে বসাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, সম্মুখে যুবকেরা টেনিস খেলিতে লাগিল। রাজ-দর্শনে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। তাঁহাকে দেখিতে সুশ্রী, বয়স ২৫ হইতে ৩০শের মধ্যে ; সাজ সজ্জা সুরুচি-সঙ্গত, সুন্দর শুভ্র বেশ পরিধান—চোস্ত পাজামার উপর নাতিদীর্ঘ মলমল চাপকান, চাপকানের হাতা দুইটি গালা-চুনাট—মাথায় লাল পাগড়ী আর অধিকন্তু পাগড়ির নীচে কেশের শোভা প্রকাশ পাইতেছে, রাজার সুরুচি ও সাহসের ইহাতে চূড়ান্ত পরিচয় ; মহারাষ্ট্র জাতি হইয়া মস্তকে কেশ ধারণ করা কম কথা নহে। গহনার মধ্যে হাতে কতকগুলি বহুমূল্য অঙ্গুরী। রাজার কথাবার্ত্তা লোকের সহিত আচার ব্যবহারও অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি দুইবার বিলাত গমন করেন, সুতরাং তাঁহাতে ইংরাজি ভদ্রতা ও হিন্দু বিনয় একত্র মিশ্রিত। আমাদের সহিত তাঁহার প্রধানত ব্রাহ্মসমাজ, তাহার তিন শাখা, বঙ্গদেশের আধুনিক অবস্থা, এই সকল লইয়াই কথাবার্ত্তা হইল। কথায় কথায় আমি বলিলাম, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই এখন প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্ম, কেননা তাঁহারা মনে মনে সকলেই প্রায় এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। রাজা বলিলেন, —"কিন্তু মনের বিশ্বাস বাহিরের কার্য্যের সঙ্গে এক হওয়া চাই, তবেই ত তাহার সুদৃষ্টান্তে সুফল হইবে।" তাঁহারই উপযুক্ত কথা! তিনি জাতিগত আচার উপেক্ষা করিয়া সস্ত্রীক বিলাত গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, রাজ্যশাসনেও তাঁহার উদার মত প্রকাশিত হয়। বরদা রাজ্য অতি সুশাসিত ; প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের দিকে রাজার বিশেষ লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে ইনি আদর্শ রাজ বলিলেও হয়। আজ কাল ভারতবর্ষের অনেক রাজা ইংরাজি শিক্ষার গুণে ইংরাজের প্রকৃত রাজগুণ লাভ না করিয়া কেবল ক্রীড়া, কৌতুক, শিকারেই কালাতিবাহিত করেন। কিন্তু বরদারাজ আমোদে উন্মত্ত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য ভোলেন নাই ; ইংরাজ সম্মিলনে ইঁহার দেশানুরাগ প্রজাপ্রিয়তা হ্রাস হয় নাই। আমি ত মনে করিতে পারি না বঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজা দেশের সামান্য লোকের আহ্বানে এরূপ প্রফুল্ল-ভাবে এরূপ বিনয় সহকারে তাহাদের মধ্যে আসিয়া তাহাদের সম্মানিত করিয়া নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন। তাঁহার দেশের লোকের সহিত কতটুক সম্বন্ধ! ইংরাজের সহিতই তাঁহার আচার ব্যবহার, ইংরাজ লইয়াই তাঁহার কারকারবার, ইংরাজকে আমোদ দান করাই যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। বিলাত যাইয়া

আর ইংরাজের সহিত মিশিয়া তাঁহার এই হইয়াছে, যে তিনি দেশীয় লোককে অবজ্ঞা করেন আর সর্ব্বতোভাবে ইংরাজ হইতে চাহেন ; আর বরদা-রাজ বিলাত যাইয়া দেশীয়-লোককে বিশেষ আপনার বলিয়া মনে করেন। এক দিকে ইংরাজদিগের সুপ্রথা সুশাসন অবলম্বনে রাজ্য পালন করেন, অন্য দিকে প্রজাদিগকে দেখাইতে চাহেন তিনিও তাহাদেরই এক জন ; জাতিতে এক, হৃদয়ে এক, আচার ব্যবহারে এক, তিনিও যা আর তাঁহার প্রজাগণও তাহাই ; তিনি যে রাজা, তিনি যে বড়, সে কেবল তাহাদের লইয়াই। বাস্তবিক সে দিন রাজ-সভায় গিয়া যে কি আনন্দলাভ করিয়াছিলাম বলিতে পারি না, চারিদিকে আনন্দ প্রফুল্ল মুখ, তাহাদের সেই আনন্দে রাজা পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ ; রাজভক্তি ও দেশীয় বৎসলতার আদান প্রদানে চারিদিক উথলিত। রাজদর্শনের যে সুখ, সেই দিন যথার্থ উপলব্ধি করিলাম। লাটপত্নীর মহা সমারোহময় উৎসব আসরে গিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তায় সম্মানিত হইয়াছি ; কিন্তু এই সামান্য টেনিস সভায় সামান্য জনসাধারণ বেষ্টিত রাজ-সভা দর্শন করিয়া যে সুখ পাইয়াছি তাহার নিকট তাহা কিছুই নহে! রাজাকে দেখিয়া মহারাষ্ট্রী জাতির উপর শতগুণ শ্রদ্ধা বাড়িল। বাঙ্গালী উন্নতশীল সত্য ; কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তার নিজের ভার অতি অল্প, কিন্তু মহারাষ্ট্রী আপন ভারে তরঙ্গ পরিচালনা করিতে পারে।

২

আমরা অল্প দিনের জন্য পুনায় বেড়াইতে আসিয়াছি। পুনার প্রকৃত নাম পুণ্যপুর তাহা বোধ হয় জান ; নাম সার্থক বটে। এমন সুদৃশ্য শোভাময় স্থান বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমি আরো অনেক বার পুনায় আসিয়াছি, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কখনো আশ মিটিল না। নগরপ্রান্তে আকাশের গায় শ্যাম পর্ব্বতের স্তর ; সুপ্রশস্ত রাজপথের ধারে—কোথাও বিচিত্র উদ্যান ভবনাবলি, কোথাও পদ্ম-শোভিত হ্রদ, কোথাও প্রশস্ত শ্যাম ক্ষেত্র, কোথাও লীলাময়ী নদীর সুনীল জলরাশির শোভা সম্পাদন করিতেছে। মাঝে মাঝে কোন কোন স্থানে সোলাপুরের মত শুষ্ক তরুবিরল ক্ষেত্র এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় ভূমিও দেখা যায়, কিন্তু মরুদৃশ্য এবং উপবন শোভার এই মিলন বৈচিত্র্যে পরস্পরের শোভা আরো রমণীয়রূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

পুনায় দুইটি সাধারণ ভ্রমণোদ্যান আছে। একটি সৈনিক কানন (Soldiers' Gardens) খড়কওয়াসলা নামক খালের ধারে। আর একটি বাঁধের বাগান (Bund Gardens) সম্বৎসর জলপূর্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে নদীর যে উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে, এই বাগান ঠিক সেই বাঁধের ধারে। এই কানন পুনার পুণ্য নিকেতন বা সৌন্দর্য্য কেন্দ্র। এ বাগান একবার দেখিলে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনেও আর মন উঠে না। "দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ"—এ কথা এখানে ঠিক খাটে। মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে ও রুচিচাতুর্য্যে প্রকৃতি সেখানে চিত্রিত ; এখানে স্বয়ং প্রকৃতির আবির্ভাব— তাই উদ্যান শোভা প্রাকৃতিক শোভায় মিলিত হইয়া এখানে এক অলৌকিক মহিমাময় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। কাননতলে দাঁড়াইয়া দেখ, দুই নদীর সম্মিলিত বিশাল জলপ্রপাত প্রস্তর-গঠিত উচ্চ বাঁধ অতিক্রম করিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতে হইতে চৌদিকে শুভ্র নীহার-

কণা বিকীর্ণ করিয়া সুমধুর গভীর কল্লোলে নিম্নের প্রস্তর-খণ্ডময় বিদারিত উৎখাদিত ভূমিতে পড়িয়া ক্ষীণভাবে বহিয়া যাইতেছে। নদীর এক পার্শ্বে পর্ব্বত দৃশ্য, অন্য পার্শ্বে সেই অতি মনোহর ক্ষুদ্র কানন,—যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ। কাননের কোন স্থলে মাটি দেখা যায় না। ফুলের টব, বৃক্ষতল, ভ্রমণ পথ, উদ্যান ভূমি, সর্ব্বস্থলই কঙ্করাচ্ছন্ন। এই শ্বেত কৃষ্ণ কঙ্কর শোভার মধ্যে স্থানে স্থানে বিচিত্র ফুলের কেয়ারি, স্থানে স্থানে তরুলতার বিচিত্র নিকুঞ্জ, স্থানে স্থানে ফুলের টবের অপরূপ বিন্যাস, এবং স্থানে স্থানে বসিবার লৌহাসন। মধ্যস্থলে ফোয়ারা খেলিতেছে। ফোয়ারার ক্ষুদ্র হ্রদে নীলাকাশ প্রতিবিম্বিত, ভ্রমণ পথের ধারে ধারে ক্রমক্ষীণ সুন্দর ঝাউ শ্রেণী মন্দির চূড়ার ন্যায় শোভিত হইয়াছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে দিগন্তের উজ্জ্বল মেঘাংশ উঁকি মারিতেছে। আর এই সকল শোভার শোভাস্বরূপ হইয়া পারসী যুবক যুবতী, বালক বালিকাগণ কতকগুলি বা উদ্যানে বিচরণ করিতেছে, কতকগুলি বা বাগানের সীমানায় লৌহশিকলের নিকট দাঁড়াইয়া জলপ্রপাতের শোভা দেখিতেছে, কোন দুইটি যুগলমূর্ত্তি বা নির্জ্জন লৌহাসনে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছে। পারসী ললনাদিগের বর্ণ-লাবণ্য ও সাজসজ্জার শোভায় কাননদেশ যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ জ্যোৎস্না রাত্রে, চন্দ্রশোভিত নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলে, কাননের শুভ্র কঙ্করমণি যখন ঝকঝক করিতে থাকে, এক দিকে নদীর জলোচ্ছ্বাসে, অন্য দিকে ফোয়ারার ধারায় যখন স্নিগ্ধ চন্দ্রজ্যোতি খেলিতে থাকে, ব্যাঙের বাজনা জলকল্লোলের সহিত যখন অপরূপ তান মিশাইতে থাকে, তখন কাননবিহারী পারসিকদিগের মুখপানে চাহিয়া মনে হয়, ইহা কি অপ্সরারাজ্য—অলকাপুরী?

এই যে সকল শোভা সৌন্দর্য্যের কথা বলিলাম, দেশীয় পাড়ার সহিত তাহার অনেকটা দূর সম্বন্ধ। ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধান ভানিতে হয়—ইহা ত জানাশুনা কথা। এই সুদৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও এখানকার দেশীয় পাড়া তাহার অবস্থার শোচনীয় চিরগৌরব সমানভাবে রক্ষা করিয়াছে। সেই গলিঘুঁজি রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে সেই খুবড়ি খুবড়ি দোকান ঘর, দোকানের আশে পাশে সেই ছোট ছোট জানালা দরজাওয়ালা সরু, লম্বা তিনতলা চৌতলা নীরেট বদ্ধ বসতবাড়ী। ইহাদের নির্ম্মাণ কৌশলের বিশেষত্বই যেন এই, কত কম আলো ও হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়। গুণের মধ্যে বাড়ীগুলো পাথরের—ও নিতান্ত আঁট সাঁট মজবুদ। আমাদের হিন্দুজাতি নাকি মায়াবাদী—এই মায়াময় অস্থায়ী সংসারে যাহা যতটুকু স্থায়ী করিয়া ভোগ দখলের সুবিধা করা যাইতে পারে—তাহারি দিকে তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন সকলের মধ্যেই এই ভাব। সৌন্দর্য্যের জন্যই সৌন্দর্য্যের আদর, আমাদের শিল্পে কম দেখা যায়। স্থায়িত্বেই আমরা শিল্পের সৌন্দর্য্য ফুটাইতে অধিক প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে দেখা যাইতেছে মায়াবাদে আমাদের আরও বেশী রকম Practical করিয়া তুলিয়াছে, আর ইংরাজেরা Practical বলিয়া মায়াকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহারা সার বুঝিয়াছে, Eat, drink, and be merry। চিরদিন কিছুই থাকে না সত্য, আমরাও থাকি না, তবে যতদিন আছি সুখে থাকি, আরামে থাকি ; যতটুকু পাই ভোগ করি। অত স্থায়ী অস্থায়ী দেখিবার আবশ্যক কি, বর্ত্তমানের ভাবনাই ভাব, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কি লাভ! সুন্দর যাহা কিছু পাও আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা কর, যতটুক পার যতটুক না পার। সুযোগ যতদূর পার আয়ত্ত

করিতে চেষ্টা কর, যতটুক পাও আর যতটুক না পাও। ইহাকেই বলি জ্ঞানবাদী। ইহাতেই ইংরাজ দুদিনের জন্য কোন স্থানে গিয়াও তাহার মধ্যে যতটুক আরামে থাকিতে পারে তাহার চেষ্টার ত্রুটি করে না। আর আমাদের হাতের কাছে থাকিলেও দুদিনের সুবিধাকে আমরা অবজ্ঞা করি।

পুনার ইংরাজ পাড়ার অধিকাংশ বাড়ী এখানকার বড়মানুষ লোকের। কিন্তু ময়রার সন্দেশের মত তাঁহারা অধিকারী মাত্র, ভোগ করেন ইংরাজে। হরিরাওজি নামে পুনার এক হিন্দু ধনী, ডিউক অব কনটের জন্য যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখন তাহা খালি পড়িয়া আছে,—তবু তিনি তাহাতে বাস করেন না; সম্ভবত দেশী পাড়ার এক অন্ধকার খুবড়ির মধ্যে তাঁহার বসতি। নিঃস্বার্থপরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত!

আমার মতে পুনার, পুণ্য স্থান বাঁধের বাগান, কিন্তু এদেশীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিবে না। পুনার পার্ব্বতী মন্দিরের নাম শুনিয়া থাকিবে, তাহাই পুণ্য-পুরের পুণ্যতীর্থ বলিয়া খ্যাত। পার্ব্বতী-পাহাড়ের উপর পুনার পেসোয়াদিগের যে বিশ্রাম প্রাসাদ ছিল ইহা তাহারই সংলগ্ন মন্দির। মন্দির-দেবীর নাম হইতে পাহাড়ের নাম পার্ব্বতী হইয়াছে। পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে মন্দির পাদমূল পর্য্যন্ত সিঁড়ির ধাপ, একটি ধাপ হইতে আর একটি ধাপের মধ্যে এত ব্যবধান যে তাহার মধ্যে অন্ততঃ আরো ১০টি মানান-সই সিঁড়ি হইতে পারিত। তবে এই ব্যবধান স্থলগুলিও এমন ঢালু যে উঠিতে কোন অসুবিধা হয় না। সিঁড়ির সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০শ খানেক হইবে। এত সিঁড়ি এক টানে উঠা আমাদের অবশ্য কর্ম্ম নহে, আমরা দুই তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া তবুও গলদঘর্ম্ম অবস্থায় মন্দির দ্বারে আসিয়া পঁহুছিলাম। এতক্ষণ আশা ছিল দেবী দর্শনে সমস্ত কষ্ট সার্থক হইবে। ওমা, উপরে উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই মন্দিরদ্বারস্থিত এক স্থূলকায় স্ত্রীলোক আমাদিগকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। আমাদের সঙ্গী বন্ধুটি অনেকবার করিয়া বলিলেন আমরা হিন্দু, কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস করে কে? প্রথমতঃ আমাদের পায়ে জুতা, দ্বিতীয়তঃ আমাদের ভাব ভক্তিতে দেব ভক্তির সম্পূর্ণ অভাব। আমরা মন্দির দেখিয়াই প্রণাম করি নাই বা পূজক যখন দেবপ্রসাদ ফুল চন্দন আমাদের হাতে দিলেন, তখনও আমরা প্রণত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলাম না। আমাদের অহিন্দুত্বের এই সকল অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে অন্যের মুখের সামান্য কথার বল কতটুক! তবে অহিন্দুকে যেন মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায় না; কিন্তু তাহার দান ত অস্পৃশ্য নহে। সুতরাং পুরোহিত মহা বিনীতভাবে আমাদিগকে দূর হইতে দেবদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রেলের বেড়ার বাহিরে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে দৃষ্টিনিবেশ করিলাম। মন্দির অপেক্ষাকৃত অন্ধকার, অতদূর হইতে মূর্ত্তি ভাল দেখা যায় না। পুরোহিত অনুগ্রহ পূর্ব্বক মূর্ত্তির নিকট প্রদীপ ধরিলেন। আমরা এদিকে ঝুঁকিয়া ওদিকে ঝুঁকিয়া যথাসাধ্য প্রকারে দেবীমূর্ত্তিকে দর্শনায়ত্ত করিতে প্রয়াস করিতে লাগিলাম। কিন্তু বৃথা! সম্মুখে মূর্ত্তি সত্য, স্বর্ণময় বৃহৎ দেবমূর্ত্তি। কিন্তু পার্ব্বতী কোথায়? গণেশকে ক্রোড়ে করিয়া এ ত মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। আমরা হতাশ হইয়া অবশেষে বলিলাম—"পার্ব্বতী ত দেখিতেছি না, ইহা ত মহাদেব!" পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "সকল লোক

পার্ব্বতী দেখিতেছে—তোমরা দেখিতেছ না?" ভাবখানা—তোমাদের মত ত পাপী ভূ-ভারতে নাই। যে পুরোহিত আলো ধরিয়া দেবদর্শন করাইতেছিল, সে বরঞ্চ লজ্জিতভাবে বলিল—"না না, এই দেখ, ভাল করিয়া আলো ধরিতেছি।" আবার আমরা মহাদেবের চারিদিকে পার্ব্বতীর অন্বেষণ-তৎপর হইলাম। অনেক কষ্টে দেখিলাম, মহাদেবের ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র এক পার্ব্বতী মূর্ত্তি লম্বোদর গজাননের পার্শ্বে এমন লুকাইয়া আছে যে দেখা যায় কি না যায়।

এখানে পার্ব্বতীর নামে মহাদেবই ধন্য। তবে এরূপ ফাঁকি জুঁকিতে দেবী যদি কিছু মনে করেন, তাহার প্রতিবিধানস্বরূপ মন্দিরগৃহের বহিঃস্থ দুই দেয়ালে পার্ব্বতীর দুই বৃহৎ মূর্ত্তি চিত্রিত। কিন্তু এই চিত্রের প্রতি কাহারো আকর্ষণ বা ভক্তি দেখা গেল না। সকলে আসিয়া মন্দিরস্থিত দেবদেবীকেই প্রণাম করিতে লাগিল। একজন স্থূলকায় মহারাষ্ট্রী ললনা এমন সুন্দরভঙ্গীতে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া উঠিল, দেখিলে মনে হয়, তাহার জন্য বিশেষ কষ্টের আবশ্যক। কতকগুলি সুসজ্জিত গুজরাটী স্ত্রীলোক দেবীপ্রণাম করিয়া পাহাড়ের অন্যান্য স্থান দেখিয়া বেড়াইতেছিল, আমরাও তাহাদের পথানুসরণ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিঁড়ি হইতে উপরে উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে পার্ব্বতী মন্দির,—চারিদিকে পরস্পর সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বিতল প্রকোষ্ঠ, বামদিকের প্রথম প্রকোষ্ঠ নহবৎখানা। এই শ্রেণীতে একটি ত্রিতল প্রকোষ্ঠও আছে, ইহার বাতায়ন সম্মুখে সুন্দর দৃশ্য উদঘাটিত। নীচে "পদতলে খড়কওয়াসলার" হ্রদ প্রবাহিত, দূরে পাহাড়ের পদতলে খিড়কির সুবিস্তৃত মাঠ। এই খিড়কি মাঠেই যুদ্ধ জয় করিয়া মহারাষ্ট্রদিগের নিকট ইংরাজেরা পুনা লাভ করেন। খিড়কি আর কি পুণার আলিপুর—এইখানেই গভর্ণমেণ্ট হাউস; অপরাপর মান্যগণ্য ইংরাজ রাজপুরুষগণও অনেকে এখানকার নদীর ধারের বাঙ্গালায় বাস করেন।

যে দিন খিড়কির ক্ষেত্রে ইংরাজ মহারাষ্ট্রীতে যুদ্ধ হইতেছিল, সেদিন পুনার শেষ পেসোয়া বাজিরাও পার্ব্বতীর উল্লিখিত ত্রিতল প্রকোষ্ঠ হইতে আপনার অদৃষ্ট পরিণাম দর্শনে নিযুক্ত ছিলেন। যখন দেখিলেন পরাজিত মহারাষ্ট্রীয় সেনা পলায়নপর, তখন তিনিও প্রাসাদ উত্তীর্ণ হইয়া পলাতক হইলেন। পাহাড়ের এক প্রান্তে পেসোয়াদিগের ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান, প্রাসাদের নিকটে আর একটি শিবমন্দির। মন্দিরের পুরোহিতগণ গভর্ণমেণ্ট হইতে এখনো বৃত্তি পাইয়া থাকেন। পার্ব্বতীর এই রাজপ্রাসাদে নাকি সাতবার বজ্র পড়িয়াছিল। বাজিরাও রাজ্য হারাইবার বৎসর খানেক আগে বুঝি শেষ বজ্র পতন হয়। জ্যোতিষীগণ ইহাতে রাজার ভাবী অমঙ্গল সূচিত দেখিলেন। তাহা শুনিয়া বাজিরাও দান ধ্যান দেব পূজা স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি বিধিমত প্রকারে এই অমঙ্গলের প্রতিবিধানে সযত্ন হইলেন। কিন্তু পোড়াকপাল জোড়া দেওয়া দেবতারো সাধ্যায়ত্ত নহে। অগ্নিদেবের রাজ-অদৃষ্টের প্রতি এমনি কৃপা যে তাঁহার পুনার যে প্রাসাদ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড অফিস হইয়াছিল, ১০/১২ বৎসর আগে সেই প্রকাণ্ড প্রস্তর অট্টালিকাও পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পেসোয়াদিগের আমলের পুরাতন প্রাসাদ পার্ব্বতী যাইতে পথে এখনও দু একটি দেখা যায়। চূড়াযুক্ত বৃহত্তোরণ বাড়ীগুলির বহির্ভাগ দেখিতে বেশ সুদৃশ্য, ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুক্ত উঠান, চারিদিকে চকমিলান ঘর, কিন্তু ঘরগুলি বিশেষতঃ জানালা দরজা নিতান্ত ছোট ছোট।

পার্ব্বতীর মন্দির ছাড়া আমরা পুনার আর একটি পাহাড়-মন্দির দেখিয়াছি। তাহাও দেবীমন্দির, কিন্তু দেবীর নাম জানি না। গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাছে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে একটি লম্বা ঘর—ঘরের মধ্যে সাত হাত পুরু মাটি জমিয়াছে, তাহার একদিকে দেবী বিরাজিত, মূর্ত্তিখানি চাঁদপারা বলিতে পারা যায়। দেবীর শরীরে হাত পা নাই, মুখখানি পাথরের চাক্তি, তাহাতে নাক চোখের শুধু চিহ্নমাত্র আছে, আর আগাগোড়া সমস্তই সিঁদুর মাখান। ইহার মাহাত্ম্য কতদূর জানি না, তবে পূজার অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখিলাম না। গৃহের কোণে ঢাক ঢোল পড়িয়াছিল—আমাদের কর্ণকুহর বিদারিত করিয়া দুইজনে তাহা পিটিতে আরম্ভ করিল, আর পূজারী প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করিতে লাগিলেন—শেষ হইলে বলিলেন—বড় জাগ্রত দেবতা, আমাদের যদি কোন মানস থাকে, চাহিলে তাহা পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমরা ইহাতে বিপরীত অর্থ বুঝিলাম। সুতরাং নিজের মানস মনে রাখিয়া পুরোহিতের মানসসিদ্ধি করিয়াই গৃহে ফিরিলাম।

নিজ পুনার এই সকল পাহাড় নিতান্ত ছোট ছোট তবে ইহার কাছাকাছি অনেকগুলি বড় পাহাড় আছে, যেমন মহাবলেশ্বর, পঞ্চগণি, সিংহগড়। মহাবলেশ্বর ত গ্রীষ্মকালে পুনার বিহার ভবন, বড় বড় ইংরাজেরা প্রায় অনেকেই সেখানে যান, কেহ বা পঞ্চগণি ভালবাসেন। সিংহগড় ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং নিকটে। ইহা পুনা হইতে মোট ১৪ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। আমি মহাবলেশ্বর, পঞ্চগণি দেখি নাই, কিন্তু পূর্ব্বে একবার সিংহগড়ে গিয়াছিলাম। সিংহগড় শিবজির একটি প্রধান দুর্গ ছিল। ইহার প্রকাশ্য পাহাড় পথ ছাড়া লুক্কায়িত একটি সোপান পথ আছে। আমরা সেই সিঁড়ি দিয়া অনেকটা নামিয়াছিলাম, কিন্তু সবটা নামি নাই। পাহাড়ের মধ্য দিয়া অন্ধকার সোপানশ্রেণীর বেশী দূর যাইতে সাহস হইল না। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে এখনও কামান পড়িয়া আছে। আমরা যখন সিংহগড়ে গিয়াছিলাম, তখন বর্ষার শেষ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝরণার শোভা, আর পাহাড়ের ক্রোড়ে যেখানে সেখানে হ্রদ। এই হ্রদই সিংহগড়ের একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য। আমি ত অন্য পাহাড়ে এরূপ হ্রদ দেখি নাই। পাথরের জমির উপর স্থানে স্থানে পরিষ্কার জল তক্ তক্ করিতেছে, দেখিতে বড় সুন্দর। সিংহগড়ের সর্ব্বত্রই প্রায় পাথর, দারজিলিংয়ের মত ইহা মৃত্তিকা-বহুল পাহাড় নহে। পাহাড়ের কোন কোন স্থানে গাছের জঙ্গল, জঙ্গলে কোথাও একটা ভগ্ন মন্দির, মন্দিরে বীরহনুমান মূর্ত্তি, স্থানে স্থানে বৃক্ষতলেও সিন্দূরচর্চ্চিত পবন নন্দন অধিষ্ঠিত।

সিংহগড়ের উচ্চ শিখরদেশে আমরা ছিলাম, তাহার একটু নীচে এক গ্রামে দেবালয় দর্শন করিতে গিয়া দুই একটি প্রকাণ্ড বল্মীকস্তূপ দেখিয়াছিলাম। একটি ত মন্দির গৃহের শিখর দেশ প্রায় স্পর্শ করে করে এত উচ্চে উঠিয়াছে।

পুনার কাছাকাছি কারলি গুহা প্রভৃতি আরো কতকগুলি দর্শনীয় স্থান আছে। কিন্তু তাহা আমাদের দেখা ঘটিয়া উঠে নাই, ইচ্ছাও নাই। আপাততঃ আমরা পুনার বহির্শোভা ছাড়িয়া অন্তর্শোভা দেখিতে ব্যস্ত আছি। দেখিতেছি, পুনার গৌরব কেবল বাহিরের নহে, অন্তর্মহিমাতেও পুনার পুণ্য প্রকাশিত। কিছুদিন পূর্ব্বে পুনা মহারাষ্ট্রীয় রাজধানী ছিল, এখন যদিও সে হৃত-রাজ, তথাপি হিন্দুসম্ভ্রমের এখনো ইহা আকর স্থল। যে হিসাবে বোম্বাইকে পারসিপ্রধান সহর বলিলে অত্যুক্তি হয় না—কেননা ধনে মানে খ্যাতি

প্রতিপত্তিতে পারসীকেরাই সর্ব্বাগ্রে এবং প্রধানতঃ যেখানে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই হিসাবে পুনাকে হিন্দুপ্রধান স্থল বলা যাইতে পারে। রাণাদে, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি এদেশের শীর্ষস্থানীয় গণ্যমান্য উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ এখানে বাস করেন। একদিকে তাঁহাদের প্রবাহিত সমাজ-সংস্কার স্রোত, অন্যদিকে স্থিতিশীলদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই আঘাত প্রতিঘাত সংঘর্ষণে এখানকার হিন্দু সমাজে একটি জীবন্ত ভাব দেখা যায়। তথাপি বঙ্গ সমাজের তুলনায় এ স্রোতোবেগ মৃদু মন্দ। এ দেশের প্রার্থনা সমাজের সভ্য একেশ্বরবাদীগণও আচারে হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া চলেন। সেইজন্য এতদিন উন্নতিশীল ও স্থিতিশীলের মধ্যে বড় একটা বিবাদ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি উন্নতিশীলদিগের এক ঘর-শত্রু বিভীষণের কৃপায় বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিলক মহাশয়ও পূর্ব্বে সমাজ সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু Consent Bill পাশ হইবার সময় বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন করিয়া "শুধাকর"দিগের (সংস্কারক) ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এমন কি, এক মিসনারীর টি পার্টিতে গিয়া সম্প্রতি যাঁহারা চা খাইয়াছিলেন, তিলক-প্রমুখ দল তাঁহাদিগকে একঘরে করিয়াছে। এখন আর ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া একঘরে করা যায় না ; এখানে ভিক্ষুক বলিয়া একরূপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আছে, ক্রিয়াকর্ম্মের সময় তাহারা দান গ্রহণ না করিলে নাকি ক্রিয়াকর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। তাহারা ইহাদিগের নিকট দান গ্রহণে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু রাণাদে মহাশয় এক বুদ্ধি খেলিয়াছেন। তিনি ছয় জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত চা-পায়ীদিগের মধ্যে কাহারো ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে ভিক্ষুকের অভাবে তাহাদের ক্রিয়া নষ্ট হইবে না।

যাহা হউক, সমাজের এই নির্যাতন সহ্য করিয়াও উন্নতিশীলগণ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—ইহা মহারাষ্ট্রীজাতির কম গৌরবের কথা নহে। স্ত্রীশিক্ষাও বিস্তার লাভ করিতেছে, বাল্যবিবাহ-রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য পড়িয়াছে। এলফিনিষ্টন কলেজের প্রফেসর মোদক তাঁহার কন্যাকে ১৩/১৪ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়াছেন, এবং পণ্ডিতপ্রবর ভাণ্ডারকর সম্প্রতি তাঁহার বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিয়াছেন। সমাজ এখন চীৎকার করিয়া মরুক।

কোন দেশের সামাজিক অবস্থার সহিত সাহিত্যের অবস্থার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একের উন্নতির উপর অন্যের উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং বলা বাহুল্য, সাহিত্যেরও এদেশে উন্নতি সাধিত হইতেছে। তবে এ সম্বন্ধেও বঙ্গদেশ অধিক সৌভাগ্যবান্, এদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যে বঙ্গের প্রতিভা দেখা যায় না। তেমন পুরাতন সাহিত্যে মহারাষ্ট্রের নিকট বঙ্গ নতমুখ। কাব্যাংশে উভয় সাহিত্যই সমতুল বলা যাইতে পারে ; আমাদের বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় তুকারাম, জ্ঞানেশ্বর, নামদেব প্রভৃতি সুবিখ্যাত ভক্ত কবিগণ মহারাষ্ট্র সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন বঙ্গ সাহিত্যের ন্যায় এইখানেই তাহার গৌরবের সীমা নহে। মহারাষ্ট্রী পুরাতন সাহিত্যের প্রকৃত মান, তাহার ইতিহাসে বখরে। আসল কথা মহারাষ্ট্রী পুরাতন জাতি, বাঙ্গালী নূতন জাতি, বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিবার কিছু ছিল না, তাই ইতিহাস নাই। কীর্ত্তি থাকিলেই তবে ত তাহা কীর্ত্তিত হইবে? তাই ভারতের অন্যান্য সকল জাতির নাম ও মান তাহাদের পুরাতন গৌরবে—বাঙ্গালীর নাম বর্ত্তমানে, ও মানের আশা ভবিষ্যতে।

যাক্ কি বলিতেছিলাম, এদেশে এখন সাহিত্যেরও বেশ অনুশীলন দেখা যায়। নগরে গ্রামে সাপ্তাহিক পত্রিকার ছড়াছড়ি, মাসিক পত্রিকাও নিতান্ত বিরল নহে। স্ত্রীলোকও এখানে সম্পাদকতা কার্য্য করিয়া থাকেন। মিশেষ কনিৎকর 'মনোরঞ্জন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা। ইহাতে নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদও ইহাতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কনিৎকর মহাশয় নিজে মিলের *Subjection of Women* তর্জ্জমা করিয়া ক্রমে ক্রমে ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদিকা উপন্যাসাদি লেখেন। অনেকেই আজকাল উপন্যাস লিখিতেছেন। সম্প্রতি বাজিরাও পেসোয়ার পতন সম্বন্ধীয় একখানি উপন্যাস আমরা উপহার পাইয়াছি, তবে মহারাষ্ট্রী ভাষায় এতদূর বিদ্যা নাই যে ইহার গুণপনা কতদূর বিচার করিতে পারি। কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি কল্পনাপ্রসূত রচনাদি ছাড়া ইংরাজি কাব্যাদির যথেষ্ট অনুবাদও হইতেছে। আমরা ওথেলো ও হ্যামলেটের অভিনয় যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ত অনুবাদ বেশ সুন্দর বলিয়া মনে হইল। অনুবাদে কাব্যের মূল ভাব বজায় রাখিয়া নাম প্রভৃতির পরিবর্ত্তনে ঠিক্ দেশের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। নহিলে ডেসডেমোনার নাকে নথ আর হ্যামলেটের মহারাষ্ট্রী ভাষায় আত্মচিন্তা সমস্তই অদ্ভুত হইত। কিন্তু রাও সাহেবের কন্যা চন্দ্রাবতীতে সে সাজসজ্জা যেমন স্বাভাবিক হইয়াছিল, বীরসেনের মুখে তাহার আত্ম-চিন্তাও তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পুরুষই যদিও এই অভিনয়ে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিল, তথাপি মোটের উপর অভিনয় বেশ ভালই বলিতে হয়। বীরসেনের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল।

পুনায় অনেকগুলি সভা সমিতি আছে। এখানকার আর্য্য মহিলা নামক মহিলা সমাজ ও সার্ব্বজনীন সভা নামক রাজনৈতিক সভার নাম ত আগেই জানিতাম; তাহা ছাড়া পুরুষদিগের খেলাধূলা, পাঠ, সম্মিলন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দুইটি ক্লব স্থাপিত দেখিতেছি। একটি নিজ সহরের মধ্যে হিন্দু ইয়ুনিয়ান ক্লব আর একটি সহরের বাহিরের ডেকন ক্লব, এখানে পারসী, মুসলমান, হিন্দু সকলেই সভ্য হইতে পারেন, সভ্যের সংখ্যাও না কি ইহার মধ্যে বিস্তর হইয়া পড়িয়াছে।

এতদ্ব্যতীত একটি সমাজ সংস্কারক সভা স্থাপনের অভিপ্রায়ে রাণাদে মহাশয় কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার নিয়মাবলী প্রচার করিতেছিলেন। তাহার তিনটি নিয়ম এই—

১। ইহার সভ্য কেহ বিধবা বিবাহে বাধা দিবেন না।

২। যৌবন বিবাহে আপত্তি করিবেন না।

৩। সুরাপান করিবেন না।

এ সভা সংগঠিত হইয়াছে কি না রাণাদে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম ২০০০ হাজার যুবক ইহার সভ্য হইতে প্রস্তুত, কিন্তু আপাততঃ পুনা যেরূপ উন্নতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান, তাহাতে কিছুদিনের জন্য তাঁহার মতে সভা সংগঠন স্থগিত রাখাই ভাল। তিনি বলেন কনসেণ্ট বিলের গোলযোগ হইতে পুনা সামাজিক উন্নতিপক্ষে ৫০ বৎসর পিছু হঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাণাদেই এখানকার উন্নতিশীলদিগের নেতা এবং উপযুক্ত নেতা। সমাজের, অবস্থা বুঝিয়া সাবধানে অথচ অটলপদে তিনি অগ্রসর হইতেছেন। প্রার্থনা সমাজেরও

ইনিই এখন দলপতি। এই প্রার্থনা সমাজ পূর্ব্বে পরমহংস সমাজ নামে একটি গুপ্ত সভা ছিল। বম্বের ডাক্তার আত্মারাম এবং রাম বালকৃষ্ণ এই দুজনে ইহার প্রথম স্থাপয়িতা। সভ্যগণ একেশ্বর মানিবেন এবং জাতি বিচার করিবেন না এই শপথবদ্ধ হইয়া শপথ পালনের নিদর্শনস্বরূপ পরস্পরের উচ্ছিষ্ট পাঁউরুটির টুকরা পরস্পরে ভক্ষণ করিতেন। তাহার পর ক্রমে এই পরমহংস-সমাজ প্রার্থনা-সমাজ নাম ধারণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে।

৩

পুনায় যে সকল বালিকা বিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলই প্রধান। সবশুদ্ধ প্রায় ৩০০ বালিকা এখানে পড়ে, বেশির ভাগই হিন্দু বালিকা। খৃষ্ট বালিকার সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ নহে। স্কুলে ড্রইং এবং পিয়ানোও শেখান হয়। সকল ক্লাশের বলিকারাই আমাদিগকে পুস্তক পাঠ করিয়া শোনাইল। আশ্চর্য্য এই তাহাদের ইংরাজি উচ্চারণ এদেশীয় পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেকগুণ ভাল। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসীর ন্যায় মহারাষ্ট্রীদিগের ইংরাজি উচ্চারণে একটি অদ্ভুত টান আছে, কিন্তু বালিকারা উচ্চারণেও এতটা ইংরাজি ধরণ দখল করিয়াছে যে সেই টান তাহাদিগের প্রায় নাই বলিলেই হয়। একটি ক্লাশের বালিকারা আমাদিগকে গাইয়া শোনাইল। একটি গানের অনেকটা ইংরাজি রকমের সুর। একজন সেতার বাজাইতে জানে কিন্তু সেতার আনিয়াও লজ্জায় বাজাইতে পারিল না। মোটের উপর আমরা স্কুলটি দেখিয়া বেশ সন্তুষ্ট হইলাম। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কন্যাকে এখানে পড়িতে দেখিলাম, ইহা খুবই শুভলক্ষণ।

এতক্ষণ একটি কথা বলা হয় নাই। পণ্ডিতা রমাবাই কিছুদিন হইতে তাঁহার পুণ্য নিকেতন শারদাসদন পুনায় স্থাপিত করিয়া পুনার মাহাত্ম্য শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রমাবাইকে বোধ হয় তুমি দেখ নাই? তিনি উজ্জ্বল চক্ষু, শোভন ললাট, সুদশনা, বিম্বাধরা গৌরী, তাঁহার মুখে বুদ্ধির জ্যোতি, হাসিতে ও হাবভাবে শিশুসুলভ সরলতা, কথাবার্ত্তায় নিরভিমান অমায়িকতা প্রকাশিত। সিঁতির দুই পাশ হইতে ছোট ছোট ঘন চুল ঘাড় পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে। পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, (এ দেশের বিধবারা রঙ্গিন বস্ত্র পরে, কেবল কাল রং তাহাদের পরিতে নাই) যদিও মহারাষ্ট্রী প্রথায় তাহা কাছা কোঁচা দিয়া পরা, তবুও পরিবার ধরণ সাধারণ হইতে বেশ একটু তফাৎ, একদিকে আপাদ তাহাতে সুচারুরূপে আবরিত, অন্যদিকে লম্বা কোঁচা শোভনভাবে ভূমে লুটাইয়া পড়ায় দেখিতেও বেশ সুন্দর হইয়াছে। পায়ে বিলাতি মোজা ও নাগরা জুতা। সবশুদ্ধ যেন খানিকটা পুরুষের বেশ ; কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে বেশ মানায়, তাঁহার সুগঠিত দেহের শোভা ইহাতে বেশ বিকশিত হইয়াছে। তাঁহার কন্যাটি নয় দশ বৎসরের হইবে। তাহার মুখে, কথায় বার্ত্তায় একটি চমৎকার উজ্জ্বল ভাব। কিন্তু মনোরমা মায়ের মত দেখিতে হয় নাই। বর্ণে, চেহারায় সে বাঙ্গালীর ন্যায়।

আমরা একদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া পণ্ডিতার সহিত কাটাইয়াছিলাম। কি সুখে সে দিনটা কাটিয়া গিয়াছিল। কেবল বিদ্যাবুদ্ধিতেই রমাবাই অসামান্যা নহেন, হৃদয় তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিকেও অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি আদর্শরমণী।

লোকের যে একটা বিশ্বাস আছে, লেখাপড়া শিখিলে স্ত্রীলোক কঠোর হইয়া পড়ে, এখানে আসিয়া তাহার বিপরীত দেখুক। রমাবাইয়ের সহৃদয়তা, দয়াশীলতা, পরদুঃখকাতরতার পরিচয় তাঁহার বিধবা আশ্রম শারদা সদনে। ১০ বৎসর শারদা সদন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, এই রূপ মাসিক আয় সংস্থান করিয়া তবে তিনি আমেরিকা হইতে ফিরিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, আশ্রমবাটী নির্ম্মাণের জন্য যত টাকা আবশ্যক, তাহাও তিনি সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন।

আশ্চর্য্য এই, বিদেশীগণই তাঁহার এই মঙ্গল উদ্দেশ্যের সহায়ক। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া শারদাসদনের জন্য তিনি অর্থ ভিক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু যে সকল রাজাগণ সামান্য কারণে ১০/২০ হাজার টাকা খরচ করেন, তাঁহারা এজন্য কেহ বা পাঁচশ কেহ বা হাজার দিয়াছেন, কেহ বা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এ পর্য্যন্ত কিছুই দেন নাই। দেশের এই শোচনীয় অবস্থায় বিদেশীর করুণার উপরই তাঁহার একমাত্র ভরসা। তিনি স্থির করিয়াছেন, আমেরিকার সাহায্য ফুরাইতে না ফুরাইতে অষ্ট্রেলিয়া গিয়া তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

শারদা সদন বিধবাদিগের আশ্রয় নিকেতন। যে কোন হিন্দুবিধবা এখানে আশ্রয় চাহেন, তাঁহার জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত। তিনি বিনা ব্যয়ে এখানে খাইতে পরিতে শিখিতে পারেন। তবে যদি কোন কুমারীকে তাহার পিতামাতা এখানে শিক্ষার জন্য পাঠান ত তাঁহাদিগকে স্কুলের বেতন দিতে হয়। রমাবাইয়ের ইচ্ছা নিরাশ্রয় বঙ্গবিধবাগণও এই আশ্রমে আসেন। এমন কি, বেশী বঙ্গবিধবা পাইলে তাহাদিগের শিক্ষার জন্য বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত তিনি নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত।

আপাততঃ আশ্রমে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪ জন ছাত্রী, তাহার মধ্যে ২৮ জন বিধবা, তিন চারিটি শিশু বিধবা। রমাবাইয়ের আশ্রয়ে ইহারা সকলে অত্যন্ত সুখে আছে। ছোট ছোট বালিকাগণ তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, তাঁহাকে চুম্বন করিতেছে, বড় বড় মেয়েরা রমাবাইয়ের সহিত সখীর মত বাক্যালাপ করিতেছে। সংসারে আপনার লোক তাহাদিগকে আপনার করে নাই, তাঁহার প্রাণঢালা স্নেহে তাহারা সেই অযত্ন, অভাব ভুলিয়াছে। তিনি তাহাদের মাতা ভগিনী সখী সর্ব্বস্ব। ৪/৫ বছরের শিশু হইতে ২৫/৩০ বৎসরের বয়স্কা বিধবাও এখানে আছে, সকলের মুখে একই কথা, রমাবাই আমাদের খুব ভালবাসেন, আমরা অত্যন্ত সুখে আছি। কোন বিধবা একবার রমাবাইয়ের আশ্রমে আসিলে নিজের বাড়ীতে অল্পদিনের জন্যও আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না, তাহাদের ভয় হয় পাছে আর এখানে না আসিতে পায়।

এখানে দুই একটি সধবাও আছে, শাশুড়ীর পীড়নে তাহারা মর মর হইয়াছিল, তাই তাহাদের পিতা তাহাদিগকে এইখানে রাখিয়াছে। রমাবাই সম্পূর্ণ দেশীয় রকমে থাকেন, মেয়েদের সঙ্গে একত্রে নীচে বসিয়া আহার করেন। কেবল তিনি নহেন, এখানে যে ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী আছেন, তাঁহাকেও তিনি বেশ দেশী রকম করিয়া লইয়াছেন। আমাদের এক শ্রেণীতে সেদিন তিনিও পিঁড়িতে বসিয়া হাতে করিয়া ভাত ব্যঞ্জন খাইতে লাগিলেন। রমাবাই যখন তাঁহার অনাথা আশ্রিতাদিগের মধ্যে বসিয়া বলিলেন, ইহারা আমার পরিবার, আমার সন্তান, তখন সেই শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "আর আমি ইহাদের

মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা।" রমাবাই ও আনন্দিবাই যোশি যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন নাকি উঁহারা মাঝে মাঝে সেদেশী মেয়েদের এইরূপ প্রথায় ভোজ দিতেন, কিন্তু গাউন পরিয়া ত নীচে বসা সুবিধা নহে, তাই তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্রী ললনার বেশ পরিতে হইত। রমাবাইয়ের অ্যালবমে মহারাষ্ট্রী সাড়ী পরা মার্কিন-রমণীর কয়েকখানি ছবি দেখিলাম। মহারাষ্ট্রী-সাজ এত ভাল হইয়াছে, যে সহসা তাহাদিগকে বিদেশীয় নারী বলিয়া চেনা যায় না।

সেদিন দুপুর বেলা আহারের পর আশ্রমবালিকাগণ আমাদিগকে তাহাদের নানারূপ খেলা দেখাইল। আমাদের দেশের মেয়েদের যেমন আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্, চোর চোর, লুকোচুরী, প্রভৃতি নানারূপ খেলা আছে, এদেশেও সেইরূপ ফুকরি নামে কতকগুলি মেয়েলি খেলা আছে। খেলাগুলির প্রধান গুণ তাহাতে শরীরের সর্ব্বাংশের পরিচালনা হয়, যেন সেই অভিপ্রায়েই খেলাগুলির সৃষ্টি। একরূপ খেলা, চারিজন চৌকোণ হইয়া দাঁড়াইয়া মুখোমুখি পরস্পরের হাতে তালি মারিতে মারিতে স্থান পরিবর্ত্তন করে। এইরূপ দাঁড়াইয়া হাতে হাতে, বসিয়া পায়ে পায়ে যুদ্ধ চলিতে থাকে, যে অধিকক্ষণ খেলিতে পারে, তার জিৎ। আর একরূপ, মাথা হেলাইয়া পরস্পরকে অভিবাদন করিতে করিতে তালে তালে পা ফেলিয়া চলে, সে বেশ দেখিতে। আর একরূপ গহনা পরা খেলা দেখিলাম, তাহা সব চেয়ে মজার। দাঁড়াইয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে করিতে আপনার দুই হাত আয়নার মত মুখের কাছে ধরিয়া তাহাতে একবার করিয়া মুখ দেখে, আর একবার করিয়া হাত সরাইয়া মিছামিছি চুল আঁচড়ায়, এবং মাথায় হাতে গলায় কোমরে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে যেন গহনা পরিতেছে এইরূপ ভাণ করে। এই খেলায় দাঁড়াইয়া অঙ্গ চালনা করিতে করিতে ক্রমে অল্পে অল্পে অবনত হইয়া মাটিতে বসে, আবার আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়ে। এই যে খেলাগুলির কথা বলিলাম, ইহা খেলিতে খেলিতে মেয়েরা মুখে এক অদ্ভুত রকম শব্দ করিয়া তাল রাখে, সেইজন্য ইহার নাম ফুকরি খেলা।

ইহা ছাড়া কতকগুলি খেলা দেখিলাম, তাহা সামাজিক চিত্রাভিনয়। ইহার মধ্যে শাশুড়ী-বৌ খেলাই প্রধান। একজন শাশুড়ী একজন বৌ সাজে। শাশুড়ী বৌকে যে কথা বলে বৌ কিছুই যেন বুঝিতেই পারে না, শাশুড়ী যদি চায় হাঁড়ি, ত বৌ আনে বেড়ি, এই রূপে ক্রমাগত তাহাকে জ্বালাতন করিতে থাকে, আর শাশুড়ী চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি হাঁড়ি খাইতে বসে।

একবার একজন যুবতী বৃদ্ধা-শাশুড়ী সাজিলেন। তিনি কুব্জভাবে লাঠি ধরিয়া চলিতে চলিতে কেবলি বৌয়ের উপর তম্বী করেন। রাঁধিয়া মেয়েকে ভাল ক'রে খাওয়ান, আর বৌয়ের অন্নে থুতু দিয়া রাখেন, বৌয়ের গহনা চুরী করিয়া মেয়েকে দেন। কিন্তু বৌও শাশুড়ীর উপযুক্ত, শাশুড়ী বৃদ্ধা, চলিতে পড়িয়া যান, চোখে দেখিতে পান না, কাণে শোনেন না, বৌ তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া ভাল রান্না নিজে খায়, তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া গহনা কাড়িয়া লয় ইত্যাদি। শাশুড়ী বৌকে আঁটিতে না পারিয়া অবশেষে পাড়াপড়সির কাছে তাহার নিন্দাবাদ করিয়া মনের ঝাল ঝাড়েন। এই খেলায় শাশুড়ীর অভিনয় বড় সুন্দর হইয়াছিল, তাঁহার ফোগলা স্বর, অনর্গল আবল তাবল বুলি, চলিবার ধরণ, পাড়াপড়সির নিকট বৌয়ের নিকট অভিযোগ, এ সমস্তই খুব হাসির হইয়াছিল।

এ দেশের শাশুড়ী বৌয়ের সম্পর্ক আমাদের দেশের চেয়ে যে.বেশী মধুর নহে, এই অভিনয়গুলিই তাহার সাক্ষ্য। বরঞ্চ এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের অবস্থার আজকাল অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। শাশুড়ী আর বৌকে বড় একটা গঞ্জনা দিবার সুযোগ পান না ; কিন্তু এখানে শাশুড়ীর দৌরাত্ম্যের নাকি এখনো বাড়াবাড়ি! এদেশে এইরূপ একটি প্রবাদ গল্প আছে, চাতক পক্ষী আগে একজন শাশুড়ী ছিল, বৌয়ের উপর সে এত পীড়ন করিত যে একদিন তৃষ্ণাতুর হইয়া বৌ মরিয়া গেল, তবুও শাশুড়ী তাহার মুখে জলবিন্দু দিলেন না। মরিবার সময় বৌ শাপ দিয়া গেল, "তুমি চাতক হইয়া চিরকাল জলের তৃষ্ণা সহ্য কর।" সেই হইতে শাশুড়ী চাতক হইয়া জলের জন্য হাহাকার করিতেছেন। 'শাশুড়ী-বৌ' খেলা ছাড়া আরও দুই একরকম অভিনয় খেলা ছিল, কিন্তু তাহা তেমন বিশেষ কিছু নহে।

এই সকল খেলাধূলার পর বেলা ৪টের সময় নিমন্ত্রিতা রমণীগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রমাবাই হিন্দু, খৃষ্টান, ইংরাজ, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় রমণীমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের মধ্যে কয়েকজন মিশনারী রমণীমাত্র আর হিন্দুর মধ্যে মিশেষ রাণাদে ও তাঁহার যাতৃগণ, মিশেষ ভাণ্ডারকর ও তাঁহার কন্যা মিশেষ ভট ও তাঁহার কন্যা এইরূপ কয়েকজন উন্নতিশীল শ্রেণীর মহিলা ছাড়া আর কেহ আসেন নাই। আগে হইলে আসিতেন, কিন্তু আজকাল পুনার মতিগতি এমনি, যে অনেকে ইংরাজ মহিলার নিমন্ত্রণে তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে বরঞ্চ পাঠাইবেন কিন্তু রমাবাইয়ের নিমন্ত্রণে আসিতে দিবেন না। আগে রমাবাইয়ের স্কুলে যতগুলি মেয়ে ছিল, এই হুজুকে তাহার কতক কমিয়া গিয়াছে।

নিমন্ত্রিতাদিগের মধ্যে দেশীয় খৃষ্টমহিলা ও ইহুদি রমণীর সংখ্যাই অধিক ছিল। এই সকল ইহুদীরমণীগণ মহারাষ্ট্রীধরণে কাপড় পরেন, মহারাষ্ট্রীভাষায় কথা কহেন কিন্তু তাঁহাদের চেহারার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

আমাদের গল্প স্বল্প চলিতে লাগিল, গান বাজনাও বন্ধ রহিল না, দুই জন হিন্দুরমণী গান করিলেন ; তাহার মধ্যে একজন বেশ সুকণ্ঠী। ইহার পর রমাবাই আমাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতার মর্ম্ম আমাদের দেশের প্রশংসা ও আমাদের প্রশংসা। তিনি এইরূপে আরম্ভ করিলেন—" 'মহারাষ্ট্র' এই কথাটা যেমন শ্রুতিকঠোর খটখটে কথা, মহারাষ্ট্র দেশও তেমনি অসমতল বন্ধুর কঠোর ক্ষেত্র, আর ইহাদের অধিবাসীগণের চেহারাতেও সেই অনুযায়ী একটি কঠোরতার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু নদীবহুল, সমতল, কোমলপ্রকৃতি বঙ্গদেশের সকলি সুকোমল, তাহার দৃশ্যে কোমলতা, ভাষায় কোমলতা, সন্তানগণের মূর্ত্তিতে স্বভাবে কোমলতা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই জন্যই কি বঙ্গদেশের গৌরব ; তাহা নহে। বঙ্গের গৌরব বঙ্গবাসী বিদ্যাবুদ্ধিতে ভারতের অন্যান্য জাতিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া। ধর্ম্মগত, ভাষাগত, সমাজগত সকল রকম উন্নতিতেই বাঙ্গালী অগ্রগামী। মহারাষ্ট্রে রাণাদে, ভাণ্ডারকর আছেন সত্য কিন্তু বাঙ্গলা দেশে রাণাদে ভাণ্ডারকরের সংখ্যা অধিক। কেবল তাহাই নহে তাঁহাদের মহত্ত্বভাবও গুরুতর। বঙ্গের রামমোহন রায়ের যশোগীতি সুদূর পশ্চিমেও ধ্বনিত।"

এই বলিয়া সংক্ষেপে প্রথমে রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিকলাপ, পরে পূজনীয়

পিতৃদেবের মহৎজীবন এবং সেই প্রসঙ্গে ক্রমে আমাদের দেশের ধর্ম্মগত সমাজগত উন্নতির উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে অভিনন্দন প্রদান করিয়া পণ্ডিতা বক্তৃতা শেষ করিলেন।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সম্প্রতি পণ্ডিতার এক ইউরোপীয় বন্ধু তাঁহাকে রামমোহন রায়ের এক গোচ্ছা চুল পাঠাইয়াছেন, বক্তৃতার সময় তাহা তিনি আমাদের দেখাইলেন।

পণ্ডিতার কি চমৎকার বাগ্মিতা, যাহা বলেন অতি হৃদয়গ্রাহী করিয়া সরল সুন্দর ভাষায় অনর্গল বলিয়া যাইতে পারেন। মিশেস রাণাদেও বলেন বেশ। রমাবাই তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন, "মহিলাদিগের উন্নতি উদ্দেশে পুনার আর্য্যমহিলা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার এখন আর সাড়াশব্দ নাই, সে গভীর নিদ্রামগ্ন আর বঙ্গের নারীগণ সোৎসাহে কার্য্য করিতেছেন।" এই কথার উত্তরস্বরূপ মিশেস রাণাদে উঠিয়া বলিলেন,' " 'আর্য্যমহিলা' ঘুমাইতেছে সত্য কিন্তু তাহা শিশুর ঘুম, শিশু যেমন ঘুমাইয়া বল সঞ্চয় করিয়া জাগিয়া উঠে, আর্য্যমহিলা সমাজ তেমনি যৌবনের তেজ লইয়া জাগিয়া উঠিবে। নূতন উদ্যমে কাজ করিবার জন্য সে ঘুমাইয়া বল সঞ্চয় করিতেছে মাত্র।"

ইহার পর আমি পণ্ডিতা রমাবাইকে তাঁহার সস্নেহ আতিথ্য ও সাদর অভ্যর্থনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও নিজেদের অযোগ্যতার উল্লেখ করিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে মনের কৃতজ্ঞতা-আবেগ ভার নিবৃত্তি করিলাম।

বাস্তবিক সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সেদিন খুবই অনুভব করিয়াছিলাম। পণ্ডিতার সেই আত্মদানের আনন্দ, পরোপকার-ব্রতপালনের অদম্য উৎসাহ দেখিলে নিজের অযোগ্যতা, ক্ষুদ্রতা পূর্ণমাত্রায় বুঝা যায়। অথচ তাহাতে ঈর্ষা নাই ; আত্মগৌরবের অভাব অনুভব নাই, কেননা সেই গৌরব জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া আমিও তখন সেই গৌরবভাগী হইয়াছি ; তবে তখনো দুঃখ কেবল এই ভাবিয়া, সেই জ্যোতি একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

হায়! বঙ্গে মহাত্মা পুরুষ উদয় হইয়াছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গের মহাত্মা রমণী, বঙ্গের রমাবাই কবে উদয় হইবেন? যিনি বঙ্গের নিরাশ্রিতাদিগের দুঃখে হৃদয় শোণিত পাত করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদিগের দুঃখ ক্ষালন করিতে পারিবেন! যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন হতভাগিণীগণ, তোমরা বুকফাটা কান্না কাঁদ, তোমাদের অশ্রু কেহ মুছাইবে না। ধন্য তুমি রমাবাই!

সভাভঙ্গে অন্য সকলে চলিয়া গেলে আমরা পণ্ডিতার সহিত আহারাদি করিয়া বিদায় লইলাম। একদিনে আশ্রম-বালিকাদের সঙ্গে আমাদের এত ভাব হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা তখনো আমাদের ছাড়িতে চাহে না। ছোট ছোট মেয়েরা আমাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "যাইতে দিব না", বড় বড় মেয়েরা হাত ধরিয়া বারম্বার বলিতে লাগিল, "আর একটু থাক।" তাহাদের এই অকৃত্রিম সরল স্নেহের স্মৃতি সঙ্গে লইয়া একই সঙ্গে আনন্দ ও নিরানন্দ হৃদয়ে আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

পুনার আর একজন রমণী মিশেস সোরাপজি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মহোদ্যমে কাজ করিতেছেন। ইনি ধর্ম্মে খৃষ্টান, জাতিতে হিন্দু, বিবাহ করিয়াছেন পার্সী। ইঁহার সপ্ত কন্যা, সকলেই সুশিক্ষিতা। মিস সোরাপজি বি, এ.। যিনি বিলাতে আছেন তিনি ইহারই

এক কন্যা। আর এক কন্যা হাই স্কুলের প্রধান কর্ত্রী। অন্য দু একজনের বিবাহ হইয়াছে এবং বাকী সকলে পুনায় মিশেস সোরাপজির যে কয়টি স্কুল আছে তাহারই শিক্ষয়িত্রী। মিশেস সোরাপজির একটি স্কুলের পুরস্কার বিতরণে আমরা উপস্থিত ছিলাম। স্কুলে ছোট ছোট বালক বালিকা উভয়েই পড়ে, আর হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পারসি এই সকল জাতির সন্তানই আসিয়া থাকে।

মিস কিনিয়ার্ডদ্বয় যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা দর্শনে গিয়াছিলেন, দেশে ফিরিবার পথে তাঁহারা পুনা বম্বে হইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা হাতে করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিলেন এবং পুরস্কার প্রদান হইয়া গেলে বালক বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজিতে তাহাদিগের মনোরঞ্জক দুই একটি কথা বলিলেন, মিশেস সোরাপজি আবার মহারাষ্ট্রী ভাষায় তাহা অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। মিস কিনিয়ার্ড যাহা বলিলেন তাহার প্রথম কথা,—তাঁহারা কখনো এই স্কুলের বালক বালিকাদিগকে ভুলিবেন না, আর ছেলেরাও যেন তাঁহাদিগকে না ভোলে, অন্ততঃ তাঁহাদের এই ইচ্ছা, এইরূপ আশা। ছেলেরা সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "কখনই ভুলিব না।"

তাঁহাদের দ্বিতীয় কথা ;—"দেশে গিয়া তাঁহাদেব বালক বালিকাদিগকে বলিবেন, তাহারা সেখানে যেরূপ হাসি মুখে পুরস্কার গ্রহণ করে,—পুরস্কার পাইলে এদেশের ছেলের মুখেও সেইরূপ হাসি ফুটিয়া উঠে, তাহাদের মত ইহারাও তখন সেইরূপ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে।"

নূতন সংবাদ বটে! অসম্পূর্ণাবৃত-দেহ দীন অসভ্যবেশ ও মলিন মুখের সহিত হাসি ও প্রফুল্লভাব এতই অসঙ্গত ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার যে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া গিয়া খবর না দিলে সে দেশের বালক বালিকারা এরূপ অসম্ভব কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিত না! এখন তাহাদের নানা জ্ঞানের সহিত আর একটা জ্ঞান এই বৃদ্ধি হইবে যে, ভিন্নদেশে এমন একরূপ আশ্চর্য্য জীব আছে, যাহাদের ঠিক পশু না বলিলেও বলা যায়, কেন না চেহারাতে তাহারা কতকটা মানুষের কাছাকাছি আর শ্বেত প্রাণীর ন্যায় হাসি দ্বারাই তাহাদিগকে হর্ষ প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে!

৪

আমরা পুনার ফ্যানসি ড্রেস বলে গিয়াছিলাম বই কি ; এবার তোমাকে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিব বলিয়া আগের চিঠিতে আর সে সব কিছু লিখি নাই; কথাটা লুকাইবার কোন অভিপ্রায় ছিল এমন মনে করিও না।

বলিব কি, সে ভাই এক অপরূপ দৃশ্য! বসন্তের দিনে যেমন মলয়হিল্লোল ছোটে, চাঁদ উঠিলে যেমন জ্যোৎস্নার হিল্লোল খেলে, তেমনি ভাই, উন্মুক্তপৃষ্ঠ, নগ্নকণ্ঠ রমণীয়-বেশ অপূর্ব্ববরণী সুন্দরীগণ অনুপম সুন্দর পুরুষদিগের সহিত মিলিয়া, সুসজ্জিত, আলোকখচিত গৃহ চতুর্গুণ আলোকিত করিয়া যখন ব্যাণ্ডের তালে তালে দলে দলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকেন, তখন সেই গৃহের চারিদিকে যেন একটা রূপের হিল্লোল বহিতে থাকে।

ফ্যান্সি ড্রেস বলে কাহারো একরূপ সাজ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই প্রায়

এক একটা কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ সাজ করিয়া থাকেন; কখনো না জানিয়া দুইজনে এক নাম গ্রহণ করিলেও উভয়ের সাজের কিছু না কিছু তফাৎ হইয়া পড়ে। মনে কর, দুজনেই সাজিয়াছেন রাত্রি, দুইজনেরি কাল কাপড়ের উপর তারার ফুল ঝক্ ঝক্ করিতেছে; কিন্তু একই স্থান হইতে কিছু আর দুজনে পোষাক প্রস্তুত করান নাই, সুতরাং কাহারো কাপড়ে বা ছোটি ছোটি তারা; কাহারো বড় বড়, কাহারো মাথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঝকঝকে মুকুট, কাহারো মাথায় চাঁদ নাই; কাল ওড়নার উপর জরির তারাফুল শোভা পাইতেছে।

এইরূপে কেহ সাজিয়াছেন রাত্রি, কেহ উষা, উষায় মৃদু গোলাপাভ বা বেগুনাভ শুভ্রবেশ, তাহার উপর ইতস্ততঃ ফুলরাশি ফুটিয়াছে; মাথায় সোনালি রংয়ের মুকুট হইতে শুভ্রশ্বেত সূক্ষ্ম বস্ত্র ঝুলিতেছে। কেহ বা বসন্ত সাজিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের ফুল বিকশিত। কেহ বা শুভ্র পুঁতিখচিত শুভ্র বস্ত্র পরিয়া তুষার সাজিয়াছেন। কাহারো বা জিপসি-রাণীর সাজ, হাতে ট্যাম্বারিণ, গলায় স্বর্ণমুদ্রার মালা, পায়ের উপরে ওঠা, খাট গাউন পরা। কেহ বা নর্ত্তকী বেশী; আজকাল দেশীয় নর্ত্তকীর অনুকরণে বিলাতে একদল নর্ত্তকী হইয়াছে; তাহারা অবশ্য ঠিক এদেশের নর্ত্তকীদের মত সাজ সজ্জা করে না, বা নাচে না; তবে তাহাদের ভাবভঙ্গীটাকে দখল করিয়া লইয়া তাহার উপর আপনাদের সুনিপুণ শিল্পচাতুর্য্য খাটাইয়াছে। তাহাদের হাতে গলায় গহনা; কাপড় ও-দেশীয় ধরণে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া বেশ সুচারুরূপে পরা, নাচের ধরণটাও অবশ্য দেশী রকম; তবে আরো সুভাবভঙ্গীময় ও মনোরম। ফ্যান্সি বলে যিনি নর্ত্তকী সাজিয়াছেন, তিনি অবশ্য নাচিতেছেন না। কাহারো পারসী ললনার সাজ, কেহ জাপানী ললনার জাঁকালো কোর্ত্তা পরিয়াছেন। (জাপানী-বেশী রমণীটি কিছু স্থূলকায়, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য একজন মহিলা নেপথ্যে বলিলেন, She is too fat for that dress)। কেহ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কেহ পঞ্চদশ শতাব্দীর কেহ ষোড়শ শতাব্দীর মহিলার সাজে সজ্জিত, যেমন কুইন মেরি, ডাচেস্ অব বাকিংহম্ ইত্যাদি। কাহারো বা সামান্য শুভ্রবস্ত্রের উপর হরতন বা রুইতনের ছক্কা পঞ্জার নক্সা, তিনি আর কি পঞ্জা বা ছক্কা সাজিয়াছেন। এইরূপ গৃহপূর্ণ বিচিত্র সাজ, অধিকাংশ সাজই সুদৃশ্য সুশোভন; এক একটি সাজে যে কত খরচ পড়িয়াছে তাহার ঠিক নাই; কেবল একরাত্রির জন্য; তাহার পর সম্ভবতঃ সে কাপড় আর ব্যবহারযোগ্য থাকিবে না; হইলে কি হয়, যখন সুকৌশলময় সাজসজ্জার প্রতিফলকে সুন্দরীর সৌন্দর্য্যচ্ছটা অত্যুজ্জ্বল প্রভায় বিকিরিত হইতে থাকে; শতশত মুগ্ধ মানব স্তম্ভিত প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে যখন সেই রূপজ্যোতিকে অভিবাদন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তখন সে রাত্রি কি আর শুধু একটা রাত্রি; তখন সুবেশীর নিকট মুহূর্ত্ত অনন্তে পরিণত হইয়াছে। তবে এমনো ইংরাজ মহিলা আছেন যাঁহারা এক রাত্রির জন্য এরূপ ব্যয়ে কুণ্ঠিতচিত্ত; তাঁহারাই এসময়ে কেহ পঞ্জা ছক্কা বা দাসী বাঁদি সাজেন। নহিলে সকল সুন্দরীগণেরই মনোগত অভিপ্রায় কিসে তিনি অন্যের সাজের উপর টেক্কা দিবেন।

পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই আমাদের দেশীয় সাজ পরিয়াছেন, তবে বাঙ্গালী বাবুর সাজ ভাবিও না; চীনেম্যানের সাজই বেশীর ভাগ; কেহবা সম্ভ্রান্ত চীন, কেহবা গরীব চীন, কেহ কাবুলি, কেহ নবাব, কেহ রাজা। একজন সিন্ধীবেশীর চমৎকার অনুকরণ

হইয়াছিল, রংয়েএও ইংরাজ বলিয়া চেনা যায় না ; এমন রং মাখিয়াছেন, ঠিক সিদ্ধি দেখাইতেছে। একজন সমস্ত গায়ে ছবির কাগজ মারিয়া বিজ্ঞাপন সাজিয়াছে, একজন ভাঁড় সাজিয়া সকলের সঙ্গে ভাঁড়ামি করিয়া বেড়াইতেছে। একজন লাইট হাউস সাজিয়াছেম, তাঁহার মাথায় লাইট হাউসের মত ক্ষুদ্র স্তম্ভ, তাহার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত দীপ। সেই স্তম্ভ মাথায় করিয়া কিরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, ইহাও আশ্চর্য্য, তবে তিনি নাচেন নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার, একজনের সয়তান সাজ। মুখে কালি, মাথায় শিং এবং পিছনে এক গুটান ল্যাজ। দেখিলে সত্যই শিহরিয়া উঠিতে হয়, আমি ভাবিতেছিলাম তিনি নাচের সঙ্গী পাইলেন কিরূপে ; ইহা ছাড়া চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীর নাইট, দস্যু রাজা, প্রভৃতির সাজে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ব্যাণ্ড বাজিতেছে, আর এই সকল বিচিত্রবেশী সুন্দর সুন্দরীগণ ধীর চরণবিক্ষেপে মসৃণ-কাষ্ঠ-গৃহতল তালে তালে ঘর্ষণ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যেমন বাজনা থামিল তাঁহারাও থামিলেন ; এবং মহিলাগণ পুরুষের বাহুতে হস্ত ন্যস্ত করিয়া চন্দ্রাতপাচ্ছন্ন পানাহার গৃহে গমন করিলেন। কোন দুইটি-বা মুক্ত আকাশতলে জাপানিক ল্যাণ্টার্ন শোভিত কানন মাঝে সুদৃশ্য সুকোমল শোভায় বসিয়া মৃদু মৃদু কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। আবার ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, যিনি যেখানে ছিলেন দ্রুতবেগে নাচঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন, যাঁহার সহিত যাঁহার নাচিবার কথা আছে দুজনে পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইলেন, আবার নাচ আরম্ভ হইল। নাচঘরের দুই পার্শ্বে উচ্চ মণ্ডপ ; যাঁহারা নাচেন না, শুধু দর্শক, তাঁহার সোপানারূঢ় হইয়া সেইখানে আসিয়া বসিয়াছেন, আমরাও বসিয়াছি, সম্মুখের উত্তেজনা, উম্মত্ততা, ঘূর্ণ্যমান অপূর্ব্ব দৃশ্যের দিকে অবাক নেত্রে চাহিয়া ভাবিতেছি, অসভ্য ভুটিয়া নরনারীর নাচে, আর এই সুসভ্য মহামহিমার্ণব ইংরাজ নরনারীর সতাল চরণবিক্ষেপে ভাবগত রুচিগত প্রভেদটা এমনি কি?

অবশ্য মর্ত্তের লোক তারকার সহিত দীপালোকেরই তুলনা করিয়া থাকে, আমরা বঙ্গনারী, তাই বুঝি আমরা মনে করি ওরূপ উম্মত্ত সুখ উম্মত্তভাব-প্রণোদিত আমোদ সুরুচিজনক সুখের বিরোধী!

ইহার কিছুদিন পরে একটা (Flower dress ball) ফুল বেশে নাচ হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহা দেখিবার জন্য পুনায় অপেক্ষা করি নাই।

কেবল বল নহে, পুনার ইংরাজ সমাজ তখন নানারূপ আমোদ প্রমোদ ভরপুর। গভর্ণর তখন পুনায়, তাই পুনার তখন Season চলিতেছিল। আজ গভর্ণমেণ্ট হাউসে বল, কাল সিভিলিয়ানদের ডিনার, পরশু মাঠে ঘোড়দৌড়, তরশু নদীতে বাচ খেলা ইত্যাদি। যতদিন না গভর্ণর মহাবালেশ্বরের পাহাড়ে যান ততদিন পুনায় এইরূপ আমোদের স্রোত বহিতে থাকে। ইংরাজের মত অদম্যোৎসাহ, সবল শির, উদ্দামতেজ নরনারী পুঙ্গবেরাই এরূপ অবিশ্রান্ত আমোদ, অশ্রান্ত অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি না থামিয়া উপভোগ করিতে পারেন, ক্ষীণজীবী আমরা অল্প পরিশ্রমেও যেমন কাতর হইয়া উঠি, অধিক আমোদেও তেমনি হাঁফাইয়া পড়ি।

সোলাপুরে আসিবার আগে একদিন কেবল আমরা ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভয়ঙ্কর উত্তেজনাময় দৃশ্য। শ্বেত নীল পীত হরিৎ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদধারী

ঘোড়সওয়ারগণ চিহ্নস্থান হইতে একত্রে অশ্বচালনা করিয়া তীর বেগে লক্ষ্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সেই প্রাণপণ অশ্ব চালনা, নিজের জীবনের প্রতি, অশ্বের জীবনের প্রতি মায়া মমতাবিহীন উন্মত্ত ভাব, আর কষাহত পদাহত, সফেন মুখ, উৎগ্রীব, মৃত্যুভয়হীন অশ্বগণের পবন গতি সত্ত্বেও এই একজন অগ্রগামী, পরক্ষণেই অন্যজন অগ্রগামী, অবশেষে মুহূর্ত্তের ফেরে বা ভাগ্য ফেরে চুলের তফাতে মাত্র একজনের জয়, অন্য সকলের হৃদয়ভেদী পরাজয়, কেহ বা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত ; এই ঘোড়ার উপর সে তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল, এই সকল দেখিতে দেখিতে হৃৎকম্পিত হইতেছে, চক্ষু আপনা হইতে বার বার বুজিয়া আসিতেছে, এত উন্মত্ততাময় উত্তেজনাময় বহুজনের হৃদয় বিদারক দৃশ্য চক্ষু যেন আর সহিতে পারে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ দেখিয়া স্ত্রীলোকের মনের ভাব কিরূপ হয় সেই দিন ঘোড়দৌড় দেখিয়া তাহা আমি বুঝিয়াছি। স্ত্রীলোকের পলিটিক্যাল অধিকার পাওয়া উচিত কি না, তাহারা ইহা পাইবার উপযুক্ত কিনা, আজকাল ইয়োরোপে এই এক তর্ক উঠিয়াছে। বিপক্ষসভাবলম্বীদিগের একটি যুক্তি স্ত্রীলোকে ত কখনো সংগ্রাম করিতে পারিবে না, ইহাতে যখন তাহারা পুরুষের অসমকক্ষ তখন রাজনৈতিক অধিকারে তাহারা দাবী করে কি বলিয়া? ইহার উত্তর স্বরূপ অন্যপক্ষেরা বলেন, কত স্থানে স্ত্রীসৈন্য ছিল কত স্ত্রীলোক পূর্ব্বে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, অধিকার দিলে স্ত্রীলোকে কেনই বা সংগ্রাম করিতে না পারিবে।

কোন পক্ষের যুক্তি বলবত্তর তাহা ভবিষ্যতের কার্য্যক্ষেত্রে মীমাংসিত হউক, বা চিরদিন অমীমাংসিত থাকুক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সেই দিন হইতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে এই যে, বাকযুদ্ধে সুনাম লাভ করিলেও বাহুযুদ্ধ স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম নহে। তবে এজন্য তাঁহাদের দুঃখিত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলের দিন দিন যেরূপ প্রভাব বাড়িতেছে, ধারাল বুদ্ধির নিকট ধারাল অস্ত্রকেও যেরূপ হৃতমান হইতে দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পুরুষদিগের আশা ভরষা যে সমূলে নির্ম্মূল, নিঃসঙ্কোচে এরূপ দৈববাণী করা যায়।

৫

পুনার চিত্রশালায় রবিবর্ম্মার কতকগুলি সুন্দর ছবি আছে, তাহার মধ্যে একখানি বড় মজার! কোন যুবতী স্বামীর সহিত আড়ালে যে সকল প্রণয় কথা কহিয়াছেন, তাঁহার গৃহপালিতা চতুরা সারিকা সে সমস্ত শিখিয়া লইয়া শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের সাক্ষাতে তাহা আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে! যুবতীর বিপদ ভাবিয়া দেখ! তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া দুষ্ট সারির মুখ চাপিয়া ধরিয়াছেন। ক্রোধ, লজ্জা, বিরক্তির ভাব অতি সুন্দররূপে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুনার প্রদর্শনী গৃহে দেখিবার সামগ্রী এখনো যথেষ্ট আছে! পুনার নির্ম্মিত পিত্তল কাঁসার দ্রব্যাদি এবং মৃত্তিকা মূর্ত্তি, এদেশীয় শিল্পনৈপুণ্যের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। সেই দিন কোন কারণে কিছুক্ষণের জন্য একবার আমরা একটা রাস্তার ধারে গাড়ীর মধ্যে

বসিয়া আছি, সেই সময় দেখিলাম, পথপ্রান্তে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ শিবালয় ; সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ভূষিতা একটি বালিকা সেই দেবালয়ে উঠিল, উঠিয়া দেবপ্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিল। সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, এবং প্রতিবার প্রদক্ষিণের পর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা নিয়ম, কিন্তু বালিকা কিছুতেই মনস্থির করিয়া প্রদক্ষিণ পূজা শেষ করিতে পারিতেছে না, বার বার থামিয়া থামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আবার অন্যমনস্কভাবে প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া প্রণাম করিতেছে। এইরূপে ক্রমশঃই তাহার গতি অলস এবং প্রতিবারেই তাহার প্রণামের আনতি কম হইয়া পড়িতেছে। প্রথমবার সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল, দ্বিতীয়বার বেশ একটু নীচু হইয়া ঘাড় নোয়াইল, তৃতীয়বার অমনি ঘাড় নোয়াইল, চতুর্থবার ঘাড় নাড়িলমাত্র ; পঞ্চমবার যেমন ঘাড় তেমনি রহিল, অঙ্গুলি দ্বারা কপাল স্পর্শ করিয়া প্রণাম শেষ করিল, ষষ্ঠবার কি করিল, জানি না, জানিবার জন্য কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি, দেখিলাম মন্দিরের নিকটের একটি গৃহদ্বারে এতক্ষণ যে রমণী দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বালিকার নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কি বলিলেন, বালিকা তখন সভয়ে রীতিমত প্রকারে প্রদক্ষিণ শেষ করিল। রমণী যে বালিকার মাতা তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ। মাতার ভয় পূজানুষ্ঠানের ত্রুটিতে কন্যা দেবতার ক্রোধভাজন হইবে, কন্যার ভয় পূজা ঠিক না হইলে মাতার নিকট শাস্তি পাইবে, উভয়ের সম্মিলিত ভয়ে মাঝখান হইতে মহাদেব সসম্মানে পূজা লাভ করিয়া লইলেন। এখন কথা হইতেছে ভয়ের পূজা কি পূজা, না প্রেমের পূজাকেই আসল পূজা বলিবে? পুনায় আমাদের এক ক্ষ্যাপা বন্ধু আছেন, তিনি বলেন, ভয়ও যা প্রেমও তা, একই কথা ; যেখানে যত প্রহার সেইখানে তত প্রেম, প্রহার নইলে প্রেম টেঁকে না। তিনি অনেকবার প্রেমে পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রহারনিপুণ নহেন বলিয়া বিবাহ করেন নাই। অন্য পক্ষে সে বিষয়ে নিপুণা হইলেও বা হইত ; কিন্তু তাহারো কোনরূপ প্রমাণ না পাওয়াতে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহাকে একেবারেই হতাশ্বাস হইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে যেমন বিবাহ করা, অমনি 'Bastinado' (লগুড়াঘাত) সুরু না করিলে সমস্ত বিশৃঙ্খল!

ইনি তাই এক অদ্ভুত ব্যাপার! পুনার শোভা সৌন্দর্য্যের কথা তোমাকে আগেই বলিয়াছি, কিন্তু সে সকল কিছুই এখানকার তাজ্জব নহে। এখানে আসিয়া যদি তাজ্জব দেখিতে চাও ত আমাদের বন্ধুটিকে দেখা আবশ্যক।

বাহ্যাকারে ইঁহার যে বিশেষ কিছু অদ্ভুতত্ব আছে তাহা নহে ; দেখিতে সাধারণ ভদ্রলোকেরই মত। একটু খাটখোট, পাতলা সাতলা, গৌরবর্ণ সুশ্রীমুখ, সুপুরুষ বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না, সাজ সজ্জাতেও অসাধারণত্ব কিছু নাই ; সাধারণ বিলাত ফেরতের বেশ ; অর্থাৎ হ্যাটকোটধারী, তবে সন্ধ্যা বেলা যখন হ্যাটের বদলে বালিশের খোলের মত এক অপরূপ বস্ত্রাবরণ তাঁহার মাথার উপর দিয়া কপাল ঢাকিয়া কাণ পর্য্যন্ত নামে, আর কোটের বদলে এক ঢিলা ঢালা আলখাল্লায় দেহমণ্ডিত হয়, তখন বটে সে সাজে তিনি যেন খোলসছাড়া স্ব-রূপে বিরাজিত হন, বাহ্যাকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির ইহাতে এমন একটা অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

দুদিন যদি তোমার ইঁহার সঙ্গে আলাপ হয় তাহা হইলেই বস্, ইনি তোমার নিকট স্বপ্রকাশ। কথায় কথায় অদ্ভুত বিশেষণের বুলি, অবিরাম মুখভঙ্গী, সমস্তক্ষণ একই প্রসঙ্গ,

তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে লইয়া অবিশ্রান্ত নাড়াচাড়া, তাহাদেরই কথা, তাহাদেরই গল্প ; তাহাদের সুখ দুঃখের রহস্যময় বিশ্লেষণে পরমানন্দ লাভ করিয়া অনবরত হাস্য, আর এইরূপ ভাষ্য, হাস্য, রহস্যে তোমার অবশ্যম্ভাবী সম্প্রীতি প্রকাশক ভাবের ব্যত্যয় দেখিলে আশ্চর্য্য এবং বিরক্তিসূচক আর্ত্তনাদ যথা Do you hear, do you understand—ইত্যাদি, এবং এইরূপ গল্প ও চীৎকারের মাঝখানে সহসা আধচ্ছত্র গানের সুর টানা, বা সহসা হাস্যকর গম্ভীরভাব ধারণ করা ;—খানিকক্ষণ, তাঁহার কাছে বসিয়া এই সকল ব্যাপার দেখিলে সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব যে কিরূপ তাহাতে তোমার অভিনব জ্ঞান জন্মিবে, আর সাধু-সঙ্গে তুমি নিজে ঠিক প্রকৃতিস্থ আছ কি না, সে সম্বন্ধেও তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে।

তিনি যখন একাকী থাকেন, তখন যে তাঁহার গল্পের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, তাহাও নহে। দূর হইতে দেখ, তিনি একাকী আপন মনে কথা কহিতেছেন, হাত নাড়িতেছেন, আর মাঝে মাঝে হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছেন। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা কর ব্যাপারখানা কি, তাহা হইলে আবার সেই সকল পুরাণ গল্প,—কিরূপ করিয়া কোন্ দিন তাঁহার কোন্ করুণাস্পদ বন্ধুদম্পতি পরস্পরের উপর রাগ করিয়া মুখ গোম্‌সা করিয়া বসিয়াছিল, কোন্ দিন কোন্ আহাম্মক কিরূপ গদগদ ভাবে কোন্ সুন্দরীর সহিত কথা কহিয়াছিল, কোন্ দিন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার রহস্যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিল, বিবাহ প্রস্তাব করিয়া তিনি কিরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলেন—আর চূড়ান্ত হাস্যজনক ঘটনার দৃষ্টান্তস্বরূপ—তাঁহার সেই প্রত্যাখ্যানকারিণী প্রণয়িণী পরে নিজে হইতে আবার কিরূপে তাঁহাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি নানা গল্পের মধ্যে যেটি আপাততঃ তাঁহার হাস্যের কারণ সেইটির পুনরাবৃত্তি করিবেন।

হংস যেমন নীর ছাড়িয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ ইনি বন্ধুদিগের গভীর দুঃখের মধ্য হইতেও হাস্যরসের সার সংগ্রহ করিয়া নিজের জীবনের খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা হইতে যদি তুমি মনে কর যে, ইঁহার বন্ধুতা সব ফাঁকিফুঁকি, লোকটা নিতান্ত হৃদয়হীন, অসার, চপলচিত্ত, তাহা হইলে কিন্তু ভুল বুঝিবে। ইনি যে অসার নহেন, তাহার প্রমাণ, সকল শাস্ত্রের সার অঙ্কশাস্ত্র, ইঁহার মস্তিষ্কমন্থিত হইয়া সাধারণে বিতরিত হইয়া যায়। আর ইঁহার বন্ধুবাৎসল্য এত অধিক যে কঠিন মৃত্তিকাও দ্বিধা হইয়া থাকে, কিন্তু ইঁহার বন্ধুত্ব কখনো ভাঙ্গে না। এই দেখ না আমার ভ্রাতার সহিত বহুদিন পূর্ব্বে ইঁহার বিলাতে প্রথম আলাপ, তার পর একজন কর্ম্মসূত্রে একজন জন্মসূত্রে, উভয়ে প্রায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া এই একই অঞ্চলের নিবাসী, ইহা সত্ত্বেও ইঁহাদের বন্ধুত্ব এই দীর্ঘকাল সমভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। "Familiarity breeds contempt" এ প্রবাদ বাক্যটি যদি কোথাও খাটে ত ইঁহার সম্বন্ধে খাটিবার সম্ভাবনা ছিল, অথচ এ সম্ভাবনাটা তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব দেখিতেছি, এমন আর কোথাও নহে। আসল কথা, বন্ধুদের খরচে ইনি হাসেন বটে, কিন্তু সে হাসি এমন কাঁটাখোঁচা হীন মোলায়েম, যে তাহাতে বন্ধুত্বের উপর কোনই আঘাত লাগে না। বরঞ্চ তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যবহারের মধ্য দিয়া এতটা বন্ধুবাৎসল্য প্রকাশিত হয় যে, বন্ধুগণও তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

চপলতা বলিতে যাহা বুঝায়, অর্থাৎ অনুরাগের অস্থিরতা, ইঁহার স্বভাবে তাহা আদপে নাই বলিলেই হয়। সমস্ত অনুরাগই ইঁহার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ইনি সঙ্গীতানুরাগী

—ইমন, মল্লার প্রভৃতি ইঁহার যে কয়টি প্রিয় রাগিণী আছে, তাহা শুনিলে সানন্দে গলিয়া যান, ক্ষেপিয়া উঠেন, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্যান্য রাগ রাগিণী ইঁহার নিকট যেন সপত্নীসন্তান, কেহ গাহিলে বলেন, "উহা থাক, ইমন্ গাও, মল্লার ধর" বলিয়াই নিজে "গরজত বরষত ভি—" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। গান, গল্প, বোলচাল সকল বিষয়েই তাঁহার এই এক ভাব, এমন কি তাঁহার প্রেমাভিনয়ও এই ভাবে ধারাবাহী হইয়া একটি পরিবারের তিনটি বোনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। ইঁহার বয়স এখন ৫০ হইবে, এখনো ইনি অবিবাহিত। তিনি যখন উক্ত পরিবারের প্রথম ভগিনীর প্রেমে পড়েন—তখন তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টির প্রেমে পড়িয়া তিনি প্রত্যাখ্যাত হন ; তৃতীয়টি তাঁহার কন্যাস্থানীয়া ; তাহার বয়স এখন ২০ মাত্র ; অবশ্য এ কারণে ইহার সহিত তাঁহার প্রেমাভিনয়ের কোন ব্যাঘাত নাই, তাহাকে শাসাইয়া রাখিয়াছেন, অন্য কেহ তাহার হস্ত প্রার্থনা করিলেই তিনি তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বিবাহ না হওয়ায় লাভ ছাড়া তাঁহার লোকসান নাই। একবার বিবাহ হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রস্তাবের সুখলাভে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত ; এখন চিরজীবন ধরিয়া চিরনবীনাগণের নিকট তাঁহার হৃদয়াশা প্রকাশ করিতে পারেন।

স্ত্রীলোক দেখিতে খারাপ হইলে ইঁহার আদপে সহ্য হয় না। কুরূপা দেখিলেই তাঁহার নেপথ্য-সম্ভাষণ, Horrid, Beast ; আর যখন যাহার উপর রাগ হয় তখন সেও Horrid, Beast। বন্ধুগণ কেবল এরূপ সাদর সম্ভাষণ হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা সব Silly, জগতের সার সকলি তাঁহার নিকট Silly, বিশেষতঃ হিন্দুজাত এবং ব্রাহ্মণেরা ; কেননা তিনি নিজে খৃষ্টান হইলেও তাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে এবং হিন্দু বন্ধুবান্ধব লইয়াই তাঁহার কারবার।

ইঁহার একটা বিশেষ প্রিয়বাক্য "কিক্ দি বকেট" অর্থাৎ শিঙ্গে ফোঁকা। মৃত্যু বুঝাইতে হইলে, তিনি ইহার পরিবর্ত্তে কখনো অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে নাই। বাল্‌তিতে কেহ লাথি মারিলে ইঁহার দুঃখ হয় না, তা সে কেন যতই বন্ধু হউক না, "তিনিও ত বাল্‌তির দিকে দিন দিন পা বাড়াইতেছেন, যেমনি লাথিটা মারিবেন অমনি কর্ম্ম নিকাশ।" (এইখানে শবাভিনয়)।

কখন কি একটা কথায় যে ইঁহার কাহাকে ভাল লাগিয়া যায় তাহার ঠিক নাই। এক জনের একদিন মাথা ধরিয়াছিল, ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন এই ত তুমি বেশ ছিলে, হঠাৎ অসুখ করিল কেন? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "কি করিয়া বলিব ; ভগবানের মর্জ্জি", অমনি 'আচ্ছা', 'good', 'nice' এইরূপ প্রশংসাভিনন্দন তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল এবং সেই দিন হইতে সৌভাগ্যবান 'বক্তা' এবং তাঁহার মহামূল্য বাক্য কয়েকটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আমাদের বন্ধুবরের হৃদয়রাজ্যের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিল। এখন শুনি যখন তখন হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠেন "খোদাকি মর্জ্জি" এবং সেই সঙ্গে ক্ষণজন্মা বক্তারও গুণরাশি কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

তাঁহার বন্ধুপরিবারস্থ তরুণ বয়স্ক বালক বালিকার সহিত, বিশেষতঃ বালিকার সহিত তাঁহার বড় ভাব। ভাবের প্রধান লক্ষণ মুখভঙ্গী করিয়া চুল টানিয়া মাথায় কাগজের টুক্‌রা দিয়া (তিনি বলেন তিনি পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পূজা করিতেছেন) মনের সাধে তাহাদের বিরক্ত করা। যাহারা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে, যে যত শুধ শুদ্ধ তাঁহার ব্যবহার

তাঁহাকে ফিরাইতে পারে, তাহাকে তিনি তত ভালবাসেন। এমন কি তাঁহার প্রিয়তম 'বোকা' হইতেও সে তাঁহার প্রিয় হইয়া উঠে। (বোকা তাঁহার প্রিয় বিড়ালের নাম। সম্প্রতি সে বাল্‌তিতে লাথি মারিয়াছে, তাহার স্থলে আর একটি বিড়াল অধিষ্ঠিত)। ইঁহার টুপি ও ছাতি অধিকার করিতে পারিলেই ইনি বিশেষ জব্দ, তাহাতে কোন বালকবালিকা হাত দিলে ইনি যেন ব্যাটারির আঘাতে অধীর হইয়া উঠেন। তবে ইহা তাঁহার সখের সাজা, ইহাতে তিনি থাকেন ভাল, তাঁহাকে নির্ঘাত জব্দ করিবার উপায় তিনি যখন তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া বাস করিতেছেন, তখন ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করা। এইরূপ নিমন্ত্রণকে তিনি যেমন ভয় করেন, ছেলেরা মুখোষকেও সেরূপ করে না। সোলাপুর পুনার কত নিকট কিন্তু ঐ ভয়ে তিনি এখানে আসা একেবারে ছাড়িয়াছেন। এবার আমরা পুনা ছাড়িবার সময় তিনি তাঁহার বাঁধাগৎ-বিদায়াভিবাদন-রসিকতা (অর্থাৎ রুমালে ঘন ঘন চোখ মোছা আর কান্নার সুরটানা) শেষ করিয়া আমাদিগকে কথা দিলেন, পরের হপ্তায় তিনি নিশ্চয় আসিতেছেন। তাহার পর এমন কত হপ্তা পার হইয়াছে, এখনো ত তাঁহার দেখা নাই। প্রতি চিঠিতেই আশ্বাসবাণী "এই আসিলেন বলিয়া ; বেশী দেরী হইবে না, বড় জোর হপ্তা খানেকমাত্র ; এই সোলাপুরের ক্রিকেট ম্যাচটা বা ডিনার পার্টিটা বা গভর্ণর সেখানে যাইতেছেন, সে হেঙ্গামটা চুকিবার মাত্র অপেক্ষা।" তবে আমরা জানি রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণের আশা করাও যা, তাঁহার সোলাপুরে আসার আশা করাও তাই একই ; কেননা এমন একটি সপ্তাহ আসিবে, যে সপ্তাহে এখানে ছোট খাটও একটি পার্টি থাকিবে না এরূপ হইবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তাহা হইলে ত এখানকার ইংরাজ সমাজের শ্বাসবন্ধ হইয়া যাইবে। এমনিতেই ত সোলাপুর Dull, Dull করিয়া তাঁহারা অস্থির। এখানকার অল্প স্বল্প আমোদে তাঁহারা যেন কলসির জলে কই মাগুরের মত ধড়ফড় করিতেছেন, সে জলটুকুও যদি একেবারে খালি হইয়া যায় তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে। আচ্ছা আমি ত অনেকবার আমার চিঠিতে ইংরাজ সমাজের উল্লেখ করি ; শুনিলে তোমার কি মনে হয় পিপড়ার সার, কি পতঙ্গ পাল না মৌমাছির চাক, কি বল দেখি? আসলে সে রকমটা কিছুই না ; জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, অ্যাসিষ্টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিস কর্ত্তা এবং রেলওয়ে উচ্চ কর্ম্মচারী দুই চারি জন মাত্র লইয়া এই সমাজ। রেলওয়ের নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহারা নীচের দল, সুতরাং এ সমাজের বার। তাহারা ইঁহাদের সহিত কখনো ক্রিকেটম্যাচে যোগ দেয়, কখনো বা ইঁহাদের কোন সখের নাট্যাভিনয় বা গীতবাদ্যের নিমন্ত্রণে আসে। এরূপ নিমন্ত্রণ পাইলে অবশ্য তাহারা আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করে। ইংরাজদের আমাদের মত জাতিভেদ নাই ; কিন্তু তাঁহাদের মত পদমর্য্যাদানুরাগ আর কোথাও দেখা যায় না। ভূতপূর্ব্ব কলেক্টার মিষ্টার ক্যানডি এ সম্বন্ধে বড় ভাল ছিলেন। এখানকার সবজজ মিষ্টার 'ম' ফিরিঙ্গি বলিয়া কয়েকজন গোঁড়া সিভিলিয়ান তাঁহাকে জিমখানার মেম্বর হইতে দেন নাই, মিষ্টার ক্যানডি কলেক্টার হইয়া আসিয়া তাঁহাকে সমাজ-ভুক্ত করিয়া লইলেন অর্থাৎ জিমখানার মেম্বর রূপে গ্রহণ করিলেন। অবশ্য মিষ্টার 'ম'য়ের এতটা সমাদরের প্রধান কারণ তাঁহার স্ত্রী। তিনি খাঁটি ইংরাজ, তাহাতে বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা, সকলেই সেজন্য তাঁহার প্রতি মমতাশীল, স্বামীকে জিমখানার মেম্বর না করিলে

আসলে তাঁহাকেই নির্ব্বাসন শাস্তি দেওয়া হয় সুতরাং কলেক্টরের প্রস্তাব সহজেই কার্য্যে পরিণত হইল। কেবল ইহাই নহে, ইঁহার সহায়তায় একজন গুজরাটি হিন্দু ষ্ট্যাট্যুটরি এসিষ্টেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে এই জিমখানার মেম্বর হইয়াছিলেন। ইঁহারা সস্ত্রীক প্রায় প্রতিদিনই জিমখানায় আসিতেন, খেলাধূলা করিতেন, তবে স্ত্রী ইংরাজি জানেন না তাই একটু অসুবিধা হইত। আর একটু এই অসুবিধা যে ইঁহারা যদিও জাতিভেদ মানেন না, ব্রাহ্ম, কিন্তু নিরামিশ ভোজী, সেইজন্য ইংরাজদের সহিত ডিনারে যোগ দিতে পারিতেন না, এই কারণে মিশিয়াও ইঁহারা ঠিক তাঁহাদের দলে মিশিতে পারেন নাই, কারণ একত্র ভোজ ইংরাজ সামাজিকতার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ।

আমরা ইংরাজদের সমকক্ষতা লাভ করা নিতান্ত দুরূহ বলিয়া মনে করি কিন্তু বাস্তব পক্ষে খানাপিনায় ইংরাজ যেমন বশ এমন কোন জাত নহে। মিষ্টার ক্যান্‌ডি থাকিতে সোলাপুরের ইংরাজসমাজ বেশ একটু আরামে ছিল। তিনি প্রায়ই নিত্য নূতন আমোদের বন্দোবস্ত করিতেন। জিমখানা প্রায়ই বলরুম ও নাট্যশালায় পরিণত হইত ; ক্রিকেট ম্যাচ্ ব্যাডমিন্টন্ টুর্ণামেণ্ট প্রভৃতিতে সময় সময় বিজাপুরের ইংরাজদলকে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করা হইত। একবার এইরূপ নিমন্ত্রণে আসিয়া বিজাপুরের ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে আমাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সপরিবার বলিতে তিনি, তাঁহার স্ত্রী, এবং তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামী জাত যুবতী কন্যা। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যুবা পুরুষ কিন্তু তাঁহার স্ত্রী অর্দ্ধ বৃদ্ধা। তিনি যে কন্যাকে বিবাহ না করিয়া মাতাকে কেন বিবাহ করিলেন ইহাতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিত। কখনো কখনো এমনো ঘটিয়াছে, নবাগতেরা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়া কন্যাকেই গৃহকর্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, এইরূপ ঘটনায় গৃহিণীর ক্রোধের আর সীমা থাকিত না।

মিষ্টার ক্যান্‌ডি এদেশীয় সম্ভ্রান্তদিগকেও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিয়া যথোপযুক্ত সাদর অভ্যর্থনা এবং আমোদপ্রমোদ প্রদান করিতেন। নিম্নপদস্থ লোককে সম্মানিত করা নিজের মানহানিজনক না মনে করিয়া তিনি বরঞ্চ সুখজনক জ্ঞান করিতেন। সেই জন্য সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই তিনি প্রিয় ছিলেন। রেলওয়ের লোকেরা তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে একদিন ক্রিকেটম্যাচের পর সহসা তাঁহাকে কাঁধে উঠাইয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল।

এখনকার কলেক্টার যে মন্দ লোক তাহা নহে, ইনিও দেশীয় লোকদিগকে বেশ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তবে নিজের লোকের সহিতও তিনি মেলামিশি করেন কিছু কম, জিমখানাতে ত প্রায়ই ইঁহাদের আসিতে দেখি না। ইঁহারা বিলাতের বেশ সম্ভ্রান্ত লোক, এখানকার ইংরাজেরা ইঁহাদের সমকক্ষ নহে ইহাই তাঁহাদের মনোগত ভাব। তবে অবশ্য এজন্য ইঁহারা কাহারো সহিত ভদ্রতার ত্রুটি করেন না, বরঞ্চ বিপরীত ; মিসেস স্নোর ভদ্রতা ও তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। তাহা ছাড়া ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব এখানকার সকল ইংরাজই স্বীকার করিয়া চলে সুতরাং তাঁহাদের মনের ভাবেও তাহারা অসন্তুষ্ট নহে। মিসেস স্নোর রং বড় সুন্দর, বিলাতে যে তুষার শুভ্র রংয়ের কথা শুনা যায় এ তাহাই। এরূপ রং না কি সে দেশের সম্ভ্রান্ততারি প্রধান লক্ষণ, এখানে তাঁহার নামটিও ঠিক খাটিয়াছে, 'স্নো' ত স্নোই বটে। ইঁহাকে দেখিতে নিখুঁৎ সুন্দরী নহে কিন্তু ইঁহার কথাবার্ত্তা হাবভাব ধরণ ধারণ এত মধুর যে সুন্দরী না হইয়াও ইনি সুন্দর। বাঙ্গালী মেয়ের মত

বেশ একটি বিনয়পূর্ণ লজ্জামাধুরী ইঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি বেশ পিয়ানো বাজাইতে পারেন, কিন্তু নিমন্ত্রণ সমাজে বেশী লোকজনের সাক্ষাতে বাজাইতে ইঁহার এত লজ্জা করে, যে সে সময় ইঁহাকে বাজাইতে অনুরোধ করা ইঁহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ। একবার নাকি নিমন্ত্রণ সভায় বাজাইয়া ইনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন।

যদি ইঁহাকে বল, "মিসেস স্নো, শুনিলাম তুমি বেশ বাজাইতে পার", ত একজন বাঙ্গালী মেয়ে এরূপ স্থলে যেরূপ আধো বাধো করিয়া লজ্জায় আহ্লাদে অবিশ্বাসে আগ্রহে বলিত, সেইরূপ ভাবে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া সাগ্রহে বলেন, "না, তুমি ঠাট্টা করিতেছ, কে বলিল, কার কাছে শুনিলে, তাও নাকি·হয়, ইত্যাদি।" তিনি যে ভাল বাজাইতে পারেন এ কথাটা যেন কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। মেয়েলি কুসংস্কারও তাঁহাতে বড় মন্দ দেখা যায় না। ১৩ জন ডিনারে বসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিলে ইঁহার কম্প উপস্থিত হয়। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস এই ১৩ জনের একজন নিশ্চয় শীঘ্র মরিবে। একবার নাকি তিনি প্রত্যক্ষ এইরূপ ঘটিতে দেখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম ১৩ জন কেন ১২ জনের ডিনারের পরও ত তাহার মধ্যে কাহাকেও শীঘ্র মরিতে দেখা গিয়াছে, না হয় ১৩ জনের ডিনারেও তাহাই ঘটিয়াছিল, ইহাতে ত এমন কিছু বলা যায় না, যে ১৩ জনের ডিনারই সাংঘাতিক। এ যুক্তি তাঁহার নিকট কোন কাজের যুক্তি নহে, তিনি বলেন, "হ্যাঁ, ঐ সব পুরুষমানুষের অবিশ্বাসের কথা, প্রত্যক্ষ চোখে আঙ্গুল দিয়া যখন তাহাদিগকে ঐ রূপ কোন ঘটনা দেখাও তখনও তাহাদের ঐ রকম উত্তর।" আমাদের মত ইহাদেরো যাত্রার শুভাশুভ দিন আছে। কোন অশুভ বারে কোথাও যাত্রা করিতে ইঁহার বড় ভয়, বিশ্বাস তাহাতে অমঙ্গল ঘটিবে। এইরূপ সকল বিষয়েই তাঁহার একটা বেশ মেয়েলি ভাব দেখা যায়। মেয়েদের একেবারে কুসংস্কার নাই, পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, নিজের বুদ্ধির দম্ভে তাঁহারা পৃথিবী মাপিয়া মাপিয়া চলিতেছেন, এমনটা হইলে কেমন যেন একটা পৌরুষিক কাঠিন্যে তাঁহাদের স্ত্রীশোভন সুকোমল হৃদয়মাধুর্য্যের মুগ্ধকারিতা ঢাকিয়া যায়।

তবে যেখানে সুশিক্ষার অভাব, যেখানে সহৃদয়তা সদ্ভাবের চর্চ্চা নাই, সেখানে এরূপ অন্ধ বিশ্বাস নিতান্ত অমঙ্গলজনক বীভৎসভাব ধারণ করে; মিসেস স্নোর শিক্ষোৎকর্ষিত উদারতা ও স্বাভাবিক সহৃদয়তার সঙ্গে এইরূপ মেয়েলীভাব যেন সুন্দরে মধুরে মিলিয়াছে। মিশনারীরা যে এদেশের ধর্ম্মহানি করিতে সচেষ্ট, ইহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার মতে তাঁহাদের ধর্ম্মও যেমন মুক্তিপ্রদ, আমাদের ধর্ম্মও তেমনি। তিনি বলেন, একজন অজ্ঞান যখন প্রস্তরে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া ভক্তিভরে পূজা করে, তখন ত সে ঈশ্বরকেই ডাকে, ইহার পরিবর্ত্তে যীশুকে ডাকিলে সে কিছু আর অধিক ভক্তি ভরে ডাকিতে পারিত না, সুতরাং অজ্ঞানের কাছে যীশু ও প্রস্তরখণ্ড একই, তবে কেন বিধর্ম্মী করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের পরিবার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন করা। এই সকল কারণে তাহাকে আমার বড়ই ভাল লাগিত। আমাদের দুজনের বেশ একরকম বনিয়া গিয়াছিল। আমি ইহাকে প্রশংসা করিয়া বলিতাম, তুমি যেন ঠিক বাঙ্গালির মেয়ে; তিনি আমাকে কথাটা ফিরাইয়া বলিতেন, তুমি যেন ঠিক একটি ইংরাজের মেয়ে—অবশ্য দুজনেরই উদ্দেশ্য ভাল, প্রশংসা করিবার অভিপ্রায়, কিন্তু দুজনার অভিপ্রায়টাই ব্যর্থ হইয়া কথাটা কেবল উপহাস হইয়া দাঁড়াইত।

এখনকার এসিষ্টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পুরোগোছ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। সোলাপুরের বেহালা বাজিয়ে রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মতে তাহারাই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, যাহারা দিনে ঘুমায় আর মসলাওয়ালা কারি খায়। উক্ত এসিষ্টেন্টের এ দুই লক্ষণ আছে কিনা জানি না ; তবে ইনি নেটিভবিদ্বেষী। যদিও ইঁহাকে নেটিভ বলিলেও একদিকে চলে, অন্ততঃ গালি দেওয়া হয় না। কেন না ইঁহার বাপ পিতামহ পর্য্যন্ত এদেশের খাইয়া মানুষ, এ দেশে বসবাস করিয়াছেন, এখানে জন্মিয়াছেন। "বঙ্গবাসী"কে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া সে দিন তিনি রাগিয়া আগুণ ; এ সম্বন্ধে তর্ক ওঠায় জজ সাহেব সে দিন তাঁহাকে বেশ দুএক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার নিজের জাত ভায়ারাও এখানে ইঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, সকলেই বলে বড় Stuck up—অহঙ্কারী ; গৃহিণীর উপরই অবশ্য এ কথাটার প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে সত্যি কথা বলিতে কি, আমরা ইঁহার অহঙ্কারের কোনরূপ পরিচয় পাই নাই, আমাদের সহিত বেশ অসঙ্কোচে মিশিয়া থাকেন।

ইঁহাদের কল্যাণে আপাততঃ মেয়ে মহলের গল্প গুজবে বেশ একটু তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইঁহাদের ঘরে দুইটি অবিবাহিত যুবতী আছেন, একটি কর্ত্তার বোন, একটি গৃহিণীর বোন। জিমখানাতে বা ডিনার পার্টি প্রভৃতি যে কোন নিমন্ত্রণে তাঁহারা উপস্থিত থাকেন, সেইখানেই দেখা যায় সোলাপুরের রহস্যক মিষ্টার বি রুক্মিণী ও সত্যভামার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মত ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পক্ষপাতিত্বহীন সমভাবে উভয়ের প্রতি নিজের শুভ্রদন্তচ্ছটা ও রসাল বাক্যঘটা বর্ষণ করিতেছেন। আমরা এবং আর সকলে তাঁহাদের দিকে আড়নয়নে আনন্দ কটাক্ষপাত করিতেছি, আর এই দ্বিমুখী উচ্ছ্বাস সহসা স্তম্ভিত হইয়া একমুখী প্রেম প্রবাহে কি প্রকারে উৎসারিত হইয়া উঠিবে সেই অত্যদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক পরিণাম রহস্য দেখিবার জন্য আগ্রহ-কৌতূহল-চিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছি। তবে সম্ভবতঃ আমাদিগের অদৃষ্টে নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছু নাই। অ্যাসিষ্টেন্ট সাহেব ত ফার্লো লইতেছেন ; যুবতী দুইজন শীঘ্রই সোলাপুর পরিত্যাগ করিবেন, অথচ এখনো পর্য্যন্ত ত কোনরূপ হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গি বা চরণ বিলুণ্ঠিত সাশ্রু প্রস্তাবের খবর শুনিতেছি না।

সোলাপুরের আর একটা সাধারণ গল্পের বিষয়—এখানকার সিভিল সার্জ্জনের সহিত ডফরিণ হাঁসপাতালের মহিলা ডাক্তারের ঝগড়া। মহিলাটি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, হিন্দুবংশ, জাতিতে পঞ্জাবী রমণী। ডাক্তার ইঁহার কাজের ক্রমাগত খুঁৎ ধরেন। সম্প্রতি ইঁহার নামে একটি এইরূপ অভিযোগ আনয়ন করেন যে ইনি অন্যায়রূপে কয়েকটি স্ত্রীলোককে হাঁসপাতালে স্থান দান করেন নাই। হাঁসপাতালের সভ্যগণ বিচারে ইঁহাকে দোষমুক্ত করিয়াছেন দেখা গেল। যাহাদিগকে ইনি স্থান দান করেন নাই, তাহারা এরূপ সংক্রামক পীড়াযুক্ত যে, তাহাদিগের সংস্পর্শে হাঁসপাতালের অন্যান্য রোগীগণও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

একজন স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের ঝগড়া হইলে সহজেই অবলা রমণীর পক্ষ সকলে গ্রহণ করে, এখানেও সকলে মিস স—য়ের পক্ষ। তবে তাঁহাকে অবশ্য কিছুতেই অবলা রমণী বলা যায় না। ডাক্তারের অবজ্ঞা তিনি শুধ সমেত ফিরাইয়া দিয়া থাকেন। তাঁহার মত নির্ভীক নিস্পরোয়া বেখাতির লোক আমি ত দেখি নাই। ডাক্তার বিলাত হইতে সিভিল-সার্জ্জন হইয়া আসেন নাই ; পূর্ব্বে অ্যাপথিকারি ছিলেন, এখন সিভিল-সার্জ্জনের

পদে উন্নীত হইয়াছেন; সেইজন্য মিস স—কখনো ইঁহাকে ডাক্তার বলেন না, তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হইলেই তীব্র ঘৃণাসূচক স্বরে বলেন "মিষ্টার অমুক"। এবং কাহারো নিকটই তিনি ডাক্তারের সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করেন না। এই ঝগড়ায় সোলাপুরের ইংরাজ সমাজ নিতান্ত বিরক্ত, সকলেরি ইচ্ছা ইহা মিটিয়া যায়। ডাক্তার এখন এতদূর নরম হইয়া আসিয়াছেন যে মিস স—তাঁহার অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার ত্যাগ করিলে এ ঝগড়া মিটিয়া যাইতেও পারে, কিন্তু তিনি অটল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ১৫ দিনের ছুটি লইয়া মিস্ স —মান্দ্রাজ গমন করেন, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে রেলওয়ে ডাক্তার পিয়ার্স তাঁহার হইয়া হাঁসপাতাল দেখিবার ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বদলি হইয়া অন্য স্থানে যাইতে হয়। সিভিল সার্জ্জন সেই সময় সৌজন্য প্রকাশ করিয়া মিস স—এর রোগীদিগের তত্ত্বাবধান লইতেন। মিস স—আসিয়া সেজন্য তাঁহাকে একবার ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিলেন না। আমরা কিছুতেই তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না, যে তিনি তাঁহার ধন্যবাদের পাত্র। পঞ্জাবী মেয়ে বটে। ইঁহাদের বিবাদের সূত্রপাতের কারণ কি জান? মিস—স নাকি একজন যুবককে সুপুরুষ বলিয়া ডাক্তার পত্নীর নিকট প্রশংসা করেন। তিনি একলা কেন, মহিলাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া থাকেন। সেইজন্য আমাদের মধ্যে ইহার একটি নাম বাঙ্গালায়, জনান্তিকে ছিল কন্দর্প। এখন ডাক্তারপত্নীর মত মেয়ে, প্রায় দেখা যায় না, তিনি সেই কথার উপর রং ঢং দিয়া জিমখানা শুদ্ধ লোকের কাছে সেই গল্প করিয়া বেড়ান, মিস স—রোখাল মেয়ে, তিনি ইহা শুনিয়া চুপচাপে সহিয়া থাকিবার পাত্র নহেন, ডাক্তারপত্নীকে ইহার জন্য বেশ দুদশ কথা শুনিতেও হয়! সেই হইতে দুজনের মনান্তর ঘটে।

যে ডাক্তার পিয়ার্সের কথা উল্লেখ করিলাম ইনি বড় ভাল লোক, তিনি এদেশীয় পর্টুগিজ খৃষ্টান। তিনি মহারাষ্ট্রী যুবকদিগের মঙ্গলের জন্য বিশেষ যত্নবান। কেহ কেহ মনে করেন মিস 'স'য়ের প্রতি ইনি যেন কিছু "মধুভাবাপন্ন", এমনটা মনে করিবার যে বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছে তাহা অবশ্য নহে। তবে ইনিও দেশী খৃষ্টান উনিও দেশী খৃষ্টান, উভয়ে উভয়ের ফাঁদে পড়িবার বেশ উপযুক্ত, অথচ উভয়েরই হাত পা খোলা, মুক্তাবস্থা, বন্ধনপ্রিয় লোকদিগের প্রাণে ইহা সহ্য হয় না, তাঁহারা তাই নিজের মনোগত অভিপ্রায় হইতে ঐরূপ অনুমান করিয়াই থাকেন ভাল। বাস্তবিক, মেয়েরা সব দেশেই সমান। ভালই হৌক মন্দই হৌক, পরের কথা লইয়া থাকিতে পারিলে ইঁহারা যেমন আরামে থাকেন এমন কিছুতে না। গবর্ণর আসিতে ত ইঁহাদের সুখের সীমা ছিল না। গবর্ণর ছিলেন এখানে বড় জোর ৩৬ ঘণ্টা; ইহার মধ্যে ত্রিশ ঘণ্টা কাল ত তাঁহাদের অশ্রান্ত আমোদ, মধ্যাহ্ন ভোজ, রাত্রি ভোজ, বৈকালিক ব্যায়াম ক্রীড়া, সায়াহ্নিক আতসবাজি, স্কুল সমিতির অভিনন্দন, সভাসমিতির অভিনন্দন—এইরূপ নিমন্ত্রণের উপর নিমন্ত্রণে, সাজের উপর সাজ পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের ত উত্তেজনার বিরাম নাই, ইহার উপর আবার সার্ব্বভৌমিক রহস্যে সমালোচনার ধূম। জজ কালেক্টরের বাড়ী গভর্ণরকে যে ভোজ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইবার কাহারা উপযুক্ত, কাহারা না; কাহার কিরূপ পদমর্য্যাদা, কে যথেষ্ট Lady like, কাহার কিরূপ হাবভাব, কিরূপ ধরণ ধারণ, এই সব গল্প গুজবে কিছুদিন আগে হইতে মেয়ে মহল বিলক্ষণ সরগরম হইয়া

উঠিয়াছিল। জিমখানার মেম্বরদিগের মধ্যে এখানে দুইজন উচ্চপদস্থ সস্ত্রীক রেলওয়ে কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহাদের মধ্যে মিষ্টার এবং মিসেস 'ও' দম্পতি সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সম্ভ্রান্ততায় অন্য সকলের অসমকক্ষ প্রমাণ স্বরূপ বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, মিসেস নিমন্ত্রণ পত্র লিখিতে হইলে লেখেন, "Will you give I the pleasure" কিন্তু মিষ্টার ও মিসেস 'র'য়ের নামে, আর যতই নিন্দা রটুক, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ অপবাদ এ পর্য্যন্ত উঠে নাই, এবার কেহ কেহ তাহাতেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মিসেস 'র'য়ের অনেক গুণ আছে, নাচিয়ে, গাইয়ে, কইয়ে, বলিয়ে, লোকের সঙ্গে সহজেই বেশ বনিবনাও করিয়া লইতে পারেন, এমন কি তাঁহার কল্যাণে কেহ কেহ যা' নন তাহাও বনিয়া গিয়াছেন। মিষ্টার ল পূর্ব্বে স্ত্রীলোক দেখিলেই লজ্জায় জড়সড় হইয়া পালাইতেন। জিমখানায় গিয়া দেখিতাম, বিলিয়ার্ড লইয়াই ইনি আছেন ; ব্যাড্‌মিণ্টন ঘরে ভুলিয়াও ইনি পা বাড়ান না। তাহার পর মিসেস 'র'য়ের সহিত আলাপ হওয়ায় ইনি যেন সোনার কাটির স্পর্শে সহসা জাগিয়া উঠিলেন, এখন আর জিমখানায় তাঁহার মত স্ত্রীজাতির সেবাপরায়ণ (Lady's man) দ্বিতীয় কেহ নাই, কোন রমণী আসিতে না আসিতে সর্ব্বাগ্রে তিনি চৌকী বাড়াইয়া দেন, ব্যাড্‌মিণ্টন খেলায় পুরুষ পাওয়া যাইতেছে না, মিশেস র বলিলেন—"Mr.—would you play?" মিষ্টার ল—কিছু পূর্ব্বে ক্রিকেট খেলিয়া শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন তবুও খেলিতে সম্মত হইলেন। আর আগে তাঁহাকেই বলিতে শুনিয়াছি, "I hate badminton"। (এখানে যে যাহাকে দেখিতে পারে না, যে যেটা অপসন্দ করে, অমনি তাহাকে hate করে)। মিশেস র—এইরূপ কারণে মেয়ে মহলের কতকটা ঈর্ষাভাজন, বুঝি বা সেইজন্য তাঁহার প্রতি এরূপ গুপ্ত কটাক্ষ।

যাহা হউক, গভর্ণরের ভোজ উপলক্ষে অন্য সকলের ত মহা আমোদ কিন্তু বেচারা যাঁহারা এই ভোজ দিতেছেন তাঁহাদের কি মুস্কিল! কলেক্টারের বাড়ী সায়াহ্ন ভোজ, আমাদের বাড়ী মধ্যাহ্ন ভোজ—সকলেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাশা করিতেছে, যাহাকে না বলা হইবে, সেই দুঃখিত হইবে, অথচ জিমখানা শুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করাও নিতান্ত অসুবিধা, স্থানাভাব, কি করা যায়। কলেক্টরের স্ত্রী আমাদের বাড়ী আসিতেছেন, আমরা তাঁহাদের বাড়ী যাইতেছি। কাহাকে বাদ দিলে মন্দের ভাল হইতে পারে, ভোজের সময়েই বা কোন রমণীর ভার কোন পুরুষের উপর দেওয়া যায়, এই সকল মান অপমানজনক কায়দার মীমাংসাভিপ্রায়ে আমাদের যতটা ভাবিতে হইয়াছিল, ইহাতে যতটা মস্তিষ্কশক্তির অপব্যয় হইয়াছিল, সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধেও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বোধ করি তত ভাবনা বা অর্থের অপব্যয় হয় নাই। অবশেষে নানা যুক্তি নানা মন্ত্রণার পর জিমখানা শুদ্ধ সকলের জন্য কোনপ্রকার স্থান সঙ্কুলান করিয়া অনেকটা হৃদয় বেদনা ও তজ্জনিত অভিশাপের হস্ত হইতে আমরা অব্যাহতি পাইলাম। এইরূপে জিমখানার প্রত্যেক মেম্বর এবং তাহার অন্তর্নীতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি করিয়া বলিতে গেলে এখনো ঢের বলা যায়, কিন্তু আঠার পর্ব্ব মহাভারত লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি ব্যাস অবতার হইয়া জন্মগ্রহণও করি নাই, সুতরাং সে সব কথায় এইখানেই ইতি দিয়া মেম্বরদিগের দৈনিক আমোদ প্রমোদের একটু বিবরণ বলি শোন।

আমাদের বাড়ী জিমখানা হইতে অনেকটা দূরে, সেখানে যাইতে হইলে উদ্যোগ

পর্ব্বের বন্দোবস্তে এই ক্ষুদ্র পরমায়ু যেন ক্ষুদ্রতর হইয়া আসে। তাই বৈকালিক ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় একবার অমনি জিমখানায় উঁকি দিয়া বা এক আধ বাজি ব্যাডমিণ্টন খেলিয়া আসা ছাড়া অন্য সময় সেখানে যাওয়া হয় না। কিন্তু অন্যান্য মেম্বরেরা সকলেই প্রায় জিমখানার আশেপাশে থাকেন, তাঁহারা সকালে বিকালে দুইবার জিমখানায় সম্মিলিত হইয়া সচিত্র পত্রিকাদি দেখেন, খেলাধূলা, গল্পস্বল্প করেন। পুরুষরা সকল খেলাতেই আছেন, ব্যাডমিণ্টন টেনিস প্রভৃতিতে তাঁহারা মেয়েদের সহিত যোগ না দিলে সে খেলা জমে না ; আর গল্‌ফ, বিলিয়ার্ড ত তাঁহাদেরি খেলা ; তাঁহারা খেলেন, মেয়েরা অনেক সময় নিকটে বসিয়া তাহা দেখেন ও তারিফ করেন। সময় সময় পুরুষেরা ক্রিকেটও খেলিয়া থাকেন। এই সব আমোদ ছাড়া রাত্রে মাঝে মাঝে পরস্পরের বাড়ী ভোজ নিমন্ত্রণও আছে। জজ কালেক্টার প্রভৃতি ষ্টেসনের শীর্ষস্থানীয়গণই বেশী নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণে আহারের পর সাধারণতঃ গান বাজনা হইয়া থাকে, কখনো কখনো নাচও হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিমন্ত্রণ, নৃত্যগীত, যত বেশী, ইহাদের স্ফূর্ত্তিও তত বেশী। আপাততঃ এখানে নবযুবক অপেক্ষা যুবতীর ভাগই অধিক, তাই নাচের তেমন একটা সুবিধা না থাকাতে যুবতীদিগের মধ্যে হাহাকার। ডাক্তারের দুই কন্যা সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। ডাক্তারপত্নীর ভাবনা, এই নির্জীব স্থানে তাহাদিগকে কিরূপে বাঁচাইয়া রাখেন। ইহা হইতে মনে করিও না ইংরাজদিগের আমোদ ছাড়া অন্য কোন কাজকর্ম্ম নাই। তাহা নহে, ইহাদের 'মটো' কাজের সময় কাজ, আমোদের সময় আমোদ। এই জন্যই ইহারা অধিক কাজও করিতে পারে। তাহা ছাড়া ইংরাজদের যেরূপ বিবাহ পদ্ধতি তাহাতে স্ত্রীপুরুষের এরূপ একত্র সম্মিলন ব্যতীত বিবাহের তেমন সুবিধা নাই। সুতরাং ইহা তাহাদের পক্ষে আমোদ ঔষধ দুইই। স্ত্রীপুরুষের এইরূপ মেলামেশার আর একটি গুণ, পরস্পরের নিকট প্রশংসিত হইবার ইচ্ছায় স্ব স্ব স্বভাবজাত গুণগুলি ফুটাইয়া তুলিবার দিকে অনুরাগ। এইরূপে উভয়ের প্রশংসা উভয়ের উপর কিরূপ কার্য্যকারী এবং ইহার সম্মিলিত ফলে সমাজকে কিরূপ বল প্রদান করে, তাহা ইহাদের সহিত মিশিয়া দেখিলে বুঝা যায়। আর একটা কথা, বাহির হইতে শুনিতে এ সমাজকে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল, অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে তেমনটা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের সমাজ নিয়ম এমনই আটে ঘাটে বাঁধা যে এক পা বাড়াইতে হইলেও ইহাদিগকে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্য দিয়া যাইতে হয় ; নহিলে অমনি নিন্দার তপ্তলৌহ ছাঁক তোমাকে জ্বালাইয়া তোলে। ইহাতে গায়ে ফোস্কা পড়ে না সত্য, কিন্তু আগুনের জ্বালা সহে, তবু নিন্দার জ্বালা সহে না।

আমাদের বাড়ীতে প্রতি মঙ্গলবারে একটি করিয়া টেনিসপার্টি হয়। জিমখানার সমস্ত মেম্বরগণই সে দিন এখানে আসেন। টেনিস খেলার নিমন্ত্রণ বলিয়া সে দিন যে কেবল টেনিস খেলাই হয় এমন নহে ; টেনিসের পর প্রায়ই গান বাজনা হইয়া থাকে। আর বর্ষা বাদল হইলে যে দিন টেনিস খেলার সুবিধা না হয়, সে দিন গান বাজনা ছাড়া মিউজিক্যাল চেয়ার, তাসখেলা, হেঁয়ালি প্রভৃতি যে সকল খেলা ঘরের মধ্যে বসিয়া হইতে পারে তাহা খেলা হয়। মিউজিক্যাল চেয়ার কিরূপ বলি শোন। যদি ১২ জন এ খেলায় যোগ দিতে চান ত ১১ খানি চৌকী পাশাপাশি সাজাইতে হয় ; তাহার পর একজন

পিয়ানো বাজাইতে থাকেন আর ১২ জন লোক চৌকীগুলি দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করেন, যেই বাজনা থামে, তাঁহাদিগকে চৌকীতে বসিয়া পড়িতে হয়। এখন বসিতে হইবে ১২ জন লোকের, চৌকী আছে ১১ খানি, কাজেই যিনি তাড়াতাড়ি দখল করিতে না পারেন, তাঁহার আর বসা হয় না ; তিনিই হারিয়া যান। যিনি হারেন তিনি আর খেলিতে পান না, তখন খেলিবার লোক মোট ১১ জন, একখানি চৌকী কমাইয়া আবার খেলা আরম্ভ করা হয়। এইরূপে প্রতিবারে একটি করিয়া লোক ও একখানি করিয়া চৌকী কমিতে কমিতে যখন মোট একখানি চৌকী অবশিষ্ট তখন খেলা শেষ।

স্ক্যানড্যাল বলিয়া একরূপ তাসখেলা আছে সে মন্দ নয়। দুই প্যাক তাসের এক প্যাক সম্মুখে রাখিয়া অন্য প্যাকের সমস্ত তাসগুলি যাঁহারা খেলিতেছেন তাঁহাদিগকে বাঁটিয়া দিতে হয়। তাহার পর পালায় পালায় একজন করিয়া কোন একটা প্রশ্ন করেন ; যেমন ধর একজন বলিলেন, 'কে চোর', বলিবার পর সম্মুখে রক্ষিত প্যাক হইতে একখানি কাগজ উঠান হইল, সেই তাসের সমান তাস যাহার হাতে থাকিবে, তিনিই চোর। ভালরকম প্রশ্ন করিতে পারিলে খেলাটা বেশ জমে। কতকগুলি মেয়ে পুরুষে একদিন খেলিতে খেলিতে একজন পুরুষ প্রশ্ন করিলেন, "আমাকে কে চায়?" তাঁহার প্রণয়িনীও অবশ্য একজন সহক্রীড়ক ; প্রশ্নকারীর ইচ্ছা তাঁহার হাত হইতেই কাগজখানি বাহির হউক, কিন্তু একটি লাজুক বালিকার হাতে সে কাগজখানি ছিল, বালিকা লজ্জায় সারা, সকলে হাসিয়া অস্থির, আর যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনিও নত মুখ। তাঁহার দেখিতে ইচ্ছা শ্রীপঞ্চমী, দেখিলেন কৃষ্ণঠাকুর।

হেঁয়ালি খেলা বোধ হয় তুমি জান। অভিনয়ের মধ্য হইতে দর্শকদিগের হেঁয়ালিটি বাহির করিতে হয়। যেমন ধর, কথাটি পাহাড় ; একজন সাজিলেন রোগী—তাঁহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়াছে ; ডাক্তার আসিয়া তাঁহার পা টিপিয়া টুপিয়া দেখিতে লাগিলেন, দর্শকেরা বুঝিলেন পাহাড়। আর একরূপ খেলা, যতজন লোক ঘরে আছেন তাহার মধ্যে প্রথমে একজন একটি কবিতার ছত্র রচনা করিয়া তাঁহার শেষ কথাটি মাত্র আর একজনকে বলিলেন। তিনি আবার আর এক ছত্রে তাহার মিল করিয়া শেষ কথাটি তৃতীয়কে বলিলেন। এইরূপে উপস্থিত সমস্ত লোকের রচনা হইয়া গেলে কাগজগুলি মিলাইয়া দেখা হয়। অনেক সময় সমস্তটা এমন অপরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে দেখিতে বড়ই আমোদ হয়। আমরা কয়জনে বহুদিন আগে গঙ্গার ধারে বসিয়া একদিন এইরূপ খেলা করিতেছিলাম, কিরূপ মজার কবিতা হইয়াছিল দেখ।

জ্যোছনা-তরঙ্গ-রঙ্গে উথলিত—দিক
সহকার শাখে বসি ডাকিতেছে—পিক
যুবক দাঁড়ায়ে এক বাহুপাশে—শিক
যুবতী বিস্মিত মুগ্ধ স্তব্ধ—অনিমিখ।
কি ভুলে রয়েছি ভুলে হা ধিক্—হা ধিক
চাঙ্গা-হিয়া রাঙ্গা পায়ে পেয়ে মাঙ্গা—ফিক্
পাষাণে খোদিত যেন সেই সে—তারিখ
সব সহে সহে নাক প্রেমেতে—সরিক।

ইংরাজদের আর একরূপ আমোদ, বন্ধুবান্ধব আলাপীদিগকে দিয়া নিজের খাতায় কিছু লিখাইয়া লওয়া। নানালোকে নানারূপ লেখেন, কেহ কবিতা, কেহ প্রবাদ, কেহ উক্তি, সবগুলি একত্রে দেখিতে বেশ লাগে ভাল। একবার আমাদের একটি বন্ধু, একটি মহিলাকর্ত্তৃক তাঁহার খাতাতে লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বড় মজার কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ইংরাজ মহিলার খাতায় ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে বঙ্গভাষায় স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছি, তাই তোমার দৃষ্টির জন্য পাঠাইলাম।

একটু লেখো গো তুমি একটুকু যা তা,
পুরাইতে হবে মোর খাতাটির পাতা।
গদ্য হোক পদ্য হোক যাহোক তাহোক,
লেখো শুধু, রাখ কথা, দুচারিটি শ্লোক।
মৃতের কি জীবিতের যাহারি বচন,
কিম্বা যদি থাকে কোন তোমারি রচন ;
যাহা ইচ্ছা লেখো তুমি ক্ষতি নাই তাতে,
জাঁকাল—বাঁধান এই পুস্তকের পাতে।
তিক্ত গালাগালি কিম্বা রহস্যচাতুরী,
কঠোর ব্যঙ্গ অথবা তীব্র জারিজুরি ;
সুমধুর রঙ্গ ভরা রসাল বিষয়,
অথবা উপজে যাহে ঘোরতর ভয় ;
সত্য হোক মিথ্যা হোক পুরান কি নব ;
লেখো তুমি যাহা খুসী মনে আসে তব।
হৃদয় বিঁধুনী কথা, কাঁদুনি বিলাপ,
মানে হীন মোদ্দাহীন উম্মত্ত প্রলাপ ;
সেলির মতন ভাব ; শুধু স্বপ্নময়,
গভীর গম্ভীর কিবা যোগতত্ত্ব চয় ;
কিম্বা অনুরোধে যদি পারি তোমা দ্বারা
লিখাইতে রসময় লেখা সদ্য গড়া ;
সকলি সমান তারা হবে মম পাশে,
লেখো তুমি যা খেয়াল মনে তব আসে।
খাতাটির পাতাখানি পূরাতে বাসনা,
তাই এত অনুরোধ তাকি বুঝিছ না?
ভাল হোক মন্দ হোক ক্ষতি তাহে নাই
লিখেছ খাতায় তুমি ; যথেষ্ট তাহাই।

৬

ইতিমধ্যে আমরা পাণ্ডুরেপুর ও আকেলকোট ঘুরিয়া আসিয়াছি। পরিষ্কার প্রাতঃকাল, ঝকঝকে রৌদ্র, অন্তর বাহির স্ফূর্ত্তিময় ; বাড়ীর বাহির হইয়া ভাবিলাম, কি শুভক্ষণেই যাত্রা করিতেছি। এটা যে অন্য যুগ নহে, কলিযুগ, লক্ষণ অলক্ষণ, যাত্রা অযাত্রা এ যুগে যে কেবল একটা কথার মাত্রায় মাত্র পরিণত হইয়াছে, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ভালই হইয়াছিল, আগে হইতে ভয়ে ভয়ে মরার চেয়ে বিপদে পড়িয়া একেবারে মরাও ভাল, ইহাই জ্ঞানী প্রবচন! আজ আমি যে নূতন কথা বলিয়া তোমার এবং পৃথিবী শুদ্ধ লোকের অজ্ঞান অন্ধকার হরণ করতঃ নিজের ভবিষ্যৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিয়া রাখিতেছি, সেদিন বিপদের ভয়ে যাত্রা রহিত করিয়া উক্ত বাক্য লঙ্ঘন করিলে তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বলিয়া গিয়াছেন বটে, স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কেশ দেখিয়াই সাপিনী তাপিনী হইয়া বিবরে লুকাইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ ললনার স্বল্পকেশ সত্ত্বেও সাপিনী যখন সে দেশে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায় তখন তাহার কারণ যে স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কেশ নহে, অনেকদিন যাবৎ তাহা প্রমাণ হইয়াছে। সুখের বিষয় রায়গুণাকর ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন না ; তাহা হইলে তাঁহার নিজের মতকে নিজের হাতেই খণ্ড বিখণ্ড করিতে হইত। এখন কথা এই, সাপিনীর কেন তবে এ লজ্জা ভয়। সে দিন রেলের গাড়ীতে

বসিয়া আমি সে গূঢ় তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছি। উক্ত কারণ সুন্দরীর দীর্ঘকেশ-রাশি নহে, তাহার শক্তিরূপা জিহ্বা।

ষ্টেশনে সেদিন মহা ভিড়, ফার্ষ্ট ক্লাশেও এমন একটি খালি কামরা পাওয়া গেল না, যেটি আমরা চারিজনে নির্ব্বিবাদে অধিকার করিয়া বসি। কাজেই আমাদের দুজনকে একটি মহিলা কক্ষে আশ্রয় লইতে হইল ; আর আমাদিগের সঙ্গী পুরুষ দুইজন স্বতন্ত্র গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলাম একজন ইংরাজললনা তখনো রাত্রি-বেশ পরিধৃত অবস্থায়, একটি বেঞ্চে অর্দ্ধ লীন হইয়া আয়েসে চা পান করিতেছেন, আর একটি স্থূলকায় ফিরিঙ্গি-রমণী অন্য বেঞ্চে বসিয়া আছেন। আমরা গাড়ীতে উঠিয়া যথোচিত ভদ্রভাবে তাঁহাদের অধিকৃত দুইটী বেঞ্চের যৎকিঞ্চিৎ করিয়া স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। তাহাতে আমরা অনধিকার চর্চ্চা বা কাহারো কিছু ক্ষতি করিতেছি না বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক স্বাধীনাধিকারবাদী ইংরাজ ললনাটির মেজাজ ইহাতে নিতান্তই বিগড়িয়া গেল, তিনি চায়ের পেয়ালা পিরিচ সশব্দে পোর্টম্যাণ্টের উপর রাখিয়া সহচরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক আমাদের আগমন সম্বন্ধে সক্রোধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকের মেয়ে এমন রূঢ় হইতে পারে আমি ত আগে তাহা জানিতাম না। (ফার্ষ্ট ক্লাশের আরোহী, কাজেই ভদ্রমহিলা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় ; তাহা ছাড়া দেখিতেও মন্দ নহে)। যাহা হৌক তাঁহার মন্তব্যের মোদ্দাখানা এই, তিনি যখন গাড়ীতে ওঠেন, তখন ষ্টেসন-মাষ্টারের কথায় বুঝিয়াছিলেন, এ গাড়ীতে আর কেহ উঠিবে না। এ কথার অন্যথা করিয়া রেলওয়ের লোকে তাঁহার প্রতি যে অন্যায় অবিচার করিল, হায়দ্রাবাদ পৌঁছিয়াই তিনি খবরের কাগজে তাহা রিপোর্ট করিবেন ; আর এজন্য পরের ষ্টেসনের ষ্টেসন-মাষ্টারকেও তাঁহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। এইরূপে প্রকাশ্যে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর এবং অপ্রকাশ্যে বেচারা আমাদের উপর শব্দভেদী বাণ প্রয়োগেও সন্তোষ লাভ না করিয়া অবশেষে ষ্টেসনের যে খানসামা তাঁহাকে চা দিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর ক্রোধ বজ্র নিক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার অপরাধ, সে বিশ্বাস করিয়া এতক্ষণ তাঁহার নিকট পেয়ালা পিরিচ রাখিয়া গিয়াছে, এখনো তাহা লইতে আসে নাই।

তাঁহার এইরূপ অকারণ ক্রোধ দেখিয়া প্রথমটা আমরা ভারী অবাক হইয়া গিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহার পর নির্ব্বিকার দার্শনিকের মত শান্তভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনোভাবের সহিত মুখ সৌন্দর্য্যের সমন্ধালোচনা করিতে করিতে একটা নূতন জ্ঞান এবং বেশ একটু আনন্দলাভ করিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় যে কি, এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমার নিজের কোন একটা স্থির মতামত ছিল না। ছেলেবেলায় জানিতাম, খাদ্যের অনাদরই চূড়ান্ত বিস্ময়জনক ; কেননা পড়িবার সময় বেণেদয়া (আমাদের পুরাতন দাসী) আমাকে খাইতে পীড়াপীড়ি করিলে যদি বিরক্ত হইয়া বলিতাম যে, খাওয়ার চেয়ে আমার পড়তে বেশী ভাল লাগে ; তাহা হইলে তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। বড় হইয়া দেখিলাম এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ ; এমন কি সারা কনফেসন অ্যালবম্ খুঁজিয়া একরকম দুটো মত মেলে না ; এবং অধিকাংশ মতই এমন স্ব স্ব প্রধান যে, মামার সম্বন্ধী, এবং পিসার ভাই অপেক্ষাও পরস্পরে অধিক সম্বন্ধবিহীন। দেখ না, আমাদের

বন্ধুবর চা-বাবু বলিতেছেন, বাঙ্গালী ঘরের আঁতুরে ছেলে বাঁচিয়া থাকার মত বিস্ময়জনক ব্যাপার আর কিছু নাই; আবার তোমার মতে সুন্দর মুখই জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য বস্তু! আমার তখন সামান্য বিষয়ে এইরূপ মতবৈচিত্র্যই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হইত; কিন্তু সেদিন সুন্দরীর ক্রোধ-বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া জ্ঞানোদয় হইল যে, সুন্দর মুখে উগ্র বিকৃত ভাবের মত বীভৎস এবং আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য সংসারে আর কিছু নাই। সুন্দরীগণ এই কথাটি মনে রাখিলে সংসারের অনেকটা উপকার সাধন করিতে পারেন! আমার তখন এমনটা ইচ্ছা করিতেছিল একখানা আয়না লইয়া তাঁহার মুখের সামনে ধরি। কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন তাহাতে আর অবসর দিলেন না; উপদেশ দান আর উপদেশ পালন যে এক নহে তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। ইংরাজসুন্দরী চায়ের পেয়ালার উপর পেয়ালা চাপাইয়া খানসামার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে যেমন হাত বাড়াইয়া তাহাকে পেয়ালা পিরিচ দিতে যাইবেন, অমনি অভিপ্রায়ে বা অনভিপ্রায়ে জানি না পিরিচের খানিকটা উচ্ছিষ্ট চা স—য়ের কাপড়ে পড়িয়া গেল। রাগটা তখন কিরকম হইল বুঝিতেই পার। কিন্তু ইংরাজের ভদ্রতাকে সাবাস! যেমনি এই ঘটনা, অমনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তিনি অসঙ্কোচ-দুঃখ প্রকাশে তৎপর হইলেন, কেবল তাহাই নহে; কাপড়খানি ধৌত হইয়া উদ্ধার লাভ করিবে এরূপ আশ্বাস প্রদানেও ত্রুটি করিলেন না। তবে তাহাতে যে আমরা কতদূর সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলাম বলা অনাবশ্যক! যাহা হউক নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, এই মহৎবাক্যটির অনুসরণে আপনাদিগকে মহত্ত্ব প্রদান করাই তখন শ্রেয় বিবেচনায় তৎকৃত ক্ষতির জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণকেও মৌখিক শিষ্ট প্রয়োগে সম্পূর্ণ নাস্তিত্ব প্রদান করিয়া ভাবিলাম, অতঃপর এইখানেই তাঁহার ক্রোধপর্ব্বের শেষ। কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে। একটা বড় ষ্টেসনে গাড়ী থামিবামাত্র সুন্দরী বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া নামিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের চক্ষের উপর ষ্টেসন-মাষ্টারের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কি কথা তাহা অবশ্য জানি না; তবে অনুমানে বুঝিলাম আমাদের সম্বন্ধেই কথা চলিতেছে। তিনি সম্ভবতঃ আমাদের তাড়াইবার ফন্দীতে আছেন আর ষ্টেসন-মাষ্টার তাহাকে হতাশ্বাস করিতেছে, সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট আমাদের পরিচয়ও প্রকাশ করিয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শেষ না হইতে হইতেই ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ায় তাঁহার তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিতে হইল, লাভের মধ্যে সে ষ্টেসনে তাঁহার খাওয়াই হইল না। তিনি যখন মনের দুঃখে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন আমারও দুঃখ হইতে লাগিল। গাড়ীতে আসিয়া নিরাশভাবে শুইয়া পড়িয়া ক্রুদ্ধস্বরে সহচরীকে বলিলেন, "আমার কিছুই খাওয়া হইল না, বাড়ী গিয়া দেখিতেছি অসুখে পড়িব।" কথাটা এইরূপ ভাবে বলিলেন, তিনি যদি অসুখে পড়েন ত যেন রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুতাপে আত্মহত্যা করিবে। শ্রীরাম মেথরকে আমার মনে পড়িল, মদ খাইলেই সে অভিমানপূর্ণ হৃদয়ে বেসুরে চীৎকার করিয়া গাহিত, "মারবে তুমি মরব আমি অপচ হবে কার।"

দুঃখের বিষয় তাঁহার এত মানাভিমান, তর্জ্জন গর্জ্জন সমস্তই চা-দানির বিপ্লব-আলোড়নের মত অল্পক্ষণেই শেষ হইয়া গেল। আমাদের ইচ্ছা করিতেছিল আরো কিছুক্ষণ তিনি তাঁহার এ সুখস্বপ্ন উপভোগ করুন; কিন্তু জীবন ও রেলগাড়ী কাহারো জন্য দাঁড়াইতে চাহে না, কাহারো সাধ পূর্ণ করিতে অবকাশ দেয় না। আমাদের মনের

বাসনা মনেই রহিল, ট্রেন হুস্ হুস্ করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেসনে থামিল। আমরা আমাদিগের আনন্দসঙ্গ হইতে সুন্দরীকে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অগত্যা নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেসনে রাজরথ আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল, আমরা উঠিতেই সারথি নল-গৌরবে অশ্বচালনা করিয়া আঠার মাইল পথ অবিলম্বে অতিক্রম করিয়া আকেলকোট আসিয়া পৌঁছিল।

বাঙ্গলার যেমন বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, তেমনি আকেলকোট এ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র জেলা। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র বলিয়া রাজা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহেন; না পদমর্য্যাদায় না আকৃতিগৌরবে। সম্মানে তিনি প্রায় আমাদের কুচবেহারেরই সমকক্ষ হইবেন; প্রকৃত রাজক্ষমতা তাঁহার হস্তে, প্রজাদিগকে তিনি ফাঁসিও দিতে পারেন; আর আকৃতিতে তিনি বেশ একটু হৃষ্টপুষ্ট; বিধাতাপুরুষ তাঁহার শত্রুদিগের মুখে মধু দিতে দিতে যে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে এমন ভ্রম কাহারো হইবার সম্ভাবনা নাই। আকেলকোটে দর্শনীয় বড় কিছু নাই। গ্রাম্যদৃশ্য, সোলাপুরের মত ধুধুকারী শুষ্কমাঠ, শস্যশ্যামল বিরল ক্ষেত্র, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তরুপুঞ্জ, আর তাহার প্রাণের মধ্যে ক্ষুদ্র লোকালয়, অধিকাংশই কুটির, মাঝে মাঝে দু একটি অট্টালিকা, এক স্থানে রাজদুর্গ অভ্রভেদীরূপে দণ্ডায়মান। রাজপ্রাসাদ নবনির্ম্মিত, প্রাসাদ সংলগ্ন বাগান বড় সুন্দর; প্রাসাদের অভ্যর্থনালয় অর্থাৎ ড্রইংরুম ইংরাজি ফ্যাশানে বেশ জমকালো করিয়া সাজানো; তবে অসামান্য সাজসজ্জা নহে; আমাদের দেশের ধনী লোকের অনেকের গৃহ ইহা হইতেও জমকালো রকমে সুসজ্জিত।

আমরা ভাবিয়াছিলাম, রাণীর গভর্ণেস মিস্ মক্সন গৃহটি সাজাইয়াছেন—কিন্তু শুনিলাম তাহা নহে, রাণীসাহেবের নিজেরি সুরুচিশৃঙ্খলা এবং কলাকৌশল ইহাতে প্রকাশিত। রাজা আমাদের সঙ্গে লইয়া যাহা কিছু দেখাইবার সব দেখাইয়া বেড়াইলেন। স্কুলবাড়ী, বিচারালয়, রাজবাজার, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, এমন কি প্রাসাদের প্রত্যেক গৃহটী—সুসজ্জিত ড্রইংরুম হইতে আর জওয়ারি গমপূর্ণ ভাণ্ডারগৃহ ও মহামূল্য হস্তীসিংহাসন যেখানে থাকে সেই হাওদাখানা পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম। আমাদের সম্মানে চিত্রবিচিত্রদেহ, মাহুতপৃষ্ঠ, মহাদন্তী রাজহস্তী দুইটিও উদ্যানে দাঁড়াইয়া শুণ্ডাগ্রভাগ তুলিয়া সেলাম করিতে লাগিল। এই সকলের মধ্যে ছোট ছোট মৃণ্ময় গমপ্রকোষ্ঠগুলি দেখিয়া স—য়ের আহ্লাদের সীমা রহিল না; তদ্দর্শনে আকেলকোটে আসাটা তাঁহার সার্থক বলিয়া মনে হইল। তবে মুনিদিগের দ্বারাই যে মতভেদ জিনিষটা এক তরফা দখলীভূত নহে তাহার পরিচয় দৈনিক জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই পাইতেছি। ক্ষুদ্র সংসারিকদিগের মধ্যেও মতের অমিলটা এমনতর প্রবলবেগে দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করিলে এতগুলো মাসিক পত্রিকার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইত বল।

আমাদের ভাগ্য যেমনই হউক, মাসিকপত্রের সৌভাগ্যবশতই বোধ হয়, আমাদের দুজনের প্রতিপদেই প্রায় মতের অমিল হইয়া থাকে, এবারো হইল, আমি ত গমকুঠরির মধ্যে কোনই সৌন্দর্য্য দেখিলাম না। রাজার সাদর অভ্যর্থনায় প্রীতি লাভ করিয়া যখন রাণীর দরবারে উপস্থিত হইলাম, তখন মনে হইল এতক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি, আকেলকোটের মধ্যে যাহা দর্শনীয়, রাজার যাহা শ্রেষ্ঠ রত্ন, তাহা এইখানে বিরাজিত।

বাস্তবিক রাণীর সেই মিষ্ট মুখের মিষ্টহাসি অমায়িক সৌজন্য-সরলতা অতি মনোহারী।

মিস্ মক্‌সন রাণীর এবং রাজারো সেক্রেটারী। উভয়েরি অত্যন্ত প্রিয়। বস্তুত পক্ষে ইনিই রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা। ইনিও কিন্তু বেশ লোক ভাল, রাজারাণী যেমন ইঁহাকে ভালবাসেন, ইনিও তেমনি তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও বেশ আরাম আছে। লোকটা বেশ সাহিত্যানুরাগী, পড়াশুনা লইয়াই এক রকম আছেন।

রাজা এতদিন পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন নাই। আমরা সেখান হইতে আসিবার পর তিনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মহা ঘটায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইল, কিন্তু তাহার মধ্যে গরীব দুঃখীদের দান ৫০০০ হাজার মাত্র, আর সব খরচ ইংরাজ-পূজার আয়োজনে। ইংরাজগণ এই উপলক্ষে আকেলকোটে নিমন্ত্রিত হইয়া তিন চারদিন ধরিয়া নৃত্যগীত ভোজোৎসবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার সীমা ছিল না। আর রাজার অতি অল্পই আত্মীয়বন্ধু এই শুভ উৎসবপর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ছেলেবেলা হইতে রাজাকে ইংরাজভক্ত করিতে সচেষ্ট, সে অভিপ্রায় তাঁহাদের সুসিদ্ধ! রাজা আত্মীয়দিগকে সম্মান করেন না, ইংরাজদের সন্তুষ্ট করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট। আত্মীয়গণও সেইজন্য তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। রাজা রাণী ও মিস মক্‌সনের বিশ্বাস তাহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বিষভাণ্ড লইয়া বসিয়া আছে। রাজার এ পর্য্যন্ত পুত্র সন্তান হয় নাই, রাজা রাণী উভয়েই সেজন্য ক্ষুণ্ণ। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ কন্যাটির বয়স ৬/৭ বৎসর হইবে, সুন্দর মুখখানি।

ভারতী ও বালক, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ ১২৯৮, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ১২৯৯

পাণ্ডারপুর

পাণ্ডারপুর বোম্বাই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। বিঠোবাদেব এই পুণ্যস্থানের অধিষ্ঠাতৃ দেব। ইনি কৃষ্ণেরই অবতার বিশেষ বলিয়া কথিত। নামটি বিষ্ণুনামের অপভ্রংশ বলিয়াই আমার মনে হয়। কালোরূপে আমাদের দেশের কৃষ্ণমূর্ত্তিকেও ইনি হার মানাইয়াছেন। বিঠোবাদেব দর্শনে পাণ্ডারপুরে আষাঢ়ি এবং ফাল্গুনি মেলায় দিগ্বিদিক হইতে এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। আমরা যদিও অসময়ে গিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে দেবদর্শনের কোন ব্যাঘাৎ ঘটে নাই, ভরসা করি অনুমিত পুণ্যলাভেরও কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। হরিশ্চন্দ্রের অবস্থাটা লোভনীয় নহে, নহিলে মুগ্ধ কণ্ঠে বলিতে পারিতাম, এমনতর নির্ব্বিকার নিষ্কাম তীর্থযাত্রায় যদি চরম ও পরম পুণ্য না মেলে তাহা হইলে শাস্ত্রই মিথ্যা। কেননা সামান্য বা অসামান্য, গুপ্ত বা প্রকাশ্য কোনরূপ কামনাপরবশ হইয়া আমরা পাণ্ডারপুর যাত্রা করি নাই, আমাদের সেখানে গমন কেবল মকদ্দমা সূত্রে।

পাণ্ডারপুর সোলাপুরের বিচার বিভাগের অন্তর্গত। সেখানকার দেবপুরোহিতগণ দেবতাকে লইয়া আপনাদিগের মধ্যে মহা বিবাদ বাধাইয়াছে, তাহার নিষ্পত্তির জন্য ভ্রাতা

মহাশয়ের এখানে আগমন ; আমরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী।—দেবতার অদৃষ্ট ফলাফল এবার মনুষ্যের হাতে—ইনি এখন দেবতারো দেবতা।—

এ দেশে 'লোকপ্রিয়' এই বিশেষণটি জজ সাহেবের নামের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ। লোকপ্রিয় ঠাকুর সাহেবের অভ্যর্থনায় পাণ্ডারপুরে মহোৎসব চলিতেছে। ভীমা নদীতীরে ক্রম রথবেষ্টী, হস্তী অশ্ব জনসঙ্কুল, বাদ্য বাদন ঘোষী স্বাগত ও বিদায় উৎসব এবং পাণ্ডারপুর অবস্থিতিকালীন দৈনন্দিন অভ্যর্থনা অভিনন্দনের বিরাট সভা, অগ্নিবাজি, মন্দির দর্শন, স্কুল পারিতোষিক প্রদান, গৃহে গৃহে পানসুপারির নিমন্ত্রণ প্রভৃতি তাঁহার সম্মানার্থে প্রতিদিন বার ঘণ্টায় তের পার্ব্বণের অনুষ্ঠান,—সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ভাগ্যিস বিঠোবাদেব ইহুদিদিগের ঈর্ষাপরায়ণ দেব নহেন।

পুরোহিতগণ এখানে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বড়বে ও সেবাধারী। আমার মনে হয় বড়বে ও বড়ুয়া একই শব্দ, দেশভেদে উচ্চারণে ঈষৎ প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। বড়ুয়াগণই প্রধান পাণ্ডা—সেবাধারীগণ পূজারী মাত্র। বড়ুয়াগণ বলে তাহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেবাধারীদিগকে বেতন দিয়া পূজারি নিযুক্ত করেন। ইহারা উহাঁদিগের বংশানুক্রমিক দাসমাত্র। সেবাধারীগণ আপনাদিগের নিজস্ব অধিকার সপ্রমাণ করিতে চায়। ইহা লইয়া অনেকদিন হইতে উক্ত দুইদলের বিবাদ চলিতেছিল—হাইকোর্ট হইতে উহাদের পারস্পরিক অধিকার অনধিকার মীমাংসাও হইয়া গিয়াছে। দেব আয়ের কত অংশ কাহার প্রাপ্য, দেবপূজার কোন্ কার্য্য কাহার, আরতিতে অধিকার কাহার, গহনা পরাইবার অধিকারী কাহারা, পাদ্য-অর্ঘ্য দিবে কাহারা, এ সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছে, তথাপি কার্য্যস্থলে সে হুকুম নির্ব্বিবাদে পালিত হয় না, পূজার সময় এই সব খুঁটিনাটি লইয়া উভয় পক্ষে মহাদ্বন্দ্ব এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত বাঁধে। সময় সময় পুলিসও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না। এই কারণে কিছু দিন হইতে দেবপূজাই বন্ধ। ইহাতে উভয় পক্ষেরি বিশেষতঃ বড়ুয়াদিগের বিস্তর ক্ষতি, কেননা দেবদক্ষিণার অধিকাংশ বড়ুয়াদিগেরই প্রাপ্য। কিন্তু সেবাধারীরা জবরদস্ত শত্রু, বড়ুয়াদিগের অধিকার তাহারা সর্ব্বাংশে অবাধে স্বীকার করিতে চাহে না, প্রতিপদে বলপূর্ব্বক নিজ পক্ষের অধিকার গ্রহণ করিতে হইলে বড়ুয়াদিগকে দাঙ্গা করিতে হয়, ফৌজদারী মকদ্দামা বাধে—তাই সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল—এই বাক্যের অনুসরণে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিযাও এ মোকদ্দমার নিস্পত্তি পর্য্যন্ত ইহারা দেবপূজা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে।

সেবাধারীরা আপাততঃ বড়ুয়াদিগের নামে এই বলিয়া মকদ্দামা আনিয়াছে যে দেবতাদিগের অলঙ্কার যাহা দেবসম্পত্তি তাহা বড়ুয়ারা আত্মসাৎ করিয়াছে আর দেবতার আয় যে পরিমাণে দেবকার্য্যে ব্যয় হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া অধিকাংশই বড়ুয়াদিগের ভোগে ব্যয়িত হয়। ইহার বিচার করিতে লোকপ্রিয় ঠাকুর সাহেবের এখানে আগমন, —এবং কোন না কোন পক্ষে অপ্রিয়ভাজন হইবারই তাঁহার সমূহ সম্ভাবনা।—

দেবপূজার সময় উভয় পক্ষে কিরূপ তুমুল দ্বন্দ্ব বাধে তাহা না দেখিলে বলিয়া বুঝাইবার নহে। উভয় পক্ষের মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীও যেন সে সময় প্রাণবন্ত বীর্য্যবন্ত হইয়া হুহুঙ্কারে সংগ্রামরত হয়।—একজন বড়ুয়া পাণ্ডা প্রতিদিন ডাকবাঙ্গলায় আমাদের তত্ত্বাবধানে আসেন। আমাকে আক্কা দেবী নামে সম্বোধন করেন। দক্ষিণী ভাষায় ভগিনীকে

আজ্ঞা বলে ; ইঁহারা দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। ইঁহার শুষ্ক যষ্টিবৎ জীর্ণ দেহ ও নিরীহ ভক্তিময় শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ইঁহার প্রতি আমার নিতান্ত একটি সকরুণ বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে দাদা কোর্টে যাইবার পর আমি লিখিবার সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া বারান্দায় আসিয়া বসি ; পাণ্ডামহাশয় সহসা আসিয়া নিঃশব্দে অভিবাদন পূর্ব্বক নীচে মাদুরে আসন গ্রহণ করেন।—আমি কলম রাখিয়া আতিথ্যধর্ম্ম স্মরণে অতিথির প্রীতি সম্পাদন অভিপ্রায়ে সহাস্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া—নানারূপ প্রশ্নের অবতারণা করি। কিন্তু বিনিময়ে প্রতিবার অতি বিনীত সংক্ষিপ্তসার উত্তর মাত্র পাইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের ভাণ্ডার আপনা হইতে ফুরাইয়া আসে, কথাবার্ত্তা নীরবতায় পরিণত হয় —আমি তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে কলম টানিয়া লইয়া মৌনে পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করি, তিনি একটি প্রাণহীন গৃহসরঞ্জামের মত নিঃশব্দে নিস্তব্ধে ভক্তিমান চিত্তে আমার কলমাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনা করিয়া বসিয়া থাকেন।—

লেখার মাঝে মাঝে আনমনে কখনো তাঁহার সহিত দুই একটি কথা কহি ; এবং প্রায়ই তাঁহার একশব্দে নিঃশেষ উত্তর ফুরাইবার পর সেই স্পন্দহীন মুখের দিকে চাহিয়া বাহিরের শীতরৌদ্রতপ্ত নিস্তব্ধ নিঃঝুম প্রান্তরে দণ্ডায়মান পত্রবিরল শীর্ণ তরুর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য অনুমান করিতে করিতে, দেশের কবিরাজী ঘৃতের স্থূলকারিতা শক্তির পরীক্ষা বাসনা করি। একদিন দেখিলাম, মিথ্যা অনুমান করি নাই। শুষ্ক তরু কঙ্কাল কয়লাতে নিহিত আগুণের ন্যায় ইঁহার শুষ্ক দেহযষ্টিতেও অসম তেজ লুক্কায়িত। কার্য্যস্থলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।—

বিঠোবাদেবের সালঙ্কৃত মূর্ত্তি দর্শন মহাপুণ্য বলিয়া কথিত। এই মহারূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহাদের ভাগ্যের জোর অর্থাৎ পয়সার জোর আছে, তাঁহারাই পাণ্ডাদের নিকট হইতে এই পুণ্য ক্রয় করিতে সমর্থ। আমাদের ভাগ্য জোর আরো অধিক, বিনালাভে দেব পুরোহিতগণ আমাদিগকে দেবের সালঙ্কৃত মূর্ত্তি দেখাইয়া নিজেরাই সম্মানিত বিবেচনা করে। অসময়ে অলঙ্কার পূজা হইবে, এ সংবাদে মন্দির সম্মুখস্থ জনপদ জনাকীর্ণ। জনতরঙ্গ ভেদ করিয়া আমাদের গাড়ী যথাস্থানে আসিলে বড়ুয়াগণ দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রহরীরূপে আমাদিগকে বহুকষ্টে ভিড়ের মধ্যে দিয়া হাঁটাইয়া মন্দিরের সদর দ্বারে আনয়ন করিল। দ্বারপথে আসিবামাত্র প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লোক পঙ্গপালের মত মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহে।

পুরোহিতগণ আমাদিগের বডিগার্ড। প্রহরীদের দুই কার্য্য, প্রথম, আমাদিগকে বিনাকষ্টে মন্দিরে আনয়ন ; দ্বিতীয়, যথাসাধ্য লোক প্রবেশনিবারণ। সে সময় কি ভয়ানক কাণ্ড। ঠেলাঠেলি মারামারি, বড়ুয়ার স্থলে সেবাধারী, সেবাধারীর স্থলে বড়ুয়া আক্রান্ত আহত। কেহ অনধিকারে প্রবেশকারী, কেহ অধিকারে পলাতক ;—যাহারা এই যুদ্ধে অটলভাবে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিল—তাহারাই কৃতকৃতার্থ। যাহা হউক, এই যুদ্ধের মধ্যে আমরা পুরোহিত বডিগার্ডের দ্বারা বেষ্টিত ব্যূহবদ্ধ হইয়া অক্ষতভাবে মন্দির প্রবেশ করিলাম—অমনি প্রকাণ্ড দ্বার বন্ধ হইল। ভাবিলাম এইবার বাঁচোয়া, কিন্তু দেখিলাম বাঁচিতে এখনো বিলম্ব আছে, ইহা যুদ্ধের আরম্ভ মাত্র—মন্দিরগৃহে এখনো প্রবেশ করা হয় নাই ; এ কেবল মন্দির দালানে ঢুকিলাম।—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ

করিতে সকলেই সচেষ্ট হইয়া আছে।—আবার একটা যুদ্ধায়োজন চলিতেছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া আবার কয়েকটি সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া তবে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। সোপানে উঠিবার সময় এমন তুমুল বিবাদ বাধিল যে তাহার মধ্য দিয়া সহজে মন্দিরে ঢোকা একরূপ অসাধ্য সাধন। প্রতি সোপানে ছোটখাট যুদ্ধ করিতে করিতে বডিগার্ডগণ আমাদের রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বীরত্বে কোনরকমে আমরা সোপানাবলির ভবনদী পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। রৌপ্যদ্বার তখন বন্ধ হইল। এই সমস্ত সময় আমার সেই ক্ষীণকায় ভ্রাতাটি আমাদের পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই —যুদ্ধ করিতে করিতে বীর এবং ধীরভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। এক সময় একজন তাঁহার হাত এমন সজোরে টানিতেছিল—দেখিয়া মনে হইল এখনি তাহা ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কিন্তু কৌশলে তিনি আত্মরক্ষা করিয়া আমাদের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মনে হইল যথার্থই সেস্থলে প্রাণ দিতে হইলে তিনি কাতর হইতেন না।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঠাকুরের তখনো গহনা পরা শেষ হয় নাই। একজন বড়ুয়া তখনো তাঁহাকে অলঙ্কারে ভূষিত করিতেছে। মাথায় হীরক মুকুট ঝক্‌ঝক করিতেছে, কণ্ঠে বড় বড় হীরামুক্তোর সহস্রলহর, হাতে হীরামুক্তোর নানারূপ অলঙ্কার। মারহাট্টা বস্ত্র পরিহিত বিঠোবাদেবের কৃষ্ণদেহ এই অলঙ্কারমালায় ভূষিত হইয়া মনোহর হইয়াছিল কিনা জানি না, আমরা মুগ্ধ হই নাই, কিন্তু চারিপাশে দর্শকেরা ভক্তিমান ভাবে আহা আহা করিতেছিল, আমরা ভাবিতেছিলাম অলঙ্কারগুলি দ্রষ্টব্য বটে। অলঙ্কারসজ্জা শেষ হইলে আরতি পূজা আরম্ভ হইবে, কিন্তু গোল উঠিল আরতির পূর্ব্বে যে অর্ঘ্য দিতে হয় তাহা কে দিবে? সেবাধারী না বড়ুয়া? বড়ুয়ারা আমাদের নিষেধ করিল, আপনারা সেবাধারীর হাত হইতে অর্ঘ্য লইবেন না, তাহা আমাদের দেয়। এদিকে সেবাধারীরা আমাদিগকে ফুলচন্দন দিতে অগ্রসর—বড়ুয়ারা বাধা দিতে উদ্যত। ডেপুটিসাহেব স্বয়ং পুলিস লইয়া হাজির—কিন্তু তখন তাঁহাকে কে মানে? তাঁহার উপদেশ কে শোনে? পুলিসও জোর করিয়া দেবগৃহে প্রভুত্ব করিতে কুণ্ঠিত, তাহারা ন যযৌ ন তস্থৌ। চারিদিকে মহা বিশৃঙ্খল পড়িয়া গেল, আরতি হইবার আর সম্ভাবনাই রহিল না, আমরা তখন পূজা না দেখিয়াই মন্দির হইতে বিদায় লওয়া যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলাম। এমন কি এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেদিন ভাল করিয়া মন্দিরই দেখা হইল না। আর একদিন গোপনে বড়ুয়ারা আমাদের মন্দিরে লইয়া গেল।—বিঠোবার মন্দির এদেশের মন্দিরের মত নহে। তাহা চূড়াবিহীন দুই তিন প্রশস্ত প্রাঙ্গণ-সংযুক্ত বৃহৎ অট্টালিকা।—গলির উপরেই অট্টালিকার প্রশস্ত সোপানাবলী উঠিয়াছে। উপরের শেষ সোপানের দক্ষিণ দিকে কবি নামদেবের স্বর্ণমূর্ত্তি। দর্শকগণ মন্দির প্রবেশের সময় প্রথমে নামদেবকে প্রণাম করিয়া তবে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। প্রাঙ্গণের পাশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরগৃহ। ইহাতে দেবপরিবারগণ অর্থাৎ রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে গরুড় গৃহ। গরুড় পক্ষীরূপী নহেন, ইনি একটি মহারাষ্ট্রী বামন। স্থূল খর্ব্বকায়া চাপকানে আবরিত, মস্তকে বিশাল উষ্ণীষ, একটি চক্ষু রৌপ্যমণ্ডিত, সমস্ত লইয়া মূর্ত্তিটি কিম্ভূতকিমাকার।

দালানে বাজার বসিয়াছে, ফুলই অধিক বিক্রয় হইতেছে। দালান পার হইয়া সিঁড়ির সাহায্যে বিঠোবার মহলে উপস্থিত হইতে হয়। বিঠোবার প্রকাশ্য অধিষ্ঠানস্থলের বাম

পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্র কক্ষ,—ইহা তাঁহার শয়নমন্দির রূপে রক্ষিত। এ-গৃহে গৃহজোড়া রৌপ্য পালঙ্ক ; পালঙ্কের নীচে পানের বাটা, ভোগের বাসন, অঙ্গরাগাদির পাত্র সজ্জিত, —দেবতা প্রতি রাত্রে তাঁহার বৈঠকখানা হইতে এইখানে শয়নে আসেন এইরূপ জন প্রবাদ।—সন্ধ্যা-আরতির পর বৈঠকখানা হইতে শয়নকক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত মহামূল্য মসলন্দ শয্যা বিছাইয়া দেওয়া হয়।—

পাণ্ডারপুরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারি কোণে চারিটি ইষ্টকগৃহ ; গৃহমধ্যে বিঠোবাদেবের পদচিহ্ন। মেলার সময় বিঠোবার শিবিকা পাণ্ডারপুর প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এইখানে আনীত হয়।

একটি মন্দির ভীমানদীর জলের মধ্যে উঠিয়াছে, বর্ষাকালে নৌকা করিয়া এই মন্দিরে যাইতে হয়। এখন নদী শুষ্ক, ইহার ত্রিসীমায় জল নাই। আমরা পাথরের উপর দিয়া এই মন্দিরে যাইবার সময় পাণ্ডারা পাষাণের উপর স্থানে স্থানে কৃষ্ণের পদাঙ্কন দেখাইল—তিনি রাখাল লইয়া এইখানে গোচারণ করিতেন।

এই পদচিহ্ন দেখিতে পাইলে মাঘমেলায় দর্শকগণ কৃতার্থ বিবেচনা করে।—

মন্দিরে দেবদর্শন করাইয়া বড়ুয়ারা আমাদিগকে একটি গুপ্তকক্ষে আনয়ন করিল। সেখানে অতি সন্তর্পণে আর একটি বিঠোবা মূর্ত্তি ঘেরাটোব উম্মোচিত করিয়া আমাদিগকে দেখাইল। শুনিলাম যখন আরঞ্জীব বিঠোবা মন্দির ধ্বংস করিতে আসেন তখন প্রকৃত দেবকে লুকাইয়া তাহারা এই মূর্ত্তি সেখানে রক্ষা করে। আরঞ্জীব ছলিত হইয়া চলিয়া যান। সেই হইতে জয়কীর্ত্তি রূপে এ মূর্ত্তি যত্নে রক্ষিত—কখনো কখনো আমাদের মত লোকদিগের নিকট ইনি প্রকাশিতমাত্র।

ভারতী, মাঘ ১৩০৪

পুরী

আমাদের একটি চলিত কথা আছে, "পুন্‌কে শত্রু বড় ভয়ঙ্কর, বড় শত্রুকে পারা যায় —তবু তাকে পারা যায় না।"

আমার একজন ইংরাজ বন্ধু প্রায়ই বলেন—"আমি মশাকে যত ডরাই, বাঘকেও তত ডরাইনে।" এ কথাগুলির সার্থকতা এবার পুরী আসিয়া যেমন বুঝিয়াছি আগে তেমন বুঝি নাই। পুরীর সমুদ্র, শোভা, স্বাস্থ্য সকলই পুরীর বালির নিকট হার মানিয়াছে।

পুরী মরুরাজ্য ; আসমুদ্র কেবলই বালি বালি বালি,—আশে বালি, পাশে বালি, খাদ্যে বালি, বিছানায় বালি, রৌদ্রে বালি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—বৃষ্টিতে ইহার ক্ষয় নাই, আর্দ্রতার চিহ্নমাত্র নাই, ইহা অক্ষত অব্যয়! দিগন্তে সমুদ্ররাজ অনবরত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বালুতীর আক্রমণ করিতেছেন, আবার প্রতিহত হইয়া দূরে ফিরিয়া চলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত এই সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু বালির এককণা নাশ করিতে পারেন নাই—তীরে বালিরাশি যেমন তেমনই আছে।

পুরীর মাটী যেমন, কেবলই বালি—পুরীর সমুদ্র তেমনি কেবলই জল। আর যত সমুদ্র দেখিয়াছি,—তাহারা কত পাহাড় কত দ্বীপ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—কিন্তু পুরীর দিগন্ত-বিলোপী সমুদ্রে কোথাও একটি সামান্য প্রস্তরস্তূপ পর্য্যন্ত নাই। ইহা ঠিক বাঙ্গলারই সমুদ্র। সূর্য্য প্রাতঃকালে সমুদ্র হইতে উঠিয়া সন্ধ্যায় সমুদ্রেই লীন হইয়া পড়েন,—অন্য কোন বাধার অন্তরাল সূর্য্যের উদয়াস্ত মহিমাকে প্রচ্ছন্ন করে না।

কি সে চমৎকার শোভা! স্তর-বিন্যস্ত পুঞ্জীকৃত শতবর্ণ মেঘে—স্থূলাতিস্থূল হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোহিতবর্ণ আভাসমূহের তরঙ্গ তুলিয়া—সে তরঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত আকাশ পাতাল অপূর্ব্ব মহিমায় রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য নীলমধ্য হইতে আকাশে ওঠেন, নীল প্রদক্ষিণ করিয়া আবার নীলেই মগ্ন হইয়া পড়েন। জানি না পুরীর এই উদয়াস্ত শোভা কোন চিত্রকর তাঁহার চিত্রফলকে ফলাইতে পারিয়াছেন কিনা। তাহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সমুদ্রস্নান এখানকার একটি প্রধান আরাম। কিন্তু বলদ্বারা লইতে না জানিলে এ আরামটিকে সহজে আয়ত্ত করা যায় না। ছলে বলে কৌশলে তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া যদি আপনাকে ঠিক রাখিতে পারা যায়—তবেই সমুদ্রস্নান পরিতৃপ্তিকর, নহিলে কেবল আতঙ্কই সার।

এখানকার মৎস্যজীবি সমুদ্রনাবিকগণ 'নুড়িয়া' নামে অভিহিত। স্নানের সময় তাহাদিগের একজনকে সঙ্গে রাখিলে আর কোন ভয় ভাবনা থাকে না। এজন্য একজন নুড়িয়াকে দুই আনা করিয়া পারিশ্রমিক দিতে হয়। ইহাদের অনেকেই বেশ বাঙ্গলা বলিতে পারে।

ইংরাজেরা প্রায়ই তিনচার জনে সার বাঁধিয়া সার্কাসের ক্লাউনের বেশে—অর্থাৎ তিনকোণা বেতের টুপি ও ইজার বডি পরিয়া দুইদিকে দুইজন নুড়িয়াকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রে নামেন। দূর হইতে পাহাড়ের মত উচ্চ ঢেউগুলা নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—তীরে দণ্ডায়মান নূতন দর্শক আমরা ভীত হইয়া মনে করি এই বুঝি চুবাইয়া দিল এঁদের! আর বুঝি রক্ষা নাই! কিন্তু তরঙ্গ মাথার উপর আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা লাফাইয়া উঠেন, তরঙ্গ তাঁহাদের ডিঙ্গাইবে কি, তাঁহারাই তরঙ্গকে ডিঙ্গাইয়া দাঁড়ান। অনবরত এইরূপ যুঝাযুঝি ও লম্ফেঝম্পে তরঙ্গবল ব্যর্থ করিয়া তাঁহারা স্নান সমাপন করেন। আর ক্ষুদ্র মানবশক্তিকে পরাজিত করিতে না পারিয়াই যেন ক্ষুব্ধ মহা-সমুদ্র বল সঞ্চয় করিবার অভিপ্রায়ে উন্মত্ত উদ্দামভাবে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে কূল হইতে আবার অকূলে ফিরিয়া যান।

ভীম তরঙ্গের উপর ক্ষুদ্র মানুষের এত সহজ প্রভুত্ব দেখিয়া আমার মনে হইত, সংযমই সিদ্ধিলাভের প্রকৃত পথ। বাসনা তখনই সম্পূর্ণ সফল হয়, যখন বাসনাকে জয় করা যায়। সমুদ্রের জয় তখনই, যখন সে বাসনায় উন্মত্ত না হইয়া ধীর প্রশান্তভাবে তলদেশ হইতে জাহাজকে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড ঝড়েও রক্ষা আছে—তাহাতে আর রক্ষা নাই। নুড়িয়াদিগের কি মাংসপেশীবহুল দেহ! কি বলিষ্ঠ মূর্ত্তি! কি অসম সাহস! ভীষণ তরঙ্গকেও উপেক্ষা করিয়া ইহারা সময়ে অসময়ে ছোট ছোট তরণীগুলি অকূলে বাহিয়া চলে, ভয়ডর কাহাকে বলে যেন জানে না। দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রথমে আমি ভাবিয়াছিলাম, ইহারা উড়িয়া, এ দেশেরই লোক। ভীরু বলিয়া

উড়েদিগের একটা অপবাদ আছে—কিন্তু স্বচক্ষে দেখিতেছি ঠিক বিপরীত,—এই জেলেরা যেন মূর্ত্তিমন্ত সাহস,—স্বজাতির ভীরুতা কলঙ্ক পূর্ণমাত্রায় ইহারা ক্ষালন করিয়াছে! সমতল বাঙ্গলাদেশের মাটি কামড়াইয়া থাকিলে চলে, সমুদ্রের বেলা ত এ কথা বলা যায় না—সমুদ্র উড়িয়াদিগকেও এরূপ সাহসী করিয়া তুলিয়াছে, মনে মনে কত না আনন্দ উপভোগ করিতাম! হায়! সহসা একদিন আমার এতখানি আহ্লাদ এবং এমন মস্ত একটা দার্শনিক সিদ্ধান্ত আমূল ধূলিসাৎ হইল। শুনিলাম নুড়িয়ারা উড়িয়া নয়; (ন-উড়িয়া : নুড়িয়া)। ইহারা মান্দ্রাজি তৈলঙ্গী, এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তখন মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল! সমুদ্রতীরবাসী উড়িয়াও সমুদ্রগাহনকুশল নহে! ইহার জন্য অন্যের শরণাপন্ন! হায় হায়! এ মুলুকের সকলই আশ্চর্য্য! জগন্নাথজি ত আশ্চর্য্যের পরাকাষ্ঠা!

একজন সেদিন বলিতেছিলেন জগন্নাথ এ দেশের লাটসাহেব,—কথাটা সঙ্গত মনে হইল না। জগন্নাথজি হইতেছেন এ দেশের সম্রাট; আর লাটসাহেবের দল তাঁহার পাণ্ডাগণ। ইহারা সংখ্যায় বড় অল্প নহে,—মন্দিরদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথের খাস দরবার পর্য্যন্ত কত যে পাণ্ডা তাহার সংখ্যা নাই। ভগবানকে লাভ করিতে খৃষ্টানদিগের একমাত্র যিশুখৃষ্টকে প্রসন্ন করিতে হয়—এখানে এই অসংখ্য পাণ্ডার দলকে বশে আনিয়া তবে জগন্নাথের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে! বড় সহজ কথা নয়! তাই যাত্রার সময় মনে মনে বেশ একটু ভীত হইয়া সঙ্গের বশীকরণ থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া লইতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু মন্দিরে গিয়া বুঝিলাম ভয় জিনিষটা রবারের থলির মত ফুলাইলে খুব ফোলে বটে, কিন্তু থাবড়াইয়া দিলে একেবারেই চ্যাপ্টা হইয়া যায়। পঞ্চ তঙ্কাতেই খাস দরবারের পাণ্ডাগণ সন্তুষ্ট হইয়া গেল—আর দ্বারের, দালানের ও অন্যান্য নানাস্থলের সঙ্গধারী প্রহরী-পাণ্ডা প্রত্যেককে দুই চারি আনা দিয়াই ঠাণ্ডা করিলাম। অনেকে পাণ্ডাদিগের এই দৌরাত্ম্য অসহ্য মনে করেন—আমার কিন্তু তাহা মনে হইল না। মন্দির দর্শনে যে আনন্দলাভ হয়—তাহার কাছে এ লাঞ্ছনা, অর্থব্যয়—কিছুই নহে।.

মন্দিরের বর্ণনা আর কি করিব—চিরকাল ধরিয়া বর্ণনা করিয়াও কেহ ইহার পরিপূর্ণ বর্ণনা করিতে পারেন নাই।* কি প্রকাণ্ড মন্দির! অথচ বাহির হইতে মনেই হয় না—মন্দির তেমন বড়। ভিতরে প্রবেশ কর—বড় বড় দালানের পর দালান,—প্রত্যেক দালানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম। থামে থামে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, দেয়ালে দেয়ালে, চূড়ায়, দরজায়,—ভিতরে বাহিরে কেবলই ক্ষোদিত মূর্ত্তি। কোথাও প্রকাণ্ড, কোথায় ক্ষুদ্র,—কোনটি রাখিয়া কোনটি দেখিব বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। প্রাচীরমধ্যে ছোট বড় ১২০টি মন্দির আছে, বলা বাহুল্য, সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দিরটি জগন্নাথের। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি তোরণ! পূর্ব্ব তোরণটি সিংহদ্বার, এখানে দুইটি সিংহ বিরাজিত,—দক্ষিণ তোরণ অশ্বদ্বার অশ্বমূর্ত্তি-যুক্ত, উত্তরে হস্তী মূর্ত্তি—তাই ইহার নাম হস্তীদ্বার, পশ্চিম তোরণ রক্ষকমূর্ত্তিশূন্য, ইহার নাম খাঞ্জাদ্বার। শুনিলাম মন্দিরচূড়ার গম্বুজ সমগ্র একখানি পাথর কাটিয়া প্রস্তুত। গম্বুজের চারিধারের চারিখানা বড় পাথরও নাকি জোড়হীন আস্ত পাথর।

* ১৩১৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীর নীলভূধর নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এখানে লোকপ্রবাদ এই যে, জগন্নাথজির মন্দির একটা বড় পাহাড়কাটা মন্দির!—অসম্ভব নহে, কিন্তু কি করিয়া তাহা হইল? পুরীর ত্রিসীমায় ত একটি ছোট পাহাড়ও দেখা যায় না। বোম্বাই প্রদেশে অনেক বড় বড় মন্দির দেখিয়াছি—মহাভারত কথিত বহু পুরাতন প্রসিদ্ধ গোকর্ণ মন্দির দেখিয়া কত না বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এমন কারুকার্য্য, এমন বিস্ময়জনক কীর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই। ভুবনেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য্য নাকি আরও উৎকৃষ্ট। ইচ্ছা আছে একবার দেখিয়া আসিব, জানি না অদৃষ্টে সে পুণ্যলাভ ঘটিবে কি না!

শোনা যায়, জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী অরুণস্তম্ভ কণারকের সূর্য্যমন্দির হইতে তুলিয়া আনিয়া এখানে প্রোথিত করা হইয়াছে। জগন্নাথজির ভোগ মণ্ডপের দরজার উপরে যে নবগ্রহ মূর্ত্তি আছে তাহাও নাকি, কণারকের সূর্য্যমন্দিরের অংশ বিশেষ।

আমরা এই বিশ্বসৃষ্টিতে দেখিতেছি—সৃষ্টিকে বড় করিয়া গড়িয়া স্রষ্টা নিজে তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখানেও মন্দিরের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিগুলি আপনাদের গঠন সৌন্দর্য্যের আড়ম্বরে জগন্নাথদেবকে একরূপ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তিতে একেবারেই শিল্প-সৌন্দর্য্যের অভাব। বস্তুতঃ এ মূর্ত্তি নিরাকার-ব্যঞ্জক ;—তাই ভক্ত এই মূর্ত্তিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দেখিয়া থাকেন। চৈতন্য এইরূপ দেখিয়াই পাগল হইয়াছিলেন। এখানকার একজন পাণ্ডা বলিল, জগন্নাথ বুদ্ধদেবের অবতার—তিনি নিরাকার। বুদ্ধদেব এবং নিরাকার ভগবানকে তাহারা এক করিয়া তুলিয়াছে। জগন্নাথদেবের পীঠস্থান ঘোর অন্ধকার,—এই অন্ধকারমধ্যে রত্নসিংহাসনে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিমূর্ত্তি একত্র বিরাজিত।

এমনই অভিভূত হইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলাম, যে তাঁহার প্রকোষ্ঠসম্মুখের অন্ধকার দালানে মেজের উপর যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা দেখি নাই। আর একটু হইলে তাহার উপর গিয়া পড়িয়াছিলাম আর কি। কে একজন আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। এই পুণ্য মৃত্যু হইতে বাধা দিয়া সে কি পুণ্য লাভ করিল!

শ্রীক্ষেত্রের অন্নছত্রের দৃশ্য দেখিলে হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। হিন্দুর আচারপ্লাবিত দেশে বুদ্ধদেবের উদার ধর্ম্ম-মহিমা আজিও এই অনুষ্ঠানে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের মহিমা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হয়। কোন্ ধর্ম্ম এমন প্রচার লাভ করিয়াছে! কোথায় না ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজিত! অধুনা সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের লুপ্ত কীর্ত্তির আবিষ্কার হইতেছে।

চৈতন্যদেব বহু প্রয়াসেও জাতিভেদ উঠাইতে পারেন নাই। এমন কি ভক্ত মুসলমানকে জগন্নাথ মন্দিরে লইয়া যাইবার প্রয়াসও তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছিল। এই খেদে তিনি মন্দিরচূড়ায় জগন্নাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন,—জাতিবর্ণ নির্ব্বিভেদে সকলেরই নিকট এই মূর্ত্তি প্রকাশিত। এইরূপ জাতিবর্ণপ্রভাবসমাচ্ছন্ন ভারতে শ্রীক্ষেত্রের অন্নছত্র বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মহাকীর্ত্তি।

জগন্নাথ মন্দির ছাড়া পুরীতে দেখিবার স্থান আরও অনেক আছে, গুণ্ডোবাড়ী, আঠারনালা, চন্দন সরোবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুণ্ডোবাড়ী জগন্নাথদেবের গ্রীষ্মাবাস-মন্দির। রথযাত্রাকালে এইখানে ত্রিমূর্ত্তির অধিষ্ঠান হয়।

আঠারনালা একটি সেতুর নাম। এ সেতু বিনা-খিলানে নির্ম্মিত। আঠারটি নালার প্রত্যেকটির স্তম্ভচূড়ায় তির্য্যকভাবে সজ্জিত পাথরের সারির উপর এই সেতু স্থাপিত।

চন্দন সরোবরের জল অতিশয় নির্ম্মল। ইহার বক্ষে একটি কৃত্রিম দ্বীপ এবং চারিদিকেই বাঁধা ঘাট। ঘাটের প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়িগুলি জলের মধ্যে ঝকঝক করিতেছে —দেখিতে বড় সুন্দর।

ভারতী, আশ্বিন ১৩২০

কবি, নাস্তিকতা ও সেলি

কবি কে? ছন্দোবন্ধে যিনি পুস্তক লিখিতে পারেন তিনিই কবি নহেন; যিনি যত ভাবুক তিনিই তত কবি। প্রকৃত ভাবুক হইতে গেলে একটি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি থাকা চাই, যাহা দ্বারা তিনি জগৎ সংসারের অন্তর-নিহিত ভাবটি গ্রহণ করিতে পারেন।

আমরা একটি ফুল দেখিলাম, তাহার গন্ধে প্রাণখানি মুহূর্ত্তের জন্য উল্লাসিত হইয়া উঠিল, তার পর সে কথা ভুলিয়া গেলাম, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ফুলের সঙ্গে কবির চিরন্তন সম্পর্ক জন্মিল, তাহার মধ্যে কবি আজীবন আত্মহারা হইলেন, সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি বিশ্বের জীবন্ত অমর আত্মাখানি প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই সৌরভের মধ্যে এক অনন্ত জীবনের অনন্ত প্রেম-কাহিনী শুনিতে পাইলেন।

আমরা, একজনের প্রেমে, মিলনে, বিরহে-বিষাদে, নিজের ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়া তাহার হৃদয়ের কতকটা সুখ দুঃখ অনুভব করিলাম, কিন্তু কবি বিশ্বের হৃদয় দিয়া সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির রহস্য ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সুতরাং তাহার সুখ দুঃখ কবি যতদূর আয়ত্ত করিলেন, আমরা তাহা পারিলাম না। কবির নিকট ক্ষুদ্র মহান হইয়া উঠিল, এ জগৎ যে জগৎ-ছাড়া সম্পর্কে আবদ্ধ, একটি ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষুদ্রতম জীবন কাহিনী হইতে কবি তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। এইরূপে কবির দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে মিথ্যার মধ্যে যাহা সত্য, জড়ের মধ্যে যাহা প্রাণ, শরীরের মধ্যে যাহা আত্মা, স্থূলের মধ্যে যাহা সূক্ষ্ম, জগতের মধ্যে যাহা জগদতীত, অসম্বন্ধতা, অশোভনতা, বৈষম্যের মধ্যে যাহা সুন্দর, সুশোভন, সাম্য, তাহা প্রকাশিত হয়।

কবি তাঁহার সেই স্বতোলব্ধ সত্য, কল্পনায় সাজাইয়া, ভাষায় ফুটাইয়া লোককে সজ্ঞান করিতে প্রয়াস করেন। যে বুঝিল সে বুঝিল, যে বুঝিল না, সে'ও তাঁহার কল্পনা ক্ষমতায়, তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত প্রসারতায় আশ্চর্য্য মুগ্ধ হইয়া গেল।

বিজ্ঞান বলিতে আজকাল জড় বিজ্ঞানই বুঝায়; যতটুকু সত্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের আয়ত্ত এ বিজ্ঞানের তাহা লইয়াই কারবার। কিন্তু যিনি যত উচ্চ কবি তিনি তত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, কেন না ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য সত্য তিনি তত অধিক আয়ত্ত করিতে পারেন। আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানশাস্ত্রকারগণ উচ্চ কবি বলিয়াই প্রকৃত জ্ঞানধর্ম্মের মূলে পৌঁছিয়াছিলেন।

সুতরাং কবি কখনো প্রকৃত অর্থে নাস্তিক হইতে পারেন না। জর্জ এলিয়ট বলিতে পারিয়াছিলেন, আমি অণু পরমাণু লইয়াই সন্তুষ্ট আছি, কিন্তু কবি টেনিসন তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

অণু হইতে অণুর অন্তরে প্রবেশ করাই কবির আকাঙ্ক্ষা, অন্ত হইতে অনন্তে মিলন লাভ করাই কবির বাসনা। সুতরাং সংসারের ক্ষুদ্র সুখ ঐশ্বর্য্য লইয়াই কবি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, কবির হৃদয় অণুর অণু, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা অনুসন্ধান করিতেই

ব্যস্ত, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি তাঁহাকে উচ্চ জ্ঞানের উচ্চানন্দের যে সমুদ্র দেখাইয়াছে, তিনি অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহার মধ্যে ডুবিতে, তলাইয়া যাইতে ব্যগ্র। ইংরাজ কবি সেলিকে গোঁড়া খৃষ্ট সমাজ নাস্তিকতা অপবাদে দূষিত করেন, কিন্তু সেলির ঈশ্বরভাব খৃষ্টানদিগের হইতে কতদূর উচ্চ তাহা না বুঝিয়াই তাঁহারা এরূপ বলেন। সেলির সংসারে কতখানি অতৃপ্তি, উচ্চ প্রেম, জ্ঞানলাভ করিতে তিনি কত দূর লালায়িত, তাহা তাঁহার 'আলেষ্টরে' তিনি দেখাইয়াছেন।

সেলি যে ঈশ্বর ধারণা করিতে পারেন না, তাহা খৃষ্টানদের প্রতিহিংসা-পরতন্ত্র, মনুষ্য গুণাগুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বর, তাঁহার ঈশ্বর অদ্বৈতবাদী হিন্দুর পরব্রহ্ম, তাহা নির্গুণ অথচ অন্ধ শক্তিমাত্র নহে। তাহা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, সর্ব্বভূত পরিচালক অনন্ত জ্ঞানশক্তির আধার পরমাত্মা। সেলির একটিমাত্র কাব্য 'কুইন ম্যাব' হইতে আমরা দেখাইব সেলির ঈশ্বর অদ্বৈতবাদী হিন্দুর ঈশ্বর কি না।

কুইন ম্যাব স্বপ্নের অধিষ্ঠাত্রী পরী রাণী নিদ্রাভিভূতা, পবিত্রপ্রাণা, শুদ্ধাত্মা-মানবী ইয়ানথির নিকটে গিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, বলিলেন, "জগতের যিনি মহানাত্মা, (The world's supremest Spirit) পুরস্কারের যোগ্য পাত্র তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এক মহৎ বর প্রদান করিতেছেন। প্রধান প্রধান জ্ঞানী কবিরাও যে সকল সত্য পরিষ্কার রূপে দেখিতে পান না, তুমি তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইবে।"

পুরস্কারের যোগ্যপাত্র কিসে?—না—

"লোকাচার, অন্ধ বিশ্বাস, ক্ষমতাকে তুমি তাচ্ছিল্য কর, ভয় বিদ্বেষ ঘৃণা হইতে তোমার হৃদয় স্বাধীন, দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র তুমি, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন প্রেমাতপ বিহীন মানবপ্রকৃতির পক্ষে পথ প্রদর্শক জীবন্ত আলোক স্বরূপ, তোমাকে দর্শন করিয়া মানব-সংসারের আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিবে—"

"অতএব, হে মহতি আত্মা, এস, প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে মন্দিরে দেবাসুরগণ একত্রে উপাসনায় নতজানু, সেখানকার হোমাগ্নি শিখা স্পর্শ কর, যে মন্দিরে কালরূপ-অনন্ত-সর্প মোহনিদ্রায় চিরকাল শয়ান আছে, তোমার দ্বারাই তাহার দ্বার উন্মুক্ত হউক। তোমার স্বরে, দৃষ্টিতে, দেহে, যেখানে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়কে আমি আহ্বান করিতেছি, হে আত্মা, তুমি পৃথিবীর ধূলিখেলা পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত চলিয়া এস।"

যদি আর অধিক দূর না যাওয়া যায়—তবে কেবল এই কয়েক ছত্র হইতেই সেলির ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

অন্ধ বিশ্বাস ও মিথ্যা ধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার বিশেষ ঘৃণা ছিল, জগতের মূল আত্মা ও ন্যায়ধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, দিব্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে যে তিনি লালায়িত ছিলেন, এই কয় ছত্রেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু আমরা এইখানেই থামিব না, আরো কিছুদূর যাইব।

"অশরীরী পবিত্রতায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া ইয়ানথির আত্মা সহসা উত্থিত হইল, পার্থিব ভাবের বিন্দুমাত্র কলঙ্কশূন্য হইয়া, স্বাভাবিক আত্ম-মহিমাময়ী রূপে মরজগতে অমররূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

"শরীর নিদ্রাভিভূত হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল, ইহার প্রত্যেক অবয়ব এখন অর্থশূন্য নির্জীব, তবু জীবন ইহাতে সঞ্চরণ করিতেছিল, প্রত্যেক যন্ত্র আপন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। শরীর ও আত্মার একত্র দর্শনলাভ কি চমৎকার ব্যাপার!

"উভয়ে সেই একই ব্যক্তি, উভয়ে সেই একজনেরি চিহ্ন বিদ্যমান, তবু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একটি স্বর্গের দিকে উন্মুখ, তাহার পৈতৃক সম্পত্তি অসীমতা লাভের জন্য লালায়িত, এবং চির পরিবর্ত্তমান, চির উন্নতিশীল অবস্থায় অনন্ত জীবরূপে বিচরণকারী"—

(One aspires to heaven, pants for its sempiternal heritage. And ever changings ever rising still. Wantons in endless being.)

আর একটি অল্পক্ষণের নিমিত্ত অবস্থা ও প্রবৃত্তির খেলার সামগ্রী হইয়া দ্রুতগতি আপনার দুঃখময় কাল পূর্ণ করিয়া সহসা অনাবশ্যকীয় ভাঙ্গাচোরা যন্ত্রের মত পড়িয়া পচিয়া, অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত।"

পাঠক দেখুন, সেলি আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমাদের হিন্দু শাস্ত্রকারগণের সহিত তাহার কিরূপ মিল!

মায়া রথ চলিল, পরীর সহিত আত্মা তাহার মেঘময় মায়াপ্রাসাদে উপনীত হইলেন, তখন পরী আত্মাকে সেই প্রাসাদ দেখাইয়া বলিলেন—

"ইহা কি বিচিত্র! মনুষ্যের উৎকৃষ্টতম প্রাসাদও ইহার নিকট উপহাসযোগ্য। কিন্তু স্বর্গীয় প্রাসাদে আবদ্ধ থাকিয়া, নিজের সুখ ভোগে রত থাকাই যদি পুণ্যের একমাত্র পুরস্কার হইত, তাহা হইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। অন্যকে সুখী করিতে শিক্ষা কর। হে আত্মা, এস, ইহাই তোমার যোগ্য পুরস্কার, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তোমার নিকট উন্মুক্ত করি।"

খৃষ্টানদিগের ন্যায় সেলির নিকট সুখভোগই পুণ্যের পুরস্কার নহে, পুণ্যলাভের উদ্দেশ্য নহে, আবার হিন্দুর সেই নিষ্কাম পরোপকার তিনি এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

নিম্নস্থিত পৃথিবী-বিন্দুকে দেখাইয়া পরী তখন আত্মার নিকট পৃথিবীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাহিনী বলিতে লাগিলেন। সেই কাহিনী সেলি নিজের হৃদয় গলাইয়া তাহা দিয়া যেন লিখিয়াছেন। এখন ধর্ম্মের নামে কিরূপ অধর্ম্মে, ন্যায়ের নামে কিরূপ অন্যায় অত্যাচারে পৃথিবী পীড়িত তাহা বলিতে বলিতে সেলির বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। অথচ তাহাতে নিরাশার ভাব কিছুমাত্র নাই, ভবিষ্যতে যে এই মঙ্গলময় রাজ্যে সমস্ত মঙ্গল হইয়া দাঁড়াইবে এ সম্বন্ধে তিনি স্থির চিত্ত, মনুষ্য মাত্রেতেই সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ আত্মার প্রসাদ ব্যাপ্ত, কালে ইহা হইতে মনুষ্য পূর্ণতা লাভ করিবে, তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ও পবিত্রতা ও ধর্ম্মের প্রতি একটি অটল অনুরাগ এই কাহিনীতে দেদীপ্যমান।

বর্ত্তমানের কথা বলিতে বলিতে পরী একস্থানে বলিতেছেন—"ঐ পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ, ক্ষেত্র সুবর্ণ শষ্য উৎপন্ন করিতেছে, ফল ফুল বৃক্ষ ক্রমান্বয়ে জন্মগ্রহণ করিতেছে,

সকলেই সুখশান্তি প্রেমের কথা গান করিতেছে। প্রকৃতির নীরব সুস্পষ্ট জ্বলন্ত ভাষায় বিশ্বসংসার ঘোষণা করিতেছে, যে আর সকলেই প্রেম ও আনন্দের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে কেবল অভাগা মানুষই তাহা করিতেছে না। সে নিজে যে অসি নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাতে নিজের শান্তি হনন করিতেছে, যে সর্প তাহার হৃদয় শোণিত পান করিতেছে তাহাকেই সে পোষণ করিতেছে, তাহার দুঃখেই যাহার আনন্দ, তাহার কষ্ট লইয়াই যাহার খেলা, এমন অত্যাচারীকেই সে বড় করিয়া তুলিতেছে।

"কিন্তু ঐ যে সূর্য্য তাহা কি কেবল ক্ষমতাশালীদেরই আলোক বিতরণ করে? ঐ যে রজতকিরণ তাহা কি রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা কুটীরশয্যায় কম সুখে নিদ্রা যায়? পৃথিবীর যে সকল অসংখ্য সন্তানেরা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার অবিভক্ত দান উপার্জ্জন করে, পৃথিবী কি সেই সন্তানদিগের বিমাতা, আর ঐ যে পুতুল শিশুগণ—যাহারা আরাম বিলাসে লালিত পালিত হইয়া মানুষদিগকে আপনাদের শৈশবের খেলার জিনিস করে, এবং মানুষেই মাত্র যে শান্তির মর্য্যাদা বোঝে, শিশুত্বের আত্মম্ভরিতায় স্ফীত হইয়া সেই শান্তি নষ্ট করে—পৃথিবী কি উহাদেরি আপনার মা?"

"হে প্রকৃতির আত্মা (Spirit of Nature) তাহা নহে, তোমার পবিত্র অংশ প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে সমানরূপ সঞ্চরণ করিতেছে, তোমার অসীম ক্ষমতা-সিংহাসন তুমি ঐখানেই স্থাপন করিয়াছ। তুমিই সেই বিচারক, যাহার ন্যায়দণ্ডের শাসনে মনুষ্যের ক্ষণস্থায়ী চপল প্রভুত্ব মৃদুল বাতাসের মত ক্ষমতাহীন। মানুষের তুলনায় যেমন ঈশ্বর (এখানে ঈশ্বর অর্থে খৃষ্টান ঈশ্বর—তাহা পাঠক ভুলিবেন না) তোমার ন্যায়ের তুলনায় মানুষের ন্যায় তেমনি ধূলিখেলা মাত্র।

"হে প্রকৃতির আত্মা, তুমিই এই অনন্ত জগৎ-সংসারের জীবন, ঐ যে বিশাল গ্রহতারানক্ষত্র, স্বর্গের গভীর স্তব্ধতার মধ্যে যাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় কক্ষ বিরাজমান, তুমি তাহাদিগেরও আত্মা, আবার ঐ যে ক্ষুদ্রতম জীব—যাহা এক বিন্দু—এপ্রিল-সূর্য্য-কিরণেমাত্র বাস করে—তাহারও তুমি আত্মা। ঐ সকল পদার্থদিগের ন্যায় মনুষ্যও অজ্ঞানভাবে তোমার উদ্দেশ্য সাধন করে, উহাদিগের ন্যায় মানুষেরও চির শান্তির যুগ দ্রুতগতিতে নিশ্চয় আসিতেছে।"

"প্রকৃতির যে আত্মা এই বিশ্বকে এত রমণীয় করিয়াছেন, ধরাকে প্রচুর শষ্যশালিনী করিয়াছেন, এবং জীবনের ক্ষুদ্রতম তারতন্ত্রটিকেও অপরিবর্ত্তনীয় এক তানে বাঁধিয়াছেন, যিনি সুখীপক্ষীদিগের বাসের নিমিত্ত কুঞ্জবন দিয়াছেন—অগাধ সমুদ্রতলবাসী জীবদিগকে চির শান্তিময় বাসস্থান দিয়াছেন এবং হেয়তম যে পতঙ্গটি ধূলির উপর বিচরণ করে—তাহাকেও আত্মা চিন্তা প্রেম দিয়াছেন—তিনি কি কেবল মানুষকেই অসুখী করিয়াছেন? তাহার আত্মাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং ধূমকেতুরূপ সুখকে দূরে রাখিয়াছেন, যাহা মনুষ্যের আলিঙ্গন তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার মাথার উপর হইতে পদনিম্নের গভীর অগাধ গহ্বর দেখাইয়া দিতেছে?

"হে প্রকৃতি, না। রাজা পুরোহিত আর রাজপুরুষ এই তিন শ্রেণীর লোকে মানবপুষ্পকে মুকুলে বিনষ্ট করিয়াছে, তাহারা সমাজে খল কপটতা প্রবিষ্ট করাইয়াছে,

মিথ্যাকে সত্য করিয়া সাজাইয়াছে, মানুষে মানুষে বিবাদ বাধাইয়া দিয়াছে এবং এইরূপে প্রকৃতির সদুদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে।"

কিন্তু ঐ সকল অত্যাচারী পাপীও সেলির নিকট হেয় নহে, তিনি বলিতেছেন—

"তথাপি প্রত্যেক অন্তঃকরণেই পূর্ণ সততার বীজ আছে। ধার্ম্মিক পুরুষের তুলনায় মহান জ্ঞানী ব্যক্তিও ক্ষুদ্র বালকের ন্যায়। ধার্ম্মিক পুরুষের বুদ্ধি পরিষ্কার, প্রবৃত্তি পবিত্র এবং উদ্দেশ্য উচ্চ। যে সকল ব্যক্তিরা সহরের নানাপ্রকার কুকার্য্যে জীবন কাটায় তাহারা ঐ ধার্ম্মিক পুরুষকে অনুকরণ করিয়া তাঁহার সমান হইতে পারে।"

আর ভবিষ্যতে যে সমান হইবে—তাহাই তাঁহার স্থির বিশ্বাস।

"এই বিচিত্র জগতে আত্মাই একমাত্র চিরস্থায়ী বস্তু।...জড়বস্তুই মঙ্গল অমঙ্গল, সত্য মিথ্যা, ইচ্ছা চিন্তা কার্য্য, সুখদুঃখ, সহানুভূতি, বিদ্বেষ এই সমুদায়ের আকর। সূর্য্যকিরণ যেরূপ পবিত্র, পৃথিবীর বায়ু হইতে অপবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, আত্মাও সেইরূপ পবিত্র, শরীরের সংস্পর্শে অপবিত্র হয়।"

"মানুষ, আত্মা ও দেহ এই দুয়ে গঠিত, উচ্চ-উদ্দেশ্য সাধন করিতে ইহাদের আবির্ভাব। এখন যে নীচ, দুঃখতাপপূর্ণ পাশবভাবাপন্ন মানুষ দেখা যায় তাহা পাপের ফল। পরে যে মানুষ হইবে, মহৎ মহৎ কার্য্য করিবে, সুখে কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিবে, চিরশান্তি লাভ করিবে, এবং দেহ ও আত্মা এতদুভয়ের সামঞ্জস্যজাত আনন্দসমূহ আস্বাদন করিবে।" তবে আর কি—

হে আত্মা "নিশ্চিন্ত থাক, তোমার সন্দেহ তাড়াইয়া দেও, পাপতাপ মিথ্যাভ্রান্তি ঐ পৃথিবীতে আছে সত্য, কিন্তু এ অনন্ত জগতে মন্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্দ নিবারণের ঔষধও রহিয়াছে। ঘোর পাপ কলুষিত দিনেও ধার্ম্মিক লোক আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের পবিত্র মুখনির্গত অমর সত্য মিথ্যারূপ বৃশ্চিককে চিরস্থায়ী অগ্নিমালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিবে—উহা আপনাকে আপনি দংশন করিয়া তন্মধ্যে মৃত হইবে।"

এ ঠিক হিন্দুর অবতার বিশ্বাস। সেলি খৃষ্টান হইয়া জন্মিয়া জ্ঞানী হিন্দুর চক্ষে জগৎ দেখিয়াছেন, খৃষ্টান তাঁহাকে বুঝিবে কি করিয়া? তিনি মানবাত্মাকে সম্বোধন করিয়া জগৎব্যাপী আত্মার স্তব করিয়াছেন, খৃষ্টান তাঁহাকে নাস্তিক ভাবিয়াছেন।

একস্থানে পরী ইয়ানথিকে বলিতেছেন—"ঈশ্বর নাই।...অন্তরে অসীমতা বাহিরে অসীমতা, সৃষ্টিকর্ত্তা মিথ্যা করিয়া দিতেছে। প্রকৃতি যে অনন্ত আত্মাতে ওতপ্রোত আছে, তাহাই প্রকৃতির একমাত্র ঈশ্বর" (Infinity within, infinity without, belie creation : The exterminable spirit it contains is nature's only God.)

কিন্তু এ ঈশ্বর খৃষ্টান ঈশ্বর—তিনি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া কথিত, কবি বলিতেছেন, সমস্ত জগৎসংসার সেরূপ সৃষ্টি অপ্রমাণ করিতেছে। পরেও তিনি খৃষ্টান ঈশ্বরকে, তাঁহার প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে অতিমাত্রায় আক্রমণ করিয়াছেন, আমরা বাহুল্যভয়ে আর তাহা এখানে উঠাইলাম না। উঠাইবার আবশ্যকও নাই। সেলি খৃষ্টান ঈশ্বর না মানুন, তিনি যে নাস্তিক ছিলেন না, জগতের অন্তরভূত ঐশীশক্তিতে তাঁহার যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, পাঠক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের

উপসংহারকালে তিনি মানবাত্মাকে যাহা বলিয়াছেন—আমরা পাঠককে তাহার অত্যল্প সংক্ষেপে উপহার দিয়া এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করি।

"মানবাত্মা, সাহসে ভর করিয়া চলিতে থাক, ধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া পরিবর্ত্তনশীল ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হও। জন্ম জীবন মৃত্যু এবং মৃত্যুর সেই পরবর্ত্তী অবস্থা, যখনো উলঙ্গ আত্মা তাহার বাসস্থান পায় নাই, সকলি পূর্ণ সুখের পথে অগ্রসর হইতেছে এবং জীবদিগের শ্রান্তিহীন চক্রকে সেইদিকে চালাইতেছে, যাহা অনন্তজীবনের আশায় লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র। জন্ম কেবল আত্মাকে বাহ্য জগতের সম্পর্কে জাগ্রত করে, জগৎ নূতন প্রকার প্রবৃত্তিতে আত্মাকে বন্ধন করে। জীবন আত্মার কার্য্যক্ষেত্র, এবং ঘটনা সমষ্টির ভাণ্ডারগৃহ, যাহা দ্বারা অনন্ত জগৎ ভিন্ন ভিন্ন সাজে প্রতিভাত হইতেছে। মৃত্যু একটি ভীষণ অন্ধকারময় দ্বার, যাহা দ্বারা অনন্ত সুখ আশার রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। অতএব হে আত্মা, নির্ভয়ে চলিতে থাক, যদিও ঝটিকায় তৃণফুলের (প্রিমরোজের) বৃন্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, যদিও তুষারে ইহার লাবণ্য ম্লান হইয়া পড়িতেছে, তবুও বসন্তের নিশ্বাস আবার পৃথিবীর প্রেমের ফুলগুলি ফুটাইয়া তুলিবে, তাহার উজ্জ্বল হাসিতে শ্যামল বনপ্রান্তর আবার উজ্জ্বল হইবে, শৈবালময় তীর ও অন্ধকার উপত্যকা সুশোভিত হইয়া উঠিবে।"

ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

অরবিন্দ ঘোষ

এতদিন পরে গত ৬ই মে তারিখে আলিপুরে বোমার মকদ্দমা শেষ হইল। ৩৬ জন বিচারাধীনের মধ্যে ১৭ জনকে মুক্তিদান করিয়া বিচারপতি ব্রিচক্রফট দেশের আবালবৃদ্ধ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। অনেক বালককেই যে পুলিশ এই মকদ্দমায় বৃথা জড়িত করিয়াছে ;—বিশেষতঃ, অরবিন্দ যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, এই বিশ্বাসে এতদিন দেশের সকলেই ভগবানকে আকুলভাবে ডাকিয়া, এই বিচার নিষ্পত্তির দিকে উদগ্রীবভাবে চাহিয়া ছিলেন। এই আকুল প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, আজ আমাদের আনন্দের দিন! বিধাতা অরবিন্দকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন। তিনি যাহাকে ভালবাসেন, তাহাকে কষ্ট দিয়া নিজের কাছেই টানিয়া লন। অরবিন্দের বিদ্যাবুদ্ধি অপরিসীম ; তিনি ইচ্ছা করিলে, সুখে স্বচ্ছন্দে মহাসম্মানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। সকলেই জানেন, তিনি সিভিল সার্ভিশে পাশ হইয়াছিলেন, কেবল অশ্বপরিচালনে ফেল হওয়াতে সে কর্ম্মলাভ করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গভর্ণমেন্ট ইঁহাকে অন্য উচ্চপদ দান করিতে চাহেন। অরবিন্দ তাহা গ্রহণ না করিয়া প্রথমে বরদারাজ-কর্ম্মচারী হইয়া, পরে দেশের কাজে পূর্ণভাবে জীবনদান বাসনায় সে কর্ম্মও ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে শত কষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মাতৃপূজায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ তাঁহার শিক্ষা কেবল বঙ্গদেশের মধ্যে নহে—ভারতবর্ষে নবধর্ম্ম, নবযুগ, নবজীবন সঞ্চার

করিয়াছে। —তাঁহার জীবন ভারতে অতুলকীর্ত্তি। মাতৃভূমি ইঁহার নিকট জড়পদার্থ নহে, আত্মাবন্ত পদার্থ। তিনি তাঁহার পত্নীকে একখানি পত্রে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। স্থানাভাবে আমরা তাহার কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"অন্যালোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, অতগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়িয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার আছে, শারীরিক বল নাই, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ ও অচল হইয়াছিল।"

তাঁহার মুক্তির পরদিন কলিকাতার ছাত্রগণ অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহমনের অবসন্নতাবশতঃ তিনি দ্বিতলের বারাণ্ডা হইতে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহার বিপদ ও দুর্গতির দিনে তাঁহার স্বদেশবাসীর স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে যে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত হন নাই, ইহাই তিনি পরম সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করেন এবং ইহাতেই তিনি সকল কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিয়াছেন।" আমরাও তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ইঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে হৃদয় আনন্দপূর্ণ হয়। এক বৎসর ধরিয়া জেলে কত না কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তজ্জনিত দেহ ক্লান্ত মন অবসন্ন, তথাপি মুখে প্রফুল্লভাব—অধরে বালকের ন্যায় সরল হাস্য বিরাজিত দেখিলাম। —বিচারে যাঁহারা দণ্ডনীয় হইয়াছেন, হাইকোর্টে তাঁহাদের আপিল হইতেছে। আশা করি জষ্টিস মহোদয় এই অর্ব্বাচীন বালকদিগের প্রতি দয়াধর্ম্ম প্রকাশে প্রকৃত ন্যায়নীতিরই প্রতিষ্ঠা করিবেন।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী

মৃত্যু প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ ঘটায় কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে কি? বরঞ্চ করাল কাল যখন আমাদের ভালবাসার সামগ্রীকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দর্শন স্পর্শনের অতীত করিয়া তোলে, তখন চর্ম্মচক্ষের অনায়ত্ত সেই প্রিয় রূপ আমাদের মর্ম্মদৃষ্টিতে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে। বাহিরে হারাইয়া অন্তরে তখন আমরা পূর্ণ মিলন অনুভব করি।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত আমার মিলন পাতানো ছিল। মানুষে মানুষে মনের

মিলন এখন কদাচিৎ ঘটে। যে সুন্দর মনোমোহন রূপে তিনি আমাকে ধরা দিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণও সকলে তাঁহাকে সে রূপে দেখিয়াছেন কিনা জানি না। কারণ সমাজের বাহিরে মুক্ত সখ্যতার নির্ম্মল আলোকে আমি দেখিয়াছি, কবি হৃদয়ের খোলসহীন যে সৌন্দর্য্যটুকু,—সমাজের বেড়া সংস্কারের বেড়া, স্বার্থ সংঘর্ষণের বেড়ার ভিতর দিয়া নিকটের লোকের নয়নে তাহা সহসা না পড়িবারই কথা। আটে ঘাটে বাঁধা সেকালের সংস্কারে লালিত-পালিত হইয়াও স্বাধীন বিচারশক্তির অভাব তাঁহাতে দেখি নাই; তাঁহার চিন্তার পরিসর ছিল প্রকৃতই মুক্ত, উদার। বলিতে কি, সংকীর্ণতার ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে কোনোদিনই আমাদের মতবিচ্ছেদ ঘটে নাই। তাই বুঝি আমাদের সখ্যতা সম্বন্ধ এমন মধুর, এমন স্থায়ী হইয়াছিল। মিলন-দিনে আমরা কি আনন্দই না উপভোগ করিতাম। দেখা হইলেই নীরব উল্লাসিত দৃষ্টিতে উভয়ের প্রাণ যেন কোলাকুলি করিয়া উঠিত। তাহার পর তাঁহার পালায় তিনি আমার হাত ধরিয়া সাগ্রহ-সমাদরে পালঙ্ক একখানির উপর বসাইতেন, আর আমার পালাতে আমিও সেইরূপ সাদর যত্নে তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আমার ঘরের শ্রেষ্ঠ শোফাসনের উপর তাঁহার শুভ প্রতিষ্ঠা করিতাম। অতঃপর মুখোমুখি হইয়া বসিবামাত্র দুজনের অদর্শন কালের মনের চাপা উৎস খুলিয়া যাইত। কত না রঙ্গরস রহস্যে, কত না গোপন মনের কথায়, প্রকাশ্য সুখ দুঃখ কাহিনীতে, সমাজ এবং কাব্য সমালোচনায় দিবসের আলো ক্রমশ যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘনীভূত হইয়া পড়িত তখনো কিন্তু আমাদের কথা ফুরাইত না; বিদায় লইতে মন চাহিত না।

আজ আমার প্রিয়সখী গিরীন্দ্রমোহিনী এ লোকে নাই, আমাদের সে সুখ মিলনের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন শুধু তাঁহার প্রীতি-মধুর স্মৃতি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপের ন্যায় দর্শন আশারহিত আমার চিত্তে অচঞ্চল রূপলালিত্যে বিরাজিত রহিল।

কবিতারি সুরছন্দে আমাদের সখ্যতা অঙ্কুরিত এবং বিকশিত হইয়াছিল।

সে আজ ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা; তখন আমরা থাকিতাম শ্যামবাজার অঞ্চলে কাশিয়াবাগান-বাগানবাটীতে। সবে মাত্র সেই বৎসর ১২৯১ সালে আমি ভারতীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছি, শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ একদিন এখানে আসিয়া একটি কবিতা আমাকে দিয়া বলিলেন, "কবিতাটি অক্রূর দত্তের বাড়ীর একটি অন্তঃপুরিকার রচনা। লেখাটি ভালই হয়েছে, ভারতীতে দিও।"

তাঁহার বন্ধু ঁগোবিন্দ দত্ত ভারতীতে প্রকাশ জন্য কবিতাটি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর সেই কবিতাটিই ভারতীতে সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ইঁহার কবিতাহার এবং ভারতকুসুম গ্রন্থাকারে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রথম পুস্তক কবিতাহার বাহির হয় ১২৭৯ সালে, তাঁহার বয়স যখন ১৪ বৎসর।

বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে তখন কবিতাহারের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভারতকুসুমের সমালোচনা ১২৯৩ সালের ভারতীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভারতকুসুম। বইখানি একজন হিন্দুমহিলা প্রণীত।

হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ ছোট ছোট কয়েকটি কবিতায় এই বইখানি শেষ হইয়াছে। ইহাতে যে দোষ নাই এমন নহে কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন সুন্দর জিনিষ আছে, তাহা পড়িলে দোষের দিকে আর ত লক্ষ্য থাকে না। কেবল তাহা নয়, যখন দেখা যায় কবিতাগুলি লেখিকার কত অল্পবয়সের লেখা তখন অনেকটা আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং ভবিষ্যতে কবির প্রতিভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। নিম্নে একটি কবিতা উঠাইয়া দিতেছি।

নিশীথে বংশীধ্বনি

কেন প্রাণ কাঁদে বাঁশি! ও তোর মধুর তানে?
উদাস হইল প্রাণ তোর স্বর পশি কাণে।
নাহিত মুরলী ধারী, নাহি রাধা ব্রজেশ্বরী,
তবে কেন চিতহারা মন নাহি গৃহপানে।
মাতিল মোহিল প্রাণ কাঁদিল কেন কে জানে?
ইচ্ছা হয় পাখী হয়ে গৃহ ত্যজি যাই,
কৌমুদী হসিতাকাশে উড়িয়া বেড়াই!
বাঁশির সুরেতে মিশি বিচরি নীল আকাশে।

বয়স সম্বন্ধে দেখিতেছি অন্যান্য মহিলালেখকদিগকে তিনি হার মানাইয়াছেন, অন্ততঃ আমি নিজের দিক হইতে বলিতে পারি, দীপনির্ব্বাণ যখন প্রকাশিত হয় তখন আমার বয়স ছিল আঠারো।

সরসী জলে শশী

কি দেখাও সরসী!
হৃদয়ে ধরেছ তুমি গগনের শশী!
আনন্দ লহরী মেখে গরবে উঠিছ কেঁপে,
হাসিতেছ টিপি টিপি সোহাগের হাসি!
ভাবিছ অমন চাঁদ আর আছে কার?
সুধামুখে হাসি রাশি ঝরে অনিবার!
হয়ো না সরসি তুমি মত্ত অহঙ্কারে,
ঐ দেখ মাতৃ অঙ্কে শিশু শোভা ধরে!
তব চাঁদ মুখে শশি কলঙ্কের দাগ।
মোদের চাঁদের মুখে নব অনুরাগ!
তব চাঁদ দিবা রাতি ভাতি না বিকাশে;
আমাদের অঙ্কে চাঁদ দিবানিশি হাসে।
শুধু সুধা, সরসি গো তব চাঁদ ধরে
আমাদের চাঁদ হাসে মধু ঝরে মধুভাষে
আধো আধো স্বরে।

কবিতাহার রচয়িত্রী।

ইহার পর ক্রমশ ভারতীর পাতে তাঁহার নানা ভাবের নানারূপ লেখা বাহির হইতে লাগিল এবং যথাসময়ে সেগুলি পুস্তকবদ্ধ হইয়া বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল।

আমি ১২৯৩ সালে যখন ভারতীর সম্পাদক কার্য্য পরিত্যাগ করি সেই সময় মিলন কথা নামক প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলিয়াছেন,—ভারতী প্রকাশ জন্য আমার গ্রাম্য ছবি নামক প্রবন্ধটি পাঠাইয়া ভাবিয়াছিলাম,—ভারতী সম্পাদিকা কখনই সেটি মনোনীত করিবেন না। কিন্তু খুব আদরের সহিতই তাহা গৃহীত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন—ভারতীর প্রকাশিত গ্রাম্যছবি পড়িয়াই আমি তপোবন লিখিয়াছি।

এই সকল কথা আমি সম্পাদিকার পত্রেই জানিতে পারি। কত রকমে তিনি যে আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন তাহা বলিবার নয়।

ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদিকার কোমল করে বলয়ের মিষ্ট-মধুর আহ্বান-ধ্বনিই চির মুখরিত হইত, কখনও সে হস্ত সমালোচনার কঠোর আঘাতে নবীন উদ্যম লেখকের ভঙ্গ করে নাই।" ইত্যাদি।

স্বাভাবিক বিনয়ভাব হইতেই যে কবি নিজের গুণপনা খর্ব্ব করিয়া দেখিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী গ্রাম্য কবিতা হইতে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

পাড়া-গাঁ

রোদ উঠেছে ফুল ফুটেছে,
ঘাসে শিশির মেলা,
চুপড়ি হাতে, যায় ক্ষেতেতে
প্রাতে কৃষক বালা।
শীতের প্রভাত, নয় প্রতিভাত,
কুয়ার ধোঁয়ায় ঢাকা—
সুদূর দূরে, নাই কিছুরে
কেবলি ধূম মাখা।
তুলছে খুঁটী, কলাই শুঁটী
ক্ষেতের মাঝে বসে,
বালক রবির, সোনার কিরণ
গায় পড়েছে এসে।
ছোটি ছোটি হলদে ফুলে
শর্ষের ক্ষেত আলা,
পূরব ধারে মেঘের শিরে,
রাঙা সোণার থালা!
পথের ধারে বিলের তীরে
বক শাদা শাদা,
খেজুর গাছের গলার কাছে
কলসীগুলি বাঁধা।

কুঁড়ের পিছে তালের গাছে
বাবুই বাসার সার—
কি চাতুরী কারিগিরি
মানুষ মানে হার।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

গার্হস্থ্য চিত্র

ফুটফুটে জোছনায়, ধব্ ধবে আঙ্গিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহ কাজে অবসর পেয়ে।
শাদা শাদা মুখ তুলি, যুঁই শেফালিকাগুলি,
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে।
প্রাচীরেতে সুশোভিতা, রাধিকা ঝুম্‌কালতা,
দুলিতেছে চন্দ্র করে নেয়ে।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়, বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল!
প্রশান্ত মুখের পরে, কালোকেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু-ঢুল্!
মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে,
গায় ঘুম পাড়ানিয়া গান।
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল বিভুল বাসে
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী তান।
শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সেই রূপরাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে,
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ', মা বলিছে 'আয় চাঁদ'
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

গ্রাম্য ছবি বা জন্মভূমি

মাটীতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর
সমুখেতে মাটীর উঠান,
খড়ো চালা-খানি ছাঁটা, লতিয়া করলালতা,
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
পিঁজিরায় বস্ত্র বাঁধা, বউ কথা, কহে কথা,
বিড়ালটা শুইয়া দাবাতে,

মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা!
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে,
কানে দুল, দুল দুল (গাছ ভরা পাকাকুল।)
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটী বোনে,
ছোট হাতে জোর করে শাখাটী নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে, হাত লয় টেনে!
পুকুরে নির্ম্মল জল, ঘেরা কল্‌সির দল,
হাঁস দুটী করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশ বন।
শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখীদল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোনার বরণ।
লুটায় চুলের গোছা বালা দুটী হাতে গোঁজা
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, গ্রাম্য মাঠে গরু চরে,
তরুতলে রাখাল শয়ান;
সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে, পথিক চলেছে গেয়ে,
মনে পড়ে সেই মিঠে তান,
আজি এই দ্বিপ্রহরে, বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে,
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান,
সুধাময়ী জন্মভূমি, তেমনি আছ কি তুমি,
শান্তিমাখা স্নিগ্ধ শ্যাম প্রাণ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

আজিকার প্রবন্ধে কবির কাব্য সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবুও প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর লেখার প্রধান আকর্ষণ ইহার অকৃত্রিম সরলতা। সরল ভাষায়, সরল ছাঁদে, নিজস্ব ভাবে গড়া সরল চিত্রকলার উপর তিনি তাঁহার প্রতিভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজকালকার দিনে নব লেখকদিগের অধিকাংশ কবিতাই, ছন্দোবন্ধে, ভাষায়-ভাবে রবীন্দ্রনাথের দুর্দ্দান্ত অথবা প্রশান্ত অনুকরণ। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় ভাষার ঘনঘটা নাই, ছন্দোবন্ধেও আধুনিক কারিকুরির অভাব, তবুও সে রূপে মন মজিয়া যায়, কারণ তাহা খাঁটি জিনিষ, স্বাভাবিক ভাবপটুতাতে তাহা মনোরম।

দুই একটী কবিতা ভারতীতে ছাপা হইবার পর—কবির সঙ্কোচ বাঁধ অনেকটা টুটিয়া আসিল! ক্রমশঃ আমাদের পত্র লেখালেখি আরম্ভ হইল,—এবং যেমন হইয়া থাকে, চিঠিতে চিঠিতে আমাদের ভাবটা বেশ জমাট বাঁধিয়া গেল। দুঃখের বিষয়, সে সব চিঠিপত্র আমার ধরিয়া রাখা নাই, রাখিলে সে কালের সখী প্রণয় কাহিনী একালে খুব সম্ভব উপন্যাসের ন্যায়ই সমাদৃত হইত। সে যাক, গতের অনুশোচনা বৃথা।

কিন্তু লেখালেখিতেই আর ত মন বাঁধে না, দেখাশুনার জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এখন উপায়! গিরীন্দ্রমোহিনী তখনো একরূপ অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা, বিশেষ অল্পদিন তিনি বিধবা হইয়াছেন, স্বামীকে তিনি তাঁহার প্রাণের যে ইচ্ছা সহজেই জানাইতে পারিতেন ; বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট তাহা প্রকাশে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। কারণ তাঁহার মনে হইল, এই প্রস্তাবে খুব সম্ভব উঁহাদিগকে ক্ষুণ্ণ ব্যথিত করিয়া তুলিবে।

কাজেই মনের ইচ্ছা আমাদের মনেই তখন চাপিয়া রাখিতে হইল। অবশ্য আমি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। তিনি আমার বাড়ী নাই আসুন, আমি যদি দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরে যাইতাম তাহা হইলে কি কেহ আমার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইতেন? তাহা ত আর নহে। কিন্তু এখানে সমাজ সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। তিনি এখানে আসিবেন না, আর আমি সেখানে যাইব, ইহা স্বামী অপমান-জনক জ্ঞান করিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রাণেও সখীর এই সম্ভাবিত অপমান সাড়া দিয়া উঠিল। অতএব এ কথা এইখানেই চুকিয়া গেল ; খাঁচার পাখীর সহিত বনের পাখীর আর তখন চাক্ষুষ মিলন হইল না।

কিন্তু পিপাসা যে নিদারুণ, জল নহিলে ত প্রাণও আর বাঁচে না। কি করা যায়? গিরীন্দ্রমোহিনীর বাপের বাড়ী আমাদের মিলনের পথ খুলিয়া দিল। কিন্তু এহেন মহা খবর কি লুকান থাকে? অবশেষে দত্তবাড়ীতেও এ-কথা পৌঁছিল। কিন্তু সুখের বিষয় এই, আমাদের এই নিমন্ত্রিত অসন্তোষের পরিবর্ত্তে তাঁহারা সন্তোষই প্রকাশ করিলেন। সখীর ভয় ভাবনা সমস্ত মিথ্যা হইয়া গেল। ইহার পরে এমন একদিন আসিল যে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই দত্ত-অন্তঃপুরে আমি সখ্যতামিলনে যাইতাম এবং মিলনও বৌবাজার হইতে আমাদের বাড়ী আসিতেন। তখন মেয়েতে মেয়েতে দেখাশুনা হইবার পক্ষেও কত বাধাবিঘ্ন ছিল একালের পাঠিকা তাহা দেখিয়া অবাক হইতেছেন কি? কিন্তু বাধাবিঘ্ন ছিল বলিয়াই বুঝি আমাদের দুইটি হৃদয় এমন অনুরাগ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

গিরীন্দ্রমোহিনী শুধু কবি ছিলেন এমন নহে, তিনি চিত্রকরও ছিলেন।

তাঁহার হস্তাঙ্কিত নানা ভাবের চিত্র এখনো তাঁহাদের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্র শিক্ষার অভাবে যদিও নির্দ্দোষ হইতে পারে নাই, তবে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা খুবই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

গিরীন্দ্রমোহিনী মাটির পুতুলও বড় সুন্দর গড়িতে পারিতেন। মহিলা শিল্পমেলায় তিনি ও তাঁহার মাতা ভগ্নী নানারূপ পুতুল গড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের গঠিত কুঁড়েঘর দেখিয়া কৃষ্ণনগরের পটুয়া নির্ম্মিত বলিয়া লোকে ভুল করিত। সখি সমিতির শিল্পমেলা সম্বন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁহার মিলন কথায় যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমাদের মহিলা-সমাজে নূতন সৃষ্ট এই 'সখি সমিতি'...অসূর্য্যম্পশ্যা অবরুদ্ধা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ইহা এক বিশুদ্ধ 'নরোজা'র দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাঁহারা আর কখনো ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 'রমণীতে বেচে রমণীতে কেনে লেগেছে রমণী রূপের হাট'।

"আমার মনে আছে, বেথুনে প্রথম উদ্‌ঘাটিত শিল্প-মেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্ত্তৃক মায়ার খেলার অভিনয় হয় এবং মেয়েরা পুরুষদের মত সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে

অভিনয় দর্শন করেন, সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন! মনে আছে, আমারই পার্শ্বোপবিষ্টা একটী মেয়ে বলিয়াছিলেন, 'এঁরা যদি সকলে চরিত্রবতী হন, তাহা হইলে এরূপ সুচারু অভিনয়-ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসা ও বাহাদুরির বিষয়।' হায়, হায়, যে-দেশে মহিলাদের মধ্যে চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য স্ত্রীশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল, যে দেশের সতী বেহুলা ইন্দ্রসভায় নৃত্যগীত করিয়া মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, এখন কোন নারীকে কলা-কুশলা দেখিলে, সেই দেশের মহিলাদেরই এইরূপ মনে হয়!"

১৩২৩ সালে ভারতীর সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া সে ভার যখন নবীন সম্পাদকদ্বয়ের হস্তে ন্যস্ত করি, তখন সখী গিরীন্দ্রমোহিনী 'মিলন কথা' নামক প্রবন্ধে —আমাদের মিলন-ইতিহাসের অনেক কথাই সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। আজ পুনরায় তাঁহার কথা হইতে তাঁহার মনোভাব কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

মিলন-কথা

"ভারতী উপলক্ষে কিরূপে আমাদের দুইটী হৃদয় এক হইয়া যায় ; কিরূপে একটী চির-রক্ষণশীল একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের অভেদ্য দুর্গ-প্রাকারে আমাদের মিলন-মঙ্গল-পতাকা উড্ডীন হয় ; তাহা ভারতীর...নবীন সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায্য প্রাপ্যবোধে উপহার দিতেছি।

•

"প্রথম যেদিন স্বামী আসিয়া বলিলেন, 'আজ একটী নূতন খবর দিব। তোমাদেরই স্বজাতীয়া একজন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা হইলেন। তুমি ত পারিলে না।' (ইহা বলিবার অর্থ, তিনি আমাকে সংবাদ-প্রভাকর, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রে ধারাবাহিকরূপে লিখিতে অনুরোধ করেন।) সেই দিন আনন্দ-কৌতূহলের মধ্য দিয়া নবীনা সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রবল হয়। তার পর ঘটনাসূত্রে যেদিন তাঁহার সহিত ঈপ্সিত মিলন ঘটিল, হায়! সেদিন তিনি, যিনি আনন্দের সহিত স্ত্রী-সম্পাদিকার সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি আর ইহজগতে ছিলেন না। আমাদের বাটী চিররক্ষণশীল হইলেও স্বামী স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মিস্ তরু দত্ত ও অরু দত্তের উল্লেখ করিয়া আমাকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহেই তখন 'কবিতা-হার', 'ভারত-কুসুম' রচিত হইয়াছিল। আমার পিতৃদেবও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' ও 'দীপ নির্ব্বাণ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এমন সুন্দর লিখিতে পারিয়াছেন ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। তিনি মেয়েদের বিজ্ঞান-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পড়াইয়াছিলেন। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিতাম। মনে পড়ে, আমার সংস্কৃত অধ্যাপকের জ্যোতিষের পুঁথি কাড়িয়া রাখিতাম। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'তারাই আবার (অর্থাৎ খনা প্রভৃতি) ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।' কিন্তু মেয়েদের জ্যোতিষ-শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার

মত ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, জ্যোতিষী নির্ব্বংশ হয় ; এবং আশ্চর্য্যের কথা, তিনি বহুপুত্রক হইয়াও পরে নিঃসন্তান হইয়াছিলেন।

"তারপর বহুদিন পরে, সিমুলিয়ায় আমার পিতৃভবনে সেই 'পৃথিবী' ও 'দীপ-নির্ব্বাণ' রচয়িত্রীর সহিত যেদিন আমার প্রথম চাক্ষুষ মিলন হয়, সেদিন আমার স্নেহময় পিতৃদেবও পরলোকে। অদৃষ্টের পরিহাস এমনি নিষ্ঠুর!"

আমাদের মহিলা-সমাজে নূতন সৃষ্টি 'সখি-সমিতি'র প্রস্তাব ভারতীতে বাহির হয় ১২৯৩ সালের বৈশাখে। আমি উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রথম পত্র লিখি। লিপি-দূতীর সে কি আনাগোনা! তখনকার লিখিত একখানি পত্রের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আপনি লিখিয়াছেন 'আমাদের শিক্ষা পুরুষদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁহাদের ইচ্ছা-ব্যতিরেকে আমাদের কিছুই করিবার যো নাই।' ইহা সত্য। তবে তাঁহারা কখনো আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার আবশ্যক বুঝিবেন কিনা তাহা জানি না। পুরুষেরা আমাদের যতটুকু শিক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা আমরা পাইয়াছি, অর্থাৎ ধোবার বাড়ীর ফর্দ্দ মিলানো, আর কায়ক্লেশে একখানা পত্র লিখিতে পারা। আমার মনে হইতেছে, একজন লেখক তাঁহার প্রবন্ধে শিক্ষা-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, 'বাহিরে কোম্‌টী মিল্ স্পেন্‌সর লইয়া জ্বালাতন, আবার ঘরেও তাই।' ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, অধিক বলিবার আবশ্যক কি?

তারপর যখন পত্র-ব্যবহারের মধ্য হইতে 'আপনি' 'আপনার' প্রভৃতি উঠিয়া গেল, যখন

রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং

...তখন গলির ভিতর পাল্কীর শব্দ হইলেই মনে হইত—

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!

পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া কতদিন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে উভয়ে উভয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের প্রেমের অভিধানে 'আদব-কায়দা' বলিয়া কোনো কথা ছিল না। আমাদের এই প্রণয়াভিসারকে শ্রীমতীর অভিসার হইতে কিছুতেই ছোট বলিতে পারি না। কতদিন আষাঢ়ের সেই ঘনঘোর, সেই মেঘ-আঁধিয়ার, সেই মৃদু বর্ষণ, সেই কনক নিকষ বিদ্যুৎ দীপ্তি আমাদের এই অভিসারকে কি মধুর করিয়া তুলিয়াছে! বাস্তবিক টিপি টিপি মেঘান্ধকারে স্নিগ্ধ দিবস দেখিলেই উভয়ের হৃদয় যে উভয়কে চাহিত, তাহা একদিনকার একটি ঘটনায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন মেঘ-মেদুর দিবসে উভয়েই উভয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছি, শেষে পথে পথে সাক্ষাৎ।

দুঁহু লাগি দুঁহুজনে বাহিরায় পন্থ।
জনু চাঁদ লাগি ফিরে রাহু, রাহু লাগি চন্দ॥

আমরা সেকালের ; সুতরাং 'পাতান' রোগের হাত এড়াইতে পারি নাই। এই মিলন-সূত্রে আমরা 'মিলন' পাতাইয়াছিলাম।

তারপর আর একদিনকার কথা। তিনি তখন তাঁহার পিতৃদেবের শুশ্রূষার্থে পিতৃগৃহে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া

দেখিলাম, তিনি 'টডের' রাজস্থান পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বইখানি মুড়িয়া ফেলিলেন। সেদিনের কথা ভুলিবার নয়। সে কি দামিনী-চমক,...কি ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন, কি মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা দুই জনেও দারুণ গল্পে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম। কখন্ যে আমার স্খলিত-কবরী লোহার কাঁটাদুটী তাঁহার শয্যায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কিছুই টের পাই নাই। পরদিন কাঁটাদুটী সমেত এই মধুময়ী পত্রিকাখানি পাই

অধরে মোহন হাসি নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে!
কইরে মিলন কোথা, সেকি হেথা আছে আর?
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল-পরশ তার!
তাপটুকু রেখে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে;
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রু-জল রেখে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারা;
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা!
ফুলটী সে নিয়ে গেছে, ফেলে গেছে কাঁটা দুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি!

মনে পড়ে, উত্তরে লিখিয়াছিলাম—

দূর হতে কাছে আনা স্বভাব আমার।
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটি।
জগৎ রয়েছে দূরে হইতে আমার—
আনিতে পরাণে তায় করি ছুটাছুটি।
প্রেমের জগতে আমি মধ্য-আকর্ষণ,
বিরহ-রূপেতে আমি সম্পূর্ণ-মিলন।

১৩০৩ সালে মৎ-প্রণীত 'শিখা' প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থ আমি 'মিলন'কেই উপহার দিই। তাহাতে আমাদের সুমধুর সম্বন্ধের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আজ আবার যুগান্ত পরে নূতন করিয়া ভারতীর পত্রে উপহার দিলাম।

সখি,

বদ্ধ মুকুলের মাঝে সুরভির মত
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি হৃদে করে বাস;—
কি অভিসম্পাতে কার জানি নাক তাহা,
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।
বিরহের কারাগারে বটে বাস করে,
নিশিদিন চেয়ে তবু মিলনের পানে—
কে করে বন্ধন মুক্তি, কে ফুটাবে তারে—
নির্দ্দয় মিলন সে ত শত ব্যবধানে।

দেখ যদি ফেলে সূত্র   তল নাহি পাবে কুত্র
এ হৃদয় অকূল সলিলে;

বিরহের পাশাপাশি, মগ্ন হেথা প্রেমরাশি
তন্দ্রামগ্ন গভীর অতলে,
অর্ণব মন্থন করে পার যদি নিও তারে
পূত সেই এক বিন্দু সুধা;
বিরহ গরল আছে তাই ভয় হয় পাছে
যদি তোর নাহি মিটে ক্ষুধা!

ওয়ালটেয়ারে সুদীর্ঘ প্রবাস যাপনের সময়...আমি যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম...

"শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে ঘটেছে যা, তোমায় আমায়;—
মনে পড়ে সেদিনের কথা দুই যুগ পূর্ণ হলো প্রায়!
লিপি দূতী করি আনাগোনা দুটি হৃদি করিল বন্ধন,
দেখিবার আগেই দোঁহার ঘটাইল অপূর্ব্ব মিলন।
কুসুমের পরাগ যেমন সমীরণে হইয়া বাহিত,
ঘটায়ে ফুলের পরিণয় দূর হতে করে সম্মিলিত।
বসে এই সুদূর প্রবাসে স্মরি সেই ভাষার প্রভাব,
মূক যেথা সুনিপুণ দূতী নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।"

এমন রাশি রাশি ছিল! মধুর যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আজ—কালসাগরে অন্তর্হিত হইয়াছে।

আমাদের ভারতীর মাসিক সমালোচনা পত্রমধ্যেই হইত। সে সব লিপির বহর-ই বা কত! আমি স্বামীকে যে-সকল চিঠি লিখিতাম, তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া তাঁহার এক বন্ধু কতকগুলি পত্র 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' নামে ছাপাইয়া দেন! তারপর মৎপ্রণীত 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম'ও জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হয়। ইংরাজী সাময়িকপত্রে 'কবিতাহারে'র সমালোচনা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার এই "জনৈক"-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার এই সাহিত্যিক রহস্য-অবগুণ্ঠন দুষ্টা ভারতী সম্পাদিকাই উন্মুক্ত করিয়া দেন।"

বলা বাহুল্য আমাদের সখ্যতা কেবল আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ রহে নাই। পরস্পরের ছেলেমেয়েকে আমরা নিজের মতই মনে করিতাম, অধিকন্তু উভয় পরিবারের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও ইহা বেশ একটি প্রিয় বন্ধন রচনা করিয়াছিল।

এ সম্বন্ধে মিলন কথায় গিরিন্দ্রমোহিনী লিখিতেছেন—

"সুবিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক...আমার দেবর শ্রীমান গোবিন্দলাল দত্তের সহিত ঠাকুর-পরিবারের অনেকের আলাপ ছিল এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের সহিতও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে, মনে পড়ে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর 'সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা' ও রবীন্দ্রের 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রভৃতি রচনা পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন জোড়াসাঁকোর মেয়ে-পরিবারের সহিত আমাদের মেয়ে-পরিবারের পরিচয় ছিল না। গোবিন্দলাল অবরোধের মধ্যে শাস্ত্র-সম্মত স্ত্রী-শিক্ষার পাণ্ডা ছিলেন, এবং সাবিত্রী

লাইব্রেরীকে উপলক্ষ্য করিয়া, নারী-রচনা পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। কঠোর রক্ষণশীল দলের 'সেনানায়ক' উপাধি ও তদুপযোগী শিরোপা আমি তাঁহাকে অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলাম এবং কোন দিন ভাবি নাই অবরোধের বাহিরে তিনি গুণের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে আমার সহিত ভারতী-সম্পাদিকার আলাপের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ক্রমে তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ভক্ত হইয়া উঠেন এবং আমাদের এই মিলনযজ্ঞের অন্যতম উত্তরসাধক ছিলেন।"

কেবল তিনি নহেন—তাঁহাদের সুবৃহৎ পরিবারের সাহিত্যানুরাগী সকলেই আমাকে কিরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন—'রেইস্ অ্যাণ্ড রায়েৎ' নামক তাঁহাদের পত্রিকাতে যথা অবসরে মাঝে মাঝে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। আর গিরীন্দ্রমোহিনী জোড়াসাঁকোর বাড়ীর অনেকেরই ছিলেন মিলন। পূজ্যপাদ মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী, আমার মধ্যম বধূঠাকুরাণী—যিনি বৎসর কাল 'বালকে'র সম্পাদিকা ছিলেন—তাঁহার সহিত মিলনের কিরূপ ভাব হইয়াছিল, সে কথাও মিলন-কথায় কবি প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সেসব কথা আর এখানে তুলিলাম না ; ১৩২৩ সালের ভারতীতে পাঠক সে কথা দেখিতে পাইবেন।

আমাদের সখ্য নাট্যের শেষ পরিচ্ছেদটি পূর্ণমাত্রায় মিলন মধুর। এত সত্বর আমার ভাগ্যে সখি বিয়োগ বেদনা ঘটিবে তাহা মনে করি নাই। কিন্তু সর্ব্বযামী পুরুষ তাহা জানিয়া বুঝি সান্ত্বন-স্বরূপ উক্তরূপ অমৃতকণার আস্বাদ দিলেন। এই মরজগৎলীলায় এইটুকুই বিধাতার অমর কৃপা। বহুদিন হইতে আমাদের ইচ্ছা ছিল উভয়ে মিলিয়া আমরা তাঁহার ভ্রাতৃসদন ও মাতুলালয় মজিলপুরে যাইব। তাঁহার ভ্রাতাগণ মজিলপুর দত্ত বংশের দৌহিত্র, অধিকার সূত্রে মাতামহের বিষয় সম্পত্তির আংশিক মালিক। দৈব নির্ব্বন্ধে যৌবন সময়ে যে সাধ আমাদের পূর্ণ হয় নাই, এইবার নববর্ষের প্রাক্কালে সেখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাইজ বিতরণ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন আমাকে ধরিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের অনুরোধ-নিমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। দুজনেই যদিও এখন আমরা ভগ্নস্বাস্থ্য তথাপি দেহের দুর্ব্বলতা মনের জোরেই উপেক্ষা করিয়া উদ্দীপিত আনন্দে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মোটরযানে আমরা মজিলপুর যাত্রা করিলাম। ১৭রই ১৮রই দুইদিন সেখানে কাটাইয়া তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিলাম। মজিলপুর অবস্থানের এই স্বল্প সময়টুকু সখীর আত্মীয়গণের আন্তরিক আত্মীয়তাপূর্ণ সমাদর যত্নে পরম সুখে কাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম প্রীতি সৌজন্য আমার জীবন-পাতে চির মুদ্রিত থাকিবে।

এই স্বল্প সময় সখী গিরীন্দ্রমোহিনীকে আমি যেরূপ প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছিলাম, পূর্ব্বে সেরূপ সুযোগ আর কখনো ঘটে নাই। আহারে, বিহারে, শয়নে, ভ্রমণে আমরা সাথী ছিলাম। অল্পক্ষণের নিমিত্তও তিনি আমার চোখের আড়াল হইলে তৃষিত-চিত্তে আমি তাঁহার পথ চাহিয়া থাকিতাম। কাছে আসিলে তখন কি পরিতৃপ্তি!

মজিলপুর প্রাসাদ আমার বড় সুন্দর লাগিল। সেকালের জমীদারদিগের বাসভবন কিরূপ নিরাপদ দুর্গরূপে নির্ম্মিত হইত এই প্রাসাদ দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। পরিখা

বেষ্টনের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশের প্রথম পথ একটী সুদৃশ্য বৃহৎ সিংহদ্বার। দ্বারমধ্য দিয়া কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিলে যে প্রাসাদ নজরে পড়ে তাহা বহির্ভবন। এ ভবনও একটি মাত্র প্রবেশ দ্বারে সুরক্ষিত। এই প্রাসাদের উঠানে দালান প্রভৃতির আবার আর এক কমপাউণ্ড ও অন্য প্রাসাদ। এইরূপ কমপাউণ্ডের পর কমপাউণ্ড, প্রাসাদের পর প্রাসাদ এক একখানি বৃহৎ প্রবেশদ্বার সুরক্ষিত হইয়া যেন কৌটার মধ্যে কৌটারূপে অবস্থিত।

প্রাসাদের পারিপার্শ্বিক কত না ঠাকুর দালান, কমপাউণ্ডের আশেপাশে কত না রঙ্গমঞ্চ, দোলমঞ্চ, দেব-দেবীর মন্দির।

কোন বাড়ীরই ঘরগুলি সেকালে ধরণে ঘুবচি খুবচি নহে। বেশ বড় বড় হাওয়া-রৌদ্র খেলিবার উপযুক্ত। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ এখন ভিন্ন ভিন্ন শরিকের ভাগে পড়িয়াছে। ইচ্ছা করিলেই এক শরিক অন্য শরিকের বাড়ী যাতায়াত করিতে পারেন—অথচ সকলেই দূরে দূরে আছেন।

আমি ছিলাম সখীর সহিত বহির্প্রাসাদে। শুনিলাম—বঙ্কিমবাবু যখন এই অঞ্চলের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি এইখানে আসিয়া থাকিতেন। এবং এই প্রাসাদের আদর্শেই নাকি তিনি বিষবৃক্ষের প্রাসাদ রচনা করিয়াছিলেন।

মজিলপুর বহু বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের বাসস্থান। রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং খ্যাতনামা শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মস্থানও এইখানেই।

প্রাসাদেরই একটি দালানে মজিলপুরের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। গিরীন্দ্রমোহিনীও এইখানে পড়িতেন।

প্রাইজ বিতরণ দিনে ঠাকুর দালানের সম্মুখবর্ত্তী বড় উঠান লোকসমাগমে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই শত সহস্র লোকের মধ্যে সেকালের অন্তঃপুরিকা গিরীন্দ্রমোহিনী প্রকাশ্যভাবেই আমার পার্শ্বে উচ্চ মঞ্চের উপর আসিয়া বসিলেন। সেকাল আর একাল।

বিদ্যালয়ের একটী বালিকা বেশ সুন্দর গান করিল। ইহা হইতে কি বুঝা যায়। সঙ্গীত শিক্ষা যে বালিকাদিগের পক্ষে এখন দোষের কথা নয় বরং গুণের কথা, ইহা পুরুষগণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মজিলপুর যাত্রা করি আমরা সন্ধ্যাবেলায়, ফিরিলাম প্রত্যুষে। তাই এ সময় পথের শোভা বেশ উপভোগ করিয়াছিলাম।

পথিপার্শ্বে কোথাও অনেকদূর ধরিয়া বৃক্ষশ্রেণীর ছায়াপথ; কোথাও উন্মুক্ত আকাশতলে আকা-বাঁকা মেটো রাস্তা, ধারে ধারে জলাভূমি, অদূরে মাঝে মাঝে একখানি কুঁড়েঘর, কোথাও বা কিছুদূরে গাছপালার ছাউনিতলে আট দশটি বসতিতে এক একটি কৃষাণ গ্রাম। রাস্তার সমপাতেই বারুই প্রভৃতি দুএকখানি বর্দ্ধিষ্ণু সহর। রাস্তা হইতেই জমীদারদিগের জমকালো বাসভবন আংশিকভাবে নজরে পড়ে।

উন্মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়া যখন মোটর চলিতেছিল তখন উষার সুবর্ণ দৃশ্যে আকাশ সুরঞ্জিত। গিরীন্দ্রমোহিনী প্রকৃতির সেই মধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বলিয়াছিলেন— "আমার অন্তিম শয্যা যেন এইরূপ মুক্ত উদার আকাশ সম্মিলনতলেই রচিত হয়। অনন্তের শোভা দেখিতে দেখিতেই যেন আমার নয়ন মুদিয়া আসে, ইহা আমার চিরজীবনের একটি সাধ।"

কবির এই অন্তিম-বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল কিনা জানি না—কারণ তাঁহার শেষদিনে তাঁহাতে আমাতে দেখা হয় নাই, এই নিদারুণ আক্ষেপ এ জীবনে ঘুচিবে না।

তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমি খুব অসুস্থ হইয়াছিলাম, একটু সুস্থ হইয়াই যখন ভাবিতেছি একবার তাঁর কাছে যাইব—সহসা খবর পাইলাম...তিনি আর নাই।

এরূপ শোক দুর্ঘটনার সময় বাড়ীর লোকের মাথা ঠিক থাকে না, সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ আমার নিকট পৌঁছে নাই।

হায়! শুনিয়া কি মর্ম্মান্তিক বেদনাই অনুভব করিয়াছিলাম। শেষ মুহূর্ত্তে একটিবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এ যে গভীর দুঃখ।

সত্যই তিনি কি আর নাই! সব সময়ে তাহা ত মনে করিতে পারি না? এই স্মৃতি-কথা লিখিতে কতবারই যেন তাঁহাকে চোখের সম্মুখে দেখিতেছি, আনন্দ হাসিতে তাঁহার মূর্ত্তিখানি যেন তেমনি প্রীতি প্রফুল্ল, তেমনি সখ্য মধুর।

ভারতী, আশ্বিন ১৩৩১

সাহিত্যে দেশবন্ধু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকাভিভূত। সকলেরই অন্তরে গভীর বেদনা এবং মুখে মর্ম্ম-উথলিত ভাষা—“সর্ব্বনাশ হইল!” দেশের নরনারী তাঁহার প্রতি কিরূপ নির্ভরপরায়ণ ছিল, অকৃত্রিম হিতকামী বন্ধুবিশ্বাসে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর আবালবৃদ্ধবনিতার শোকাঞ্জলিদান হইতে অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত হইয়া অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেন, কিন্তু ভক্তির এমনই প্রভাব যে, দেশবন্ধুর চিতাহুতির দিন মহাত্মা স্বয়ং তাঁহারই প্রবর্ত্তিত কাউন্সিল গ্রহণের সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

সত্য কখনও মরে না। তাহার প্রভাব চিরস্থায়ী। দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইলেও তাঁহার কার্য্যপ্রভাব চিরঞ্জয়িরূপে ভারতে চির-বিরাজমান রহিল। মৃত্যুতে তিনি আমাদের নবজীবন লাভের শক্তি দান করিয়া গেলেন। আমরা যদি এই শক্তি গ্রহণ করিতে পারি, তবেই সে দানের সার্থকতা। শোক করিবার দিন ফুরাইয়া আসিল। এখন যদি তাঁহার অনুদ্‌যাপিত দেশমঙ্গলব্রত উদ্‌যাপনে আমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্পণ করি, তবেই তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান দান করা হইবে। তাঁহার সম্মানরক্ষার অর্থই আত্মসম্মানরক্ষা। শয়নে স্বপনে যে চিন্তা পলে পলে তাঁহাকে মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের স্বার্থচিন্তা নহে। লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থের মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র স্বার্থ জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র দেশের মঙ্গলই তিনি আত্মমঙ্গল বলিয়া জানিয়াছিলেন। কেবল জানেন নাই—প্রাণ, মন, দেহ দিয়া সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় ছিলেন।

ভগবান্ আমাদের প্রয়োজনমত যুগে যুগে নেতা প্রেরণ করেন। চিত্তরঞ্জন ছিলেন ভগবান্-প্রেরিত শক্তিমান্ দেশপ্রেমিক, ভারতবর্ষের স্বরাজ-নেতা। মহাত্মা গান্ধী

বলিয়াছেন,—দেশবন্ধু স্বরাজের জন্যই বাঁচিয়াছিলেন এবং স্বরাজের জন্যই দেহপাত করিয়াছেন। অতএব এমন যদি কোন দিন আসে—যে দিন আমরা পৃথিবীস্থ অন্যান্য স্বাধীন দেশের নরনারীর সঙ্গে সমকক্ষভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব, সেই দিনই আমাদের দেশবন্ধুর অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং একমাত্র ইহাতেই তাঁহার স্বর্গগত আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

চিত্তরঞ্জন যে দেশের কি ছিলেন, কি গুণে যে তিনি সমগ্র দেশের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া গিয়াছেন—কত বড় বড় লোক ইহার ব্যাখ্যা-নিরত হইয়া ভাষার দৈন্য অনুভব করিতেছেন, এমনই বিরাট অপূর্ব্ব ছিল তাঁহার দেশপ্রেম, মাহাত্ম্যময় ছিল তাঁহার আত্মত্যাগ এবং কর্ম্মশক্তি। তবে আমি আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা কি লিখিব? আমি শুধু বলিতে পারি, তাঁহার কবিতার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা। সাহিত্যের দিক হইতে তাঁহাকে যেন ভাল করিয়া আমাদের এখনও দেখা হয় নাই। আশা করি, অতঃপর সাহিত্য-মন্দিরেও তাঁহার যথাযোগ্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে।

তিনি যে বেশী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; ক্ষুদ্রায়তন চারি পাঁচখানি পুস্তকের মধ্যে তাঁহার কবিতার সমষ্টিসংখ্যা এক শতের অধিক হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এক চন্দ্রও তমোহরণ করেন; একটি বিদ্যুৎকণিকার মধ্যেও বজ্রতেজ নিহিত। সংখ্যাবহুলদানে তিনি সাহিত্যভাণ্ডার সাজাইতে না পারিলেও, ভাবসম্পদে তিনি তাহা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার সকল কবিতাই তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের যেন সাধনা—তাঁহার জীবনেরই যেন রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী,—যে মহাপ্রেম তাঁহার জীবনকে চিরদিন আচ্ছন্ন, অভিভূত, ব্যথিত-আকুল করিয়া রাখিয়াছিল—তাহারই যেন মূর্ত্তিমন্ত বহির্বিকাশ। তাঁহার এই ছন্দোময়ী ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরতম মানুষটিকে আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই বলিয়াই এ কবিতাগুলি এত মূল্যবান্। তাঁহার অন্তরব্যাপী আদর্শ মহাপ্রেমকে ধরিবার জন্য তাঁহার যে আকুলতা, 'মালা'-গ্রন্থের "প্রেম ও প্রদীপে" তাহা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত।—সে কবিতা এইরূপ—

১

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?
তোমার ও প্রদীপের কনক-কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া!
কেন রাখিয়াছ আহা! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া?
আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া?
তোমার লাবণ্য-মূর্ত্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া!
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা জাগে দেখিতে দেখিতে
কেন রাখিয়াছ, ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?

২

অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ-মাঝারে!
আমি অশ্রুজল লয়ে—শুধু চেয়ে থাকি
আমি ত জ্বালিনি দীপ, কি করিয়া ডাকি?

৩

তবু মনে হয়, তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্ত্তস্বর—অন্তর-মাঝারে!
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার,
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর-আঁধারে।
জ্বাল গো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার!

৪

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক বন্ধন;
ব্যথিছে সকল মন সর্ব্বাঙ্গ আমার!
কত না অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার!
হে মোর নিষ্ঠুরা! কি যে বেদনা-বন্ধনে
টানিতেছ সর্ব্ব হৃদি তব সন্নিধানে!
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে!
প্রজ্জ্বলিত হৃদিমাঝে, শূন্য সব ঠাঁই!
হে প্রেমনিষ্ঠুরা! আমি যে তোমারে চাই।

—প্রেম ও প্রদীপ।

মাঝে মাঝে তাঁহার কবিতায় তাঁহার প্রেম-সাধনার মধ্যে একটি গভীর নিরাশা দেখা যায়। অতীতের একটি শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার দেবী তাঁহার হৃদয়ে যে প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন, পরমুহূর্ত্তে যেন তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আকাঙ্ক্ষাময় ও অতৃপ্তিময় মহাশূন্যের মধ্যে তাঁহাকে ভাসাইয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তখন হাহাকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিতেছেন—

জীবন, জীবন কোথা?—যেন নিরবধি,
মরণ নিশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া,
যেন চুপি চুপি অই—কাঁদাইছে হৃদি,
অতীত সে জীবনের প্রতিধ্বনি দিয়া।
জীবন, জীবন কোথা?—ভ্রান্তি স্বপনের,

দৃপ্ত সুরা পান ক'রে শুধু ভুলে থাকা।
এ কি হাসি। এ কি কান্না। শুধু ব'সে ব'সে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতেরে আঁকা।
মহান্ মুহূর্ত্ত এক জীবনে পশিয়া
ভাসাইয়া লয়ে গেছে—গ্রাসিছে সকল!
কোথা তুমি কোথা আমি, গেছে হারাইয়া
রয়েছে অনন্ত ব্যথা হৃদয়-সম্বল।
সে ব্যথা বাজিছে আজো ; আমার জীবন
তারি যেন প্রতিধ্বনি, আর কিছু নয়!
যত হাসি যত অশ্রু যাতনা স্বপন,
করেছে জীবন যেন মহাশূন্যময়।

—মহাশূন্য।

কিন্তু মহাজন ও মহাপ্রেমিক চিরদিন কল্পিত শূন্যতা লইয়া থাকিতে পারেন না। কার্য্যশক্তির দ্বারা তাহাকে তাঁহারা পরাজয় করিতে চাহেন। তাই কবিকে যখন মহাশূন্য ঘিরিয়া ফেলিল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন?
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি—নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে,—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

—মালা

তিনি আঁখি মুছিয়া কার্য্যে নামিলেন, কিন্তু কার্য্যে নামিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। কবি যেমন শতচ্ছন্দ গাঁথিয়াও মনে করেন, তাঁহার অনেক ভাবই প্রকাশ করা হইল না,—সেইরূপ যিনি মহাকর্ম্মী, তিনি শত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও মনে করেন, তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তাই কবির কর্ম্মহৃদয় বিফলতা-নিপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিল—

ওরে রে পাগল!
জ্বলিছে নয়নে তব কি নব বাসনা,
কি গীত রয়েছে বাকি ;—কি নব বাজনা?

উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন্ পূজা লাগি তব আকুল অন্তর?
আমি ত দিয়াছি যা' কিছু আছিল সার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
নিবিড় নয়ন হ'তে দিয়াছি দরশ,
এ শুভ্র দেহের আমি দিয়াছি পরশ,
পরাণের প্রীতি-পুষ্প, প্রতি হাসি গীত,
জীবন-যৌবন-ভরা সকল সঙ্গীত,
তোমারে করেছি দান! কি চাহ আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
তোমারে করেছি পূজা, দেবতা সমান,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে গাহি সুমঙ্গল গান;
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি, ধূপ ধুনা দিয়া
আরতি করেছে মোর প্রেমপূর্ণ হিয়া।
আর কি করিব দান, কি আছে আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে রে পাগল আমার।
সন্ধ্যাশেষে পুনর্ব্বার করেছি বরণ
সমস্ত রজনী ভ'রে করেছি স্মরণ,
তোমারে, তোমারে শুধু; হাসিয়া প্রভাতে
আনিয়াছি পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া দু'হাতে।
আর কি আনিতে পারি কি আছে আমার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি! কি দিব গো আনি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর?
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

—মালা।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের নিরাশ মুহূর্ত্তে তিনি ভগবানের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আবার বল লাভ করিতেছেন।

এ পথেই যাব বঁধূ! যাই তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব।
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব!
গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব—
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!

দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেকো!—
যদি ভয় পাই বঁধূ! মাঝে মাঝে ডেকো!
—অন্তর্য্যামী।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার সমস্ত কবিতাই একটি মহাপ্রেমের ভাব-প্রেরণা। এইভাবে তিনি কখন হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন। সেই প্রেমকে কখনও কর্ম্মরূপে, কখনও ধর্ম্মরূপে, কখনও বা প্রিয়ারূপে পাইতেছেন, কখনও বা হারাইয়াও ফেলিতেছেন। যেমন তাঁহার কার্য্যের মধ্যে, তেমনই তাঁহার কবিতার মধ্যেও ভাব ও ভক্তি, জ্ঞান ও শক্তি, চিন্তা ও কল্পনা—এ সকলের একটি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আমরা দেখিতে পাই।

মৃত্যুর বহুপূর্ব্বে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী ঈঙ্গিত রূপিণীর দর্শনলাভে আনন্দের উচ্ছ্বাসভরে বলিতেছেন :—

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো অন্ধকারে;
সকল সুখের মাঝে, সর্ব্ব-বেদনায়!
কর্ম্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
ওই তব প্রদীপের আলো-অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে!
হে মোর লুকান ধন!
হে রহস্যময়ি!
আজি জীবনের শেষ
আজো তুমি জয়ী!
তোমারে খুঁজেছি আমি
আলোকে আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি;
মরণ-মাঝারে—
সকল সুখের মাঝে
সর্ব্ব-সাধনায়!
আজি শ্রান্ত জীবনের
ধূসর-সন্ধ্যায়
হে মোর লুকান ধন!
আজো তুমি জয়ী!
আজো খুঁজিতেছি তোরে
হে রহস্যময়ি!
একই সন্ধ্যা আমাদের পরে
ঢালিয়াছে ঘন ছায়া তার!
আমাদের দু'জনের তরে
পাতিয়াছে মহা অন্ধকার!
আর কিছু নাই—কেহ নাই

আছি আমি—আছে অন্ধকার,
আছ তুমি, আর কেহ নাই
আছে শুধু সাঁজের আঁধার!
হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার?

—প্রেম ও প্রদীপ।

ইচ্ছা করিতেছে, তাঁহার সব কয়খানি গ্রন্থ হইতেই দুই চারিটি করিয়া কবিতা এখানে তুলিয়া দিই। কিন্তু স্থানের স্বল্পতাবশতঃ তাহা পারিলাম না। যদি সুবিধা ও সুযোগ হয়, তবে ভবিষ্যতে বিশদভাবে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় রহিল। এই স্থানে আর একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই কবিতার মধ্যে দেখিতে পাই, এতদিন তিনি কর্ম্মের গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া যে পথটি সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন—হঠাৎ যেন তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

সব তার ছিঁড়ে গেছে! একখানি তার
প্রাণমাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার!
সব আশা ঘুচে গেছে! একটি আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায়!
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার!
সবকর্ম্ম শেষে আজ, মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী!

ইহাই কি স্বরাজের পথ? ধন্য তুমি দেশবন্ধু! তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমাতে ধন্য! আর তোমার দেশবাসী আমরাও—তোমাকে বন্ধুরূপে পাইয়া ধন্য!

মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩২

ইংরাজের সহিত সুরেন্দ্র-প্রসঙ্গ

কিছুকাল পূর্ব্বে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া একজন ইংরাজের সঙ্গে আমার বেশ একটু বচসা হইয়াছিল।

ইংরাজ-মণ্ডলী আজকাল সুরেন্দ্রবাবুকে মডারেট বলিয়া খাতির করেন। কিন্তু তখনকার দিনে ইঁহাদের মতে তিনি ছিলেন একজন ঘোর Extremist, এমনকি ইঁহাকেই তাঁহারা বিদ্রোহিতার প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিতেন। সে দিন সে ইংরাজটির তৎপ্রতি বিদ্বেষ-বিষবর্ষিত বাক্যে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, অথচ তাঁহার সেই জ্বালাময় সমালোচনার মধ্যে বেশ একটু কৌতুকও অনুভব করিয়াছিলাম। তখন আমি 'ভারতী'র

সম্পাদক ছিলাম। সম্ভবতঃ কোনও একদিন এই বাদানুবাদ 'ভারতী'রই কাযে লাগিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া সে দিনের কাহিনী তখন খাতায় টুকিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু পরে আর তাহা ছাপাইবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। আজ এতদিন পরে দেখিতেছি, সে কথা প্রকাশের ঠিক সময় আসিয়াছে। ভারতে জাতীয়তা উদ্বোধনের যিনি আদিগুরু, তাঁহার স্মৃতিকল্পে শ্রদ্ধাতর্পণস্বরূপ সেই কাহিনী আজ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

সেই সময় মাণিকতলার বিদ্রোহী দলের বিচার চলিতেছিল। খুদিরামের সবেমাত্র ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। সেই বিপ্লবযুগে আমি একদিন একজন ইংরাজ-মহিলার বাটীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার স্বামী ছিলেন একখানি সচিত্র পাক্ষিক কাগজের প্রোপ্রাইটর। আমার ছোট ছোট গল্প মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কাগজে প্রকাশিত হইত। সেই সূত্রেই তাঁহাদের সহিত আমার আলাপ-পরিচয়।

চা-পানের পর মিসেস্ পি সদ্যপ্রকাশিত কাগজখানা আমাকে দেখিতে দিলেন। প্রথম পাতাখানা উল্টাইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, খুদিরামের ছবি। ছবিখানি দেখিয়া অসতর্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "খুব ত ভালমানুষী নরম চেহারা! আহা, দেখিলে মায়া করে!"

মিঃ পি বলিলেন, "কিন্তু কায যা করেছে, তা ত একটুও নরম নয়।"

আমি। তা সত্য। তবে স্ত্রীহত্যার অভিপ্রায়ে সে কিন্তু এ কায করে নাই। কিংবা তার হাতেই যে খুনটা হয়েছে, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া যে রকম তার কচি বয়স, এই বিবেচনায় গভর্ণমেণ্ট যদি তাকে ফাঁসী না দিয়ে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিতেন, তবে আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তার জীবনের ধারা একেবারেই উল্টে যেত।

মিঃ পি বলিলেন, "আমার মতে সঙ্গে সঙ্গে দলপতিদের লট্‌কে দিলেই ঠিক হত। এ সকল কার্য্যের জন্য আসলে দায়ী তারাই।"

আমি তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম। দুই একখানা পাতার পরই নজরে পড়িল সুরেন্দ্রবাবুর ছবি। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "একি! সুরেন্দ্রবাবুও যে এখানে?"

মিঃ পি। তিনিই ত যত নষ্টের গোড়া। তিনিই ত ছেলেদের এ সকল কাযে উত্তেজিত ক'রে তুলেছেন।

আমি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলাম, "কি বল্‌ছেন আপনি? তিনি ছেলেদের দেশানুরাগধর্ম্ম শিখিয়েছেন বটে, কিন্তু বোমা ফেল্‌তে বা গুপ্তহত্যা করতে ত শেখাননি! বিদ্রোহিতার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই নন। তিনি একান্তই মডারেট।"

মিঃ পি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মডারেট! তিনি পাক্কা Extremist। যখন বিপিন পালের দল তাঁকে ছাড়িয়ে উঠলো, তখনই তিনি Moderate সাজলেন। লোকটা ভারী চালাক (clever)।"

আমি। মডারেট বা Extremist দলের মধ্যে বিশেষ কি প্রভেদ, তা আমি জানি না। তবে দেশাত্মবোধ প্রচার করাই যদি চরমপন্থীবাদ হয়, তবে ইঁহাকেই যথার্থ আদি গুরু বলা যায়। আর খুন-জখম করাই যদি চরমপন্থীর কায হয়, তা হ'লে ইনি একান্তই মডারেট।

কিন্তু মিঃ পি কিছুতেই তাঁহার ধুয়া ছাড়িলেন না। খুব জোরের সহিত বলিলেন,

"নিশ্চয়ই তিনি Extremist। Extra Extremist দলের আবির্ভাবেই এখন তিনি মডারেট নাম নিয়েছেন। যেমন ইংলণ্ডে প্রথমে Liberal নামধেয় দলকে যারা ছাড়িয়ে উঠলো, তারা দাঁড়াল Radical ; এ শুধু একটা নামের ঘোরফের। আসলে সব হাঙ্গামার মূল হচ্ছেন ইনি—এই সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি! বরিশালের যে গোলযোগ ঘটে, সেও এঁরই জন্য। ইনি ছেলেদের ক্রমাগত এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন পদদলিত ক'রে চলো (trample under your foot)।"

আমি বলিলাম, "বাধাবিঘ্ন দলিত করার অর্থ ইংরাজ-দলন নয়। দেশের মঙ্গল করতে হলে বাধা-বিঘ্নের উপর দিয়ে চলতেই হবে। এ একটা সহজ সত্য। আপনাদের 'হেপেনি' (Half-a-Penny) বুকের উপদেশ।"

মিঃ। তা নয়, আপনি ওকে জানেন না, ও-কথার গুপ্ত অর্থ নিশ্চয়ই ইংরাজ-দলন। জানেন না কি,—উঁহাকে যে বাঙ্গালার রাজা ক'রে তুলেছে। (He was crowned as the King of Bengal)।

আমি বলিলাম, "এখানে রাজা অর্থে গুরু। তিনিই কি না প্রথমে দেশানুরাগ শিক্ষা দেন।"

মিঃ পি। গুরুকে কি ছাতা ধরে? তাঁর মাথায় যে ছেলেরা ছাতা ধরেছিল।

মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম, হায় রে, তোমরাই ভারতের হর্তাকর্তা বিধাতা। প্রকাশ্যে কহিলাম, "হাঁ, শিষ্যরা গুরুর মাথায় ছাতা ধরে বৈ কি! আপনারা কি দেখেননি, অনেক সময় শিষ্যরা গুরুর মাথায় ছাতা ধ'রে রাস্তায় শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে।"

মিঃ পি। তা জানি আর নাই জানি, এটা ত ঠিকই জানি যে, মিঃ ব্যানার্জ্জিই ছেলেদের বয়কট শিখিয়েছেন।

আমি। তাতে দোষ হয়েছে কি? দেশোন্নতি-চেষ্টা ত রাজার বিরুদ্ধাচরণ নয়! দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করতে গেলেই স্বদেশী পণ্যগ্রহণে বদ্ধপরিকর হ'তে হবে।

মিঃ পি। ওঃ, আপনি বলছেন স্বদেশীর কথা। কিন্তু স্বদেশী ও বয়কট, এ দুটো ত এক জিনিষ নয়।

আমি। এক বৈ কি! স্বদেশী পণ্য গ্রহণ করতে গেলেই বিদেশী বর্জ্জন অনিবার্য্য।

মিঃ পি। আপনি দেখছি, তা হ'লে ভাল ক'রে বেঙ্গলী কাগজখানা পড়েন না। কাগজখানা তলিয়ে পড়লেই বুঝা যায়, ইংরাজ বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা জাগানই সম্পাদকের মনোগত অভিপ্রায়। তবে সেয়ানা ছেলে এখন সুর বদলাচ্ছেন।

আমি। আপনারই ভুল। এ রকম idea আমাদের দেশেরই নয়। যদি কেউ বিদ্রোহিতা শিক্ষা দিয়ে থাকে, ত আপনারাই—

মিঃ পি। "আমরা?" এইরূপে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মিস নোবল্ অনেকটা mischief করেছেন, আমি জানি। কিন্তু আপনি জানেন, গভর্ণমেণ্ট সে জন্যে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন?"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলাম, "সত্যি না কি? আমি তা ত জানি না।"

মিঃ পি বলিলেন, "খুব সত্যি। এ দেশে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে আর আসতেই দেবেন না।"

তাঁর স্ত্রী এতক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইতেছিলেন। এইবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মিস নোবল্ এখানে এলেই আমার স্বামীর সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া হ'ত। এ দেশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বল্লেই মিস্ নোবল্ রেগে উঠে বল্‌তেন, 'তোমার স্বামী native-hater, আমি আর এর মুখদর্শন করব না, আমি চল্লুম, আর কখনও তোমাদের বাড়ী আসব না।' আমি তখন তাঁকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে ফলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করতুম। কিছু পরে তিনি আবার জল হয়ে যেতেন।"

মিঃ পি বলিলেন, "ও কথাটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। আমি মোটেই native-hater নই। আমি native-দের সত্যিই ভালবাসি। এ সকল idea তাদের পক্ষেই ক্ষতিজনক। তিলক ত স্পষ্ট করেই বোমা-হত্যার প্রশংসা করেছেন।"

আমি উত্তেজিত স্বরে কহিলাম, "সে ত অনুবাদের কথা। মূল লেখা থেকে ত তাঁর বিচার হয়নি! আজকাল কথায় কথায় তিলকে তাল ক'রে তুলে sedition প্রমাণের চেষ্টা হচ্ছে। এ policy-টা গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই ক্ষতিজনক। অনেক ছোটখাটো কথা গভর্ণমেণ্ট নোটীশ নিলেই বড় হয়ে যায়। ছেলেদের বন্দেমাতরম্ নিয়ে ফুলার যদি ওরকম গোলমাল না করতেন, তা হ'লে এ সব অনর্থ কিছুই হ'ত না। বন্দেমাতরম্ যে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ কথা, এ আমাদের লোকের মাথাতেই ছিল না।"

মিঃ পি'র কথার সুর হঠাৎ বদলিয়া গেল। বলিলেন, "দেশের লোক যদি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধভাবই মনে পোষণ করে, তাতেই বা দোষ কি? দেশটা হ'ল তাদের নিজের। যদি বিদেশীদের তাড়িয়ে তারা স্বাধীন হবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, সে প্রশংসারই কথা।"

বেচারী মিসেস্ এই কথা শুনিয়া ভারী ভীত হইয়া পড়িলেন, পাছে আমি তাঁহার কথার ফাঁদে পড়িয়া যাই। তিনি আমাকে সতর্ক করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আমার স্বামী তামাসা করছেন।"

মিঃ পি একটু অবজ্ঞার সুরে কহিলেন, "তামাসা কেন, আমি ত সত্যই মনে করি, এরা যদি স্বাধীন হ'তে পারে ত হোক। তবে কথা হচ্ছে এই যে, তোমাদের এক কড়ার সামর্থ্য নেই। ঘরে একটা অস্ত্র রাখবার পর্য্যন্ত অধিকার নেই, আর দু' একটা বোমা ছুঁড়ে দেশ-উদ্ধার করতে চাও তোমরা, তা ত আর হ'তে পারে না। যদি সত্য লড়তে পার ত লড়, তাতে কারও কিছু বলবার নাই। কৃতকার্য্যতাতে পাপস্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু এরূপ গুপ্তহত্যার উপদ্রব নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা (Silliness)।"

আমি বলিলাম, "আপনি বলছেন নির্ব্বুদ্ধিতা—কেন না, তাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নাই—কিন্তু আমার মতে তারা নির্ব্বোধ, কেন না, এরূপ অধর্ম্ম আচরণকে তারা দেশমুক্তির উপায় স্বরূপ মনে করছে। কিন্তু আমি ত আগেই বলেছি, খুন-জখম ত আমাদের দেশের idea নয়, এটা হচ্ছে আপনাদের দেশের আদর্শ। দেখছেন ত, যারা এ সব কাযে লিপ্ত, তারা সকলেই প্রায় ছেলে-ছোকরা। আলিপুরের বিচারাধীনে ১০/১৫ বছরের ছেলে পর্য্যন্ত আছে। এ রকম বাচ্ছাদের কাছ থেকে দূরদর্শিতা বা বিবেচনা প্রত্যাশা করা যায় না। দেশমঙ্গলের ইচ্ছা ভূতের মত তাদের পেয়ে বসেছে। এই উত্তেজনার আবেগে তারা কি করছে বা না করছে, তা নিজেই তারা জানে না।"

মিঃ। কিন্তু ছেলেরা যে শুধু উপলক্ষ মাত্র। এখানে বুড়োলোকেই ত তাদের উত্তেজিত ক'রে তুলছে। আমি যদি গভর্ণমেণ্ট হতুম, তা হ'লে এ দেশের ধরণেই এ দেশের বিচার করতুম। অর্থাৎ বিচারের কোন আড়ম্বর না ক'রে যেখানেই sedition-এর সন্দেহ, সেইখানেই লটকে দেবার হুকুম চালাতুম। যেমন এ দেশে আগে মুসলমান সম্রাটরা করতেন।

কথাটা অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি ইতঃপূর্ব্বেই বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। চলিতে চলিতে বলিলাম, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনি সম্রাট নন। তবে আপনি রাজা হ'লে আপনার রাজ্য যে স্থায়ী হ'ত না, এটা ধ্রুব নিশ্চয়। অত্যাচারবশতঃই মুসলমান-রাজত্ব লোপ পেয়েছে।"

আশা ছিল, এ কথার পর তিনি আর কিছু বলিবেন না। কিন্তু তাঁহার ঘাড়েও তখন ভূত চাপিয়াছিল। আত্মসংবরণে তিনি তখন সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাকে গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার সেই স্বল্প সময়টুকুর একটি মুহূর্ত্তও অপব্যয় না করিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, "তা কেন? আমি চূড়ান্ত শাস্তির বিধানে চূড়ান্তভাবে সমস্ত crime-এর উচ্ছেদসাধন করতুম।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু পৃথিবী তাতে স্বর্গ হয়ে উঠতো মনে হয় না। বরঞ্চ মানুষের আর্ত্তনাদ নরকের ভীষণতাকেও ছাপিয়ে উঠতো। সে যাই হোক, গভর্ণমেণ্ট যদি আপনার উপদিষ্ট নীতি অনুসারে চলেন, আমিও তাতে আপত্তি দেখি না। আমরা অযোগ্য হ'লে আমাদের নিধনই শ্রেয়ঃ। যোগ্যের রক্ষাই জগতে প্রার্থনীয়।"

কোচম্যান গাড়ী চালাইয়া দিল। আমার কথার উত্তরে তিনি যদি আরও কিছু বলিয়া থাকেন, তাহা আর শুনিতে পাইলাম না।

ইহার পর তাঁহাদের সহিত আমি আর কোন সম্পর্ক রাখি নাই।

মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক ১৩৩২

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ

নাটোরের মহারাজ দৈব-দুর্ঘটনায় অসময়ে ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা একান্তই হৃদয়-বিদারক।

তাঁহাকে আমি বহুদিন হইতেই জানি। তিনি আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি বঙ্গ-বিভাগের সময়। আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা মাত্রকেই প্রায় কারণে অকারণে গভর্ণমেণ্টের ভয়ে ভীত হইতে দেখা যায়। ইচ্ছা থাকিলেও দেশমঙ্গলজনক কোন কার্য্য প্রকাশ্যভাবে করিতে অনেকেই পশ্চাৎপদ হন। কিন্তু মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টের সহিত এই বিরোধের দিনেও যেরূপ নির্ভীক চিত্তে জাতীয়তার পতাকা হস্তে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে কে না মুগ্ধ হইয়াছিল? তিনি সেবার নাটোরে কনফারেন্স আহ্বান করিয়া প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকতার পরিচয়

দিয়াছিলেন, এবং যেরূপ ভাবে সেখানে অতিথি-সৎকার প্রভৃতি করিয়াছিলেন, তাহা এখনো প্রবাদ কথার মত তাঁহার যশ ঘোষণা করিতেছে।

কিন্তু তখনও তাঁহার অন্তরের মানুষটিকে আমি ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধবা-শিল্পাশ্রমের সেক্রেটারির কার্য্যভার আমাদের অনুরোধে যখন তিনি গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিবার অবসর ঘটে। পূর্ব্বে বিধবা-আশ্রমটি কলিকাতার নলিনী সরকার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান বালিগঞ্জস্থিত আশ্রমটির ভিত্তিপত্তন মহারাজই করেন। এই সময়ে কার্য্য উপলক্ষে তিনি সদা-সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী আসিতেন। কাযের কথার সঙ্গে যে বাজে কথাও বিস্তর হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। কথাবার্ত্তা তাঁহার অতি সরস ছিল। আমি চিরদিন সাহিত্যসেবা করিয়া আসিতেছি, সুতরাং তাঁহাকে এরূপ সাহিত্যরসিক দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। তিনি তাঁহার জীবনের অনেক ছোট ছোট গল্প করিতেন। তাঁহার গল্প তন্ময় চিত্তে শুনিতে শুনিতে প্রায়ই আমি তাঁহাকে বলিতাম, "আপনার জীবন-কাহিনী ভারতীর জন্য লিখুন না!"

একদিন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "জীবন-কাহিনী না মর্ম্মবাণী?"

"সে ত আরও ভাল কথা।" আমার এ কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, "সে বাণী ত শুধুই প্রিয়-কাহিনী নয়।"

"প্রিয় হ'ক, অপ্রিয় হ'ক, আপনার প্রাণের কথা আমাদের ভালই লাগ্‌বে।"

"তথাস্তু, মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য।" এই বলিয়া তখনকার মত তিনি আমাকে নিরস্ত করিলেন। তিনি আমাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। আমি যদিও তাঁহাকে "মহারাজ" বলিয়াই সম্বোধন করিতাম, কিন্তু তাহা দূরত্ব-বোধক ভাব নহে, প্রিয় ভাবেই।

ইহার কিছুদিন পরে দেখিলাম, সত্যই 'মর্ম্মবাণী' সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

সেকালে আমাদের দেশের উচ্চবংশীয়গণ সৌজন্য ও বিনয়তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আজকাল নব-সভ্যতার আড়ম্বরে সেই অভিজাত সৌজন্য শিষ্টাচার অনেকটা লোপ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু নাটোরবংশ এই সুনাম বরাবরই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এমন কি নাটোর-অন্তঃপুরেও ইহার প্রভাব প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

নাটোরের মহারাণী গিরিবালা দেবী যেন সারল্যশীলতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। তাঁহার শান্ত সুমিষ্ট শিষ্টাচারে মন কি স্নিগ্ধ প্রীতিতে ভরিয়া উঠে!

রাণী ভবানীর বংশধর নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ আভিজাত্য গুণে আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা তিনি মৃত্যুতেও দেখাইয়া গিয়াছেন। যে ট্যাক্সি-চালকের অসাবধানতার জন্য তিনি এরূপ সাংঘাতিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন, শেষ বাণীতে তাহার প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়া যান! এই পুণ্যমাহাত্ম্যে তিনি ধন্য!

অধুনা তিন চারি বৎসর কাল যাবৎ তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। ইতিমধ্যে আমার মাথার উপর দিয়া কত বিপদ আপদ চলিয়া গেল, তিনি একবারও খোঁজ খবর লইলেন না, মাঝে মাঝে এই ভাবিয়া মনে মনে বেশ একটু ক্ষোভ জাগিয়া

উঠিত। কিন্তু আজ সে অভিমান অভিযোগের স্থান হৃদয়ে লেশমাত্র নাই। তিনি আর ইহজগতে নাই, এ জীবনে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না, তাঁহার প্রীতিভক্তিপূর্ণ মধুর বাক্য আর শুনিতে পাইব না,—বারবার এই কথাই মনে জাগিয়া হৃদয় শোকবেদনায় ভরিয়া উঠিতেছে।

বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, পৃথিবী শোকতাপের মধ্য দিয়াই চিরঞ্জয়ী, চিরঞ্জীবী রূপে বিরাজিত। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ পরলোকে গিয়াও তাঁহার পুত্র, পৌত্রের যশঃকীর্ত্তিতে ইহলোকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকুন, ইহাই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাঘ ১৩৩২

পুষ্পাঞ্জলি

(বড়দাদা)

পরম পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ, আমাদের বড়দাদা, অমর লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তিনিই 'ভারতী'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি বার বার প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা চারিটী ভাই, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কাব্যে, নানাভাবে, নানাছন্দে দেবেন্দ্র-প্রাসাদ আলোকিত ও ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে তিনজন সরিয়া পড়িলেন, এখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ গোবর্দ্ধনধারীর ন্যায় অঙ্গুলি অগ্রে সেই প্রাসাদ-সম্পদ রক্ষা করিতেছেন। ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করুন।

বড়দাদা শুধু আমাদেরই বড়দাদা ছিলেন না। বয়োঃজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ও দেব-গৌরব এই অমর কবি সমগ্র বাংলা দেশের,—শুধু বাংলা দেশের কেন,—সমগ্র ভারতেরই বড়দাদা ছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, তাঁহার পরিচিত বিদেশীজনও তাঁহাকে বড়দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই মহাপুরুষকে ভ্রাতৃরূপে পাইয়া আমি ধন্য। আমাদের ভাইবোনের প্রীতি ভক্তি স্নেহভালবাসা কি গভীর কি সুমধুর ছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। সে কথা যখন মনে মনে আলোচনা করি, তখন হৃদয় সৌভাগ্য আনন্দে উথলিয়া উঠে। বড়দাদার সঙ্গে আমার যে সদাসর্ব্বদা পত্রলেখালেখি চলিত, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাকে যখনই পত্র লিখিতাম, তিনি কিরূপ স্নেহমাখা উত্তর দিতেন, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠক দেখিবেন যে পত্রখানি তাঁহার বহুদিনের লেখা নয়।

ওঁ

শান্তিনিকেতন
২৬ কার্ত্তিক, ১৩৩০

স্নেহের বোন্‌টী আমার—

আমার হাতে এখনো কতকগুলি করণীয় কার্য্য অবশিষ্ট আছে। সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র চুকাইয়া ফেলিতে আমি নিতান্তই আগ্রহান্বিত। যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার এক্ষণে তুমি বই আর আমার কেহই নাই; সুতরাং তোমার এবারকার ভাই ফোঁটা ঠিক্ আমার সময়োপযোগী, আর সেইজন্য তাহা আমি অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত ললাটে বরণ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। দিব্যধামস্থিত আমাদের প্রাণের ভাই সতুর বিরচিত একটী ব্রহ্মসঙ্গীত এক্ষণে আমার জপমালা হইয়াছে। সে গীতটি এই :—

কেহ নাহি আর আমার—সব তুমি। লয়েছি স্মরণ তব চরণে দীননাথ। যদি পাই তোমার চরণ ছায়া নাহি ডরি করাল কালে।

হায় বিষ্ণু নাই—কে এটা গাইয়া আমাকে শুনাইবে।

তোমার নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী
বড় দাদা—

পুনশ্চ :— এই সঙ্গে আর একটী ব্রহ্মসঙ্গীত আমার মনে পড়িতেছে। সেটা আমার স্বহস্ত বিরচিত। সে গীতটী এই :—

গভীর বেদনা
অস্থির প্রাণ।
করহে আমারে
শান্তি দান॥
মোচন করহে পাপ তাপ।
ঘুচাও রোদন বিলাপ॥
যে যায় যা'ক্-যে থাকে থা'ক্—
শুনে চলি তোমার ডাক॥
কেবলি তোমার আশ্রয়ে
তরিব সাগর নির্ভয়ে॥
তুমি বিনা কর্ণধার
কেহ নাহি আর আমার॥"

ইহারই কয়েক মাস পূর্ব্বে মেজদাদার মৃত্যু হইয়াছিল, তাই মনে হয় তাঁহার শোকস্মৃতিতে তিনি এরূপ গভীর বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে এমনই প্রগাঢ় প্রেম বন্ধন ছিল যে উভয়ে যেন একাত্মস্বরূপ ছিলেন। অথচ সামাজিক সমস্যায় উভয়ের খুবই মতভেদ ছিল। বড়দা ছিলেন রক্ষণনীতিশীল, মেজদা ছিলেন পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ উন্নতি-পন্থী। এই বিষয় লইয়া দুইজনের মধ্যে রীতিমত তর্কাতর্কি চলিত। আর আমরা শ্রোতৃবর্গ সকৌতুকে তাহা শুনিয়া নিজ নিজ মত রচনা করিতাম। তবে অবশেষে সত্যের নিকট দ্বিজকে পরাস্ত মানিতে হইয়াছিল। কালচক্রের সহায়তায়

ক্রমশঃ বড়দাদাকে মেজদাদা অনেকটাই আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন।

উক্ত চিঠিখানি তিনি আমাকে স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার হাতের লেখা কি সুন্দর ছিল—প্রকৃতই তাহা মুক্তাক্ষর। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া পড়েন। তখনও তাঁহার মস্তিষ্কশক্তি অব্যাহত ছিল। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ছড়া-সম্বলিত যে সকল পত্রাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব রসমধুর। তিনি আমাদিগকে যে ভালবাসিবেন, স্নেহ করিবেন, তাহা কিছু বেশী কথা নহে। আমরা তাঁহার আপনার জন। কিন্তু পরকেও তিনি পর করিতে জানিতেন না। যে কেহ তাঁহার নিকটে আসিত, তাহাকেই তিনি সরল হৃদ্যতায় প্রীতি-পাশে বদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার শিষ্টাচার-সৌজন্যে কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। কেবল মানুষ নহে, বনের পশু-পক্ষী, জীব-জন্তুও তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহাকে আপন করিয়া লইত। তিনি বসিয়া থাকিতেন, আর কাক, শালিক, কাঠ-বেড়ালী প্রভৃতি, কেহ বা মস্তকে, কেহ বা শরীরে, কেহ বা পদপ্রান্তে খেলা করিয়া বেড়াইত।

প্রকৃতই তিনি ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন। দেখিতে সৌম্যসুন্দর, স্বভাবে সরল সহৃদয়, জ্ঞানে মনীষী পণ্ডিত এবং সাহিত্যে ভারতীর একটি বরপুত্র ছিলেন। দর্শন, গণিত, ও তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এরূপ রচনা বাংলা সাহিত্যে আর নাই—ইহা বোধ হয় বিশ্ব-মণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইবেন, তবে তৎপ্রণীত উক্ত কঠোর তত্ত্বসকল সর্ব্ব-সাধারণের মনোরঞ্জক পাঠ্য হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা দেশবিদিত। তাঁহার প্রতি কাব্যখানি এমন কি ক্ষুদ্র ছড়াগুলিও সাহিত্য-রসে ভরপূর। ছন্দ লালিত্য তাঁহার রচনার একটি প্রধান গুণ। ছন্দের উপর অপরিসীম প্রভুত্বে তিনি বাংলার আদি মৌলিক কবি।

ললিতকলাতেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একটা জ্ঞান ছিল। আমরা ছেলেবেলায় তাঁহাকে হারমোনিয়ম্ বাজাইতে দেখিয়াছি, বাঁশীও বাজাইতেন, কতপ্রকারের বাঁশী আসিয়া তাঁহার ঘরে জমিত তাহার ঠিক্ নাই। পরে একটির পর একটি করিয়া দান-খয়রাতে পুরাণোগুলি চলিয়া যাইত এবং নূতন বাঁশীতে তাহার স্থান পূর্ণ হইত। কেহ কিছু প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাহাকে না বলিতে পারিতেন না। এইরূপ দানশীলতার জন্য তাঁহার মাসোহারা প্রায় চার পাঁচ শত টাকা যাহা পাইতেন, সমস্তই ব্যয় হইয়া যাইত। তখনকার দিনে তিনি ছবিও আঁকিতেন। মনে পড়ে, আমাকে বসাইয়া মধ্যে মধ্যে ছবি আঁকিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ চর্চ্চা বরাবর রাখেন নাই। বোধ হয় তত্ত্ববিদ্যার আগ্রহে পরে এ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কত আর লিখিব? তাঁহার গুণের কথা লিখিয়া ফুরাণ যায় না, তিনি বিশ্বে যে স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ গুণ কীর্ত্তন অন্যের মুখেই শুনিবার অভিলাষ করি। হে স্বর্গীয় ভ্রাতঃ, তোমার গুণ, তোমার স্নেহ স্মরণ করিয়া আমি প্রীতিভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দানে তোমাকে বার বার প্রণাম করি। তুমি অমরলোক হইতেও স্নেহাশীষ প্রদান করিয়া আমাকে ধন্য কর।

ভারতী, মাঘ ১৩৩২

কৌতুকনাট্য

লজ্জাশীলা

ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ী। ফুলদার সূক্ষ্ম পায়নাপল বস্ত্র পরিহিতা এবং নানালঙ্কারে বিভূষিতা দুই যুবতী, সিদ্ধেশ্বরী এবং নিধিমণি অন্তঃপুরে নির্জ্জন বারান্দায় বিশ্রম্ভালাপে রত।

সিধু। এমনো কালামুখী!

নিধু। মাইরি! ছি ছি!

সিধু। ছিছি না ছিছি! লাজলজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে!

(কামিনীর প্রবেশ।)

কামিনী। কি হয়েছে মেজবৌ! কার কথা বলছিস?

সিধু। কামিনী যে! এতক্ষণে কি আসতে হয়? বোনঝির গায়ে-হলুদ সব করবি কর্ম্মাবি, না একেবার বেলা পুইয়ে এলি!

নিধু। ও ভেবেছে বেলায় এসে হলুদের পালাটা এড়াবে, সেটি হচ্ছে না। সোনার রং ফলিয়ে তুলবো লো, ছাড়ব না।

কামিনী। মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি বিকাল বেলাটা আর হলুদ দিসনে। নিজেরা ত রং ফুটিয়েছিস, সেই ভাল! চমৎকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ কর।

কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিবা হার পরেছ গলে,
দেখে তোমার মুখশশী মুনিজনার মন ভোলে।

সিধু। (সানন্দে নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) কামিনি, তোর কি মিষ্টি গলা ভাই। আমার সারাদিন শুনতে ইচ্ছা করে।

নিধু। বাহারটা তোরই যেন কিছু কম? অমন রঙ্গিন্ ফিতে কোথায় পেলি বল দেখি?

কামিনী। সে তোর ঠাকুরজামাইকে জিজ্ঞাসা করিস্। হুটিয়ে না লাটিয়ে বলে কোন ইংরাজ দোকান আছে, আমার ছাই অত নাম মনে থাকে না, সেখান থেকে এইসব জুটিয়ে জাটিয়ে আনেন। যাহ'ক, কার কথা তখন বলছিলি? বল্ না? লাজলজ্জার মাথা কে খেয়েছে?

নিধু। এই বোসেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল।

সিধু। হবে আর কি! যতদূর হবার তা হয়েছে! একেবারে মেম সেজে গাউন পরে এসেছে। মাগো আমরা ত সাতজম্মে পারিনে! দেখে অবধি গা কসকস্ করছে, তাই সে-ঘর থেকে উঠে এসেছি। (ঘাড় বাঁকাইয়া অধরৌষ্ঠের ভঙ্গী দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ)

নিধু। আর বল্লে কি হবে, কলিযুগ দেখছি উল্টে গেল!

কামিনী। সত্যি নাকি! বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে! ওমা কোথায় যাব মা!

সিধু। এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা—

কামিনী। গায়ে জামা—তা—

সিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার বিদিকিচ্ছি মোটা ঘাগরা। সাড়ি সে শুধু নাম রক্ষে! দেখে অবধি লজ্জায় ঘেন্নায় একেবারে মরে যাচ্ছি।

কামিনী। এই যে বল্লি গাউন!

সিধু। গাউন না সে, গাউনের বাবা! নিমন্ত্রণবাড়ীতে এসেছ নীলাম্বরী পর, নেট পর, পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, একবার দেখবি চল না।

কামিনী। তা ভাই জামাজোড়া পরেছে— তাতে আর এমনি কি দোষ। আমার স্বামী আমার জন্যে একটী ফরমাস দিয়েছেন।

নিধু। সত্যি নাকি! একদিন পরে আসিস দেখি, দেখব। আমিও ত তাই বলি সেটা আর এমনি কি লজ্জার কথা।

সিধু। তবে যা, তোরাও বিবি সাজগে, কুল উজ্জ্বল হয়ে যাক্। আহা কি রূপখানাই খুলেছে, কি মানান্‌টাই মানিয়েছে—মরে যাই আর কি!

নিধু। তা যদি বলিস্, তাকে কিন্তু মন্দ দেখাচ্ছে না ভাই।

সিধু। অমন ভালো দেখানোর কপালে আগুন। আহা কিবা রূপেরই শ্রী।

নিধু। তা ভাই, রূপটা তার মন্দ কি? সত্যি কথা বল্‌তে কি তাকে জামাজোড়ায় সেজেছেও ভাল।

সিধু। (সক্রোধে) কালামুখী, ধিকজীবনী, পোড়াকপাল তার রূপে! পোড়াকপাল তার সাজে!

কামিনী। অত রাগ করছিস কেন ভাই, জামাজোড়া পরলে একরকম বেশ ত মানায়! এই তুই যদি পরিস্ তোকে বড় সরেস দেখতে হয়।

সিধু। (আহ্লাদের হাসি হাসিয়া) তা ভাই উনিও ঐ কথা বলছিলেন যে আমাকে একদিন বিবি সাজিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। তবে কি জানিস, যাদের রং তেমন পরিষ্কার নয়—

কামিনী। তা বই কি? তোমার চেহারায় গাউন কেন, চীনে চোগাও খাটে, তাই বলে দেশশুদ্ধ জ্যাকেট পরলে কি সাজবে?

সিধু। (উথলিত গর্ব্বে) কামিনি, তুই এতদিন আসিসনি—তোর জন্যে এমন মন কেমন করত! চল্ ভাই, ঘরের ভিতর একবার রঙ্গখানা দেখবি চল্।

(তিনজনের মজলিস গৃহে প্রবেশ।)

সিধু। বলি ও শশীর বৌ! কত্তদিন এমন হোল!

বৌ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি হোল ঠাকুরঝি?

সিধু। ন্যাকা আর কি! যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না!

বৌ। (সভয়ে) তা জান্‌ব না কেন? কিন্তু সত্যি বলছি আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।

সিধু। আমরা যে তোকে বড় লাজুক মেয়ে বলে জানতুম, তোর মনে এই ছিল!

কামিনী। হায়! হায়! এমন কাজও তুই করলি!

বৌ। কেন আমি কি করেছি?

কামিনী। সর্ব্বনাশ লো, সর্ব্বনাশ! এতদিন মেয়েমানুষের মন চেনাই দায় ছিল, তুই যে অঙ্গ-চেনা পর্য্যন্ত দায় করে তুল্লি।

নিধু। (সিধুর গা টিপিয়া) বেশ বলেছে কামিনী।

(সকলের হাস্য।)

সিধু। বলি এমন পোষাক কবে ধরলি।

কামিনী। একেবারে যে বিবি লো!

বৌ। (সলজ্জে) কি করব ভাই, তিনি এ কাপড় না পর্‌লে ছাড়েন না যে।

সিধু। তা আরো কত হবে! এর পরে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে আর ঘোমটা পর্য্যন্ত উঠবে না।

বৌ। তা কি কর্‌ব ভাই, আমার শ্বাশুড়ী আমাকে ঘোমটা দিতে দেন না। বলেন —আমার মেয়ে নেই, তুমি আমার মেয়ের মত কাছে ব'স কথা কও, এই সব।

কামিনী। সত্যি নাকি লো!

নিধু। একেবারে লোক হাসালি, পদার্থ আর রইলো না কিছু তোতে!

সিধু। কেন আমরা কি আর কথা কইনে? সেদিন বাপের বাড়ি যেতে ঠাকরুণ বারণ করেছিলেন, আমি যে একটু সরে এসেই কত ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিলুম্—তাই বলে কি ঘোমটা খুল্‌তে গিয়েছিলুম না কাছে বসে বেহায়ার মতো গল্প করতে গিয়েছিলুম? সবাই ত তাই বলে ও-বাড়ীর মেজবৌয়ের লজ্জাটা বড় বেশী—।

সকলে! তা সত্যি, তা সত্যি!

বৌ। ছিঃ ঠাকুরঝি, তুমি শ্বাশুড়ীকে অমন করে বল্লে? তাতে তোমার লজ্জা হোল না!

সিধু। কি লজ্জাবতী গো, ঘোমটা খুলে মেম সাজতে লজ্জা হোল না আর যত লজ্জা ওনার এর বেলা। তোর মত যেদিন নির্লজ্জ বেহায়া হব, সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

বৌ। (স্বগত) বটে, জামা পরলেই যত মেম সাজা হয়। আর উনি যে মুখে এক রাশ রুজ পাউডার মেখেছেন তাতে কোন দোষ হোল না—দাঁড়াও না, জব্দ করছি। (প্রকাশ্যে) ঠাকুরঝি, অত রেগো না গো, লাল গাল আরো লাল হয়ে উঠবে। সত্যি সত্যি তোমার গালদুটো অত লাল দেখাচ্ছে কেন? পিঁপড়ে কামড়েছে নাকি?

সিধু। মরণ, পিঁপড়ে কামড়াবে কেন? আমার গালদুটো ভাই অমনি লালপানা, তোর ঠাকুরজামাই ত সর্ব্বদাই বলেন গাল নয়ত, যেন গোলাপফুল!

কামিনী। আহা আমাদের যদি ঐরকম হোত?

নিধু। গাল?

বৌ। না স্বামী?

কামিনী। ওলো দুইলো দুই,—যার গাল লাল তার স্বামী আপনা হতেই বশ, আর যার স্বামী বশ তার গাল—

সিধু। (সগর্ব্বে) তা সাধ যায় বই কি?

বৌ। (সিধুর নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে) তা ভাই মুখে তোর খড়িপানা ওকি লেগেছে? মুছিয়ে দেব।

সিধু। (স্বগতঃ) এই যা মজালে, সব দেখছি ফাঁস হয়ে যাবে। (তাড়াতাড়ি বৌয়ের

কানে কানে) চুপ কর। ও ভাই একরকম গুঁড়ো, মাখলে স্বামী বশ হয়, কাউকে বলিস্‌নে ; আমি তোকে এক কৌট পাঠিয়ে দেব এখন। আর তুই ভাই আমাকে একটা তোর জামার নমুনা পাঠিয়ে দিস্‌, বুঝলি? দেখিস ভুলিস্‌নে, মাথা খাস্‌।*

*(এই নক্সাটি ১২৯২ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এই অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। বাহিরে যাইতে হইলে শাড়ির সহিত একটি সুদর্শন জ্যাকেট এবং অন্তরাবরণ এখন আর লজ্জার কথা নহে। কিন্তু তখন যিনি দুঃসাহসী হইয়া উক্তরূপ সুরুচিসঙ্গত শোভন বেশভূষায় অঙ্গাবরণ প্রয়াসী হইতেন তাঁহাকে বিলক্ষণ হাস্যভাজন হইতে হইত।)

বৈজ্ঞানিক বর

(দৃশ্য : বাসর গৃহ, মসনদের উপর কন্যার পার্শ্বে গ্র্যাজুয়েট বর ;
নিকটে যুবতীগণ আসীন)

প্রথম যুবতী। (বরের প্রতি) বলি কিগো অমন ধারা চুপ করে বসে রইলে কেন? সেই অবধি বকাবকি করে মলুম, মুখে যে একটা রা নেই।

দ্বি। রা আর থাকবে কি ক'রে লো? ফুলির আমাদের যে চাঁদপানা সোনার মুখ, তা দেখেই অবাক হয়ে গেছে।

বর। কি বল্লেন, চাঁদপানা সোনার মুখ? (একটু হাসিয়া) আপনি যে অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ তুলনা করলেন! চাঁদপানা সোনার মুখ তো কই কোথাও পড়িনি। (চিন্তিতভাবে) বায়রণ, স্কট, সেলি, টেনিসন, কই কোথাও Moon-face আছে ব'লে ত মনে পড়ছে না। আর সোনার মুখ—Why that's absurd! Golden face—সোনার মুখ হয় না—তবে Golden hair—সোনার চুল হয় বটে।

তৃ। ওমা, কেমন কানা বর গা ; মেয়ের অমন সোনাপারা মুখ, তাও সোনা নয়, অমন কাল কুচকুচে চুল, তাও বলে সোনা রঙের! একি কথা গা! এত রূপও কি পসন্দ হোল না না কি?

প্র। না লো না, বর তা বলছে না, বরের তোদের ইংরাজী পসন্দ, বর সোনা মুখ চায় না, সোনা চুল চায়।

চ। ওমা সত্যি নাকি? হ্যাঁ গা, তবে কি আমাদের বুড়ঝি হারার মাকে এনে তোমার পাশে বসিয়ে দেব নাকি? ফুলির আমাদের কাল চুল বলে কি মনে ধরলো না?

বর। (একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) মনে ধরা—পসন্দ হওয়া! যার সঙ্গে এক মিনিট বসে কোর্টসিপ করতে পাইনি—তাকে মনে ধরেছে বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। ইংরাজদের কিন্তু এসব নিয়ম বড় ভাল।

প্র। কেন ইংরাজদের কোর্টসিপের বিয়েতেও ত ঝগড়াঝাঁটি, ছাড়াছাড়ির অভাব দেখিনে।

বর। সে কি জানেন,—সে ভালর মন্দ। যাক্, আপনারা প্রথমে আমাকে যে প্রশ্ন করছিলেন, যে আমি চুপ করে আছি কেন? তার উত্তর এই যে, পরশু দিন আমার একটা এন্‌গেজমেন্ট আছে, টাউন হলে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটা লেকচার দিতে হবে, আমি সেই বিষয় ভাবছিলুম।

প্র। তা কি লেকচারটা দেবে শুনি—আমাদের কাছে একটা নমুনা দিয়ে যাও।

বর। তা উচিত কথা ছাড়া আর কি বলব? দেখুন দেখি—দশ বৎসরের বালিকা, আজ তার বিবাহ, কাল সে বিধবা! কাল হ'তে একাদশীর দিনে সে এক ফোঁটা জলও মুখে ঠেকাতে পারবে না, কোনদিন সাধ করে একখানা রংকরা কাপড়ও পরতে পারবে না, আর বড় হয়ে সে যদি কোন সুপুরুষের loveএ পড়ে গেল—যেটা হওয়া খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক—তাহলে তাদের দুজনের মিলনের পর্য্যন্ত আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা থাকবে না। দেখুন দিকি, এই শেষ ব্যাপারটী কতদূর শোচনীয়। আমার স্ত্রীর আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলে আমার উইলে আমি স্পষ্টাক্ষরে এই কথাগুলি লিখে যাব যে যদি আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করেন তবেই আমার ধনের অধিকারিণী হবেন, তা না হলে এক কানাকড়িও পাবেন না।

প্র। তা যদি বল তবে তোমার স্ত্রী দোরে দোরে বরঞ্চ ভিক্ষা মেগে বেড়াবে।

তৃ। নে ভাই নে, তোদের পণ্ডিতে পণ্ডিতে এখন ব্যাখ্যা রাখ। বর, একটি গান বলত ভাই।

কন্যার মাতার প্রবেশ।

মাতা। এস বাছা খাওসে। তোরা এখন ঠাট্টা রাখ।

(বরকে লইয়া আহারের স্থানে গমন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আহারান্তে বর আবার মসনদে উপবিষ্ট।

তৃ। নাও ভাই বর, এবার একটি গান শোনাও।

বর। আমি আপনাদের অজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এইমাত্র আহার করে এলুম, এরই মধ্যে গান! স্বাস্থ্যের প্রতি কি আপনাদের একটুও দৃষ্টি নেই?

চ। এ বর ত আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ করলে। মেজদিদি, তোরা সবাই মিলে দুটো ঠাট্টা তামাসার কথা ক।

দ্বি। (তৃতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) বলি একটা পান সেজে নিয়ে আয়—ঠাট্টাও করতে ছাই শিখলিনে।

বর। জীবনটা কি ঠাট্টা তামাসার? যে সারাদিন ঠাট্টা তামাসা ক'রে কাটাতে হবে? যতদিন আমাদের দেশে serious scientific spirit—

(তৃতীয়ার পান হস্তে প্রবেশ ও বরের হস্তে পান প্রদান করিয়া)।

তৃ। নাও, কথা কইতে কইতে মুখ শুকিয়ে এসেছে, পানটা খেয়ে কথা কও।

(পান খুলিয়া পানের দিকে বরের এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ)।

প্র। (সভয়ে দ্বিতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) এই বুঝি ধরে ফেল্লে! (প্রকাশ্যে) কি আবার দেখছ, পানটা খেয়ে ফেল না।

বর। (মুখ তুলিয়া) এমন কিছু নয়,—এই আগেই যা বলছিলুম, বাঙ্গালীদের যতদিন discovery করবার spirit না হবে, ততদিন কোন মতেই দেশের দুর্দ্দশা যাবে না। আমি যে দিন থেকে science পড়তে আরম্ভ করেছি, সেই দিন থেকে আমার ঐ দিকে লক্ষ্য।

প্র। তা পানের ভিতর আর কি discovery করবে, ওটা খেয়ে ফেলো।

বর। (পান মুখে দিয়া) কিসে কখন কি discovery করা যায় তার কি ঠিক আছে? তাই জন্যই ত যা কিছু হাতে পাই আমি পরীক্ষা করে দেখি। এই Dr. Koch জলের ভিতর সেদিন কলেরা জার্ম আবিষ্কার করেছেন, আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি শুকনো জিনিসের মধ্যেও সে জার্ম আছে—তাহলে ইণ্ডিয়ার কাছে তৎক্ষণাৎ ইয়োরোপের মাথা হেঁট হয়ে যায়!

প্র। (হাসিয়া) তবে দেখছি—এবার তোমা হতেই ভারতটা উদ্ধার হবে।

বর। (পান লোস্তা বোধে—মুখ বিকৃত করিয়া) একি সত্যিই এতে জার্ম্মটার্ম্ম কিছু আছে নাকি?—এমন ঠেকছে কেন?

(বরের থুথু করিয়া পান নিক্ষেপ। যুবতীগণের সকলে মিলিয়া হাস্য)

বর। আপনারা একটু চুপ করুন, এ হাসির সময় নয়। গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। একি হোল! চারিদিক যে অন্ধকার—মাথার ভিতর যে বোঁ বোঁ করে উঠ্‌লো। ভগবান, এ কি করলে! মৃত্যুর জন্যেই কি আজ বিবাহশয্যায় বসিয়েছিলে? প্রেয়সি—তোমার ও চাঁদমুখ—সোনার মুখ আর কখনো দেখতে পাব না,— জন্মের শোধ যে আজ শেষ দেখা। —প্রাণেশ্বরি, তুমি যে আজ বিধবা হলে। শেষ দিনে একটি এই অনুরোধ, মাথা খাও, আমার এই অন্তিম ভিক্ষাটি স্মরণ রেখো, প্রেয়সি, ইংরাজদের মত কখনো বিধবা-বিবাহ করো না, আমি চল্লাম কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য একাদশীর প্রথাটা তুমি পালন করবে —এই আশা হৃদয়ে নিয়ে চল্লাম।

প্র। (শশব্যস্তে) এ কি, তোমার আবার একি হোল?

দ্বি। একি! নাটক করে যে?

তৃ। ওমা এমন বেরসিক বরও ত কোথাও দেখিনি—পানে একটু নুন দিয়েছি—তা এত হেঙ্গাম!

বর। নুন দিয়েছেন কখনই না। আমি জানি এ কলেরা জার্ম, আর আমিই তা আবিষ্কার করেছি। আমি এখন মরলাম বটে, কিন্তু আমার নাম চিরকালই পৃথিবীতে জেগে থাকবে।

দ্বি। এ কি তোমার মতিচ্ছন্ন ধরলো যে—নুন নয়তো আবার কি?

বর। (মুখ নাড়িয়া দেখিয়া স্বগতঃ) তাই ত নুনই ত বটে, আমাকে দেখছি বড়ই মাটি করলে। কিন্তু আমি কি না মাটি হবার ছেলে—রোসো না। (প্রকাশ্যে) ঠাট্টা। আপনাদের ইয়ে—এই এক বিন্দুও যদি বিজ্ঞানজ্ঞান থাকত তাহ'লে কি এরূপ ঠাট্টা করতে পারতেন? কি হতে যে কখন কি হয় তা যাদের জ্ঞান নেই—

প্র। তা সত্যি কথা, তোমাকে নিয়ে যখন ধান্ ভান্‌তে আরম্ভ করি—তখন যে এমন শিবের গীত গাইতে হবে তা কি জানি?

বর। সেটা আমার দোষ, না আপনাদের? সেই অবধি Science Philosophy বুঝিয়েও আপনাদের নীতি-বিরুদ্ধ ঠাট্টার হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। Oh! Byron, how truly thou said,—'Philosophy and science I have essay'd but they availed not'! সমাজের মূল উচ্ছেদ ছাড়া এর প্রতিকার আর কি আছে?

প্র। তা হলে বিধবার একাদশীটা পর্য্যন্ত উঠে যায় সেটা যেন মনে থাকে।

(সকলের হাস্য)

তৃ। না, আমাদের বর রসিক বটে, অনেক বিয়ে দেখেছি—কিন্তু এমন নাটক কেউ করেনি। ও ফুলি, দে তোর বরের গলায় একগাছ ফুলের মালা দিয়ে দে।

দ্বি। হ্যাঁ এত কান্নাকাটির পর মধুর মিলন হোক্, দুই প্রাণে মিশে এক হয়ে যাক্ —আমরা দেখি?

বর (স্বগত) আমাকে বড় মাটিটাই করেছে—এর শোধ এইবার তুলব। (প্রকাশ্যে) দেখুন — Science না জানার কত দোষ, তা হলে আর আপনি এমন absurd কথাটা বলতে পারতেন না। একজন living being কি আর একজন living being-এর সঙ্গে মিশে যেতে পারে? প্রকৃতপক্ষে ও কথা matter-এর molecules সম্বন্ধেই খাটে, কেন না cohesion, matter-এর একটা property, একজন ইংরাজ মেয়ে হলে কখনো এরূপ বলতেন না।—What a pity!

প্র। কেন—ইংরাজ মেয়ে ছাড়া অনেক ইংরেজ পুরুষও ত কবিতায় এরূপ কথার ছড়াছড়ি করে গেছেন।

বর। সে আলাদা কথা। কিন্তু ও কথাও তার বেশীদিন চলছে না। রেনা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন অল্পদিনের মধ্যে বিজ্ঞান ছাড়া কবিতা টবিতা কিছু থাক্‌বে না।

প্র। তখন না হয় বলব না?

বর। উঁহু, এখনও বলতে পারেন না। ওতে অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ পড়ে। একটা গ্রহের যখন Centrifugal force কমে যায় তখন সূর্য্য Centripetal force দ্বারা তাকে টেনে নিয়ে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে—কিন্তু মানুষ ত আর একটা গ্রহ নয়?

দ্বি। কোথাকার হতভম্বা বর,—এসব আবার কি বকে?

তৃ। একবার সোজা না করে দিলে চল্লো না দেখছি—

প্র। আমরা জানি—হাতের জোরে—পিঠের জোর কমিয়ে ফেল্‌তে পারলেই মানুষ-গরুদের নাকে দড়ি দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনা যায়—পরীক্ষা দেখবে—

(বরের পৃষ্ঠে চারিদিক হইতে মুষ্টি পতন)

বর। একি ভয়ানক! দোহাই আপনাদের—এসব ছেড়ে আপনারা একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা করুন, যদি বিজ্ঞানও না পড়েন—দর্শনগুলো,—গুলো না হ'ক—অন্ততঃ কাণ্টের দর্শনখানা জানা থাকলে এ সব nasty ব্যাপার হতে কেবল আমি না—সমাজ পরিত্রাণ পায়।

প্র। বটে, তা কান্-টেপার দর্শন আমরা বেশ জানি,—বিদ্যাটা দেখিয়ে দেব?

বর। (কানমলা খাইয়া) By Jove! রক্ষা করুন—জানলে কোন হতভাগা বিয়ে করতে আসে। দোহাই তোমাদের, যা হবার হয়েছে—এমন কর্ম্ম আর কখনো করব না।

দ্বি। বল করবে না—?

বর। কক্ষণো না, জন্মে না, নেহাত গণ্ডমূর্খ না হলে সে বিয়ে করতে আসে—রাম রাম!

প্র। তা বই কি, কিন্তু হ্যাদে গণ্ডমূর্খ, বিয়েটা একবার করলে যে আর ফেরে না।

বর। গণ্ডমূর্খ! শেষে এও অদৃষ্টে ছিল!

চতুর্থ। না না গণ্ডমূর্খ না— পণ্ডিতমূর্খ। ও ফুলি, তোর পণ্ডিতমূর্খ বরকে একবার ফুলের মালাটা পরিয়ে দে, তোর বুদ্ধির একটু ভাগ পাক্।

(কনের হাতে মালা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া বরের গলে মালা প্রদান)

বর। (ক্রুদ্ধভাবে) মশায়রা মাপ করবেন—বিয়েটা করে জীবনের মধ্যে একটা মূর্খমি করে ফেলেছি, তাই বলে আর বেশী করতে পারছিনে।

(মালা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ)

দ্বি। কেন মালাতে আবার কি দোষ হোল? ওতে আবার সাপ বিছে আছে নাকি?

বর। কি আশ্চর্য্য! বিজ্ঞানের এই সামান্য সত্যটাও কি আপনাদের বোঝাতে হবে? ফুল থেকে Carbonic acid বলে রাতে একরকম গ্যাস বার হয়—সে সাপ বিছে হতেও ভয়ানক। রাতে ফুল ঘরে রাখাই উচিত নয়।

দ্বি। সে আবার কি জিনিস?

বর। By Heavens! সে একরকম মন্দ বাতাস।

তৃ। মন্দ বাতাস! ভূত নাকি?

বর। তা ভূত বলতে পারেন—বাতাস পঞ্চভূতের এক ভূত।

প্র। তা তোমাকে দেখছি আগে থাকতে পঞ্চভূতেই পেয়ে বসেছে—একভূতে আর কিছু করতে পারবে না—মালাটা এখন পরে ফেল।

বর। সে কথা আর বলতে! এখন ভূতগুলো ছাড়াতে না পারলে ত আর প্রাণ বাঁচে না। আগে জানা ছিল, অন্ধকারেই ভূতের প্রাদুর্ভাব কিন্তু এখন দেখছি আলোতেই ভূতের দৌরাত্ম্য বেশী। আলোটা নিবিয়ে দিলেই এ ভূত ছেড়ে যাবে। (উঠিয়া দীপ নির্ব্বাপণ)

প্র। আমাদের ভূত বললে? ভারী ত অসভ্য!

যুবতীগণ। (গোল করিয়া) যা হ'ক এতক্ষণে একটা কীর্ত্তি করেছে—পাশ দিয়েছে বটে।

(হাসিতে হাসিতে সকলের পলায়ন)

ভারতী, ১২৯২

লোহার সিন্দুক

প্রথমা। তারপর?

দ্বি। নেহাত শুনবি? সে কিন্তু অনেক করে বারণ করে দিয়েছে।

প্র। তা বারণ করলেই বা, আমার কাছে বলবি বই ত নয়, আমি ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছিনে।

দ্বি। তা জানি বলেই ত তোকে বলছি—নইলে কি বলতুম, তা ভাই দেখিস্ যেন প্রকাশ না হয়।

প্র। মরণ— তুই কি ক্ষেপেছিস— আমার কাছে—

দ্বি। তবে শোন, এই সেদিন— কিন্তু তাকে কড়ারটা দিলুম, দেখিস—

প্র। এমন ক্ষেপাও ত কোথায় দেখিনি, আমাকে কথা বলতে ডরাস্? এই সেদিন দীনুর মা আমাকে বল্লে তার স্বামী মদ খেয়ে ঘরে এসেছিল— সে কথা কি আমি তোদের কাউকে বলেছি? আমার মত লোহার সিন্দুক কাউকে পাবিনে।

দ্বি। তা সত্যি— তবে শোন—।

ভারতী, ১২৯৩

ষষ্ঠীর বাছা

(নবীন ও নবীনের কাকা।)

কাকা। আজকাল তোমার কেমন পড়াশুনা হচ্ছে নবীন?

নবীন। খুবই ভাল।

কাকা। তোমার মতে ত বরাবরই খুবই ভাল, সে কথা কে জিজ্ঞাসা করছে?

নবীন। তবে কি জিজ্ঞাসা করছেন?

কাকা। মাষ্টার তোমার কি বলেন? তিনি কি সন্তুষ্ট?

নবীন। আজ্ঞে খুবই।

কাকা। সবই খুব। Superlative ছাড়া দেখছি তোমার কথা নেই।

নবীন। আজ্ঞে ঠিক উল্‌টো, Superlative হলে হোত খুবতম, আমি Positiveএর একটুও এদিক ওদিক করিনি।

কাকা। বটে, একেবারে গোল্লায় গেছ। কাকার সঙ্গে এয়ারকি? খুবতম একবার পেতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?

(নবীনের মাতার প্রবেশ।)

মা। কি হয়েছে ঠাকুরপো? মার-মূর্ত্তি যে?

কাকা। কি আর হবে, তোমারি কারখানা—ছেলেটাকে একেবারে গোল্লায় দিয়েছ?

মা। তোমার ঐ এক কথা! কেন গা, ওর আমার পড়াশুনার যেমন মন— তোমাদের তেমন হলে বাঁচতুম। রাতদিন বই হাতে করেই বাছা আছে।

কাকা। আর কারো নজরে তো তা পড়ে না।

মা। হ্যাদ্ দেখো ঠাকুরপো— নজর নজর কোরো না—তাহলে কালই আমি বাপের বাড়ী চলে যাব। আমি কি একলা ওর পড়াশুনার কথা বলি— কেন মাষ্টার কি বলেছে শোননি কি? হ্যাঁ বাবা, বল্ তো রে আর একবার— তোর কাকাকে একবার শুনিয়ে দে ত রে।

নবীন। তা উনি শোনেন কই?

মা। না শুনবে না! বল বাবা, তুই বল দেখি — কেমন শুনবে না দেখি?

কাকা। আমি ত সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলুম?

মা। বেশ করছিলে —ভাল করছিলে— তা করবে না কেন? বল্ বাবা আমার, বল্ তুই।

নবীন। আমি ত আগেই তা বলতে গিয়েছিলুম।

মা। তা ত বেশই করেছিলি— আবার বল্ মানিক আমার।

নবীন। সেদিন আমি স্কুলে একটা রচনা লিখেছিলুম—

মা। শোন ঠাকুরপো, বাবা আমার একটা ল -ল লচনা—

নবীন। অ্যাঃ, থাম না একটু—

মা। না বাবা, —হ্যাঁ হ্যাঁ থামছি বাবা— তারপর বল্, বল্ ধন তুই।

কাকা। তুমি দেখছি বলতে দেবে না।

মা। সে কি কথা? কেন দেব না? বল্ যাদু, মাষ্টার লচনা দেখে—

কাকা। কি বল্লে বলে যাও।

মা। হ্যাঁ বাবা, বলে যা।

নবীন। তুমি একটু না থামলে আমি বলব না।

মা। বলবি বই কি, বাবা আমার বল্, বাবারে— আমি আর কিছু বলব না।

নবীন। বল্লেন—"সব ছেলেরা যদি তোমার মত হ'ত"—

মা। শুনলে ঠাকুরপো— যদি আমার বাবার মত হোত—

কাকা। আঃ, ওকে বলতে দাও না।

মা। বল্ বাবা বল্, তাহ'লে কি হোত সোনাধন?

কাকা। (রাগিয়া) হবে আর কি? তাহলে মাষ্টারের অন্ন জুটত না।

নবীন। ঠিক কথা কাকা, মাষ্টারও তাই বলছিলেন। বলছিলেন— "সব ছেলেরা যদি তোমার মত হ'ত, তাহলে কালই স্কুল উঠিয়ে দিতুম।"

মা। শোন ঠাকুরপো, শোন্— চাঁদের আমার—

কাকা। বটে!

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার মত যদি সবাই শেখে— তাহলে শেখাবার জন্য নূতন কিছু ত আর থাকে না।

মা। তবু যে তোর কাকার মন ওঠে না— বাবা! বাছারে আমার, ষাটের বাছা — তুই কি আমার বাঁচবি রে!

ভারতী, ১২৯৩

চাক্ষুষ প্রমাণ

(বারান্দায় দণ্ডায়মান শ্যামবাবু মাষ্টার প্রাণকালীবাবুকে রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া)

শ্যাম। আরে এই যে মাষ্টারবাবু! এত সকালে এত চোটপাট যাওয়া হচ্ছে কোথা?

মাষ্টার। (উপরে চাহিয়া) এই যে শ্যামবাবু! আর মশায় আমাদের সকাল বিকাল! চারটি অন্নের জন্য আমাদের কি না করতে হয়!

শ্যাম। সে সব হবে এখন, দেখাই যদি হোল একবার এইদিক দিয়ে হয়ে যান।

মাষ্টার। না মশায়, সময় বিন্দুমাত্র নেই। আপনাদের কি, আপনারা পায়ের উপর পা রেখে দিব্যি আরামে বসে থাকেন, সময়ের মূল্য ত আপনারা জানেন না।— তা যাচ্ছি, — এক্ষণি কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে।

শ্যাম। একমিনিটের মধ্যেই যাবেন এখন।

(প্রাণকালীর গৃহে প্রবেশ, দুজনে উপবেশন।)

মাষ্টার। দেখবেন মশায়, শীঘ্র ছেড়ে দেবেন, বোঝেনই ত, পরের চাকরী, এক ঘণ্টা দেরী হলে সর্ব্বনাশ! একবার একজন বন্ধুর অনুরোধে পড়ে একহপ্তা— শুধু একটি হপ্তা মশায় কামাই হয়েছিল— তা সে যে লাঞ্ছনা, কি আর বলব!

শ্যাম। উঃ তাই ত, ওরা সব পাষণ্ড মশায়, ওরা সব পারে! বুঝেছি, আপনাকে গলায়—

মাষ্টার। (তাড়াতাড়ি) না না, তা নয়— এই—

শ্যাম। তা যেন নাই হোল— মাইনেটা যে কেটে নিয়েছিল তার ত সন্দেহ নেই, গরীবের প্রতি কি অত্যাচার— তা নিক্‌গে— কিছু মনে করবেন না;— আমি—

মাষ্টার। আপনি ত আমাদের মা বাপ আছেনই, কিন্তু মাইনে কাটাও নয়। মাণিকের মা স্পষ্ট বলে পাঠালেন যে অমন করলে এবার কর্ত্তাকে বলে দেবেন, আর মাণিক বল্লে ওরূপ হলে সে স্বতন্ত্র মাষ্টারের বন্দোবস্ত করবে।

শ্যাম। হাহাঃ মাষ্টারমশায়, আপনি বলেই ওরকম হয়েছিল! আমি হলে—

মাষ্টার। কি করতেন?

শ্যাম। কি করতুম! বড় মানুষের ছেলেকে যে রকম করে পড়াতে হয় তাই করতুম।

মাষ্টার। সে কি কোনরকম ফন্দী আছে নাকি? আমাকে শিখিয়ে দিন্ দেখি।

শ্যাম। সে অতি সহজ ফন্দী। পড়াতে গিয়ে একবারেই পড়াতে হয়, তাহলেই সব চুকে যায়, বিনা আয়াসে মাইনেটি আদায় হয়, আর ঘাড় ভেঙ্গে দু'পাত্র টানাও যায়!

মাষ্টার। তবে বলব মশায়? সে উদ্যোগটাও হয়ে এসেছে।

শ্যাম। সত্যি নাকি?

মাষ্টার। সত্যি না ত কি, যে ছেলে টেরি বাঁকিয়ে চুল আঁচড়াতে শিখেছে, শীঘ্রই তার গোল্লায় যাবার লক্ষণ।

শ্যাম। বটে! টেরি বাঁকাতে ধরেছে! তবেই হয়েছে। আমাদের হরি অমন ভাল ছেলে ছিল, যেদিন দেখলাম চুল ফিরিয়েছে, বলব কি মশায়, তার পরদিন থেকে সে স্কুল ছেড়ে দিলে!

মাষ্টার। এরও সে উদ্যোগ হয়ে এসেছে, কিন্তু বড় মানুষের কথা বলতে ভয় করে, যদি প্রকাশ—

শ্যাম। পাগল নাকি! ওসব ভাবতে হবে না, বলুন দেখি ব্যাপারটা কি?

মাষ্টার। (চুপে চুপে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ্যে) মাণিক বলছিল তার বাপকে বলে একদিন ষ্টার থিয়েটার যাবে, চৈতন্যলীলা তার ভারী দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।

শ্যাম। ষ্টার থিয়েটার! হাহাঃ, আমি ত বলেইছিলাম!

মাষ্টার। কিন্তু একটা কথা,— তার বাপ যে যেতে টাকা দেবে তা আমার মনে হয় না, তিনি তেমন পাত্রই নন।

শ্যাম। তা বাপে না টাকা দিলে কি আর অন্য উপায় নেই? আমি ছেলেবেলা যখন টাকা চেয়ে না পেতুম তখন মা ঘুমোলে আস্তে আস্তে চাবিটি নিতুম। তা তার যখন যেতে ইচ্ছা হয়েছে, সে অবশ্যই চুরি করেছে।

মাষ্টার (আশ্চর্য্যভাবে) সত্যি নাকি? তাই বটে! একদিন আমি পড়াতে গেছি, দেখি সে তার বাপের ডেক্সর কাছে বসে আছে ; আমাকে দেখে তখন নিজের ডেক্সের কাছে এল!

শ্যাম। দেখলেন! সে নিশ্চয়ই ডেক্স ভাঙ্ছিল, আপনাকে দেখে স'রে পড়লো, সন্দেহ নেই!

মাষ্টার। বলেন কি— সন্দেহ মাত্র নেই?

শ্যাম। যেমন নিঃসন্দেহ আমি আছি।

মাষ্টার। কি ভয়ানক! (হাঁ করিয়া এক দৃষ্টে শ্যামের মুখ নিরীক্ষণ।)

শ্যাম। হায় হায়, ছোকরাটা একেবারেই ব'য়ে গেল!

মাষ্টার। একেবারেই ব'য়ে গেল!

(বামাচরণবাবুর প্রবেশ।)

বামা। কি হয়েছে? দুজনে অমন করে বসে আছ কেন?

শ্যাম। বলব কি মশায়, তাজ্জব লেগে গেছে— বরাবর ত শোনাই যেত মাণিক বড় ভাল ছেলে, সে নাকি পড়াশুনা একেবারে ছেড়ে মায়ের বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বামা। (অবাক হইয়া) আমার বিশ্বাস হয় না— তাকে আমরা বড় ভাল ছেলে বলে যে জানি, তার নামে এ পর্য্যন্ত একটি মন্দ কথাও ত কখনো শুনিনি!

শ্যাম। আপনার কিসে বিশ্বাস হয়! এই মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করুন, ইনি তার

নাড়ী নক্ষত্র সব জানেন। ইনি বলেছেন ইনি স্বচক্ষে তাকে তার বাপের ডেস্ক্র ভেঙ্গে চুরি করতে দেখেছেন, আর—

(মাষ্টারের চোখে হাত দিয়া ক্রন্দন।)

বামা। কি ভয়ানক, কি ভয়ানক— পৃথিবীতে কাকেও বিশ্বাস করতে নেই! (প্রস্থান)

মাষ্টার। দুপুর বেজে গেল, আজ আর পড়াতে যাওয়া হোল না দেখছি, এইখানেই আহারের কথাটা বলে দিন।

শ্যাম। তবে রাতটাও থেকে যান, সন্ধ্যার পর দুজনে ষ্টার থিয়েটারে যাওয়া যাবে এখন।

সেইদিনই মাণিকের নিন্দায় সহর গুলজার হইয়া পড়িল।

ভারতী, ১২৯৩

সৌন্দর্য্যানুরাগ

(যুবতী পুকুরধারের সোপানে একখানি বই হাতে আসীন,
স্বামীর প্রবেশ ও নিকটে উপবেশন।)

স্বামী। কি পড়া হচ্ছে? রসময়ের অসময়ে আবির্ভাব হোল না কি?

স্ত্রী। না না এস এস, একলা পড়ে মন উঠছে না—একবার শোন দেখি, এবার আর বলতে হবে না যে ইংরাজিতে অমন ঢের আছে—

স্বামী। যে মত্ত দেখছি ভয় হচ্ছে যে? একেবারে দেখ মনটা হারিয়ে ফেলো না। আমার যেন শেষে হাহা করে বেড়াতে না হয়।

স্ত্রী। (হাসিয়া) মন হারানই বটে—আহা কি চমৎকার বর্ণনা, সত্যই মোহিত না হয়ে থাকা যায় না—

সুকোমল চরণ কমল দুটি
ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটী, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি।
করে পদ্মফুল
করে দুলদুল
অলসিত আঁখি সম আধো আধো ফুটি—

কি চমৎকার—বল দেখি—

স্বামী। তাই ত। (বইখানি হাতে লইয়া) 'স্বপ্নপ্রয়াণ'। নামটি ভাল। তা পড়ব এখন, এখন থাক। আমার কি ভাই জান—সৌন্দর্য্যরসে মিছরির মত আমাকে এত শীঘ্র গলিয়ে ফেলে যে ওসব পড়তে আমার ভয় করে। বিশেষ এখন তোমার সঙ্গে দুট কথা কইতে এলুম—তাহলে আর তা হবে না। কিন্তু তুমি ভাই ঐ বর্ণনার সৌন্দর্য্য টুক really কতটা appreciate করেছ—

স্ত্রী। আবার ইংরাজি—বাঙ্গলা বেরোয় না বুঝি?

স্বামী। কতটা তুমি অনুভব করেছ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে—স্ত্রীলোকের Aesthetic faculty—দূর হ—সৌন্দর্য্যরসজ্ঞান আদপে যে নেই এটা একরকম সিদ্ধান্তই হয়ে গেছে—

স্ত্রী। বটে! কে সে বল দিখি বিদ্যাবাগীশ—যিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন?

স্বামী। (স্বগত) (তুমি ত আর প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ি বি, এ, নও কিম্বা দিগম্বর গড়গড়ি এম্ এ বি এল্‌ও নও—যে তোমার কাছে মুখ বুজে বসে থাকতে হবে, একটাবার তার নাম করলে ত আর ভুল ধরবার যো নাই—কি সুবিধা!) (প্রকাশ্যে) কার সিদ্ধান্ত শুনতে চাও? লোকটা কে জান? আর কেউ না—স্বয়ং স্পেনসার।

স্ত্রী। পেনসর প্রাণেশ্বর যিনিই হ'ন না কেন স্বয়ং আমার প্রাণেশ্বর বল্লেও ও-কথা আমি মানিনে। মিন্সের রকম দেখ না! ও কথা বল্লে কি করে—তার পেটে কি দু'কড়ার বিদ্যে নেই?

স্বামী। বটে প্রাণেশ্বরগুলো বুঝি মানুষের মধ্যেই নয়?

স্ত্রী। (হাসিয়া) আমার প্রাণেশ্বর ছাড়া।

স্বামী। তা সে লোকটা কে জান? একজন মহা পণ্ডিত। তাঁর কথা অগ্রাহ্য করার যো কি?

স্ত্রী। সত্যি নাকি? কখানা ইংরাজি বই পড়েছে?

স্বামী। হা হা—সে যে ইংরাজ—

স্ত্রী। ইংরাজ হলেই বা? সে কি তোমার মত অতগুলা ইংরাজি বই পড়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি?

স্বামী। তা আমার মত অতগুলা পড়েছেন কি না জানি না—তবে তিনিও একজন মস্ত বিদ্বান এই কথা বলতে পারি।

স্ত্রী। কক্ষনো না। তবে সে ও-কথা বলবে কেন? আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ নেই এ আবার কি কথা! তবে বুঝি সেটা এ কালের নারদ অবতার, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তার ঝগড়া বাধাবার ফন্দী?

স্বামী। (হাসিয়া) তিনি একলা না—কাণ্ট কমটি প্রভৃতি আজকালকার বড় লোকদের সকলেরি ঐ মত। কিন্তু তুমি ত সে সব কথা অত বুঝবে না—আমি তোমাকে আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাই।

স্ত্রী। (গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া স্বগত) কি বিদ্বান স্বামীই আমি পেয়েছিলুম—সরস্বতী যেন কণ্ঠাগ্রে। কিন্তু এ কথাটি যে কেন বলছেন তা ত বুঝতে পারছিনে—বুঝিবা আমার বুদ্ধির পরীক্ষা করছেন। দাঁড়াও আমিও ছাড়ছি কি না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বল।

স্বামী। দেখ ঐ যে ঐখানে গোলাপফুলটি ফুটিয়া আছে, দেখ কত সুন্দর—

স্ত্রী। তা ত দেখছিই, সে কি আর আমাদের চেয়ে তোমরা বেশী দেখবে! শোন—

কি চক্ষে দেখে যে ফুল বিরহিণী!
ফুরায় না দেখা আর! পড়ে যেন দুঃখের কাহিনী!

পড়া শিখিয়াছে, ফুল ধনু [কাছে]
ফুলের তেঁই সে এত মরম গ্রাহিণী

পুষ্প নারী হৃদয়ের দরপণ,
অবলা লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি অরপণ
তা'র দলে দলে তেঁই গীতচ্ছলে
মনোজ্বালা করে বালা ফুলে আরোপণ—

কবি এ কথা বলেছেন।

স্বামী। আহা, কথাটাই শেষ করিতে দাও। "মেয়েরা যে ফুল, আমি অস্বীকার করিতেছি নাকি! কিন্তু ফুল যে নিজের সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ করে সে কি নিজে সে সৌন্দর্য্য অনুভব করে? তেমনি তোমরা সৌন্দর্য্যভাব প্রস্ফুটিত কর, সৌন্দর্য্যরস অনুভব করিতে পার না।"

স্ত্রী। কি কথাই বল্লে—মরে যাই আর কি? ফুলের সঙ্গে আমরা সমান হলুম—কেন আমরা ফুলের মত জড় নাকি? মেয়ে বলে আমাদের কি মন-টন কিছুই নেই? তা বলবে বই কি! হা অদৃষ্ট! (মুখ ভার)

স্বামী। (শশব্যস্তে) তাই কি আমি বলছি?

স্ত্রী। তবে কি বলছ?

স্বামী। আমি বলছি মেয়েদের পুরুষদের মত অতটা সৌন্দর্য্যজ্ঞান নেই?

স্ত্রী। তাই বা নয় কেন? কথা একটা ত বল্লেই হোল না, বুঝিয়ে দাও?

স্বামী। রুচির উৎকর্ষ সাধিত না হলে যথার্থ সৌন্দর্য্যজ্ঞান কখনই স্ফূর্ত্তি পেতে পারে না। তোমাদের রুচির অভাব তোমাদের বেশেই প্রকাশ পায়, অসভ্যদিগের মেয়েদেরও এরূপ নির্লজ্জবেশ নয়, বিশেষ যখন তোমরা নিমন্ত্রণে যাও—দশজনের মাঝে ভদ্ররকম বেশের যেখানে নিতান্তই আবশ্যক—সেইখানেই তোমাদের চূড়ান্ত রুচি প্রকাশ পায়।

স্ত্রী। প্রভু, সে কার দোষ? আমাদের না আপনাদের? আপনারা আমাদের যেমন রাখেন সেইরূপ থাকি, যে পথে নিয়ে যান সেই পথে যাই। আপনারা আমাদের এই বেশ ভালবাসেন তাই আমরা পরি—যদি দেশশুদ্ধ পুরুষের এ-বেশ নিন্দনীয় মনে হয় —ত একদিনেই ইহার অন্য ব্যবস্থা হয়।

স্বামী। কেন আমি অনেকবার এরূপ কাপড় পরার নিন্দা করেছি।

স্ত্রী। আমি ত সেরূপ নিন্দার মানে প্রশংসাই বুঝেছি। সেদিন বোসেদের বাড়ীর বৌয়ের কাপড়পরা দেখে আমি সে কথা যখন বলি তখন তার উপর কতটা আক্রমণ হয়েছিল মনে আছে কি?

স্বামী। দূর কর ছাই—তোমরা এমন কথাটাকে বাঁকিয়ে ফেলতে জান? নূতন কিছু হলেই লোকে অমন দুএকটা কথা কয়। তাতে আর হয়েছে কি। আমি তোমাকে ঐরকম কাপড় পরতে মানাও করছিনে কিছুই না—কিন্তু তাতে ত আর তোমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে বলে প্রমাণ হচ্ছে না। ভারতচন্দ্র বিদ্যাপতি প্রভৃতি আমাদের কবিদের বর্ণনায়

দেখ, আর আসলেও দেখ —বাঁকা হাসি, আড়চাহনি, তেড়িফেরান-সৌখিনতা ভাবেই আমাদের দেশের মেয়েরা পাগল, যথার্থ মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, পুরুষের একটা পুরুষত্ব ভাব, এ আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা কজন appreciate—দূর কর, বুঝে বল দেখি? এইখানেই ত প্রকৃত রুচির অভাব!

স্ত্রী। তা দেশের পুরুষরা যদি সব মেয়েই হয় তার জন্য আমরা কি করব?

স্বামী। তা কেন? তোমরা যদি বাস্তবিক পুরুষের পৌরুষিকগুণ ভালবাসতে তা হলে কি পুরুষরা মেয়ে হতে পারে? তা হলে দেশের স্বতন্ত্র শ্রী হয়ে পড়ত। এই সে-দিন আমি একরকম নূতন রকম কাপড় ও পাগড়ি তৈরি করলুম—তা দেখেই তুমি নাক তুলতে আরম্ভ করলে। তোমার সেই বাহারে ধুতী চাদরটি না হলে মনঃপূত হয় না—

(ভ্রাতৃবধূর প্রবেশ)

স্ত্রী। (হাসিয়া) ও বউ—মজা শুনসে? তুই যদি ভাই সেই ধুম্ব পাগড়িটা—আর মালকোচা সাটের কাপড় পরাটা দেখতিস—ত হাসি রাখতে পারতিস নে। তা যখন যুদ্ধে যাবে সে রকম কাপড় পরো—এখন ঘরে বসে আর ওতে কি হবে!

স্বামী। তা তুমি যেতে দিলে ত?

স্ত্রী। তা দেব না কেন? এই যে সেদিন হারার মাকে হারা মদ খেয়ে মারতে লাগলো—আমি জানালা দিয়ে দেখে ছাড়িয়ে দেবার জন্য তোমাকে কত ডাকলুম—তা তুমিই ত গেলে না!

স্বামী। (স্বগত) বেশ স্ত্রী যা হক! মাতালের হাতে গিয়ে তখন প্রাণটা খুইয়ে আসি। (প্রকাশ্যে) সে তখন আমার মাথা ধরেছিল, কি করি বল?

স্ত্রী। মাথা আবার কখন ধরলে? তুমি ত বল্লে কে আবার যায়।

স্বামী। আমি যদি না গিয়ে থাকি—সেও তোমার দোষ? তুমি যদি যশোবন্তের স্ত্রীর মত আমাকে উত্তেজিত করতে তাহলে কি আমি না গিয়ে থাকতে পারতুম!

স্ত্রী। সে আবার কোন বইয়ে আছে?

স্বামী। টডের রাজস্থানে।

স্ত্রী। ইংরাজি না বাঙ্গলা?

স্বামী। ইংরাজি।

স্ত্রী। সেটা কার দোষ! তুমি আমাকে ইংরাজি পড়ালে না কেন—তাহলে ত সে বক্তৃতাটী মুখস্থ করে রাখতে পারতুম।

স্বামী। (স্বগতঃ) তাহলেই হয়েছিল আর কি। এখানে এসে বিদ্যে ফলিয়ে যে সুখটুক আছে তাও থাকত না। (প্রকাশ্যে) তা আমি ত তোমাকে ইংরাজি শেখার জন্য ঢের বলেছিলুম।—তোমার সঙ্গে একসঙ্গে মিল স্পেনসর পড়ে যদি দুজনে সকল রকম ভাবের আদান প্রদান করতে পারতুম—তাহলে কি সুখই হোত—

ভ্রাতৃজায়া। বলি ব্যাপারখানা কি—আমি ত তোদের ঝগড়ার মানে মোদ্দা কিছু পাচ্ছিনে।

স্ত্রী। উনি বলছেন কি জান—মেয়েদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান নেই—?

ভ্রাতৃজায়া। সে কি কথা! কার কেমন রূপ, কে কেমন দেখতে—কে সুরূপ—কে কুরূপ তা আমরা বুঝতে পারিনে? আমরা কি কানা নাকি?

স্বামী। ঠিক কানা নয়—এক চোখে। তোমরা কুরূপই দেখতে পাও—সুরূপ কারো কখনো দেখ না। এই মনে কর—আমরা একটা সুন্দর—ী এই সৌন্দর্য্য দেখলে যতটা আনন্দ লাভ করি—তা কি তোমরা কর—তোমাদের মুখে কাউকে ত প্রায় সুন্দর বলতেই শোনা যায় না!

স্ত্রী। ওমা কি হবে? কেন জগৎবাবু—

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎবাবু! সে কথা কে বলছে? আমি বলছি—যথার্থ সৌন্দর্য্য তোমাদের চোখে লাগে না—লাগে কেবল তার খুঁৎটা। সৌন্দর্য্য দেখে তোমরা আনন্দ উপভোগ কর না—ঈর্ষা উপভোগ কর।

স্ত্রী। কেন কাকেই বা আমি ঈর্ষা নয়নে দেখলুম—আর কারই বা খুঁৎ ধরতে গেছি—

স্বামী। কেন—ললিতা—অমন সুন্দরী তুমি—

স্ত্রী। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল!

ভ্রাতৃজায়া। ও পোড়া কপাল, সে আবার সুন্দরী, তার পায়ের আঙ্গুলের নখগুলা যেন শালপাত পানা চটাল চটাল। হাতের কুনইটা টিবলে বার হয়ে আছে। তারপর আবার মেয়েমানুষের অত বড় কপাল, অত ট্যাকাল নাক—শ্রী যে কোনখানটায় তা ত বুঝতে পারিনে। চুলটা ছাই যদি পেটে-পেড়ে কপালটা ঢাকে তবু না হয় চলে—তা না আবার ঐ চাঁদপারা কপালে আলবর্ট ফ্যাসানে চুলবাঁধা—মরে যাই আর কি! মেয়েমানুষ, ছোট-খাট কপালটি হবে—খাঁদাপারা নাকটি হবে। হ্যাঁ, তবে চোখদুটি ডাগর ডাগর দেখায় ভাল। কেন তার চেয়ে আমাদের ঠাকুরঝি কি কম সুন্দরী?

স্বামী। (মনে মনে) হ্যাঁ, ঠিক ঐরূপ খ্যাঁদাপারা শ্রীটিই বটে।

স্ত্রী। তা ভাই আমি যেন নাই সুন্দরী হলুম—তাই বলে কি আর কেউ সুন্দর নেই —ঐ একজনই কি বিশ্বে সুন্দর জন্মেছে? অমন পটল চেরা চোখ আমি ঢের দেখিছি—

স্বামী। কোথায় বল দেখি?

স্ত্রী। কেন আমার দিদির—আর আমার ভগিনীপতির বা কম কি? দেখেছ ত বৌ?

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎবাবু—! সেই বানরটা আবার!

স্ত্রী। আর আমার মেজ ভগিনীপতিই বা কি সুশ্রী! যেমন রং—তেমনি চেহারা।

স্বামী। সে হনুমানটার নাম শুনলে গা জ্বলে!

স্ত্রী। আর সেজও যেন কার্ত্তিক—

স্বামী। (ক্রোধভরে উঠিয়া) আমি চল্লুম। বুঝেছি, সবাই সুন্দর—আমিই কেবল কুশ্রী, আমার মুখ আর তোমার দেখে কাজ নেই।

স্ত্রী। কেন গো—এতে রাগ কি? সুন্দরকে সুন্দর বলেছি বই ত নয়!

স্বামী। তাই জন্ম জন্ম কাল বল, আমি চল্লুম—

(পুষ্করিণী সোপানে দ্রুতবেগে অবতরণ)

ভ্রাতৃজায়া। এ কি! হাসতে হাসতে সমস্তটাই শেষে হাহাকার যে!

স্ত্রী। (কাঁদিয়া) কর কি, কর কি? সব ঠাট্টা! আমি এমন কথা আর বলব না—

ভ্রাতৃজায়া। ঠাকুরজামাই কর কি—মর তাহাতে ক্ষতি নাই, সিঁড়িতে পড়িয়া গেলে—অমন চাঁদপারা মুখে চিরকাল কলঙ্ক ধরিয়া থাকিবে যে।

স্বামী। (জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া) সে কথা বড় মিথ্যা নয়, তবে দেখছি এখান থেকেই আবার ফিরতে হোল।

ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪

গানের সভা

গৃহকর্ত্তা গোপালবাবু, পুরাতনানুরাগী নব্য-গ্র্যাজুয়েট হরিদাস এম,এ, জ্ঞানদাস বি, এ, বৃদ্ধ ভটচায মশায়, তদ্বন্ধু ভজহরি প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসীন।

ভটচায। যাই বল যাই কও—সেকালের মত গাইয়ে আজকাল নেই।

গোপাল। না মশায়,—এ মস্ত গাইয়ে—একবার তার গান শুনে তবে ওকথা বলবেন।

ভজহরি। বলি কার পালাটা হবে?

গোপাল। কারো পালা-টালা নয় মশায়—এ হোল ওস্তাদ মানুষ—কালোয়াতি, খেয়াল ধ্রুপদ—

হরি। খেয়াল ধ্রুপদ? তার চেয়ে ত টপ্পাই ভাল।

জ্ঞান। টপ্পাটাই হোল কি না More modern invention.

হরি। Modern invention বলেই কি ভাল বলতে হবে নাকি? বল দেখি বাবু? আমাদের আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা নাই হোল—তবে তুমি যে বল্লে টপ্পা ভাল?

হরি। আমি ভাল বল্লুম—because ভাল, because আমার ভাল লাগে, আর because খেয়াল ধ্রুপদ are nothing but barbarian-like meaning-less gurgling of sound-notes only.

গোপাল। আরে তোমরা যে ঝগড়া করতে বসলে।

হরি। মশায়, ঝগড়া কি, এ ত ঠিক কথা—বলুন দেখি আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা ত অস্বীকার করছিনে।

হরি। তা করছ না? বস্—তবে সব চুকে গেল—Then let us be friends again—shake hands and say—আমাদের আগে যা ছিল তার চেয়ে ভাল কিছু হয়নি।

ভটচায। বেঁচে থাক বাবা, তোমার মত বুঝদার ছেলে আমি একটি আর দেখিনি! বড় ঠিক কথা—সেদিনের মত আর কি এখন কিছু আছে— সেই যে রামযাত্রা—রামলক্ষণ

ছোট দুইটি ভাই—বুকে চন্দনের চিত্রবিচিত্র, নাকে নোলক, মাথায় চূড়া—হাতে ধনুর্ব্বাণ—নৃত্য করিতে করিতে হুহুঙ্কারকারী—সোনার মুণ্ডধারী রাক্ষসপতি দশাননকে—

ভজ। আহাহা—আর সেই কৃষ্ণযাত্রা—ধড়াচূড়াধারী বালককৃষ্ণ—রাঙ্গা লাঠির বাঁশি হাতে, অলকা তিলকায় সেজে, রাধার প্রেমে গদগদ হয়ে, সরু গলায়, সরু সুরে, অধিকারী বিন্দেদূতীকে যখন বিনয় করে বলছেন—

রাধা রাধা বলে—

মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে—তখন—"

হরিদাস। উঃ কি চমৎকার গান!

রাধা রাধা বলে—

মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

এমন সহজ ভাবের, সহজ ভাষার গান এখন আর কোন কবির মুখ হতে বার হয় না। ইংরাজি অনুকরণে পড়ে—কবিতা আর আমাদের নেই!

আহা—রাধা রাধা বলে

মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনা জলে—

জ্ঞান। এখন হলে একজন বলতেন,

মান করে থাকা আজ কি সাজে

বনে এমন ফুল ফুটেছে

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে চল চল কুঞ্জমাঝে।

সেক্সপিয়র বলেছেন—Othello thy ocupation is gone—আমরাও বলতে পারি, কবিতা thy time is gone—অর্থাৎ কবিতা তোমার কাল আর নেই।

ভট। পয়ারের কথা বলছ বুঝি? তা যদি বল্লে ত শোন। বর্দ্ধমানের রাজা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি এঁকে জাতে উঠাবার অভিপ্রায়ে—মহা অনুনয় বিনয় করে নদের রাজাকে একখানা পত্র দেন—তার উত্তরে নদের রাজা আর কিছু না বলে এই দুই ছত্র পয়ার লিখে পাঠান—

আমি—নহি তব অবাধ্য

এ—বহুজনরব বহুজনসাধ্য

অস্যার্থ—আমি তোমার অবাধ্য নই, আমার ইচ্ছা আমি তাঁকে জাতে উঠাই,—কিন্তু যাহা বহুজনে জানে, তা একা আমার সাধ্য নয়। দেখেছ ত বাবা! দুই ছত্রের মধ্যে কি কারখানা!

ভজহরি। আজকাল এমন পয়ার আর হতে হয় না!

গোপাল। মশায়গণ, আজ দেখছি আপনাদের কষ্ট ভোগ করার জন্যই নিমন্ত্রণ করেছি, গায়কমশায় আপনাদের মনের মত উচ্চাঙ্গের কবিতার গান গাইতে পারবেন কি না আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে।

হরি। রাধা রাধা বলে—পরাণ ত্যজিব আমি যমুনার জলে—কি সুন্দর! আর কিছু নয়—একটা এরূপ গান শোনার জন্য কি করা না যেতে পারে?

(গায়কের প্রবেশ।)

গোপাল। এই যে গায়কমশায়—মশায়! আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছি—আপনাকে আজ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড করতে হচ্ছে।

গায়ক। কেন মশায়, দলে এসে পড়েছি নাকি?

ভটচায। (হাসিয়া)—তা বলতে পারেন—বলতে পারেন—মশায়, একটি রামযাত্রা—

ভজহরি। একটি কৃষ্ণযাত্রা—

জ্ঞান। মশায়, আমরা আপনাকে একটি উচ্চাঙ্গের টপ্পা গাইতে বলছি—

হরি। রাধা রাধা বলে—জীবন ত্যজিব আমি যমুনাজলে—মশায় জানেন কি?

গায়ক। (অবাক হইয়া) গোপালবাবু আপনি ত জানেন ধ্রুপদ খেয়াল নিয়েই আমার কারবার?

গোপাল। কি করবেন মশায়—এঁরা ওস্তাদি গান শুনতে চান না, এঁদের মনের মত গানই আগে হোক।

গায়ক। (স্বগত) কি বিপদ—এ দেখছি ভেড়ার দলে এসে পড়া গেছে—তবে ভেড়াই সাজা যাক। একটা হাসির গান শেখা গেছলো, সেইটে গাই—

গান

ছক্রগাড়ী, চক্র নাড়ি—বক্র পাড়ি মারিছে
বঙ্ককানু ফুংকি বেণু—যন্ত্র তন্ত্র সারিছে—

হরিদাস। (চোখ বুজিয়া) ওহো ওহো—

ভটচায (মৃদুস্বর) হরিদাসবাবু গানটা কি হোল, ভাল বুঝতে পারছিনে।

হরিদাস। বুঝতে পারছেন না! গানের অর্থ বড় চমৎকার! আমাদের দেহরূপ এই যে ছক্র গাড়ী—এই গাড়ী যখন প্রবৃত্তিরূপ চক্র নাড়িয়া বক্র পাড়ি মারে তখন বঙ্ককানু অর্থাৎ পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ—আমাদের আত্মার মধ্যে সুবুদ্ধি বাঁশি বাজাইয়া—আমাদের বিকৃত মনরূপ যন্ত্র মেরামৎ করেন। বুঝলেন মশায়?

গোপাল। Ah! Philosophy with a vengeance! এরা দেখছি ridiculous-কেও sublime ক'রে তুলতে পারে!

হরিদাস। (কর্ণপাত না করিয়া) কি ভাষা!

জ্ঞানদাস।—(গদগদ হইয়া) কি ভাব!

ভজহরি। ওহো ওহো!

ভটচায। আহা আহা।

(চারিজনের দশাপ্রাপ্ত।)

ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৪

ব্যাঘ্র-সভা

(হ্যাটকোটধারী ব্যাঘ্র মহোদয়গণ আসীন।)

সভাপতি ব্যাঘ্র। সভ্যগণ, আমরা সুসভ্য ব্যাঘ্রজাতি, পশুদিগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই উন্নতির কারণ—

প্রথম সভ্য। আমাদের খরধার দন্তনখ, আমাদের দাঁতের জোরের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য? দেশকে দেশ আমরা এই দাঁত নখের প্রতাপে উচ্ছন্ন দিই।

সভাপতি। (জিভ কাটিয়া) উহুঁ, অমন কথা বলিবেন না। মনের জোরই আমাদের প্রধান জোর। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য, স্বাধীন বাণিজ্য—ইহাই আমাদের উন্নতির কারণ। আমরা যেখানে যাই এই স্বাধীনতা বিস্তৃত করি, বিশ্বজনীন উন্নতির ভিত্তি প্রোথিত করি।

দ্বিতীয় সভ্য। উত্তম। উত্তম। আমরা উন্নত উদার ব্যাঘ্র জাতি। আমাদের যেরূপ সুবিধা, সেইরূপ বাক্য, সুতরাং আমাদের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য—

তৃতীয়। স্বাধীন বাণিজ্য। গরু ছাগল আমাদিগকে অনবরত রক্ত যোগায়, সেজন্য তাহাদিগকে আমাদের কিছুই দিতে হয় না। (সহসা একজন শৃগাল সভ্যকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া) কি হে, তুমি কি বলিতে চাও?

শৃগাল। আমি শুধু একটি স্বাধীন বাক্য বলিতে চাই—

দ্বি-স। বেটা, তুমি স্বাধীন বাক্য বলিবে—তোমাকে এই উন্নত ব্যাঘ্রজাতির সহিত একাসনে বসিতে দিয়াছি—ইহাই যথেষ্ট—আবার স্বাধীন বাক্য। ধর বেটাকে?

(সকলের আক্রমণ, শৃগালের পলায়ন।)

(ব্যাঘ্র দূতের প্রবেশ)

দূত। মশায়রা গো, মশায়রা গো, আর স্বাধীনতা না, এদিকে গৌখানার বড় গরুটা যায়।

সভাপতি। বড় গরুটা যায়, তার পা দুট যে খেয়ে রাখা গেছে, যাবে কি করে?

দূত। সে যাবে না মশায়, তাকে নিয়ে যাবে।

সভা। কে নেবে, কে?

দূত। কে আবার? ভালুকভায়া, তার ডাক এতক্ষণ আপনারা কেউ শোনেননি?

সভা। ভালুকভায়া! গৌখানার নেকড়ে খানসামা কি করছে? ভালুকের কাণ পাকড়ে ধরুক না?

দূত। সে ত মশায় পাকড়াতেই গেছে।

সভা। তবে খবর?

দূত। খবরেরই মশায় অভাব। নেকড়ের খবর ত এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

প্র-স। সত্যি না কি?

সভা। তাইত, নেমকের চাকর—বিড়ালটা বল, কুকুরটা বল যখন তখন আমাদের যোগাচ্ছে, তার দেখা নেই?

দ্বি-স। তার জন্যই ত এমন পেট ফুলিয়ে বসে আছি? তার দেখা নেই?

তৃতীয়। গেল গেল সব গেল, গরু গেল, নেকড়ে গেল, হায় হায় সব গেল!

(সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।)

সভাপতি। (ব্যগ্রভাবে) আর কেঁদ না—সভ্যগণ, আমি এখনি খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছি।

(গৌখানা।)

(একজন ব্যাঘ্রের প্রবেশ।)

ব্যাঘ্র। বলি ও নেকড়ে— নেকড়ে ভায়া হেথায় আছ হে? (নেকড়েকে দেখিয়া) এই যে নেকড়েজি—খবরটা কি বল দেখি? পাকড়ালে?

নেকড়ে। প্রভু, এতক্ষণ তা কি বাকী থাকে, সে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

ব্যাঘ্র। (আহ্লাদে) বেশ হয়েছে—ভালুকভায়া—কেমন জব্দ! কিন্তু কোথায় রেখেছ বল দেখি?

নেকড়ে। ভালুকভায়া! তাকে কেন পাকড়াব?

সিংহ। তবে কাকে?

নেকড়ে। যাকে পারব তাকে। ভালুক পাকড়ান কি সহজ নাকি? ভালুক ত ভালুক—মশায় কাবুলি বেড়ালটাকে ধরতে গিয়ে দেখুন না গায়ে এখনো আঁচড়ানোর দাগ।

ব্যাঘ্র। তবে কাকে পাকড়ালে নেকড়ে সাহেব?

নেকড়ে। দুটা ফড়িং।

ব্যাঘ্র। ফড়িং! কই?

নেকড়ে। একটাকে ঐ বর্ম্মার কোণে মেরে রেখে এসেছি। আর একটাকে এই পাহাড়ে মারতে চলেছি।

ব্যাঘ্র তাহার বুদ্ধি বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া নতজানু হইয়া বলিলেন—

প্রভু হে, কে তুমি? এত বুদ্ধি নেকড়ের হইবে না। শুনিয়াছি মনুষ্যরাজ্যে ব্রিটিস ব্যাঘ্র নামে এক উচ্চতর ব্যাঘ্রজাতি আছে—তুমি তাহারি দ্বিতীয়াবতার নেকড়ে রূপে জন্মিয়াছ। প্রভু তোমায় প্রণাম করি—তুমি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ কর।

ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৪

নিজস্ব সম্পত্তি

(সস্ত্রীক নবীনবাবু ও তাঁহার ভগিনীপতি রাখালবাবুর কথোপকথনস্থলে নবীনবাবুর ভায়রাভাই নভেল লেখক ব্রজবাবুর প্রবেশ)

রাখাল। চুপ চুপ, ঐ যে ব্রজবাবুই আসছেন।

স্ত্রী। এই যে জামাইবাবু, নাম করতে করতে যে এসে উপস্থিত, অনেকদিন বাঁচবে!

নবীন। দাদাঠাকুর, আসতে আজ্ঞে হোক। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল।

ব্রজ। (বসিয়া) তা বইটা কি পড়া হয়েছিল?

নবীন। আরে, তার কথাই ত হচ্ছিল, চমৎকার!

রাখাল। তোমার এ বইখানার কাছে আর কারো বই দাঁড়াতে পারে না।

ব্রজ। দেখ রাখালবাবু, তোমাদের সমালোচনা শক্তির প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা, এ পর্য্যন্ত এমন সমালোচক কিন্তু আর দেখলুম না।

স্ত্রী। জামাইবাবু, তুমি যেমন ওদের কথায় ভোল, এতক্ষণ কি হচ্ছিল শুনবে? বলি তবে?

নবীন। (স্ত্রীকে টিপ্পনি দিয়া) আঃ! ব্রজবাবুকে দেখলেই কি তোমার ঠাট্টা! এমন একঘেয়ে পচা, ঠাট্টার ভিতর ঠাট্টাটাই বা কোথায় তাও ত দেখতে পাইনে।

স্ত্রী। তাই ত! না জামাইবাবু—

নবীন। (স্ত্রীর প্রতি চুপে চুপে) আরে চুপ কর না—ওকে নিয়ে একটু মজা করি।

ব্রজ। আমি কি না এমনি গাধা আর কি যে, আপনাদের মত সুরুচিসম্পন্ন সমজদার সমালোচক লোক আমার লেখার সত্যি অপ্রশংসা করেন এই আমি বিশ্বাস করব!

স্ত্রী। এখন তোমার এতটা বুদ্ধি হয়েছে সে জ্ঞান আমার ছিল না। ঠিক বলেছ —তোমার দর ওঁরা না বুঝবেন ত বুঝবে কে? তা জামাইবাবু, তুমি যে বলছিলে বইখানা অভিনয় করতে দেবে, তার কি হোল?

ব্রজ। শেষে বুঝলুম অভিনয় করতে না দেওয়াই ভাল। না জেনে কোন লোকের নামে কিছু বলতে চাইনে, তবে এইটে বলতে পারি—হিংসাটা মানুষের মনে স্বভাবতঃ প্রবল।

নবীন। তা সত্যি বলেছ।

ব্রজ। তা ছাড়া যারা নিজে লেখে, তাদের হাতে বই দেওয়া আমার বড় ভাল মনে হয় না।

নবীন। সেও একটা কথা বটে, চুরি করতে পারে।

ব্রজ। তাই ত আমি বলছি। কার হাতে দেব কে আত্মসাৎ করবে।

রাখাল। (আস্তে আস্তে) তাতে তোমার ত কোন ক্ষতি দেখছিনে, সে লেখা যে চুরি করবে ক্ষতি তারই।

ব্রজ। কি বলছেন?

স্ত্রী। উনি বলছেন—তোমার লেখা যে চুরি করবে ক্ষতি তার।

ব্রজ। ক্ষতি তার! কথাটা ঠিক—

স্ত্রী। এর মানে বুঝলে না—গাধা মহাশয়—তোমাকে গাধা বলছে।

রাখাল। ব্রজবাবু, ওর কথা শুনবেন না, উনি নারদের ঢেঁকি, কেবল রাগাবার ফন্দী। আমি বলছি, আপনার Originality এত অধিক যে আপনার লেখা চুরি করে কেউ হজম করতে পারবে না। জানেন ত Originalityগুলো ঠিক লোহার কলাই—তাতে দন্তস্ফুট করা যে সে লোকের কর্ম্ম নয়, সে কেবল আপনারাই পারেন।

ব্রজ (আহ্লাদে) বাস্তবিক বইখানা আপনাদের কোথায় কি রকম লাগলো সেটা শুনলে বুঝতে পারি—

রাখাল। সমস্তই ভাল লেগেছে।

ব্রজ। তবু কোথাও কিছু বদল করার আবশ্যক দেখলেন কি? (নবীনবাবুর প্রতি) আপনি কি বলেন?

নবীন। কোথাও না, কোথাও না, আগাগোড়াই ভাল।

ব্রজ। (ঘামিয়া উঠিয়া) আপনারা কিছু সঙ্কোচ করবেন না। উপযুক্ত লোকে যখন আমার লেখার ঠিক দোষটি দেখিয়ে দেয় তাতে আমি যেমন সন্তুষ্ট, এমন কিছুতেই না। বন্ধুরা যদি দোষ সংশোধন না করেন, তাহলে বন্ধুত্বই কি?

রাখাল। এতটা যখন বলছেন—তাহলে আমার একটি কথা বলার আছে।

ব্রজ। কি রকম!

রাখাল। আগাগোড়া বইখানি বেশ হয়েছে—

ব্রজ। বেশ হয়েছে?

রাখাল। হ্যাঁ, বেশ হয়েছে—কেবল একটু।

ব্রজ। কেবল একটু কি?

রাখাল। একটু ঘটনার অভাব হয়েছে?

ব্রজ। ঘটনার অভাব! মহাশয় আমায় আশ্চর্য্য কল্লেন।

রাখাল। হ্যাঁ, ঘটনা বড়ই কম হয়েছে।

ব্রজ। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! মহাশয় আপনি যদিও একজন সমজদার ব্যক্তি এবং আপনার সমজদারিত্বের প্রতি আমার অটল বিশ্বাস, কিন্তু তবুও এ কথাটায় আমি আপনার সহিত একমত হতে পারছিনে। আমার মতে বরং ঘটনাটা একটু বেশী হয়েছে। নবীনবাবু, আপনি কি বলেন?

নবীন। না, এ বিষয়ে আমি রাখালবাবুর সঙ্গে মত দিতে পারছিনে। আমার মতে ঘটনা যথেষ্ট আছে—আর প্রথমদিকের পরিচ্ছেদগুলি অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক, কিন্তু শেষাশেষি কৌতূহলটা একেবারেই কমে আসে।

ব্রজ। কমে আসে? আপনি বোধ হয় মানে করছেন কৌতূহল বাড়ে, এতই বাড়ে —যে তখন আপনার কৌতূহল-উদ্দীপক বোধ শক্তি বোধ হয় কমে আসে—এই কথাই আপনার বলার উদ্দেশ্য।

নবীন। না, আমি সে মানে করছিনে—সত্যই কৌতূহল আর কিছুমাত্র থাকে না।

ব্রজ। কখনোই না, কখনোই আপনি সে মানে করতে পারেন না—নিশ্চয়ই আপনি বলছেন কৌতূহল বাড়ে।

নবীন। আচ্ছা, গিন্নিকে জিজ্ঞাসা কর—উনিও তোমার বই পড়তে পড়তে কাল ঐ কথা বলছিলেন।

স্ত্রী। না জামাইবাবু—আমি ও-কথা বলিনি—আমি সমস্ত বইখানির কোথাও একটু খুঁৎ পাইনি।

ব্রজ। যাই বল, মেয়েরা যেমন ঠিকটি বোঝে, পুরুষেরা অমন বুঝতে পারে না।

স্ত্রী। আমার কেবল মনে হয়—একটু বেশী বড় হয়েছে।

ব্রজ। আকারে বড় হয়েছে—না বলছ ঘটনার আধিক্য বেশী হয়েছে?

স্ত্রী। না না তা নয়, আমি বলছিলুম—অভিনয় করার পক্ষে আকারে একটু বড়।

ব্রজ। শালীঠাকরুণ, আপনার কথার উপর আমার কথা নেই, তবে এটা কি না ঘড়ির কথা, আমি বলছি পাঁচ ঘণ্টায় অভিনয় হয়, তাহলে বইখানা ত আর বড় হতে পারে না।

নবীন। সে কথা তবে যাক। খবরের কাগজওয়ালারা কি বলছে?

ব্রজ। খবরের কাগজ? তাদের মতন মিথ্যাবাদী, হিংসুক, নিন্দুক, বদমাইস বিবেক-বুদ্ধিহীন—, যাক, আমি যদিও তাদের কাগজ পড়িনে।

নবীন। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ কর—তারা যেরকম কঠোর গালাগালি দেয় তাতে তোমার মত কোমল হৃদয় লোকের বিশেষ কষ্ট পাবার সম্ভাবনা।

রাখাল। কিন্তু লেখক হতে গেলে সে নিন্দা শোনাটাও দরকার।

ব্রজ। তা যদি বল, তা হলে যার বন্ধু আছে তার খবরের কাগজ পড়ার কিছুমাত্র আবশ্যক নেই। আর নবীনবাবু, আপনি যে মনে করছেন—খবরের কাগজের নিন্দেতে আমি চটে যাব, তেমন ছেলে আমাকে পাননি। জঘন্য খবরের কাগজের প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই আরো ভাল।

রা। তা ঠিক। সেদিন ঐ কাগজটা তোমাকে কি গালই দিয়েছে।

ব্রজ। কি রকম?

নবীন। হ্যাঁ সত্যি, সে কি যাচ্ছেতাই রকম গালাগালি?

ব্রজ। (কষ্টেশ্রেষ্টে হাসিয়া) বেশ বেশ—বড় নাকি বয়ে গেল।

নবীন। বাস্তবিক—তাহার ঝালঝাড়া দেখলে হাসিই পায়।

ব্রজ। তবু কি বলেছে? আপনার মনে আছে?

নবীন। রাখাল, তোমার মনে আছে? ব্রজবাবু দেখছি ভারী উৎসুক!

ব্রজ। উৎসুক? না একটুও না। তবে কি না কি বলেছে জানাই যাক না।

নবীন। কি রাখাল, মনে আছে? (চুপে চুপে) যা হয় কিছু বলে যাও।

রাখাল। হ্যাঁ, কতক কতক মনে আছে বই কি।

ব্রজ। বলুন তবে—শোনাই যাক।

রাখাল। বলেছে—তোমার কল্পনার নূতনত্ব বা নিজত্ব কিছুই নেই। সমস্ত চুরি।

ব্রজ। সত্যি নাকি! এর চেয়ে absurd আর কি হতে পারে? (জোর করিয়া হাস্য) হাঃ হাঃ।

রাখাল। ঠাট্টা তামাসগুলি সব নিখ্‌তিতে ওজন করা—

ব্রজ। ভারী মজা? হা হাঃ।

রাখাল। তুমি যে চুরি কর তা ভালরকম করে করতে পার না, যত যেখানকার বিশ্রী বই আছে তাই থেকে চুরি করে চুরিটাকেও চুরির অধম করে তোল।

ব্রজ। তাই ত—হা হাঃ।

রাখাল। ভাল লেখকের লেখাও যেখানে চুরি করেছ—তারা তোমার ভাষার আবর্জ্জনার মধ্যে পড়ে একেবারেই কলঙ্কিত হয়ে গেছে।

ব্রজ। দেখেছ—হা হাঃ।

রাখাল। দু এক জায়গায় যেখানে দৈবাৎ ভাষা ভাল হয়েছে, সেখানে বিকৃত-কল্পনা, কুরুচি এমন ফুটে উঠেছে যে ভাষায় সৌন্দর্য্য সেখানে বাঁদরের গলায় মুক্তাহারের মত হয়েছে।

ব্রজ। আর কাজ—হা হাঃ।

রাখাল। আর আমার সব মনে নেই, এইরকম আরো আছে।

ব্রজ। (ক্রোধ দমন করিয়া) আর কেউ হলে এতে নিশ্চয়ই চটে যেত।

রাখাল। তুমি চটবার লোক হলে কি আর তোমাকে এসব বলতুম? তোমাকে হাসাবার জন্যই এতটা বলা গেল।

ব্রজ। বাস্তবিকই বড় হাসি পাচ্ছে। আমার একটু নিজত্ব নেই,—একটু কল্পনা নেই—হা হাঃ।

নবীন। দেখ ব্রজ, তোমার কিন্তু, একটা প্রতিবাদ লেখা উচিত।

ব্রজ। প্রতিবাদ! কেন? আমি নাকি ওসব কথায় কেয়ার করি, তাই প্রতিবাদ!

নবীন। তা ত বটে, সে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

রাখাল। আমি যে খবরের কাগজের এতগুলা কথা বলে গেলুম, ভরসা করি, সে জন্য কিছু মনে করবেন না।

ব্রজ। মনে করব? অবাক! আমি ত আগেই বলেছি ওসব কথায় আমি কিছুই মনে করিনে।

রাখাল। তা ত বলেছেন—তবু কি জানি—

ব্রজ। তবু? তবুটার অর্থ কি বলুন দেখি?

নবীন। রাগ কর কেন ব্রজবাবু?

ব্রজ। (উগ্রস্বরে) রাগ! আমি একশবার বলছি আমি রাগ করিনি—তবু ঐ-কথা! তোমরা কি মনে কর খবরের কাগজওয়ালাদের আমি কেয়ার করি? তা মনে করলে আমার অপমান করা হয়। আমি খবরের কাগজকেও কেয়ার করিনে, আর যারা ওরকম ভাবে তাদেরও কেয়ার করিনে, আমি চল্লেম। (রাগিয়া প্রস্থান)

নবীন। ভায়া বড় রেগেছেন, কাল দেখছি বেনামা প্রতিবাদে খবরের কাগজ ভরে যাবে।*

ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৫

*সেরিডনের 'দি ক্রিটিক্' হইতে গৃহীত।

বিরহ বেদনা

নব বিবাহিত মতিবাবু বিষণ্নভাবে উপবিষ্ট, তাঁহার ভগিনীপতি বন্ধুবর মাধবের প্রবেশ।

মা। কি হে মতি, অমন করে গালে হাত দিয়ে কি ভাবা হচ্ছে? উঠতে আজ্ঞা হোক, আমাদের ওখানে একটা মজলিস আছে তাই তোমাকে নিতে এসেছি।

মতি। আমার শরীরটা বড় ভাল নেই—যেতে পারব না।

মা। তা কি হয়—তুমি না গেলে আমি ছাড়ব না।

মতি। ভাই মাপ কর—মজলিসে মেশার মত মন এখন আমার নেই—আমার অবস্থা ত জানই?

মা। তুমি কি ক্ষেপলে নাকি? আর কি কেউ বিয়ে করে না,—আমাদের কি স্ত্রী নেই?

মতি। তা ত আছে—কিন্তু—

মা। 'কিন্তু' এই মাত্র, তোমার স্ত্রীর বয়স ১০ বছর, —আর আমাদের স্ত্রী—স্ত্রীর মতন। সেই ১০বছরের মেয়ের প্রেমে তুমি এতটা যে কি রকম করে হাবুডুবু খাচ্ছ, এতটা ফোঁশ ফোঁশ করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছ—তা ত আমি বুঝতেই পারিনে।

মতি। হায়! তা তুমি কি করে বুঝতে পারবে? আমার প্রাণের প্রাণ—জীবনের জীবন,—আহা, না জানি সে আমার জন্য কতই কাতর। একটু গরম হলে, একটু বৃষ্টি হলে, একটু মৃদু বাতাস বইলে, একটু জোর বাতাস হইলে আমার বিরহে তাহার প্রাণ বোধ হয় আমারি মত আকুল হয়ে উঠে, হায় কে বলে দেবে—

মা। আমি বলে দিচ্ছি—অত ভাববার কোন কারণ নেই—আমি এইমাত্র—

মতি। এইমাত্র?—মতিবাবু—বল বল—কি এইমাত্র —? সে ত ভাল আছে—সুখে আছে মাধববাবু— ? সে সুখে আছে জানলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি। তার কথা শোনার জন্য যে আমি হা প্রত্যাশ করে আছি,—সে জল—আমি যে মীন—সে চাঁদ, আমি যে চাতক—

মা। চাতক না চকোর— ? তা যাই হও—আমি ভরষা দিচ্ছি—তুমি নিশ্চিন্ত হও, সে ভালও আছে—সুখেও আছে, আমি গাড়ী করে আসবার সময় দেখে এলাম নলিনী তাদের বাড়ীর বাগানে ছুটছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে।

মতি। সত্যি? সত্যি? তাকে ছুটছুটি করতে দেখলেন? আমি সেখানে নেই, আমা হারা হ'য়েও সে হেসে খেলে আমোদ করে বেড়াচ্ছে? আমার শ্যালি যে লিখেছেন নলিনী আমার বিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে, হায়।

(হরিবাবুর প্রবেশ)

মা। এই যে তোমার ভায়রাভাই হরিবাবু এসেছেন—তাঁকে জিজ্ঞাসা কর না, উনি বল্লে ত বিশ্বাস হবে? হরিবাবু, নলিনী কেমন আছে?

হরি। আমাদের নোলু?

মতি। (স্বগতঃ) আমাদের নোলু— ? উঃ, এতখানি আস্পর্দ্ধা?

মা। হ্যাঁ, তার কথাই বলছি, মতিবাবু শুনেছেন— সে অসুস্থ—তাই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?

হরি। হা হাঃ অসুস্থ? এইমাত্র আমরা সকলে বাগানে খেলা করছিলেম। তার সঙ্গে ছুটেছুটে আমার পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে—আমার পকেট থেকে চাবি চুরি করে আর দেবে না।

মতি। (স্বগতঃ) পকেট থেকে চাবি চুরি,—পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ, নলিনী এই তোমার ভালবাসা, এই তোমার প্রেম! হায়, কি বিশ্বাসঘাতকতা!

মা। তাপর চাবিটা ত পেয়েছেন? একজনের হৃদয়ে সে এমন চাবি দিয়েছে—যে আমি এত চেষ্টা করেও খুলতে পারছিনে, আবার আপনার সুদ্ধ মনের চাবি হারাবে না ত?

মতি। (সক্রোধে) মাধব ও-ঠাট্টা করো না—জান—

হরি। মতিবাবু, আপনার ভয় হচ্ছে নাকি? তা ভয় নেই। জানেন আজ দুটি গালে দুটি চড় মেরে তার কাছ থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়েছি, মন-চাবি যদি চুরি করে ত সেই রকম করে না হয় কেড়ে নেওয়া যাবে।

মতি। (দ্বিগুণ ক্রোধে) হরিবাবু, জানেন সে পরস্ত্রী? সে আমার স্ত্রী? তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে জানেন আপনি কতদূর অভদ্রতা করেছেন? এর জন্য আমার কাছে মাপ চাওয়া উচিত।

মা। মতি, তুমি কি সত্যই ক্ষেপেছ?

মতি। আমি ক্ষেপেছি? তোমার ধমনীতে একটুও আর্য্য শোণিত নেই, তাই তুমি ও-কথা বলছ, হরিবাবু—দাঁড়ান—দাঁড়ান—যদি ভরষা থাকে দাঁড়ান, যুদ্ধ চাই, আমি যুদ্ধ চাই।

(হস্ত আস্ফালন করত দণ্ডায়মান)

(হরিবাবু হাসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় চৌকিতে বসাইয়া) মাধববাবু, একটু জল আনুন, সত্যই মতি ক্ষেপেছেন।

মতি। (অবসন্নভাবে চৌকীতে মাথা হেলাইয়া) আঃ, কি ভয়ানক! কি অত্যাচার! কি অপমান। প্রাণ থাকিতেও এ অপমান আমি ভুলিব না। প্রিয়ে, তোমার মনে এই ছিল। রমণী, তুমি সত্যই ভুজঙ্গিনী। (ক্রন্দন)

ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৫

সূক্ষ্মার্থ

আকবরের প্রমোদ সভায় তানসেন সুরদাস রচিত গান গাহিলেন, "যশোদা বার বার ইহ ভাবৈ, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারৌ চলত গোপালহি রাখৈ।" সম্রাট বলিলেন —"বা কি তারিফ্? কিন্তু ইহার অর্থ কি ওস্তাদজি?"

তানসেন। যশোদা ঘড়ি ঘড়ি ইহাই বলিতেছেন, ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন যিনি আমার চলন্ত গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন?

আকবর বলিলেন, "যেমন গান তেমনি অর্থ; বহুত আচ্ছা ওস্তাদজি।"

রাজার প্রশংসায় প্রসন্ন হইয়া তানসেন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মন্ত্রী বীরবল এইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বলিলেন—

"মন্ত্রিবর—যশোদা বার বার ইহ্ ভাবৈ, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারৌ চলত গোপালহি রাখৈ। গানে তানসেন মন উদাস করিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

বীরবল হাসিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আপনি গানে উদাস হইয়াছেন, গানের অর্থে আমার উদাসীন হইতে ইচ্ছা হইতেছে। বার অর্থাৎ পৌর (পাড়া)—যশোদা পাড়ায় পাড়ায় গিয়া ইহাই বলিতেছেন, ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন যিনি গোপালকে আটকিয়া রাখিবেন। আহা!"

(টোডরমল্লের প্রবেশ)

টোডরমল্ল। মন্ত্রী মহাশয়, অর্থটা আমার সঙ্গত মনে হইতেছে না। বার অর্থে জল ও দ্বার, জলের দ্বার কি—না ঘাট, সুতরাং গানটির অর্থ দাঁড়াইতেছে—যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া ইহাই বলিতেছেন যে ব্রজে আমার এমন কোন মিত্র আছেন যিনি গোপালকে যাইতে না দিবেন।

কবি ফৈজি এতক্ষণ নিস্তব্ধে তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন—তিনি বলিলেন—"মহাশয়গণ, আপনারা চিরকাল মন্ত্রণা প্রদান করুন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, আপনারা আর গানের অর্থ ব্যাখ্যা করিবেন না।

"জাঁহাপনা, বার অর্থে জল এবং দ্বার সত্য, কিন্তু এখানে ইহা নদীর জলও নহে, জলের ঘাটও নাই। এখানে জল অর্থে অশ্রুজল এবং দ্বার অর্থে অশ্রুজলের দ্বার অর্থাৎ আঁখি, সুতরাং গানের অর্থ এই—যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন, ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন যিনি গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন?"

(নবাব খান খানানের প্রবেশ।)

আকবর। "নবাব সাহা, বিষম সমস্যা! তানসেন গান গাহিয়া গেলেন 'যশোদা বার বার ইহ্ ভাবৈ হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারৌ চলত গোপাল রাখৈ'—ইহার অর্থ লইয়া বড় গোল বাধিয়াছে, আপনাকে ভাঙ্গিতে হইতেছে।"

বীরবল। একবার আমার কথাটা আগে শুনুন, যশোদা বার বার অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় —গিয়া—

টডরমল্ল। তাহা হইতেই পারে না— যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া—

কবি ফৈজি। ইহারা কি বলে মশায়! যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া—

আকবর। কিন্তু তানসেন যিনি গানটি গাহিয়াছেন—তিনি বলেন—"ঘড়ি ঘড়ি যশোদা ইহাই বলিতেছেন যে ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছে যে গোপালকে ধরিয়া রাখে।" এখন আপনি মীমাংসা করুন ইহার কোনটি ঠিক?

নবাব খানান। মহারাজ, এ কোনটাই এই বিষ্ণুপদের ব্যাখ্যা নয়, সকলেই আপন আপন মনের অনুভাব বলিয়াছেন মাত্র।

বাদশাহ। সে কিরূপ।

নবাব। ঐ যে কলাবন্ত তানসেন যিনি ঘড়ি ঘড়ি নোম-তোম করেন, তাঁহার মনে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে যশোদা ঘড়ি ঘড়ি বলিতেছেন। আর বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ, পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ইঁহার মনে হইয়াছে যশোদা পাড়ায় পাড়ায় ফিরিয়া কহিতেছেন—ইত্যাদি। আর টোডরমল্ল তুমি মুৎসদ্দি—তুমি ঘাটে ঘাটে নৌকা বাহ আর

মাশুল আদায় কর—তোমার মনে ঘাটের কথাই আসিয়াছে, আর ফৈজি কবি—ইনি জগৎসুদ্ধ লোককে কাঁদিতেই দেখেন।

বাদশাহ। ইহা ত ঠিক কথা। তবে তুমি বল নবাব সাহা, ইহার অর্থ কি?

নবাব। 'বার' অর্থে কেশ। যশোদার প্রতি-কেশ ইহাই বলিতেছে, "ব্রজধামে আমার এখন কে মিত্র আছে—যে গোপালকে ধরিয়া রাখে।"

বলিয়া নবাব সাহা আপনার শ্মশ্রুতে সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন।

আকবর বলিলেন—"বাহ্‌বা! বাহ্‌বা!"

ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৫

তত্ত্বজ্ঞানী প্লুটার্ক ও তাঁহার শিষ্য

প্লুটার্ক। অহংকারের বিসর্জ্জনই সত্য জ্ঞানলাভের উপায়, সর্ব্বদাই মনে এই ভাব জাগ্রত রাখিতে হইবে। অহং বলিয়া বিশ্বসংসারে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, তুমি আমি সকলি সেই এক পরমাত্মাময়।

শিষ্য। কিন্তু কি করিয়া অহংকার পরিত্যাগ করিব প্রভু? আমি যখনি মনে করি এ বিশ্বসংসারে আমার আমিত্ব কিছুই নাই, তখনি জগৎ সংসার হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে থাকি।

গুরু। বৎস জিতেন্দ্রিয় হও, মনঃসংযম অভ্যাস কর, তাহা হইলেই এই দ্বৈত-ভাবাপন্ন সৃষ্ট জগতের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টের একত্ব অনুভব করিবে।

শিষ্য। সর্ব্বক্ষণই ত ভাবি মনঃসংযম করি—কিন্তু কি করিয়া করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

গুরু। মনঃসংযম—অর্থাৎ প্রবৃত্তি দমন। মানবগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি জয়ী হইলেই সত্যের আলোক দেখিতে পায়।

শিষ্য। ভগবান, যে মন্ত্র দ্বারা মনুষ্য প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে—আপনি তাহাই আমাকে প্রদান করুন।

গুরু। ইহার অন্য কোন মন্ত্রতন্ত্র নাই—নিজের ইচ্ছা, চেষ্টা, একাগ্রতাই প্রবৃত্তিদমনের একমাত্র মন্ত্র, একমাত্র উপায়। অল্পে অল্পে অগ্রসর হও—প্রথমে ক্রোধ দমন কর। অহংকার হইতেই ক্রোধের আবির্ভাব। যদি আমি জানি সংসারে আমি-তুমি নাই, তাহা হইলে কেই বা ক্রোধ করে—ক্রোধের পাত্রই বা কোথায়? ক্রোধ অহংকারকে জাগাইয়া রাখে—সুতরাং ক্রোধ মহা অনর্থের মূল। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে অজ্ঞানতার উদয়, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ক্রোধ দমনীয়।

শিষ্য। আপনার উপদেশে আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি—কিন্তু তথাপি ক্রোধের উদ্রেক তিরোহিত করিতে পারিতেছি না।

গুরু। অজ্ঞান! অজ্ঞান!

শিষ্য। প্রভু, যখন দুষ্ট দাস আপনার শিষ্টাচার ও সৌজন্যকে আক্রমণ করিয়া গালি বর্ষণ করিতেছিল—আমি কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি নাই। এ অজ্ঞানতা—

গুরু। আবার সে গালি পাড়িতেছিল?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

(দাসের প্রবেশ।)

গুরু। বৎস, দোষ সর্ব্বদাই শাসনীয়। উহাকে বেত্রাঘাত কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞে।

(দাসকে বেত্রাঘাত।)

দাস। (সক্রোধে) আমি কি দোষ করিয়াছি? বিনা দোষে আমাকে কেন মারিতেছেন? (পুনশ্চ বেত্রাহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সক্রোধে গুরুর প্রতি) ভণ্ড তপস্বি, এই তোমার জিতেন্দ্রিয়তা? এই তোমার তত্ত্বজ্ঞান? তুমি অন্যকে ক্রোধ দমন করিতে উপদেশ দাও, সংযমী হইতে বল, আর নিজে অন্যের উপর এইরূপ ব্যবহার করিয়া ক্রোধহীনতার দৃষ্টান্ত দেখাও।

প্লুটার্ক। (স্থির গম্ভীরভাবে) হতভাগ্য, পাষণ্ড, কি দেখিয়া তুই মনে করিলি আমি রাগিয়াছি? আমার মুখ, আমার স্বর, আমার বর্ণ, আমার বাক্য কিছুতেই কি ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে? আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয় নাই, মুখ রক্তবর্ণ কিম্বা স্বর ভয়ঙ্কর হয় নাই, আমি বেত্র সঞ্চালন করিতেছি না—কিম্বা দাপাদপি মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছি না, আমার মুখে ফেন নির্গত হইতেছে না—এবং এমন কোন কথা বলি নাই যেজন্য পরে আমার অনুতাপ করিতে হয়। রে মূঢ়, জানিয়া রাখ, এই সকলই ক্রোধের লক্ষণ। (শিষ্যকে বেত্রাঘাত বন্ধ করিতে দেখিয়া) বৎস, ইহাতে আমাতে যতক্ষণ এই বিষয় লইয়া বিচার চলিতেছে—ততক্ষণ তুমি তোমার কাজ করিতে থাক। থামিবার আবশ্যক নাই।

ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৫

সূক্ষ্ম ডাক্তারি

(অন্তঃপুরের বারান্দা, যাদবচন্দ্রের প্রবেশ)

যাদব। তোর হাতে কি রে, মানি? বড় এলাচ বুঝি? ফেলে দে—ফেলে দে, এমন অসুখ করবে!

(মানির দ্রুতবেগে পলায়ন)

যাদব। (পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে পথে খোকাকে দেখিয়া)—তোর গাল ট্যাবলা যে? কি খাচ্ছিস?

খোকা। মিশলি।

যাদব। (কোলে লইয়া) ছিঃ! মিছরি খায় না, ফেলে দে, হাতে আরো রয়েছে যে, —দেখি—?

খোকা। কাকাবাবু খাবি? (এক টুকরা যাদবের মুখে—এবং বাকী সমস্তটা নিজের মুখে পুরিয়া) তুই খা, আমি খাই?

যাদব। আচ্ছা খা, কিন্তু যেন খাসনে, বুঝলি? ঝি, খোকাকে নে। এই যে শশি, সন্দেশ খাচ্ছিস? কে দিলে? ফ্যাল, বলছি—ফ্যাল, ফ্যাল। সদ্য এতে ওলাওঠা হবে, ডাক্তার কনেমারা স্পষ্ট লিখেছে। (শশির হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া নিক্ষেপ—শশির কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।)

(মেজ বোয়ের ঘর, যাদবের প্রবেশ।)

যাদব। শুয়ে যে? আহারের ব্যবস্থা কেমন চলছে বল দেখি?

বৌ। তুমি ভাই, যেমন বলেছ।

যাদব। বেশ বেশ,—এবার দেখবে দুদিনে কেমন হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। Secretটা কি জান? যে খাদ্য সহজে জীর্ণ করতে পারবে তাই খাবে, হজমেই আমাদের শরীর ; যদি বিশ্বাস না কর ত বরঞ্চ তোমাকে ডাক্তার কার্পেন্টারের ফিজিয়লজিখানা খুলে দেখিয়ে দিই।

বৌ। তার দরকার নেই, তুমি যা বলেছ আমি ঠিক তেমনি করছি।

যাদব। ইনোস ফ্রুট-সল্ট টা খাচ্ছ ত? ওতে হজমের একটু help করে—

বৌ। হ্যাঁ।

যাদব। আয়রণ? ওটা একটু জোরাল—

বৌ। খাচ্ছি বই কি?

যাদব। তবে বল বেশ আছ, তোমার আর complain করার কিছুই নেই?

বৌ। হ্যাঁ—তা—তা মন্দ নেই, কিন্তু গা মাথাটা কেমন ঘুরছে।

যাদব। সে আবার কি? তাহলে নিশ্চয়ই আহারের কোন অনিয়ম হয়ে থাকবে। ও একটা অজীর্ণের লক্ষণ কি না। বোধ করি লুচি খেয়েছ? আমি ত বলেছি লুচিটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষ।

বৌ। না ঠাকুরপো, তুমি বলা পর্য্যন্ত লুচি মোটেই খাইনি।

যাদব। পাঁটার মাংসটা বুঝি ছাড়তে পারনি। তোমার ত দেখতুম লুচি আর মাংস নইলে চলে না।

বৌ। না মাংসও ছেড়েছি।

যাদব। মাংস একটু খেলে হানি আছে তা নয়, তবে তোমরা যে ঘি মসলা দিয়ে রাঁধ,— তাছাড়া দুধটাও তোমাদের সে সঙ্গে ত বাদ পড়ে না,—মাংস আবার দুধ, বড় খারাপ, বড় খারাপ।

বৌ। দুধও ছেড়েছি।

যাদব। তা ভালই,—কম খেলেই শরীর ভাল থাকে। তবে গা-ঘোরাটা কেন হোল? ফল খাও বুঝি? ফলটা বড় বেহজমি—তা জান?

বৌ। না, ফল খাইনি।

যাদব। তবে আর ত কোন কারণ দেখছিনে, ওঃ! ফস্‌ফোডাইনটা খাওনি বুঝি?

(দাসীর বরফজল লইয়া প্রবেশ।)

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! বরফজল! তাই বল! আমি ভেবে মরছি—কেন ওরকম হোল। কি ভয়ানক? নিয়ে যা নিয়ে যা, এ শরীরে বরফজল খেলে এখনি ইন্‌টেস্টাইনের Overturn হবে।

দাসী। বৌঠাকরুণ কদিন থেকে কিচ্ছু খাচ্ছে না—অরুচি করেছে, না খেয়ে খেয়ে ঘুরনি রোগে ধরেছে, একটু ঠাণ্ডা জল খেলে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে, তাই নিয়ে এনু, খেতে দাও দাদাবাবু। বুঝছ না—এটা অরুচি,—কারো কারো এ সময়ে—

যাদব। খেতে দেব বই কি? আমি নিজে হাতে বিষ দিই এই ওনার ইচ্ছা! বরফজল খেয়েই ত গা ঘুরছে। নিয়ে যা বলছি।

বৌ। না ঠাকুরপো, আমি আগে খাইনি, এই খেতে যাচ্ছিলুম।

যাদব। অজীর্ণ ত আর অমনি হয়নি, অবিশ্যিই তাহলে আর কিছু কুপথ্যি করেছ।

দাসী। না গো না, বৌঠাকরুণ সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত দুটি ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয়নি—তাও খেতে না খেতে—

যাদব। ভাত! শুধু ভাত। দাঁড়া দেখি, তাতে কি প্রপার্টি আছে, ওঃ! বুঝেছি, গা ত ঘুরবেই, ওতে আলকহল আছে কি না। বোধ হচ্ছে পরিমাণে কিছু বেশী হয়ে পড়েছে, একটু বুঝে-সুঝে খেও।

দাসী। এমন ন্যাকা মানুষও কোথাও দেখিনি! কেন অরুচি হয়েছে, সেটা আর বুঝছ না! তবে জল এই রইল—আমি চন্নু।

(দাসীর প্রস্থান—বড় বৌয়ের প্রবেশ।)

বড়বৌ। ও মেজবৌ, কদিন থেকে তোর মুখে কিছু রুচছে না, এই টাটকা নিমকি ভেজে নিয়ে এলুম। দেখ দেখি খেয়ে দুখানা, কেমন লাগে।

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! নিমকি। তবেই হয়েছে?

বড়বৌ। তুমিও খাও না একখানা, দেখ না কেমন হয়েছে।

যাদব। না না ওসব খেতে নেই, অসুখ করে।

বড়বৌ। ডাক্তারির জ্বালায় ত আর বাঁচিনে বাবু, তবে তোমার খেয়ে কাজ নেই, মেজবৌ, ধর একখানা খা।

যাদব। আচ্ছা কই দেখি? বেশী না কিন্তু, একখানা! মন্দ হয়নি, আর একখানা দেখি, না আর দুখানা দাও।

বড়বৌ। এই থালা শুদ্ধ রইল, তোমার যখানা ইচ্ছা খাও না বাবু।

(একে একে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া)

যাদব। স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, তোমাদের হাতে পড়ে দেখছি আমি শুদ্ধ মারা গেলুম। যাই, এক গ্লাস পাইরেটিক্‌ স্যালাইন খাইগে।

ভারতী, ১২৯৮

প্রলয় কাণ্ড

(হরি গৃহে বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন,
হরের প্রবেশ।)

হর। কি পড়ছ ভায়া?

হরি। এই যে হর, এস এস, তোমাকে না শুনিয়ে কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না!

হর। পড় পড়—আমিও চাতকের মত তৃষিত হয়ে আছি! সেই কাব্যখানা বুঝি শেষ হোল? কি নামটা? এই যাঃ, ভুলে যাচ্ছি যে!—

হরি। সিন্ধু প্রভঞ্জন।

হর। ঠিক ঠিক! সিন্ধু প্রভঞ্জন,—লিখে লিখে মেমরিটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে —অনবরত ব্রেনের একসাইস কিনা! পড় পড়,—তারপর— আমার নাটকের শেষটাও শোনাব এখন, সঙ্গে এনেছি।

হরি। বেশ!

আলোড়ি বিমথি সিন্ধু ভীষণ গর্জ্জনে—
নিক্ষেপি প্রবল বেগে—উত্তাল নিবিড়—
তরঙ্গ মহান উচ্চ পর্ব্বত সমান,
ঘেরিয়া অম্বরতল, ঢাকি বিবস্বান্—
প্রলয়ের প্রভঞ্জন ঘোষিলা সরোষে—
করাল আঁধারে পৃথ্বী করিয়া মগন!!!

হর। থাম ভাই, একটু থাম, আমার মাথা ঘুরে গেল, আমার চোখে আর এককণা সূর্য্যকরও বিভাসিত হচ্ছে না,— বিশ্ব মহা অন্ধকারে—আত্মা প্রলয়ান্ধকারে মগ্ন হয়ে পড়েছে! চমৎকার চমৎকার!

হরি। কি বল ভাই হর,—সত্যি? তোমার নাটকের নায়িকার রূপবর্ণনা শুনতে শুনতে আত্মা যেমন সপ্তম স্বর্গের চূড়ায় দুলতে থাকে, তেমনি এ কবিতাটা কি সত্যিই—

হর। সত্যি বলছি হরি, সত্যি! এবার আমাদের হতে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য নিশ্চয়ই ফেল হবে, নিশ্চয় নিশ্চয়! কোন সন্দেহ নাই! সরস্বতী সেই আদি যুগে বাল্মীকিতে আবির্ভাব হয়েছিলেন—আর এ যুগে এতদিনে—

(বিষ্ণুর প্রবেশ।)

বিষ্ণু।— হরি হরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে হরিহরের একত্র সাক্ষাৎ লাভ করেছি।

হরি। এস এস বিষ্ণু এস—বন্ধুবর, —এতক্ষণ তোমারি অভাব অনুভব করছিলেম।

হর। এখন মন সন্তুষ্ট হোল, প্রাণ তৃপ্ত হোল, হরিহরে আত্মার আবির্ভাব হোল —এস ভাই এস। হরি ভাই! তোমার কবিতাটা আর একবার পড়ে—বিষ্ণুকে শোনাও না।

হরি। না না, তোমার নায়িকার রূপ বর্ণনাটি আগে শোনাও। বলব কি বিষ্ণু—প্রতি অক্ষরে অক্ষরে রতিদেবী যেন মূর্ত্তিমতী অথচ তাতে একটি অশ্লীলতা নেই— সমস্তই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ!

বিষ্ণু। দুঃখ কেবল এই,— লোকগুলাকে এ কথা কিছুতেই বোঝাতে পারছিনে; তাদের রুচি এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে তারা অশ্লীলতাকে শ্লীলতা, কুভাবকে সুভাব, ঐন্দ্রিয়িককে আধ্যাত্মিক ভেবে নিয়ে প্রমাদ ঘটাচ্ছে।

হরি। কি দুঃখ কি দুঃখ, বেচারাদের জন্য বড় দুঃখ।

হর। উঃ বল কি। এইসকল দীনহীন হতভাগ্যদের পরিত্রাণের—পাপীতাপী উদ্ধারের উপায় হবে কি করে।

(উভয়ের রোদন।)

বিষ্ণু। ভেবো না, দাদারা কেঁদ না। সে উপায় আমি ঠিক করেছি। হরিহর আত্মায় মিলিত হলে বিশ্ব রসাতলে যায়— আর আমরা সাহিত্যে এতটুকু বিপ্লব ঘটাতে পারব না! এই দেখ ব্রহ্মাস্ত্র, হিমালয় হতে কুমারিকা এতে কম্পিত হয়ে উঠবে, সূর্য্য চন্দ্র তারকা জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, বঙ্গসাহিত্য ভেঙ্গেচুরে একেবারে রসাতলে নিমগ্ন হবে,—আর সেই প্রলয় পয়োধিজলে কেবল আমাদের নূতন সাহিত্যগুলি নারায়ণের মত ভেসে ভেসে বেড়াবে।

হর। ও হরি! আমার মাথা যে ভোঁভোঁ করছে, মনে হচ্ছে আমি সেই প্রলয়ান্ধকারে নিমগ্ন হয়ে পড়ছি!—

হরি। আর আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন নারায়ণ হয়ে সেই প্রলয়জলে পদ্মপত্রের উপর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি।

বিষ্ণু। আর আমার মনে হচ্ছে—আমি তোমাদের দুজনকে ধরে টেনে টেনে ডাঙ্গায়

হরি-হর। (দুজনে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) বন্ধু হে, তুমিই ভরসা।

ভারতী, ১৩১৭

মহিলা-মজলিস

আজকাল ইংরাজমহিলাগণ অনেকেই বঙ্গরমণীগণের সহিত মিশিতে সমুৎসুক। পরস্পর মেলামেশায় যে মঙ্গল হয়, ইহা তাঁহারা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজ-বাঙ্গালীর মিলন-উদ্দেশ্যে মিশ মেরি কার্পেণ্টার ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পুরুষদের যেমন ক্যালকাটা ক্লব—কলিকাতার উক্ত শাখাসমিতি সেইরূপ এখন ইঙ্গবঙ্গ রমণীর মিলনস্থল। বড়লাট, ছোটলাটের পত্নী হইতে এখানকার অধিকাংশ উচ্চপদস্থ ইংরাজ গৃহিণী এবং সম্ভ্রান্ত বঙ্গ রমণী, পারসী রমণী, দুই একজন মুসলমান রমণীও এই সমিতির সদস্যা। মর্য্যাদাসম্পন্ন সদস্যাগণ, এমন কি বড়লাট ছোটলাটপত্নীও সময়ে সময়ে নিজগৃহে সমিতির সমস্ত মেম্বরদিগকে আহ্বান করিয়া আদর আপ্যায়িত করেন। এইরূপ নিমন্ত্রণে সর্ব্বস্থলেই পরদার সুবন্দোবস্ত থাকে। একবার লেডি

মিণ্টোর এইরূপ একটি পার্টিতে লর্ড মিণ্টোকে বাধ্য হইয়া বাগানে তাম্বুর মধ্যে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পার্টির সময় লর্ড মিণ্টো বাড়ী ছিলেন না; গভর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—তখনো তাঁহার ভিতরে প্রবেশ নিষেধ; মেয়েরা তখন গাড়ীতে উঠিতেছেন। তাঁহার আর বাড়ীতে ঢোকা হইল না; বাগানেই রহিয়া গেলেন।

অল্পদিন হইল, আমাদের লোকপ্রিয় চিফজষ্টিস্ জেনকিন্স সাহেবের পত্নী এইরূপ একটি পার্টি দিয়াছিলেন—জাহাজে। গঙ্গার উপর রোডাস নামক জাহাজে জেনানা পার্টি; পরদার কড়াক্কর বন্দোবস্ত; গঙ্গার কিনারায় যেখানে গাড়ী থামে সেইখান হইতে সুরু করিয়া জাহাজ পর্য্যন্ত জেটির দুইদিক কানাতে ঘেরা। কেবল তাহাই নহে, গঙ্গা হইতে অন্য কোন জাহাজ নৌকার বা এ জাহাজেরই দাঁড়িমাঝিখালাসীর দৃষ্টি পাছে রোডাসের অন্দরমহলে পৌঁছে, এই বিপদ নিবারণ জন্য তাহার চারিদিকে কাপড়ের পরদা ফেলা। বাঙ্গালী সমাজে অবশ্য এরূপ পরদার চলন কোন কালেই নাই, তবে ইহা নবাবী আদপ কায়দা বটে! জজের মেম জেনানা বলিতে এইরূপ জেনানাই বুঝেন। তাই বহু কষ্ট ও অর্থব্যয় করিয়া বিলাতী জাহাজকেও এইরূপ জেনানা করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ফলে যাঁহারা কোন জন্মে পরদার ধার ধারেন না তাঁহারাও আজ অসূর্য্যম্পশ্যা। এক হিসাবে ভালই হইয়াছিল, দিনটা সেদিন বেশ একটু গরম ছিল, জাহাজ পরদাঢাকা থাকাতে পড়ন্ত রৌদ্রতাপ কাহাকেও ভোগ করিতে হয় নাই। রোডাসে উঠিবার নিমন্ত্রণ ছিল, ৩টা ১৫ মিনিটের সময়। তবু সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিতাগণ আসিয়া ফেরেন নাই। কিন্তু ইহারও পরে প্রায় চারিটার কাছাকাছি দুইটি ইংরাজমহিলা নদীতীরে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। আমাদের লজ্জা নিবারণ হইল, যে তাঁহার বঙ্গ রমণী নহেন।

নিমন্ত্রিতাগণের মধ্যে লাট সাহেবের পত্নী হইতে বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের মেম, ভূপালের বেগম, হাতুয়ার মহারাণী এবং অন্যান্য রাণী মহারাণী হইতে আমাদের মত নগণ্য লোকেরও অভাব ছিল না। এইরূপ কোন নিমন্ত্রণে ইংরাজ রমণীর আতিথ্য সমাদরে মন মুগ্ধ হইয়া যায়, লেডি জেন্‌কিন্স আবার আতিথ্য কার্য্যে তাঁহাদেরও আদর্শস্থানীয়া। প্রকাণ্ড জাহাজের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত নিমন্ত্রিতা মহিলাগণে পূর্ণ, তিনি বায়ুগতিতে যেন সর্ব্বত্র বিরাজিত হইয়া সকলকেই আদর আপ্যায়িত করিতেছেন। বড়লাটপত্নী হইতে বিধবাশ্রমের দরিদ্র বিধবা রমণীটি পর্য্যন্ত তাঁহার সমাদরে পরম পরিতৃপ্ত। কি ক্ষিপ্রগতি! কি অশ্রান্ত উৎসাহ-উদ্যম! দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়, —যেন অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোটকী। আমরা আজন্মকাল গজেন্দ্রগতিতেই অভ্যস্ত, ইহার জন্যই প্রশংসাপ্রাপ্ত; আমাদের পক্ষে এরূপ দৃশ্য একেবারেই তাজ্জব ব্যাপার!

সেদিন অনেকগুলি পা-খোলা বঙ্গযুবতীর সুন্দর নূতন মুখ দেখিলাম, দুই একটি কজ্জলাঙ্কিতাক্ষী মুসলমানরমণীর সহিতও প্রথম পরিচিত হইলাম। ভূপালের বেগম সাহেবের পৌত্রীকে দেখিতে বড়ই সুন্দর! ইংরাজ মেমেরা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, বেগম যে এক সময়ে ঐরূপ সুন্দরী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়, পৌত্রী অনেকটা তাঁহারই অনুরূপ। সম্ভবতঃ একথা সত্য, কিন্তু আমি তাহা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। হাতুয়ার রাজকন্যা কাশীকুমারী সুন্দর বাঙ্গলা বলিতে পারেন ;শুনিয়া বড় প্রীত হইলাম।

অনেক মেমই অন্তঃপুরিকাগণের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বা ভাঙ্গা

হিন্দুস্থানীতে কেহ বা শ্রুতিসুখকর উচ্চারণে কথিত অবোধ্য বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

আমরা ইংরাজী কহিবার সময়—পাছে একটা ভুল হইয়া যায় সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠি, একটা ভুল করিয়া ফেলিলে কত লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু তাঁহারা যখন আমাদের ভাষায় অজস্র ভুল করেন তখন ত তাহাতে তাঁহাদের লজ্জার কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। বিদেশী ভাষা ভুল হইবারই ত কথা, এই ভুল ভ্রান্তি উপেক্ষা করিয়াও আমাদের সহিত কথা কহিবার তাঁহাদের যে প্রয়াস—ইহাতে মনে মনে তাঁহাদের সুখ্যাতিই করি। ইংরাজ-উচ্চারিত এই অপূর্ব্ব বাঙ্গালা বুলি শুনিয়া যে আমরা হাসি না তাহা নহে; কিন্তু সে হাসি ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপজনক নহে। সত্য কথা বলিতে হইলে,—বালকের আধ আধ বুলি শুনিতে যেরূপ ভাল লাগে, আমার ত ইংরাজদের মুখে দেশী বুলি শুনিতে সেইরূপ বেশ একটা প্রীতির উদ্রেক হয়।

অনেক ইংরাজমহিলা আজকাল বুঝিয়াছেন বাঙ্গলা না জানিলে অন্তঃপুরিকাগণের সহিত প্রকৃতভাবে মেলামেশা একরূপ অসম্ভব। কেহ কেহ উৎসাহের প্রথম মাত্রায় শিখিতেও আরম্ভ করেন, অর্থাৎ কিছুদিন পণ্ডিতকে মাহিয়ানা দেন। অবশেষে শিক্ষার কষ্ট শেষ পর্য্যন্ত স্বীকারে অসমর্থ হইয়া শিক্ষা বন্ধ করেন। এ সম্বন্ধে কথা উঠিলে প্রায়ই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—

"ওঃ, বাঙ্গালা ভাষা কি কঠিন!" আমরা বলি "ইংরেজি ভাষা আরও কঠিন, তবুও ত আমরা শিখি।" ইহার আসল উত্তর, ইংরাজি না শিখিলে আমাদের চলে না; তাঁহাদের পক্ষে যদি বাঙ্গালা শিক্ষা আমাদেরই মত প্রয়োজনীয় হইত তবে এজন্য কোন কষ্ট স্বীকারেই তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না। কিন্তু এরূপ স্পষ্ট উত্তর ভদ্রতার কথোপকথনে চলে না; তাঁহারা আমাদের বুদ্ধির অপরিমিত প্রশংসা করিয়াই এরূপ স্থলে আমাদিগকে নিরুত্তর করিতে চান।

"তোমরা কি clever! কি করিয়া এমন ইংরাজি শেখো! আমরা এত কষ্ট করিয়াও ত বাঙ্গালা শিখিতে পারি না" ইত্যাদি।

"এত কষ্টের" অর্থ অবশ্য ক্লাইবের বঙ্গবিজয়ের ন্যায় কিছু কষ্ট না করিয়াই তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাটাকেও মারিয়া লইতে যান,—আর আমরা ইংরাজী শিক্ষার জন্য আজীবন প্রাণপাত করি। যাহা হউক, প্রশংসা সর্ব্বস্থলেই উপভোগ্য, ঝুটা হইলেও খোস খবরের আদর সর্ব্বত্র। তবে এই প্রসঙ্গে সময় সময় যে সকল কৌতুকজনক গল্প জমে, তাহা যে অধিকতর উপভোগ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নিম্নে তাহার একটু নিদর্শন দিলাম।

মিশেষ অ—একজন সিভিলিয়ানের মেম, এদেশে আসিয়া, চাকরদিগের সহিত কথা কহিবার সুবিধার জন্য হিন্দুস্থানী শিখিতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই মুন্সি মহাশয়ের সার্টিফিকেট লাভে গর্ব্বিত হইয়া ভৃত্যদিগকে বিদ্যার পরিচয় দানের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন মুন্সি পড়াইয়া চলিয়া যাইবার পর নিয়মিত সময়ে ভৃত্য খানার হুকুম লইতে আসিল। মেমসাহেব আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন আজ তাহার সহিত হিন্দুস্থানীতে কথা কহিয়া তাহাকে তাজ্জব করিয়া দিবেন। ভৃত্য প্রতিদিনকার মত ভাঙ্গা ইংরাজীতে তাঁহার হুকুম ভিক্ষা করিবামাত্র তিনি হিন্দুস্থানীতে বলিলেন,—"আজ—টু—

মাটাকো—দুম—কা—বাব—বানাও—", শুনিয়া সে বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া রহিল—মেমসাহেব পুনরায় সেই কথাই আওড়াইলেন, তখন হাসিতে তাহার পাঁজরা কাঁপিতে লাগিল, তথাপি কোন রকমে হাস্য সম্বরণ করিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। মেমসাহেব ত ভৃত্যের বে-আদপিতে রাগিয়া আগুন।—কিন্তু পরে সাহেবের তদন্তে প্রকাশ পাইল, ভৃত্য তাঁহার কথার অর্থ এই বুঝিয়াছিল—"মাতার ল্যাজের বাপ বানাও।" সেই হইতে মেমসাহেব আর চাকরদের সহিত হিন্দুস্থানীতে কথা কহিবার চেষ্টা করেন নাই।—এই গল্পটি গল্পকর্ত্রী যেমন রসান দিয়া গল্প করেন, আমি তেমন পারিলাম না।

একজন ফ্রেঞ্চ মেম—আমাদের পরিচিত একটি বাঙ্গালী-ব্যারিষ্টারের পত্নী—এইরূপ প্রসঙ্গ উঠিলেই মজা করিয়া বলিতেন—"জাহাজ হইতে এদেশে মাটীতে পা দিয়াই আমি যে দুইটি দেশী কথা শিখিয়াছি—তাহাতেই চাকরদের সঙ্গে কথা কহিবার কাজ আমার বেশ চলে,—আর বেশী কিছু শিখিবার প্রয়োজন দেখি না।"—কথা দুইটি হইতেছে "শূয়ারকি বাচ্ছা" আর "জাহান্নম্ যাও"।

মিশেস বি—একজন জজের মেম ; তিনি একদিন বলিতেছিলেন, তিনি ঠিক দুটি বাঙ্গালা কথা জানেন—"জল আন।"

আমি বলিলাম,—"তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না, অসময়ে এই দুটি কথাই আপনাকে কোনদিন রক্ষা করিতে পারে। আমাদের দেশের একটি লোক বহুপূর্ব্বে তিনটি কথায় কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিল।"

জজের মেম জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে তিনটি কথা কি?"

"Yes, no, very well. সেকালে একজন এই তিনটি কথা শিখিয়া পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্টেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এমন বিদ্যার পরিচয় পাইবামাত্র সাহেব যে তাহাকে তাঁহার সেরেস্তাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। লোকটাকে অনেকে গুলিখোর বলিয়াই সন্দেহ করিত। একদিন নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল, তাহার বহুদিনের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হইয়াছে ; স্বয়ং ম্যাজিষ্টেট সাহেবের এজলাসে সে হাজির। এখানে কে আনিল ; কেন আসিল, সে কথা জিজ্ঞাসার সে আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। সে বেশ জানে,—ম্যাজিষ্টেট সাহেব তাহার বিদ্যার পরিচয় গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জন্যই চৌকিদার তাহাকে এখানে আনিয়াছে। সে যে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত একথা তাহার মনের ত্রিসীমাতেও আসে নাই। পরীক্ষাপাশের পর চাকরী পাইলে মাহিয়ানাটা লইয়া সে কিরূপ ব্যয় করিবে তাহার কল্পনাতেই সে তখন নিমগ্ন,—এমন সময় ম্যাজিষ্টেট সাহেব ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তুমি চুরি করিয়াছ?"

সে অমনি বুক ঠুকিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল,—"Yes," সে ভাবিল জজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি চাকরী লইবে?

জজ কহিলেন,—"তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

"No"—

"তবে তোমার জেল হৌক—"

"Very well."

খুব একটা হাসির উচ্ছ্বাস জমিল— জজের মেম বলিলেন—"দুইটি বাঙ্গালা কথা শিক্ষার ফল আমার পক্ষেও এইরূপ শোচনীয় দাঁড়াইবে নাকি!"

এই সময় লেডি জেন্‌কিন্স আসিয়া চা-পানের জন্য আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। নীচের ক্যাবিনে জলযোগের বন্দবস্ত, ইংরাজি-বাঙ্গালা নানারূপ মিষ্টান্নের সমাবেশ,—মেমরা স্বয়ং পরিবেষণ করিতেছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—কিছুরই অভাব নাই, পানটি পর্য্যন্ত আছে।

তখন ৫টা, জাহাজ তীরাভিমুখে চলিয়াছে ; পশ্চিমের বায়ুবিক্ষিপ্ত পরদার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে সূর্য্যকিরণ অন্দরে প্রবেশ করিতেছে, বাসনের ঠুংঠাং ও মহিলাগণের আনন্দ হাস্যের সহিত জাহাজে প্রতিহত জলের ঝলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠিতেছে। পরদার আড়ালে দিগন্ত আবরিত ; ক্যাবিনের তক্তায় বসিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্বল্প প্রসর স্থানের মধ্যে গঙ্গার জলস্রোত কেবল চোখে পড়ে।

এক্‌টুকরা কেক হাতে লইয়া আমি নিম্নমুখ হইয়া সেই উছলিত জলস্রোতের দিকেই চাহিয়া ছিলাম। সহসা একটি কৌতুকনাট্যের আখ্যান-উপাদান সেই জলস্রোতের মতই ছলাৎ ঝলাৎ শব্দে আমার মস্তিষ্কে ধাক্কা দিয়া আমাকে সচকিত করিয়া তুলিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, আহারগৃহ হইতে সকলে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—কেকখণ্ড জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম জাহাজ জেটিতে লাগিয়াছে, লেডি জেঙ্কিংস —লেডি হার্ডিংকে লইয়া তীরের দিকে চলিয়াছেন। আমরাও সকলে তাঁহাদের অনুগমন করিলাম। পরে পরে যথারীতিতে সকলকে বিদায় অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। আমি গাড়ীতে উঠিয়া সেই হেঁয়ালি নাট্যটিরই ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। বাড়ীতে আসিয়া কাগজ কলমে তাহার যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছি—যে সকল পাঠিকা সেদিন জাহাজে যাইতে পারেন নাই,—তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ তাহা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইল।

ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯

শিক্ষা-বিভ্রাট

১

[তালপুকুরের মিশন্ হাউসের বড় মেম মিশ নেলসন তিনকড়ি তালপাত্রের নিকট বাঙ্গলা শিখিতেছেন। মেমসাহেব বই খুলিয়া পড়িয়া যাইতেছেন ; পণ্ডিত মহাশয় উচ্চারণের ঘোরফের এবং বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছেন।]

পণ্ডিত। বাঙ্গলায় অকারান্ত শব্দে প্রায়ই অকার উচ্চারিত হয় না—যেমন, সুর অসুর, দেব্‌ নর, ঘর বর,—ইত্যাদি।—

মিশ। বুঝিল—আমি ঠিক বুঝিল।

প। 'বুঝিল'—না—বুঝিলাম।

মেম। ওঃ কেবলি ভুলিয়া যাইলাম! তিনি আবার পড়িতে লাগিলেন, "সুরাসুর মিলিয়া সাগর মন্থন করিল, দেবগণ অমৃৎ লাভ করিলেন, আর"—

পণ্ডিত। অমৃৎ নহে, অমৃত। কতকগুলি অকারান্ত শব্দে অকার উচ্চারিত হয়,— যেমন অমৃত, অজ, গজ, প্রবাহ, শুভ—

মিশ— বর্ (বড়) কঠিন; বর্ কঠিন! (বলিতে বলিতে খাতায় কথাগুলি টুকিয়া লইয়া মুখস্থ করিতে লাগিলেন)—

"সুর অসুর,—ঘর বর,—অমৃত অজ, গজ। ভাল্ হইল, পণ্ডিত মহাশয়?"

প। ভাল্ নহে, ভাল-অ। ভাল্ অর্থে, কপাল।

মি। আমার ভাল্ বর্ (বড়) মন্দ আছে—শিখিতে না পারিলাম। ঠিক হইলাম?

প। ঠিকই হইয়াছে—কেবল বড় না বলিয়া বড় বলিলে আরও ঠিক হইত—আর—

মিশ। Ah! I am getting despondent—Oh Pundit, save me!

প। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই— বাঙ্গলা শিক্ষার একটি সহজ উপায় বলিয়া দিই শুনুন।

মিশ। বলুন—বলুন।—

প। আপনার দেখিয়াছি একজন বাঙ্গালী খৃষ্টান ঝি আছে—

মিশ। জি কাহাকে বলে?

পণ্ডিত। মেড সার্ভেন্টকে আমরা ঝি বলি। হিন্দুস্থানীর বদলে তার সঙ্গে বাঙ্গলা বলিলে শীঘ্র বাঙ্গলা শিখিয়া ফেলিবেন।

(মেমসাহেব আনন্দ সহকারে বলিলেন)—

"Good idea! আমি শিখিল, ও—ঠিক শিখিলাম? Thank you পণ্ডিত।"

পণ্ডিত মহাশয় ধন্যবাদ লইয়া চলিয়া গেলেন—মেমসাহেব ডাকিলেন—"মেরিয়া।" মেরিয়া হাজির হইয়া সেলামপূর্ব্বক বলিল—"বরা মেমসাহেব, ক্যা হুকুম?" মেরিয়া পূর্ব্ববঙ্গের লোক, সেও মেমসাহেবের মত—ড়কে র উচ্চারণ করে।

মিশ। মেরিয়া, জি,—টুমি যাও—শীগর শীগর যান আন।

ঝি করযোড়ে বলিল—বরা মেমসাহেব, আপনি আমাকে জি বলেন কেন? আমি আপনাকে জি বলিব—আপনি আমাকে জি বলিবেন না।

বড় মেম অবাক হইয়া গেলেন, পণ্ডিতের কথা ভুল হইবার নহে—মেরিয়া যে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বোঝে না—এই কথা তাহারই প্রমাণ,—তাহার সহিত কথা কহিলে তবে ত ভুল শিক্ষাই হইবে! তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া রহিলেন,—মেরিয়া ইতিমধ্যে ঘরের বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হাতে একটি কাগজের বাক্স প্রদান করিল। তিনি বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ কি আছে?"

"শিগার!"

"কেন?"

"আপনি যে আনিতে হুকুম করিলেন!"

"Oh my God" বলিয়া মেমসাহেব মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—ওঃ বাঙ্গলা শিক্ষার প্রাইজটা আর পাইলাম না— পাইলাম না। তারপর দাসীকে বলিলেন, "যাও মেরিয়া, গাড়ী বোলাও—", মেরিয়া চলিয়া গেল; তিনি স্থির করিলেন— গাড়ী আনিলেই প্রথমে পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়ী যাত্রা করিবেন। তালপাত্রের বাড়ীর মেয়েদের সহিত প্রতিদিন কিছুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহাই তিনি প্রাইজ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

২

[তিনকড়িবাবু তখন বাড়ী ছিলেন না, তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা চারুলতা মেমসাহেবকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে আনিয়া বসাইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত।]

চারু। মা বাড়ী নাই—মামার বাড়ী গেছেন, ঠাকুরমা রান্নাঘরে। তিনি এখনি আসবেন, আপনি বসুন।

মিশ। তোমার বাবা কোটায়?

চারু। জানি না।

মিশ। তুমি কি পরিল? (কি পড়?)

চারু। সাড়ী—দেখিতেছেন না?

মিশ। কি বই পরিল?

চারু। কি বই? দুর্গেশনন্দিনী!

মিশ। দুর্গেশি-ননডিনী! আমিও পরিলাম—ভুল হইলাম কি!—

এই সময় ঠাকুরমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চারু। ঠাকুরমা, মিশ নেলশন এসেছেন, বাবা এঁকে পড়ান।

"কেমন আপনি কেমন?" (How do you do) বলিয়া মেমসাহেব সেক্‌হ্যাণ্ড করিতে হস্ত বাড়াইলেন। ঠাকুরমা শুচিবাতিকগ্রস্ত লোক—তিনি দুই পা সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—

"সেলাম মেমসাহেব। এই রান্নাঘরের কাপড়খানা পরেছি,—ছোঁব না আর; বস' তুমি,—মেমসাহেব, তোমার কটি ছেলে?"

এই সময় পণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রবেশ করায় মেমসাহেব্‌কে এই অপ্রীতিকর কথার আর উত্তর দিতে হইল না। কিন্তু ঠাকুরমা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেমসাহেব, তোমার কটি ছেলে? ছেলেদের আননি কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় আস্তে আস্তে বলিলেন, "মা উনি মিশ—"

—"তা ত জানি—নাম ত মেয়ে বলেছে!"

"উনি অবিবাহিত!"

"এত বড় মেম এখনো বিয়ে হয়নি! সর্ব্বনাশ! বুঝেছি—এই সব দেখেশুনে তোরও আর মেয়ের বিয়ের চেষ্টায় মন নেই! তাই ত বলি! ১৩ পেরিয়ে গেল—এখনও তিনকড়ে বর দেখে না কেন!"

মিশ। ছোট কালো বিয়ে ভাল না আছে।

"কেন আমরা ত বরাবর ছোট কালেই বিয়ে দিয়ে আসছি, কি মন্দ হয়েছে?"

মিশ। "মন্দ বহু আছে, বর্ কালো বিবাহ কর।"

"তা আমাদের কালো বরই ভাল, সুন্দর বর নেই হোল। ওকথা শুনিসনে তিনকড়ে, তাহলে আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব। বাপপিতাম বরাবর যা করেছে তাই কর বলছি, —নাম ডোবাসনে। আর তোমাকেও বলছি মেমসাহেব, অমন মন্ত্রণা তিনকড়েকে দিও না, তাহলে আমি ওকে তোমার কাছে আর যেতে দেব না!"

ঠাকুরমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, মেমসাহেবও প্রাইজ লাভটা নিতান্তই অদৃষ্টে নাই এই ভাবিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক বিদায়গ্রহণ করিলেন।

পাঠিকাগণ এখন ইহার ভিতরকার হেঁয়ালিটি বাহির করুন।

ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯

গ্রন্থপঞ্জি

উ প ন্যা স

১. দীপ-নির্ব্বাণ। "কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলি-তেজে/উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম, রে আছিল/এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে/শুকাইল ফুল এবে, নিভিল দেউটী।"/মেঘনাদবধ কাব্য।/দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শ্রাবণ ১৮০৫ শক। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ॥/০, ৩১৬, [29]

উপহার।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু।

মেজ দাদা!
উপহার সমর্পিণু সোহাগে যতনে,
লহ হাসি মুখে, নিরখিব সুখে,
সে মধুর স্নেহহাস্য সদা জাগে মনে—
যে হাসি দেখিলে, হৃদয় সলিলে,
ফুটিবে হরষপদ্ম অপূর্ব্ব শোভনে!
হাস, সে বিনোদ হাসি বড় সাধ মনে!
কিন্তু বা কেমনে কহি হাসিতে আবার!
আর্য্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়াছে চলি,
ঢেকেছে ভারতভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল!

মোট একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ও উপসংহারে 'দীপ-নির্ব্বাণ' উপন্যাসটি সমাপ্ত।
[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল বঙ্গাব্দ ১২৮৩ সাল (১৫ ডিসেম্বর, ১৮৭৬)]

উপক্রমণিকা

মুসলমানেরা ভারত আক্রমণ করিতে আসিবার পূর্ব্বে যে সময় হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে একতার দৃঢ় বন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল, এবং যে সময় পরস্পর সকলেই সর্ব্বপ্রধান হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত করিতেছিলেন, সেই সময়ের একটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসটি আরম্ভ ; এবং এই গৃহবিচ্ছেদ হেতুক সুযোগ বুঝিয়া যবনেরা যে সময় ভারতের চিরপ্রজ্জ্বলিত দীপ নির্ব্বাণ করিল, সেই দীপ-নির্ব্বাণেই দীপ-নির্ব্বাণের শেষ।

উপন্যাস মধ্যে দিল্লিই প্রধান রঙ্গভূমি। যে সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আর একটী রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার

নাম ইন্দ্রপ্রস্থ রাখিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবেরা একাদিক্রমে ৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অধিকার করিয়া আসেন। পাণ্ডবদিগের পরে গোতমবংশ রাজা হয়। গোতমবংশোদ্ভব রাজা দিলু ইন্দ্রপ্রস্থের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আর একটী স্বতন্ত্র নগরী নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের নাম হইতে সেই নগরীর নাম দিল্লি রাখিলেন, ক্রমে দিল্লিরই প্রাধান্য হইয়া উঠে, এবং এক সময়ে সেই দিল্লিই প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী রূপে পরিগণিত হয়। পরে কুমায়ুন দেশের রাজা পুরুরাজ, দিলুরাজকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দিল্লি অধিকার করেন। এই সকল ঘটনার অনতিপরে তুয়ার বংশ, তৎপরে চোহান বংশ দিল্লির রাজা হয়। তুয়ার বংশের রাজা অনঙ্গপাল দিল্লিনগরীকে নানা স্তম্ভ, দুর্গ ও অট্টালিকায় বিভূষিত করিয়াছিলেন। অনঙ্গপালের মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র, আজমীরাধিপতি সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ দিল্লির সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তাঁহার সময়ে যদিও সকল ক্ষত্রিয় রাজারা পরাক্রান্ত ছিলেন, তথাপি গৃহবিচ্ছেদে তাঁহাদের একতা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। সেই গৃহবিচ্ছেদই পরে সকল অনর্থের মূল হইল।

কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রই গৃহবিচ্ছেদের মূল কারণ। যখন নাগোরদেশের বহুকালপ্রোথিত ৭০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার সন্ধান পাইয়া পৃথ্বীরাজ, চিতোরাধিপতি সমরসিংহের সাহায্যে তাহা উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, তখন জয়চন্দ্র ও পত্তনরাজ ঈর্ষা প্রযুক্ত তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার অভিলাষে মহম্মদ ঘোরিকে দেশে আহ্বান করিলেন। ১১১৩ শকাব্দে, অর্থাৎ ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। স্থানেশ্বরে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ঘোর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ কেবল যবনদিগকে পরাজিত করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, মহম্মদ ঘোরিকে ও অনেক সম্ভ্রান্ত যবনদিগকে বন্দী পর্য্যন্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পৃথ্বীরাজ আপন সৌজন্য ও উন্নত স্বভাব গুণে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে দিলেন। স্থানেশ্বরের প্রথম যুদ্ধবৃত্তান্তের সঙ্গে আমাদের এই উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া জয়চন্দ্রকে আর আমরা উপন্যাসের মধ্যে আনি নাই, তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতাও বিশেষ বর্ণনা করি নাই, কোন কোন স্থলে কেবল তাঁহার নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছি।

ঐ যুদ্ধে যবনেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবার প্রায় দুই বৎসর পরে ১১১৫ শকাব্দে আবার তাহারা দিল্লি আক্রমণার্থে আগমন করে। জয়চন্দ্র প্রভৃতি রাজগণ ঈর্ষামদে মত্ত হইয়া, সানন্দ চিত্তে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহা দেখিয়াছিলেন এবং গোপনে গোপনে সাহায্য করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এবারেও স্থানেশ্বরে যুদ্ধ হয়, এবং এই যুদ্ধে তিনদিন ঘোরতর সংগ্রামের পর যবনদিগের ধূর্ত্ততায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দুগণ পরাজিত হয়। সেই অবধি আর্য্যরাজ্য লোপ হইতে আরম্ভ হইল।

চিতোরাধিপতি সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের পরম বন্ধু ছিলেন, মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার যে দুই যুদ্ধ হয় সেই দুই যুদ্ধেই তিনি বিশেষ সাহায্য করেন। উপন্যাসের অনুরোধে আমরা সমরসিংহ সম্বন্ধে দুই স্থলে ইতিহাসের ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রথম, আমরা সমরসিংহের বয়ঃক্রম চারি বৎসর অধিক করিয়াছি। দ্বিতীয়, সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন, কিন্তু উপন্যাসের অনুরোধে আমরা সে সম্পর্ক রক্ষা

করি নাই। যদিও এই পুস্তক উপন্যাসমাত্র, কিন্তু পুস্তকসন্নিবেশিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায়ই ইতিহাস হইতে গৃহীত। এবং তাঁহাদের স্বভাব ও জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ইতিহাসানুযায়ী রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

চাঁদকবি যথার্থই একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত মহাকবি। তিনি পৃথ্বীরাজের পরম বন্ধু ছিলেন এবং পৃথ্বীরাজের সহবাসেই সদা সর্ব্বদা থাকিতেন। চাঁদকবি পুস্তক মধ্যে কবিচন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের সর্ ফিলিপ্ শিড়নি ও সর্ ওয়ালটার র‍্যালীর ন্যায় তিনি কাব্য বিষয়ে যেমন নিপুণ ছিলেন, যুদ্ধ বিষয়েও তদ্রূপ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু কাব্যই তাঁহার প্রতিপত্তির নিদান। তাঁহার সকল মহাকাব্যে রাজপুতদিগের, বিশেষতঃ পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তিকলাপ ও শৌর্য্য পরাক্রম বিবরিত হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যে যেমন রামায়ণ ও মহাভারত আদরণীয়, গ্রীকদিগের মধ্যে যেমন হোমর আদরণীয়, রাজপুতদিগের মধ্যে চাঁদকবির কাব্যসমূহও সেইরূপ আদরণীয়। কিন্তু চাঁদকবির কপোলকল্পিত কাব্যউচ্ছ্বাস অতি অল্প, প্রকৃত ইতিবৃত্তান্তের ভাগই অধিক। দুঃখের বিষয় এই, যে তাঁহার সমগ্র জীবনচরিত কোথাও পাওয়া যায় না এবং তাঁহার কাব্যসমূহের অধিকাংশই প্রায় প্রাচীন হিন্দি ভাষাতে অবরুদ্ধ।

পৃথ্বীরাজের সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে কামান ব্যবহার যে প্রচলিত ছিল ইহা অনেকেই কাল্পনিক মনে করিতে পারেন। এবং আমার কোন আত্মীয় ইহা নিতান্ত কাল্পনিক মনে করিয়া ঐ বিষয়ে প্রথমে নানা তর্কবিতর্ক করেন। কিন্তু পরে যখন তিনি প্রমাণ পাইলেন যে যথার্থই অনেক পুরাকাল হইতে আমাদের মধ্যে কামান প্রচলিত আছে তখন তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল, এবং পাছে তাঁহার মত অন্য কেহ ইহা কাল্পনিক মনে করেন, সেই আশঙ্কায় তিনি ভূমিকামধ্যে কামানব্যবহার বিষয়টী কিছু বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধেই এই স্থলে কামানসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইল। কোন কোন ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা বলেন* যে বাবরের সময় হইতে এদেশে প্রথমে কামান ব্যবহার হয়। তাহার পূর্ব্ব হইতে যে এদেশে কামান প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। বিশেষতঃ ইউরোপে কিনা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কামান প্রচলিত ছিল না, সুতরাং তাহার শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে হিন্দুরা কামান নির্ম্মাণ বা ব্যবহার করিতে জানিত ইহা বিদেশী-মণ্ডলে সহজেই বিশ্বাস হইবার নহে। সাধারণ মত এই যে ১৩৩৬ কিম্বা ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম কামান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে ইহা এখন এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহার অগ্রে ১৩১২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মূরগণ স্পেনে এক প্রকার কামান ব্যবহার করিয়াছিল। মূরগণ যে আরবদিগের কর্ত্তৃক অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং অধুনা যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে কামান ব্যবহারও তাহারা ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়া পরে ইউরোপে প্রচলিত করিয়াছে।

* M. General Briggs, quoted by Elliot in his *History of India*.

কিন্তু মূরদিগের ইউরোপে কামান প্রচলিত করিবার বহুদিন পরে ইংরাজেরা সবে মাত্র ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম কামান ব্যবহার করেন, সুতরাং ভারতবর্ষেও যে অল্প দিন হইতে কামান চলিয়াছে এ কথা যে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু রামায়ণে ও মহাভারতে যে শতঘ্নীঅস্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা অনেক ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের মতেও কামান ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। হ্যালহেড মহোদয় কামান ব্যবহার বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, "হিন্দুরা ও চীনদেশের লোকেরা এত পুরাকালে বারুদ প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে জানিত যে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।"[১] কিন্তু শতঘ্নীবিষয়ে নানা প্রকার সন্দেহ থাকিলেও, কবিচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা পড়িলে পৃথ্বীরাজের সময়ে যে কামান ব্যবহার হইত, সে বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি কানোজখণ্ডের এক স্থলে লিখিয়াছেন[২] "কামান সকল হইতে এমন বিকট ধ্বনি এবং তাহার গোলার দ্বারা এমন ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে তাহা দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল। আবার নয় লক্ষ মুদ্রার হার নামক কাব্যে যুদ্ধবর্ণনাস্থলে তিনি বলিয়াছেন "বিষম ভারযুক্ত কামান সমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত ছিল।" এবং আর একস্থলে লিখিয়াছেন "কামান সমূহ ও বারুদের থলিকা সকল তিন ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ছিল।" যে কোন হিন্দি ভাষাজ্ঞ ইংরাজ গ্রন্থকার, কবিচন্দ্রের কোন কোন কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই কামান শব্দটি (cannon) বলিয়া ভাষান্তরিত করিয়াছেন।

যমুনাস্তম্ভ কুতবমিনর নামেই অধুনা প্রসিদ্ধ, এবং ঐ নামের দ্বারাই উহা যে হিন্দুদের কৃত, এই সত্যটি আবরিত রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যমুনাস্তম্ভ পৃথ্বীরাজের কৃত। কন্যাবৎসল পৃথ্বীরাজ তাঁহার কন্যার প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যমুনাসন্দর্শন জন্য উক্ত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। এই প্রবাদটী আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে। দিল্লি-অঞ্চলে আধুনিক ও পুরাতন সকল লোকদিগের মধ্যেই এই প্রবাদটি প্রচলিত আছে। এবং মেটকাফ, হিবর প্রভৃতি অনেক ইংরাজ ও মুসলমান লেখকও যমুনাস্তম্ভ যে হিন্দুদিগের নির্ম্মিত তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। যমুনাস্তম্ভের নির্ম্মাণকৌশলের সহিত মুসলমানদের স্তম্ভনির্ম্মাণ কৌশলের প্রভূত বৈষম্য প্রদর্শন করিয়া বেগলার মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যমুনাস্তম্ভ হিন্দুদিগেরই নির্ম্মিত[৩]। আর আলিগড়নিবাসী বিখ্যাত সাইদ আমেদ, কর্ণেল কানিংহামকে ঐ বিষয়ে যে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি

১ Halhead says "gun-powder has been known in China as well as Hindoostan for beyond all periods of investigation." Quoted by Elliot in his *History of India.*

২ নৃপ পংগ নয়র ছুটে অরাব।
কোটহ কংগুর চটি চটি সিতাব॥
জংবুর তোপ ছুটহি ঝনংকি।
দশ কোশ জায় গোলা ভনকি॥
সিরদার ভার বারাহ রোহ।
লংগী অমংগ বর হনৈ কোহ॥

৩. *Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1864.* Vol. 33.

দেখাইয়াছেন[৪] যে যমুনাস্তম্ভ কখনই মুসলমান-কৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যমুনাস্তম্ভের তলদেশে হিন্দুদিগের পূজার ঘণ্টা প্রভৃতি যে সকল প্রতিমূর্ত্তি মূর্ত্তিত রহিয়াছে তাহাতে উহা হিন্দুদিগের কৃত বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে। যমুনাস্তম্ভ আদিকালে যত উচ্চ ছিল এখন আর তত উচ্চ নাই। কেননা কুতবউদ্দিন উহার শিখরদেশ ভগ্ন করিয়া মুসলমানরীতি অনুসারে পুনর্ব্বার উহার শিখর নির্ম্মাণ করিয়া স্বনামেই উহা প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

যেমন কুরুক্ষেত্র এখন স্থানেশ্বর নামে অভিহিত, তেমনি কুরুক্ষেত্রের পুণ্যনদী দৃশদ্বতীও অধুনা কাগার[৫] নামে খ্যাত। ইহা স্থানেশ্বর প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে।

পাগলিনীর ব্যাপারটি আমরা একটী প্রকৃত ঘটনার আভাষ হইতে কল্পিত করিয়া লইয়াছি।

কাপ্তেন টডের রাজস্থান পাঠে জানা যায় যে আশাপূর্ণা নামে দেবী যথার্থই দিল্লির কুল দেবী ছিলেন, এবং সকল রাজপুতেরাই কোন কর্ম্ম করিবার অগ্রে আশাপূর্ণাদেবীর পূজা করিতেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা :

দীপনির্ব্বাণ

We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.

Calcutta Review.

২. ছিন্ন-মুকুল। দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত-উৎসব-রচয়িত্রী-প্রণীত। "ওরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,/এ হেন কোমল পুষ্পে তোর কিরে বাসা।"/তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। কলিকাতা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে, শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৩৮।

উপহার।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিদাদা,

হৃদয়-উচ্ছ্বাস-ভরে আজিকে তোমার করে
দলিত-কুসুম-কলি সঁপিনু যতনে,
কি আর চাহিতে পারি?— এক বিন্দু অশ্রুবারি
মিশাইও কনকের অশ্রুবারি-সনে।

৪. Cunningham's *Archaeological Survey of India.* Vol. IV.
৫. Elphinstone's *History of India.*

মোট একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ও উপসংহারে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ।

[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ৪ নভেম্বর, ১৮৭৯। তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে]

সং স্ক র ণ

ছিন্নমুকুল।/শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।/"ওরে রে বিকট কীট নিদারুণ শোক,/ এহেন কোমল পুষ্পে তোর কিরে বাসা?"/তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য।/(চতুর্থ সংস্করণ)। মূল্য ১।০।১৩২০ সাল। কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৯৮।

উপহার

পূজনীয়েষু,

জ্যোতিদাদা!

হৃদয় উচ্ছ্বাস ভরে, আজিকে তোমার করে
দলিত কুসুমকলি সঁপিনু যতনে,
কি আর চাহিতে পারি? এক বিন্দু অশ্রুবারি
মিশাইও কনকের অশ্রুবারি সনে।

গ্রন্থ-সমালোচনা :

Another good book is before us—*Chinna Mukul* a Novel by the authoress of *Dip Nirban* and *Basanta Utsab.* The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a literary artist. It is a pleasant transition to nature and fancy—to the calm and placid sweetness of Indian home life from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput Princess of *Dip Nirban.* A deep shade of Tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters broken in here and there by a faint glimmer of incidental comic scenes which instead of relieving the senses, serves to thicken the gloom around. The dialogues are well sustained. The style is, as is characteristic of this writer, chaste, clear, sweet, and vigorous. The book is interspersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost all the characters are extremely natural, especially Kanak, the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed love. Instances of such grand woman heroism and abnegation of self liberate the fancy and gladden the heart. The character of Promod, her selfish brother, has hardly been less cleverly drawn. It is not difficult to find original of such characters in this cold, calculating world.

Niraja, the other female character, thrives well up to a certain point, and then dwindles into insignificance in the greater interest which one feels for Kanak.

The pages that described the conflict of feelings in Kanak's mind, obedience to her brother and guardian on the one side and the dictates of an all-absorbing love on the other, constitute an interesting reading, and are sure to give the book in which they occur a respectable place in Bengali fiction.

Indian Mirror.

৩. মালতী। উপন্যাস। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। "হৃদয়ে রয়েছ ত অবিরত, মদির-আঁখি,/হিয়া তোমারি কাছে বাঁধা আছে—জাননা তা' কি?/যদি আরেকতর মনে কর, বলিলো শুন,/একে অতনুশরে আছি মরো মরিব পুন।।"—শকুন্তলা। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত। কলিকাতা। অপার সারকুলার রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে। "ভারতী" যন্ত্রে। শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩০১ আষাঢ়। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪২।

উপহার।

ছোট বোনটি আমার!
সংসারের কিছু নাহি ধারো ধার,
সরলা প্রতিমা, স্নেহের ধন!
স্নেহের জিনিষ মালতীও মোর
তোরি মত তার সরল মন।
স্নেহেতে স্নেহেতে মিশাইনু, তাই,
সরলে সরলা করিনু দান।
তোর মত তার বিষাদের গানে
মমতায় কে বা মিশাবে তান।

পুস্তক-শেষে 'শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী' নামধেয় বিজ্ঞাপন অংশ থেকে তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের কিছু সমালোচনা উদ্ধৃত হল।

পৃথিবী।

মূল্য ১৲ টাকা।

The writer brings a great research and vast information to bear upon her book...The work does great credit to the writer. We have no hesitation in saying that this is the best book in popular Astronomy and Geology in the Bengali language.

Statesman & Friend of India.

The book is written in a very clear and simple style...It is perhaps the best book in Bengali on the subjects of which it treats. We have been simply charmed with the book, and with the research and careful study of the subjects which it displays.

Brahmo Public Opinion.

[The writer] is an ornament to her sex and to her country...A mine of valuable and interesting information. We would strongly recommend the Education Department to prescribe this work as a text book for vernacular examinations, as it is admirably fitted to teach the principles of modern science to our boys and girls.

Hindoo Patriot

ইঁহার পুষ্পময়ী লেখনীর উপর ভারতীর পুষ্পবৃষ্টি হউক, এবং বঙ্গের যে সকল শিক্ষানুরাগিনী কুলকামিনী লেখা পড়া শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার ইঁহার গ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। পড়িলে অনেক বিষয়েই তাঁহাদিগের ও আমাদিগের উপকার হইতে পারে।

বান্ধব।

বঙ্গভাষায় সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এই প্রথম রচিত হইল।...আমরা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের এই পুস্তকখানি মাইনর ও নর্ম্মাল পরীক্ষায় একখানি পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিতে অনুরোধ করি।

আনন্দ বাজার পত্রিকা।

মালতী।

It is a sweet short story simply told. It is gratifying to see that the talented authoress does not allow her powers to remain idle.

Indian Mirror

৪. মিবাররাজ। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড। জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮০।

উপহার

ভাই বকুল,

কোমল মাধুরী মাখা বিমল বকুল,
তুই সখি প্রেমময়ী, বরষার ফুল,—

বিকশিত অশ্রুজলে, সুবাসিত শুষ্ক দলে
ম্লানমুখে হাসি রাশি উজল অতুল।
তুই সখি প্রেমময়ী, বরষার ফুল।

যে তোমার কাছে আসে, জুড়াও মধুর [বাসে]
ক্ষুদ্র হৃদে উথলিত প্রণয় অকূল।
যে যায় দলিত রেখে, সেও গন্ধ যায় মেখে,
স্বরগের পুণ্য তুমি ধরণীর ভুল।
মুখানি দেখিলে তোর, প্রাণে বহে অশ্রু-লোর,
কি জানি কি ভাব ঘোরে হৃদয় আকুল।

সেই অশ্রু সেই তানে, সেই সুরে বাঁধা গানে
উপহার সঁপে আজি বকুলে বকুল,
লহ ভাই ধর, তুমি বরষার ফুল।

সং স্ক র ণ

মিবাররাজ। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কান্তিক প্রেস, ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১৬। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭৯। ১৬ X ১০ সেমি।

উপহার।

স্নেহময়ি ইন্দিরা,
তুই স্নেহময়ি, যেন বরষার ফুল,—
কোমল মাধুরী মাখা বিমল বকুল!
বিকশিত অশ্রুজলে, সুবাসিত শুষ্ক দলে
বিধাতার দিব্য সৃষ্টি অপূর্ব্ব অতুল!
যে তোমার কাছে আসে, জুড়াও মধুর বাসে,
ক্ষুদ্র হৃদে উথলিত প্রণয় অকূল।
যে যায় দলিত রেখে, সেও গন্ধ যায় মেখে,
স্বরগের পুণ্য তুমি ধরণীর ভুল।
এনেছি এ শোকগীতি তোমার পরশ-প্রীতি
ফুটাবে বিরাগ মাঝে সুরাগ মুকুল।

৫. হুগলীর ইমামবাড়ী। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ভবানীপুর মনোমোহন যন্ত্রে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ়। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৬০। সচিত্র।

চিত্র-পরিচিতি :
সলেউদ্দিন বলিলেন, "নাম! কোথায় রাস্তা থেকে একটা ভিখারিণীকে ধরে এনেছে, ওর আবার নাম?" [হুগলীর ইমামবাড়ী, ২৩০ পৃষ্ঠা]। মোট ৪০ অধ্যায় এবং পরিশিষ্টে উপন্যাস সমাপ্ত। প্রতিটি অধ্যায়-শিরোনাম ও অন্যান্য অধ্যায়-পরিচিতি 'উপহার'-এর পর দেওয়া হল।

উপহার

তোমায়,
সংসারের সুখদুঃখ, সংসারের হাসি,
সংসারের মোহমায়া ভালবাসাবাসি,

এ সব চাহ না কিছু উৰ্দ্ধে আছ তার,
করুণ-নয়নে তবু কেন অশ্রুধার।
ও অশ্রু নহে ত সুখে অভিনব আশ,
ও অশ্রু নহে ত তীব্র বাসনা-পিয়াস,
বিমল করুণা-ধার ঐ অশ্রুজল,
দুঃখের জগতে করে আশীষ মঙ্গল,।
ও করুণ আঁখি তুলে চাহ একবার,
জন্ম-জন্মান্তের স্মৃতি—জীবন মরণ-প্রীতি–
এনেছি চরণে দেব, দিতে উপহার।

অধ্যায়-শিরোনাম

প্রথম	পরিচ্ছেদ	সন্ন্যাসী
ষড়বিংশ	”	বন্দী
সপ্তবিংশ	”	বন্দী
অষ্টাবিংশ	”	অটল
ঊনত্রিংশ	”	সরাইয়ে
ত্রিংশ	”	মৃত্যু
একত্রিংশ	”	সন্ন্যাসী
দ্বাত্রিংশ	”	মোহমুগ্ধ
ত্রয়োত্রিংশ	”	একাকিনী
চতুঃত্রিংশ	”	করুণা
পঞ্চত্রিংশ	”	নিষ্ঠুরতা
ষড়ত্রিংশ	”	স্মৃতি
সপ্তত্রিংশ	”	বৈরাগ্য
অষ্টাত্রিংশ	”	প্রত্যাগমন
ঊনচত্বারিংশ	”	আলোক
চত্বারিংশ	”	একপথে

উপসংহার।

৬. স্নেহলতা। সামাজিক উপন্যাস। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩১৪ ফাল্গুন। মূল্য ২ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : (প্রথমভাগ : ১৯৭, দ্বিতীয়ভাগ : ১৮২)।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে :

Printed by B. K. Dass, at the "Wellington Printing Works" 10, Haladhar Burdhan Lane, Calcutta.

উপহার।

ভাই মিলন,

সুখেরে লভিবারে, দুখের হা হুতাশ!
হাসির ফাঁশে অশ্রু, আপনা চাহে নাশ।
আঁধার, আলো মাঝে, ডুবাতে চাহে প্রাণ!
বিরহ হতে চায়, মিলনে অবসান!
হায়! মিছে এ আঁকুবাকু, মিছে এ যাচাযাচি!
ততই দূরে দূরে, যতই কাছাকাছি!
চাহিয়া দেখি আর, দেখিয়া মরি ভেবে,
আমার এই স্নেহ, কারে দেব কে নেবে?
সখিগো ফিরাও না, এনেছি তোরি তরে,
না হয় দিও ফেলে, আড়ালে কিছু পরে!

'স্নেহলতা' উপন্যাসের প্রথমভাগ ত্রিংশ পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয়ভাগ একত্রিংশ পরিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত।

['স্নেহলতা' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১১ মাঘ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (২৩ জানুয়ারি, ১৮৯০)]

৬ক. স্নেহলতা। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। ২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে। শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ। সন ১২৯৯। ফাল্গুন মাস। মূল্য ১৲ এক টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮২।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে :

অপার সার্কুলার রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটী হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭. বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল। মূল্য ১।০। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৮২।

উপহার।

দিদি,

নিষ্ঠুর-পরশে ম্লান, বোঁটা ভাঙ্গা ফুল,—
তবুও সুবাসে তার জগৎ আকুল,—
তবুও বিমল-শুভ্র স্নিগ্ধরূপ-জ্যোতি,—
জাগায় হৃদয়ে পুণ্য-তোমারি মূরতি।

মোট ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ও উপসংহারে উপন্যাসটি সমাপ্ত।

৮. ফুলের মালা। [আমাদের দেখা কপিতে আখ্যাপত্র, উৎসর্গপত্র বা উপহারপত্র বিনষ্ট হওয়ায় এ-বিষয়ে বিশদ কোনো তথ্য দেওয়া গেল না]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫৯।

মোট চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ ও উপসংহারে উপন্যাসটি সমাপ্ত।

[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১২ মার্চ, ১৮৯৫]

৯. কাহাকে?। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। কলিকাতা ; ভারতী কার্য্যালয় হইতে শ্রীচন্দ্রভূষণ সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০৫। আষাঢ়। ১৮৯৮। জুলাই। মূল্য ১।০। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১২১।

।

কাহাকে?

করুণা সে চাহে কৃতজ্ঞতা
ভালবাসা চাহে ভালবাসা ;
তব প্রেম অতুল মহান,
শুধু দান নাহিক প্রত্যাশা।

নিষ্কাম চরণে তব দেব,
প্রীতিময় এ পূজা, প্রণতি,—
স্বার্থপূর্ণ দীন সকামের
আত্মহারা বিস্ময়-ভকতি।

১০. বিচিত্রা। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী। কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির। ১১৪নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১ বৈশাখ, ১৩২৭ (৭ মে, ১৯২০)। ১৲ একটাকা সংস্করণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫৭।

আখ্যাপত্রের উল্টোদিকের পাতায় লেখা আছে :

Published by :
G. B. Dutta & S. C. Paul
Kamalini-Sahitya-Mandir
114, Ahireetola Street, Calcutta

Printer : Purna Chandra Chakravarty
Vidyodaya Press
8-2 Kashi Ghosh Lane, Calcutta.

উপহার।

তোমারেই দিতে হবে? তাই লও, বেশ!
দেখো যেন না প'ড়েই করিও না শেষ!
অত কেন হাসি রাণি? বল দেখি মনোবাণী
কার ছবিখানি এত দেখিছ সরেশ?

মোট আঠারো পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি সমাপ্ত। উপন্যাসের কোনো কোনো পরিচ্ছেদ নাম-যুক্ত ; যথা—হাসি (প্রথম পরিচ্ছেদ), শরৎকুমার (তৃতীয় পরিচ্ছেদ), রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী (পঞ্চম পরিচ্ছেদ), বন্দেমাতরম্ (সপ্তম পরিচ্ছেদ), রাজা অতুলেশ্বর (অষ্টম পরিচ্ছেদ), ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি (নবম পরিচ্ছেদ), মাল্যদান (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ), উন্মেষণা (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ), দুর্ঘটনা (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)।

১১. স্বপ্নবাণী। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী। কলিকাতা। কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির। ১৲ একটাকা সংস্করণ। ১৩২৮। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৭২।

উপন্যাস শেষ হবার পর একটি বিজ্ঞাপন আছে।

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া প্রণীত
স্বপ্নবাণীর পরিসমাপ্তি
মিলন-রাত্রি
তিনি সুস্থ হইলেই প্রকাশিত হইবে।

উপন্যাস পাঠেচ্ছু সাহিত্যামোদী মাত্রেই তাঁহার সত্বর আরোগ্য কামনা করুন।

মোট সপ্তদশ পরিচ্ছেদে উপন্যাস সমাপ্ত।

উপন্যাস শুরুর আগে প্রকাশকদ্বয়ের বক্তব্য নিচে মুদ্রিত হল :

প্রমাণ।

'বিচিত্রা'র পর 'স্বপ্নবাণী'র প্রকাশ—সে আজ কত দিনের ব্যবধান! কিন্তু কি করিব—উপায় ছিল না। 'স্বপ্নবাণী' বিজ্ঞাপিত হইবার পর যখনই শুনিলাম, সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া শয্যাশ্রয় লইয়াছেন, উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল হৃদয় লইয়া সেই মুহূর্তে ছুটিয়া গিয়া সাহিত্য-দেবীর পদপ্রান্তে উপনীত হইলাম। বই ছাপা ত দূরের কথা; সে মূর্ত্তি দর্শনে সেই সময় বাস্তবিকই শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। তাহার পর তুহিন-শীতল নিস্পন্দ বক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'স্বপ্নবাণী' প্রকাশ সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন ছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মৃত্যু-বিভীষিকা-ভ্রষ্টা পথভ্রান্ত দিশাহারা পান্থ—দূরাগত কণ্ঠের জীবন্ত শব্দ-ঝঙ্কার শ্রবণে যেমন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির আশা প্রাপ্ত হয়,—তেমনি এক চিন্তামগ্ন স্তব্ধ সন্ধ্যায় স্বপ্নবাণী সদৃশ সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর অভয় 'পত্রবাণী' সম্বল করিয়া আমরা পুনরায় সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী-ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বাংলার বীণাপাণি শয্যাশ্রয় ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। আমাদের দেখিয়াই বীণা বিনিন্দিত কম-কণ্ঠে অমরার অমিয়া ঢালিয়া, বাংলার মাতৃময়ী ব্রতধারিণী সাহিত্য-জননী কহিলেন, "এসেছ! আহা, বড় লোক্‌সান হ'ল তোমাদের! কি করি বল, শুয়ে শুয়েও তোমাদের প্রুফ্ দেখে দিয়েছি, নিজের হাতে লিখে, বাকীটুকু শেষ করে দেবো, এমন শক্তি এখনও পাইনি—এখনও পথ্য পাইনি! —তবুও আজ লেখা শেষ করে দেবো তোমাদের। মুখে বলি আমি, লিখে যদি নিতে পারো তোমরা—"

ওঃ, গ্রাহক মনোরঞ্জনার্থে কি কষ্টই না জানি দেবীকে সে দিন দিয়া আসিয়াছি! শয্যানিম্নে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার আদিষ্ট শব্দগুলি লিখিবার সময় মনে হইতেছিল, যেন বঙ্গীয় উপন্যাস-সাহিত্য লিখন প্রণালীর 'ক' 'খ' শিখিতেছি। যাই হোক্, প্রকাশের বহু বিলম্ব হইলেও 'স্বপ্নবাণী'তে শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া যাহা দিয়া গেলেন ও পরিসমাপ্তিতে যাহা দিতেছেন,—বর্ত্তমান উপন্যাস-সাহিত্য যুগের প্রত্যেক লেখক, লেখিকার তাহা দেখিয়া, লেখার প্রতিযোগিতায় ঈর্ষা হওয়া উচিত।

পরিশেষে সর্ব্বসাধারণ্যে ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন যে, 'স্বপ্নবাণী' বইখানিকে কেবল 'নভেল' পাঠোপযোগী মনে না করিয়া ইহার মধ্য হইতে এই অবসরে সাহিত্যের সারাংশটুকু বুঝিয়া লইয়া, সকলেই নিজের শিক্ষা ও অপরের শিক্ষার সুবিধা করিয়া রাখিবেন—তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বিনীত প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

১২. মিলন-রাত্রি। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২। মূল্য—দুই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৮৫

মোট অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ও 'অন্তিম কাহিনী' শীর্ষক উপসংহারে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

ছো ট গ ল্প

১. নবকাহিনী ও অন্যান্য গল্প। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ, ১৯১৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮৭। সূচি : কুমার ভীমসিংহ (পৃ ১), ক্ষত্রিয় রমণী (পৃ ১৮), ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি (পৃ ৩৫), সন্ন্যাসিনী (পৃ ৪৩), প্রতিশোধ (পৃ ৬৩), যমুনা (পৃ ৭০), কেন (পৃ ৮৮), আমার জীবন (পৃ ৯৭), লজ্জাবতী (পৃ ১১৫), নূতন বালা (পৃ ১৪০), চাবি চুরি (পৃ ১৫৬), রক্তপিপাসু (পৃ ১৭৬)।

আখ্যাপত্রের উল্টোদিকের পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপহার।

স্বামিন

সংসারের অন্ধকার ঝটিকা পীড়নে
যখনি কাতর দেহ, অবসন্ন প্রাণ,
প্রীতিদীপ্ত পুণ্যরূপে নয়ন ভরিয়া
দাঁড়াও সমুখে দেব, কর শান্তি দান!
প্রেমের পরশে তব দলিত হৃদয়,
নবীন জীবন লভে, ফুলে ফুলময়!
স্বর্গের প্রভাত তুমি প্রশান্ত বিমল।
বিধাতার মূর্ত্তিমান্ আশীষ মঙ্গল!
তোমারি প্রসাদ এ যে তোমারি কল্যাণ—
তোমারে করিনু আজি উপহার দান।

[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৭ আগস্ট, ১৮৯২ সাল]

২. মালতী ও গল্পগুচ্ছ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। মূল্য : বারো আনা। **পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০৬। [প্রকাশতারিখ** নেই]। ১৭ x ১০$^{১}/_{২}$ সেমি।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় আছে :

প্রকাশক : শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।.

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : ১৯১০ সাল]

উপহার

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু—

সযতনে গাঁথে তারা যারা সঁপে মালা,
পরে যারা তারা ধরে—করি হেলাফেলা।
অযতনে গাঁথা এই স্নেহে বাঁধা গুচ্ছ,
তোমার নিকটে বৎস নহে কিন্তু তুচ্ছ।
জানি মনে সত্য ইহা, নহে কোনও ভুল,
বিশ্বাস আনন্দে তাই হৃদয় আকুল।

নাটক/প্রহসন/কাব্যনাট্য/গীতিনাট্য/নাট্যোপন্যাস

১. বসন্ত-উৎসব। গীতিনাট্য। "দীপনির্ব্বাণ"-লেখনী-প্রসূত। কলিকাতা। বাল্মীকি যন্ত্রে। শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শক ১৮০১। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪০।

উপহার।

ভাই বিহঙ্গিনি,
সখিলো জনম ধোরে
ভাল যে বেসেছি তোরে,
নে লো তার নিদর্শন—এই উপহার,
হৃদয়ের আদরিণি—বিহগি আমার!

গ্রন্থ-সমালোচনা :

Basanta Utsab...has here and there, passages of such intrinsic poetic beauty and natural worth that we have little doubt it will make its way to every lover of Bengali literature. The songs in pp. 8, 21, and 33, and especially the one in dedication, are truly poetic, and have an exquisitely delicate touch. There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so thoroughly chaste and sweet, so rich in charms of Poetry, and, therefore, none so well calculated to improve the taste of the play-going public. We have little hesitation in declaring that it will, at no distant date, revolutionise the existing style of

opera-writing in Bengali by giving it a healthy tone and moral vigour which it so much wants. As we read it, its morning freshness and lyrical sweetness steal upon us, and we feel as if we were in a "bubble of visionary happiness", unruffled by the tempests blowing without. We cordially recommended it to the reading public, and sincerely congratulate the author on her very excellent production. We shall be glad to see it in the hands of every reader of Bengali literature.

We hear the author is a lady of a very respectable Bengali family of Calcutta. It is customary to make some relaxations of strict critical canons in favour of lady writers. We are not inclined to countenance such partiality, nor is there any necessity for it in the present case. *Basanta Utsav* can stand upon its own merits.

Indian Mirror

This charming little work is, we understand, the production of a Bengali lady, otherwise known as the authoress of *Dip Nirban*. It has an immense interest for us. Written by a lady belonging to an illustrious family in Bengal, it shews, in the clearest manner possible, the many advantages to be derived from a superior order of mental training among females.

The number of operatic pieces in Bengali is small, much less the number of good and readable ones. The flirtations and amorous expeditions of the redoubtable Krishna have afforded ample food to a number of opera writers, the songs for the most part being lifeless if not void of some meaning. But here we have a work containing a number of exquisite songs. The scenes are all well conceived. And we are of opinion that its production is a marked indication of a cultivated mind and refined taste, so rarely to be met within the ordinary run of Bengali operas. We may venture to say *Basanta Utsav* is the *best of its kind* in the Bengali language. The song serving as dedication, *Lila's* songs of despair and disappointed love, and those of *Sangit* and *Kavita* have a charming effect upon the reader. The third scene, Act I which brings us to the temple of *Maya Debi* with *Udasini* absorbed in prayer is exquisitely grand. And we can well conceive what a telling effect it will have on the audience if properly managed. From what we have said above, we have no hesitation in asserting that *Basanta Utsav* is a work of intrinsic merit and that it differs widely from other works of its class in its superior moral tone and purity of sentiments and expressions. We heartily wish it may have an extensive circulation.

Brahmo Public Opinion

২. বিবাহ-উৎসব। (গীতি-নাট্য।)। কলিকাতা, বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১৭নং ভবনে, বি. কে. দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে। শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ।০ চারি আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৩।

[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল আনুমানিক মে ১৮৯২]

৩. কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস। মূল্য ১।।০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮১।

আখ্যাপত্রের উল্টোপিঠে লেখা আছে :

কলিকাতা, ১১৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ভারত যন্ত্রে; শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপহার।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীকে।

ধর স্নেহ উপহার
স্নেহময়ি, রাণি,
রূপ বা নিরূপ মন্দ
গন্ধ কিবা হীনগন্ধ
সুর বা বেসুর ছন্দ
আমার যা বাণী,
সকলি তোমার কাছে
আদরের জানি।

সূচি : *কৌতুক নাট্য*—লজ্জাশীলা (পৃ. ১-৬), বৈজ্ঞানিক বর (পৃ. ৭-১৫), লোহার সিন্ধুক (পৃ. ১৬), ষষ্ঠীর বাছা (পৃ. ১৭-১৯), চাক্ষুষ প্রমাণ (পৃ. ২০-২৩), সৌন্দর্য্যানুরাগ (পৃ. ২৪-৩২), গানের সভা (পৃ. ৩৩–৩৭), ব্যাঘ্রসভা (পৃ. ৩৮-৪০), সূক্ষ্মার্থ (পৃ. ৪১-৪৩), তত্ত্বজ্ঞানী (পৃ. ৪৪-৪৬), নিজস্ব সম্পত্তি (পৃ. ৪৭-৫২), বিরহ বেদনা (পৃ. ৫৩-৫৭), সূক্ষ্ম ডাক্তারি (পৃ. ৫৮-৬১)।

বিবিধ কথা—প্রেম (পৃ. ৬৩-৬৬), অভাব (পৃ. ৬৭-৬৯), নৈরাশ্য (পৃ. ৬৯-৭২), কাজ (পৃ. ৭২-৭৬), সিদ্ধি (পৃ. ৭৭-৮০), মায়া (পৃ. ৮০-৮১)।

সং স্ক র ণ

কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩২০ সাল। মূল্য ১।।০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১১৬।

আখ্যাপত্রের উল্টোদিকের পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপহার

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীকে

ধর স্নেহ উপহার
স্নেহময়ি রাণি,
রূপ বা নিরূপ মন্দ
গন্ধ কিবা হীনগন্ধ
সুর বা বেসুর ছন্দ
আমার যা বাণী
সকলি তোমার কাছে
আদরের জানি।

৪. দেবকৌতুক। কাব্যনাট্য। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। মূল্য ১।০। ১৩১২। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৯৬।

বিবাহ-যৌতুক।

স্বপন-রতনে গাঁথা অপূর্ব্ব যৌতুক!
নন্দনকুসুমহার, 		আশীর্ব্বাদ দেবতার
চিরফুল্ল গন্ধাকুল, অনাদি কৌতুক।
পবিত্র উৎসব রাতি, 		লহ দোঁহে কণ্ঠ পাতি
এ বন্ধনে বসুমতী, সুধন্য হউক।

৫. কনে-বদল। [প্রহসন]। [আখ্যাপত্র ছিন্ন।]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪৪।

প্রহসনটি দুটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথম অঙ্কে—৪টি দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য ও একটি শেষ দৃশ্য—অর্থাৎ ছয়টি দৃশ্য আছে।

উপহার।

বৎস,
কর কাজ চিরোৎসাহে, অশ্রান্ত অটল;
ধন্য কর, ধন্য হও, সাধ সুমঙ্গল।
হাসি খুশী এ কৌতুক,
ক্ষণিকের খেলাটুক,
বিশ্রাম আরাম শুধু—শুধু নব বল।

[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩১৩ (১৯০৬ ইং)]

সং স্ক র ণ

কনে-বদল। [প্রহসন]। [আখ্যাপত্র নেই]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫৬ + 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ' নামক চরিত্রতালিকা সম্বলিত পৃষ্ঠা—১ + প্রস্তাবনা—১।

[তিনটি অঙ্কে প্রহসনটি সমাপ্ত।]

[পূর্বোক্ত গ্রন্থে দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য ও একটি শেষ দৃশ্য অর্থাৎ ছয়টি দৃশ্য ছিল। বর্তমান গ্রন্থটিতে প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটিকে 'শেষদৃশ্য' বলা হয়েছে। একটি উপশিরোনামও আছে—'মিলনোৎসব'। এই বইখানিতে 'প্রস্তাবনা' অংশটি যুক্ত হয়েছে।]

৬. পাকচক্র। (প্রহসন)। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। মূল্য বার আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭০। [প্রকাশতারিখ নেই]। ১৭ x ১০$^{১}/_{২}$ সেমি।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় আছে :

প্রকাশক
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ অংশ এইরকম :

স্নেহাস্পদ
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারকে।
বিবাহযৌতুক

হাসিতে রচি দিলাম গছি—
এই,—কৌতুক নব ধাঁধা—
তোরে—যৌতুক উপহার।

তুমি, যতনে যত খুলিবে তত
পড়িবে পাকে বাঁধা,—
প্রাণে ছুটিবে—হর্ষধার।—

[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল আনুমানিক ফেব্রুয়ারি, ১৯১১]

৭. রাজকন্যা। (নাট্যোপন্যাস)। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ১ সানি পার্ক বালিগঞ্জ কলিকাতা। [প্রকাশতারিখ নেই]। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮২। সচিত্র।

আখ্যাপত্রের উল্টোদিকের পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

প্রকাশক
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার

এসো এসো ওগো প্রসাদকুমার,
এসো কল্যাণি, রূপসীবালা,
শোনাব একটি করুণ কাহিনী—
ছুটে এসো কাছে, রাখিয়ে খেলা।
তারো নাম ছিল কল্যাণী দেবী—
রাজার মেয়ে সে,—গরবী নয় ;
রূপ তোর মত অতটা না হোক্
গুণে কিন্তু সেরা বলিতে হয়।
বড় হবে যবে দুটি ভাই বোনে
এমনি-সত্যে রহিও ধ্রুব,
সার্থক হোক্ নাম তোমাদের—
এই দিদিমার আশিস্ শুভ।

[প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : ১৭ এপ্রিল, ১৯১৩]

৮. নিবেদিতা (নাটিকা)। [আমাদের দেখা কপিতে আখ্যাপত্র ছিল না]। [প্রকাশতারিখ বা মূল্যের উল্লেখ নেই]। [প্রথম সংস্করণের প্রকাশতারিখ ৩ এপ্রিল, ১৯১৭]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬০। ১৬ x ১০ সেমি।

প্রকাশক
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

রচয়িত্রীর নিবেদন

মহিলা-সমাজে অভিনয় জন্য এই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছে। শিল্প-সমিতির বিধবাশ্রম এবং স্ত্রীমহামণ্ডলের শিক্ষয়িত্রী-ভবন নির্ম্মাণ করিতে উভয়পক্ষের যে ঋণ হইয়াছে, —ইহার অভিনয় অর্থে যদি সে ঋণ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিশোধ হয় তবে এ রচনা সার্থক জ্ঞান করিব।

উপহার

মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে।

হাসি অশ্রু দিয়ে গাঁথা এই মালা গাছি,
তোমারে পরাতে, হের—সখি, আনিয়াছি।
এ নহে রতন গুচ্ছ—হীরা মুক্তা রাশি,—
—বচন রচন তুচ্ছ ;—তবু ধর হাসি।

৯. **যুগান্ত কাব্য নাট্য। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। মূল্য আট আনা।** [All Rights Reserved]।
[**প্রকাশতারিখ নেই**]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৬। ১৬ x ১০ সেমি।

আখ্যাপত্রের উল্টোপিঠে লেখা আছে :

প্রকাশক
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত

'উপহার' অংশে আছে :

বৎস,

তরুণ অরুণ তব মধুর আলোকে—
অন্তর বাহির পূর্ণ আনন্দ-পুলকে!
এমনি কল্যাণ ছটা বিতরিয়া তুমি
চির ধন্য হও, ধন্য কর জন্ম ভূমি।
মাতৃ হৃদয়ের এই আশীষ বচন—
বরমাল্য দেবতার,—করহে ধারণ।

[প্রথম প্রকাশ : সম্ভবত ২০ জানুয়ারি, ১৯১৮]

১০. দিব্য-কমল। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬৪, উপহারপত্র—১, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের তালিকাপত্র—১ [উপহারপত্রের অপরপৃষ্ঠে মুদ্রিত।]।

আখ্যাপত্রের পর-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে :

প্রকাশক : শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

এবং

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার। ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস। ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

ফুটেছিল এ কমল—
মানস কনক-সরে,
যতনে এনেছি তুলে
তোরে মা স্মরণ ক'রে!

যদিও নিকটে নেই,
স্মৃতি পূর্ণ তোমাতেই;
একবার নেমে এস,
দেখা দাও ক্ষণতরে!

কোন্ ভূবর্লোকে আজি
তুমি ঊষাময়ী জ্যোতি—
জানিনাত! দেখিবারে
আকুল ব্যাকুল অতি!

দেখাও সে অভিনব
সুদিব্য মূরতি তব
প্রকাশি উজলরূপে
নয়ন-নিঝর লোরে!

[নাটকটি তিনটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রতিটি অঙ্ক চারটি দৃশ্য সম্বলিত। নাটকের প্রথমে একটি প্রস্তাবনা অংশ এবং শেষে একটি উপসংহার অংশ আছে।]

প্র ব ন্ধ (বৈজ্ঞানিক পুস্তক)

১. পৃথিবী। দীপ-নির্ব্বাণ প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আশ্বিন ১২৮৯।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮৪, উপহারপত্র ১, সংশোধনপত্র ২, সূচিপত্র ৪, ভূমিকা ৪, উপক্রমণিকা ২৪, Opinion of the Press ১৪। মোট ৯ অধ্যায়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

শিরোনামের ঠিক নিচে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে :

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তমহিনা জায়তৈকং॥

ঋগ্বেদঃ ১০।১১।৩

সূচি : ভূমিকা (পৃ ১-৪), উপক্রমণিকা (০-১৷৷০), **সৌর পরিবারবর্ত্তী পৃথিবী** (১-১৪) [সৌর পরিবার, ছায়াপথ, স্থির নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এবং গ্রহ খণ্ড, প্রাচীন হিন্দুদিগের গ্রহ, রাহু, কেতু, শক্তি অবিনশ্বর, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, কেন্দ্রানুগ, কেন্দ্রাতিগশক্তি, ধূমকেতু এবং উল্কাপিণ্ড, সৌরপরিবার ভুক্ত ধূমকেতু ও তাহার কক্ষ, জ্যোডিয়্যাক্যাল লাইট, উল্কাপিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।]; **পৃথিবীর গতিপ্রণালী** (১৫-৫৩) [পৃথিবীর আয়তন এবং আকৃতি, টলেমি, কোপার্ণিকস্, পৃথিবী আপনাকে আপনি আবর্ত্তন করে, ঐ বিষয় যুক্তি, দিনরাত্রি, দিন রাত্রির বৈষম্য, পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ, ঋতু পরিবর্ত্তন হইবার কারণ, বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে ঋতু পরিবর্ত্তন, ক্রান্তিপাতের বক্রগতি হইবার কারণ, এই গতি হেতু আমরা যে দুই তিনটি ঘটনা দেখিতে পাই, ধ্রুব নক্ষত্র সর্ব্বদা এক থাকে না, নাক্ষত্র বৎসর, সৌর বৎসর, হিন্দু এবং ইউরোপীয় গণের বৎসর গণনা, সৌর ব্যবধান বৎসর, পৃথিবীর কক্ষ পরিবর্ত্তন গতি, পৃথিবীর মেরু কক্ষ পরিবর্ত্তন গতি]; **পৃথিবীর উৎপত্তি** (৫৪-৭০) [কাণ্টের মত, সার উইলিয়ম হারসেলের মত, লাপলাস, সার উইলিয়ম টম্সন, এবং হেল্ম্ হোলটস, সূর্য্যের উত্তাপ আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সূর্য্যের উত্তাপ ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, কি প্রকারে সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে, সূর্য্য শঙ্কুচিত হইয়া সমভাবে উত্তাপ রক্ষা করিতে কি পরিমাণে সূর্য্যের সঙ্কোচন আবশ্যক, সূর্য্য পরিত্যক্ত বাষ্পীয় চক্র কি প্রকারে গ্রহ হইয়া দাঁড়ায়।]; **ভূপঞ্জর** (৭১-৯৪) [পর্ব্বতের উৎপত্তি, আগ্নেয় পর্ব্বতের উৎপত্তি, আটিকা, যে সকল পদার্থে ভূপঞ্জর গঠিত হইয়াছে, সামুদ্রিক স্তর-সংস্থিতির উৎপত্তি সময় নির্ণয়, পৃথিবীর যুগবিভাগের তালিকা, জীবশূন্য সময়, উদ্ভিদ জীবের অগ্রে জন্মিয়াছিল, প্রারম্ভ বা ইনফ্রা সাইল্যুরিয়ান কাল, লরেন্সিয়ান কাল, ক্যামব্রিয়ান কাল, প্রথম যুগ, সাইল্যুরিয়ান অন্তর যুগ, ডিবোনিয়ান অন্তর যুগ, কারবণিফরস অন্তর যুগ, লাইমষ্টোন্ গর্ভ যুগ, মৃদঙ্গার গর্ভ যুগ, অধ্যাপক ফিলিপ্সের গণনা, পারমিয়ান অন্তরযুগ।]; **দ্বিতীয় প্রস্তাব** (৯৫-১০৭) [দ্বিতীয় যুগ, ত্রিস্তর অন্তর যুগ, জুরাসিক অন্তর যুগ, রিটিক গর্ভ যুগ, মেরিথ্যানিং ওয়োলাইট গর্ভ যুগ, স্তন্যপায়ী জীবের প্রথম আবির্ভাব, ক্রিটেস্স অন্তর যুগ।]; **তৃতীয় প্রস্তাব** (১০৮-১২৮) [তৃতীয় যুগ, ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের সহিত এ সময় সম্ভবতঃ সংলগ্ন ছিল, এ বিষয়ে ভূবেত্তা ব্যানফর্ডের যুক্তি, সিন্ধুগাঙ্গ প্রদেশ সমতল হইবার কারণ, ইয়োসিন অন্তর যুগ, মায়োসিন অন্তর যুগ, চৈনজাতির প্রবাদ, মার্শটডন হস্তি সম্বন্ধে একটী ঐতিহাসিক সত্য গল্প, প্লায়োসিন অন্তর যুগ, জলচর স্তন্যপায়ীর প্রথম আবির্ভাব।]; **চতুর্থ প্রস্তাব** (১২৯-১৫৮) [চতুর্থ যুগ, প্রায়োসিনের পরবর্ত্তী কাল, মামথ, আধুনিক কাল, আসিয়ার বন্যা, ইয়ুরোপীয় বন্যা, হিমশৈল কার্য্যকাল, হিমশৈল কালের দারুণ শীতের

আনুমানিক কারণ, মনুষ্যের জন্ম ও আসিয়ার বন্যা, মনুষ্যের জন্ম সময় নিরূপণ দুঃসাধ্য, এই সম্বন্ধে প্রমাণ, মনুষ্যের উৎপত্তি, পশু হইতে মনুষ্যের প্রভেদ, অ্যাভেরনস্থ অসভ্য, মনুষ্যজাতি এক পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন কি না এ বিষয়ে মতামত, আসিয়ার বন্যা, একটি আধুনিক বন্যার বিবরণ।]; **ভূগর্ভ** (১৫৯-১৭১) [ভূগর্ভ সম্বন্ধে প্রধান চারিটি মত, প্রথম মত সমর্থক যুক্তি, দ্বিতীয় মত সমর্থক যুক্তি, হপ্‌কিন্স, দ্বিতীয় মতের বিরুদ্ধ যুক্তি, জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সাইমেন্স, দ্বিতীয় মত সমর্থক অন্যান্য যুক্তি, ইহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি, সাইমেন্স তৃতীয় মত সমর্থক যুক্তি, এই যুক্তির মূল্য, চতুর্থ মত সমর্থক যুক্তি, ইহাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি, প্রথম মতটি অধিক সম্ভবপর, পালমিয়েরি, সার জর্জ এয়ারির মত।]; **পৃথিবীর পরিণাম** (১৭২-১৮৫) [পৃথিবীজাত সকল বস্তুর তিন অবস্থা, পৃথিবীর জীবন ও মৃত্যু, চন্দ্র মৃতগ্রহ, পৃথিবীর মৃত্যু সম্ভাবনা, গ্রহের জীবনের প্রধান কারণ প্রলয়, পৃথিবীর গতি লাঘব হইয়াছে, চন্দ্রের গতি বৃদ্ধিশীল, জোয়ার ভাঁটা পৃথিবীর গতি লাঘবের কারণ, পৃথিবীর গতি লাঘবের দ্বিতীয় কারণ, সূর্য্যের প্রভাব চিরস্থায়ী নয়, শেষ।]

উপহার

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতৃদেব শ্রীচরণকমলেষু।

খেলিতে খেলিতে ক্ষুদ্র শিশুটি যেমন
পেয়ে কোথা কাঁচ ভাঙ্গা, মাটী বা উপল রাঙ্গা,
কি জানি কি মহামূল্য ভাবিয়ে রতন,
মনের আগ্রহে ছুটি, বার বার পড়ি উঠি,
সঁপে আসি মার করে সে অমূল্য ধন।

বিজ্ঞান জগত মাঝে স্খলিত চরণ,
ক্ষীণ হস্ত বাড়াইয়ে কি পাইনু কুড়াইয়ে,
দেখ দেব একবার মেলিয়ে নয়ন।
মা আমার নাই আর, ছুটে যাব কাছে যাঁর,
জনক-জননী দেব তুমিই আমার।
পূজিতে চরণ তব আজিকে আগ্রহ নব
এসেছি পিতা গো নিয়ে এই উপহার!

ভূমিকা

গণিত শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন; নানা কারণবশতঃ অঙ্ক-শিক্ষাও সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না,—বিজ্ঞান এইরূপ কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহা বিশ্ববিদ্যালয়েই একরূপ আবদ্ধ। বিজ্ঞানের এই দুরূহ পথ সুগম করিবার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকা দেশে গণিতের সাহায্য ব্যতীত যেরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচার হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই প্রকার গ্রন্থের আদর্শানুসারে রচিত।

পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের মনে প্রধানতঃ যে সকল প্রশ্ন উদিত হইতে পারে, তাহারি মীমাংসা-স্বরূপ, প্রচলিত বিজ্ঞানের উপদেশ-অনুযায়ী সাধারণের পাঠোপযোগী কতকগুলি প্রবন্ধ, গত দুই বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় ও ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

প্রধানতঃ জর্ম্মাণ লকিয়ার, গডফ্রে, নিউকাস, ব্যালফোর-ষ্টুয়ার্ট ও ফিগুয়ের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত, অপরাপর যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহা যথা স্থানে স্বীকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক সঙ্কলন সম্বন্ধে প্রধান অসুবিধা পারিভাষিক শব্দের অভাব। এ পুস্তকে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক মহাশয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ প্রায়ই গ্রহণ করা হইয়াছে—তবে দু একটি প্রচলিত শব্দের স্থানে অন্য শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। সচরাচর অগ্ন্যুৎগারী পর্ব্বত সকলকে আগ্নেয় গিরি বলিয়া উল্লিখিত হয় কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের জ্বালামুখী শব্দে যখন ঐ অর্থটি আরো সুস্পষ্ট হয় তখন সে কথাটিও বা বঙ্গভাষায় চলিবে না কেন? ঐ উৎকৃষ্ট কথাটি বঙ্গভাষায় প্রবেশার্থী করিয়া এ পুস্তকে ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছি।* যে যে স্থানে পারিভাষিক শব্দের অপ্রতুল হইয়াছে সেই সেই স্থানে নূতন শব্দ রচনা করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সকল নূতন রচিত কথাগুলিই যে গৃহীত হইবে তাহা প্রত্যাশা করি না। জীব জগতেও যেমন শব্দ জগতেও তেমনি—যাহা যোগ্য তাহাই জীবিত থাকিবে। যদি বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি, সকল ভাষায় একই রাখা যায়—তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং ভাষার উন্নতি হয় দেখিয়া যে স্থানে মনোমত প্রতি-শব্দ না পাওয়া গিয়াছে সে স্থানে ইংরাজি মূল শব্দই রাখা হইয়াছে।

সচরাচর ইংরাজি জ্যোতিষিক পাঠ্য পুস্তকে বাস্তবিক পৃথিবী সচল এবং সূর্য্য স্থির বলিয়া দিয়া তাহার পর পৃথিবীকে স্থির অনুমান করিয়া, সূর্য্যের দৃশ্যতঃ গতি আলোচিত হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর গতিবিধি যথার্থরূপ বুঝিবার পক্ষে ধাঁধা লাগিতে পারে, সে জন্য এখানে পৃথিবীর বাস্তব গতি অবলম্বন করিয়াই অপর সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

অঙ্ক বিদ্যার সাহায্য ছাড়িয়া কোন ইংরাজি গ্রন্থে ক্রান্তিপাতের গতি বুঝান হইয়াছে এরূপ দেখিতে পাই নাই, এ পুস্তকে সে বিষয়ে যত্ন করা হইয়াছে, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা।

ডেরাডুনের ভারতবর্ষীয় সরবে অফিসের সুযোগ্য গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম দুই অধ্যায়ের প্রুফ সংশোধন করিয়া যে সাহায্য করিয়াছেন সে নিমিত্ত এইস্থলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

উপক্রমণিকাতে আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষিক উন্নতি সম্বন্ধে যে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশ শ্লোকই আমাদিগের

---

* বোধ হয় এ কথাটি ব্যবহার করা অসঙ্গত হয় নাই, আশ্বিন মাসের ভারতীতে পৃথিবীর পরিণাম শীর্ষক প্রবন্ধে প্রথম ইহা ব্যবহার করা হয়। তাহার পর মাসে দেখিলাম চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহও ঐ অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছেন।

অনুরোধে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সেই পরিশ্রমের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপকৃত রহিলাম।

অগ্রে মূল গ্রন্থখানি পড়িয়া পরে উপক্রমণিকাটি পড়িলে ভাল হয়, কারণ মূল গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সহিত উপক্রমণিকাটি এমন বিশেষ রূপে জড়িত যে অগ্রে উপক্রমণিকা পড়িলে তাহার স্থানের স্থানের যথার্থ অর্থ সহজে বোধগম্য না হইতে পারে।

গ্রন্থ-সমালোচনা :

পৃথিবী।—দীপনির্ব্বাণ প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। এখানি একখানি জ্যোতিষ ও ভূবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবাত্মক গ্রন্থ। বঙ্গ ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অতি বিরল, এই জন্য এবং স্ত্রীলোক লেখনী প্রসূত বলিয়া আমরা এই গ্রন্থ রচনায় অতীব প্রীত হইলাম। বঙ্গবালা যে দুরূহ বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ইহা অতীব গৌরবের কথা। গ্রন্থ রচয়িত্রী সাহিত্য সংসারে খ্যাতাপন্না। ইনি কখন কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। অধ্যাব্যবসায় [sic] ও মেধাশক্তি সহায়ে সংস্কৃত ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকে ইনি ভাবুকতা, কবিত্ব ও চরিত্র চিত্র-নিপুণতায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

সমালোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রস্তাব বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে। এই প্রস্তাব প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাস সূচক। ভারতবর্ষই বিজ্ঞানের আদিম জন্মভূমি, বেদবর্ণিত সময়েও ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যগণ বীজগণিত জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ইউরোপে তাহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্যাও হিন্দুদের প্রথম আলোচিত। খৃষ্টের জন্মিবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জ্যোতিষ আলোচনা দেখা যায়। এদেশ হইতেই জ্যোতিষ ক্রমে কালডিয়া, মিসর, গ্রীস, প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হয়। গ্রন্থকর্ত্রী বলেন, পৃথিবী যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ভট্ট বলিয়াছেন, "পৃথিবীর আবর্ত্তন বশতঃই স্থির নক্ষত্র মণ্ডল এবং গ্রহগণের উদয় অস্ত হইতেছে।" তিনি তাহার পর লিখিয়াছেন, দূরবীণ সৃষ্টি হইবার পর ইউরোপে অল্প কালমাত্র সূর্য্য বিম্ব (Sun spots) পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে, "বিশ্বকর্ম্মা অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিয়া লইলেন, যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল, সেই অংশটিতে শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক রহিল।" জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল স্বরূপ যে মাধ্যাকর্ষণ নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই নিয়মের আংশিক জ্ঞান যে পুরাকালে ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর জীবন ইতিহাসে চারিটি যুগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পৌরাণিক আখ্যানেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের কথা বলিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্রী লর্ড বেকনের "আরোহণ প্রণালী" (Inductive theory) অতি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতের স্থূল মর্ম্ম বলিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা কি উপকার সাধিত হইতে পারে তাহা লিখিয়াছেন। বিজ্ঞান চর্চ্চা জন্যই ইউরোপ এতদূর উন্নত ও গৌরবাপন্ন হইয়াছে। যদিও ভারতবর্ষ এক কালে বিজ্ঞানের জন্ম ও আবাসভূমি ছিল, এখন আর এখানে

রীতিমত চর্চ্চা হয় না। আমাদের দুর্দ্দশাও তাহার জন্য। এই প্রস্তাবটি গ্রন্থকর্ত্রী এক জ্বলন্ত কথা গুলি বলিয়া শেষ করিয়াছেন।

"আজকাল ইউরোপীয়গণ আমাদের এই রত্নগর্ভা ভারত ভূমিতে আসিয়া আমাদের দেখাইয়া দেখাইয়া রত্ন সকল লুটিয়া লয়েন, আমরা যখন তাঁহাদের মত শিক্ষিত হইব তখন আমাদের আর এরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে না। এখন অতীত কালেই আমাদের অহঙ্কার, স্মৃতিতেই আমাদের মাহাত্ম্য, বর্ত্তমানে আমাদের কিছুই নাই, সুতরাং অতীতের কথা নাড়াচাড়া করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। যে দিন বিজ্ঞান আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন, সেই দিন অতীত ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমানের অহঙ্কার হইয়া দাঁড়াইব। সেই দিন সর্ব্বতোভাবে আমাদের উন্নতি হইবে, ধনে মানে, যশে আমরা অন্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইতে পারিব।" আমরা গ্রন্থকর্ত্রীর স্বদেশানুরাগিতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমরা তাঁহার প্রত্যেক কথায় অনুমোদন করি।

পুস্তকখানি অষ্টম অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ১ম অধ্যায় "সৌর পরিবারবর্ত্তী পৃথিবী" শীর্ষক। পৃথিবী এবং অপর কয়েকটী গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটি পরিবার, সূর্য্য এই পরিবারের কর্ত্তা। এই সকল গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অনন্তকাল গৃহিত ভ্রমণ করিতেছে ইহা বুঝাইবার জন্য নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের স্থূল নিয়ম পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎপরে রাত্রি দিবা ঋতু ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অধ্যায় পৃথিবীর উৎপত্তি ভূ-পঞ্জর স্তর ও তাহার উৎপত্তি কঙ্কাল প্রভৃতি বিষয়ে অতি প্রশস্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ৭ম অধ্যায় "পৃথিবীর অভ্যন্তর কি?" এই বিষয় ভিন্ন মতের স্থূল মর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে, শেষ অধ্যায় পৃথিবীর পরিণামের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

পুস্তক মধ্যে পৃথিবী সম্বন্ধে যাহা জানা আবশ্যক তাহা সকলই অতি পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে গ্রন্থকর্ত্রী তাহা সমস্ত পাঠ করিয়া তাহাঁদের স্থূল-মর্ম্ম গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা অতীব মধুর ও প্রাঞ্জল। বৈজ্ঞানিক মত যে তিনি এইরূপ মিষ্ট পরিষ্কার ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন ইহা কেবল গ্রন্থকর্ত্রীর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন লেখকেরই সম্ভব। তিনি বঙ্গভাষায় অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দ সংস্কৃত হইতে নূতন ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এই প্রথম রচিত হইল। পুস্তকাভাবে অনেক বঙ্গবাসী পৃথিবীর বিষয় অজ্ঞ ছিলেন ; তাঁহারা এখন এই পুস্তক পাঠ করিয়া আপনাদের অজ্ঞতা দূর করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, বঙ্গভাষা রচয়িত্রীর নিকট বিশেষ উপকৃত রহিলেন। আমরা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের এই পুস্তকখানি মাইনার ও নর্ম্মাল পরীক্ষায় একখানি পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিতে অনুরোধ করি। আমরা আশা করি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এই প্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গীয় নারীগণের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা

This is the latest work of Srimati Svarna Kumari Devi, daughter of our venerable townsman Babu Debendra Nath Tagore. She is already very favourably known to our readers as the authoress of Dip-Nirvan and several

other books, which we received in these columns some time ago. This fair writer had hitherto written anonymously. Neither the Dip-Nirvan with which she commenced her literary career six years ago nor her other works which followed one another in rapid succession disclosed the name of their writer. And as these books possessed great merits and gave promise of future excellence, speculation was naturally rife as to their authorship. We set all the speculation at rest by announcing the name of this fair writer, an announcement which as might be expected created much interest. The public saw how a Zenana lady, who had never been in any school, or mixed in society, could write books in a chaste and vigorous style, delineating some of the subtlest working of the human heart and displaying admirable depth and purity of thought. Srimati Svarna Kumari Devi, indeed, is an ornament to her sex and to her country.

We are very glad to see that this talented authoress does not allow her powers to remain idle. Her last production—the work before us fully sustains her reputation. She had previously written romances and tales, poetical and operatic pieces. This might have led the public to suppose that her powers did not go beyond the field of imagination. If such an impression was created, it would be removed by the present work which treats of scientific subjects. The "Prithivi" which is the first scientific work written by a Bengali lady, is a collection and reprint of a series of papers that appeared from time to time within the last two or three years in the pages of the well-known Bengali periodicals—the Tatwabodhini Patrica and the Bharati. The authoress informs us in the preface that those papers have been carefully revised and in many places entirely re-written. The introduction to the book is worth more than a passing notice. It bears testimony to the extent of the fair writer's sanskrit learning. She points out that India was the birthplace of science, and that even in the Vedic times we find indications of the scientific acquirements of our fore-fathers. The ancient Indians diligently cultivated astronomy at least three thousand years before the commencement of the Christian era; and it was from here that the cultivation of this science gradually extended to Chaldea, Egypt, and Greece. The law that the sun stands motionless in the centre while the earth and the other planets revolve about it was made known in Europe by Copernicus in the sixteenth century, but Srimati Svarna Kumari Devi quotes a passage of Arya Bhatta's works which proves conclusively that the law was known in India more than a thousand years before its discovery in Europe. Then, she gives us a sloka from the Martundya Purana, which demonstrates that the astronomers of Ancient India were aware of the existence of solar spots long before the invention of telescope as also of connection of those spots with famine. Again, she quotes a passage from the Sidhunta Siromoni of Bhaskaracharjia which indicates beyond the possibility of a doubt that the astronomer had anticipated Newton's grand idea. The book before us consists of eight chapters. The first two chapters are taken up

with a description of the different bodies comprising the solar system and of the various motions of the earth as also of the imaginary lines and points which are supposed to be drawn on its surface for the purpose of facilitating astronomical calculations. The next four chapters trace the past history of the globe and of the life upon it and describe the present actual state of things on the surface of our planet—the strata, their nature, organic remains, order of arrangements, the changes visibly going on by the action of waters, winds, volcanoes, & c. The seventh chapter contains a summary of the different theories regarding the Interior of the Earth and the arguments framed against such theory. The most interesting portion of the book is its eighth and last chapter which treats of the probable end of the Earth. It will thus be seen that the work under notice comprises within a short compass a vareity of useful and interesting information on abstruse scientific subjects, which our talented authoress has brought within the reach of the comprehension of the general reader. She has clearly exhibited the main characteristics of the science of the nineteenth century. It is needless to say that the book is written in a chaste and exquisite style. The language is clear and at the same time forcible; and the manner in which some of the most important and extricate discoveries of modern science have been brought to the level of the understanding of lay readers cannot be sufficiently admired. The book will be particularly useful to those who have a taste for scientific studies, but unfortunately have not had the advantage of a scientific education in school or colleges. Such persons would find in it a mine of valuable and interesting information. We would strongly recommend the Education Department to prescribe this work as a text book for vernacular examinations, as it is admirably fitted to teach the principles of modern science to our boys and girls. It is of the utmost importance that attempts like the present one should be encouraged. We would conclude by expressing an earnest hope that the book under notice will be followed by others of its kind from the prolific pen of its versatile fair writer.

Hindoo Patriot,
May 21, 1883

কবিতা/গাথা

১. গাথা। দীপ-নির্ব্বাণ-রচয়িত্রী-প্রণীত। কলিকাতা। বাল্মীকি যন্ত্রে। শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৭ সাল। মূল্য : দশ আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৯৫(6)। সূচি : সাশ্রু-সম্প্রদান (পৃ ১-২৩) ; সাধের ভাসান (পৃ ২৩-৩৬) ; খড়্গ-পরিণয় **[Rutna (Rana of Mewar) had married by stealth the daughter of Prithuraj of Amber...His double edged sword, the proxy the Rajput cavalier, represented Rutna on this occasion. Tod's *Rajasthan*, Vol. 1—Page 308.** পৃ. ৩৭-৭২) ; অভাগিনী (পৃ. ৭৩-৯৫)।

উপহার।

ছোট ভাইটি আমার,
যতনের গাথা হার কাহারে পরাব আর?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,
যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলোনা খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।

গ্রন্থ-সমালোচনা

The writer of this charming little book of poetical tales is Srimati Svarna Kumari Devi, a daughter of our well-known fellow-townsman, the Venerable Babu Debendra Nath Tagore. While yet in her teens she commenced four years ago her literary career with the Dip Nirvan. The works of the fair writer like those of the late lamented Miss Toru Dutt, possess, for obvious reasons, a peculiar interest. Miss Toru Dutt finished her education in Europe and wrote in foreign languages, while Srimati Svarna Kumari is and has always been an inmate of the Zenana, and she writes in her mother-tongue. An educated Hindu woman's observations of men and things in general, embodied in a chaste and vigorous style can hardly fail to arrest the attention of the student of literature and the social philosopher.

The first production of Srimati Svarna Kumari Devi, Dip Nirvan, an historical romance, made its appearance in 1876; and it is no exaggeration to say that the literary public was surprised with it. As the book, which possessed great merits, did not disclose the name of its writer, speculation was naturally rife as to its authorship. It became known in course of time that the accomplished writer was a young Hindu lady belonging to one of the highest families in the metropolis. The Dip Nirvan, as might have been expected called forth warm encomiums from literary critics and the Bengali reading public. It displayed such beautiful conception and skilful delineation of characters, such depth and purity of thought and such chasteness and eloquence of style, that the public was forced to the conclusion that the writer was possessed of high talents. The Calcutta Reviewer felt no hesitation in pronouncing Dip Nirvan "to be by far the best book that has yet been written by a Bengali lady" and in calling it "one of the ablest in the whole literature of Bengali". It is needless to add that the work gave promise of great future excellence. Srimati Svarna Kumari Devi's two next books "Basanta Utsav" or the Spring Festival, a melodrama and "Chhinna Mukul" or the Broken Blossom, a novel, followed each other in quick succession. Basanta Utsav contains many passages of intrinsic poetic beauty and many sweet songs, which testify to the writer's powers as a poet and a musical composer. She has evidently inherited a large share of the superior musical talents of her family, which has the honour of claiming Raja Sourindra Mohun Tagore as

one of its ornaments. Chhinna Mukul, which is a tale of our own days comes quite up to the mark, and fully supports the previous reputation of the writer. She then produced Malati, an excellent novel, in which within a short compass, are vividly portrayed some of the subtlest workings of the heart.

Srimati Svarna Kumari Devi's last published work is Gatha, which is now before us. It is a collecting of four beautiful idylls and as such, a novelty in Bengali literature. Its poetry, as a contemporary justly remarks "is the poetry of genuine heart-felt pathos—powerful from its sublimity and affecting from its tenderness", and its "verification is delicate and sweet". It is difficult to single out any one passage when so many challenge our admiration. But the best piece in the book is certainly that with which it concludes. The story on which this truly pathetic piece is based is very simple. A young man leaving behind his beloved and charming wife, goes to a distant foreign country to fight the battle of life. He achieves success and sets out for home. He, however, encounters the grave perils of a ship-wreck on the return journey, and reaches his destination just in time to clasp in his agonised bosom the almost lifeless form of his wife. The feelings and situation of the unfortunate wife are beautifully conceived and skilfully delineated.

The richness of imagination with which the picture of the final catastrophe is drawn cannot be sufficiently admired, and reminds us of some of Byron's vigorous touches.

It is customary to make some relaxation of strict critical canons in favour of lady writers. But there is no necessity for extending this indulgence of the productions of Srimati Svarna Kumari Devi.

The works of Srimati Svarna Kumari Ghosal show clearly that she is well read in both English and Sanskrit poetry as well as in European works of imagination; and we perfectly agree with the Calcutta Correspondence of the Hindu of Madras, an extract from whose letter we published in these columns some little while ago, "that never before in Bengali did a lady writer of such real powers and abilities appear, and shed such a lustre on the literature of her country" as the talented authoress of Dip Nirvan, Basanta Utsav, Chhinna Mukul, Malati and Gatha.

Hindoo Patriot

২. কবিতা ও গান। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কার্ত্তিক ১৩০২। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ।০, ২৪০।

আখ্যাপত্রের উল্টো-পিঠে লেখা আছে :

কলিকাতা।
অপার সারকুলার রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে
"ভারতী যন্ত্রে"
শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপহার।

ভাই,

সামান্য এ উপহার, যোগ্য নহে তব!
শুষ্ক ফুল দুচারিটি, নাহি বাস নব ;—
তবু যদি লহ হর্ষে, ও পুণ্য স্নেহের স্পর্শে
সরস সুভাবে পুন হাসিবে এ সব!

বিজ্ঞাপন

কবিতাগুলির মধ্যে অল্পই ইতিপূর্ব্বে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দুই চারটি আমার বাল্য-রচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, কেবল "বসন্ত উৎসবে"র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই ; প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই একটি গান ইংরাজি ভাব লইয়া রচিত।

অনবধানতাবশতঃ দুই একটি গান একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে, পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

মহীশূর, রচয়িত্রী
ভাদ্র ১৩০২

(পৃ ২২০), মাঘ মেলা (পৃ ৬২), মায়াবিনী (পৃ ১০), যেন আমার দুখে (পৃ ৬৫), লজ্জাবতী (পৃ ৯৩), লিখিতেছি দিন রাত (পৃ ২২৩), শারদ জ্যোৎস্নায় (পৃ ৮৭), শিশু হরি (পৃ ৪৭), সন্ধ্যা (পৃ ৪৬), সন্ধ্যার স্মৃতি (পৃ ৫৬), স্মরিও আমায় (পৃ ৫৩), সিন্ধুর বিলাপ (পৃ ২৬), সুখের অবসাদ (পৃ ৯২), সুন্দরী (পৃ ২০), সেই তিরস্কার (পৃ ৬৬), স্রোত (পৃ ২৩), হা ধিক মানব! (পৃ ১১৪), হোক কালের মরণ! (পৃ ৯)।

গান : আকাশের ঐ মেঘ (পৃ ১৬২), আকাশের পটে (পৃ ১৬৮), আজি এ কেমন বেশ? (পৃ ১৬০), আজু কোয়েলা (পৃ ১৭১), আমার সাধের (পৃ ১৮৩), আ মরি লাবণ্যময়ী (পৃ ১৭৬), আমি কি করি (পৃ ১৮৬), আমোদে কি আছে (পৃ ১৭৪), আর না আর না (পৃ ২০৫), আহা কেন ঐ মুখখানি (পৃ ২১০), আয় আয় আয় (পৃ ১৫৬), আয় লো সরলে! (পৃ ১৫৯), আয় লো আয় লো (পৃ ১৭৯), আয় লো বালা (পৃ ১৮২), উথলিত অশ্রুবারি (পৃ ১৬৭), উদয় মধুর মধু (পৃ ২১১), একি এ সুখের (পৃ ১৭২), এখনো এখনো প্রাণ (পৃ ২০৪), এ জনমের মত সুখ (পৃ ১৫৮), এত বুঝাইনু (পৃ ২০৮), এমন যামিনী (পৃ ১৯০), এমন বারি ঝরে (পৃ ২১১), এমনি ক'রে (পৃ ১৯৮), এমনে কেমনে রব (ঐ), এ হেন পাষাণ যদি (ঐ), এ হৃদয়-ফুল (পৃ ১৭৪), এ হৃদয় বুঝিল না কেহ (পৃ ১৯৭), এ হৃদি নিভাতে চাহে (পৃ ১৯৯), ঐ বুঝি দেবী (পৃ ২১৫), ওগো, একবার চেয়ে (পৃ ২১৪), ওহে পরাণপ্রিয় (পৃ ১৯২), কত দূরে থেকে (পৃ ১৬৩), কাহে লো যমুনা (পৃ ১৫২), কি গভীর বেদনায় (পৃ ১৭৭), কে আছে রে অভাগিনী (পৃ ১৫৭), কে তুমি, স্বপনময়ী (পৃ ২০৩), কেন গো ফেলিছ (পৃ ১৭৫), কেন সখি (পৃ ১৭৯), কেমনে বিদায় দেব (পৃ ২০১), কেহ শুনিল না (পৃ ২০৮), কোথায় গেলে কালরূপ (পৃ ১৮৮), কোন চুরায়লো (পৃ ১৫৫), ক্যায়সে বাজাওয়ে কান (পৃ ১৮৮), ঘোষে বজ্র কড় মড় (পৃ ১৬৬), চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য (পৃ ১৭২), চলিলে প্রবাসে তবে (পৃ ১৬৮), চলিনু জন্মের মত (পৃ ২০৭), চলো লো কাননে (পৃ ১৬১), চেয়ে আছি (পৃ ১৬৪), চোখের আড়াল হলে (পৃ ১৯৭), ছি ছি কেমন জামাই (পৃ ১৮১), জনম আমার শুধু (পৃ ১৭৫), জনমের মত সখা (পৃ ২০০), জ্বলিল কেন এ হৃদে (পৃ ২০৬), তারকা হারাতে পারে ভাতি (পৃ ১৯৬), তারে কভু না ছাড়িব (পৃ ১৬২), দিনের আলো (পৃ ১৯০), দূর বিজন বনে (পৃ ১৫৫), দেখিয়ে এ অশ্রুরাশি (পৃ ১৭০), নব শ্রাবণ মাস (পৃ ২১৩), নিঃঝুম নিঃঝুম (পৃ ১৫৬), নিঠুর নয়নে কেন (পৃ ২০৫), নিভে গগন সীমান্তে (পৃ ১৯৩), পোহাইল বিভাবরী (পৃ ১৭৭), প্রাণ সঁপিলাম (পৃ ২০৯), প্রেমের অমৃত বিষে (পৃ ২০৩), ফোটা ফুলগুলি (পৃ ১৭০), বিদায় প্রাণেশ (পৃ ২১৬), বিরাগভরে অমন করে (পৃ ১৭৮), বুঝি গো সে এল না (পৃ ১৫৮), ভুলে যাও দুখিনীরে (পৃ ১৬৬), মকর গঙ্গাজল (পৃ ১৮৩), মকর গঙ্গাজল (পৃ ১৮৪), মধু বসন্ত (পৃ ১৮৯) মনের উচ্ছ্বাসে (পৃ ১৯৪), মরমের সাধ, সখি (পৃ ২০৬), মোর বিরহ ভাল (পৃ ২১৪), যমুনা পুলিনে (পৃ ১৫৩), যাও যাও যাও হে (পৃ ১৮৭), যাতনার এই দুঃখময় সুখ (পৃ ১৬৯), যাতনা-সমুদ্র মাঝে (পৃ ১৯৬), রিম ঝিম ঘন বরিষে (পৃ ১৬২), লুকাইবি যদি পুনঃ (পৃ ২১০), শুকাইতে রেখে একা (পৃ ২০০), সখিরে তু বোলো (পৃ ১৫১), সজনি নেহারো (পৃ ১৭৫),

সহসা হাসিল কেন (পৃ ১৭৮), সাগরছেঁচা মাণিক (পৃ ১৮২), সারাদিন পড়ে মনে (পৃ ২০৯), সুখের বসন্তে আজ (পৃ ১৭৩), সুখের স্বপনে ছিনু (পৃ ২০৪), সুচারু চাঁদিমা (পৃ ১৮৭), সুশীতল মহীরুহ (পৃ ১৫৭), সে কেমনে চলে যায় (পৃ ১৮০), সে প্রেম সে ভালবাসা (পৃ ২১৬), সেই ত' কুসুম ফোটে (পৃ ২০২), হাস একবার (পৃ ১৯৫), হের গো উদয় (পৃ ১৭৯), হোল না ত মালা গাঁথা (পৃ ১৯১)।

জাতীয়-সঙ্গীত : কি আলোক জ্যোতি (পৃ ২৩০), তবু তারা হাসে (পৃ ২২৯), ফুরায়েছে হাসি (পৃ ২৩০), বল, ভাই, বল্ (পৃ ২২৮), বড় সাধ বড় আশা (পৃ ২২৬), মানব জনম (পৃ ২২৭)।

ধর্ম্ম-সঙ্গীত : অনাথনাথ হে (পৃ ২৩৯), ওহে সুন্দর প্রেমময় (পৃ ২৩৪), ওহে জগজনপাতা (পৃ ২৩৫), ওগো তারা দয়াময়ি (পৃ ২৪০), কি সুন্দর নিকেতন (পৃ ২৩৬), তুমি স্বয়ম্ভূ সুন্দর (পৃ ২৩২), তোমারি আদেশে (পৃ ২৩৪), দয়াময়ী নামে তোর (পৃ ২৪০), দীনদয়াময় (পৃ ২৩৫), দোষ করেছিনু, সখা (পৃ ২৩৮), বহুক ঝটিকা ঝড় (পৃ ২৩৬), মধুর প্রভাতে মধুর রবি (পৃ ২৩২), মা বলে আর ডাকব না মা (পৃ ২৩৯), হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা (পৃ ২৩০)।

স্ব র লি পি

১. গীতি-গুচ্ছ (গান ও স্বরলিপি)। কলিকাতা। ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, চেরি প্রেস, ১৩২৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা : (৪), ১২৪।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড।

১৫।	লক্ষ ভায়ের...	২৭	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
১৬।	নমস্তে সতেতে...	২৯	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
১৭।	ঐ বিশ্বলোকে...	৩১	গীতি রচয়িত্রী
১৮।	কর নূতন বর্ষে...	৩৩	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
১৯।	ওহে পুণ্য শক্তিমান...	৩৬	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
২০।	আমার গীতি কুসুম...	৩৮	ঐ
২১।	শিখাও হে শিখাও...	৪০	গীতি রচয়িত্রী
২২।	এস হে এস সুন্দর...	৪৩	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
২৩।	কে তুমি প্রেমিক বাদক...	৪৬	গীতি রচয়িত্রী
২৪।	মধুর আকাশে...	৪৭	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
২৫।	দীন দয়াময়...	৪৯	গীতি রচয়িত্রী
২৬।	আমার মনের সাথে...	৫১	ঐ
২৭।	ওহে কাল ত্রিলোক...	৫৫	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
২৮।	কোথা হে তুমি ধর্ম্মরাজ	৫৭	গীতি রচয়িত্রী
২৯।	গাও জয় জয়...	৫৯	গীতি রচয়িত্রী
৩০।	সফল কর...	৬১	ঐ
৩১।	বহুক ঝটিকা ঝড়...	৬২	ঐ
৩২।	ওহে সুন্দর প্রেমময়...	৬৪	শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৩।	হের গো হের...	৬৫	গীতি রচয়িত্রী
৩৪।	এই নিবেদন প্রভু...	৬৭	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
৩৫।	এ জনম প্রভু...	৬৯	গীতি রচয়িত্রী
৩৬।	জানি হে বঁধু জানি...	৭১	শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৭।	তুমি স্বয়ম্ভু সুন্দর...	৭৩	ঐ
৩৮।	কাঁদিতে পারিনে...	৭৪	ঐ
৩৯।	দোষ করে ছিনু সখা...	৭৬	গীতি রচয়িত্রী
৪০।	দয়াময়ী নামে...	৭৭	ঐ
৪১।	ওগো তারা দয়াময়ি...	৭৮	ঐ
৪২।	মা বলে আর...	৭৯	ঐ
৪৩।	আজি মঙ্গল শঙ্খ...	৮১	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
৪৪।	দাঁড়াও গো রাণি...	৮২	ঐ
৪৫।	এত দিনে পড়িল কি...	৮৩	ঐ
৪৬।	হায় দেখিতে দেখিতে...	৮৫	গীতি রচয়িত্রী
৪৭।	বিদায় দেব কেমনে...	৮৬	ঐ
৪৮।	নন্দন আনন্দ আভা...	৮৮	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
৪৯।	সারদে শুভঙ্করি...	৮৯	ঐ
৫০।	নমামি ত্বাং ভারতি...	৯০	গীতি রচয়িত্রী
৫১।	আজি মঙ্গল পঞ্চমী...	৯১	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

দ্বিতীয় খণ্ড

গান	পৃষ্ঠা	সুরদাতা
৫২। গানের ঝরণা...	৯৩	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
৫৩। তোমার ছড়িয়ে পড়া...	৯৫	গীতি রচয়িত্রী
৫৪। শারদ সমীর...	৯৮	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
৫৫। বসন্ত জেগেছে...	৯৯	ঐ
৫৬। ওহে সুন্দর তব...	১০১	গীতি রচয়িত্রী
৫৭। আজি কোয়েলা...	১০৩	ঐ
৫৮। নিঃঝুম নিঃঝুম...	১০৩	ঐ
৫৯। তারা চল্‌লো ভেসে...	১০৪	ঐ
৬০। আমার ডাক পড়েছে...	১০৫	ঐ
৬১। মনটি ওরে ভাল করে...	১০৭	শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২। তোমার আপনার জনা...	১০৯	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
৬৩। কে জানে সখি...	১১১	গীতি রচয়িত্রী
৬৪। আমি কি চাহি...	১১২	ঐ
৬৫। আমি বাঁধলাম গান...	১১৩	ঐ
৬৬। তোরা কাঁদিস সখি...	১১৫	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
৬৭। কে আমারে বারে...	১১৭	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
৬৮। আহা মরি মরি...	১১৯	শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৯। মম চিত্তকুঞ্জ কাননে...	১২০	গীতি রচয়িত্রী
৭০। তোমার সে তারাটী...	১২১	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
৭১। শীত শান্ত বেলা...	১২৩	ঐ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

গীতিগুচ্ছের প্রকাশক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গসমাজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক। এই পুস্তকের গানগুলি স্বরলিপি করিবার কালে যত্নের সহিত তিনি তাল লয় বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন এবং অনেকগুলি গানে সুর সংযোগও তিনিই করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার যত্ন পরিশ্রমেই যে গানের এই বইখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, লেখনীমুখে আজি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আমার পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অন্য যাঁহারা গীতিগুচ্ছের কোনো কোনো গান সুরতানে শ্রুতিমধুর করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমার আত্মীয় এবং সঙ্গীতজ্ঞ গুণী। তাঁহাদের নাম গানের সুরের সঙ্গেই এই পুস্তকে সংযুক্ত আছে। তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে নিবেদন অনাবশ্যক হইলেও তাহা কিছু কম আন্তরিক বা গভীর নহে।

রচয়িত্রী।

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থে জাতীয় সঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীতের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য ভাবের গান যাহা আছে

তাহাও যৌবন-সুলভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম সঙ্গীত নহে অতএব এই স্বরলিপি গ্রন্থ নিঃসঙ্কোচে বালক বালিকার হাতে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগে দেবীর অন্যান্য সঙ্গীতের সহিত তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে খাঁটি প্রেমভাবের ও হাস্য কৌতুক রসাত্মক সঙ্গীতাদি সংগ্রহপূর্ব্বক স্বরলিপি প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানই রচয়িত্রীর নব রচনা। তিনি যেমন যেমন রচনা করিয়াছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সুর ও স্বরলিপি সংযোগে প্রেসে পাঠান হইয়াছে; তন্নিবন্ধন ভাবের ধারাবাহিকতা অনুসারে গানগুলি পরে পরে ক্রম-সংবদ্ধ হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে।

কয়েকটি স্বরলিপির কোনও কোনও স্থানে ভুল ছাপা হইয়াছে, আমরা শুদ্ধিপত্রে সে সকল ভ্রম সংশোধিত করিয়া দিলাম। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

উপহার।

ইমন ভূপালী—একতালা

ওগো কমল আসনা—রঞ্জিনি বীণাপাণি
আমি কাহাকেও আর জানিনা ভারতি
তোমারেই শুধু জানি!

১. ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা,
না জানি প্রভাত না জানি সন্ধ্যা,
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া, জীবন ধন্য মানি।

২. আমি জানিনা ত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাস হীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতি পূরিত পরমানন্দ লভিগো চরণে দানি।

৩. আমি, না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি,
চাহিনা মুক্তি চাহিনা সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃতবাণী।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৪। [+সূচিপত্র—১, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রকাশকের নিবেদন—১, শুদ্ধিপত্র—১, আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা—১, উপহার (স্বরলিপিসহ)—১।]

২. প্রেম-গীতি। (স্বরলিপি)। দ্বিতীয় ভাগ। গীতি-রচয়িত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রকাশক এবং স্বরলিপিকার সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী। কান্তিক প্রেস —৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রী বিজয়নারায়ণ দাস পাল কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ২ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭২ + সূচীপত্র—১+শুদ্ধিপত্র—১। [প্রকাশতারিখ নেই]।

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমার প্রথম স্বরলিপি পুস্তক গীতি-গুচ্ছের প্রকাশক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযত্নে এই গ্রন্থখানিও তান লয় বিশুদ্ধ স্বরলিপি আকারে প্রকাশিত হইল। এজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গীতি-রচয়িত্রী

প্রকাশকের নিবেদন

পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া প্রণীত গীতাবলীর প্রথম স্বরলিপিগ্রন্থ 'গীতি গুচ্ছ'। জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম্মসঙ্গীত ও অন্যান্য নানাভাবের বহু সঙ্গীত ইহার মধ্যে স্বরলিপিবদ্ধ হইয়াছে।

নবপ্রকাশিত স্বরলিপিগ্রন্থে কেবল প্রেম-গীতি মালাকারে গ্রথিত হইল।

আরও কতকগুলি প্রেমের গান এই গ্রন্থভুক্ত করিব এইরূপ মনে করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে এই বইখানি শীঘ্র প্রকাশের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ২য় সংস্করণে এই বাসনা পূর্ণ করিবার আশা করিতেছি।

'শারদ সমীর' নামে গীতিগুচ্ছের একটি গান নূতন সুরসংযোগে পুনরায় এই গ্রন্থে স্বরলিপি করিয়া দিলাম।

একটি গান ভুলক্রমে এই গ্রন্থে দুইবার ছাপা হইয়াছে, পাঠক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। পরিশেষে নিবেদন এই, যদি সময় ও সুবিধা ঘটে, অতঃপর তৃতীয় ভাগে দেবী মহাশয়ার উৎসব সঙ্গীত ও হাসি কৌতুকের গানগুলি স্বরলিপি করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিবার প্রত্যাশায় রহিলাম।

পা ঠ্য পু স্ত ক

প্রথম সংস্করণ [* তৃতীয় সংস্করণ]

১. গল্পস্বল্প। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড। ১২৯৫ সাল। মূল্য ॥০ আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা :

১০০, উপহার—১, সূচীপত্র—২, মন্তব্য [?]—১, অশুদ্ধ-সংশোধন-পত্র—১ [মন্তব্য-পত্রের পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত]।

সূচী : ১। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য (পৃ. ১), ২। মাতার আশীর্ব্বাদ (পৃ. ৪), শুভ কাজে সুযোগ হারাইও না (পৃ. ৫), ৪। প্রভাত (পৃ. ৯), ৫। সুবুদ্ধির উপদেশ (পৃ. ১০), ৬। শান্তি নিকেতন (পৃ. ১৭), ৭। বীরেন্দ্র সিংহের রত্ন লাভ (পৃ. ১৯), ৮। দ্বিপ্রহর (পৃ. ২৬ *২৫), ৯। সঙ্গদোষ (পৃ. ২৮ *২৭), ১০। ঝটিকা (পৃ. ৩৯ *৩৭), ১১। সত্য (পৃ. ৪৩ *৪১), ১২। বাগানেতে খেলা (পৃ. ৪৭ *৪৫), ১৩। ক্ষমা (পৃ. ৫০ *৪৯), ১৪। শিশু হরি (পৃ. ৫৬ *৫৫), ১৫। সাররত্ন (পৃ. ৫৮ *৫৭), ১৬। বোনের ভালবাসা (পৃ. ৬৫ *৬৩), ১৭। স্বাস্থ্য (পৃ. ৬৬ * ৬৪), ১৮। বিশুদ্ধ জল বাতাস (পৃ. ৬৮ *৬৬), ১৯। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (পৃ. ৭০ *৬৯), ২০। খাদ্য (পৃ. ৭২ *৭২), ২১। ব্যায়াম (পৃ. ৭৯) ' চিত্র সম্বলিত , ২২। সন্ধ্যা (পৃ. ৯২ *৯১), ২৩। কৃতজ্ঞতা (পৃ. ৯৩ *৯২), ২৪। আশা (পৃ. ১০০ *৯৯)।

উপহার

ভাই বোনকে।

শুধু এই হাসি খুসি
শুধু ছেলেখেলা,
কাটি দিবে জীবনের—
সুদীর্ঘ এ বেলা?

শুধু এই হাহাকার
শুধু অশ্রু-ব্যথা—
হৃদয়ের আঁখিপাতে
রহিবে কি গাঁথা?

কিছুই নাহি কি আর
প্রাণ যাহা যাচে?—
থাকুক তোদের তাহা
পরাণের কাছে!

মন্তব্য বা মুখবন্ধ •

'গল্পস্বপ্নে' স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা পড়িয়া বালকের [প্রথম সংস্করণ] *বালকবালিকাদিগের [তৃতীয় সংস্করণ] পাঠোপযোগী এবং বিজ্ঞান-সঙ্গত বলিয়াছেন। ইঁহাদের এ সম্বন্ধীয় পত্র দুইখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দেবেন্দ্র বাবুর পত্র :

"স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহা অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষায়

লেখা হইয়াছে, আর তাহাতে যে বিষয়গুলি বিবৃত হইয়াছে, তাহা আধুনিক 'হাইজিন' শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।"

ব্রজেন্দ্র বাবুর পত্র :

"আমি আপনার পুস্তকের প্রুফ পাঠ করিয়া কোন পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক বিবেচনা করি না। আপনার ভাষা, যেরূপ সুন্দর ও প্রাঞ্জল তাহা প্রায় অন্য গ্রন্থে দেখা যায় না। পুস্তকখানি যে সুপাঠ্য ও মনোরঞ্জক হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।"

[তৃতীয় সংস্করণের সংযোজিত অংশ] :

বেথুন স্কুলের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

এই পুস্তকের দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম এই তিনটি গল্প শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর লেখা।

সং স্ক র ণ

গল্পস্বল্প। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাসিয়াবাগান। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১৭নং ভবনে। বি, কে, দাস এবং কোম্পানীর যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯৮। মূল্য ছয় আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৯৯, উপহার পত্র—১, সূচীপত্র—২, মন্তব্যপত্র—১ [৯৯নং পৃষ্ঠার অপর পিঠে মুদ্রিত।]।

দ্বিতীয় আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠে মুদ্রকের লোগো মুদ্রিত আছে :

B. K. D & Co/General merchants./Commission agents./ [লোগো সহ]

[উপহার—হুবহু এক।]

[সূচীতে পৃষ্ঠাসংখ্যায় পরিবর্তন লক্ষিত হয়।]

[মন্তব্য-এর প্রথম অংশ প্রায় একই।]

[মন্তব্যের শেষ অংশে আছে] :

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, বেথুন স্কুলের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রথম সংস্করণকালে এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু দ্বিতীয় সংস্করণকালে এই পুস্তকের ভাষা সংশোধন করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

এই পুস্তকের দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম এই তিনটি গল্প শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর লেখা।

গল্প-স্বল্প।/নানাচিত্র পরিপূর্ণ।/দ্বিতীয় ভাগ। Vide January List of approved Text-Books, 1905./ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। BHOWANIPUR, Diana Printing Works. Printed by S. N. Batbyal.। মূল্য : সাত আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪৭, সূচীপত্র—১।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

আখ্যাপত্রের উল্টোপিঠে এবং দ্বিতীয় মলাটের দুই পৃষ্ঠে 'সচিত্র বর্ণবোধ' ও 'বাল্যবিনোদ' বিষয়ে একাধিক মন্তব্যের মধ্যে আমরা আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-কৃত মন্তব্যটি মুদ্রিত করলাম :

Balya Vinoda consists of a number of progressive reading lessons, both in prose and verse from the pen of one who ranks among the best writers of our language. Both in diction and [in] the moral tone which pervade them, they are well suited to meet the requirement of vernacular schools. Prescribe for a two years' course, practised writer very aptly has commenced with plain and simple words, and then by slow degrees has introduced more difficult language. This is as it should be. The grammar portion of the book has been admirably done. It is evident that it is the result of much labor and thought and close and well-directed study both of the English and the Sanskrit

learning on the subject. It is a wonder within what small compass she has given a sound analysis of sentence, a good classification of words and a lucid exposition of all the matters dealt with in this part,—illustrated with excellent examples. The rendering of "subject" and "predicate" by উদ্দেশ্য and বিধেয় and of 'parsing' by 'পদান্বয়' struck me as very apt. This "Child's Bengali Grammar" as I may well call it, shows that the fair writer is a perfect master of the subject.

(Sd.) Krishna Kamal Bhattacharjee

১ক. গল্পস্বল্প। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। নূতন সংস্করণ। ছবিতে ছবিতে পূর্ণ। এ পুস্তকে বালক বালিকার উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোরঞ্জক কবিতা, জীবজন্তু সম্বন্ধীয় সহজ সরল বিজ্ঞান কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈতিক গল্প ও [...] লোকের জীবন-কথা সন্নিবিষ্ট।

সমালোচনা—*হিতবাদী*। এখানি অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের পাঠার্থ বিরচিত সচিত্র পুস্তক। * * * * "কথাচ্ছলেন বালানং নীতিস্তদি [...] কথ্যতে" এই মূলমন্ত্র অনুসারে সরলভাষায় লিখিত গল্প ও উপদেশপূর্ণ ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে যদি কাহারও আদর থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিক[ট] এ পুস্তকের অনাদর হইবে না।

কীর্ত্তিকলাপ। নূতন সচিত্র পুস্তক। অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠদিগের জন্য। এ পুস্তকে বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি আমাদের দেশের বড় লোকদিগের সংক্ষেপ জীবনী এবং নৈতিক গাথা এবং কবিত্ব সকল সন্নিবিষ্ট। যেরূপ রচনা পাঠে বালক বালিকাদিগের জ্ঞান ও চরিত্র উভয়ই স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাহার দিকে পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াই উক্ত পুস্তক দুইখানি রচিত।

সমালোচনা—*হিতবাদী*। এ খানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছে। কতকগুলি মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত, কতকগুলি সরল পাঠ্য কবিতা ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত আভাস এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। * * * * সর্ব্বত্র এ পুস্তকের সমাদর হওয়া উচিত, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৬, বালিগঞ্জ সারক্যুলার রোড
[মূল্য এক আনা]

২. বাল্য-বিনোদ। [আখ্যাপত্র নেই, সে কারণেই প্রকাশনা-বিষয়ক বিস্তৃত তথ্যাদি দেওয়া গেল না]। সচিত্র। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫৬ + ব্যাকরণ ১৬। ১৬ x ১০ সেমি। সূচি : বড়লোক কে? (পৃ ১) ; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চরিত্রকথা (পৃ. ৩) ; সুযোগ হারাইও না (পৃ. ৭) ; ক্ষমা (পৃ. ৯) ; অধ্যবসায় (পৃ. ১৩) ; সুবুদ্ধির উপদেশ (পৃ. ১৫) ; রাজভক্তি [ঐতিহাসিক চিত্র।] (পৃ. ২০) ; সাররত্ন (পৃ. ২২) ; পিতৃভক্তি (পৃ. ২৭) ; কৃতজ্ঞতা (পৃ. ৩৪) ; সত্য (পৃ. ৩৮) ; কবিতাংশ : বিভুগুণ-গান (পৃ. ৪১) ; জননী (পৃ. ৪২) ; শিশু হরি (পৃ. ৪৪) ; বাগানেতে খেলা (পৃ. ৪৫) ; পিতৃস্নেহ (পৃ. ৪৭) ; বর্ষা (পৃ. ৪৮) ; বসন্ত (পৃ. ৪৮) ; ঝটিকা (পৃ. ৪৯) ; প্রভাত (পৃ. ৫৩) ;

সন্ধ্যা (পৃ. ৫৪) ; আশা (পৃ. ৫৫) ; মাতার আশীর্ব্বাদ (পৃ. ৫৬)।
[প্রথম প্রকাশ ইংরাজি ১৯০২ সালে]।

৩. কীর্ত্তিকলাপ। ছাত্রবৃত্তি ক্লাশের জন্য। Vide January list of approved text books, 1905. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। মূল্য ।।০ আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : [৯৬] [৪৮]। ১৭ X ১০১/২ সেমি। সূচি : *সাহিত্য :* গৌতমবুদ্ধ (পৃ. ১), শ্রীচৈতন্যদেব (পৃ. ১৮), নানক (পৃ. ২৭), গুরুগোবিন্দ (পৃ. ৩২), বন্দা (পৃ. ৪১), রামমোহন (পৃ. ৪৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পৃ. ৬৪)
কবিতা : শান্তিনিকেতন (পৃ. ১), বৃদ্ধ বট (পৃ. ২), মাতা (পৃ. ৪), ইব্রাহিম ও অগ্নিউপাসক (পৃ. ৫), মাঘমেলা (পৃ. ৮), মূল্য প্রাপ্তি (পৃ. ১১), প্রতিনিধি (পৃ. ১৩), নগর লক্ষ্মী (পৃ. ১৮), সামান্য ক্ষতি (পৃ. ২১), জাপানী বীর (পৃ. ২৫), বুদ্ধদেবের পাখী (পৃ. ৩০), প্রশ্নোত্তর (পৃ. ৩৩), উপকথা (পৃ. ৩৫), আশীর্ব্বাদ (পৃ. ৪৮)। ব্যাকরণ।

'ভূমিকা' অংশে লেখা আছে :

এই পুস্তকের বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের সংক্ষেপজীবনীর জন্য গ্রন্থকর্ত্রী, পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী। উঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে উক্ত জীবনী চতুষ্টয় সঙ্কলিত। সর্ব্বোপরি ব্যাকরণ অংশের জন্য গ্রন্থকর্ত্রী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তিনি উহা দেখিয়া দিয়া পরম উপকার সাধন করিয়াছেন।

কবিতাগুলি একজনের রচনা নহে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গ্রন্থকর্ত্রীর রচনা হইতে নৈতিকগাথা ও কবিতা সকল বাছিয়া ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মলাটের/আখ্যাপত্রের উল্টো-পিঠে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত অন্য দুটি পাঠ্যপুস্তক— 'সচিত্র বর্ণবোধ' এবং 'বাল্যবিনোদ' বিষয়ে তৎকালীন সংবাদপত্র [*Amrita Bazar Patrika,* 8th December, 1902 ; *Indian Mirror,* 22nd October, 1902; *The Bengalee* , 3rd November, 1902] এবং বিভিন্ন মনীষীদের অভিমত ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এঁরা হলেন : প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ *Dawn* পত্রিকা-সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-কৃত মন্তব্যটির জন্য 'গল্প-স্বল্প' পুস্তকের সংস্করণ অংশ দ্রষ্টব্য। সব পেছনের মলাটে 'গল্প-স্বল্প' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) এবং 'কীর্ত্তিকলাপ'—এই দুটি বইয়ের বিজ্ঞাপন এবং 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাদের সমালোচনাও উদ্ধৃত হয়েছে। প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা : শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২৬ বালিগঞ্জ সারক্যুলার রোড।

৪. সাহিত্য-স্রোত। প্রথম ভাগ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। প্রথম সংস্করণ। প্রকাশক : শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ বি, এল। রিপণ লাইব্রেরী, ঢাকা। কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান :

স্কুল লাইব্রেরী, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। সন ১৩৩৮ সাল। ইং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ। মূল্য পাঁচ সিকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : উপক্রমণিকা, ৩৮৮, শুদ্ধিপত্র।

সূচি : 'ভারত সাহিত্যে রমণী-প্রতিভা' (শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' (শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'রামমোহন রায় সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' ; 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। পিতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি' (শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'মহর্ষিদেব' (তাঁহার আত্মজীবনী হইতে যৎকিঞ্চিৎ) ; 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' (শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনচরিত অবলম্বনে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'আতিথেয়তা' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) ; 'বঙ্কিমচন্দ্র' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ; 'দেবী প্রতিমা'* (*রাজসিংহ। বঙ্কিমচন্দ্র) ; 'প্যারীচাঁদ মিত্র—ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর' (শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ) ; 'আলালের ঘরের দুলাল' (টেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত) ; অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন কথা (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) ; 'স্বপ্নদর্শন,—বিদ্যা-বিষয়ক*' (*চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ। অক্ষয়কুমার দত্ত) ; 'সংক্ষিপ্ত ভূদেব-জীবনী (লেখকের নাম নাই) ; 'ঐতিহাসিক উপন্যাস। সফল স্বপ্ন' ভূদেব মুখোপাধ্যায়) ; 'সদাশয় কালীপ্রসন্ন সিংহ' (শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ) ; 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত) ; 'ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন' (শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত'* (*শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত কেশবচরিত এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জীবন ইতিহাস হইতে ইহা সঙ্কলিত ; ইহা আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি। সঙ্কলনকারিকা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'সেবকের নিবেদন' (শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন) ; 'শোকাশ্রু' (শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ' (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়) ; 'দ্বিজেন্দ্রনাথ' (শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ রায়) ; 'মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ : মহাপ্রস্থান' (শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য) ; 'ধর্ম্মের নিয়ম' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ; 'রাজনারায়ণ বসু' (আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী) ; '১৮৪৩ সালে ষ্টীমারে ভ্রমণ' (স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত) ; 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : শোক-নৈবেদ্য' (শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন প্রসঙ্গ' ; 'শোক-নৈবেদ্য' (কবিতা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী) ; 'ব্রাহ্মণাবাদ' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ; 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : পল্লীগাথা ও কাঞ্চনমালা' (রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর) ; 'কাঞ্চনমালা'।

'উপক্রমণিকা' অংশটি পুনর্মুদ্রিত হল :

নবযুগে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি কিরূপে হইয়াছে এই পুস্তকে তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গগত যে সকল গ্রন্থকারগণের জীবন-কাহিনী ও রচনাবলী ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই ভারতীর বরপুত্র। বঙ্গ-সাহিত্য-প্রাসাদে তাঁহাদের নাম জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে চির মুদ্রিত থাকিবে।

আশা করি এই পুস্তক পাঠ করিয়া তরুণ ছাত্রবৃন্দের সাহিত্য-জ্ঞানানুরাগ বর্দ্ধিত হইবে এবং মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিগণের উচ্চভাবের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের প্রাণে আদর্শ-জীবন লাভের একটা ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে। ইহাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে সফল হইলেও আমার এই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, কোনো গদ্য গ্রন্থাদি যে ছিল না এমন নহে।

"নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ১৮০০ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ নামে একটি কালেজ স্থাপিত হয়।* তাঁহার ইচ্ছানুসারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন প্রণীত "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" কেরী প্রণীত "বাংলা ব্যাকরণ" রামরাম বসু প্রণীত "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও "লিপিমালা", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "বত্রিশ সিংহাসন" ও "রাজাবলী" চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রণীত "তোতার ইতিহাস" হরপ্রসাদ রায় প্রণীত "পুরুষ পরীক্ষা", বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ পারসীবহুল ও দুর্ব্বোধ্য ভাষায় পূর্ণ। তখনকার বাংলার সহিত বর্ত্তমান বাংলার ভাষাগত এত প্রভেদ যে পাঠ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।"

কিন্তু রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে 'প্রতাপাদিত্য চরিত' লেখক রামরাম বসুকে "আধুনিক যুগের সাহিত্য স্রষ্টা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দীনেশবাবু বলিয়াছেন—

"এটি স্থির কথা, বাংলা গদ্যের প্রাচীনতর নমুনা যতই থাকুক না কেন, রামবসুই আধুনিক গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক ছন্দের গদ্যে প্রতাপাদিত্য চরিতের মত একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক কেহ লেখেন নাই। পণ্ডিতেরা এই পুস্তকের একটা খুঁৎ ধরিয়াছেন,—'রামবসু অনেক মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন'।

কিন্তু তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন, দরবারের চিত্র দিয়াছেন,—সেখানে মুসলমানী শব্দ তখন চলিত ছিল, তিনি তাহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে?"

শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' নামক পুস্তকে 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"তখন যে গদ্য রচনা করাই কঠিন ছিল তাহা নহে—তখন লোকে অনভ্যাসবশতঃ গদ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না।

সেইজন্য রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গদ্য বুঝিবার কি প্রণালী, তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন।

পুরাণ, ইতিহাসে পড়া গিয়াছে, রাজগণ সহসা কোনো ঋষির তপোবনে অতিথি হইলে তিনি যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন। বেশ দেখা যাইতেছে তপোবনের নিকট দোকান বাজারের সংস্রব ছিল না, এবং শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্রহ করিয়া রাজযোগ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না—সেইজন্য ঋষিদিগকে তপঃপ্রভাব প্রয়োগ করিতে হইত। রামমোহন রায় যেখানে ছিলেন সেখানেও কিছুই প্রস্তুত ছিল না ; গদ্য ছিল না, গদ্যবোধ শক্তিও ছিল না ;—যে সময়ে এ-কথা উপদেশ করিতে হইত, যে, প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্ত্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় অনুসরণ করিয়া গদ্য পাঠ করিতে হয়, সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদের জন্য কি উপহার প্রস্তুত করিতেছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি সর্ব্বসাধারণকে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের হস্তে উপস্থিত মত সহজপ্রাপ্য আমলকী

---

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তকে "বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তার" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হরীতকী আনিয়া দিলেন না। সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার এমন একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ নামের এই মহারাজের যথোচিত অতিথি সৎকার উদ্দেশ্যে কঠিন তপস্যা দ্বারা উক্ত অনুবাদরূপ রাজভোগ সৃষ্টি করিলেন।

কেবল পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জ্জন করা, রামমোহন রায়ের ন্যায় পরম বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জ্জন অত্যুচ্চ শিখর ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানব সভার মধ্যে পরিবেষণ করিতে উদ্যত হইলেন।

এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব, এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙ্গালী, সর্ব্বসাধারণকে রাজটীকা পরাইয়া দিলেন—এবং এই রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাংলা দেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।"

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন* প্রশংসিত এই প্রতাপাদিত্য চরিত-লেখক রাম রাম বসু চুঁচড়ার এক প্রধান কায়স্থ বংশে অনুমান ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। পাদরি টমাস সাহেব বঙ্গদেশে আগমন করিবার পর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রামবসু তাঁহার মুন্সীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামবসু টমাসকে বাঙ্গালা শিখাইয়াছিলেন, এবং বাইবেলের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অনুবাদে পাদরী সাহেবকে বিশেষ সহায়তা করেন। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীরামপুরের কেরি সাহেব বাইবেলের যে বঙ্গানুবাদ সম্পাদন করেন রামরাম বসু তাহার ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিলেন।

মুন্সির পদ যাইবার পর কেরি সাহেব রাম রাম বসুকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদ দান করেন। এই কার্য্যে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাহাল ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকটও আধুনিক বাংলা-সাহিত্য বহুল পরিমাণে ঋণী। কিন্তু প্রধানতঃ তিনি কবিতা লিখিয়াই প্রসিদ্ধ। সেইজন্য এই সংখ্যায় গদ্যলেখকদিগের পার্শ্বে তাঁহাকে না বসাইয়া সাহিত্য-স্রোতের দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার আসন নির্দ্দেশ করিয়া রাখিলাম।

স্থানাভাববশতঃ পরলোকগত সুবিখ্যাত গদ্যলেখকদিগের সকলকেই এই ভাগে আসন দিতে পারি নাই। দ্বিতীয় ভাগে সেকালের গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ খ্যাতনামা সাহিত্যকারগণের প্রতিভার পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা রহিল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

৩নং সানি পার্ক, বালিগঞ্জ
পৌষ—১৩৩৮ জানুয়ারী—১৯৩২

* রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য।

গ্র ন্থা ব লী

১. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী। (প্রথম ভাগ)। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২২৮।
সূচি : দীপ-নির্ব্বাণ (১-৯৭) ; ছিন্নমুকুল (৯৮-১৭৬) ; নবকাহিনী (কুমার ভীমসিংহ —ঐতিহাসিক নাটক ১৭৮-১৮২, ক্ষত্রিয়-রমণী—ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৮৩-১৮৭, ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি ১৮৮-১৯০, সন্ন্যাসিনী ১৯০-১৯৫, প্রতিশোধ ১৯৫-১৯৭, যমুনা—সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত ১৯৭-২০২, কেন? ২০৩-২০৫, আমার জীবন ২০৫-২১০, লজ্জাবতী ২১০-২১৭, নূতন বালা ২১৭-২২১, চাবী চুরি ২২১-২২৮)।

২. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী। (দ্বিতীয় ভাগ)। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৬৫।
সূচি : হুগলীর ইমামবাড়ী (১-৮৪) ; দেব-কৌতুক (কাব্যনাট্য, ৮৫-১১৪) ; ফুলের মালা (১১৫-১৭৩) ; বসন্ত-উৎসব (গীতিনাট্য, ১৭৪-১৮৭) ; মিবাররাজ (ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৮৮-২১৩) ; পাকচক্র (প্রহসন, ২১৪-২৩৬) ; নব-কবিতাবলী (২৩৭) ; প্রবন্ধ রত্নমালা (২৩৮-২৪২) ; পূজার তত্ত্ব (২৪৩-২৪৫) ; পত্রাবলী (২৪৬-২৫৫) ; দার্জ্জিলিং (২৫৬-২৬৫)।

৩. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী। (তৃতীয় ভাগ)। [আমাদের ব্যবহার করা কপিতে আখ্যাপত্র বিনষ্ট]। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৪৬।
সূচি : স্নেহলতা বা পালিতা (প্রথম ভাগ, ১-৮৩) ; অতৃপ্তি (নাট্য-কাব্য, ৮৪-৯৭) ; জাতীয় সঙ্গীত (৯৮-৯৯) ; ধর্ম্ম-সঙ্গীত (১০০-১০২) ; প্রেম-পারিজাত (কবিতা ও গান ১০৩-১০৭) ; যুগান্ত-কাব্যনাট্য (১০৮-১১৭) ; নিবেদিতা (১১৮-১৩৬) ; হাসি (১৩৭-১৪৩) ; শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (অস্বাক্ষরিত লেখিকা-পরিচিতি ১৪৪-১৪৬)।

৪. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী। (চতুর্থ ভাগ)। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-মুদ্রণ-যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২০৪।
সূচি : স্নেহলতা (দ্বিতীয় ভাগ, ১-৫৯) ; বিদ্রোহ (৬০-১৪১) ; সমুদ্রে (১৪২-১৫১) ; প্রভাত-সঙ্গীত (১৫২-১৬৪) ; সন্ধ্যা-সঙ্গীত (১৬৪-১৭২) ; নিশীথ-সঙ্গীত (১৭৩-১৮২) ; সঙ্গীত-শতক (১৮৩-১৯৮) ; সেকেলে কথা (১৯৯-২০৪)।

৫. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী। (পঞ্চম ভাগ)। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। কলিকাতা। ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী বৈদ্যুতিক মেসিন যন্ত্রে, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৯০[?]
সূচি : কাহাকে? (১-৪৩) ; মালতী (৪৪-৫৫) ; জীবন-অভিনয় (৫৫-৫৬) ; পেনে প্রীতি (৫৭-৬৪) ; মিউটিনি (৬৫-৬৮) ; অমরগুচ্ছ (৬৯-৭৫) ; বিবিধ কথা (৭৬-৮২) ; কনে বদল (প্রহসন,

৮৩-১০১) ; কৌতুক নাট্য (১০২-১২৩) ; গাথা (১২৪-১৪৯) ; ট্যালিসম্যান (১৫০-১৫৭) ; রাজকন্যা (নাট্যোপন্যাস, ১৫৮-১৯০?)।

৬. স্বর্ণকুমারী দেবীর নূতন গ্রন্থাবলী। (ষষ্ঠ ভাগ)। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৫৮।
সূচি : মিলন-রাত্রি (১-১০৪) ; বিচিত্রা (১০৫-১৫৫) ; স্বপ্নবাণী (১৫৭-২০৮) ; বিজয়ার আশীর্ব্বাদ (২০৯-২১৯) ; স্বপ্ন না কি? (২২১-২৩০) ; নব ডাকাতের ডায়েরি (২৩১-২৩৯) ; গল্প-প্রবন্ধমঞ্জুষা (কান্তিবাবুর খোসনাম ২৪২-২৪৭, সাহিত্যে দেশবন্ধু ২৪৮-২৫১, ইংরাজের সহিত সুরেন্দ্র-প্রসঙ্গ ২৫২-২৫৪) ; কবিতা-পারিজাতহার (২৫৫-২৫৮)।
[ইংরাজি ১৯১৬-১৭-এর মধ্যে গ্রন্থাবলীর এই ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল]।

৭. স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী। [আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত]। সম্পাদনা : শ্রীমতী বাণী রায়। কলকাতা। রামায়ণী প্রকাশ ভবন। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৪। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শ্রীমনোজ বিশ্বাস।। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—আঞ্চলিক ভাষা উন্নয়ন প্রকল্প—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় সুলভ মূল্যে প্রকাশিত।]। মূল্য : আঠারো টাকা মাত্র। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫১৪।
উৎসর্গ : আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে বিশ্বনারীদের উদ্দেশে—প্রকাশনা উপসমিতি।
সূচি : জীবনী ও সাহিত্যকৃতি : বাণী রায়, বিদ্রোহ (উপন্যাস), কাহাকে? (উপন্যাস), পাকচক্র (প্রহসন), বসন্ত উৎসব (গীতিনাট্য), কৌতুকনাট্য, সঙ্গীত-শতক, প্রভাত-সঙ্গীত, মধ্যাহ্ন-সঙ্গীত, সন্ধ্যা-সঙ্গীত, নিশীথ-সঙ্গীত, গ্রন্থপঞ্জী।

স ম্পা দি ত গ্র ন্থ

১. হাসি ও অশ্রু। শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত। শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত। মাঘ ১৩০১। মূল্য এক টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৯৫, উৎসর্গপত্র : ১, সূচীপত্র : ৫। ১৬ X ১০ সেমি।
আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় লেখা আছে :

কলিকাতা,/আপার সারক্যুলার রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে/"ভারতী যন্ত্রে"/ শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

২৯৫ পৃষ্ঠার একেবারে তলায় লেখা আছে :

Printed at the Bharati Press—Calcutta.

উৎসর্গ

মা আমার।

যেখানে গিয়েছো মা গো, নাহি সেথা অশ্রুধার,
ধরণীর ধূলা রাশি ব্যথিত না করে আর।
কত দূরে কোথা আছ, আমি ত মা নাহি জানি,
তবুও দেখি গো যেন বিমল হৃদয় খানি।

সেই হৃদি নিরমল, তায় স্নেহ কত প্রীতি,
আমারি মুখেতে চেয়ে ফুটিয়া উঠিত নিতি।
হেরিলে আমারি মুখে প্রথম স্নেহের ছবি,
ফুটিয়া উঠিল প্রাণে কত তব আশা রবি।
সযতনে ক্ষুদ্র লতা তোমারি সোহাগ ভরে,
আজি বিকাশিত হয়ে দাঁড়াল সংসার পরে।
জগতে কে বুঝিবে গো কতই মাধুরী তার,
আজ তুমি কোন দূরে কোথা আছ, মা আমার।
এ শোভা কাহারো নয়, শুধু মা তোমারি তরে ;
অর্পিণু চরণে তব যেথা থাক যত দূরে।
শুনেছি তোমারি মুখে মরণের আছে পার,
তবে তুমি সেথা হতে দেখিবে তো, মা আমার।
বলেছিলে সেথা গেলে ভুলিতে নারিবে কভু,
মোদের স্নেহের মুখ জেগে প্রাণে রবে তবু।
যেথা থাক যত দূরে ক্ষুদ্র মোর উপহার,
তোমারি স্নেহের করে সমর্পিণু, মা আমার।

নীরবে (পৃ. ১১৩), আত্মহত্যা (পৃ. ১১৫), শেষ বিদায় (পৃ. ১১৭), শিশুহারা (পৃ. ১১৮), শোকোচ্ছ্বাস (পৃ. ১২১), সিন্দূর (পৃ. ১২৪), সু (পৃ. ১২৫), পূর্ব্বস্মৃতি (পৃ. ১২৬), তিনটি (পৃ. ১২৮), প্রতিশোধ (পৃ. ১২৯), বকুল সুবাস (পৃ. ১৩০), সমাধি (পৃ. ১৩২), সে দিন (পৃ. ১৩৪), একখানি ছবির প্রতি (প. ১৩৬), বিরহ (পৃ. ১৩৭), আলিঙ্গন (পৃ. ১৩৮), দুটি চুম্বন (পৃ. ১৩৯), স্নেহলতা (পৃ. ১৪০), যদি (পৃ. ১৪৯), এসেছি (পৃ. ১৫১), বিদেশী কবিতা (পৃ. ১৫৩), মিলনে (পৃ. ১৮৩), আঁধারে (পৃ. ১৮৪), আশার স্বপন (পৃ. ১৮৫), ঈর্ষা (পৃ. ১৮৬), অলস প্রেম (পৃ. ১৮৭), বিরহ (পৃ. ১৮৮), ফাঁদ (পৃ. ১৮৯), চুম্বন স্পর্শ (পৃ. ১৯০), নব পরিণয়ে (পৃ. ১৯১), আর্ত্তস্বর (পৃ. ১৯৩), ছি (পৃ. ১৯৪), উপহার (পৃ. ১৯৬), দুইটি ছবি (পৃ. ১৯৮), স্বপ্ন (পৃ. ২০০), ভুলে বলি (পৃ. ২০১), সন্দেহ (পৃ. ২০৩), তুমি (পৃ. ২০৪), রাজা ও রাণী (পৃ. ২০৫), অভিমানী (পৃ. ২১২), শ্রাবণে (পৃ. ২১৩), জীবন স্বপন (পৃ. ২১৪), ছেলেখেলা (পৃ. ২১৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পৃ. ২১৭), এমনি (পৃ. ২২০), একটি শিশুর প্রতি (পৃ. ২২২), বসন্ত পঞ্চমী (পৃ. ২২৩), প্রভাতে (পৃ. ২২৫), প্রদোষে (পৃ. ২২৭), সাধ (পৃ. ২২৮), সাধের ভাসান (পৃ. ২২৯), নীরব প্রকৃতি (পৃ. ২৩০), চলে যায় (পৃ. ২৩২), একটি চুম্বন (পৃ. ২৩৩), এস কাছে (পৃ. ২৩৪), বঙ্কিমচন্দ্র (পৃ. ২৩৫), দুটি কথা (পৃ. ২৬৬), পথের পরিচয় (পৃ. ২৭০), বিদায়ে (পৃ. ২৭১), আলাপ পরিচয় (পৃ. ২৭৩), মধ্যাহ্ন (পৃ. ২৭৫), দলিত লতা (পৃ. ২৭৭), তরুর উক্তি (পৃ. ২৮০), পাগল (পৃ. ২৮৩), দেখা (পৃ. ২৮৫), সে (পৃ. ২৮৬), শেষ (পৃ. ২৮৮), পত্র (পৃ. ২৮৯), সপ্তম বর্ষ (পৃ. ২৯১), পুরাতন বর্ষ বিদায় (পৃ. ২৯৩)।

অ নু বা দ

১. ***The Fatal Garland.*** By Srimati Svarna Kumari Devi. English Edition. By A. Christina Albers. Price Rs. 2, p. 172. Illustrated.

আখ্যাপত্রের উল্টোদিকের পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

Printed by P.C. Dass, at the
Kuntaline Press,
61 & 62, Bow Bazar Street,
&
Published by S.K. Lahiri & Co.,
54, College Street, Calcutta.

Introduction

This story which has some events of Indian history of the 14th Century as its background, contains much of Indian philosophy, which gives it its main value. We trust it will do something towards making our Western friends better acquainted with Hindu ideas. It is remarkable how little even Englishmen who have lived for years in this country in many cases understand Hindu thought. The Hindus have struggled for many centuries and under

different foreign rules, and they have maintained their originality under the greatest difficulties and hardships, a little of which this book shows. We further see by it that the material spirit which is now almost entirely lost, was very strong in those days. With this exception the customs, manners, thoughts and tendencies of the people are greatly the same today as they were in the days to which this tale carries us back.

A. C. Albers

Dedication

Dear Friend,

I wove a flowery chain
Which on my heart has lain
Hidden, for many a day.

I hold it in your sight
To-day, but sad its plight
Of crumpled disarray.

Wilt thou take it from me,
Coldly, or lovingly,
Wilt thou accept it, say?

চিত্রসূচি :

1. Srimati Svarna Kumari Devi. (From an old photograph by Bourne & Shepherd. প্রবেশক চিত্র।)

2. The Play "King and Queen". (And as he spoke he picked up the fallen wreath that Nirupama has woven...and put it around Shakti's neck. Page 10.)

3. Ganesh Deb and Shakti on the River Bank. ("And now Ganesh Deb played—played the sweet tune of an old time song and Shakti listened with her whole heart and drank in every note." Page 25.)

4. Shakti in the disguise of a beggar woman. (She stood near a tent;—the curtain was half drawn and what was the site before her! Page 123.)

5. Shakti's dream.—Voyage to an Unknown World. (—Only the Rajkumar was with her and their strong souls soared upward together to those regions where ecstacy and life are blended and eternal peace holds sway. Page 169)

এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ১৯০৯ অবধি *Modern Review* পত্রে ধারাবাহিকভাবে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

২. ***An Unfinished Song.*** By Mrs. Ghosal (Srimati Svarna Kumari Devi). Author of "The Fatal Garland", etc. New York. The Macmillan Company, p. 219. (Hard Cover).

আখ্যাপত্রের উল্টো-পৃষ্ঠায় আছে :

NEW YORK HERALD—Mrs. Ghosal has contrived in an absorbing narrative to convey to the Western reader a valuable insight into the Hindu nature.
WESTMINSTER GAZETTE.—Mrs. Ghosal, as one of the pioneers of the woman movement in Bengal, and fortunate in her own upbringing, is well qualified to give this picture of a Hindu maiden's development.
CLARION—Remarkable for the pictures of Hindu life, the story is overshadowed by the personality of the authoress, one of the foremost Bengali writers of to-day.

1st Edition, December, 1913
2nd Edition, October, 1914

Preface

This is a story of life among the Reformed Party of Bengal, the members of which have to some extent adopted western customs. It shows the changes that touch with Europe has brought upon the people of India, but in their inner nature the Hindus are still quite different from western races. The ideals and traits of character that it has taken thousands of years to form are not affected by a mere external change. This story, it is true, touches on one side of Indian life only, for in a small book it is difficult to depict many of the numerous phases of our Society; still I trust it will give the western reader some insight into Hindu nature.

Introduction

The author of this book, a high caste Indian lady, is one of the pioneers of the Woman movement in Bengal, indeed the wealthy Tagore family to which she belongs has done more to raise the standard of the Bengali than any other Indian family. Although brought up strictly on Zenana lines, educated behind the purdah, and married at a very youthful age, Mrs. Ghosal was encouraged both by her father and her husband to develop her unusual powers of mind and character. Her father, Devendra Nath Tagore, was the great religious reformer and founder of the Brahmo Somaj, a society which devotes itself to fostering and preserving all that is high and noble in the Vedic religion. From her father Mrs. Ghosal inherites her passionate love and admiration for her native land, her ardent desire to rouse it from its lethargy, to inspire it to progress, and to help it cast off the yoke of its debasing traditions.

One of her brothers, Rábindra Nath Tagore, is the foremost Indian poet of to-day, adored by his countrymen, and eulogised both in England and America, where his poems have been issued in translated form. Another brother, Dwijendra Nath, founded what is now one of the chief Bengali magazines, which he dedicated to Bharoti, the goddess of learning; while her third brother, Satyendra Nath, after visiting England, set himself to tear down the purdah, to remove from Indian women the many and tremendous disabilities under which they labour; he has been warmly supported by Mrs. Ghosal, who was one of the first Bengali ladies to mix freely in Society.

At a very early age Mrs. Ghosal, or, to call her by her beautiful Indian name, Srimati Svarna Kumari, which signifies the Maiden of Gold, showed unusual ability and force of character; before she was twenty she had published an anonymous novel which became an immediate success, and the revelation of its authorship caused a great sensation, as it was the first time an Indian woman had attempted such a feat. Soon after she took over from her brother the editorship of the magazine "Bharoti", thus becoming the first woman editor in India, and, except for a short interval when her two daughters took it in hand, she has conducted it ever since—a period of twenty-five years. Besides her editorial work she has produced novels and short stories, poems, dramas, farces, and popular scientific text books for use in schools. Several of her novels have been dramatised and her plays have been performed before enthusiastic audiences all over India.

Besides her literary and editorial work she interests herself in every movement that is set on foot to educate and raise her countrywomen, and has herself founded a Home for Indian widows, for the purpose of providing a refuge for those unfortunates whose relatives, now that old customs are losing ground, no longer feel bound to maintain them; this Home is directed by one of Mrs. Ghosal's daughters, while her other daughter founded and directs the "All India Women's Society" for the education of Indian women. Mrs. Ghosal's son holds an important position in the I.C.S., and is now on a visit to England with his wife, the Princess Sukriti of Cooch Behar.

Now that her children are married Mrs. Ghosal lives alone in the great Ghosal house, which stands in its large and beautiful grounds, shaded by palm trees and cooled by fountains, on the outskirts of Calcutta. Only a few months ago she lost her beloved husband, her lifelong companion, who shared her convictions and encouraged her in her work. Since then, although she does not adhere to the strict rules of the Hindoo widow, she has withdrawn from Society. She feels that, for her, the joy of life is over. "We shall be reunited in our future births," she says, and this she awaits with calm conviction. She has laid aside her wonderfully embroidered saris with their gold borders; her magnificient necklaces and bracelets and the splendid jewels that used to fasten her saris on shoulder and breast and in her dark hair she has divided among her daughters and grandchildren, and she now appears clad in flowing garments of soft white silk. She is tall and stately, a veritable "grand dame", her face is noble and expressive of high intelligence, and her manner calm and perfectly dignified.

One day for her is very like another; she rises at a very early hour, and upon the great terrace in front of the house she recites her morning prayer as the sun rises, endeavouring to "merge her small entity in the great ocean of entities"; she prays to the Almighty, All Beneficent Power, that good may befall every creature, that wisdom and happiness may be the lot of every soul on its journey up from ignorance to light. Then she goes to the south verandah

where, after drinking a glass of milk, she spends the early morning hours in literary work, revising, editing, correcting and writing. At eleven o'clock she has her daily bath, an important ceremonial in the life of an Indian lady, even her heavy luxuriant hair is washed every day. After a very simple meal she rests and reads the daily papers or a book. At four she has another cup of milk, and until seven she strolls in her beautiful garden, or receives visitors (or before her husband's death she would drive out in her car and pay visits), and soon after dinner she retires to rest. Although Mrs. Ghosal still wears the native dress and retains all the beauty and comfort that India has to offer her, she does not hesitate to introduce European conveniences into her house, and her wide drawing-room contains English chairs and tables. There she receives her friends with generous hospitality; when they first arrive tea is handed to them in pretty Japanese cups, then a number of trays are brought in covered with small dishes containing innumerable delicacies : quaint little cakes, delicious sandwiches, fried rice, biscuits spread with hot cheese, salads, fruit creams and sherbets ; the hostess herself piles her visitors' plates till they pray her to desist, and finally finger bowls are handed round.

Mrs. Ghosal is a forerunner, a type of the future woman of India, now that education is becoming general. She has not wholly emerged from the seclusion of the purdah, there are still many relatives even in Calcutta whose feeling would be grievously hurt by total emancipation, with them she still keeps purdah, the change even in her enlightened family is going on slowly. Emancipation is not all gain, Mrs. Ghosal thinks ; women behind the purdah lived such peaceful sheltered lives, nothing came near enough to hurt them except the sickness or death of their dear ones; anxieties passed them by, there was time for everything, no hurry, no striving to be "economically independent", and Mrs. Ghosal, with all her progressive ideas, still preserves the dignified tranquillity of the purdah-nashin lady; brilliant as she is in the eyes of her countrymen, flattered as she has been she never asserts herself nor gives an opinion unasked; and indeed the semi-purdah in which she lives has the great advantage that it affords her abundant opportunity for her literary work and study. Mrs. Ghosal has read and thought deeply; although she has never been to England she is greatly interested in everything English, and reads many English books ; her favourite author is George Eliot, for whom she has a deep veneration.

This is the first time that a book of hers has been brought before the English public, and it should be of deep interest to all those who are concerned with the Woman question, for it presents a careful study of the Indian girl at this intensely interesting stage in the history of her development and particularly of her attitude towards love and marriage; all that is best in the old traditions of her race still holds her fast, but she is reaching out eager hands for the freedom that will some day be hers.

E. M. Lang

৩. *Princess Kalyani.* (A Play in Three Acts). By Mrs. Ghosal. (Srimati Svarnakumari Devi). Published by Ganesh & Co. Madras. 1930. Pages : XVIII, 223.

উৎসর্গপত্র এইরকম :

To
Herr Theodor Riebeling
In Token of
My Sincere Friendship

Svarnakumari Devi Ghosal

আমাদের দেখা কপিতে উৎসর্গপত্রের উল্টোপিঠে লেখিকার হস্তাক্ষরে লেখা আছে :

The play may be shortened or slightly altered, if necessary, for better effectiveness, on the stage.

Author

Preface

The very kind reception which my former books have met with from the Press and public has emboldened me to launch forth into still another attempt, though in quite a different direction. I hope that this little Eastern drama will be accorded a welcome by the Western stage and help to portray the spiritualistic ideas of our country.

I offer my sincere thanks to my niece Mrs. P. Chaudhuri and my friend Mr. K. C. Sen, I.C.S., for the great help they have rendered me in this connection, and to Miss Agnes Platt for re-arranging some of the scenes. I am also indebted to my English friend "A Buddist Bhikkhu" for his appreciative Introduction, and to Herr Theodor Riebeling for translating the play into German.

The Author

Introduction

This delightful little drama from the pen of the gifted authoress of the Unfinished Song and the Fatal Garland should perhaps have appreared without any introduction, which is an attempt to provide some kind of bridge or approach between forms of art almost entirely alien to each other. This is unnecessary for a play so self-contained and complete in itself, with its strange and subtle atmoshphere. The foreword-writer in such a case can but play the part of mediator or interpreter, and this has been done wonderfully well by the author herself in the prologue.

Man is undeveloped until he is thoroughly humane, and is in reality soulless till he can feel the Universal Soul throbbing in unison with his own. The self-centred man has lost his real self, and this is true not only for an individual, but also for a nation or kingdom. In an objective world, this seems to be a paradox, but it is a fundamental truth. The great creed of love underlying every religion has been brought to perfection in Buddhism, and

where bigotry has been followed by blood-shed in most other religions. Buddhism is perhaps the only religion which draws into its fold by the magnatic-force of Love alone.

As in the physical evolution of the animal world man is the outcome of perfection, so in the evolution of the soul it may not be futile to hope that man will in course of time become god-like in nature. This the author has portrayed most convincingly and realistically.

This play is an illustration of the eternal truths in the guise of a story of the demoralized ancient India. With all its Mid-summer Night's dream-like allegory the play in no wise lacks the human interest, with which the author's consummate skill has succeded in investigating it. Whether taken as an allegory or as plain drama, it will yield the reader equal pleasure and profit.

A Buddhist Bhikkhu
(An Englishman).

সর্বশেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রকের নাম হিসেবে আছে :

Printed by A.K. Sitarama Shastri, at the Vasanta Press, Adyar, Madras.

8. ***Shorts Stories.*** By Mrs. Ghosal (Srimati Svarna Kumari Devi). Author of the 'Fatal Garland', 'An Unfinished Song', Etc. Price Rs. 2. Ganesh & Co. Madras. P. iii, 242.
[Contents : Preface, The Sorrows of a Life, The Lost Key, Immortelles from a Daring Hand, Lajjavati or (The Sensitive Plant), The New Bangles, The Reason Why? A Strange Tale, The Gift of the Goddess Kali, The Sannayasini, The Rajput Prince and his Steed, The Oath of Kumar Bhim Singh (A Tale from Indian History), The Genius of the Place, Only a Chapter, Talisman, Mutiny]. Illustrated.

Dedication
To the Brave

Soldier and hero. O my Countryman!
In admiration of thee stands the world,
And I, though little, become great in thee,
My brother, and in thy proud state, forget
Myself the sorrows of my servitude.

Even as stars of burning beauty seem
Merely to shoot and in the ethereal vast
To loose themselves, and none perceives the heat
Of dreadful fire intense that in their being.

Through every particle and atom breathes :
Even so thy sacrifice, but more splendid still
This death espoused, not for thyself, nor even
For Country, but for duty's sake slone :

Thy selfless death-pyre, holy warrior!
So long as bursts not yet the flood of doom,
And sun and moon within their orbits run,
Over her vesture thy great deeds shall earth
Blazen, thy glory's hymn proudly proclaim.

How shall we praise when speech to praise
thee fails?
Thee, hope of Gods in this tremendous war!
I know not with what offering, I shall greet
Thee, in whose name, O hero, thy own land
Glories, and foreign lands feel blest indeed.

Preface

All the stories in this volume were written some time ago in Bengali and first came out in the pages of my magazine the 'Bharati'.

Human nature in its primary constituents, is, I think, essentially much the same all the world over. Yet it assumes vastly different guises under the varying influences of culture, habit, manners, and customs, which mould the individual no less than the national character. Hence it is possible for certain ideals, nay, even the entire civilisation of one nation to remain unappreciated by another, more especially if a superficial glance is all that is bestowed upon it.

The people of the West have very little real opportunity of getting to know us Indians, particularly Hindus, in our true "inwardness". Our domestic and social life generally is to all intents and purposes, a sealed book to them. Our customs do not permit of foreigners entering within the inner circle of our life; and even if these were not so, even if they were admitted within the pale they would only with very great difficulty find it possible to identify themselves with us, for the Hindu is born, not made.

In a sense the civilisations of the East and the West are directly opposed to each other. One tends towards materialism : the other aims at the cultivation of the spiritual life. Hence certain traits are to be found in the Hindu nature that are distinctly different from those developed by Western people. In all his actions be they good or evil, the Hindu instinctively relies upon a Higher Power. His fundamental goodness and sense of justice, and also his ardent faith, sometimes endow him with wonderful power in this direction. The story, 'The Gift of the Goddess Kali', is intended to portray an instance of this.

Again, a Hindu woman is a complete mystery to the foreigner, is she not? Her nature, like her person, is always a veiled wonder to him. Yet those who know her can realise how sweet and noble she is. Her timidity only enhances her simple grace, like that of the gentle gazelle. Her modesty and simplicity, her intense devotion to her husband and his people, her self-

effacement and self-sacrifice, and her constant reliance on a Higher Power,—all these rare virtues, as found in her, are too genuine to be imitated by women of other nations. Of course there are exceptions, but they only serve to prove the general rule.

If in presenting these few sketches of different phases of Indian life, I succeed in making my Western reader understand, were it only a little of the life that pulsates in the quiet East, and enable him to enter in some small measure into the true spirit of our national character, then I shall deem myself fortunate and feel richly rewarded.

Most of these translated stories have already appeared in various English magazines in India, and it is an agreeable surprise to me to find that yet another has lately been published in the pages of 'Verden Og Vi', a magazine of the far West.

To conclude : I offer through the medium of this book my sincere thanks to my friends, Miss A.C. Albers and brother Silacara (the latter an Englishman by birth and Buddhist Bhikshu by religion) who have kindly taken the trouble to revise it carefully; and I also heartily thank the literary public of the West, whose appreciation of my other two books—"An Unfinished Song" and "The Fatal Garland"—has given me sufficient encouragement and stimulus to continue my literary efforts in this direction.

The Author

Printed at The Cambridge Press, Madras.

পরিশিষ্ট ১

Srimati Swarnakumari Devi

The death of Srimati Swarnakumari Devi, an elder sister of the Poet Rabindranath Tagore, at the age of 76, removes from our midst of oldest Bengali authoress. who was in her generation and of her sex the formost Bengali novelist. dramatist, poet, essayist, writer of songs, and writer of popular scientific and other school books. English translations of two of her novels have appeared under the names of "The Fatal Garland" (originally published in this *Review*) and "The Unfinished Song". A collection of English translations of her short stories has also appeared. A German translation of one of her plays has been published under the name of "Kalyani".

She edited the now-defunct famous Bengali monthly *Bharati* with ability for years. She was the first among our ladies to edit a monthly. The Calcutta University honoured her by conferring on her the Jagatarini Medal in 1926. She was the elected president of the 29th session of the Bengali Literary Conference. She was the first lady to act as its president. More than half a century ago she set the example of not observing purdah. It required great courage in those days. The women of Bengal are now enjoying the benefits of her and her colleagues and successors' courage and of the obloquy which fell to their lot. She founded the Sakhi Samiti in 1886. It was a Ladies Association of which the objects were :

(1) To promote friendly intercourse among Indian ladies and foster in them the growth of an active and enlightened interest in the welfare of the country.

(2) To provide a home for and educate poor Hindu girls, so as to enable them to become useful members of society.

(3) To secure for them employment when fit for it and to help in the spread of female education by sending them out as *Zenana* Teachers.

An annual *Mela* or Fair used to be held under its auspices. It was conducted by its members alone and was open only to women, who were regaled with music and theatrical performances.

At the sixth session of the Indian National Congress, held in Calcutta in 1890, she was one of the two Bengali lady delegates. She was president of the Ladies' section of the Theosophical Society of Bengal in 1885-86.

The Modern Review, August 1932.

পরলোকে স্বর্ণকুমারী দেবী

অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া যাঁহার বীণাধ্বনি দেবী ভারতীর পূজা-প্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল, যাঁহার নৈবেদ্য-সম্ভারে মন্দিরতল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, পদ্মাসনা অমলার সেই অশেষস্নেহাস্পদা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী কবির বর্ণিত আষাঢ়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন—স্বর্ণময় ঘৃত-প্রদীপ মন্দিরতলে আর আলোক দান করিবে না। বঙ্গ-সাহিত্যে

কবিবর রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর দান অসামান্য এবং বিচিত্র। বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কলিকাতা ঠাকুর-পরিবারের দান অক্ষয় হইয়া থাকিবে। স্বর্ণকুমারীর পূর্ব্বে কোনও বঙ্গ-মহিলা সাময়িক পত্রের সম্পাদনভারের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। "ভারতী ও বালক", "ভারতী" স্বর্ণকুমারীর নামের স্পর্শে ধন্য হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র জীবনব্যাপী সাধন-ফলে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে যে রস পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা যে কোনও দেশের মহিলা রচয়িত্রীর পক্ষে গৌরব জনক। "দীপ-নির্ব্বাণ", "ছিন্নমুকুল", "মিলন-রাত্রি", "কাহাকে", "স্নেহলতা" প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গালা-সাহিত্যে গৌরবময় আসন গ্রহণ করিয়াছে, ইহা রসিক পাঠক সমাজ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান যুগে যৌনতত্ত্ববিশারদ যে সকল সাহিত্যিক প্রতীচ্যের পচামাল আমদানী করিয়া দেবী ভারতীর তপোবনকে কলুষিত করিতেছেন, স্বর্ণকুমারী কোনও দিন তাহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থে অসম্ভব, অবাস্তব, অসামাজিক কোনও চরিত্রের সমাবেশ নাই। বাঙ্গালীর উচ্চাদর্শ হইতে স্বর্ণকুমারী কখনও ভ্রষ্টা হইয়া কোনও উপন্যাস রচনা করেন নাই। রাজপুত-কাহিনী লইয়া যে সকল উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়া নারী ও ক্ষত্রবীরগণের চরিত্রের বিন্দুমাত্র খর্ব্বতা-সাধনের অবকাশ দেন নাই। "দীপনির্ব্বাণে" যে বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুর আদর্শ বীরত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেশাত্মবোধে স্বর্ণকুমারী উজ্জীবিতা হইয়া "মিলনরাত্রি" রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী কোনও দিন শ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। দেবী ভারতীর বীণাগুঞ্জন সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরকে কাব্যরসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত। অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকাই যে যুগে দূষণীয় ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত না, সেই যুগে প্রচুর অর্থসম্পদ এবং ভোগবিলাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াও নিষ্ঠাভরে ভাষা-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে কি? স্বর্ণকুমারীর জীবন-ব্যাপী সাহিত্য-প্রচেষ্টা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠে স্বর্ণকুমারীর বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সারা জীবনব্যাপী সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে তিমি বাঙ্গালী জাতিকে ভাবিবার বহু উপাদান দিয়া গিয়াছেন। বার্দ্ধক্যে পীড়িত হইয়াও তাঁহার লেখনী বিশ্রাম করিতে পায় নাই। তাঁহার শেষ রচনা "সাহিত্য-স্রোত" পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বাঙ্গালী, বহু গুণী ও সাহিত্যসেবীর জন্য উৎসব করিয়াছে, কিন্তু ৭৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহার অকুণ্ঠ সাহিত্য-সেবার জন্য কোনও জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান বাঙ্গালী করে নাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী জাতির এই বিস্মৃতি শোভন হয় নাই। কিন্তু এখন তিনি সকল প্রকার স্তুতি-পূজার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি বাঙ্গালীর পক্ষে একটা কর্ত্তব্য আছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি বাঙ্গালীর সেই কর্ত্তব্য পালনের এখনও অবকাশ আছে। পরিণত বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, সে জন্য শোক-প্রকাশের অবকাশ থাকিতে পারে না; কিন্তু তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অংশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার বিয়োগে সে অংশ শূন্য হইয়া গেল। আর কেহ সে স্থান পূর্ণ করিতে পারিবে কি?

মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩৯

স্বর্ণকুমারী দেবী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতমা কন্যা, কবি রবীন্দ্রনাথের অন্যতমা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বহুগ্রন্থের লেখিকা এবং নারীদের কল্যাণ বিধায়ক নানা কার্য্যের অনুষ্ঠাত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী জীবনের ৭৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য বিষয়িণী প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা ও গান, বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক, প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গে বোধ হয় তিনিই প্রথমে ভূতত্ত্ববিষয়ক, "পৃথিবী" নামক, গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুস্তকাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা সম্মুখে নাই—হয়ত কোন কোন নাম বাদ পড়িবে। সম্ভবতঃ অধিকাংশের নাম নীচের তালিকায় পাওয়া যাইবে।

উপন্যাস—দীপনির্ব্বাণ, স্নেহলতা, ছিন্নমুকুল, ফুলের মালা, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, মেবার-রাজ, কাহাকে?, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলন-রাত্রি। ছোট গল্পের বহি—নবকাহিনী, মালতী ও অন্যান্য গল্প। নাটক—রাজকন্যা, দিব্যকমল, ক'নে বদল, পাকচক্র, কৌতুকনাট্য, দেব-কৌতুক। কবিতা ও গানের বহি—কবিতা ও গান, বসন্ত-উৎসব, গাথা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক পুস্তক—পৃথিবী। বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক—বর্ণবোধ, ব্যাকরণ, গল্পস্বল্প, বাল্যবিনোদ, কীর্ত্তিকলাপ, সাহিত্যস্রোত।

তাঁহার "ফুলের মালা" ও "কাহাকে"? উপন্যাস দুটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। "ফুলের মালা"র অনুবাদ "ফেটাল গার্ল্যাণ্ড" নাম দিয়া প্রথমে মডার্ন রিভিউ কাগজে বাহির হয়। "কাহাকে?" উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের নাম "দি আনফিনিষ্ট সং"। মান্দ্রাজের গণেশ কোম্পানী তাঁহার কয়েকটি ছোটগল্পের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। "কল্যাণী" নাম দিয়া তাঁহার "দিব্য কমল" নাটকের একটি জার্ম্যান অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি ১৮৮৪ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত এবং পরে আবার ১৯০৬ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত "ভারতী" পত্রিকা সম্পাদন করেন। বঙ্গে মহিলাদের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনের কাজ তিনিই প্রথমে করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম তাঁহাকেই ১৯২৬ সালে জগৎতারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ২৯শ অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কার্য্যও মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে করিয়াছেন।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে তিনি স্বীয় আচরণ দ্বারা অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ও অন্য ব্রাহ্ম মহিলাদের এই চেষ্টার সুফল এখন বাঙালী সমাজ ভোগ করিতেছেন, বিদ্রূপ ও মিথ্যা নিন্দা তাঁহারা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। নারীদের কল্যাণার্থ ১৮৮৬ সালে "সখি সমিতি" স্থাপন করেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে বন্ধুভাবে মিলামিশায় উৎসাহপ্রদান, তাঁহাদের মনে দেশের কল্যাণচিন্তা ও হিতৈষণার উদ্রেক, দরিদ্র হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি নিকেতন স্থাপন করিয়া তাহাতে তাহাদিগকে শিক্ষাদান ও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল ও সমাজসেবায় সমর্থ করা, তাহারা যোগ্যতা লাভ করিলে তাহাদের কাজ জুটাইয়া দেওয়া ও তাহাদিগকে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া নারীশিক্ষার বিস্তার সাধন, এবং ভারতীয় কলা ও পণ্যশিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা, এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির

শুভপ্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় আগে আগে প্রতি বৎসর মহিলা-শিল্পমেলার অনুষ্ঠান হইত। ইহা সম্পূর্ণরূপে মহিলারা চালাইতেন, কেবল মহিলাদেরই ইহাতে প্রবেশের অধিকার ছিল। সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করা হইত।

স্বর্ণকুমারী দেবী কিছুকাল বঙ্গীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী ছিলেন। ১৮৯০ সালে ফিরোজশাহ্ মেহতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

তাঁর শেষ গ্রন্থ সাহিত্যস্রোতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক মনোনীত হইয়াছে। শেষ পীড়ার সময় তিনি উহার দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯

শোক-সংবাদ
পরলোকে স্বর্ণকুমারী দেবী

সত্যসত্যই বাঙ্গালা-সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল—পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী আর ইহজগতে নাই। বিগত ১৯শে আষাঢ় রবিবার পূর্ব্বাহ্নে তিনি তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। আমরা আয়োজন করিতেছিলাম, আগামী ১৪ই ভাদ্র তিনি সাতাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ করিলে, আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিব, বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিব ; হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল পাঁচদিনের ইনফ্লুয়েঞ্জাতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিলেও আমরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

১২৬৪ সাল (ইং ১৮৫৭) ১৪ই ভাদ্র স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। ইনি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস-রচয়িত্রী এবং সর্ব্বপ্রথম পত্রিকা-সম্পাদিকা। স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তন করেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। ১২৯১ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত (মধ্যে চার পাঁচ বৎসর বাদ) যেরূপ যোগ্যতার সহিত তিনি "ভারতী"র সম্পাদনা করেন, বাঙ্গলা পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাহা আজিও আদর্শ হইয়া আছে।

নারীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি অগ্রণী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র মিলন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও বিধবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বিধবাদের সাহায্য প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া ১২৯৩ সালে তিনি তাঁহার পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সহযোগে "সখি সমিতি" নামে এক মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন। মহিলা সমাজের মধ্যে শিল্পোন্নতিকল্পে "মহিলা শিল্পমেলা" নামে এক মেলাও তাঁহার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে প্রথম উপন্যাস—দীপনির্ব্বাণ, হুগলীর ইমামবাড়ী, ছিন্নমুকুল, স্নেহলতা, বিদ্রোহ, কাহাকে, মেবার রাজ, ফুলের মালা, নবকাহিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার

অপরিমেয় দানের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে 'জগত্তারিণী স্মৃতি পদক' প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ভবানীপুরের অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর পদে বৃত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার যে পরিবার শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও শিল্পকলায় বাঙ্গলাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তিনি ছিলেন সেই বিখ্যাত ঠাকুর বংশের সার্থক-জন্মা মহিলা। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী পরলোকগতা হইয়াছেন ; এখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল ও কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী জীবিত আছেন।

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৯

স্বর্ণকুমারী

শ্রী প্রভাতকিরণ বসু বি-এ

যেদিন শুধু পুরুষদলে বাণীর পূজার তরে
গাঁথিতে মালা তুলিত ফুল, আনিত সাজি ভ'রে,
জ্বালিত দীপ, জ্বালিত ধূপ, সাজাত থালি যত,
রমণীহীন দেউলতলে থাকিত ধ্যান-রত ;
সেদিন তুমি একেলা এলে আপনি রাণী হ'য়ে,
তোমার কাজ করিতে সারা বাণীর দেবালয়ে ;
সেদিন তুমি প্রথম নারী আসিলে পথ চিনি,
পূজার ঘরে কাঁকন তব বাজিল রিনিঝিনি!
দেখিল সবে চেয়ে,
মায়ের কাজে বাহিরে এল, মায়েরি কোনো মেয়ে!

সেদিন পথে অনেক বাধা, অনেক কটুকথা,
অনেক হাসি, কুটিল চোখে অনেক মলিনতা,
সকলি তুমি করেছ হেলা, সয়েছ অনায়াসে ;
সরম-ভরে শরণ তুমি লহনি গৃহপাশে।
শঙ্কাহীন মানস লয়ে সকল বাধা ঠেলি
মানুষ যারা, তাদেরি সনে দাঁড়ালে বাহু মেলি ;
লভিলে তুমি আসন তব, হেরিলে নব রবি,
বরিলে তুমি সেবার ব্রত প্রথম নারী কবি!
পরিলে জয়টীকা,
সকল দিকে উঠিল বাণী—স্বাগত সাহসিকা!

এখন দেখি সেবিকা বহু বাণীর পীঠতলে,
জয়ের ধ্বনি তাঁদেরো শুনি বিপুল কোলাহলে।

সহজ আজি হয়েছে পথ, সরল আজি গতি,—
করেছ তুমি একা এ কাজ, দেখনি ক্ষয় ক্ষতি!
কিশোরকালে যে ব্রত তুমি নিয়েছ শিরে বহি,
পালন তাই করেছ দেখি যখন পিতামহী!
আরতি তব 'ভারতী' হাতে সে কথা মোরা স্মরি,
ভাবিয়াছিনু প্রাচীন জনে নূতনতম করি!
ভাবিয়াছিনু মনে,
রহিতে নাহি দিব গো আর তোমারে নিরজনে!

চলিল দূত সকল দিকে বহিয়া সেই বাণী,—
তোমারি প্রীতি লভিতে হবে, তোমারে কাছে আনি,
মিলিত-গানে জানাতে হবে, তোমারে ভালোবাসি,
মধুর তব রচনা,—মোরা তাহারি অভিলাষী,
তোমারে জানি, তোমারে মানি,—এ কথাটুকু ব'লে
তোমারি জয় গাহিতে চাহি অসীম কলরোলে!—
সে আয়োজনই চলিতেছিল,—সহসা কেবা জানে
ধরণীতল ছাড়িয়া গেলে সে কোন অভিমানে!
চাহ না পূজা তুমি,
আপন পূজা করিলে শেষে জননীপদ চুমি!

জীবনে তব বেদনা বহু, নয়নে বহু বারি,
মরমে তব কত না ব্যথা, কে খোঁজ পেল তারি?
বিলালে সুধা সেটুকু লহি, দেখি না কেহ ফিরে,
পারের পানে চাহিয়া তুমি দাঁড়ায়েছিলে তীরে!
সকল সাথী চলিয়া গেছে, আপন যারা ছিল,
বন্ধু যত স্বজন যত সকলি মিলাইল ;—
খ্যাতির নেশা এমন দিনে কভু কি জাগে চোখে?
যেমনি ডাক শুনিলে তুমি, মিলালে দূরলোকে!
দীর্ঘকাল ধরি
যে গীতিগান গুঞ্জরিলে, উঠিল মরমরি।

আসিবে যাবে সেবিকা বহু মাতার দেউলে ত',
আসন তব শূন্য রবে ভরিবে না গো সে ত'!
তোমার কথা সবার আগে ধ্বনিবে বহু মনে,
আপনি জল উঠিবে জমি' সকল আঁখি কোণে!
সোনার রেখা আঁকিয়া গেলে, মুছিয়া যাবে যবে
সেদিন দেশ ভরিবে জানি গভীর হাহারবে!

মুছিবে না সে, মুছিবে না সে, মুছিতে নাহি পারে,
ঝলিবে নব-যাত্রীদলে পন্থা বলিবারে ;
প্রথম পূজারিণী,
বলিবে সবে—তোমারে চিনি তোমারে মোরা চিনি।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৯

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্মান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বৎসরের 'জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক' বঙ্গের বীণাপাণি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে প্রদান করিয়াছেন জানিয়া এই যোগ্যতমার সম্মানে আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। বঙ্গ-সাহিত্যসেবা-গৌরবে যিনি যে বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনোনীত হন—তাঁহার সম্মানের জন্য বাঙ্গালার গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীর পুণ্যনামে এই 'জগত্তারিণী পদক' উপহার দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বর্ষে কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় বর্ষে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় বর্ষে রসরাজ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে সম্মান দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এই পদক প্রদান করিয়াছেন। এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় যশস্বিনী প্রতিভাময়ী সুলেখিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে এই পদক প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্য কবিরাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর দানে সমৃদ্ধ। তিনিই বোধ হয় প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক—কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সদস্য—বাঙ্গালায়, তথা ভারতে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের মূলে তাঁহার আদর্শ শিক্ষার নির্দ্দেশ সমাহিত। এজন্য আমরা আশা করি, প্রবীণ বয়সে তাঁহার এই সম্মানে তাঁহার উপন্যাস-নাট্য-কাব্যের অনুরাগী সৎসাহিত্যপ্রিয় সম্প্রদায় আমাদেরই মত পরম আনন্দ লাভ করিবেন।

মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩৪

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

অদ্যকার এই সভা স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর পরলোক গমনে শোক প্রকাশের জন্য। সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের পত্রখানি হাতে লইয়া একবার মনে হইয়াছিল, স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্বন্ধে 'শোক' শব্দটা ব্যবহার করা হয়তো সঙ্গত হইল না। তিনি উপযুক্ত বয়সে বাঞ্ছনীয় উন্নততর লোকে নব জন্ম লাভ করিয়াছেন। বিধাতা তাঁহাকে যে জীবনখানি দিয়াছিলেন, সে জীবনখানি পৃথিবীতে দীর্ঘকাল জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যে বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহারি সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, অবশেষে তাঁহারি কাছে ফিরিয়া গিয়াছে। যে শক্তি ও সদ্‌গুণের বীজ অন্তরে লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন, আলস্যে, ব্যসনে, ভয়ে বা অবসাদে তাহা ব্যর্থ হয়

নাই। তাঁহাকে দেশমাতা যে এতকাল কোলে রাখিয়াছিলেন, বঙ্গের বহু নারী যে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছেন এবং সম্মুখে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাখিয়া যে তাঁহার পদানুসরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, ইহার জন্য আজ বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা দিতে এবং সমস্ত হৃদয়ের সহিত এই বাণীর পূজারিণীকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে আমরা সমবেত। তথাপি একথা সত্য যে, আমরা যাঁহাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, যাঁহাকে লইয়া গৌরব বোধ করি, যত বয়সেই হউক তাঁহার অন্তর্দ্ধান আমাদের ব্যথিত না করিয়া পারে না। সেই জন্যই ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে স্বর্ণকুমারী দেবীর দেহাবসান হইলেও তাঁহার বিচ্ছেদে আমরা ব্যথিত এবং বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত। সান্ত্বনা এই যে, সাধারণ জনের মৃত্যুর মতো বিশিষ্টজনের মৃত্যু একেবারে 'গত হওয়া' নহে। যিনি যে পরিমাণে সমকালীন ও পরবর্ত্তী মানুষদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অধিকার করিতে পারেন, অথবা নিজের ও অপরের অলক্ষিতেও যিনি আপন জীবন দ্বারা অপরের জীবন প্রভাবিত ও উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে মৃত্যুকে জয় করিয়া অ-মৃত বা নিত্য-জীবিত। এদেশে একটি সত্য বচন সকলেই আবৃত্তি করেন—"কীর্ত্তির্যস্য ম জীবতি", যাঁর কীর্ত্তি আছে তিনি বাঁচিয়া থাকেন! কিন্তু এর চেয়ে বড় সত্য বোধ হয় এই যে, কৃতী যিনি তিনি বাঁচিয়া থাকেন, তিনি চির-জীবিত। কালে কালে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিকথা মানুষ ভুলিয়া যায়, কবিযশঃ সাহিত্যিক গৌরব কাল ভেদে, রুচিভেদে, ক্ষীণ হয়, কিন্তু জীবনের দৃষ্টান্ত, মনের বল, চির প্রচলিত প্রথা ও জন্মগত সংস্কারকে ভ্রান্ত জানিয়া তাহার বর্জ্জন ও শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন, কর্ম্ম দ্বারা আদর্শকে মূর্ত্তি প্রদান—ইহার প্রভাব অপর জীবনে নীরবে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া অক্ষয় থাকে। ইহাই কৃতিত্ব। এই কৃতিত্ব স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যে ছিল। তাঁহার কৃতকর্ম্ম ও তাঁহার আজীবন সাধনার দ্বারা তিনি পুরাতন ধারণা পরিবর্ত্তিত করিয়া, বহু নারী পুরুষের আচরণ ও আদর্শ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহার সৎসাহস, তাঁহার সাহিত্যসেবা এবং তাঁহার নারীহিত-প্রচেষ্টা যে পরিমাণে বঙ্গের অন্যান্য নারীর জীবনকে সাহিত্যপথে ও সাবলম্বনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহাদের ভিতরে অলক্ষিতভাবে তিনি এবং তাঁহার সমসাময়িক কতিপয় উদারচেতা নারী পুরুষ জীবিত আছেন এবং পুরুষ পরম্পরায় সাধনার বিস্তারের মধ্যে ভবিষ্যতেও থাকিবেন।

এতকাল নারীর সকল শক্তি আবদ্ধ ছিল গৃহকর্ম্মের মধ্যে। পরিবারের বাহিরে তাহার চিন্তা কথা ও কর্ম্ম বাহির হইবার তেমন পথ পায় নাই। যখন উহাদের গতির প্রসার বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বাড়িয়া চলিল। যে সুদূর-সঞ্চরণশীলা লতা-বিস্তৃত ক্ষেত্রের শোভা সম্পাদন করিতে পারিত, সে পথ না পাইয়া একটি ক্ষুদ্র যষ্টি অবলম্বন করিয়া কিয়দ্দূর উঠিয়া বার বার আপনাকে জড়াইয়া জড়াইয়া স্ফীত আকার ধারণ করিয়াছিল, আজ যেন বিস্তৃত বিচরণ স্থান লাভে চারিদিকে শাখা প্রশাখা বাড়াইয়া, পল্লব পুষ্পে বিভূষিত হইয়া জন্ম সার্থক করিল। যে কেবল একটি প্রদীপের মত নিজ বাসভবন আলোকিত করিতেছে, সে যে চন্দ্র তারকার মত সুদূরে আপনার আলোকমালা প্রেরণ করিতে পারে একথা পূর্ব্বে স্বীকৃত হয় নাই। নারী ছিল উপদেশের পাত্রী, উপদেশ দাত্রী নহে, শ্রোত্রী, বক্ত্রী নহে; পূজাকারিণী, পৌরহিত্যে তাহার অধিকার ছিল না; যদি সুদূর অতীতে থাকিয়া থাকে, মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। এই অধিকারের দাবী কেবল একজনের দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই, দুই একদিনেই ইহা স্বীকৃতও হয় নাই; কেবল স্বদেশী ভাব ও স্বদেশের চেষ্টায়ও ইহা সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গনারীর শিক্ষা ও অধিকার বিস্তারের বিস্তৃত ইতিহাস দিবার সময় আজ নহে। কেবল এই

কথাই আজ স্মরণীয়, যে, এই অধিকারের স্পষ্ট উচ্চারিত দাবী লইয়া নহে, যুদ্ধার্থীর মত সশস্ত্র হইয়া নহে, কিন্তু নীরবে, কতকটা আপনার অজ্ঞাতসারে, পারিবারিক শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গূঢ় প্রভাবে, স্বর্ণকুমারী যখন বঙ্গনারীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসীমার বাহিরে পা বাড়াইলেন, তখন এই দাবী অনেকেই স্বীকার না করিয়া পারিলেন না।

বাঙ্গলা ১২৬৪ সালের ১১ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৫৬ সনের ২৮ আগষ্ট, স্বর্ণকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্য-বিধাতা তাঁহাকে সকল দিক দিয়া সৌভাগ্যবতী করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে অতি অল্প নারীর ভাগ্য তাঁহার সহিত তুলিত হইতে পারে। তাঁহার জনক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই মহর্ষি আখ্যার পর তাঁহার আর বর্ণনা অনাবশ্যক। দার্শনিক প্রবর, হাস্য-কৌতুক প্রিয়, আনন্দ সরস প্রাণ দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান উদার-চরিত, সমাজ-সংস্কার ব্রতী নারী-হিতৈষী সত্যেন্দ্রনাথ, সৎসাহসী, দৃঢ়চেতা, শিল্পানুরাগী হেমেন্দ্রনাথ, বহুভাষাবিদ্ নাট্যকার ও নানা গ্রন্থের অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ, এবং বিশ্ববরেণ্য কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুজ। বহু রত্নের আকরের মধ্যে স্বর্ণকুমারী যে আর একটি রত্নরূপে প্রকাশিত হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এই রত্ন লোক-চক্ষুর অগোচরেই থাকিত, যদি না ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ পরিবারস্থ নারীগণের অবরোধ-মোচনে ব্রতী হইতেন। মহর্ষিদেবের গৃহে কন্যা ও বধূরা কিছু শিক্ষা পাইলেও তাঁহারা পর্দ্দানশীনই ছিলেন। বাহিরে চলাফেরা, দেশ-ভ্রমণ ও ভিন্ন রীতিনীতি দর্শন, বহু সুধীজনের সহিত আলাপ-পরিচয়াদি দ্বারা যে শিক্ষা লাভ হয় তাহা এ পর্য্যন্ত তাঁহারা পান নাই। এই শিক্ষা লাভের সূচনা হইয়াছিল বোম্বাই গিয়া সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে। তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে শিশু কন্যাকে লইয়া তিনি বৎসর কাল সত্যেন্দ্রনাথের নিকট অবস্থান কালে ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া শিখিবার সুযোগও পাইযাছিলেন। কেবল পিতৃভাগ্য ও ভ্রাতৃ-ভাগ্যই নহে, তাঁহার স্বামীভাগ্য ও সন্তানভাগ্যও নারী সাধারণের দুর্ল্লভ। দশ কি একাদশবর্ষে জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বর্ণকুমারী নানা উপলক্ষে নানা স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইঁহাকে স্বামীরূপে না পাইলে তাঁহার জীবন-বিকাশের পথ সহজ হইত না। স্বামীর স্নেহ, সহানুভূতি, উৎসাহ ও আশ্বাসবাণীই ছিল তাঁহার সাহিত্য-সাধন ও সকল কর্ম্ম প্রচেষ্টার সহায়। একমাত্র পুত্রকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল ; এবং কন্যাদ্বয় তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ও নারীহিত-প্রচেষ্টায় তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে সুখী করিয়াছেন। তাঁহার এই সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া আজ আমরা আনন্দিত হই এবং বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা দিই। কত প্রতিভাপূর্ণ নারীজীবন স্নেহ ও সহানুভূতির অভাবে শুষ্ক ও নিষ্ফল হইয়া যায়।

বঙ্গের নারীগণের মধ্যে সাহিত্য সাধনায় তিনি অগ্রবর্ত্তিণী ও পথপ্রদর্শিকা। কিন্তু আমি আমার দশম বর্ষে প্রথম যখন তাঁহার দর্শন পাই, তখনও তিনি সে খ্যাতি লাভ করেন নাই। তখন তাঁহার সৌন্দর্য্যই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি কেবল কয়েক মাস পূর্ব্বে মিস্ এক্রয়েড (Miss Akroyd) প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছি। এই বিদ্যালয়টি ছিল হিন্দু যুবতী ও বালিকাদের জন্য সর্ব্বপ্রথম বোর্ডিং স্কুল। হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় নাম হইলেও কোন গোঁড়া হিন্দু পরিবারের কন্যা বা বধূ এখানে শিক্ষা পাইতে আসেন নাই। আসিয়াছিলেন কয়েকটি ব্রাহ্ম বধূ ও ব্রাহ্ম পরিবারের বালিকা, আর কয়েকটি হিন্দু সমাজ হইতে পলায়মানা, ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রিতা বাল্য-বিধবা। দুই একটি ভিন্ন প্রায় সকল ছাত্রীই ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের। বধূদিগের স্বামীরা তখন শিক্ষার্থ বিলাতে বাস করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিজ পত্নীকে সুশিক্ষিত হইবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছিলেন।

ইঁহাদের পত্নীরাও স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বঙ্গের নারী-শিক্ষার ইতিহাসের এক অধ্যায়রূপে ইঁহাদের বৃত্তান্ত স্মরণীয়।

যেদিন প্রথম স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখিলাম, সেদিন মিস্ এক্রয়েড মহিলাদের জন্য একটি সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সমাগত মহিলাদের মধ্যে স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দুই কন্যা মালতীমালা ও মতিমালা এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর উপস্থিতির কথা আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত আছে। শৈশবে শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার নামটা পরিচিত ছিল। তিনি যে নারী শিক্ষার প্রথম যুগে বেথুন স্কুলে কন্যাদিগকে পড়িতে দিয়া 'এক ঘরে' হইয়াছিলেন সে কথা তখনও জানা ছিল না।

স্বর্ণকুমারী দেবীকে তাঁহার স্বামী পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। মেয়েদের মধ্যে জিজ্ঞাসা চলিল—ইনি কে? ইনি কে?—শুনিলাম ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী, মিসেস্ ঘোষাল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মিস্ এক্রয়েড হয়তো বিলাতেই চিনিতেন। স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে চুপি চুপি যে কথা হইতেছিল, তাহা হইতে জানিলাম, তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর, ইতিমধ্যেই তিনি চারিটি সন্তানের জননী ; আর বেশী কিছু শুনিলাম না। সেই সুগঠিত কৃশ দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আয়ত ঘন কৃষ্ণ চক্ষু, সুন্দর ললাটে বলয়িত চূর্ণ কুন্তল দীর্ঘকেশ সূচিতা কবরী, আর পরিধানের প্রশস্ত সাদা পাড় যুক্ত কালোরং-এর বোম্বাই শাড়ী, কণ্ঠে মুক্তামালা, কর্ণে মুক্তা-গ্রথিত বড় বড় মাকড়ি—এ সমস্ত এখনও স্মৃতিতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। তখন সরস্বতীর নহে, লক্ষ্মীর প্রতিমারূপে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে নব প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয়ে যখন আবার পড়িতে আসিয়াছি, তখন একবার স্বর্ণকুমারী দেবী পতি ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তখনও অভ্যাগতাদের সৌন্দর্য্য ও সাজসজ্জার সমালোচনাই সহপাঠিনীদের সহিত করিয়াছি। তবে কয়েক দিন পরে, কৌতূহল বশতঃ পরিদর্শকদের মন্তব্য লিখিবার বহিতে স্বর্ণকুমারী দেবীর মন্তব্য পড়িয়াছিলাম। সুকুমার সাহিত্যের সহিত বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এই কথা তিনি জানাইয়াছিলেন। 'সুকুমার সাহিত্য' কথাটা তখন নূতন ঠেকিয়াছিল। ইহারই কিছুদিন পরে অথবা পূর্ব্বে ১৮৭৭ সনে 'দীপ-নির্ব্বাণ' প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি সম্পূর্ণতঃ স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা অথবা ভ্রাতার সাহায্যে লিখিত এই লইয়া বাদানুবাদ শুনিয়াছিলাম। সন্দেহ অমূলক হইলেও এই সন্দেহই গ্রন্থখানির উৎকর্ষের প্রমাণ। সে কালের লোকের মনে হইয়াছিল—এত ভাল লেখা, এ কি নারীর পক্ষে সম্ভব? নিশ্চয়ই ইহাতে পুরুষের হাত আছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় উদ্যম, 'বসন্ত উৎসব', রচনাকাল ১৮৮০। হিরণ্ময়ীর নিমন্ত্রণে বেথুন স্কুল হইতে এই গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখিতে আমরা ঠাকুরবাড়ী গিয়াছিলাম। স্বর্ণকুমারী যোগিনী সাজিয়াছিলেন। অন্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথের পত্নী, ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীর (বলেন্দ্রনাথের মাতা) কণ্ঠ বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী, সরলা ও ঊর্ম্মিলা আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। একদিন বিকালে স্বর্ণকুমারী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী আমাদের সহিত Badminton খেলিতে গিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাদের সহিত আমার খেলা করিবার সৌভাগ্যও হইয়াছিল।

বসন্ত-উৎসবের পর 'মালতী' নামে একটি ছোট করুণ গল্প, ছিন্নমুকুল উপন্যাস এবং গাথা নামে কবিতায় গল্প। গাথা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সনে। এখানি সে বয়সে আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। ইহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন ছোট ভাইটিকে। অর্দ্ধশতাব্দী পরেও উৎসর্গের কথাগুলি বোধ হয় ঠিকই মনে আছে :

যতনের গাথা হার, কাহারে পরাব আর
স্নেহের রবিটি তোরে আয়রে পরাই,
যেনরে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়া ফেলনা খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই তাইতে ডরাই।

এই দুরন্ত ছোট ভাইটি তখনও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার ছোটই ছিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে, এই স্নেহের ভাইটি হইবেন বঙ্গ-সাহিত্য জগতের একচ্ছত্র সম্রাট এবং সর্ব্ব দেশপূজ্য কবি। দুই ভাই বোনে এই সময় হইতে ভারতীর পৃষ্ঠায় অনেক ছোট ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন।

দেখিতে পাই স্বর্ণকুমারী তাঁহার প্রত্যেক পুস্তক কোন না কোন প্রিয়জনকে উৎসর্গ করিতেন। উহা কবিতায় লিখিত হইত। পিতা; অগ্রজ, অনুজ, সখী, পতি, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও অন্য আত্মীয়, সকলকেই বীণাপাণির পূজার নির্ম্মাল্য দান করিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছেন। এই বান্ধব-প্রীতি বড়ই সুন্দর মনে হয়।

১৮৮৩ সনে 'পৃথিবী' প্রকাশিত হইল। ইহা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইলেও ইহাদ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের কলেবর পুষ্টতর হইয়াছে। এ-জাতীয় পুস্তক আর কোন বঙ্গনারী কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নাই। আজকাল অজস্র গল্প ও কবিতার বদলে এই জাতীয় পুস্তক আরও হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৮৭৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৩ পর্য্যন্ত স্বর্ণকুমারী দেবী মিবার রাজ, বিদ্রোহ, স্নেহলতা, ফুলের মালা, কাহাকে, হুগলীর ইমামবাড়ী প্রভৃতি উপন্যাস, কবিতা ও গান নামক কবিতাগ্রন্থ, দেবকৌতুক প্রভৃতি নাটিকা, কৌতুকনাট্য ও কয়েকটি প্রহসন লিখিয়াছেন। তিনি যে অশ্রান্তভাবে সাহিত্যের সাধনা করিয়াছেন এইটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাঙ্গলা ১২৮৯ (ইংরাজী ১৮৮৪) সালে তিনি জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে ভারতী পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। এই গুরুতর ভার তিনি একাদিক্রমে এগার বৎসর কাল অতিশয় যোগ্যতার সহিত বহন করিয়াছিলেন। ১৩০২ (ইংরাজী ১৮৯৫) সনে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উহা কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলার হস্তে অর্পণ করেন। ১৩১৫ (ইং ১৯০৮) সনে আবার উহা স্বহস্তে পুনর্গ্রহণ করিয়া ১৩২৩ (১৯১৬) সন পর্য্যন্ত চালাইয়াছেন। উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র সম্পাদনে বহু আয়াস, চিন্তা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন। অপরের প্রবন্ধাদির গ্রহণ, বর্জ্জন, পরিবর্ত্তনাদি কর্ম্মে ধৈর্য্য ও সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির আবশ্যক। সমসাময়িক চিন্তা ধারণার সহিত যোগ-রক্ষাও অপরিহার্য্য। সকলেই স্বীকার করেন যে পত্রিকা পরিচালনের দায়িত্ব স্বর্ণকুমারী সুন্দররূপে পালন করিয়াছেন। 'ভারতী' পত্রিকার ভিতর দিয়া দেবী ভারতী যে [পূজা] পাইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। তিনি করুণ ও হাস্যরসযুক্ত, ইতিহাসমূলক ও সমাজের বর্ত্তমান চিত্র সম্বলিত গল্প উপন্যাসাদি দ্বারা ও নাটকাদি দ্বারা এবং নানাবিধ সাময়িক বিষয়ের আলোচনা ও সমালোচনা দ্বারা পত্রিকাখানির মূল্য ও সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছিলেন।

বঙ্গ রমণীদের মধ্যে প্রথম উপন্যাস লেখিকা, প্রথম পত্রিকা সম্পাদিকা, প্রথম

উল্লেখযোগ্য কবিতা ও গীতের রচয়িত্রী বলিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্য মন্দিরের বর্ত্তমান ও ভাবী পূজারিণীগণের নমস্যা হইয়া থাকিবেন।

আজকালকার মত জটিল সমস্যামূলক, সমাজ-বিদ্রোহ-সূচক এবং বহু তথ্যের আলোচনাপূর্ণ গল্প বা উপন্যাস তিনি লেখেন নাই। যাহা এদেশের প্রতি দিনের, প্রতি স্থানের সুলভ ঘটনা, যাহা জীবনের করুণ ও শান্ত ভাবগুলি ফুটাইয়া তোলে, সৌন্দর্য্যের ও মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে রকম চিত্র তিনি সহজ সুন্দর ভাবে আঁকিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফল যত্ন হইয়াছেন। নির্য্যাতিতা নারীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে, তথাপি রুদ্র বিদ্রোহের রক্ত ধ্বজা তুলিয়া তিনি এক হীনতা হইতে আর এক হীনতায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে নারীকে আহ্বান করেন নাই। তিনি সকল বিষয়ে ধীর ও সংযত ছিলেন। কোন উদ্দাম ভাব তাঁহার কথায় বা লেখায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাঠককে আকৃষ্ট করিবার জন্য কোন অযথা চেষ্টা তাঁহার ছিল না। বাণী পূজার আনন্দই তিনি তাঁহার চরম পুরস্কার বলিয়া জানিতেন। তিনি গাহিয়াছিলেন—

ওগো কমল-আসনা, রঞ্জিনি বীণাপাণি,
আমি কাহারেও আর জানি না ভারতি,
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা,
জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা,
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
আমি জানি না তো তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুরগন্ধ,
শুধু প্রীতি পূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি আনন্দ বিভব ঋদ্ধি,
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।

বাণী পূজাই তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। শুনিয়াছি শেষ পীড়ার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গীত রচনা ও তাহাতে সুর প্রয়োগে নিযুক্ত ছিলেন।

জগত্তারিণী পদক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন। বাং ১৩১৬ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী পদে তিনি বৃত হইয়াছিলেন। আমিই সেদিন তাঁহাকে সভানেত্রীর অর্ঘ্য ও মাল্য নিবেদন করিয়াছিলাম। তাহার পর তাঁহার নিমন্ত্রণে আর একটি দিন তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার শেষ সস্নেহ আহ্বান রক্ষা করিতে পারি নাই, সে দুঃখ আমার রহিয়া গেল।

তাঁহার জীবনের আর একটা দিক এখনও বলা হয় নাই। তিনি মানুষের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতেন, কারণ মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল। কেবল গল্পে উপন্যাসে গানে তাঁহার নারী-হৃদয় স্বদেশের নারীর জন্য কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। যাহাতে নারীদের পরস্পরের

সহিত সখ্য সদ্ভাব ও সহানুভূতি জন্মে, পরস্পরের সম্মিলনে স্বদেশের প্রতি মমতা বর্দ্ধিত হয়, সম্মিলিত শক্তি লইয়া যাহাতে সকলে নানা শুভ অনুষ্ঠানে সমবেত হইতে পারেন ; —যাহাতে নারীর শিক্ষা বিস্তারের নূতন পথ হয়, শিক্ষাগুণে আপনাদের ভরণ-পোষণের শক্তি বর্দ্ধিত হয়—যাহাতে স্বদেশী শিল্পের বিস্তার হয়, এই সকল উদ্দেশ্যে তিনি সখিসমিতি নামে একটি নারী-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে এ দেশের পুরুষ নারী এখনও পারিতেছেন না ; তাই গঠন-মূলক (Construction) কাজের জন্য উৎসাহ বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তাই সখি-সমিতিও দীর্ঘায়ু হইল না। ইহার মৃতদেহের উপর এক বিধবাশ্রম মাতা ও কন্যায় মিলিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। কন্যা হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পর উহা হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম নামে এখনও ক্ষীণভাবে বাঁচিয়া আছে। স্বর্ণকুমারী দেবী এই আশ্রমকে নিজের সমুদয় পুস্তকের স্বত্ত্ব দান করিয়াছেন, আর উহাতে দুইটি বৃত্তি স্থাপনের জন্যও উহাতে আড়াই হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সকল শুভ আকাঙ্ক্ষা ও শুভ চেষ্টা দিন দিন ফলবতী হউক, তাঁহার অমর আত্মা অমর লোকের আনন্দ লাভ করুক এবং ইহলোকে আমাদের মধ্যেও জীবিত থাকুক।*

শ্রী কামিনী রায়

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৩৯

* [বিগত ৩১শে জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্বর্ণকুমারী দেবীর পরলোক গমনে শোক প্রকাশের জন্য যে সভা হয় তাহাতে পঠিত]।

স্বর্ণ-স্মৃতি

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

১৩৩৯ সাল আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনী হইতে পুনর্মুদ্রিত।*

* শ্রীঅরিজিৎ ঘোষ এবং অধ্যাপক ড. অলোক রায়ের আনুকূল্যে প্রাপ্ত।

স্বর্ণ-স্মৃতি *

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এম-আর-এ-এস)

বঙ্গভারতীর মন্দির হইতে সত্য সত্যই একটী গৌরব-দীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া যে প্রতিভা-প্রদীপ বঙ্গবাণীর রত্নবেদী আলোকিত করিতেছিল, যে প্রদীপের প্রোজ্জ্বল শিখা হইতে কত শত শত দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাণীমন্দির অপূর্ব্ব বিভায় বিভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, সে দীপ কালের ফুৎকারে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণলাভ করিল। কবি বলিয়াছেন—

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে,
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে?"

ইহা কঠোর সত্য এবং যে জীবন প্রায় ষাট বৎসরকাল বঙ্গসরস্বতীর অক্লান্ত সেবায় ধন্য হইয়াছে, যে জীবন নারীসমাজের উন্নতিকল্পে নীরবে ও নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, এমন কি রাজনীতিক যে ক্ষেত্রেও যে জীবন বিগত যুগের দেশনায়কগণের সহযোগিতা করিয়া বঙ্গললনাগণকে সর্ব্বপ্রথম এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, যে জীবন সুদীর্ঘকাল দেশচর্য্যা ও সাহিত্যসেবায় সার্থক ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, সে জীবনের জন্য শোকপ্রকাশ কেন? মন মানে না, হৃদয় বুঝিতে চাহে না। সাহিত্যপ্রেমের সেই মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, প্রতিভার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি—যে মূর্ত্তির সম্মুখে থাকিলে কত অভিনব প্রেরণা লাভ করা সম্ভব হইত, কত নব উৎসাহে সুপ্ত হৃদয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিত, কত নূতন আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শে প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সেই বরদশ্রীর জীবন্তমূর্ত্তি যে চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? এ শোকপ্রকাশের ভাষা কোথায়?

বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তারাজ্যে কলিকাতা যোড়াসাঁকোর যে প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশ বেণীসংহারপ্রণেতা ভট্টনারায়ণের কাল হইতে বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন ও করিবেন, স্বর্ণকুমারী সেই মহাবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী, সরল ও প্রাঞ্জল গদ্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔরসে রত্নগর্ভা দেবী সারদার গর্ভে কলিকাতা মহানগরীতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে বিদ্যাশিক্ষার তাদৃশ সুবিধা না থাকিলেও ঠাকুরপরিবারে একজন বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে সুশিক্ষিতা বৈষ্ণবী বিদ্যাবিতরণার্থ আগমন করিতেন। স্বর্ণকুমারী তদীয় জীবনস্মৃতিবিষয়ক একটি প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণীও কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখান বই হাতে ; আর কোন বই না পাইলে

---

* নব দিল্লীতে "বেঙ্গলী লাইব্রেরী এণ্ড লিটেরারী সোসাইটীর" সাহিত্যবিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় ১৯৩২, ১৬ই জুলাই দিবসে পঠিত।

শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের তত্ত্ববিদ্যার সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীন দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়িতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়ে মহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী ভরা পুতুল, খেলানা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।"

এইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। অন্তঃপুরে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া পণ্ডিতের নিকট স্বর্ণকুমারীর সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার পর একজন মেমের নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া মনে না হওয়ায় অতঃপর আদিব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে মহর্ষি অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইঁহার নিকট স্বর্ণকুমারী অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণের সঙ্গে অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তক পাঠ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তদীয় জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন : "এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। * * * আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি যেন উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরে দেখা গেল যে, আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা।" (স্মরণ করিবেন ১১ বৎসর বয়সে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়)।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বর্ণকুমারীর জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে পঠদ্দশায় পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। পর বৎসর স্বর্ণকুমারীর প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান (বোম্বাই শাসনপরিষদের সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত সদস্য) জ্যোৎস্নানাথ এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান সুপ্রসিদ্ধা সরলা দেবী জন্মগ্রহণ করেন।

সাহিত্যসেবা ও সঙ্গীতের চর্চ্চায় স্বর্ণকুমারী তাঁহার উদারহৃদয় স্বামীর নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হন। তাঁহার Fatal Garland নামক পুস্তকের ভূমিকায় স্বর্ণকুমারী লিখিয়াছেন :

"আমার পূজনীয় ও স্নেহময় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য যেভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎকালে হিন্দুবালিকাগণকে সেভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইত না। তথাপি আমার প্রিয়তম স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। আজ বহির্জগৎ আমাকে যে ভাবে দেখিতে পাইতেছে, তিনিই আমাকে সেইভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ উপদেশে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও যেমন সন্তরণনিপুণ ব্যক্তি সহজে ও অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিয়া যায়, সাহিত্যজীবনের ঝটিকাময় ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া আমিও সেইরূপ

অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিয়াছি। এবং যদিও আজ তিনি ইহজগতে বর্ত্তমান নাই, তাঁহার কল্যাণময়ী শক্তি এখনও আমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয় প্রভাব সঞ্চারিত করিতেছে এবং প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহার সাহায্যকারী সবল হস্তের স্পর্শ অনুভব করিতেছি এবং প্রত্যেক সাধু সংকল্পে তাঁহার সমর্থনসূচক উৎসাহবাণী শ্রবণ করিতেছি। সাহিত্যের প্রতি যে গভীর প্রেম তিনি আমার মধ্যে সঞ্চায়িত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে তৎকালীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানদ্যোতক মাসিকপত্রগুলির অন্যতম ভারতী মাসিক পত্রিকার সম্পাদনের দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে অনুপ্রেরিত করিয়াছিল, এবং মানসিক স্বাধীনতার সুখের যে স্বাদ তিনি আমাকে উপভোগ করাইয়াছিলেন, তাহাই আমাকে আমার দেশবাসীগণের সহিত বর্ত্তমান উন্নতিযুগের ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশে সহযোগিতা ও বিস্তারসাধনে সহায়তা করিতে উদ্দীপ্ত করিয়াছে।" তাঁহার 'নবকাহিনী' নামক গ্রন্থের উৎসর্গপত্রেও তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট এই ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন—

স্বামিন্!

সংসারের অন্ধকার ঝটিকা-পীড়নে
যখনি কাতর দেহ, অবসন্ন প্রাণ,
প্রীতিদীপ্ত পূণ্যরূপে নয়ন ভরিয়া
দাঁড়াও সমুখে দেব, কর শান্তি দান।
প্রেমের পরশে তব দলিত হৃদয়,
নবীন জীবন লভে, ফুলে ফুলময়।
স্বর্গের প্রভাত তুমি প্রশান্ত বিমল।
বিধাতার মূর্ত্তিমান আশীষ মঙ্গল।

কিন্তু পিতা ও স্বামীর ন্যায় তাঁহার সাহিত্যানুরাগী ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে স্বর্ণকুমারী সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চ্চায় কম উৎসাহ প্রাপ্ত হন নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং খুল্লতাতপুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ গৃহে যে সাহিত্যিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-জীবন তাহার নিকট অল্প ঋণী নহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তদীয় জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন : "জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে থাকায়, আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।" অন্যত্র :—"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিতাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। * * * সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্‌টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত। * * স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতের চর্চ্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি পূর্ণ হইয়া থাকিত।"

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারীর প্রথম গ্রন্থ 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইনিই মহিলাগণের মধ্যে প্রথম উপন্যাসলেখিকা। তখন প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যতীত উল্লেখযোগ্য পুরুষ উপন্যাসলেখক অধিক

ছিলেন না এবং স্বর্ণকুমারীর গ্রন্থখানি সমালোচকগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং পাঠকগণের অপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়াছিল।

ইহার পরেই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্কল্পানুসারে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বে 'ভারতী' নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বিজেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, রবীন্দ্র ও স্বর্ণকুমারী ইঁহারা সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর রচনায় ভারতীর অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। 'ছিন্ন মুকুল', 'মালতী', 'গাথা', এবং 'পৃথিবী'র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি ভারতীতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বোধ হয় পূর্ব্বে কোন বঙ্গমহিলা রচনা করেন নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ সাত বৎসরকাল সহোদর-সহোদরাগণের সহযোগিতায় অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সহিত ভারতীর সম্পাদনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হওয়ায় ঠাকুরপরিবার শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) সেইজন্য স্বর্ণকুমারীর উপর ভারতীর সম্পাদনভার ন্যস্ত হয়। একাদশ বর্ষকাল অপূর্ব্ব কৃতিত্ব সহকারে ভারতী সম্পাদন করিয়া ১৩০২ সালে স্বর্ণকুমারী তাঁহার কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবীর উপর সম্পাদনভার ন্যস্ত করেন। ১৩১৫ সালে তিনি পুনরায় স্বহস্তে ভারতীর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং ১৩২২ সালে স্বামীর পরলোকগমনে শোকবিহ্বল হইয়া মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর উহার ভারার্পণ করেন। দুইবারে স্বর্ণকুমারী মোট ১৮ বৎসর কাল 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে 'ভারতী' প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইত এবং কোনও পুরুষ সাহিত্যিক সম্পাদিত মাসিক পত্রের অপেক্ষা অল্প যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হয় নাই।

ভারতীতে স্বর্ণকুমারীর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কতকগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, সমস্ত রচনা সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অক্লান্ত সাহিত্যসেবা করিবার সৌভাগ্য অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :—

দীপনির্ব্বাণ (১২৮৩), নবকাহিনী (১২৮৩), ছিন্ন মুকুল (১২৮৫), বসন্ত উৎসব (১২৮৬), গাথা (১২৮৭), মালতী (১২৮৮), পৃথিবী (১২৮৯), মিবাররাজ (১২৯৬), বিদ্রোহ (১২৯৭), স্নেহলতা (১২৯৯), ফুলের মালা (১৩০১), কবিতা ও গান (১৩০২), কাহাকে (১৩০৫), হুগলীর ইমামবাড়ী (১৩০৮), কৌতুকনাট্য (১৩০৮), দেবকৌতুক (১৩১২), কনেবদল (১৩১৩), পাকচক্র (১৩১৯), রাজকন্যা (১৩২০), বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি, দিব্যকমল। বালকপাঠ্য পুস্তকের তালিকা দিলাম না। গত ১৯শে আষাঢ় ১৩৩৯ (৩রা জুলাই ১৯৩২) স্বর্গারোহণের দুইমাস পূর্ব্বেও তিনি 'সাহিত্যস্রোত' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে উহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এরূপ সাহিত্যসেবার দৃষ্টান্ত এদেশে অতি বিরল। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ 'কাহাকে' ও 'ফুলের মালা'র ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে The Unfinished Song এবং The Fatal Garland নামে, লণ্ডনে টি ওয়ার্ণার লরি লিমিটেড গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত করিয়াছে। তাঁহার দিব্যকমলের একটি জার্ম্মাণ অনুবাদও 'কল্যাণী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। Short Stories নামে তাঁহার ছোট গল্পেরও একটী ইংরাজী সংস্করণ মান্দ্রাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্যসেবা ব্যতীত অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যেও স্বর্ণকুমারীর আলস্য ছিল না।

১২৯৩ সালে ইনি 'সখী-সমিতি' নামে একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। উহার উদ্দেশ্য—

[১] সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র সম্মিলনে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাববর্দ্ধন এবং তৎসঙ্গে দেশহিতকর কার্য্যসাধন।

[২] পিতা অক্ষম হইলে বালিকা কন্যাকে শিক্ষার্থে সাহায্যদান, অনাথ অসহায়া বিধবাদিগকে অর্থসাহায্যদান এবং কোন বিধবা ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে আশ্রয়দান করিয়া যাহাতে তিনি দেশহিতকর কার্য্যে জীবনদান করিতে পারেন সেইরূপ শিক্ষাপ্রদান।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণকে এইরূপ সভাসমিতিতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা দেশের কাজ করান যে কতদূর দুরূহ ছিল, তাহা আধুনিকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। স্বর্ণকুমারীর ন্যায় উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি রমণী এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বলিয়াই এই সমিতি সাফল্যলাভ করিয়াছিল এবং উহার চেষ্টায় বহু দরিদ্রকন্যা সুশিক্ষালাভ এবং বহু সম্ভ্রান্ত গৃহের দরিদ্র বিধবা মহিলা অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর নামের সহিত আর একটী অনুষ্ঠান জড়িত। 'মহিলাশিল্পমেলা' ইহাঁর দ্বারাই উদ্ভাবিত। "অন্তঃপুর-মহিলাগণের হৃদয়-মনের প্রসারতাসম্পাদন এবং তাঁহাদের শিল্পোন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগের জন্য এবং মহিলাগণ কর্ত্তৃক বৎসরান্তে উক্ত নামে একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী সংগঠিত হইত। এই প্রদর্শনীতে বোম্বাই, আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর, কানপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের শিল্পাদি রক্ষিত হইত এবং মহিলাগণ তাঁহাদের রচিত নানারূপ শিল্পও প্রেরণ করিতেন। শিল্পনৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অন্তঃপুর-মহিলাগণের নিকট 'মহিলা-শিল্পমেলা' একটি বিশেষ আনন্দ উৎসব বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা প্রতি বৎসর ইহার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এই মেলা হইতে যে অর্থলাভ হইত, তাহা 'সখীসমিতি'র ভাণ্ডারে যাইত।"

স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ এদেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। স্বর্ণকুমারীও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার স্বামীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন সার ফিরোজ সাহ মেটার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হয়, তখন ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি উহাতে 'প্রতিনিধি'রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় রমণী কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর কৃতিত্ব যে তাঁহার জননীর আদর্শের নিকট ঋণী, তাহা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হইবে।

কিন্তু প্রতিভাশালিনী লেখিকা বলিয়াই স্বর্ণকুমারী চিরস্মরণীয়া ও চিরবরেণ্যা হইয়া থাকিবেন। শক্তির প্রাচুর্য্য, সৃষ্টির বৈচিত্র্য, ভাষার লালিত্য ও কল্পনার প্রসারতা তাঁহার রচনাকে একটি বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। আজি কলিকাতায় যৌনসমস্যার আলোচনামুখর তথাকথিত আর্টমূলক সাহিত্য বাঙ্গালার সৎসাহিত্যকে আবর্জ্জনাস্তূপে কিয়ৎকালের জন্য সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেও আমাদের বিশ্বাস আবর্জ্জনাগুলি যথাযোগ্য স্থানেই বিদূরিত হইবে এবং স্বর্ণকুমারীর রচনা বঙ্গসাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবে।

এযুগেও বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর অপরিমেয় দানের কথা বাঙ্গালী বিস্মৃত হয় নাই; তাহার প্রমাণ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশনে মূল

সভাপতি রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বর্ণকুমারী সভানেত্রীর আসনে বৃত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহার প্রতিভার আদর করিয়াছেন। বাঙ্গালার পুরুষশার্দ্দূল স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রত্নগর্ভা জননী জগত্তারিণী দেবীর নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রদান করিবার জন্য একটি সুবর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। উহা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বা লেখিকাকে প্রদত্ত হয়। স্বর্ণকুমারীকে সাহিত্যসেবার জন্য এই পদক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এই পদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কামিনী রায়, অমৃতলাল বসু ও রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনকে এ পর্য্যন্ত প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বাণীর প্রসাদলাভ। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

ওগো কমল-আসনা, রঞ্জিনি বীণাপাণি!
আমি কাহারেও আর জানিনা ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানিনা প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা—
তোমারই পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
আমি জানিনাত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতিপূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত-বাণী।

তিনি যে বাণীর প্রসাদলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি?

স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহার রচনার দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। বাল্যকাল হইতে যাঁহাকে কেবল শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নহে, নিতান্ত আপনার জনের মত মনে করিয়া আসিয়াছি, যাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া আমাদের সাহিত্যশিক্ষা, তাঁহার রচনাবলী নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা কি করিয়া করিব? কেহ স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার আপনার জন যেমন জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, তাহার কেবলই মনে হয় কবে কোন্ দিন সে কি ভাবে তাঁহার নিকট উপকৃত, আমারও আজ কেবল সেই কথাই মনে হইতেছে। স্মৃতিপট উন্মোচিত করিয়া কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র মানসনয়নে ভাসিয়া আসিতেছে—সেগুলি আমার পক্ষে স্মরণ করা প্রীতিকর, কিন্তু আপনাদের নিকট তাহার হয়ত কোনও মূল্য নাই; কারণ যে সামান্য সামান্য ঘটনা বা আচরণ, যে সহৃদয়তার নিদর্শনের স্মৃতি আমি শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহার অক্ষম বিবৃতি হয়ত আপনাদের নিকট সে মহীয়সী মহিলার মহিমময় চিত্রের ক্ষীণতম আভাস দিতে সমর্থ হইবে না। তথাপি উহা ব্যতীত আর আমার কিছু সম্বল নাই।

স্বর্ণকুমারীর নামের সহিত আমি শৈশবকাল হইতেই পরিচিত ছিলাম। আমার ছয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমার তৃতীয় মাতুল বাঙ্গালার বোর্ড অব রেভিনিউএর ভূতপূর্ব্ব মেম্বর পূজনীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে সি-আই-ই মহোদয় ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। সেই সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র বঙ্গে শাসনপরিষদের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালমহাশয়ও ইংলণ্ডে আই, সি, এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং উভয়ে একত্র নানা ভঙ্গীতে যে সকল ফটো তুলিয়াছিলেন সেগুলি আমাদিগের নিকট আসিত এবং চোখে না দেখিলেও জ্যোৎস্নামামা যে আমাদের খুব আপনার লোক, তাহা শৈশব হইতেই ধারণা হইয়াছিল। পরীক্ষার সময় কি রকম পড়া হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে মাতৃদেবীর নিকট একখানি ফটো আসিল—মাতুলমহাশয় দাবাবড়ে খেলায় ব্যস্ত এবং জ্যোৎস্নানাথ বেহালাশিক্ষায় নিবিষ্টচিত্ত। এই সকল ফটো এখনও আমাদের বাড়ীর আলবামে আছে। আমার মাতুল মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (অধুনা কলিকাতার উদীয়মান ব্যারিষ্টার) জ্যোৎস্নাকুমারের নাম তাঁহার বন্ধুর নামানুসারেই রাখিয়াছিলেন। ইনি যে "ভারতীর" বিখ্যাত সম্পাদিকার পুত্র তাহাও ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম। তখন মাসিকপত্রের এত ছড়াছড়ি ছিল না, এবং 'ভারতী'র সমকক্ষ মাসিকপত্র ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই 'ভারতী'র সম্পাদিকার নাম মাসে মাসে পত্রিকার উপর মুদ্রিত দেখিয়া আমার নিকট সুপরিচিত হইয়া গিয়াছিল। আমার মাতুল মহাশয়ের একখানি স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণ বিষয়ক পত্র ভারতীতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে স্বর্ণকুমারীর রচনার সহিত পরিচয়লাভ ঘটিল। সেকালে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসরচয়িত্রী ও লেখিকা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধি কেবল বিজ্ঞাপন ও canvassingএর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, একনিষ্ঠ সাধনার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর উহা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার অনেক উপন্যাস ও গল্প পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি, অনেক কৌতুকপূর্ণ প্রহসন পাঠ করিয়া বিশুদ্ধ হাস্যরসের আস্বাদ পাইয়াছি, অনেক চিন্তাশীল সন্দর্ভপাঠে জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করিয়াছি, অনেক সুমিষ্ট নানা ভাবদ্যোতক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

বাণীসেবায় তাঁহার বিরাম ছিল না, সাহিত্যসাধনায় তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। কতদিন তাঁহাকে ছাপাখানার সম্মুখে গাড়ীতে বসিয়া শেষ প্রুফ সংশোধন করিতে দেখিয়াছি। সাহিত্যসাধনায় এরূপ দীর্ঘকালব্যাপিনী অবিচলিত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অতি অল্পই দেখিয়াছি।

বাল্যকাল হইতে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যপ্রতিভার সহিত পরিচিত হইলেও তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম মাত্র সাত বৎসর পূর্ব্বে। তখন (১৩৩২ বঙ্গাব্দে) আমি তাঁহার প্রতিভাশালী ভ্রাতৃগণের অন্যতম বঙ্গসাহিত্যের অক্লান্ত সেবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত। জীবনীর উপকরণাদি সংগ্রহমানসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। প্রত্যুত্তরে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্বহস্তে কম্পিত অক্ষরে আমাকে তাঁহার ৩নং সানি পার্ক স্থিত বালীগঞ্জের ভবনে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। মনে হয় মধ্যাহ্নে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত সাহিত্যালোচনা করিলেন। বলিলেন, 'তুমি আমাকে নতুন দাদার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যাও, আমি উত্তর দিতেছি'। জ্যোতিবাবুর ও তাঁহার অপ্রকাশিত চিত্র ও পত্রাবলী চাহিলাম। তিনি অন্বেষণ করিয়া উহা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'মিলন রাত্রি' উপহার দিয়া তাহা পড়িয়া আমার মতামত জানাইতে বলিলেন। তখন তাঁহার দুইখানি উপন্যাস ইংরাজীতে অনুবাদিত

ও প্রকাশিত হইয়াছিল। হয়ত তাঁহার কয়েকটি সঙ্গীতেরও অনুবাদ প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ছিল। আমাকে বলিলেন, 'তোমার জানা এমন কেহ আছেন, যিনি ইংরাজী পদ্যে আমার কয়েকটী গীত অনুবাদ করিয়া দিতে পারেন? অনুবাদ তাঁহার নামেই প্রকাশিত হইবে'। আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবির কয়েকটী উৎকৃষ্ট গানের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পূর্ব্বে আমি উহা পুস্তিকাকারে Deathless Ditties নামে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, আমার পিতৃদেব হয় ত করিতে পারেন, তিনি সম্মত হইলে জানাইব।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই পত্র পাইলাম কয়েকখানি ফটো ও পত্র তিনি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমি অনতিবিলম্বে সেগুলি আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাই। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রদত্ত উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছিলাম এবং দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এই প্রবীণা উপন্যাসরচয়িত্রী কিরূপে আধুনিক রাজনীতিক সমস্যা ও তরুণ বাঙ্গালীব আশা আকাঙক্ষার অভিব্যক্তি নিপুণতাসহকারে উপন্যাসখানির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। "জীবন ফুরায়ে এল আঁখিজল ফুরাল না" প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটী পুরাতন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতের পিতৃদেব-কৃত ইংরাজী অনুবাদও তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। অনুবাদের নমুনাস্বরূপ কয়েকটী ছত্র নিম্নে প্রকটিত হইল :—

(১)

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা,
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখি জল ফুরাল না।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর,
পূরিল না জীবনের একটি কামনা।
এখন সুখের কথা, উপহাসি দেয় ব্যথা
এই এ মিনতি সখি, ও কথা বলোনা।

(1)

To suffer anguish was I born,—
Fresh ills my bosom pierce;
While fast the sands of life run out,
Exhaustless flow my tears!

Ah! so perverse my fortune is,
It ne'er fulfilled a wish;
All talk of bliss to me's a taunt:
So, pray, no more of this!

(২)

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়াছে সখি।
এখন তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একি।
জানি এ অভাগী-ভালে, সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলে উঠে থাকি থাকি।

(2)

My stock of bliss for this life, dear,
Hath been exhausted all ;
Yet still I hear, within my heart,
False Hope's delusive call!

I know my fate—no happiness
Is written in my lot ;
And yet my heart's consuming thirst
Extinguish I cannot.

I try so hard this smouldering fire
Of love to quench for e'er ;
But still it flares up now and then,
And baffles all my care!

(৩)

না, না, লুকাব না আর!
আমি যারে ভালবাসি সে নহে আমার॥
সঁপিয়ে এ মন প্রাণ, পাই নাকো প্রতিদান,
বলেছে সে দেখিবে না এ মুখ আমার।
লুকাবো না আর॥

(3)

No, no,! I'll hide no more!
O let my shame be known!—
Him whom I love so much,
I cannot call mine own!

I gave my heart to him ;
My love was not returned ;
He turned away his face ;—
To look at me he spurned.

No, no! I'll hide no more!
O let my shame be known!
Him whom I love so much
I cannot call mine own!

(৪)

শুকাইতে রেখে একা ফেলিয়া চলিলে সখা,
যাও যাও দূরদেশে, সুখে থেকো এই চাই।
যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষ ভরে,
জ্বালাতন করিবারে অভাগিনী বেঁচে নাই।

(4)

You go away, and leave me here
Alone to pine and wither ;—
Where'er distant lands you roam,
May bliss attend you thither!

When back you come, O may the news
With joy your bosom fill ;—
The luckless thing that teased you so,
Lives not to tease you still!

(৫)

সখিরে, তু বোলো।
কাহে এত মন মজিল॥
যব দেখিনু সো হাসি,
পরাণে হইনু উদাসী,
স্বর শুনি হইনু পাগল।
কি আছে সে আঁখিয়াতে, মুই পরাণ হারালো,
সখিরে তু বোলো।
কাহে মেরা অ্যায়সা ভেল,
আপনা সুধায়ে সখি উত্তর ন পাওলো॥

(5)

O say, my sister, say,—
What stole my heart away?
When I saw that smile so sweet,
My life was at his feet!
And when that voice I heard,
A madness seized my blood!
And something in those eyes,
My soul did magnetise!
Now tell me, sister dear,
How did it come to pass?
I questioned mine own heart,—
No answer came alas!

তাঁহার নিকট সংগৃহীত চিত্র ও পত্র মৎপ্রণীত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাঁহার গানের ইংরাজী অনুবাদগুলি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "আমি ত ইহা চাহি নাই ; আমার ইচ্ছা ছিল আমি কতকগুলি গীত নির্ব্বাচিত করিয়া দিব, সেইগুলির অনুবাদ করাইয়া দিবে।" আমি বলিলাম, "বেশ, আপনি কতকগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া দিবেন।" কিন্তু সে নির্ব্বাচনের তিনি সময় পান নাই। সেদিনও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে সাহিত্যালোচনা করিলেন। সাহিত্যালোচনায় এমন উৎসাহ অতি অল্পই দেখিয়াছি। জরা যেন সেই বর্ষীয়সী বাণীপুত্রীর মানসিক শক্তির এতটুকুও খর্ব্বতা সাধন করিতে পারে নাই, নয়নের সেই প্রতিভাদীপ্তি এতটুকু ম্লান করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে স্বর্ণকুমারীপ্রদত্ত ফটোগুলি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে যাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথজীবনী 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে যেমন যেমন প্রকাশিত হইতেছিল, তাঁহাকে একখানি করিয়া ফাইল কপি পাঠাইয়া দিতাম। অনুরোধ করিয়াছিলাম কোন তথ্যের ভুল থাকিলে তিনি যেন আমাকে জানান, তাহা হইলে গ্রন্থাকারে পুনর্ম্মুদ্রণকালে বহিখানি অনেকটা নির্ভুল হইতে পারিবে। দেখিলাম তিনি আগ্রহসহকারে উহা পড়িতেন ; স্মরণ হয় দুই এক স্থলে ভ্রম প্রদর্শনও করিয়া দিয়াছিলেন, গ্রন্থাকারে মুদ্রণের

সময় আমি সংশোধিত করিয়া দিই। স্বনামপ্রসিদ্ধ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা এবং সাহিত্যজগতে সুপরিচিত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ইন্দিরা দেবীর নিকট কিছু উপকরণ থাকিতে পারে ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আমার সহিত একজন লোক সঙ্গে দিয়া তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। বৃদ্ধ বয়সেও যে কাজ তিনি করিতেন আগ্রহসহকারে করিতেন, অনেকের ন্যায় অনর্থক লোককে হাঁটাহাঁটি করাইতেন না।

ইহার পর কিছুকাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। ১৩৩৫ সালে আমি যখন বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জননী ও সহধর্ম্মিণীদের চিত্রসংগ্রহ ও প্রকাশে প্রবৃত্ত তখন একবার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। আমার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আমাকে সাহায্য করিতে পারিলেন না।

গত বৎসর হঠাৎ একদিন তাঁহার একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে স্নেহের মৃদু ভর্ৎসনা ছিল। পত্রের মর্ম্ম এই—'অনেক দিন আস নাই কেন? আগামী রবিবার প্রাতঃকালে আসিলে সুখী হইব। তোমার সঙ্গে আমার একটু কাজও আছে।'

তাঁহার অনুরোধ আদেশ বলিয়া শিরোধার্য্য করিলাম। নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পরে পৌঁছিয়াছিলাম। চা ও জলযোগ করাইয়া তিনি নানাপ্রকার সাহিত্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেকালের অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি এত সব সেকালের কথা জানিলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "আমার পিতামহ 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং আমার প্রমাতামহ "ইণ্ডিয়ান ফীল্ড" সম্পাদক ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জীবনীব উপকরণ ও রচনাবলী সংগ্রহের জন্য তৎকালীন অনেক সংবাদপত্র পাঠ করিতে হয় ও তাহাতে অনেক তথ্য জানিতে পারি। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তকাবলী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতিকথা প্রভৃতিতেও সেকালের অনেক কথা আছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কৃষ্ণকমল বাবু এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কবে আমার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে; তিনি এখনও পড়াশুনা করিতে পারেন কি না—নানা প্রশ্ন। বেলা বাড়িয়া গেল, ছাড়িতে চান না। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আপনার কি কাজ আছে—আমি কি করিতে পারি?" তিনি বলিলেন, "কাজ? এমন কিছু নয়। তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা হইল। আর দেখ, তোমার সব বই কালীসিংহের জীবনী, নতুনদাদার জীবনী, কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী সব আনাইয়া পড়িলাম। পড়িয়া বড় ভাল লাগিল। মনে করিলাম তোমাকে লিখিয়া জানাই, তারপর ভাবিলাম কি আর লিখিব, তার চেয়ে তোমাকে মুখেই বলিয়া দি। আর একটা কথা। আমি একটা নূতন বই লিখছি তাতে বাঙ্গালা গদ্যলেখক যেমন দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালীসিংহ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনার নিদর্শন থাকিবে। তোমার বইগুলা থেকে অনেক সাহায্য নিচ্ছি।" আমি বলিলাম, "সে ত আমার সৌভাগ্য। আমি ত পয়সার লোভে বই লিখিনা, যশের লোভেও লিখিনা। বিস্মৃতকীর্ত্তি মহাত্মাদের সহিত নবীনগণের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য আপনার নামের সহিত বিজড়িত গ্রন্থ দ্বারা আরও বেশী সিদ্ধিলাভ করিবে।"

তাহার পর কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া বলিলেন, "দেখ তোমার বই পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হল। আমি অনেক বড়, তোমাকে যদি একটা কথা বলি ত রাগ করিবে না ত?" আমি বলিলাম, "বিলক্ষণ! আপনারাই ত আমাদের উপদেশ দিবেন। যদি কিছু অন্যায়

লিখি আপনারা দেখাইয়া দিবেন না ত দিবেন কে?"

তিনি বলিলেন, "দেখ তোমার—এর জীবনীটি সুন্দর হয়েছে কিন্তু এক স্থানে তাঁহার চরিত্রদোষের উল্লেখ করিয়াছ। আমার মনে হয় ওটা না করিলেই ভাল হইত। লোকে পরলোকগত হইলে তাঁহার দোষের কথা বিস্মৃত হওয়াই উচিত।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এখন এদেশে পরলোকগত ব্যক্তিগণকে দেবতা করিয়াই অঙ্কিত করা নিয়ম। 'Paint me as I am' জীবিতেরাও এদেশে কেহ বলে না। কিন্তু জীবনচরিত-লেখক কি কেবল গুণের স্তাবক? বাল্মীকি বা ব্যাস অলৌকিক গুণসম্পন্ন মহাপুরুষগণের চরিত্রের গুণগানের সহিত তাঁহাদের কলঙ্ককথাও নির্ভীক ও অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় তিনি পুনরায় বলিলেন, 'ও কথাটা মনে রেখ, যেটা বল্লাম। স্বর্গগত ব্যক্তিদের দোষের কথা মনে করিতে নাই।' ইহার পরদিনই বোধ হয় তিনি চিঠি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আচার্য্য কৃষ্ণকমলের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' কোথায় পাওয়া যায়।

গত ভাদ্রমাসে (১৩৩৮) তাঁহার নিকট যাইবার আমার প্রয়োজন হয়। পরবর্ত্তী আশ্বিনে 'বিচিত্রা'র রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা বাহির হইবে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন, উহার জন্য কোন নূতন ছবি ও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দিতে হইবে। আমি বলিলাম, "দেখুন, এতকাল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ ছাপা হইল, তাঁহার কত ছবি প্রকাশিত হইল, কিন্তু আমার দুঃখ হয়, তাঁহার পত্নী আপনাদের নিকট এরূপ উপেক্ষিতা রহিলেন কেন? তাঁহার ছবি এ পর্য্যন্ত কোথাও কোন সম্পাদককে ছাপিতে দেখিলাম না, তাঁহার কোনও বৃত্তান্ত কোথাও প্রকাশিত হইতে দেখিলাম না।" উপেন্দ্রবাবু ইহা শুনিয়াই বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন। আপনাকে এই কাজটী করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণীর চিত্র ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে বিচিত্রায় সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ছবি চাহিলে দিবেন কিনা কে জানে? যাঁহার নিকট একখানি ছবি পাইব আশা করিয়াছিলাম, তিনি শেষ মুহূর্ত্তে দিতে পারিলেন না। অগত্যা একদিন প্রাতঃকালে স্বর্ণকুমারীর শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার নিকট চিত্রও পাওয়া যাইবে, কবিপত্নী সম্বন্ধে দুই একটী কথাও জানা যাইবে, উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে, এই আশা করিয়া গেলাম। দেখিলাম তিনি একজন গায়ককে লইয়া তাঁহার রচিত ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী একটী গ্রন্থের গানের স্বরলিপি করাইতেছেন। আমাকে বলিলেন, 'তুমি গান শুনিতে ভালবাস?' আমি বলিলাম—'গান শুনিতে কে না ভালবাসে?' 'কি গান শুনবে? নাচের গান ভাল লাগে, না প্রাকৃতিকসৌন্দর্য্য বিষয়ক গান, না ধর্ম্মসঙ্গীত?' আমি বলিলাম—'সব গানই ভাল লাগে।' তখন গায়ককে এক একটি গানের প্রথম পদ বলিয়া দিয়া গান গাহিতে বলিলেন। কতকগুলি গান শুনা হইল। তাহার পর আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, "তার ছবি রবির কাছে চাইলে না কেন, কি রথীর কাছে? তাদের কাছে পরিণত বয়সের ভাল ছবি আছে।" আমি বলিলাম "আমরা চাই তাঁহাদের না জানাইয়া ছাপিতে—তাঁহাদের একটা Surprise দেওয়া যাইবে।" তিনি আমার দুষ্টামি বুঝিলেন, মৃদু হাসিলেন। তারপর বলিলেন, "আমার কাছে যে ছবি আছে সে বহু পুরাতন ছবি, বিবাহের পরেই তোলা, সে ছবি কি ছাপা ভাল হবে? ছবিখানা খুঁজিয়াও দেখিতে হইবে, কোথায় আছে।" আমি বলিলাম—"আমার অসুস্থতার জন্য আসিতে পারি নাই, অথচ 'বিচিত্রা'কে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছি,

দুই চারিদিনে কাগজ বাহির হইবে, ছবিখানি দুইএকদিনের মধ্যেই যে আমার চাই।" দুই একদিনের মধ্যেই পত্র পাইলাম, ছবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন, আনিতে পারি। আমার অসুস্থতার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে যাইতে পারিলাম না। দুইদিন পরে কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি তখন তাঁহার নূতন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ 'সাহিত্য-স্রোতে'র ফাইলগুলি দেখিতেছিলেন। আমাকে দেখাইলেন। উহাতে প্রাগুল্লিখিত কয়েকজন গদ্যলেখকের জীবনী ও রচনার নিদর্শন ছাপা হইয়াছে। দেখিলাম কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার গ্রন্থের নিকট ঋণী তাহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে নূতন গবেষণা থাকে না, প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে সারভাগ সঙ্কলন করা হয়, তজ্জন্য কেহ ঋণ স্বীকার করে না এবং না করিলেও কেহ দোষ গ্রহণ করে না। অনেক খ্যাতনামা গবেষক বেমালুম পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়া দিয়া থাকেন, ঋণস্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু স্বর্ণকুমারী যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণীর চিত্র তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দিলেন। উহা গত বৎসরে আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত করিয়াছিলাম।

'সাহিত্যস্রোত'-গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছিলাম প্রত্যেক লেখকের জীবনী ও রচনার সহিত তাঁহাদিগের এক-এক খানি প্রতিকৃতি দিলে ভাল হয়; ইহার পর আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। জানিতাম না ইহাই আমার শেষ দেখা ও শেষ বিদায় গ্রহণ।

ইহার পর তাঁহার একখানি মাত্র পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —প্যারীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের যৌবনের ছবি পাওয়া যায় কিনা। উত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম যে প্যারীচাঁদের যৌবনের ছবি মদ্বিরচিত 'ভোলানাথ চন্দ্রে'র জীবনচরিতে এবং অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয় দত্তের বৃদ্ধবয়সের ছবিই দেখিয়াছি, যৌবনের ছবি পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিনে সাহিত্যালোচনায় তাঁহার যে উৎসাহের অগ্নিশিখা, নয়নে যে প্রতিভার দীপ্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা যে এত শীঘ্র নির্ব্বাণ লাভ করিবে তাহা কে জানিত? যাঁহারা আমাদের মত তাঁহাকে অল্পকালও দেখিবার সুযোগ ও অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন সাহিত্যপ্রেমের এই স্বর্ণপ্রতিমা, বাণীসেবার এই মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠা কত সাহিত্যসেবকের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, কত অভিনব প্রেরণা দান করিয়াছেন। কালে হয় ত তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থরাজি অনাদৃত হইতে পারে কিন্তু প্রায় ষাটবর্ষব্যাপী অক্লান্ত বাণীসেবার দ্বারা তিনি সাহিত্যচর্য্যার যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, উপদেশ ও উৎসাহ দ্বারা যে অসংখ্য লেখককে বাণীসেবায় ব্রতী করিয়া গেলেন, তজ্জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার প্রতিভাবান সহোদরগণের সহিত স্বর্ণকুমারীর নামও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

(বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণার্থ)

কলিকাতা ৫৫, আপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ
যন্ত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জানকীনাথ ঘোষাল *

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

সংসারের মাঝে, সকলের কাজে,
দেহ প্রাণ মন, করিয়ে অর্পণ
দিয়েছিলে তুমি।
পর আপনার, ছিল না তোমার,
হয়ে একচিত্ত সেবিয়াছ নিত্য
মাতা জন্মভূমি॥
গুণমুগ্ধ তব, বান্ধবেরা সব,
বিদায় সম্মান, করিবারে দান
এসেছে সকলে।
পূজার তরেতে, অর্ঘ্য করেতে,
অনাথ আমরা, আসিয়াছি ত্বরা
নয়নের জলে॥
কে লইবে তাহা শূন্য গৃহ আহা,
তব স্মৃতি বক্ষে, কহে কক্ষে কক্ষে,
নাই কেহ নাই।
অন্তর সে কহে, নহে তাহা নহে,
জানি তুমি আছ, শান্তি লভিয়াছ
অমৃতের ঠাঁই॥

আজ আমরা যাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত হইয়াছি তিনি আমাদের পিতা। আমরা সন্তান হইয়া এই শোকসভায় পিতার কথা যে বলিতে আসিয়াছি তাহা শুধু সম্পর্কের দাবীতে নহে। তিনি আমাদের পিতা—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ—সত্য, কিন্তু তিনি শুধু একলা আমাদের ছিলেন না। শুধু নিজের পরিবার প্রতিপালন করিয়া, নিজের সন্তানদের স্নেহ করিয়াই পিতৃদেব জীবন অতিবাহিত করেন নাই। তিনি তাঁহার উদার মনঃপ্রাণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই—বন্ধুবান্ধব ও মাতৃভূমির সেবায় প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন, যে দিন তাঁহার আত্মজ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্নানাথ বহুদূরে ইংলণ্ড প্রবাসে, সেদিন ভক্তবৎসলা বঙ্গজননীর প্রেরিত বহু পুত্রগণের সহায়তায় আত্মীয়গণের হৃদয়ে জ্যোৎস্নানাথের অনিবার্য্য অনুপস্থিতিজনিত সন্তাপের তীব্রতা কতকটা প্রশমিত হইয়াছিল।

* শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী কর্ত্তৃক পঠিত।

নদীয়ার জয়রামপুরের ঘোষালবংশে প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেবের জন্ম হয়। আমাদের পিতামহ জয়চন্দ্র ঘোষালের দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে পিতামহাশয় কনিষ্ঠ। এই ঘোষালবংশ অসাধারণ বলবীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের জয়রামপুরের পৈত্রিক জমিদারী সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, ঘোষালদিগের কোন পূর্ব্বপুরুষ উহা বীর্য্যতার পুরস্কার-স্বরূপ কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। প্রবাদ এই যে—রাজার এলাকায় এক বন্য মহিষ প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করে, কেহ তাহাকে দমন করিতে না পারায় রাজা ঘোষালদের দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া পাঠান। তাঁহারা রাজাহ্বানের কারণ অবগত হইয়া বলিলেন, এই একটা বুনো মোষের জন্য দুটো লোকের কি দরকার? একজনই যথেষ্ট। এই বলিয়া কোন এক ভ্রাতা একখানা কাঠের মোটা চেলা লইয়া যুদ্ধার্থে যাইলেন। সঙ্গে রাজা, অনুচর, গ্রামবাসী সকলে দর্শকভাবে চলিলেন। মহিষ যেমন আসিয়া আক্রমণ করে, অমনি তিনি শিং ধরিয়া তাহাকে হটাইয়া দেন। এইরূপে খানিকক্ষণ যুদ্ধের পর একবার এমন জোরে তাহার মুখ মাটীতে গুঁজিয়া ধরিলেন যে তাহার উঠিবার সাধ্য রহিল না। তখন তাহার মাথা কাটিয়া রাজাকে উপহার দিলেন ও প্রতিদানে এই ব্রহ্মত্র লাভ করিলেন।

কথিত আছে, আমাদের প্রপিতামহ একদিন ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে গ্রামে একটা ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া অনর্থ করিতেছে। তিনি অমনি ব্যাঘ্রাভিমুখে গমন করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধের পর ব্যাঘ্রকে বধ করিয়া স্কন্ধে লইয়া গৃহে আগমন করেন। কিন্তু ব্যাঘ্রের প্রহারে তাঁহার শরীর এরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছিল যে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পূর্ব্বে ডাকাতের দৌরাত্ম্য প্রবল ছিল কিন্তু শুনা যায় ঘোষালদের এমনিই ডাক নাম ছিল যে জয়রামপুরে তাহারা আসিতে সাহস কবিত না। আর নিকটের গ্রামে ডাকাত পড়িলে যখনই তাঁহারা বিপন্ন পরিবারেব সাহায্যার্থ পঁহুছিতেন ডাকাতেরা সভয়ে প্রস্থান করিত। এখনও দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ঘোষালদের ভয়ে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খায়।"

এই প্রবাদগুলি অতিরঞ্জিত হইলেও, ইহা যে বংশবিশেষেব চরিত্রের গতি নির্দ্দেশ করে তাহা নিঃসন্দেহ। এই বংশে জন্মিয়া পিতার বাল্য-শিক্ষাও বংশানুকুল হইয়াছিল। তাঁহাদের লাঠিখেলা বর্ষাখেলা ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত এবং মধ্যে মধ্যে দুই দল হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ চলিত। জ্যেঠামহাশয় ও পিতামহাশয় দুই বিরোধী দলের অধ্যক্ষ হইতেন—তাঁহাদের মধ্যে অসামান্য ভ্রাতৃস্নেহ ছিল কিন্তু যুদ্ধের সময় কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিতেন না।

এই শান্তিপূর্ণ সময়ে ডাকাত বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার আবশ্যক না হইলেও পিতৃদেবের এই অসাধারণ বল ও সাহসের পরিচয় অনেক কার্য্যেই পাওয়া যাইত।

পূজ্যপাদ মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চুঁচুড়াতে যখন রোগশয্যায় শয়ান তখন একদিন রাত্রিকালে তাঁহার মশারীতে আগুন লাগে। পিতৃদেব তাঁহাকে একলাই কোলে করিয়া উঠাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যান। পিতামহাশয়ের বিবাহের পূর্ব্বে দাদামহাশয় যখন একবার সপরিবারে সিঁথির বাগানে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় পিতা একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেজ-মাতুলমহাশয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অত্যন্ত দুরন্ত ঘোড়া ছিল, কেহই তাহাতে চড়িতে সাহস করিত না। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন দ্বারবান সেই ঘোড়ায়

চড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফিরিবার সময় ষ্টেশনে যাইবার জন্য ভাড়াটে গাড়ী না পাওয়ায় সেজমামা তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, যাইবার একমাত্র এই উপায় আছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন পিতামহাশয় তাহাতে সম্মত হইবেন না ; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতেই আরোহণ করিয়া ষ্টেশনে গমন করেন। ঘোড়া সওয়ার চিনিতে পারে ; তাঁহার হস্তে চালিত হইয়া সুবাধ্য সন্তানের ন্যায় হৃষ্ট ও প্রফুল্লভাবে সে গমন করিল—কোন দুষ্টামির চিহ্নও প্রকাশ করিল না।

যোড়াসাঁকোর বাটীতে তেতলার ছাদে বাগানের দিকে ত্রিকোণচূড়া এক আলিসা আছে। একদিন মামাদের সহিত বাজী রাখিয়া তিনি ইহার উপর দিয়া দৌড়িয়া যান। সামান্য পদস্খলন হইলেই তৎক্ষণাৎ তেতলা হইতে নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। তাঁহার সাহসিকতার এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে কিন্তু বাহুল্য ভয়ে অধিক উল্লেখ করিলাম না।

তাঁহার নিজ ইচ্ছামতই পিতামহ মহাশয় তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠান। তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তিনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এইখানেই তিনি ৺রামতনু লাহিড়ী, ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৺কালীচরণ ঘোষ, ৺রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর রাজার দৌহিত্র) প্রভৃতি বন্ধুগণের সংস্পর্শে আসেন। রামতনু লাহিড়ীপ্রমুখ মনীষীগণের উপদেশ ও উত্তেজনায় পিতামহাশয় ও আরও কতিপয় ছাত্র জাতিভেদে বিশ্বাসশূন্য হন, এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। আমাদের পিসেমহাশয় ৺পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ও ইঁহাদের মধ্যে একজন। উপবীত-ত্যাগবার্ত্তা শুনিয়া পিতামহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করেন, কিন্তু শুনিতে পাই পিতামহী ইহাতে মোটেই রাগ করেন নাই ; বলিয়াছিলেন ছেলের যাহা সত্য মনে হয় তাহাই করিয়াছে, তা করুক। কিন্তু ঠাকুরদাদা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এমন কি জ্যেঠামহাশয়ের মৃত্যু হইলে পিতাকে বঞ্চিত করিবার জন্য অনেক বিষয় সম্পত্তি তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলেন ; তথাপি পিতৃদেব স্বার্থের জন্য নিজের মত ও বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই ; পিতার ক্রোধবজ্র মাথায় লইয়া এই সময় তিনি নানা সমাজসংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এবং নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পুলিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় লোকের পুলিসের সব কার্য্য অনুমোদন করিয়া সদ্ভাবে চলা অধিক দিন সম্ভব নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সময় মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে যান ও এই সুদর্শন উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক যুবককে দেখিয়া প্রীত ও আকৃষ্ট হয়েন এবং কয়েক বৎসর পরে মাতৃদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পিতা বিবাহ করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুরদাদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন এবং এই সময় হইতে আবার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা বধূর মুখ-দর্শন করেন এবং তখন হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আমাদের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন ও আমাদের লইয়া আহারাদি করিতেন। সেকালের হিসাবে তাঁহারও প্রকৃতি উদার ছিল। ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় তাঁহার মনে আঘাত লাগিয়াছিল কিন্তু অনেকগুলি ছোট-খাট কুসংস্কার তিনি নিজেই মানিতেন না।

বিবাহকালে পিতৃদেব মাতামহ-পরিবারের ২টী রীতি গ্রহণ করেন নাই : ১। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ, ২। ঘরজামাই থাকা। এই সময় তিনি ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। মাতৃদেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র। মাতামহ কন্যার যে শিক্ষা পত্তন

করেন, স্বামীর যত্নে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পিতা তাঁহার কন্যাদ্বয়কেও পুত্র-নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, ইহা সকলেই জানেন। মাতৃদেবী ও আমরা যে কোনো সৎকার্য্যের বা দেশ-হিতকর কার্য্যের প্রয়াস পাইয়াছি তাহার তিনি প্রধান সহায় ও উদ্যোগী ছিলেন। পূজনীয় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ-সংস্কার-প্রযত্নে তিনিই সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য যে কি গভীর ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ফললাভদ্বারা তাঁহার অনেক বন্ধুই বিশেষভাবে অবগত আছেন। কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি এখন অতি বৃদ্ধ, তথাপি পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিবার সমস্ত ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদের বিশেষ নিষেধে ক্ষান্ত হন। তাঁহার একজন সহপাঠী বন্ধুকে তিনি একবার কয়েক সহস্র টাকা ধার দেন। বন্ধু তাহার কিয়দংশ শোধ করিয়া একদিন বলিলেন, "বাকী হাজার কতক আর আমি দিতে পারছিনে, আমায় মাপ করে দেও।" পিতৃদেব হাস্যমুখে বন্ধুর এ আবদার মানিয়া লইলেন।

বিবাহের পরেই পিতার বিলাত যাইবার প্রস্তাব হওয়ায় তিনি ডেপুটী কালেকটরীর পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু নানা অভাবিত কারণে সেই সময় বিলাত যাওয়ার বাধা পড়ায় তিনি স্বাধীন জীবিকার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন। সেই সূত্রে বেরিণী কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক দোকান তিনি ক্রয় করেন। তাহা খুব লাভজনক ছিল। বিক্রয় করিবার অল্পদিন পরে—তাহার পূর্ব্ব মালিক তাহা পুনর্লাভে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে পিতা গভীর স্বার্থত্যাগ করিয়া দোকান ফিরাইয়া দিলেন।

তাঁহার ত্যাগস্বীকার ও দয়া প্রভৃতি কিরূপ প্রবল ছিল, তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি। লাটের নিলামে অল্প মূল্যে তিনি অনেকগুলি বিষয় খরিদ করেন; তাহা রাখিলে তিনি লক্ষাধিপতি হইতে পারিতেন। কিন্তু যখন পূর্ব্ব মালিকগণ গললগ্নবাসে আসিয়া জমি ফিরাইয়া দিবার অনুরোধ করেন, তখন তাহার অধিকাংশই তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

রোগীর সেবা তাঁহার একটি প্রধান ব্রত ছিল। পরিবারের সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র তিনি মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যতদূর সেবা করিয়াছেন, আর কেহই তাহা করিতে পারেন নাই। দাসদাসীর রোগেও তিনি সেবা করিতেন। পূর্ব্বে যোড়াসাঁকোর নবাবী প্রথায় চাকরদাসীদের অসুখের সময় তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ ও বৈদ্যের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পিতা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না; অসুখের সময় নিজে পুনঃ পুনঃ তাহাদের খোঁজ খবর লইতেন; আবশ্যক হইলে নিজেও সেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে এজন্য উপহাসাস্পদ হইতে হইত। গরীব দুঃখীর সেবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় ডাক্তারী করিতেন। কাশিয়াবাগান বাগান-বাড়ীতে আমরা যখন ছিলাম—তখন দেখিয়াছি, রোজ সকালে পাড়ার আর্ত্ত লোকে বাড়ী ভরিয়া যাইত। ভোর হইতে রোগী দেখিয়া ঔষধ বিতরণ করিতে করিতে বেলা দশটা এগারটা বাজিয়া যাইত। তাহার পর তিনি স্নান আহার করিতেন।

কাহারও বিপদ বা কষ্ট দেখিলে তিনি প্রাণপণ সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মাতামহমহাশয় এক সময়ে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির সহিত বৈষয়িক মকদ্দমায় জড়িত হয়েন। তখন পিতা আইনের সূক্ষ্ম জাল ভেদ করিয়া যে নীতি বাহির করেন তাহার দ্বারাই তাঁহার বিষয় রক্ষার বিশেষ সহায়তা হয়। সেই সময় আইনে তাঁহার বিশেষরূপ

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিলাত যাইয়া বারিষ্টার হইবার পরামর্শ দেন এবং তিনি আমাদের মাতুলালয়ে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে অধিকাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন কিন্তু শেষ পরীক্ষার পূর্ব্বেই ছয় বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু সংবাদে তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয়। ইচ্ছা ছিল, আবার যাইয়া শেষ পরীক্ষা দিবেন এবং তজ্জন্য বরাবর ফি দিয়া নাম বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আর যাওয়া হয় নাই।

তিনি পরের কষ্টে এতদূর ব্যস্ত থাকিতেন যে নিজের বৈষয়িক কার্য্য অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিত। সান্ত্বনা-পত্রে সকলেই তাঁহার মধুর নম্রতা ও বিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখনও তিনি সমাগত বন্ধু বান্ধবগণকে যথারীতি অভিবাদন করিয়াছেন, নিজে যাইয়া গাড়ীতে পৌঁছাইতে না পারায় দুঃখ জানাইয়াছেন।

কলিকাতার প্রায় সব সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল। অনেক বৎসর তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিসনার ছিলেন। ম্যেকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদে যে ২৮ জন কমিসনার পদত্যাগ করেন, তম্মধ্যে তিনি একজন। শিয়ালদহ ও লালবাজার দুই কোর্টেই তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বৎসরাবধি তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল ; মধ্যে মধ্যে এক একবার শয্যাগত থাকিতেন ; কিন্তু একটু সুস্থ বোধ করিলেই কোর্টে ও অন্যান্য কার্য্যে যাইতেন ; আমাদের নিষেধ মানিতেন না। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিরল।

ইঁহার সঙ্কলিত "Celebrated Trials in India" নামক পুস্তক সাধারণের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে।

পবলিক কার্য্যের মধ্যে তাঁহার সব চেয়ে প্রিয় কার্য্য ছিল—ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস। হিউমের উদ্বোধনে এটি জানকীনাথের স্বহস্তে রোপা, স্বহস্তে জল সেচন করা ও স্বহস্তে বাড়ান জাতীয় মহীরূহ। কংগ্রেসের জীবন আজ ২৮ বৎসর ; আজ অনেকেই ইহার বন্ধু, সহায় ও মুরুব্বি, কিন্তু যতদিন এ নাবালক ছিল, ততদিন জানকীনাথই ইহার প্রধান অভিভাবক ছিলেন।

যে সময়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মাদাম ব্লাভাট্স্কি ভারতবর্ষে আসিয়া থিয়সফি প্রচার করেন সে সময় জানকীনাথ থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিঃ হিউমও থিয়সফিষ্ট ছিলেন। সেকালে বৎসরান্তে মান্দ্রাজে একটি থিয়সফিক্যাল কন্‌ফারেন্স হইত ; ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে থিয়সফিষ্টগণ সেখানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এইরূপ সম্মিলনী হইতেই হিউম সাহেবের মনে একটি ভাবের স্ফূরণ হইল যে, সমগ্র ভারতবাসীর এইরূপ একটি পলিটিক্যাল সম্মিলনী গড়িয়া তুলিতে পারিলে ভারতবাসীর অশেষ মঙ্গল হইবে। এই ভাব হইতেই কংগ্রেসের উৎপত্তি এবং সেই ভাবটিকে কাজে পরিণত করার মূলে ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি তখন কিছুকালের জন্য এলাহাবাদে থাকিয়া "Indian Union" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে তিনি যে কিরূপ ভাবে ইহার জন্য কার্য্য করিয়াছেন, ধন প্রাণ মন দিয়া সকলের তিরস্কার নিগ্রহ সহ্য করিয়া অম্লানচিত্তে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি আরম্ভ হয়, তখন কংগ্রেসে যাইবার উদ্যোগ কতদূর অগ্রসর হইল ক্রমাগত তাহার খোঁজ লইতেন। কংগ্রেস-সঙ্গী ভৃত্য গোপালকে পুনঃপুনঃ শীঘ্র প্যাক করিতে আদেশ করিতেন। জষ্টিস আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আসিলে তাগিদ দিতেন।

পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তম্মধ্যে দুই একটি

কথা উদ্ধৃত করিয়া এখন শেষ করিব। "দুঃখীর দুঃখ নিবারণ, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার, স্বদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার প্রভৃতি যে দিকে যে কোনও কার্য্যে তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন হইত, সর্ব্বদাই তিনি তাহাতে আপনার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিতেন। কোন ভাল কাজের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার কাছে আসিলে কাহাকেও কখনও নিরাশ হইতে হয় নাই। সেই সকল প্রসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, তাঁহার যেন আহার নিদ্রা মনে থাকিত না, কতই যুক্তি আঁটিতেছেন, কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, কতই সাহায্যের পথ আবিষ্কার করিতেছেন। সে সময়ে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকাও একটি আনন্দ।"

আজ ভ্রাতা শ্রীমান জ্যোৎস্নানাথ সুদূর প্রবাসে। তাঁহার অনুপস্থিতিবশতঃ যে পুণ্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে তাহার ত্রুটি ভক্তির দ্বারা পূর্ণ হইবে এই আশা। এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনে যাঁহারা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন আর যাঁহাদের স্নেহ ও সহানুভূতি মাতৃদেবীর শোকার্ত্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি বর্ষণ করিয়াছে তাঁহারা আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

হিরণ্ময়ী দেবী

এ বৎসর যে কয়েকটি মানবলীলার অবসান হইয়াছে তাহার মধ্যে হিরণ্ময়ী দেবীর জীবন 'ভারতী'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ত্রিশাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মাতৃদেবীর সাহায্যার্থ তাঁহার অন্তরালে থাকিয়া 'ভারতী'র সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। মৌলিক প্রবন্ধ তিনি লিখিতেন না, কিন্তু প্রয়োজনীয় সাময়িক তথ্যের ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলা পাঠকদের সহজগ্রাহ্য করা তাঁহার কাজ ছিল। পাস্তুরের ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা বাঙ্গলা পত্রে তিনিই প্রথমে করিয়াছিলেন। সাহিত্য-বিষয়ক অনুবাদমূলক নানা প্রবন্ধও তিনি সে সময় লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মৌলিক রচনা ছিল তাঁর স্বলিখিত সনেট। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে সরল মাধুর্য্য ছিল, যেমন কারো কারো গানের গলা মিষ্টি ও করুণ অথচ সে বড় গাইয়ে নয়—তাঁর কবিতা সেইরূপ ছিল।

কিছুকাল পরে ভগ্নস্বাস্থ্য জননীর স্কন্ধ হইতে 'ভারতী'র গুরুভার তুলিয়া লইয়া তিনি প্রকাশ্যে তার ভারবাহক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন। তখন ছোট ভগ্নীর নাম সংযুক্ত করিয়া ভারতীর সম্পাদনা কার্য্য প্রকৃতপক্ষে তিনিই করিতে লাগিলেন। আজ যে 'ভারতী' পঞ্চাশ বৎসরে পদক্ষেপ করিতে চলিয়াছে এ আয়ুষ্মত্তার প্রধান সহায় হিরণ্ময়ী দেবী। সে সময় তিনি সুচারুরূপে 'ভারতী' সম্পাদন না করিলে বাঙ্গলার সাহিত্যজগতে 'ভারতী'র নাম আজ পর্য্যন্ত প্রবাহিত থাকিত না। সে সময় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ একটি ভারতী-সেবক-মণ্ডলী তিনি নিজ অমায়িকতাগুণে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি 'ভারতী'র একান্ত ঘরের লোক ছিলেন বলিয়া যে এই ঘরই হিরণ্ময়ী দেবীকে আত্মসাৎ করিয়াছিল, বাহিরের মানবসমাজে তিনি তাঁহার প্রীতি ও কীর্ত্তির চিহ্ন রাখিয়া যান নাই, তাহা নহে। ছেলেবেলা হইতেই জনসেবার আগ্রহ ও আয়োজন তাঁর ছিল। এ সব বিষয়ে দিদিই তাঁহার ছোটবোনের পথদর্শী ছিলেন। আমাদের কাশিয়াবাগান গৃহে পল্লীর গৃহস্থ মেয়েদের জড় করিয়া তিনি একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। তিনি প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, আমি হইলাম তাঁর সহকারিণী। তখন তাঁহার বয়স পনেরো, আমার বয়স এগার। আমরা নিজেরা তখন দিনেরবেলা বেথুন স্কুলে পড়ি, সকালে সন্ধ্যায় বাড়ীতে গৃহশিক্ষক পণ্ডিত ওস্তাদ ও মেমের কাছে ইস্কুলের পড়া ছাড়া, সংস্কৃত, গান, সেতার ও পিয়ানো শিখি, আর ইস্কুল হইতে ফিরিয়াই অপরাহ্ণ সাড়ে চারটা হইতে সাড়ে ছটা পর্য্যন্ত দুইঘণ্টা রীতিমত ইস্কুল চালাই। বাঙ্গলা, ইংরাজী, অঙ্ক ও সেলাই এই চারিটি বিষয়ই শেখান হইত। প্রায় গুটি কুড়িক মেয়ে আসিত, কেহ কুমারী, কেহ-বা বালবিধবা। চাঁদনির সিঁড়ির উপর ধাপে ধাপে বসিত। জায়গাটি ছিল সহরের কোলাহল হইতে বহু দূরে। খিড়কি দুয়ার দিয়া পাড়ার বৌ-ঝিরা মল ঝুমঝুম করিয়া পুকুরে জল তুলিতে নিত্য আনাগোনা করিত। তাই বোধ হয় হিরণ্ময়ীর মনে তাদের জড় করিয়া পড়ানর কল্পনা উদয় হয়। যোড়াসাঁকোর আত্মীয়দের প্রতিদিন সমাগম হইত। আমরা তাঁহাদের কারো কারো দ্বারা মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণ করাইতাম, প্রাইজ দেওয়ার সমারম্ভেরও ত্রুটী হয় নাই। দিদির বিবাহের পর আমি একলা কিছুকাল সে স্কুল চালাইয়াছিলাম। যখন আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার সময় ঘণীভূত হইল তখন

স্কুল বন্ধ করিতে হইল।

বিবাহের পর হিরণ্ময়ীর মাতৃপিতৃভক্তি ও পারিবারিক প্রীতি বিশেষভাবে প্রকট হইল। সকল বিষয়ে মায়ের সহকারিণী হইলেন। থিয়সফির তখন খুব প্রচার, আমাদের বাড়ীতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা বসিত। নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনা ও মাতৃদেবীর সহিত সখিত্ব স্থাপিত হইল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অল্কট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, মহিলাদের উপদেশ দিতেন। মাদাম ব্লাভাটস্কির দলভঙ্গের পর থিয়সফির প্রতি শ্রদ্ধার যখন মান্দ্য পড়িয়া গেল, 'সখিসমিতি' নাম দিয়া মাতৃদেবী একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিলেন। থিয়সফিতে দীক্ষিত হওয়ার সূত্রে যাঁহাদের সহিত পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহাদের লইয়াই ইহা প্রথম আরম্ভ হইল। নামকরণ রবীন্দ্রনাথকৃত। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিপন্ন বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, শিল্পমেলা, মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতি আয়োজনে সখিসমিতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী দেবী এসব কার্য্যে মাতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

উপর্য্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগে হিরণ্ময়ীর সন্তানবাৎসল্য-বুভুক্ষিত হৃদয় সখিসমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথ বা দুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজেব কাছে রাখিয়া পালনের জন্য উম্মুখ হইল। বরাহনগরের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত ম্রিয়মাণ সখিসমিতি সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া উহা বর্ত্তমান বিধবাশিল্পাশ্রমে পর্য্যবসিত হইল। এই শিল্পাশ্রমের অনতিপূর্ব্বে তিনি অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি কলাভবন খুলিয়াছিলেন। মূল সখিসমিতি ও কলাভবনের সংমিশ্রণজাত এই বিধবাশিল্পাশ্রম, হিরণ্ময়ী দেবীর নিজস্ব কীর্ত্তি। এইটিকে খাড়া করিতে তিনি দেহপাত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর যে অক্লান্ত উদ্যম, বিপুল অধ্যবসায় ও বুকভরা প্রীতি দিয়া গঠিত হইয়াছে তার পরিচয় এই আশ্রমের আরম্ভ হইতে যে-কোন নরনারী ইহার সংস্রবে আসিয়াছে সেই পাইয়াছে। এখন একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে। কমিটীর প্রেসিডেন্ট পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী। সেক্রেটারী-পদস্থা হিরণ্ময়ী দেবীর কন্যা। দেশমাতা ও শারীর-মাতা এই দুয়ের মধ্যে হিরণ্ময়ীর হৃদয় বিভক্ত ছিল—দুয়েরই সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁর দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল। মাতার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সখিসমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবাশ্রমের জন্ম। কার্য্যকরী শক্তি ও ব্যবস্থাশক্তিতে তিনি বিশেষ সম্পন্না ছিলেন। ব্যবস্থাকালীন বাধা অতিক্রম করিতে তাঁহাকে অনেক সময় কঠোর হইতে হইয়াছে—তাহা কার্য্যকুশলতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। ব্যবস্থাশক্তিগুণে এবং সঙ্গীতরসগ্রাহিতায় সঙ্গীত-পারদর্শিনী না হইলেও অনেক সময় অন্যের অভাবে তিনি স্বয়ংই কোন সমিতির উৎসব উপলক্ষ্যে বা কংগ্রেসের জন্য সংগীতমণ্ডলী গঠনে নেতৃত্ব করিয়াছেন।

হৃদয়-রস তাঁহার ভিতর অপরিমিত মাত্রায় ছিল। মাতা পিতা, ভাই বোন, স্বামী পুত্র কন্যা আত্মীয় সুহৃদ বন্ধু বান্ধব সকলের প্রতি উদ্বেল সহৃদয়তায় সর্ব্বদা ভরপূর। তাঁর স্নেহশীল প্রকৃতি-মুগ্ধ, আমরা বিচলিত হৃদয়ে তাঁর উদ্দেশে এই স্মৃতি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

শ্রীমতী সরলা দেবী

ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২

পরিশিষ্ট ২

ক. ব্রাহ্ম-বিবাহ : স্বর্ণকুমারী দেবী

গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহু-সংখ্য ভদ্রলোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই শুভ কার্য্য আরম্ভ হইল।

সম্প্রদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান ভূমিতে বেদীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমত জ্যেষ্ঠ জামাতৃগণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাক্রমে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তৎপরে পাত্র সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

জামাতৃ বরণ।

সম্প্রদাতা ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন, যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।

ধীরেরা আকাশে প্রসারিত চক্ষুর ন্যায় যে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করি।

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিলেন। যথা—

কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদান-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ পুণ্যাহং।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদান-কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ ঋদ্ধতাং।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদান-কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

অনন্তর অর্ঘ্যাদি দ্বারা পাত্রকে অর্চ্চনা করিলেন। যথা—

সম্প্রদাতা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ এষ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ পরিচ্ছদং প্রতিগৃহ্লামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ ইদমঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্লামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরস্য রামহরি দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরস্য কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরস্য শ্রী জয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং বাৎস্য গোত্রং ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরং শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মাণং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং শাণ্ডিল্য

গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবীং শুভ বিবাহেন দাতুং এভিঃ অর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহংবৃণে।

জামাতা—ওঁ বৃতোস্মি।

সম্প্রদাতা—যথাবিহিতং বিবাহ কর্ম্ম কুরু।

জামাতা—যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনন্তর স্ত্রী-আচার হইল। তৎপরে সম্প্রদাতা বেদীর অভিমুখীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বাম হস্তের সম্মুখে চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্র ও দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে তাদৃশ আসনান্তরে কন্যা বেদীর অভিমুখীন হইয়া উপবেশিত হইলেন। অনন্তর আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী ব্রহ্মোপাসনা ও বৈবাহিক প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সম্প্রদান।

পাত্র ও কন্যা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। যথা—

ওঁ ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দদানি।

জামাতা—ওঁ দদস্ব।

তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তোপরি স্থাপন করিয়া সম্প্রদান করিলেন। যথা—

সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা ঈশ্বরপ্রীতিকামঃ, বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরস্য রামহরি দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরস্য কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরস্য শ্রী জয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য গোত্রায় ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায়, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবীং (প্রথম বাৎস্য গোত্রস্য অবধি এই পর্যন্ত বার ত্রয় বলিয়া) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসাচ্ছাদিতাং তুভ্য মহং সম্প্রদদে।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

সম্প্রদাতা—ধর্ম্মেচ অর্থেচ কামেচ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

জামাতা—নাতি চরিষ্যামি।

সম্প্রদাতা কাঞ্চন দক্ষিণা প্রদান করিলেন, যথা—

ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বাৎস্য গোত্রায় ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মণে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় তুভ্য মহং সম্প্রদদে।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর গ্রন্থিবন্ধন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন।

ওঁ বধ্নামি সত্য গ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইযং।

পাণিগ্রহণ।

অনন্তর ভর্ত্তা ও বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভর্ত্তা আপন অঞ্জলির অভ্যন্তরে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন।

ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নী এধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূ জীর্বসূ র্দেবকামা স্যোনা শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রুবাৎ ভব।
ননান্দরি চ সাম্রাজ্ঞী সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।
ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত মনু চিত্তং
তেহস্তু। মম বাচ মেকমনা জুষস্ব ধর্ম্মাবহস্ত্বা।
নিযুনক্তুমহ্যং।

তৎপরে বধূ স্বামিগোত্রে আপনার নাম উল্লেখ করিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিলেন। যথা—

বাৎস্য গোত্রা শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে।

ভর্ত্তা—ওঁ আয়ুষ্মতী ভব।

এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন।

তৎপরে ভর্ত্তার আসনে বধূ ও বধূর আসনে ভর্ত্তা বেদীর অভিমুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথসকল অতি দুর্গম ; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি ; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখ-দাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি-সাধন ও সুখ-বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন ; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ কর ; তিনি তোমারদিগকে রোগ, শোক, ভয়, বিপত্তি, পাপ, তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীমান্ জানকীনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে ; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে

এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে। যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভ কার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ওঁ যত্রকোবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর দম্পতী তদগতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন, তৎপরে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথা—করুণাময় পরমেশ্বর তোমারদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তপদীগমন।

অনন্তর সম্প্রদান স্থান হইতে বাসগৃহ-গমনের পথে সাত খানি আসন প্রদত্ত হইলে বধূ-ক্রমান্বয়ে তাহাতে পদ নিক্ষেপ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং ভর্ত্তা সেই সপ্ত পদে ক্রমান্বয়ে সাতটী উপদেশ দিলেন ; যথা—

ওঁ ঈশে একপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ উর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ ব্রতায় ত্রিপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ মায়োভবায় চতুষ্পদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ পশুভ্যঃ পঞ্চপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ রায়স্পোষায় ষট্‌পদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
সখ্যং তে মা যোষাঃ সখ্যং তে মা যোষ্ঠ্যাঃ।

অনন্তর বধূ ও ভর্ত্তা বাসগৃহে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে উদীচ্য কর্ম্ম যথা-বিধি সম্পন্ন হইল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৮৯ শক

[সুকুমারী দেবী (আনুমানিক ১৮৫০-৬৪) ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা। ব্রাহ্মসমাজের 'অনুষ্ঠান-পদ্ধতি' রচিত হবার পর সর্বপ্রথম ব্রাহ্মমতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সুকুমারীর বিবাহ হয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই বিবাহ-অনুষ্ঠানটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর 'জীবনকথা'র প্রথম পর্বে (দ্র. 'এক্ষণ', শারদ সংখ্যা ১৩৯৯) "পিসিমাদের বৃত্তান্ত" অধ্যায়ে লিখেছেন :

> তখনকার কালে আমাদের ঘরজামাই রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল; বিশেষতঃ এই কারণে যে, আমরা একে পিরালী তায় ব্রাহ্ম, সুতরাং কোন ভাল হিঁদুঘরের ছেলের আমাদের ঘরে বিয়ে হবার সম্ভাবনা ছিল না। টাকাকড়ি দিয়ে বা বিলেত পাঠিয়ে যদিও বা ভদ্রঘরের কোন ছেলেকে রাজি করানো যেত ত তার নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়তে হত।...
>
> আমার মেজপিসিমা সুকুমারী কেবল এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। যদিও তাঁকে কখনো দেখি নি, তবে শুনেছি তাঁর 'বাইরে' হেম মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, —এবং তাঁর বিয়েই নাকি প্রথম আদিসমাজ মতে হয়; তাই একটু বিশেষত্ব ছিল।

এই নব্য-বিবাহপ্রণালীর বিশদ বিবরণ ভাদ্র ১৭৮৩ শকাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য এই বিবাহ-বৃত্তান্তটি স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ-বৃত্তান্তের (আদিসমাজ মতে বিবাহ হয় ১৭ নভেম্বর, ১৮৬৭ তারিখে) অব্যবহিত পরেই—দীর্ঘ ১৩৯ বছর পর পুনর্মুদ্রিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার (১৮৯০-১৯০৪) মতো সুকুমারীও মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান]।

খ. ব্রাহ্ম বিবাহ : সুকুমারী দেবী

গত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বিবাহ সভায় লোকের বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথা বিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা যে রূপ পদ্ধতি ক্রমে নির্ব্বাহ হইয়াছে, অবিকল তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

কন্যা-যাত্র, বর ও বর-যাত্র সকল আসিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে পর রাত্রি দশ ঘণ্টার পরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পবিত্র হৃদয়ে সম্প্রদান-শালায় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া মঙ্গল-বাচন করিলেন। যথা

মঙ্গল বাচন।

ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং। ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধতাং ওঁ ঋদ্ধতাং ওঁ ঋদ্ধতাং। ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

অভ্যর্থনা।

পরে অর্ঘ্য লইয়া ওঁ অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি। —সম্প্রদাতা, ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্ণামি। —সম্প্রদাতা, ওঁ অঙ্গুরীয়ং অঙ্গুরীয়ং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা, ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্ণামি। পরে বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলেন।

এই রূপে যথা নিয়মে পাত্রের অভ্যর্থনা হইলে পর স্ত্রীআচার করিবার জন্য পাত্রকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। অনন্তর পাত্র আসিয়া আসনে উপবেশন করিলে এবং কন্যাকে আনয়ন করিয়া তৎসম্মুখে বসাইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ বেদীতে উপবেশন করিলেন এবং ব্রহ্মবিষয়ক একটী সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ হইল। জনকোলাহল আর কিছু মাত্র রহিল না। কেবল ব্রহ্ম নামের মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে লাগিল।

ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ তৎসৎ

ওঁ যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথা-তথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥ ত্বমেকং শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্যং ত্বমেকঞ্জগৎপালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেকঞ্জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকম্পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পং॥ ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণ ম্ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাম্পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥ বয়ন্ত্বাং স্মরামোবয়ন্ত্বাম্ভজামঃ বয়ন্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ। সদেকন্নিধান-ন্নিরালম্বমীশং ভবাম্ভো ধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য স্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্ব রহিত, সংসার সাগরের তরণী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈসঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দযাতি। যদাহ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেনাত্ম্যে নিরুক্তে নিলযনে ভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোহভয়ং গতোভবতি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

হে পরমাত্মন্! তুমি নিয়ত আমারদের উপর করুণা-বারি বর্ষণ করিতেছ এবং আমারদিগকে ধর্ম্মের পথে নিয়োগ করিবার জন্য বিবিধ উপায় বিধান করিতেছ। তুমি মঙ্গল দাতা মুক্তি দাতা; তুমি আমারদের সুখশান্তি; তুমি জীবনের জীবন ও চিরকালের সুহৃদ্। আমারদের সমুদায় প্রীতিকে তোমার প্রতি লইয়া যাও এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে অটল উৎসাহ প্রদান কর, যেন সকল অবস্থাতে সকল সময়ে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে সমর্থ হই। তুমি আমারদিগের জীবনের লক্ষ্য, এই সত্যটি যেন আমারদের মনে নিরন্তর জাজ্বল্যমান থাকে এবং সাংসারিক তাবৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম যেন তোমার সত্য-স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্পন্ন করি। হে নাথ! যাহাতে তোমাকে প্রাণ মন সকলই সমর্পণ করিতে পারি এবং আমাদের সমুদায় শক্তি তোমার প্রিয় কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি, এপ্রকার বল ও বুদ্ধি প্রেরণ কর।

সম্প্রদান।

ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে পর সম্প্রদাতা পাত্র কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া "ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দাস্যামি" ইহা বলিয়া পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পাত্রও "ইমাং গৃহ্নামি" ইহা বলিলেন।—পরে সম্প্রদাতা ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কর্কটরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মা ঈশ্বরপ্রীতি কামঃ ভরদ্বাজগোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য রামসুন্দরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, ভরদ্বাজগোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য কাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য শ্রীরাজারাম দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণে বরায়। শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্য গোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং শ্রীমতীং সুকুমারী দেবীং। ইহা তিন বার উচ্চারণ করিয়া। এনাং কন্যাং সালঙ্কৃতাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। জামাতা স্বস্তি বলিলেন।

পরে সম্প্রদাতা ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কর্কটরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভকন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং

দক্ষিণামিমং কাঞ্চনং ভরদ্বাজ গোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইহা বলিয়া জামাতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন। জামাতা স্বস্তি বলিলেন। পরে কন্যা পাত্রের অন্যোন্যাবলোকন হইল। পরে জামাতৃ দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাকে উপবেশন করাইয়া দম্পতীর বস্ত্রদ্বয়ে গ্রন্থি বন্ধন করতঃ পুনর্ব্বার কন্যাকে জামাতৃ বাম পার্শ্বে বসাইলেন।

পরে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দম্পতীকে এই উপদেশ করিলেন।

উপদেশ।

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবনপথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধ-জনিত গুরুতর ভার তোমারদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ সাবধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইবে। ইহার পথ-সকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশি রাশি ; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি সকল তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্যস্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি সাধন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহ কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন"। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলই তাঁহাতে সমর্পণ কর ; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে ; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার সমর্পণ করিলেন ; সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে, যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে আনিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সত্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে যত্নশীল হইবে, যেন উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন।

শ্রীমতী সুকুমারি দেবি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবে। সকল কর্ম্মে পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে ও সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

করুণাময় পরমেশ্বর তোমারদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

ওঁ যত্রকোবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ

সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর দম্পতী তদ্গত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন এবং সভাস্থ লোকদিগকে মাল্যচন্দন দেওয়া হইল।*

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৮৩ শক